অনীশ দেব

ডট কম রহস্য

ডট কম রহস্য

ক্রাইম সাসপেন্স থ্রিলার ভৌতিক

অ নী শ দে ব

ডট কম রহস্য

ক্রাইম সাসপেন্স থ্রিলার ভৌতিক

সৌভিক চক্রবর্তী

প্রিয়জনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

প্রতিঘাত

আগুন রঙের বুলেট

ভূতনাথের ডায়েরি

অনীশের সেরা ১০১

অশরীরী ভয়ংকর

ভয়পাতাল

দুঃখী রাজকুমার

দেখা যায় না, শোনা যায়

ভৌতিক অলৌকিক

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

পাই নিয়ে রূপকথা

রোমাঞ্চকর ধূমকেতু

সহজ কথায় রোবট

সহজ কথায় ইন্টারনেট

সহজ কথায় টেলিভিশন

কেমন করে কাজ করে যন্ত্র

বিজ্ঞানের হরেকরকম

বারোটি রহস্য উপন্যাস

পাঁচটি রহস্য উপন্যাস

বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৯৯ সাল নাগাদ আমরা 'ডট কম' শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছিলাম, কারণ, ইন্টারনেটের ব্যবহার তখন ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে-ধীরে। এই 'ডট কম'-এর 'প্রেমে' পড়ে গিয়ে ২০০০ সালে (মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে বোধহয়—ঠিকঠাক মনে নেই) 'সুখী গৃহকোণ' পত্রিকায় 'মার্ডার ডট কম' নামে একটা ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম। যতদূর জানি, বাংলা গল্প-উপন্যাসের নামকরণে 'ডট কম'-এর ব্যবহার সেই প্রথম। এই নামকরণের মাধ্যমে এটা বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, লেখাটার ডোমেন মার্ডার।

এর পর ২০০৩ সালে 'ক্রাইম ডট কম' নামে আমার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। তারপর একে-একে আসে 'সাসপেন্স ডট কম' (২০০৮), 'থ্রিলার ডট কম' (২০০৯) এবং সবশেষে 'ভৌতিক ডট কম' (২০১১)। সবগুলোই সংকলন। তাতে গল্প ছিল, নভেলেট ছিল, উপন্যাসও ছিল। বছরদুয়েক আগে হঠাৎই মনে হয়েছিল, এই চারটে সংকলন এখন যেহেতু কমবেশি অমিল, এগুলো একসঙ্গে একটা বইয়ের মধ্যে এলে কেমন হয়? সেই ইচ্ছাপূরণের নামই 'ডট কম রহস্য'।

১৯৬৮ সালে বাণিজ্যিক পত্রিকায় আমার লেখালিখির শুরু। 'ভৌতিক ডট কম' প্রকাশের সময় পর্যন্ত আমার লেখালিখির বয়েস মোটামুটি ৪৩ বছর। সেই ৪৩ বছরের আউটপুট থেকে তুলে নেওয়া ৫৯টি লেখা জায়গা পেয়েছে এই স্থূলকায় সংকলনে। এর মধ্যে কয়েকটি লেখা আমার 'অনীশের সেরা ১০১' বইয়ে জায়গা পেয়েছে—আর বাকিগুলো শুধুমাত্র এই বইতেই বন্দি হয়ে রইল। এতগুলো লেখা একসঙ্গে আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। এই বইটি তৈরির কাজে পত্রভারতীর বরুণ রায় বিশেষভাবে পাশে থেকেছেন। ওঁকে ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

অনীশ দেব

১৩ অক্টোবর, ২০১৯

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি

কলকাতা ৭০০১২৬

লেখকের সম্পাদিত বই

রক্ত ফোঁটা ফোঁটা

সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩

রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প

সূচিপত্র

হত্যাকাণ্ড

থ্রিলার ডট কম

টাইম-কিলার

ভৌতিক ডট কম

তোমার আসা চাই

আমার বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুল

অন্ধকার রঙের কুকুর

চেইন রিয়্যাকশন

নীল রঙের মশারি

চ্যানেল এক্স

অনির্বাণ ছাই

আলো জ্বেলো না, কেউ শব্দ কোরো না...

কুয়াশা, অন্ধকার এবং...

ভৌতিক ডট কম

না যেন করি ভয়

আঁধারপ্রিয়া

অপরূপ অন্ধকার

ক্রাইম ডট কম

গল্প

একটা ঘুঁটি কম ছিল

চন্দ্রাণীকে খুন করার জন্য দেবপ্রিয় যে-ছক তৈরি করেছিল তাতে কোনও ভুল ছিল না।

ছকটাকে নানাদিক থেকে বারবার খতিয়ে দেখে দেবপ্রিয়র অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল।

সবাই জানে, কোনও বিবাহিতা মহিলা খুন হলে পুলিশ সবার আগে তাঁর স্বামীকে সন্দেহ করে। দেবপ্রিয়ও এ-কথা জানত। সেইজন্যই ও বারবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছকটাকে যাচাই করছিল।

ব্যাপারটা অনেকটা স্লো মোশানে অ্যাকশন রিপ্লে দেখার মতো।

প্রায় মাসখানেক ধরে খুনের ছকটায় ঘুঁটি চালাচালি করে দেবপ্রিয় যেদিন নিশ্চিত হল যে, না, ছকটায় কোনও গোলমাল নেই, সেদিন ফূর্তিতে ও তিন পেগ হুইস্কি চড়িয়ে বাড়ি ফিরল। চন্দ্রাণীকে ও আর ভয় পায় না।

ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে পাখির ডাকের কলিং বেল টিপতেই ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখল চন্দ্রাণী। তারপর দরজা খুলল।

এবং মদের গন্ধ পেল।

'আজ আবার এসব গিলে এসেছ!' চাপা গলায় হিসহিস করে বলল চন্দ্রাণী। ও চায় না ঘরের অন্তর্বাস চৌরাস্তার মোড়ে কাচা হোক, তাই গলার স্বর তিরিশ ডেসিবেলের উপরে উঠল না।

'তেমন কিছু খাইনি।' জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে জবাব দিল দেবপ্রিয়, 'ওরা জোর করে খাইয়ে দিল...।'

'ওরা' কারা দেবপ্রিয় জানে না। জানার দরকারও নেই।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে চন্দ্রাণীর গীতাপাঠ শুরু হল: ভদ্রসমাজে বাস করতে হলে সমাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়; আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি বোধ থাকা দরকার; সম্মান গেলে কখনও আর ফিরে আসে না; ডিসিপ্লিন একটা সুখী সংসারের চাবিকাঠি।

গীতাপাঠ চলছিল, আর দেবপ্রিয় এক অদ্ভুত চোখে বউকে দেখছিল। মনে-মনে বেশ মজা পাচ্ছিল ও। চন্দ্রাণী জানে না, ওর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। আর কদিন পর যখন ও 'নেই' হয়ে যাবে, তখন বেনিয়ম করলে দেবপ্রিয়কে এরকম জ্ঞান দেবে কে!

আক্ষেপের ‘চুক-চুক’ শব্দ বেরিয়ে এল দেবপ্রিয়র মুখ থেকে। ও বলল, ‘সরি, চন্দ্রা... আর হবে না। প্লিজ, ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।’

দেবপ্রিয় অন্যদিন এত সহজে বশ মানে না। আজ মানল। কারণ, আজ একটু আগেই ও চন্দ্রাণীর কপালে মনে-মনে কাটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এখন থেকে ও চন্দ্রাণীর সব কথা শুনবে, পদে-পদে ওর কাছে হার মানবে। আর তো মাত্র কটা দিন!

চন্দ্রাণীর বাবা রিটায়ার্ড বিচারপতি। আর মা কলেজের প্রফেসর। চন্দ্রাণী ওঁদের একমাত্র মেয়ে।

বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মেলামেশা করে দেবপ্রিয় যা বোঝার বুঝেছে। ওর মনে হয়েছে চন্দ্রাণীর বাবার ডাকনাম ডিসিপ্লিন, আর মায়ের ডাকনাম আত্মসম্মান। এই দুটি মহান মানুষের মিলনে জ্ঞান লগ্নে অহংকার রাশিতে চন্দ্রাণীর জন্ম। ওর ডাকনাম চানু, কিন্তু দেবপ্রিয়র মনে হয়েছে ডাকনামটা গীতা হলেই ভালো মানাত।

প্রেম গীতা-টিতা মানে না। তাই দেবপ্রিয়র সঙ্গে চন্দ্রাণীর প্রেম হয়েছিল। বিয়েও।

তার পাঁচ বছর পর আবার প্রেম এল। শরীরী প্রেম।

মেয়েটির নাম ললনা। দেবপ্রিয়দের অফিসে সিস্টেম অ্যানালিস্ট-এর কাজ করে। দেখতে রীতিমতো কুৎসিত। কিন্তু ওর অন্য লুকোনো গুণ আছে। যে-গুণ মরা মানুষের শরীরেও শ্মশানের লকলকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ললনার কোনও ডাকনাম নেই। তাই দেবপ্রিয় ওর ডাকনাম রেখেছিল কামনা। ডাকনামটা কামনার বদলে বাসনা অথবা বিছানা হলেও কোনও ক্ষতি ছিল না।

অনেকে হয়তো ভাববে কামনাকে বিয়ে করার জন্যই চন্দ্রাণীকে দেবপ্রিয় খুন করতে চাইছে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। কারণ, কামনাকে বিয়ের ব্যাপারে দেবপ্রিয়র কোনও মাথা ব্যথা নেই। তা ছাড়া কামনার ইন্টারেস্ট শুধু ইয়েতে—বিয়েতে নয়। ও কারও আন্ডারে থাকতে ভালোবাসে না। যেমন দেবপ্রিয় চন্দ্রাণীর আন্ডারে রয়েছে।

যখন ওরা আদরে-আদরে ব্যস্ত থাকে তখন এই আন্ডারে থাকা নিয়ে দেবপ্রিয়কে মাঝে-মাঝে খোঁচা দেয় কামনা। সেইসঙ্গে খিলখিল হাসি এবং মারাত্মক শরীর ঝাঁকুনি—যা একমাত্র ও-ই পারে। তখন দেবপ্রিয় সুখে পাগলের মতো হয়ে যায়।

‘এখন তুমি আমার আন্ডারে আছ।’ শব্দ করে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে এলো চুল সরিয়ে দেয় কামনা। তারপর ‘কাল রাতে আমি তোমার আন্ডারে ছিলাম।’ খিলখিল হাসি ‘এইরকম আন্ডারে থাকতে ভালো লাগে। তবে তুমি যেভাবে তোমার বউয়ের আন্ডারে দিন কাটাও সেরকম নয়। আমার কাছে লাইফের মানে হচ্ছে ফ্রিডম...।’

এইরকম একটা অবস্থায়, অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কামনার কথা শুনতে-শুনতে, হঠাৎই আন্ডারওয়ার্ল্ড শব্দটা দেবপ্রিয়র মাথায় আসে। এবং মনে হয়, চন্দ্রাণীকে খুন করলে কেমন হয়!

আশ্চর্য! এ-কথা ভাবামাত্রই ওর শরীর উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইল। লোহা হার মেনে গেল ওর শরীরের দৃঢ়তার কাছে।

কামনা সেটা টের পেল। টের পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ওর কাজে মন দিল।

দেবপ্রিয় যখন পুরোনো কথা ভাবে তখন ও বেশ বুঝতে পারে সেই বিশেষ মুহূর্তেই চন্দ্রাণীকে খতম করার মতলবটা প্রথম ওর মাথায় জন্ম নিয়েছিল।

তারপর থেকে দেবপ্রিয় ধীরে-ধীরে টাকা জমাতে শুরু করে। কারণ, আন্ডারওয়ার্ল্ডের যে-পেশাদারি খুনিকে ও চন্দ্রাণীর দায়িত্ব দেবে তাকে টাকা দিতে হবে। এখন এসব কাজের যা বাজারদর তাতে হাজার পঞ্চাশেক হলেই কাজ হয়ে যাবে।

এই ধরনের খুনের ক্ষেত্রে পুলিশ স্বামীকে সন্দেহ করে প্রথমেই খোঁজ করবে সম্প্রতি স্বামীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা টাকা তোলা হয়েছে কি না। সেইজন্যই দেবপ্রিয় প্রতি মাসে অল্প-অল্প করে টাকা তুলে নিজের কাছে ক্যাশ টাকা জমাতে লাগল। যেদিন ওর লুকোনো ক্যাশ-টাকার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছবে সেদিন ও ছকের নতুন ধাপে পা দেবে।

টাকাটা জমাতে আট মাস সময় লাগল। তারপর দেবপ্রিয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রফেশনাল কিলারের খোঁজ করতে শুরু করল।

পাড়া থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে প্রোমোটার সেজে জমির খোঁজে নেমে পড়ল দেবপ্রিয়। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করতেই একজন পেশাদার খুনির খোঁজ পেয়ে গেল ও।

লোকটার নাম স্টেন মদন। কালো, রোগা, দড়ি পাকানো চেহারা। বাঁ-চোখটা সামান্য ট্যারা। বয়েস বড়জোর পঁয়তিরিশ। তবে ওর কারিকুলাম ভিটা দেখবার মতো। পাঁচটা খুন, তিনটে ধর্ষণ, আটবার ডাকাতি, এছাড়া গুলি-গোলা বোমাবাজি তো আছেই! এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট সাত বছর জেল খেটেছে।

মদনের গলায় সোনার চেন, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে জিনস, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাতে সোনার ব্যান্ড লাগানো ঘড়ি। ছিটেবেড়া আর টিনের চাল লাগানো একটা মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে টেপ-রেকর্ডারে গান শুনছিল আর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

দেবপ্রিয় চুল উসকোখুসকো করে চোখে রে-বান-এর সানগ্লাস লাগিয়ে মদনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একমিনিটের মধ্যেই ওর কাজের কথা শেষ হয়ে গেল।

দরাদরির মধ্যে না গিয়ে ও প্রথমেই মদনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অফার করে বসল। তারপর চন্দ্রাণীর একটা রঙিন ফটো ওকে দিল। সঙ্গে টাইপ করা ঠিকানা।

নোংরা বালবের আলোয় মদন ফটোটা তেরছা চোখে দেখল। গ্লাসে একটা জোরাল চুমুক মেরে বলল, 'কোনও টেনসন নেই—মাল নেমে যাবে।'

দেবপ্রিয় গলাটা অন্যরকম করে বলল, 'এই মেয়েটি ফ্ল্যাটে একাই থাকবে। তবে কলিং বেল বাজালেই আপনাকে দরজা খুলে দেবে না। তখন আমার লেখা একটা চিরকুট আপনি দরজার নীচ দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন। ওটা পড়লেই ও দরজা খুলে দেবে। তারপর ফ্ল্যাটে ঢুকে...।'

কথা শেষ না-করে মদনকে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল দেবপ্রিয়—লাল রঙের তিরিশটা নোট। তারপর স্টেন মদনের মোবাইল নাম্বার নিয়ে চলে এল। বলল, ওর সঙ্গে মদনের আর দেখা হবে না। বাকি আলোচনা ও ফোনে করবে।

মদনকে দেবপ্রিয় নিজের নাম বলেনি। ওদের আলাপ-পরিচয় যত কম হয় ততই ভালো। তাতে ধরা পড়ার ভয় কম। খুনের দিনে সকালে মদন ওর নাম জানতে পারবে — তার আগে নয়।

'কিন্তু আপনি ফোন করলে বুঝব কেমন করে?' মদন জানতে চাইল।

'আমি ফোন করে প্রথমেই বলব, 'চন্দ্রাণী বলছি।' তাতে আপনি বুঝে নেবেন। আর কবে, কখন কাজটা সারতে হবে সেটা আমি কাজের দিন সকালে আপনাকে জানাব। এসবই সেফটির জন্যে। বাকি কুড়ি হাজার টাকাও আপনি সেদিনই পেয়ে যাবেন—তবে কীভাবে পাবেন সেটা এখনই বলছি না।'

মদন হাসল। বলল, 'ডিউ বিস হাজার টাকা নিয়ে কোনও পরেসানি আমার নেই। আমার টাকা কেউ চোট করতে পারে না...তাহলে সে নিজেই চোট হয়ে খাল্লাস হয়ে যাবে।'

দেবপ্রিয় কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এল। গলা ছেড়ে হিন্দি গান গাইতে-গাইতে ফ্ল্যাটে ঢুকল।

চন্দ্রাণী ওর হেঁড়ে গলার গান শুনে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আনকালচার্ড।'

রাতে বিছানায় শুয়ে ক্রিকেটারদের ক্যাচ প্র্যাকটিসের মতো খুনের ছকটাকে নিয়ে অন্ধকারে লোফালুফি করতে লাগল দেবপ্রিয়। ওর ভেতরে একটা খুশির তুবড়ি জ্বলছিল।

সারা রাত ধরে খুনের ছকের প্রতিটি ধাপ খতিয়ে দেখল দেবপ্রিয়। নাঃ, কোথাও কোনও ফাঁক নেই। সব ঘুঁটি ঠিক-ঠিক জায়গাতেই বসানো আছে।

দেবপ্রিয়র ছকের ধাপগুলো এইরকম :

১. চন্দ্রাণীকে খুন করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

২. ধীরে-ধীরে, বেশ সময় নিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকা গোপনে জমানো। টাকাটাকে ধীরেসুস্থে নানান জায়গা থেকে হাজার টাকার নোটে বদলে নেওয়া। এতে টাকা দেওয়া-নেওয়ার সুবিধে হবে।

৩. একজন ভাড়াটে খুনিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া। সঙ্গে চন্দ্রাণীর রঙিন ফটো এবং কম্পিউটারে ছাপানো ফ্ল্যাটের ঠিকানা।

সতর্কতা : খুনিকে ঠিক করতে হবে বেশ দূরের কোনও এলাকা থেকে। খুনির সঙ্গে দেখা করার সময় হালকা ছদ্মবেশে—যেমন, সানগ্লাস ইত্যাদি—ব্যবহার করতে হবে। খুনির সঙ্গে একবারের বেশি দেখা করা ঠিক হবে না। সব যোগাযোগ ফোনে সারতে হবে। ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা যে-কোনও একটা কম্পিউটার সেন্টার থেকে অন্যান্য বাজে ঠিকানার সঙ্গে ছাপিয়ে নিতে হবে। তাতে হাতের লেখা মিলিয়ে পুলিশ তদন্তে এগোতে পারবে না।

৪. খুনের দিনক্ষণ ঠিক করার পর তার দু-দিন কি তিনদিন আগে ঘরের রঙিন টিভিটা খারাপ করে দিতে হবে।

৫. পাড়ার এমন একটা ইলেকট্রিকের দোকানে খবর দিতে হবে, যার বেশ গাফিলতি আছে। সাতবার কি আটবার তাগাদা না-দিলে মিস্তিরি পাঠায় না।

৬. খুনের দিনটা কাজের দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হবে— যাতে অফিস-কাছারি সব খোলা থাকে। সেদিন বেলা বারোটার সময় ভাড়াটে খুনিকে ফ্ল্যাটে আসতে বলবে।

৭. খুনি টিভি সারানোর মিস্তিরি সেজে বাড়িতে ঢুকবে। একতলায় সিঁড়ির নীচে দেবপ্রিয়দের নাম লেখা লেটার বক্সে একটা চিরকুট রাখা থাকবে।। চিরকুটে চন্দ্রাণীর নামে একটা ছোট্ট চিঠি লিখবে দেবপ্রিয়। যার সারমর্ম হল, 'টিভি সারানোর মিস্তিরি যাচ্ছে—ওকে টিভিটা সারাতে দিয়ো। টাকাপয়সা কিছু দিয়ো না—যা দেওয়ার আমি দিয়ে দেব।'

চিঠির ওপরে ইলেকট্রিকের দোকানের নাম ও মালিকের নাম লেখা থাকবে—যাতে খুনি নাম দুটো জানতে পারে, চন্দ্রাণী আচমকা জিগ্যেস করলে ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারে।

৮. লেটার বক্স থেকে চিরকুটটা নিয়ে খুনি দেবপ্রিয়দের ফ্ল্যাটে যাবে। কাজ শেষ করে চিরকুটটা মুখে পুরে স্রেফ গিলে ফেলবে—অথবা, লেটার বক্সে রেখেই চলে যাবে। দেবপ্রিয় পরে ওটা সরিয়ে নেবে।

সতর্কতা : চিরকুটটা যাতে কিছুতেই পুলিশের হাতে না-পড়ে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। ওতে দেবপ্রিয়র হাতের লেখা থাকবে। তা হলেই জানা যাবে মিস্তিরি পাঠানোর ব্যাপারটা মিথ্যে। আর খুনির সঙ্গে দেবপ্রিয়র যোগাযোগের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যাবে।

৯. চন্দ্রাণীর খুনটা নিশ্চিত করতে বড়জোর দুটো গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। গুলির শব্দ চাপা দেওয়ার জন্য সাইলেন্সার অথবা বালিশ কাজে লাগনো যেতে পারে। ব্যাপারটা ফোনে খুনির সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ খুনিকে মোবাইলে ফোন করবে দেবপ্রিয়। যখন জানবে কাজ শেষ, তখন খুনিকে বলবে মোবাইল ফোনের 'সিম' কার্ডটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ক্যাশকার্ড ভরে নিতে। তখনই ও জেনে নেবে, খুনির বাকি টাকাটা কোনও মিডলম্যানের মারফত কবে কখন খুনিকে পৌঁছে দিতে হবে।

সতর্কতা : 'সিম' কার্ড পালটানের ব্যাপারটা বেশ জরুরি। দরকার হলে এ-কাজের জন্য খুনিকে বাড়তি দু-হাজার টাকা অফার করা যেতে পারে।

১০. চন্দ্রাণীকে খুন করানোর অন্তত একমাস আগে থেকেই ললনার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দিতে হবে। খুনের পর কমপক্ষে ছ-মাস ললনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলবে দেবপ্রিয়। তারপর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।

১১. চন্দ্রাণী খুন হওয়ার পর পুলিশ যথারীতি দেবপ্রিয়কে সন্দেহ করবে এবং পাগলা কুকুরের মতো খুনের মোটিভ খুঁজে বেড়াবে। সেইজন্যই দেবপ্রিয় শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়া পর চন্দ্রাণীর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি কোর্টের কাগজ তৈরি করে চন্দ্রাণীর মা-বাবাকে গিফট করে দেবে। তাহলে পুলিশ কিছুতেই আঁচ করতে পারবে না, চন্দ্রাণীর আন্ডারে-আন্ডারে থেকে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লান্তি থেকেই দেবপ্রিয় চন্দ্রাণীকে খুন করার ছক কষেছে। অর্থাৎ, ওরা কোনও মোটিভ খুঁজে পাবে না।

এগারোটা ধাপের পর আবার সুস্থ স্বাভাবিক স্বাধীন জীবন। তার মধ্যে তিনটে ধাপ ইতিমধ্যে দেবপ্রিয় শেষ করে ফেলেছে। বাকি আর মাত্র আটটা ধাপ।

তৃপ্তিতে দেবপ্রিয়র চোখ বুঝে এল। অন্ধকারে পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে দুবার 'ললনা' বলে ডাকল। পাশবালিশ কোনও উত্তর দিল না। তবে দেবপ্রিয়র শরীরের চাপ টের পেল।

এক মঙ্গলবারকে চন্দ্রাণীর অমঙ্গলের দিন বলে দেবপ্রিয় বেছে নিল।

তার আগের বৃহস্পতিবার স্টেন মদনকে ও ফোন করল। বলল, দিন এগিয়ে আসছে—তৈরি থাকতে। খুনের দিন সকাল নটায় ও মদনকে ফাইনাল সিগনাল দেবে। তারপর ওর

সঙ্গে মদনের যোগাযোগ হবে বেলা সাড়ে বারোটায়। তারপর আর কোনওদিন হবে না।

শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ চন্দ্রাণী কিছু কেনাকাটা করতে কাছেই সুপারমার্কেটে গিয়েছিল। সেই সুযোগে টিভির পিছনের ঢাকনা খুলে সার্কিট বোর্ডে জল ঢেলে রাখল দেবপ্রিয়।

মার্কেট থেকে ফিরে এসে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল চন্দ্রাণী। দেবপ্রিয় তখন ফ্ল্যাটের গেস্টরুমে অফিসের কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজের ভান করছে। কিছুতেই ও টিভির সুইচ অন করবে না।

দেবপ্রিয়কে মন দিয়ে কাজ করতে দেখে খুশি হল চন্দ্রাণী। রান্নার ফাঁকেই ওকে এক কাপ চা করে দিল। তারপর হাতের কাজ সেরে যেই না টিভি অন করেছে অমনই শর্ট সার্কিট, শব্দ, অন্ধকার, পোড়া গন্ধ। নিশ্চয়ই ফিউজ উড়ে গেছে।

পত্নীব্রতা স্বামীর মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ল দেবপ্রিয়। ফিউজ-টিউজ পালটে সবকিছু ঠিকঠাক করল। তারপর টিভি অন করে দেখল টিভি চলছে না।

অতএব চার নম্বর ধাপ শেষ।

পরদিন দেবপ্রিয় পাড়ার 'বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক'-এ খবর দিল। মালিক অনিমেষ পাত্র—দেবপ্রিয়র 'অনিমেষদা'—বললেন, চিন্তার কিছু নেই...দু-একদিনের মধ্যেই তিনি লোক পাঠাচ্ছেন।

দেবপ্রিয়র ছকের পাঁচ নম্বর ধাপ মসৃণভাবে শেষ হল।

সোমবার রাতে কাজের ছল করে প্রায় বারোটা পর্যন্ত জেগে রইল দেবপ্রিয়। অনেক মকশো করার পর একটা ছোট্ট চিঠি দাঁড় করাল:

বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিক

অনিমেষ পাত্র

চন্দ্রা,

টিভি সারানোর মিস্তিরি যাচ্ছে। ওকে টিভিটা সারাতে দিয়ো। টাকা-পয়সা কিছু দিয়ো না—যা দেওয়ার আমি পরে হিসেব করে দিয়ে দেব। বাড়ি ফিরে কথা হবে। লাভ ইউ।

দেবপ্রিয়

১৮/৯/২০০১

পরদিন—অর্থাৎ, মঙ্গলবার—বাজার থেকে ফেরার সময় মদনকে ফোন করে ফাইনাল সিগনাল দিল দেবপ্রিয়। তারপর বাড়িতে ঢুকে চিঠি দেখার ভান করে লেটার বক্স খুলে হাতড়াল। আর সেই ফাঁকে চিরকুটটা লেটার বক্সের মেঝেতে শুইয়ে রাখল। তারপর বাক্সের টিপতালাটা না-টিপে এমনিই ঝুলিয়ে রাখল আংটার গায়ে। যাতে মদনের কোনও অসুবিধা না হয়।

বেলা এগারোটা নাগাদ চন্দ্রাণী যখন স্নান করতে ঢুকল তখন দেবপ্রিয় তৈরি হয়ে অফিসে বেরোল।

এই কাজটা ওকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে করতে হয়েছে।

'শরীরটা ভালো নেই। গা ম্যাজম্যাজ করছে।' সকাল থেকে এইসব বলে সময় কাটিয়েছে দেবপ্রিয়। এমনকী অফিসে ফোন করে বলেও দিয়েছে 'আজ অফিসে যাব না।' তারপর দশটা নাগাদ হঠাৎ অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করেছে।

চন্দ্রাণী রোজই পৌনে এগারোটা-কি-এগারোটা নাগাদ স্নান করতে যায়। দেবপ্রিয় ঠিক করল, চন্দ্রাণী যখন বাথরুমে থাকবে তখনই ও ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোবে। অর্থাৎ, বেরোনোর ভান করবে।

'আমি বেরোলাম।' বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল দেবপ্রিয়।

বাথরুমে শাওয়ারের জল পড়ার শব্দ হচ্ছিল। চন্দ্রাণী 'ঠিক আছে' জাতীয় কিছু একটা বলল। দেবপ্রিয় ভালো করে বুঝতে পারল না।

'বিশ্বকর্মা ইলেকট্রিকে একবার মিস্তিরির জন্যে তাগাদা করে যাব—।' দেবপ্রিয় বলল।

'হু...আচ্ছা।' জলের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে কথাগুলো শোনা গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দেবপ্রিয়। নাইটল্যাচের নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল। তারপর দরজাটা বেশ শব্দ করে ঠেলে বন্ধ করে দিল। দরজা নিজে থেকেই লক হয়ে গেল।

দেবপ্রিয় কিন্তু ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোল না—ভেতরেই থেকে গেল।

সাবধানে পা ফেলে ও ফিরে গেল জামাকাপড়ের আলনার কাছে। চটপট অফিসের পোশাক খুলে ঘরোয়া পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর অফিসের পোশাক আর ব্রিফকেস আঁকড়ে ধরে চলে গেল গেস্টরুমে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল গেস্টরুমের খাটের নীচে। শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল দেওয়ালের গায়ে, অন্ধকার এলাকায়।

এবং রুদ্ধশ্বাসে বেলা বারোটা বাজার অপেক্ষা করতে লাগল।

এটা ছকের একটা নতুন ধাপ। দেবপ্রিয় ছকটা একটু-আধটু বদলেছে। তাতে ওর মনে হয়েছে, খুনের ব্যাপারটা আরও নিখুঁত হবে।

দেবপ্রিয় লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল আর দাঁতে নখ কাটছিল। ওর জামাকাপড়ের আলনাটা যেরকম লণ্ডভণ্ড থাকে তাতে পাজামা-পাঞ্জাবির ঘাটতিটা নিশ্চয়ই চন্দ্রাণীর চোখে পড়বে না। আর পড়লেও হয়তো ভাববে ওগুলো লন্ড্রিতে দেওয়া হয়েছে।

ওর এইসব উথালপাথাল ভাবনার মধ্যেই ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

দেবপ্রিয়র বুকটা ধড়াস করে উঠল। তারপর ওর হৃৎপিণ্ড যেন বাজি জেতার ঘোড়দৌড় শুরু করে দিল।

ছক অনুযায়ী দেবপ্রিয়র লেখা চিরকুট দেখিয়ে স্টেন মদন ফ্ল্যাটে ঢুকল। চন্দ্রাণীকে 'বউদি, বউদি' করে একগাল হেসে টিভির কাছে গেল। হাতের ব্রিফকেস খুলে যন্ত্রপাতি বের করতে লাগল।

টিভির পিছনের ঢাকনাটা খুলে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কিছুক্ষণ কীসব দেখল। চন্দ্রাণী টিভির পাশে দাঁড়িয়ে মদনের কাজ দেখছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল, 'সুইচ অন করতেই ফ্ল্যাশ-ট্যাশ হয়ে একেবারে সব ফিউজ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে এখন কত খরচ হবে...।'

‘আপনার কোনও চিন্তা নেই, বউদি...যতটা কমে হয় করে দেব।’ বিজ্ঞের মতন টিভির ভেতরটা দেখতে-দেখতে মদন বলল।

তারপর হঠাৎই ওর হাত থেকে স্ক্রু-ড্রাইভারটা পড়ে গেল মেঝেতে।

‘বউদি, ইস্ক্রু-ড্রাইভারটা একটু তুলে দিন না...।’

মদনের অনুরোধে চন্দ্রাণী ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর। হাত বাড়িয়ে স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলতে গেল।

স্টেন মদন চট করে টিভির একদিকে চলে এল। পকেট থেকে রিভলভার বের করে টিভির অন্যদিকে ঝুঁকে-পড়া চন্দ্রাণীর মাথায় নল একেবারে ঠেকিয়ে গুলি করল।

‘ফট’ করে একটা চাপা শব্দ হল।

টিভির পিছনের দেওয়ালটা বিচ্ছিরিরকম লাল হয়ে গেল। চন্দ্রাণীর জ্ঞান, অহংকার, আর আই.কিউ. ছত্রখান হয়ে দেওয়ালে লেপটে গেল। ও ‘টুঁ’ শব্দটি করার সময় পেল না।

টিভির আড়াল থাকায় মদনের গায়ে রক্ত ছিটকে এসে লাগেনি। কোনও ক্ষতি ছিল না, কারণ, ওর ব্রিফকেটে একই রঙের আর এক সেট জামা-প্যান্ট ছিল। মদন পেশাদারি খুনি। ও-ও নিজের মতো করে ছক কষতে জানে।

রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে মদন অবাক হয়ে গেল।

একটা ভারি খিল হাতে দেবপ্রিয় কখন যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মদন অবাক হয়ে কিছু এটা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দেবপ্রিয় খিলটা সপাটে মদনের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে।

মদন টাল খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

দেবপ্রিয় পাগলের মতো মদনের মাথা লক্ষ করে খিল চালাতে লাগল। একবার... দুবার...তিনবার...চারবার...।

দেবপ্রিয় যখন থামল তখন মদনের মাথাটা থেঁতলে যাওয়া কালোজামের মতো দেখাচ্ছিল।

খিলটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে চটপট কাজ শুরু করে দিল দেবপ্রিয়।

সাবধানে মদনের পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে নিল। ফোনের পিছনটা খুলে ‘সিম’ কার্ডটা টেনে খুলল। তারপর সেটা টক করে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। ফোনটা ঠিকঠাক করে লাগিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল মদনের পকেটে।

মুখ নাড়তে-নাড়তেই টিভির পাশে রাখা একটা ছোট টি-টেবিলের দিকে গেল দেবপ্রিয়। টেবিলে ওর লেখা চিরকুটটা রাখা ছিল।

সেটা তুলে নিয়ে একবার দেখল। শেষের দুটো লাইন মিহি গলায় ব্যঙ্গ করে পড়ল: ‘...বাড়ি ফিরে কথা হবে। লাভ ইউ।’ তারপর চিরকুটটাও মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল।

যাক, ছকের নটা ধাপ শেষ! হাঁফ ছাড়ল দেবপ্রিয়। এরপর ললনার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলা আর চন্দ্রাণীর সবরকম সম্পত্তি ওর মা-বাবাকে নিঃশর্ত গিফট করে দেওয়া। এই দুটো ধাপ তেমন কঠিন নয়।

খুনের ছকের কয়েকটা ঘুঁটি দেবপ্রিয় ইচ্ছে করেই একটু নতুনভাবে সাজিয়েছিল। স্টেন মদনের বেঁচে থাকাটা ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। এত কাণ্ড করার পর মদনকে বাঁচিয়ে রাখাটা নিতান্ত বোকামি। তাই...।

চিবোনো কাগজের মণ্ডটা এইবার জোর করে গিলে ফেলল দেবপ্রিয়।

তারপর গলার স্বর দু-রকম করে এক কাল্পনিক পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে লাগল। আর একইসঙ্গে মদনের জামাকাপড় হাতড়ে চন্দ্রাণীর রঙিন ফটোটা খুঁজতে লাগল। খুঁজতে লাগল মদনকে চিনে ফেলা যায় বা মদনের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ধরে ফেলা যায় এমন কোনও কাগজপত্র আছে কি না।

'মার্ডারার যখন আপনার ওয়াইফকে গুলি করে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানার এককোণে শুয়ে ছিলাম। গুলির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি একটা লোক চন্দ্রাকে গুলি করে পালাচ্ছে। তখন আমার জ্ঞান ছিল না। শোবার ঘরের দরজার পাশ থেকে খিলটা তুলে নিয়ে...।' ব্যঙ্গ করে কাঁদতে লাগল দেবপ্রিয়। চন্দ্রাণীর ফটোটা খুঁজে পেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কালচার্ড ওয়াইফ, এবার তোমাকে চিবিয়ে খাব।'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে ফটোটা মুখে পুরে দিয়ে হিংস্রভাবে চিবোতে লাগল দেবপ্রিয়। চিবোতে-চিবোতেই কাঁদতে লাগল আর কাল্পনিক ইন্সপেক্টরকে বলতে লাগল, 'জানেন, আমার জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল...সত্যিকারের আত্মীয় বলতে আর কেউ রইল না...কেউ রইল না...।'

দেবপ্রিয় ফ্ল্যাটটা যেটুকু গোছগাছ করার করে নিল। তারপর দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। চন্দ্রাণী খুন হওয়ার পর প্রায় আট মিনিট পার হয়ে গেছে। এইবার চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা যেতে পারে।

মুখে রাখা ফটোর পিণ্ডটা গিলে সর্বহারা স্বামীর মতো হইচই শুরু করে দিল দেবপ্রিয়। 'খুন! খুন!' বলে ফ্ল্যাটবাড়ি একেবারে মাথায় তুলল।

ফলে, আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, সব এসে হাজির হল।

দেবপ্রিয় বাইরে কাঁদছিল, তবে ভেতরে-ভেতরে মজা দেখছিল। নিখুঁত খুন করতে পারার অহংকার ওর ভেতরে ফুলে-ফুলে উঠেছিল।

দেবপ্রিয় জানত না, ওর খুনের ছকে সব ঘুঁটি ঠিকমতো সাজানো হয়নি। তাই ওর খুনটাও নিখুঁত হয়নি।

কারণ, ওর হাতে লেখা চিরকুটটা পাড়ারই একটা দোকান থেকে স্টেন মদন জেরক্স করে নিয়েছিল। ভেবেছিল, খুনের কাজ সেরে ফেরার পথে ওটা নিয়ে যাবে। মদন পেশাদার খুনি। সেইজন্যই একটা 'অস্ত্র' ও হাতে রাখতে চেয়েছিল। দরকার হলে যাতে দেবপ্রিয়র বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহার করা যায়।

জেরক্সটা মদন আর হাতে পায়নি। কারণ, দেবপ্রিয়র লেটার বক্সের অন্ধকার এককোণে চিরকুটের জেরক্স কপিটা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একতিলের জন্য

—বেঁচে গেল অমৃতা।

প্রথমটা ও ঠিক বুঝতে পারেনি। ডানদিক দেখে, বাঁদিক দেখে, তারপর আবার বাঁদিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য একটা পা সামনে বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি—কোথা থেকে একটা মানুষ-বোঝাই মিনিবাস ছুটে এসে হুস করে বেরিয়ে গেল ওর নাকের ডগা দিয়ে। মিনিবাসের গা ঘেঁষে ছুটে যাওয়া বাতাসের ঝাপটা ওর সোনার নাকছাবিটা ছুঁয়ে গেল। মৃত্যুভয়ে অমৃতার শরীরটা পলকে পাথর হয়ে গেল।

মিনিবাসটা ডানদিক থেকে আচমকা ছুটে এসেছিল। ট্র্যাফিক লাইট সবুজ হয়ে থাকায় ওটা আর দাঁড়ায়নি—মরণপণ ছুট লাগিয়েছে বড়রাস্তা ধরে।

সন্ধের মুখে অফিসপাড়ায় ভিড় কিছু কম ছিল না। তাই অমৃতার একতিলের জন্য বেঁচে যাওয়াটা অনেকেরই নজরে পড়েছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেশ কিছু মানুষ ছুটে এল ওর কাছে। শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি, গুঞ্জন, জ্ঞানবর্ষণ এবং কলকাতার জঘন্য যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা নিয়ে বিচিত্র সব মন্তব্যের ফুলঝুরি।

চারপাশের প্রায় কোনও কথাই অমৃতার কানে ঢুকছিল না। পাথর হয়ে ও শুধু ভাবছিল, কেমন করে বেঁচে গেলাম? মরে গেলে বেশ হত...পিছনে কাঁদার কেউ ছিল না। একা-একা অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। বসন্ত কবে থেকেই যাই-যাই করছে—তাকে সরিয়ে দিয়ে হেমন্ত উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

নাঃ, শুধু গানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা যায় না। অমৃতা এখন একজন পুরুষকে আঁকড়ে ধরতে চায়—অন্তত একটিবারের মতো।

ওর গানের প্রশংসা অনেকে করে। পুরুষরাই বেশি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গান ডিঙিয়ে ওরা আর এগোতে চায় না। অমৃতার চেহারা ওদের থামিয়ে দেয়। ওরা সৌজন্যের হাসি হেসে চলে যায়। ওদের আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ব্যবহার অমৃতাকে মনে পড়িয়ে দেয় ওকে দেখতে মোটেই ভালো নয়। ওর মুখটা অচল পয়সার মতো।

আচ্ছা, রূপই কি সব! মনটা কিছু নয়!

তিলতিল সাধনা করে গান শিখেছে অমৃতা। গানকে সুন্দর করে তুলেছে। তেমনি মনটাকেও সুন্দর করে তুলেছে। অথচ সেটার খবর কেউ জানতে চাইল না!

গান গেয়ে এখন যৎসামান্য নাম-ডাক হয়েছে ওর। সকলেই এগিয়ে আসে ওই গান পর্যন্ত—বাইরের কুরূপের আড়াল সরিয়ে মনের অন্দরে কেউ উঁকি দিতে চায় না।

'আপনি খুব লাকি।'

ভরাট পুরুষালি কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল অমৃতা। মুখ ঘুরিয়েই দেখতে পেল সুন্দর চেহারার এক তরুণকে। কাটা-কাটা নাক, ঠোঁট, চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। ফরসা রং, একমাথা চুল, গায়ে ঢোলা জিনস-এর শার্ট, পায়ে বাদামি কটন প্যান্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফকেস।

আর গায়ে কেমন এক হালকা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ।

এক নিশ্বাসে যুবকটিকে জরিপ করে নিল অমৃতা।

গানের ক্যাসেটে অমৃতার কোনও ছবি ছাপা হয় না। তাই ওর যারা ফ্যান তারা বেশিরভাগই ওকে চেনে না। বছরে দু-চারটে ফাংশান করে অমৃতা। তার দৌলতে কিছু লোক ওকে চেনে। এই পুরুষটি...।

'আপনি যেভাবে বেঁচে গেলেন সেটাকে মিরাকল বলে।' চওড়া হাসল ছেলেটি: 'এখন কোথাও বসে একটু রেস্ট না-নিয়ে কিছুতেই যেন বাড়ির দিকে রওনা হবেন না! এরকম বিপদ থেকে বাঁচলে পর মনটাকে সেটল করার টাইম দিতে হয়।'

অমৃতা ফুটপাথের ওপর সরে এসেছিল। চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল, সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত—অমৃতার দিকে নজর দেওয়ার সময় কারও নেই। তবুও অমৃতা একটু অস্বস্তি পাচ্ছিল।

'আপনি গান করেন?'

একটা ধাক্কা খেল অমৃতা। আবার সেই গানের প্রশংসা, ন্যাকা-ন্যাকা অভিনন্দন, তারপর পিঠ বাঁচিয়ে পিঠটান! এর চেয়ে মিনিবাসের ধাক্কা অনেক ভালো ছিল।

'কী করে বুঝলেন? ভীষণ রুক্ষভাবে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল অমৃতা। তারপর আরও বিরক্ত হয়ে: 'আপনি কি জ্যোতিষী না কি?'

উত্তরে মিষ্টি করে হাসল: 'না, জ্যোতিষী নয়...পরপর তিনদিন ওই রেকর্ডিং স্টুডিয়োটা থেকে আপনাকে বেরোতে দেখলাম...তাই। আমি গান ভালোবাসি, তবে ভালো বুঝতে পারি না বলে সবসময় কাঁচুমাচু হয়ে থাকি। যেমন এখন।'

অমৃতার হাসি পেয়ে গেল। ছেলেটিও হাসছে। ওর মুখটা মোটেই কাঁচুমাচু মনে হচ্ছে না। তবে সন্দেহ একটা তৈরি হচ্ছিল অমৃতার মনে। মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে যারা আলাপ করতে চায় এই ছেলেটি কি সেই দলের? বোধহয় না। কারণ আজ পর্যন্ত অমৃতার সঙ্গে গায়ে পড়ে কেউ আলাপ করতে চায়নি। কোনও গীতিকার, সুরকার, কিংবা ক্যাসেট কোম্পানির মালিক কখনও ওকে উলটোপালটা প্রস্তাব দেয়নি। কেউ ডিনারে নিয়ে যেতে চায়নি। কেউ সন্ধের পর ওর এক-কামরার ফ্ল্যাটে আসতে চায়নি। পুরুষের হ্যাংলাপনা থেকে ও বরাবরই নিরাপদে থেকেছে—পঞ্চাশ কি ষাট পেরোনো কোনও মহিলা যেমন নিরাপদ।

'আপনি কি রোজ এই স্টুডিয়োর ওপরে নজর রাখেন না কি?'

'না। আসলে সেলসম্যানের চাকরি করি। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই আমার পেশা। তারই মাঝে ফাঁক পেলে মানুষ দেখি...ওটা আমার নেশা। এই যে, আমার কার্ড...।' কথা শেষ হতে-না-হতেই জামার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে নিয়ে অমৃতার হাতে তুলে দিয়েছে ছেলেটি।

রাস্তার সোডিয়াম-আলোয় কার্ডটা পড়তে পারল অমৃতা।

সুকান্ত চক্রবর্তী। বি.এ.এল.এল.বি। সেলস এক্সিকিউটিভ।

তার নীচে একটা সাহেবি ধরনের কোম্পানির নাম লেখা।

'আপনার পারসোনালিটি আমাকে খুব স্ট্রাইক করেছে। মিনিবাসের ওরকম ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে যাওয়ার পর আপনাকে যেরকম স্টেডি দেখলাম...রিয়েলি...খুব রেয়ার কোয়ালিটি। যাদের মনের জোর খুব বেশি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভালো লাগে—।'

'কেন?'

'আমার মনের জোর কম—তাই।'

অমৃতা ছোট্ট করে হাসল। মনে-মনে ভাবল, দেখাই যাক না, আলাপটা কতদূর গড়ায়। সুকান্তকে দেখে মনে হচ্ছে না ও সুযোগ-খোঁজা পুরুষের দলে। সেরকম হলে ও অনায়াসে কোনও সুন্দরী মেয়েকে বেছে নিত। সুন্দরী না-হোক, অন্তত অমৃতার মতো বত্রিশ-তেত্রিশের কোনও অসুন্দরী মেয়েকে বেছে নিত না।

আচ্ছা, প্রেম কি এভাবেই শুরু হয়?

ধুৎ, কীসব যা-খুশি ভাবছে অমৃতা। মনে হয়, সুকান্ত...।

'আমরা কি এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলব?' সুকান্ত জিগ্যেস করল, 'যদি আপনার অমত না থাকে আমরা কোনও একটা দোকান-টোকানে বসতে পারি। অবশ্য আপনার তাড়া থাকলে অন্য কথা।'

তাড়া? আগামী একশো বছরে অমৃতার কোনও তাড়া নেই।

সুতরাং কথা বলতে-বলতে একটা ছোটখাটো রেস্তরাঁয় পৌঁছে গেল ওরা।

ধোঁয়া ওঠা ফিশফ্রাই সামনে রেখে মুখোমুখি বসে চলল কথার-পর-কথা।

'জানেন, একসময় আমার গায়ক হওয়ার শখ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না।'

'কেন? আপনার গলার স্বর তো বেশ...।'

'দোয়াত আছে, কালি নেই। স্বর আছে, সুর নেই।' হাসল সুকান্ত। তারপর আলতো করে বলল, 'আপনার দুটোই আছে। ভগবান আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।'

মাথা নামাল অমৃতা: 'দিয়েছে—আবার অনেক কিছু দেয়নি।' কথাটা বলতে গিয়ে অমৃতার গলা কেঁপে গেল।

সুকান্ত বুঝল। বলল, 'মনখারাপ করবেন না। ভগবান লোকটা কৃপণ নয়। আপনাকে যা দিয়েছে তা-ই যথেষ্ট। ভাবুন তো, যদি এই জীবনটাই আপনাকে না দিত! তখন তো অনেক কিছুই আপনি হারাতেন। এই যে এখন এই রেস্তরাঁয় বসে আপনার সঙ্গে গল্প করছি, সেটাও হত না। তার মানে আমিও অনেক কিছু হারাতাম।'

অমৃতা সুকান্তর মুখের দিকে তাকাল। সুকান্তর কথাগুলো ওর ভালো লেগেছে বলেই তার মধ্যে তোয়াজ আছে কি না খুঁজল।

না, সেরকম কোনও ইশারা পেল না।

'আপনাকে একটা মনের কথা বলি, ম্যাডাম। এই দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটাই ভারি মিস্টিরিয়াস। এক ধরনের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নেয়...।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল অমৃতা। হ্যাঁ, এইরকম মানুষ ও দেখেছে।

ফিশফ্রাই-এর টুকরো চিবোতে-চিবোতে সুকান্ত বলল, '...ম-ম-ম...আর-এক টাইপের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নিতে চায় না।'

'আপনি কোন টাইপের?' অমৃতা মজা করে জিগ্যেস করল।

'সেটা বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন? বরং খানিকটা বন্ধুত্ব হোক, তা হলে টের পাবেন।'

তারপর অমৃতার গানের কথা জানতে চাইল সুকান্ত। অমৃতা বলতে লাগল, সুকান্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনতে লাগল। সময় কাটতে লাগল একটু-একটু করে।

অনেক গল্পের পর ওরা উঠল।

সুকান্ত একরকম জোর করেই রেস্তরাঁর বিল মিটিয়ে দিল।

তারপর রাস্তায় পা দিয়ে বলল, 'আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন তো?'

'হ্যাঁ—।'

'আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'কেউ না। আমি একা।' একটা বড় শ্বাস ফেলল অমৃতা: 'শুধু-আমি, আর গান। মা-বাবা আর ছোট ভাই দেশের বাড়িতে থাকে। আমার এই গানের ব্যাপারটা ওরা খুব একটা পছন্দ করে না। আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে।'

'সেটা আপনাকে দেখে বোঝা যায়।'

'আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'সবাই। তবে মনে-মনে আমি সবসময় একা-একা থাকি।'

'কেন?'

'দুঃখ পাওয়া আমার ছোটবেলাকার অভ্যেস। তাই সুখের হদিস পেলে খুব ভয় পাই। এই বুঝি সুখের খেলনাটা কেউ কেড়ে নিল। তাই মনে-মনে একা থাকাটাই ভালো।'

'আমার ব্যাপারটাও অনেকটা তাই।' মনখারাপ গলায় বলল অমৃতা।

'মোটেই না। আপনার গান আছে। এখন বাড়ি গিয়ে আপনি গানের রেওয়াজ করতে বসবেন। আর আমি? হুঁঃ...চারপাশে আড়াল তুলে আকাশপাতাল ভাবব। তবে আজ হয়তো আপনার কথা ভাবব। কালও, পরশুও...। সেইজন্যেই আমার বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।'

অমৃতা সুকান্তকে দেখল। রাস্তার ঠিকরে পড়া আলোয় ওর মুখে হাইলাইট তৈরি হয়েছে। সেখানে নুন-গোলমরিচের মতো দুঃখ ছিটিয়ে দিয়েছে কেউ।

জিগ্যেস করে জানল সুকান্তর বাড়ি টালিগঞ্জে। তাও ওর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই! সেকি অমৃতার জন্য?

অসম্ভব। মনে-মনে নিজেকে এক বকুনি লাগাল অমৃতা। একটু আলাপ হতে-না-হতেই বুকের ভেতরে সারস পাখি ডানা মেলে দিয়েছে!

'আপনার বাড়ি কোথায়?' সুকান্ত জানতে চাইল।

'কলেজ স্ট্রিটের কাছে...সূর্য সেন স্ট্রিটে...।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল। আপনার বাড়ি গেলে আপনাকে ব্রিফকেসটা খুলে দেখাতে পারতাম। রাস্তায় তো আর দেখানো যায় না!'

'কী আছে আপনার ওই ব্রিফকেসে?' হেসে জিগ্যেস করল অমৃতা।

'আমার সবকিছু! আমার জীবনদর্শন। মানে...ঠিক বোঝাতে পারছি না। থাকগে, পরে কখনও দেখানো যাবে।'

ব্রিফকেসটা কি অজুহাত? এই ছুতোয় অমৃতার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওর সঙ্গ চাইছে সুকান্ত? না, না, প্রথম আলাপেই এতটা দুঃসাহসী কেউ হবে না। তা ছাড়া, ও যদি আজ চলে যায়, আবার কবে ওর সঙ্গে অমৃতার দেখা হবে...।

'চলুন, আপনাকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত এগিয়ে দিই।' নিচু গলায় সুকান্ত বলল।

ওর কি অভিমান হল? নিশ্চয়ই ও অমৃতাকে ভিতু ভাবছে।

'আপনার ব্রিফকেসে কী আছে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।' কিশোরী গলায় আবদার করল অমৃতা।

'খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?'

'ইয়েস, খুব।'

'ও.কে.। তা হলে দুটো অপশন দিচ্ছি। এ—আপনার বাড়ি যাব না। বি—আপনার বাড়ি যাব। বলুন, আপনার চয়েস কোনটা?'

'বি।'

'শিয়োর?'

'হ্যাঁ—।'

'কনফিডেন্ট?'

'ইয়েস।'

'ফাইনাল জবাব? কম্পিউটার লক কর দিয়া যায়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ও.কে. ডান।' বলে হেসে অমৃতার দিকে ডানহাত বাড়াল সুকান্ত।

অমৃতাও হাত বাড়াল।

ওরা হ্যান্ডশেক করল।

ঠিক তখনই অচেনা এক উত্তেজনার তরঙ্গ অসংখ্য ডালপালা মেলে ছাড়িয়ে গেল অমৃতার শরীরে। অমৃতার ভালো লাগল। এরকম নতুন ভালো-লাগা আগে কখনও ও টের পায়নি।

হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল সুকান্ত। তারপর দুজনে উঠে পড়ল তাতে। অমৃতা লক্ষ করল, সুকান্ত ভদ্রমাপের দূরত্ব রেখেই পাশে বসল।

মিনিটকুড়ির মধ্যেই অমৃতার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। অমৃতা কিছু বলে ওঠার আগেই সুকান্ত ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর ঢুকে পড়ল সদর দরজা পেরিয়ে।

বাড়িটা বেশ পুরোনো। দু-পাশের দুটো বাড়ির সঙ্গে দেওয়ালে দেওয়াল ঠেকিয়ে তৈরি। দু-পাশের বাড়ি দুটো রং-চং করে ভোল ফেরানো হয়েছে। তাদের তুলনায় মাঝেরটা বয়েসের ভারে এতই নুয়ে পড়েছে যে, পাশের বাড়ি দুটো যেন দু-পাশ থেকে বাড়িটাকে সযত্নে সামলে রেখেছে। গান্ধীজির কথা মনে পড়ে গেল সুকান্তর—দুই সঙ্গিনীর কাঁধে ভর দিয়ে তাঁর পথ চলা।

অমৃতার ফ্ল্যাট তিনতলায়। ফ্ল্যাট না-বলে আস্তানা বলাই ভালো। তবে ও নিজের মতো করে একটু-আধটু সাজিয়ে নিয়েছে।

ঘরে ঢুকে টিউবলাইট জ্বেলে দিল অমৃতা। ছোট্ট করে হেসে সুকান্তকে আহ্বান জানাল, 'আসুন—।'

সুকান্ত চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিল।

অমৃতা একটু অবাক হল। সেইসঙ্গে একটু বিরক্তও। কিন্তু ধৈর্য না হারিয়ে ও শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

সুকান্ত একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে। এসময়ে কেউ এসে পড়লে আমার ভীষণ নার্ভাস লাগবে।'

'কেন, নার্ভাস লাগার কী আছে! দরজাটা খুলে বরং পরদাটা টেনে দিন। বুঝতেই তো পারছেন...মিডল ক্লাস পাড়া...এখানে পান থেকে চুন খসলেই লোকের জিভ লকলক করে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল সুকান্ত। মিনমিন করে বলল, 'ঠিক আছে, খুলে দিচ্ছি। তার আগে আপনি টিভিটা চালিয়ে দিন।'

এই অনুরোধটা অমৃতাকে অবাক করে দিল। কিন্তু ও কিছু বলল না। ঘরের এককোণে চোদ্দো ইঞ্চি একটা কালার টিভি দাঁড় করানো ছিল। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা অন করে দিল। তারপর ঘরের দুটো বন্ধ জানলা খোলার জন্য পা বাড়াতেই সুকান্তর গলা ওকে থামিয়ে দিল।

'ওসব পরে হবে, ম্যাডাম—আগে আমার ব্রিফকেসটা দেখে নিন।'

অমৃতা অবাক হয়ে ফিরে তাকাল সুকান্তর দিকে। ওর আচরণে কোথায় যেন একটু সুর কেটে গেছে।

কী চায় সুকান্ত? সব পুরুষ যা চায় তাই? কিন্তু অমৃতার কাছে তো কেউ কখনও তা চায়নি! চাইলে কী হত কে জানে! হয়তো অমৃতা খুশি হয়ে সবকিছু উজাড় করে দিত। হয়তো দিত না। কিন্তু সুকান্তকে পছন্দ হয়েছে বলেই না ওকে ঘর পর্যন্ত নেমন্তন্ন করেছে।

অমৃতার হঠাৎই খেয়াল হল, সুকান্ত এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তাই বলল, 'বসুন—।'

সুকান্ত ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা সোফায় বলল।

সামনেই খাটো টি-টেবল। তার ওপরে ব্রিফকেসেটা রেখে শব্দ করে লক খুলল। তারপর ধীরে-ধীরে ঢাকনা তুলল।

অমৃতার চোখের নজর ঢাকনার দেওয়ালে আটকে গেল। ব্রিফকেসর ভেতরটা ও দেখতে পাচ্ছিল না। তবে ঢাকনার ওপর দিয়ে সুকান্তর মুখটা দেখা যাচ্ছিল।

'একটু চা করি আপনার জন্যে?'

ব্রিফকেসের ভেতরটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সুকান্ত। অমৃতার প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'না, এখন চায়ের তেষ্টা নেই। আগে এগুলো আপনাকে দেখাই...।'

অমৃতা সুকান্তর কাছে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই ফোন বেজে উঠল। তাই থমকে দাঁড়িয়ে ও টিভির পাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ফোনে কথা বলতে-বলতেই অমৃতা দেখল সুকান্ত কয়েকটা কাগজ ব্রিফকেস থেকে বের করে টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখল। তারপর অমৃতার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ফোনে কথা বলা শেষ হতেই কাগজগুলো তুলে নিল সুকান্ত। চট করে উঠে দাঁড়াল। অমৃতার দিকে দু-পা এগিয়ে কাগজগুলো বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, বলল, 'এগুলো একটু পড়ে নিন...তা হলে সুবিধে হবে।'

অমৃতা অবাক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে কাগজগুলো নিল।

অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং। সাদা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো। ওপরে এককোণে তারিখ লেখা। আট-দশটা কাগজ সুকান্ত ওকে পড়তে দিয়েছে।

অমৃতা কাগজগুলো পড়ছিল। সেই ফাঁকে সুকান্ত টিভির কাছে গিয়ে ভলিয়ুমটা বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাটিংগুলো পড়তে পড়তে অমৃতার দম আটকে এল। কাগজ-ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

একজন খুন-পাগল মানুষের কথা লিখেছে খবরে। পরিভাষায় যাকে বলে সিরিয়াল কিলার। খবরের কাগজওয়ালারা তার নাম নিয়েছে 'নাইফম্যান'। অজানা-অচেনা এই খুনি গত ছ-মাসে পাঁচটি মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। প্রতিটি মেয়ের শরীরে অসংখ্য ছুরির আঘাত ছিল। বিশেষ করে তাদের মুখগুলো এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, ঠিকমতো শনাক্ত করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।। পাঁচটি ক্ষেত্রেই ক্ষতবিক্ষত নগ্ন মৃতদেহ পায় পুলিশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও খুনের মোটিভ বুঝতে পারেনি—খুনিকে ধরা তো দূরের কথা! এই পাঁচজন ভিকটিমের মধ্যে এমন কোনও মিল পুলিশ খুঁজে পায়নি যা থেকে বলা যায় একটি বিশেষ ধরনের মেয়েই খুনির শিকার হতে পারে। কোনও ক্ষেত্রে খুন হয়েছে নির্জন রাস্তায়। কখনও-বা খোলা মাঠে কিংবা পার্কে। আবার কখনও মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে তার ফ্ল্যাটে। অর্থাৎ, মোডাস অপারেন্ডাই-এরও কোনও সুনিশ্চিত ধারা খুঁজে বের করা যায়নি। শুধু এটুকু পুলিশ বুঝতে পেরেছে, খুনির পছন্দ ছুরি। তাও একরকম নয়—নানা ধরনের। তিনটে খুনের বেলায় দেখা গেছে, খুনি প্রতিটি ক্ষেত্রে কম করেও চাররকমের ছুরি বা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সেই কারণেই কোনও-কোনও সাংবাদিক ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছে: খুনির বোধহয় ছুরি-কাঁচির দোকান আছে।

অমৃতা কাগজে 'নাইফম্যান'-এর কথা পড়েছিল। গত পনেরো-বিশদিনে স্মৃতি যেটুকু-বা ঝাপসা হয়ে এসেছিল, খবরের কাগজের কাটিংগুলো পড়তে শুরু করামাত্র সব মনে পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেছে অমৃতার শরীরে। ওর হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। কেন যে ও অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না, সেইকথা ভেবে ও অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

এইবার সবকিছুর মানে ধীরে-ধীরে ওর কাছে স্পষ্ট হল।

কেন সুকান্ত গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছে। কেন ওর সঙ্গে বাড়ি আসতে চেয়েছে। কেন জানলা খুলতে বারণ করেছে। কেন টিভির ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিয়েছে।

অমৃতা এখন না-দেখেও বুঝতে পারছে সুকান্তর ব্রিফকেসের মধ্যে কী আছে।

অমৃতার হাত থেকে কাগজগুলো খসে পড়ে গেল।

যেন তেমন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সুকান্ত সেগুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর চাপা গলায় খুকখুক করে হাসতে-হাসতে ঢাকনা খোলা ব্রিফকেসের কাছে গেল। কাগজগুলো ব্রিফকেসের পাশে রেখে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস বের করে নিল।

রবারের গ্লাভস টেনে পরতে-পরতে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'এখন আপনার আর কোনও উপায় নেই...অপেক্ষা করা ছাড়া...।'

'কীসের অপেক্ষা?' চাপা খসখসে গলায় জিগ্যেস করল।

'নিয়তির...' গ্লাভস পরা শেষ করে সুকান্ত বলল। ওর হাত দুটো এখন কী শক্তিশালী আর পুরুষালি মনে হচ্ছে।

অমৃতা চিৎকার করার জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চিৎকারটা ওর গলা দিয়ে বেরোল না। কারণ, ঠিক তক্ষুনি সুকান্ত হাতের একটানে ব্রিফকেসটা অমৃতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর অমৃতা দেখতে পেয়েছে সুকান্তর সবকিছু, সুকান্তর জীবনদর্শন।

ব্রিফকেসের ভেতরটা ঝকঝক করছে।

নানা ধরনের নানা মাপের পাঁচটা ছুরি সেখানে শুয়ে আছে। কারও ফলা সোজা, কারও ফলা বাঁকানো, আবার কারও-বা করাতের মতো খাঁজ কাটা।

সুকান্ত একটা বড় মাপের ছুরি হাতে তুলে নিল। সেটা ডাক্তারি নজরে খুঁটিয়ে পরখ করতে-করতে বলল, 'চিৎকার করতে চাইছেন? চাইতেই পারেন। তবে ওই যে, কে যেন বলে গেছেন, চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। এখানে সেই ফাঁকটা তৈরি করবে এই ছুরিটা—আপনার গলায়...গানের গলায়। আর যদি একটুকরো চিৎকার ভুল করে গলা দিয়ে বেরিয়ে যায় তা হলেও অসুবিধে নেই। ওই টিভির শব্দ সেটাকে চাপা দেবে...।'

সুকান্ত একচিলতে হাসল, তবে হাসিটা ঠোঁটেই থেকে গেল—চোখ পর্যন্ত ছড়াল না।

'আ-আমি বাঁচতে চাই...।' কাঁপা গলায় বলল অমৃতা।

'আবার সেই চাওয়া!' গ্লাভস-পরা হাতে ছুরিটা ধরে অমৃতার কাছে এগিয়ে এল সুকান্ত। চাপা গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'কাগজগুলো পড়ে তো দেখলেন, আমি কেন খুন করি কেউ জানে না। আপনাকে বলতে পারি...আপনি জানলে কোনও অসুবিধে নেই, কারণ, আপনার জানাটা আর কেউ জানতে পারবে না। আপনার চুলটা খুলে ফেলুন।'

শেষ কথাটা একই ঢঙে, বলে ফেলায় অমৃতা ঠিক বুঝতে পারেনি।

সুকান্ত আবার বলল, ‘মাথার চুলটা খুলে ছড়িয়ে দিন—।’

ঠান্ডা গলায় কথাটা বলে বাঁ-হাতে আলতো করে অমৃতার চুলে হাত দিল সুকান্ত।

অমৃতা শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি মাথার পিছনে হাত দিয়ে শৌখিন ক্লিপটা খুলে ফেলে দিল মেঝেতে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপরে।

সুকান্ত খুব খুঁটিয়ে অমৃতাকে দেখতে লাগল। ওর চুল পরখ করতে করতে চলে এল অমৃতার পিছনে। মাথা ঝুঁকিয়ে ফুঁ দিল চুলে। কয়েকটা চুল উড়ল কি উড়ল না।

অপছন্দের ঢঙে মাথা নাড়ল সুকান্ত: ‘উঁহু, আপনার চুল তেমন লম্বা নয়। রেশমের মতো ফিনফিনেও নয়...।’

বিড়বিড় করে কথা বলতে-বলতে অমৃতার চুলে হাত দিল। আলতো করে ওর চুলের গোছা ধরে মুখ নামিয়ে ঘ্রাণ নিল। আবার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

অমৃতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রাণপণে ঠোঁট চেপে রাখা সত্ত্বেও একটা মিহি গোঙানির টুকরো কীভাবে যেন বাইরে বেরিয়ে আসছিল। বড়-বড় শূন্য চোখে টিভির দিকে ও তাকিয়ে ছিল—কিন্তু ওর চোখ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। আর কানেও কোনও শব্দ ঢুকছিল না—সুকান্তর ঘন নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া।

অমৃতার চুলের গোছা একপাশে সরিয়ে ওর ঘাড়ের হালকা পালকের মতো চুলে ফুঁ দিল সুকান্ত।

অমৃতা শিউরে উঠল।

চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে হুট করে ওর সামনে চলে এল সুকান্ত। সরল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, ‘আমি কেন খুন করি জানেন? পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার জন্যে। আর সুন্দর করে তুলতে হলে অসুন্দরকে বিসর্জন দিতে হয়। যেমন, ফুলের বাগানকে সুন্দর করে তোলার জন্যে আগাছা উপড়ে ফেলতে হয়...।’

সুকান্ত বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল আর হাতে-ধরা ছুরিটা অমৃতার গায়ে ছোঁয়াচ্ছিল।

‘মাসছয়েক ধরে আমি এই সুন্দর করার কাজে নেমেছি। তাই অসুন্দরকে খতম করাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য...।’ হাসল সুকান্ত। তারপর: ‘আপনি তো জানেন, অসুন্দর থেকে অসুন্দরের জন্ম হয়। তাই মেয়েদের দিয়ে কাজ শুরু করেছি। আপনি ছ-নম্বর। এবার শাড়িটা খুলে ফেলুন।’

আবারও বুঝতে পারেনি অমৃতা। কারণ, একটানা সুরে বেশ মোলায়েম গলায় কথাটা বলেছে সুকান্ত।

অমৃতা ইতস্তত করছে দেখে সুকান্ত ছোট্ট করে হাসল, বলল, ‘যে-কাজ নিজে পারেন সেটা আমাকে দিয়ে করাবেন না...করালে আপনার ভালো লাগবে না। শাড়িটা খুলে ফেলুন।’

এইমুহূর্তে কেউ কি এসে অমৃতার ঘরের কড়া নাড়বে না? এমন কিছু কি একটা হতে পারে না যাতে সুকান্ত অমৃতাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়? একটা লাইফলাইনও কি অমৃতার কপালে নেই?

শাড়ি খুলতে শুরু করল অমৃতা। ওর মনে লজ্জা যেটুকু-বা তৈরি হচ্ছিল তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল একরাশ ভয়। সুকান্তর হাতের ছুরিটা কখন ওর গায়ে বসবে? কখন?

সুকান্ত একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। অমৃতার শাড়ি খোলা দেখতে লাগল।

কোনও পুরুষের সামনে ও পোশাক ছাড়বে এমন গোপন ইচ্ছে অমৃতার ছিল। কিন্তু সেটা যে এইরকম একটা অবস্থায়, তা ও কল্পনা করেনি। ওর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল অনেক আগেই। এখন কয়েকটা ফোঁটা একজোট হয়ে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নেমে এল। তারপর ঠোঁটের কোণ ছুঁতেই নোনা স্বাদ টের পেল।

'কাগজওয়ালারা আমার নাম দিয়েছে "নাইফম্যান"।' হাসল সুকান্ত। আপনমনে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আসলে আমি কী জানেন? লাইফম্যান। কুৎসিত জীবন থেকে মুক্তি দিই সুন্দর জীবনে। কারণ, মৃত্যু না হলে তো পুনর্জন্মের কোনও চান্স নেই! আগে যে-পাঁচটা কুৎসিত মেয়েকে আমি মুক্তি দিয়েছি তার বিনিময়ে আমি কিন্তু কিছু নিইনি। আপনাকে তো আগেই বলেছি, কিছু দিলে তার বদলে কিছু-না-কিছু নেওয়া অনেকের অভ্যেস। আমি সেরকম শাইলক নই। আমি যা দিই এমনি দিই। ফ্রি।'

দুঃখ দিলে সেটাকে কি দেওয়া বলে? মৃত্যু দিলে সেটাও কি দেওয়া?

অমৃতার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ও যন্ত্রের মতো শাড়ি খোলা শেষ করে ফেলেছিল। শাড়িটা পায়ের কাছে জড়ো হয়ে পড়ছিল। সুকান্ত পা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল একপাশে।

'সত্যি কথা বলুন তো, ম্যাডাম, এইরকম একটা বিচ্ছিরি রূপ নিয়ে আপনার বাঁচতে ইচ্ছে করে?'

অমৃতা বোবা চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে চাইল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—বাঁচতে ইচ্ছে করে...।'

কিন্তু সুকান্ত যেন সেটা বুঝতেই পারল না। আপনমনেই বলে চলল, 'আমি জানি করে না। আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস, পরের জন্মে আপনি অবশ্যই সুন্দরী হয়ে জন্মাবেন। সেই জীবনটা আপনার এই হতচ্ছাড়া জীবনের চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগবে। কী এক্সাইটিং তাই না? এবার ব্লাউজটা খুলে ফেলুন।'

কেন জানি না, অমৃতা এই নির্দেশটাই আশা করছিল।

টিভির দিকে তাকাল ও। একটা ভয়ের সিরিয়াল আছে আগামীকাল রাত নটায়—তারই বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওর মনে হল আগামীকাল নয়, এখনই সিরিয়ালটা এই ঘরে শুরু হয়ে গেছে। আর টিভির ভেতরের মানুষগুলো অবাক হয়ে দম বন্ধ করে এই সিরিয়াল দেখছে।

অমৃতা আগে কখনও ভাবেনি ব্যাপারটা এরকম উলটে যেতে পারে।

একা-একটা আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে কতবার নিজেকে দেখছে। মুখ থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত এককণা সৌন্দর্য খুঁজেছে। না, নেই। কোথাও রূপের ছিটেফোঁটামাত্র নেই। আপাদমস্তক কুরূপা কোনও তরুণীকে অনায়াসে বৃদ্ধা বলা যেতে পারে। এরকম কোনও মেয়ের যৌবনের বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতার কতবার যে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে!

অথচ এখন! মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকার চেয়ে সুন্দর কিছু আর নেই।

তাই, বেঁচে থাকার জন্য, ব্লাউজটা খুলে ফেলল অমৃতা।

তারপর, সুকান্তর জরিপ-নজরের সামনে, খুলে ফেলতে হল ভেতরের জামাটাও।

কারণ, নির্দেশ সেরকমই আসছিল।

সুকান্ত এবার এগিয়ে এল অমৃতার খুব কাছে। যেমন করে বসন্তের টিকে দেয়, অনেকটা সেইরকম ঢঙে ছুরির ডগা দিয়ে আঁচড় কাটল অমৃতার দুই বুকের মাঝে।

ডুকরে কেঁদে উঠল অমৃতা। কেঁপেও উঠল। সরু রক্তের রেখা মাধ্যাকর্ষণের টানে গড়িয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। জ্বালা হয়তো করছিল, কিন্তু সেটা অনুভব করার মতো মনের অবস্থা অমৃতার ছিল না।

'না, আপনার চামড়া তেমন মোটা নয়।' ছুরির ডগাটা পরীক্ষা করতে-করতে অনেকটা ডাক্তারি সুরে মন্তব্য করল সুকান্ত, 'অনেকের চামড়া অস্বাভাবিক মোটা থাকে। জোরে চাপ দিয়ে ছুরি বসাতে হয়। সবসময় আমি আগে একটু টেস্ট করে নিই— টি ই এস টি টেস্ট, টি এ এস টি ই নয়। আমি দুশ্চরিত্র নই।'

কথা বলতে-বলতে ব্রিফকেসের কাছে গেল সুকান্ত, '...আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। এটা সৌন্দর্যের স্বাধীনতা-যুদ্ধ...' ব্রিফকেসের ওপরে ঝুঁকে পড়ল: '...পরের জন্মের কথা ভাবুন—ভালো লাগবে। উঁ উঁ...এইটা নিই... শুরুর কাজটা দারুণ হবে...' ব্রিফকেস থেকে বাঁকানো ফলার একটা ছুরি তুলে নিল: '... এবার সায়াটা ছেড়ে ফেলুন। আমার হাতে আর বেশি সময় নেই...।'

অমৃতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সুকান্ত। দু-হাতে দুটো ছুরি। চোখে বরফের দৃষ্টি।

তড়িঘড়ি শায়ার দড়ি খুলে ফেলল অমৃতা। আঙুলগুলো অসম্ভব কাঁপছিল বলে দড়ি খুলতে দেরি হয়ে গেল।

সায়াটা খসে পড়ল পায়ের কাছে।

অমৃতা সুন্দরী হলে বলা যেতে পারত গুটিপোকার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল প্রজাপতি। সুকান্তর মনে হল, প্রজাপতি নয়—শুঁয়োপোকা।

ও চটপটে পায়ে চলে এল অমৃতার কাছে। হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কাস্তে দিয়ে আগাছা কাটার মতো শায়াটার একটা অংশ চেপে ধরে বাঁকানো ছুরি দিয়ে একপোচে কেটে দিল। শায়ার বৃত্ত ছিন্ন হল। ওটা একটানে দূরে ফেলে দিল সুকান্ত। তারপর অ্যাটলাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল অমৃতার পায়ের কাছে।

অমৃতা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওর শরীরটা ফুলে উঠছিল বারবার। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে দাঁড়ালে মনের অবস্থাটা কীরকম হয় সেটা ও বেশ বুঝতে পারছিল। না, আর কোনও আশা নেই। অমৃতা খবরের কাগজের খবর হতে চলেছে আগামীকাল। নাইফম্যানের ছ-নম্বর শিকার। কোনও অলৌকিক ঘটনা ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।

সুকান্ত পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওড়াচ্ছিল। হঠাৎই বলল, 'আপনি ইচ্ছে হলে চোখ বুজে ফেলতে পারেন। তা হলে শকটা কম হবে...।'

অমৃতা চোখ বুজে ফেলল। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। ও শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ভালোবাসার কাঙাল হয়ে কী ভুলটাই না ও করেছে!

সুকান্ত মাথা সোজা করে তাকাল। অমৃতার দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছনের দেওয়ালটা ওর নজরে পড়ছে। ওর চোয়াল শক্ত হল। চোখে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল।

ঠিক তখনও তিলটা ওর চোখে পড়ল।

সুকান্ত পাথর হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল তিলটার দিকে।

অমৃতার ডান উরুর ওপরের দিকে একটু ভিতর ঘেঁষে একটা কালো তিল। মাপে মসুরডালের মতো। কাজলের মতো কুচকুচে কালো। অমৃতার ময়লা রঙের ওপরেও তিলটা জ্বলজ্বল করছে।

কী সুন্দর! অপূর্ব!

সুকান্তর হাত থেকে ছুরি খসে পড়ল। অতি সাবধানে আঙুল বাড়িয়ে তিলটাকে ছুঁয়ে দেখল ও।

আসল।

পোশাকের আড়ালে কেউ কখনও নকল বিউটিস্পট তৈরি করে না।

সুকান্তর শরীরে কাঁটা দিল। আসল সৌন্দর্যকে ছোঁয়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে।

এবারে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল ও।

আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল অমৃতার তিলে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ‘এ কী সুধারস আনে/আজি মম মন প্রাণে...।’

অমৃতা থরথর করে কাঁপছিল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের দেওয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডারের দিকে।

ক্যালেন্ডার আড়াল করে ওর দৃষ্টিপথে এসে হাজির হল সুকান্তর মুখ। অদ্ভুত এক হাসি ওর মুখে আলো জ্বলে দিয়েছে।

‘আপনার সৌন্দর্যের কোনও জবাব নেই, ম্যাডাম। প্রিয়ার তিলের জন্যে কবি সমরখন্দ-বোখারা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর আমি আপনার প্রাণ দিতে পারব না! আর আপনি তো জানেন, কিছু দিলে তার বদলে আমি কিছু নিই না। আমি শাইলক নই...।’

এরপর ছুরি-টুরি চটপট সব নিজের ব্রিফকেসে গুছিয়ে নিল সুকান্ত। হাসিমুখে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। শেষবারের মতো ফিরে তাকাল অমৃতার দিকে। বলল, ‘এবার ভেবে দেখুন, আমি নাইফম্যান, না লাইফম্যান...।’

তারপর বাইরে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা। ওর মধ্যে তা হলে সৌন্দর্য আছে!

না, এই নাইফম্যানের কথা ও কাউকে বলবে না, ওর গোপন সৌন্দর্য আবিষ্কারের কথা গোপনই থাক।

সত্যি, জীবন কি আশ্চর্য! একতিলের জন্য ও আবার বেঁচে গেল।

আরশিনগরের অসভ্য লোকটা

এক

বলব না বলব না করেও শেষ পর্যন্ত লোকটার কথা নন্দিনীকে বলে ফেললাম।

লোকটাকে আমি গত তিনদিন ধরে লক্ষ্য করছি। সবসময় চোরের মতো আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছে। প্রথম-প্রথম ভাবতাম, লোকটা বুঝি লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাকে দ্যাখে। কিন্তু এই তিনদিনেই বুঝেছি, তা, আমাকে না—লোকটা লুকিয়ে-লুকিয়ে নন্দিনীকেই দেখার চেষ্টা করে।

অবশ্য সবসময় যে দ্যাখে তা নয়। লুকিয়ে দেখার জন্যে ও ঠিক মোক্ষম মুহূর্তগুলোই বেছে নেয়। যেমন, নন্দিনী বাথরুম থেকে স্নান সেরে ঘরে এলেই লোকটা তৈরি হয়ে যায়। ওর চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। গলার শিরা ফুলে ওঠে। ফরসা মুখে রক্তের ফোয়ারা ছোটে। সব মিলিয়ে লালসা মাখানো কামুকনজরে ও চোখ বড়-বড় করে নন্দিনীকে দেখতে থাকে। কারণ ও জানে, এক্ষুনি নন্দিনী কাপড় ছাড়বে। তারপর...ওঃ, অসহ্য!

আর নন্দিনীকেও বলিহারি যাই! জানি, সুন্দর করে সাজানো অ্যাটাচড বাথওয়ালা এই মাঝারি ফ্ল্যাট একেবারে আমাদের নিজের। বাথরুম থেকে স্নান সেরে নন্দিনী খালি গায়ে বেরোলেই-বা কে দেখতে পাবে—আমি ছাড়া! তখন ওর ফরসা গায়ে, বুকে, চুলে জলের ফোঁটা আটকে থাকে। এমনকী নাকের ডগায়, চোখের পাতায়, অথবা ঠোঁটেও ছুঁয়ে থাকে জলবিন্দু। তখন আমার তো আর মাথার ঠিক থাকে না, তাই ওকে জাপটে ধরে ঠোঁট দিয়ে সারা শরীরের জলের ফোঁটা মুছে নিই। আর স্পষ্ট বুঝতে পারি, কেন জলের আর-এক নাম জীবন। কারণ, ওই সময়ে নন্দিনীকে আদর করতে না-পারলে আমি মরে যেতাম।

বিয়ের পর তিনটে বছর দারুণ কেটে গিয়েছিল। দিনে বা রাতে আমাদের ভালোবাসায় কোনও হেরফের হত না। মনে হত, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমাদের ভালোবাসা যেমন ছিল, এখন তারই অ্যাকশান রিপ্লে চলছে। তা-ই চলত—যদি না মাঝখান থেকে ওই অসভ্য লোকটা এসে দেখা দিত।

ভোরবেলা নন্দিনী যখন বিছানা ছেড়ে ওঠে তখন সে এক দেখার মতোই দৃশ্য! যাকে বলে টপ। মানে টপলেস। ব্লাউজ-এর বালাই নেই। আর শাড়ি-সায়াটা বায়না-করা বাচ্চার মতো কোনওরকমে ওর কোমর আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। তখন ঘুম জড়ানো চোখে যেই

আমি নন্দিনীকে দেখি অমনি আমার ঘুম ছুটে যায়। হ্যাংলার মতো ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। অথচ, কিছুক্ষণ আগেই, সারারাত ধরে ওকে নিয়ে কত-না হামলা-হামলি করেছি। শরীর-মন-বিছানা সব উথালপাথাল। তবুও সকালের আলোয় ওর ওই ফরসা ইয়েগুলো দেখলে আমি কেমন ইয়ে হয়ে যাই। এইজন্যেই বোধহয় মুনি-ঋষিরা বলেছেন: লোভ অতি বিষম বস্তু।

তা এই লোভের টানেই বোধহয় ওই অসভ্য লোকটা তাক বুঝে উঁকিঝুঁকি মারে। ভোরবেলা নন্দিনীর ঘুমভাঙা থেকে শুরু হয় লোকটার নজরদারি কাজ। তারপর স্নান করতে যাওয়ার আগে-পরে। কাপড় ছাড়ার সময়। রাতে শুতে যাওয়ার সময়। এমনকী আধো-আঁধারি বিছানার দিকেও ওর নজর থাকে। অবশেষে সকালবেলার ব্যাপারটা তো আছেই।

লোকটার অসভ্যতার এত খুঁটিনাটি আমি টেরও পেতাম না, যদি-না অফিস থেকে দশদিনের ছুটি নিতাম। অফিসে কাজের টেনশান দিনকে-দিন বেড়েই চলেছিল। তাই ডাক্তারি পরামর্শে দশদিন ছুটি নিয়েছি—বিশ্রামের জন্যে। কিন্তু ওই লোকটা আমাকে বিশ্রাম দিল কই!

তিন-তিনটে দিন লোকটাকে ভালো করে লক্ষ করার পর আজ সকালে নন্দিনীকে ডেকে বললাম, অ্যাই শোনো—।

কী?

জানো, একটা অসভ্য লোক সবসময় লুকিয়ে-লুকিয়ে তোমাকে দ্যাখে!

নন্দিনী হেসে বলল, সে আর জানি না, সেই লোকটা তো এখনও আমাকে হ্যাংলার মতো দেখছে।—বলে আমার বুকে আঙুল দিয়ে টোকা মারল দু-বার।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আমি না, আমি না—একটা অন্য লোক।

নন্দিনী তখন বেশ ঘাবড়ে গেল। এক-পা পিছিয়ে গিয়ে চারপাশে তাকাল। তারপর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কে? কোথা থেকে দ্যাখে?

আমি দেখলাম, আর লুকিয়ে লাভ নেই। সুতরাং ওকে বলেই ফেললাম, লোকটাকে চিনি না। তবে লোকটা দ্যাখে ওই আয়নার ভেতর থেকে। —বলে আমি আঙুল তুলে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটার দিকে দেখালাম।

এই ড্রেসিং-টেবিলটা বিয়ের সময় নন্দিনীর মা আমাদের দিয়েছিলেন। এটা তিনি আবার পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। অর্থাৎ অ্যান্টিক। আর চেহারা দেখেই তার আভিজাত্য দিব্যি বোঝা যায়। যেমন, মেহগনি কাঠ। সূক্ষ্ম কারুকাজ—যার মধ্যে রয়েছে শিল্পীর ধৈর্য ও দক্ষতার প্রমাণ। এ ছাড়া আয়নাটাও মাপে বেশ বড়। প্রায় ছ-ফুট উঁচু, আর চওড়ায় প্রায় দু-ফুট। তার ওপর আবার দু-পাশে দুটো ভাঁজ করা আয়নার ফালি জোড়া রয়েছে—পাখির ডানার মতো।

বিয়ের পর সময় করে আমি ড্রেসিং-টেবিলটাকে ভালো করে পালিশ করিয়ে নিয়েছিলাম। আর সুন্দর ঝালর দেওয়া সরু লেসের কাজ-করা পরদা ঝুলিয়ে দিয়েছি ওটার ওপরে। আমাদের ফ্ল্যাটে যে-ই আসুক, ড্রেসিং-টেবিলটা দেখে তারিফ না করে পারে না। বলে, দামি কাঠ, বেলজিয়ামের কাচ, ব্রিটিশ আমলের জিনিস, এর দাম কম করে দশ-পনেরো হাজার টাকা হবে।

এখন সেই অভিজাত ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার আড়ালেই আশ্রয় নিয়েছে নির্লজ্জ বেহায়া অসভ্য লোকটা।

নন্দিনীকে আয়নাটা আঙুল দিয়ে দেখাতেই ওর মুখ পলকে খানিকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চট করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল বিছানার কাছে। নরম গদির ওপরে ঠেলে বসিয়ে দিল আমাকে। গায়ে, মুখে, কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে জিজ্যেস করল, সকালে ওষুধ খেয়েছিস?

বিয়ের আগে আমাদের 'তুই-তুই' প্রেম ছিল। বিয়ের পরেও আদুরে ভালোবাসা জানাতে আমরা দুজনে-দুজনকে 'তুই' বলে ডাকি। কিন্তু ওর মুখে 'ওষুধ' শব্দটা শুনেই আমার আদুরে ভালোবাসা বিগড়ে গেল।

অফিসের কাজের চাপে আমার টেনশান হয় বলে নন্দিনী একরকম জোর করেই আমাকে একদিন ডক্টর সোমেন বাসুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে মাসে একবার করে ডক্টর বাসুকে দেখাতে যাই। ইনি কী দেখেন ভগবান জানেন! তবে কী একটা বিচ্ছিরি ট্যাবলেট আর সিরাপ খেতে দিয়েছেন। নন্দিনীর খেয়াল আর যত্নে একটিবেলাও সে-ওষুধ বাদ দেওয়ার জো নেই। আর সাম্প্রতিক ছুটি নেওয়ার পরামর্শটাও ওই মহা-চিকিৎসকের।

নন্দিনীকে আমি রাগাতে চাই না। তাই ওর বুকে মুখ গুঁজে বললাম, হ্যাঁ, ওষুধ খেয়েছি।

নন্দিনী কোনও কথা না-বলে আমার মাথাটা বুকে চেপে রেখে আমার চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আমার বেশ ভালো লাগছিল। কিছুক্ষণের জন্যে বেমালুম ভুলে গেলাম অসভ্য লোকটার কথা।

পদ্ম নামে একটি বউ আমাদের ঠিকে কাজ করে দেয়। ওর আসার কথা সকাল আটটায়, কিন্তু প্রায় রোজই আসে সাড়ে ন'টা-দশটায়। ওর দেরি দেখে আমি রেগে যাই, অথচ নন্দিনী ওকে কিছু বলে না। কী করে পদ্ম ওর বউদিমণিকে ম্যানেজ করে রেখেছে কে জানে!

আজও পদ্ম আসতে দেরি করছে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। নিশ্চিন্তে নন্দিনীর আদর খেতে পারছি। পদ্মর মেয়ে সুখী আসে বেলা বারোটা নাগাদ। এসে সারাটা দিন নন্দিনীর কাছেই থাকে, আর দরকার হলে ফাইফরমাশ খাটে। রাত ন'টা বাজলে খেয়েদেয়ে মেয়েটা মায়ের ডেরায় চলে যায়।

তোর কী হয়েছে বল তো!—নন্দিনী আমাকে আলতো করে জিগ্যেস করল।

আমি ওর বুকের মধ্যেই আড়ষ্টভাবে সামান্য মাথা নেড়ে বললাম, কিচ্ছু না। শুধু ওই অসভ্য লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। লোকটা সবসময় ওই আয়নার আড়াল থেকে তোকে দ্যাখে।

কথাটা বলেই আমি ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকালাম আয়নাটার দিকে। ওটার ওপরে লেসের পরদা টানা ছিল। কিন্তু তবু যেন আমি একটা অস্পষ্ট ছায়াকে চট করে সরে যেতে দেখলাম। চোখগুলো বড়-বড়। ঠোঁটের কোণে লোভাতুর হাসি।

নন্দিনীকে কিছু বলার আগেই ও বলে উঠল, সন্দীপ, এসব নিয়ে তুই একদম ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিনী সান্ত্বনা দিলে কী হবে, আমি জানি, এত সহজে সব ঠিক হবে না। ওই লোকটার নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে আলতো ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ওর পেছনটা বেশ ভারী। বিয়ের আগে এতটা ভারী ছিল না।

নন্দিনী টেলিফোনে মিষ্টি করে 'হ্যালো' বলল।

এটা কি সেই টেলিফোন?

মানে, কিছুদিন ধরে একটা ফোন আসছে, সেটা আমি ধরলেই সব চুপচাপ—কেউ কথা বলে না। শুধু দম নেওয়ার 'ফোঁস-ফোঁস' শব্দ শোনা যায় কয়েক লহমা। আর তারপরই লাইন কেটে যায়।

অথচ নন্দিনী যদি ফোন ধরে তা হলে আর লাইন কাটে না। কখনও সেই ফোনে কথা বলে নন্দিনীর মা, অথবা আমার ছোটপিসি, বা আমেরিকা থেকে নন্দিনীর বড়দা, আর নয়তো দীপেশ।

নন্দিনী টেলিফোনে কথা বলছিল। আমি হাঁ করে ওর কথাগুলো শুনছিলাম। কে ফোন করেছে এখন?

আমার মুখ দেখে নন্দিনী বোধহয় নীরব প্রশ্নটা টের পেল। রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসে গলায় বলল, দীপেশ—।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপেশ আমাদের দুজনেরই বন্ধু। ইউনিভার্সিটিতে আমরা তিনজনে একসঙ্গে পড়েছি। দীপেশটা যাচ্ছেতাই নম্বর পেয়ে প্রত্যেক ইয়ারে ফার্স্ট হত। তার ওপর কী দারুণ চেহারা! আমার সঙ্গে তো একেবারে গলায়-গলায় ছিল। একসঙ্গে কত সিনেমা দেখেছি আমরা। তখন নন্দিনীর সঙ্গে আমার অতটা মাখামাখি ছিল না।

পাশ-টাশ করে একটা দারুণ ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি নিয়ে দীপেশ স্টেটস-এ চলে গেল। আমিও চাকরি পেলাম। তার কিছুদিন পর নন্দিনীও চাকরিতে ঢুকল। চাকরি করা অবস্থায় আমাদের প্রেম চলেছিল বছরখানেক। কিন্তু তারপর আর পারা যাচ্ছিল না। নন্দিনীর বাবা একটা ফ্ল্যাট গিফট করতেই সব প্রবলেম সলভ হয়ে গেল। নন্দিনী চাকরি ছেড়ে দিল। বলল, সন্দীপ, চাকরির চেয়ে বিয়ে অনেক বেটার। তুই একা চালাতে পারবি না?

আমি 'খুব পারব' বলে ওকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিয়েছিলাম। আর তারপরই দু-গালে প্রচণ্ড 'চকাৎ-চকাৎ' শব্দে দুটো চুমু। নন্দিনী আচমকা বিব্রত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, কী হচ্ছে! কী হচ্ছে!

আমি হেসে বলেছিলাম, সোনা, চুমুতে যখন বিকট শব্দ হয় তখন তাকে বলে হামি।

করিডর ধরে কে যেন এগিয়ে আসছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে নন্দিনীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের বিয়ের মাসতিনেক পর দীপেশ কলকাতায় ফিরল। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই আসে আমাদের আস্তানায়। ওকে দেখলেই আমার ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। নন্দিনীর সঙ্গে পিরিত করার জন্যে ও আমাকে কম ওসকায়নি। বন্ধুবান্ধব সকলের মাঝে লুকিয়ে আমার পেছনে চিমটি কেটে বলেছিল, জাগো বাঙালি, লড়ে যাও।

নন্দিনী টেলিফোনে খুব হাসছিল। তারপরই খেয়াল করলাম ও দীপেশকে আমার কথা বলছে।

আমি আয়নার দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম। না, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু দীপেশকে এখুনি ওই লোকটার কথা বলার দরকার নেই। ও কী মনে করবে কে জানে!

নন্দিনীকে ইশারা করে বারণ করলাম, দীপেশকে এখন যেন কিছু না বলে।

নন্দিনী আমাকে আশ্বস্ত করে হাসল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল। রাখার সময় স্পষ্ট দেখলাম, রিসিভারটা ওর বাঁ-দিকের বুকে ঘষে গেল। রিসিভারটাকে হিংসে হল আমার।

নন্দিনীকে কাছে ডাকতে যাব, অমনি কলিংবেল বেজে উঠল। ও আমাকে লক্ষ করে জিভ ভেঙাল। বলল, পদ্ম না-এলে আমার কপালে বোধহয় একটি ফোঁটাও বিশ্রাম জুটত না। দীপেশ এলে বলব, তুমি একটুও কথা শোনো না।

নন্দিনী দরজা খুলতে গেল।

আর ঠিক তখনই একটা আবছা ছায়া আয়নার ওপরে আড়াআড়ি সরে গেল যেন।

দুই

নন্দিনী অলস ভঙ্গিতে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়। ঘরের নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে। তার নীল আলোয় নন্দিনীর শাড়ির রং ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন লোককে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। ওদের মুখ অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য মোটেই অস্পষ্ট নয়। ওদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র হাতে খপ করে চেপে ধরল নন্দিনীর শাড়ি। তারপর একটা উল্লাসের হেঁচকি তুলে শাড়িটা টানতে শুরু করল। বিছানায় নন্দিনীর দেহটা সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে, আর শাড়িটা একটু-একটু করে খুলে আসছে ওর শরীর থেকে। বাকি তিনজন লোক নন্দিনীর বস্ত্রহরণ চুপচাপ দেখছে। আবছা আলোতেও ওদের চোখে ফুটে ওঠা তৃপ্তি বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ওই চারজন দস্যু চমকে উঠে এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় চারজন গায়ে-গায়ে মিশে একজন মানুষ হয়ে গেল। এবং সেই লোকটা একছুটে চলে গেল ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার কাছে। আয়নার পরদা সরিয়ে চোখের পলকে ঢুকে গেল আয়নার ভেতরে।

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের মধ্যেই বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। কারণ, দেখি, নন্দিনী আলুথালু বেশে উঠে বসে আমার বুকে হাত বোলাচ্ছে, মাথায় হাত বোলাচ্ছে, কপালে-গালে ভয়-ভাঙানো চুমু খাচ্ছে।

কী হয়েছে রে? বাজে স্বপ্ন দেখেছিস?—নন্দিনীর গলায় উৎকণ্ঠা।

হ্যাঁ, খুব বাজে স্বপ্ন।—বড় বড় শ্বাস নিতে-নিতে আমি বললাম, আয়নার ওই লোকটা তোর শাড়ি ধরে...শাড়ি ধরে...।

থাক, থাক। এখন ঘুমো।

আমাকে একগ্লাস জল দিল ও। ঢকঢক করে জল খেয়ে ওর নরম বুকে মুখ গুঁজে আমি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল থেকে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। আমি নানা অছিলায় আয়নার কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগলাম। নন্দিনী ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে লক্ষ করছিল। ওর নজর দেখেই বুঝলাম আমার মতলব ও ধরে ফেলেছে, কিন্তু আমাকে কিছু বলল না।

বেলার দিকে একবার ফোন বেজে উঠতেই আমি ফোন ধরলাম। নন্দিনী রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ছুটে আসছিল ফোন ধরতে। কিন্তু আমাকে রিসিভার তুলতে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি টেলিফোনে কথা বললাম।

হ্যালো—

কোনও উত্তর নেই। তবে টের পেলাম, ও-প্রাপ্ত শোনা যাচ্ছে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

আমি আরও বেশ কয়েকবার 'হ্যালো-হ্যালো' বললাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না।

আমি আয়নার দিকে একবার তাকালাম। নাঃ, সেখানে কেউ নেই।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছি, নন্দিনী সাত-তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমাকে দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

আমি রিসিভারটা ওকে বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলাম। আয়নার দিকে না-দেখার ভান করে আড়চোখে নজর রাখলাম—যদি শয়তানটা উঁকিঝুঁকি মারে।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, টেলিফোনে দিব্যি কথা চলছে। নন্দিনী কথা বলছে আর হাসছে।

একটু পরেই কথা শেষ করে ও রান্নাঘরে চলে গেল। যাওয়ার আগে আমাকে মিষ্টি করে বলে গেল, বারোটার সময় ওষুধটা খেতে ভুলো না।

রান্নাঘর থেকে পদ্মর মশলা বাটার শব্দ আসছিল। আর নন্দিনী সেখানে ঢুকেই কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বোধহয় কিছু ছাড়ল। কারণ 'ছ্যাঁক' করে এমন শব্দ হল যে, মনে হল আমার কপালে ছ্যাঁকা লেগেছে।

বিছানায় চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। টেনশান কাটাতে ডাক্তারবাবু আমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন! কিন্তু ডক্টর বাসু তো আর আয়নার ওই লোকটার কথা জানেন না!

লোকটার কথা ভাবতে-ভাবতেই অলস চোখে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। আমার মাথার ভেতরে কোথাও একটা টেলিফোন ক্রমাগত বেজে যাচ্ছিল।

জানলার বাইরে চড়া রোদ্দুর। উলটোদিকের ফ্ল্যাটের কার্নিশে একটা মেয়ে-চড়ুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একটা কাম-জর্জর পুরুষ-চড়ুই দু-পাশে ডানা নামিয়ে মুখটা উদাসীনভাবে ওপরে তুলে মেয়ে-চড়ুইটিকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একটা থিয়োরি মাথায় এল। মানে, ওই অসভ্য লোকটার ব্যাপারে। যতই ভাবতে লাগলাম, থিয়োরিটা ততই কম অবাস্তব ঠেকতে লাগল। কিন্তু না, নন্দিনীকে এখন বলব না। শুনলে ও হয়তো খিলখিল করে হেসে উঠবে। তারপর বলবে, না রে, তোর টেনশান এখনও কাটেনি।

নন্দিনী মনে হয় আমার কথায় খুব একটা আমল দিচ্ছে না। দীপেশ বললে ব্যাপারটাকে ও কিন্তু এরকম হালকাভাবে উড়িয়ে দিতে পারত না। আজ সন্ধেবেলা দীপেশ যদি আসে তা হলে সবকিছু ওকে বলব। বলা দরকার। তা না-হলে আয়নার ওই লোকটা দিন-দিন আমার মাথায় চড়ে বসবে।

ঘোর দুপুরে নন্দিনীকে বিছানায় কাছে পেয়ে আমি কয়েকঘণ্টা আগে দেখা কার্নিশের চড়ুই পাখিটার মতো হয়ে গেলাম। সুখী পাশের ছোট ঘরটার মেঝেতে শুয়ে পড়েছে। আর আমাদের ঘরে ঢোকার সব দরজাই বন্ধ। সুতরাং আমরা দুজনে এখন দুজনের।

আমার ভালোবাসায় বাধা দেওয়ার ছল করে নন্দিনী বলল, একটু ঘুমোও না, তা হলে টেনশানটা একটু কমবে।

আমি হাসলাম, বললাম, টেনশান কমানোর এটাই সবচেয়ে ভালো ওষুধ—ট্যাবলেট বা সিরাপ নয়।

জানলাগুলোয় পরদা টানা ছিল। তাই ঘরে হালকা ছায়ায় একটা আস্তরণ ছিল। কিন্তু তাতে নন্দিনীকে আগাপাস্তলা দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না আমার। ওর শরীর নিয়ে পাগলামি করতে-করতেই কী যে হল, হঠাৎ করে চোখ গেল আয়নার দিকে।

আবছা আঁধার এবং লেসের কাজ করা পরদা থাকা সত্ত্বেও লোভী ছায়াটাকে আমি দেখতে পেলাম। আমি ঝটকা মেরে উঠে বসতেই ছায়াটা সড়াৎ করে সরে গেল।

নন্দিনী অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী হল?

ওই লোকটা।—আয়নার দিকে দেখালাম আমি, বললাম, ওঃ, অসহ্য হয়ে উঠেছে।

নন্দিনী কোনও কথা না বলে চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট করে বলল, এবার শুয়ে পড়ো। সন্ধেবেলা দীপেশ এলে ওকে বলে দেখি কী বলে—।

ওর কথামতো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। নাঃ, সন্ধেবেলা দীপেশকে ব্যাপারটা বলতেই হবে।

সন্ধেবেলা দীপেশ এল। ওর কলিংবেল বাজানোর নিজস্ব একটা ঢং আছে। শুধু কলিংবেল কেন, সব ব্যাপারেই ওর নিজস্ব কতকগুলো ঢং আছে। মনে পড়ে, ইউনিভার্সিটির দিনগুলোয় আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে ওকে নকল করার চেষ্টা করতাম। ওকে আমার মাঝে-মাঝে হিংসে হত। এখনও যে হয় না তা নয়।

ডাইনিং স্পেসে টিভি চালিয়ে চায়ের আসর বসিয়েছিলাম আমরা তিনজনে। এ-কথা সে-কথার মাঝে নন্দিনীই ফস করে বলে বসল লোকটার কথা। আমি ভেবেছিলাম দীপেশ হো-হো করে হেসে উঠবে, কিন্তু ও হাসল না। সিরিয়াস মুখ করে লোকটার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল আমাকে কেমন দেখতে, কখন-কখন উঁকি মেরে নন্দিনীকে দ্যাখে, আমাকে দেখিয়ে নন্দিনীকে কোনওরকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে কি না, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

আমি তখন একটু ভরসা পেয়ে সামান্য ইতস্তত করে নতুন থিয়োরিটার কথা দীপেশকে বলে ফেললাম।

আমার কী মনে হয় জানিস? ড্রেসিং-টেবিলের ওই আয়নাটা আসলে একটা দরজা—।

দরজা!—অবাক হয়ে নন্দিনী বলল।

আর-একটু বুঝিয়ে বল তো।—দীপেশ চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। হাতের সিগারেটে টান দিতে ভুলে গেল।

আমি হয়তো বিব্রত হয়ে পড়তাম, কিন্তু দীপেশের আগ্রহ আমাকে ভরসা দিল।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি বললাম, হ্যাঁ, দরজা। দরজার একপাশে হচ্ছে আমাদের জগৎ—মানে, আমাদের এই ফ্ল্যাট, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, এইসব। আর অন্যদিকে ওই লোকটার দুনিয়া। আয়নাটা হচ্ছে এই দুটো জগতের মাঝের দরজা। আমরা সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে পারি না, কিন্তু লোকটা হয়তো পারে—কে জানে!

আমি ভাবছিলাম, আমার কথায় দীপেশ আর নন্দিনী হয়তো হো-হো করে হেসে উঠবে। কিন্তু না, ওরা কেউই হাসল না আমার থিয়োরি শুনে। নন্দিনী একবার চিন্তিত মুখে তাকাল দীপেশের দিকে। দীপেশ গম্ভীরভাবে আমাকে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জিগ্যেস করল, আর কী-কী মনে হয় তোর?

এইজন্যেই দীপেশের জবাব নেই। ও আর-একজনের মনের অবস্থা সবসময় ঠিক-ঠিক বুঝতে পারে। এইজন্যেই কারও কাছের মানুষ হয়ে উঠতে ওর এতটুকু দেরি হয় না।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, আমার আরও কী মনে হয় জানিস! ওই লোকটা নির্ঘাত কোনও বদ মতলবে ঘুরঘুর করছে।

কী মতলব?

সেটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না।

তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

একসময় দীপেশ বলল, সন্দীপ, তুই লোকটাকে যেমন লক্ষ রাখছিস সেরকম লক্ষ রাখ। এটা নিয়ে এক্ষুনি থানা-পুলিশ করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে থাকাই ভালো। আমি আজ চলি, নন্দিনী, তোরা একটু সাবধানে থাকিস।

দীপেশ চলে যাওয়ার পর সুখীকে একপ্যাকেট সিগারেট কিনতে পাঠালাম। নন্দিনীকে একা পেয়ে জাপটে ধরে দুটো চুমু খেয়ে বললাম, শুনলি তো, এখন থেকে তোকে সাবধানে থাকতে হবে।

নন্দিনী অদ্ভুত হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, এখন না, রাতে।—তারপর চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

আমি টিভিটা অফ করে দিয়ে চলে এলাম শোওয়ার ঘরে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়নার পরদা সরিয়ে দিয়ে ঠান্ডা কাচে হাত দিলাম। এটা আসলে দরজা! ভাবা যায়! ওই লোকটা কোথায় গেল?

আয়না লক্ষ করে কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিলাম। তারপর আয়নার খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, আয়না, তুই সত্যি করে বল, কাকে তুই লুকিয়ে রেখেছিস—।

আয়না কোনও উত্তর দিল না।

শুধু আমার প্রতিবিম্ব আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তিন

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তবে আমি সেটা জানতে পেরেছি এটা নন্দিনী বা দীপেশ—কাউকে বুঝতে দিইনি।

সন্ধের পর একটা ফোন এল। আমিই ফোনটা ধরলাম। তারপর 'হ্যালো' বলা সত্ত্বেও ও-প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর নেই। তবে মনোযোগ দিয়ে কান পেতে শুনতে পেলাম ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

নন্দিনী বাথরুমে গা ধুতে ঢুকেছে। সুতরাং আরও কয়েকবার চেঁচিয়ে 'হ্যালো' বলে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম 'খটাস' করে বাথরুমের দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ। তাকিয়ে দেখি, ভেজা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নন্দিনী এগিয়ে আসছে।

দাও তো, আমি একবার দেখি।

নন্দিনীকে রিসিভারটা দিয়ে শোওয়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জলে ভেজা নন্দিনীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলাম। ও ছোট-ছোট আদুরে শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে ফোনে কথা বলতে লাগল। আমি আদর করতে-করতে ওর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম।

হ্যালো, নন্দিনী বলছি। হ্যাঁ, বলো। এই তো, ঘরেই রয়েছে। না, ডক্টর বাসুকে ফোন করিনি। পরশুদিন একেবারে ওকে নিয়ে যাব। তুমি কী করছ এখন? আমি? আমি এই তো গা ধুয়ে বেরোলাম। ইয়ারকি কোরো না। তুমি কবে আসছ? আচ্ছা। রেখে দিই তা হলে—।

ফোন রেখে দিল নন্দিনী। ওর 'উঁ', 'আঃ—' শব্দগুলো এবার জোরে হতে লাগল। ও আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেসব আলগা আপত্তি করছিল সেগুলো যে আসলে কোনও আপত্তিই নয় তা এই তিন বছরে আমি ভালো করে জেনে গেছি।

সুতরাং ভিজে শাড়িটা ওর গা থেকে খসিয়ে দিলাম। তারপর ওকে নিয়ে গেলাম বিছানার কাছে। ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ, আর পরদা ঢাকা আয়নায় আবছাভাবেও কাউকে নজরে পড়ছে না। তা হলে ফুলশয্যা হতে আর বাধা কী!

আদর-ভালোবাসার দমকে আয়নার দিকে তাকানোর কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু সবকিছুর শেষে ক্লান্ত দেহে যখন শুয়ে আছি, তখনই লোকটাকে দেখতে পেলাম। আয়নার বাঁ-দিকের এককোণে ওর বাঁ-চোখ আর চুলের খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

আমি বিছানায় উঠে বসতেই লোকটা সরে গেল।

নন্দিনী অবাক চোখে আমাকে একবার দেখল, তারপর বলল, কী হল!

সেই লোকটা।—আমি আয়নার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলাম।

ও—।

নন্দিনী বিছানা ছেড়ে উঠে মেঝেতে পড়ে থাকা ভিজে শাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ অলসভাবে শুয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম আমার থিয়োরিটার কথা। লোকটার নিশ্চয়ই কোনও খারাপ মতলব আছে। হয়তো সুযোগ বুঝে ও ওই দরজা পেরিয়ে চলে আসবে আমাদের জগতে। ঢুকে পড়বে আমাদের ফ্ল্যাটে। তারপর সাংঘাতিক কিছু একটা কাণ্ড করে...।

আমার মাথাটা কেমন দপদপ করছিল। বোধহয় টেনশানটা বাড়ছে। নাঃ, একটু রাস্তায় বেরোই, পায়চারি করে মাথাটা হালকা করে আসি।

নন্দিনীকে বলে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। কাছেই একটা মাঠ আছে, সেখানে বসে একটু জিরিয়ে নেব।

ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একটা লোককে হঠাৎই দীপেশ বলে মনে হল। আমি চেঁচিয়ে ওকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গাড়িটা চলে যেতেই রাস্তাটা এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে, ধন্দে পড়ে গেলাম। বোধহয় দীপেশ না, অন্য লোক। দীপেশকে কাছে পেলে আমি খুব ভরসা পেতাম। তাই কখনও ওকে কাছছাড়া করতে চাইতাম না। কিন্তু সেসব দিন এখন কোথায়!

খোলা মাঠে ঠান্ডা বাতাসে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ফিরে চললাম বাড়ির দিকে।

ফ্ল্যাটের দরজায় এসেই ভেতর থেকে হাসি আর কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেলাম। কী ভেবে কান পাতলাম দরজায়।

ওঃ, সন্দীপের নতুন থিয়োরির জবাব নেই!—কোনও পুরুষের ভারি গলা। তারপর আমার গলা নকল করে ব্যঙ্গের সুরে সে বলল, আমার কী মনে হয় জানিস? ড্রেসিং-টেবিলের ওই আয়নাটা আসলে একটা দরজা।—তারপরই দরাজ গলায় অট্টহাসি।

এবার নন্দিনীর গলা শুনলাম: ওর আজগুবি ফ্যানটাসি নিয়ে ওকে থাকতে দাও। ওষুধপত্র খাচ্ছে—কদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ডক্টর বাসু বলেছেন, ওকে কখনও কনট্রাডিক্ট না-করতে। বলেছেন, ওর সব গল্পে সায় দিয়ে যেতে।

তাই তো দিচ্ছি। ও কোথায় গেছে এখন?

এই আশেপাশে একটু পায়চারি করতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

আমি কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরে কথাবার্তা থেমে গেল।

নন্দিনী দরজা খুলল। আমাকে দেখেই মিষ্টি করে হাসল, বলল, কী, বেড়ানো হল?

আমি অল্প হেসে 'হুঁ' বলে জবাব দিলাম। ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দীপেশকে দেখতে পেলাম। ও সহজভাবে হাসতে চেষ্টা করল, বলল, কী রে, কেমন আছিস?

না, কিছুতেই ওদের বুঝতে দেব না যে, ওদের কথাবার্তা আমি শুনে ফেলেছি। তাই বললাম, ভালো।—তারপর শোওয়ার ঘরের দিকে যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে যোগ করলাম: ওষুধ তো খাচ্ছি—কদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ করলাম, পলকের জন্যে নন্দিনী আর দীপেশের মধ্যে চোখাচোখি হল।

আমি শোওয়ার ঘরে ঢুকে গায়ের জামাটা খুলে সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, সাংঘাতিক একটা কিছু না-হওয়া পর্যন্ত ওই লোকটার কথা ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আগের দিন আমার থিয়োরির কথা শুনে দীপেশ তো একটুও ঠাট্টা করেনি! আর নন্দিনীও তো কখনও আমার কথায় প্রতিবাদ করেনি! এ-সবই কি ওদের অভিনয়? নাকি ডক্টর বাসু ওদের যেরকম শিখিয়ে দিয়েছেন ওরা সেরকমই ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে।

একটু পরেই ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম, দীপেশ চলে গেল।

আমি চোখ বুজে শুয়ে রইলাম। নন্দিনীর সঙ্গেও এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ওরা ওদের বিশ্বাসে নিয়ে থাক। দীপেশ যত পারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুক আমাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ওরা চিড় ধরাতে পারবে না কিছুতেই।

আমার মন বলছে, আয়নার ওই লোকটার মতলব মোটেই ভালো নয়।

শেষ

যা ভয় করছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল। লোকটাই জিতে গেল শেষ পর্যন্ত। ওকে কিছুতেই আটকাতে পারলাম না।

রাত্র তখন কটা হবে? বড়জোর সাড়ে এগারোটা। আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকেই দেখি নন্দিনী কেমন অদ্ভুতভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। একটা হাত বুকের ওপরে, আর একটা হাত ছড়ানো। শাড়িটা উঠে গেছে হাঁটু পর্যন্ত। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি ছুটে গেলাম ওর কাছে। দেখি ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, দাঁত দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে একফোঁটা রক্ত, আর ওর নরম গলায় কালশিটের দাগ।

আমি ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওর পালস দেখলাম। কোনও সাড় নেই। ওর নাকের কাছে হাত রাখলাম। না, নিশ্বাস পড়ছে না। তখন ঝুঁকে পড়লাম ওর শরীরের ওপর। বুকে কান চেপে ধরলাম। না, কোনও শব্দ নেই।

আমি ঘামতে শুরু করলাম। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। ভয়ে-ভয়ে তাকালাম আয়নার দিকে। কোথায় গেল লোকটা? নিশ্চয়ই অপকর্মটি সেরে লুকিয়ে পড়েছে।

আমি দৌড়ে গেলাম ফ্ল্যাটের দরজার কাছে। যা ভেবেছি তাই! দরজার লক, ছিটকিনি সব ঠিকঠাক রয়েছে। বাইরের কেউ ফ্ল্যাটে ঢোকেনি। সুতরাং আর কাউকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি যখন বাথরুমে ঢুকেছি তখনই সুযোগ বুঝে ওই লোকটা বেরিয়ে এসেছে আয়নার ভেতর থেকে। ঘুমিয়ে থাকা নন্দিনীকে নিয়ে নিজের সাধ মিটিয়েছে। তারপর ওকে খুন করে আয়না দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আমি যে এখন কী করি! দরজা খুলে বাইরে গিয়ে কাউকে ডাকাডাকি করতে যাব সে-উপায় নেই। কারণ সেই ফাঁকে লোকটা হয়তো টুক করে বেরিয়ে আসবে আয়না থেকে, তারপর কায়দা করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সোজা হাওয়া হয়ে যাবে, তখন তাকে আর কে খুঁজে পাবে!

আমি নন্দিনীকে জাপটে ধরে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করলাম।

কাঁদতে-কাঁদতেই বললাম, তুই আমাকে চেঁচিয়ে একবার ডাকতে পারলি না!

নন্দিনী ফ্যাকাসে মুখে শূন্য চোখে চুপচাপ তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

হঠাৎই আমার দীপেশের কথা খেয়াল হল। ওকে ফোন করে ব্যাপারটা বলি। তারপর বাকি যা ব্যবস্থা করার ও করবে।

দীপেশকে ফোন করতেই ও-প্রান্ত থেকে ওর ঘুম জড়ানো গলা পেলাম।

হ্যালো।

সন্দীপ বলছি।

দীপেশ চমকে উঠল। উৎকণ্ঠার সুরে বলল, কী ব্যাপারে রে, এত রাতে?

আমি ওকে সব বললাম।

দীপেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অস্পষ্ট গলায় নন্দিনীর নামটা দু-বার বিড়বিড় করল। তারপর বলল, তুই এ কী করলি, সন্দীপ?

আমি?—দীপেশ বোধহয় আমার কথা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। তাই ওকে বুঝিয়ে বললাম, আমি কিছু করিনি। আয়নার ওই লোকটা গলা টিপে নন্দিনীকে খতম করেছে। আমি এখন ফ্ল্যাটে বসে পাহারা দিচ্ছি যাতে শয়তানটা পালাতে না-পারে। তুই তো আমার থিয়োরিটাকে আমল দিলি না—এবার দেখ, আমার কথা ঠিক হল কি না!

দীপেশ আমার কথা বুঝতে চাইল না। ও শুধু বলেই যেতে লাগল, ছি, ছি, সন্দীপ, তুই এটা কী কাজ করলি! তুই কেন এসব করলি? নন্দিনীকে তুই...।

দীপেশের গলা বুজে এল। আমি শুধু ওর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

অনেকক্ষণ পর দীপেশ বলল, তুই ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাস না যেন। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই লোকজন নিয়ে যাচ্ছি।

না, না, আমি এখানেই আছি—নন্দিনীকে ফেলে আর কোথায় যাব!

ফোন রেখে দিলাম।

তারপর শুধু অপেক্ষা। আয়নার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা আর পাহারা। ওই শয়তান অসভ্য লোকটাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়িতে যেন বেশ কয়েকজোড়া ভারী বুটের শব্দ পেলাম। তারপরই কলিংবেল বেজে উঠল। আর একইসঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজায় অধৈর্যভাবে 'দুমদুম' করে ধাক্কা মারল কেউ।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দীপেশ লোকজন নিয়ে এসে গেছে। আমার দায়িত্ব শেষ। সব দায়িত্ব শেষ।

ঘুমে দু-চোখ জড়িয়ে আসছে আমার।

সন্ধের পর, একা

মল্লিকা বেশ বুঝতে পারছিল চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বিকৃত চিৎকার ওর ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আজকের এই মুহূর্তটার জন্য ও মনে-মনে বহুবার তৈরি হয়েছে। তাতে ওর মনে হয়েছিল, বেশ শান্তভাবে ঠান্ডা মাথায় ও ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে পারবে। কিন্তু এখন, নির্জন ঘরে, ভয়ঙ্কর মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মল্লিকার সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

মোহনদাস জোয়ারদার তখন ঘরের একমাত্র দরজাটা লক করে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মেয়েটার মুখের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে। আজ পর্যন্ত মোহনদাস এমন কাউকে দেখেনি যে ভয় পায়নি। আচ্ছা-আচ্ছা সাহসী মেয়েও এই অবস্থায় ভয় পেয়েছে। অনেকে তো আবার কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মেয়েগুলো ছিঁচকাদুনে হলে মোহনদাস তেমন মজা পায় না। বরং বিরক্ত লাগে।

‘কী, দিদিমণি, ভয় করছে? চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে?’ রীতিমতো স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন দুটো করল মোহনদাস।

মল্লিকা জোর করে মাথা নাড়ল।

মোহনদাস কী বুঝল কে জানে! হেসে বলল, ‘ভয়ের কী আছে! ভয়ের কিস্যু নেই। আমি তো তোমাকে আর খেয়ে ফেলছি না। শুধু একটু আদর করব। এ-কথা বোলো না যে, লাইফে কেউ কখনও তোমাকে আদর করেনি। তোমাদের গায়ে তো আর কিছু লেখা থাকে না—মানে, ক’জন লোক আদর করেছে তাদের নাম-ঠিকানা তো আর ট্যাক্সির মিটারের মতো তোমাদের কপালে বা...ইয়ে...বুকে লেখা হয়ে যায় না। তোমাদের বডি যদি কম্পিউটার হত তা হলে কী হত সেটা বলা মুশকিল—।’

মোহনদাস জোয়ারদার একটা গানের কলি গুনগুন করে ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘরের বাঁ-দিকে রাখা একটা বড় সোফায় গিয়ে বসল। তার পাশের একটা ক্যাবিনেট থেকে ধীরেসুস্থে মদের বোতল, গ্লাস, আর সোডা বের করে নিল। কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে সে মল্লিকার দিকে আড়চোখে দেখছিল। মল্লিকা ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। একটু পরেই হয়তো জওহরলাল নেহরু রোডে জল দাঁড়িয়ে যাবে। গাড়িঘোড়া যানবাহন সব জট পাকিয়ে যাবে। বাড়ি ফেরার সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকবে না কারও। সুতরাং মল্লিকার আজ দেরি হওয়াটা কারও কাছেই তেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। আর মল্লিকাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার লোক এখন তো

একজনই—বুড়ি মা। অথচ গত বছরেও ওকে নিয়ে চিন্তা অথবা দুশ্চিন্তা করার দুজন মানুষ ছিল। এখন একজন আর নেই।

জওহরলাল নেহরু রোডের ওপরে মস্ত বাড়ি ব্যানার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ির ছাদের দিকে তাকাতে হলে আকাশমুখো হতে হয়, ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। পরিভাষায় এ-ধরনের বাড়িকেই বোধহয় বলে গগনচুম্বী অট্টালিকা। এই বাড়িরই টেনথ ফ্লোরে মোহনদাস জোয়ারদারের কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল।

মল্লিকা এখানে রিসেপশনিস্টের চাকরিতে ঢুকেছে প্রায় একমাস। ও নিজেই একদিন চাকরির জন্য এসে হাজির হয়েছিল মোহনদাসের অফিসে। মল্লিকার যোগ্যতা ছিল তিনটি : পাস কোর্সে বি. এ. পাশ, অল্পসল্প টাইপিং-এ জ্ঞান, এবং ওর রূপযৌবন। মল্লিকা জানত, এরমধ্যে তৃতীয় যোগ্যতাটিই মোহনদাসের সবচেয়ে বেশি মনে ধরবে। কারণ, মোহনদাস জোয়ারদার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিয়ে তবেই মল্লিকা যেচে ওর কাছে এসেছে—ওর ফাঁদে নিজে থেকে এসে ধরা দিয়েছে। কারণ, মল্লিকার লক্ষ্য ছিল একটাই : মোহনদাস জোয়ারদারকে শায়েস্তা করা। এই জানোয়ারটা গত দেড় বছরে অন্তত চারটি মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। বেচারা মেয়েগুলো নিতান্ত পেটের দায়ে মোহনদাসের কাছে চাকরি করতে এসেছিল—রিসেপশনিস্টের চাকরি। লাঞ্ছিত চারজনের মধ্যে দুজন ব্যাপারটা চেপে যায়। কিন্তু বাকি দুজন পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেও শেষ পর্যন্ত মোহনদাসের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়েনি। পুলিশ ও উকিলের যৌথ কেরামতিতে মোহনদাস ছাড়া পেয়ে যায়।

'আপনি...আপনি আমাকে ছেড়ে দিন...' কথাটা বলতে গিয়ে মল্লিকার গলা কেঁপে যায় : 'এভাবে আমার লাইফটা নষ্ট করবেন না, প্লিজ...।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মোহনদাস হাসল। মেয়েটা দেখতে সত্যি সুন্দরী। আগের চারটে মেয়ের মধ্যে সুলক্ষণা নামের মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। মেয়েটা ঘটনার পর বিস্তর কান্নাকাটি করেছিল। করবেই তো! ওর বয়েস যে ছিল মাত্র উনিশ! তবে মোহনদাস ওকে দু-হাজার টাকা দিয়েছিল। বিয়ে করবে এরকম একটা বেহুদা শপথও করেছিল। এতে সুলক্ষণার কান্না থেমে গিয়েছিল। এবং মোহনদাস প্রায় দু-মাস মেয়েটাকে ভোগ করতে পেরেছিল।

এভাবেই দিব্যি চলছিল, কিন্তু কে যে সুলক্ষণার মাথায় কুমতলব ঢোকাল কে জানে! মেয়েটা হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে গেল। তার কদিন পরেই পুলিশি ঝঞ্ঝাট, কোর্ট-কাছারি। বহু টাকা আর বুদ্ধি খরচ করে সেবার মোহনদাস পিঠ বাঁচাতে পেরেছিল।

এই মেয়েটার বয়েস হয়তো সাতাশ-আঠাশ হবে, তবে সুলক্ষণার চেয়েও সুন্দরী দেখতে, আর জিনিসও ভালো।

মল্লিকার কথার উত্তরে মোহনদাস অভয় দেওয়ার হাসি হাসল দ্বিতীয়বার। বলল, 'কী যে বাচ্চা মেয়ের মতো কথা বলো! তোমাকে ছেড়ে দেব না-তো কি আটকে রাখব! তুমি লাইফ নষ্ট করার কথা বলছ কেন, মল্লিকা? আমরা দুজনে এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় যদি বন্ধ ঘরে একটু বুলবুলি করি তাহলেই তোমার লাইফ নষ্ট হয়ে যাবে! আরে, দিদিমণি, লাইফ কি এতই সস্তা!' গলাখাঁকারি দিল মোহনদাস। আর-একবার চুমুক দিল গ্লাসে। না, বেশি মদ গিললে চলবে না। তাতে শরীরের আঁকুপাঁকু ভাবটা বাড়বে, শরীরটা চাগাড় দিয়ে উঠবে —কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করা যাবে না। কিছুক্ষণ ঠুকঠুক করেই আউট। মল্লিকার সঙ্গে

মোহনদাস অনেকক্ষণ তারিয়ে-তারিয়ে ব্যাট করতে চায়। এরমধ্যেই মোহনদাস বেশ বুঝতে পারছে, ওর শরীরটা অধীর হয়ে উঠেছে।

মল্লিকার চোখে এবার সত্যি-সত্যি জল এসে গেল। ভাঙা গলায় ও কোনওরকমে উচ্চারণ করল, 'আপনি...আপনি একটা রেপিস্ট!'

মল্লিকা কী ভেবে এসেছিল, আর কী হচ্ছে! ও মন শক্ত করে এসেছিল মোকাবিলা করতে, লড়াই করতে, শোধ নিতে—অথচ এভাবে ভেঙে পড়ছে! কোনও রেপিস্টের সামনে মেয়েদের মনটাই বোধহয় আগে তছনছ হয়ে যায়, তারপর শরীর।

মোহনদাস জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, 'মল্লিকা, তুমি বড্ড উলটোপালটা কথা বলো! ব্যাপারটা রেপ হবে কি হবে না তার সবটাই ডিপেন্ড করছে তোমার ওপরে। তুমি যদি কোনওরকম ঝামেলা না করে ব্যাপারটা ইয়ে...মানে...এনজয় করো, তা হলে সেটাকে মোটেই রেপ বলা যায় না। আর তুমি যদি ফালতু-ফালতু চিৎকার-চেঁচামেচি করো, হাত-পা ছুড়ে ঝামেলা পাকাও তা হলেও রেজাল্ট সেই একই—তবে তখন ব্যাপারটা ওই রেপ হয়ে দাঁড়াবে।' মোহনদাস হাসল চাপা শব্দ করে: 'এখানে যে লড়াই বা চেঁচামেচি করে বিশেষ সুবিধে হবে না সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ?'

হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পেরেছে মল্লিকা। এই ঘরটা এই বেপরোয়া জহ্লাদটার প্রাইভেট অফিস। তবে বড্ড বেশি প্রাইভেট।

আজ সকাল থেকেই মল্লিকার মনটা কেমন করছিল। মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, আর ঝোড়ো হাওয়া। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, আজই মোহনদাসের সঙ্গে মোকাবিলার দিন—অথবা, মোকাবিলার রাত। আর হলও ঠিক তাই।

পাঁচটার পর মোহনদাস জোয়ারদার একগাদা টাইপের কাজ চাপিয়ে দিয়েছে মল্লিকার ওপরে। তারপর, সাতটার সময়, যখন ক্লাস হয়ে গেল, ছাত্র-ছাত্রীরা সব চলে গেল একে-একে, তখন মোহনদাস মল্লিকাকে ওর ভেতরের প্রাইভেট অফিসে ডেকেছে ডিক্টেশান দেওয়ার জন্য। গোটা অফিসে তখন ওরা দুজন, আর দারোয়ান-কাম-সিকিওরিটি গার্ড মনোজিৎ। একটু পরেই মোহনদাস 'একমিনিট আসছি।' বলে উঠে গেছে এবং একমিনিট বা ষাট সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার আগেই ফিরে এসেছে।

মল্লিকা আন্দাজ করতে পেরেছিল, মোহনদাস মনোজিৎকে ছুটি দিয়ে এল। আর তখনই ওর বুকের ভেতরে কেউ টিপটিপ করে কিল মারতে শুরু করেছিল। কিন্তু মল্লিকা ঠিক প্রকৃত অর্থে ভয় পায়নি। সেটা পেয়েছে এখন, একটু আগে। আগের চারটে মেয়ের করুণ অবস্থার কথা মল্লিকা এখন আরও ভালো করে বুঝতে পারছে। ওদের জন্য এক অদ্ভুত দুঃখ আর মমতা উথলে উঠছিল মল্লিকা মনে। এমন কী নিজের জন্যও।

ওই চারজন মেয়ের ঘটনা নিয়ে হইচই কম হয়নি। ব্যাপারটা নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ-সমিতি'-ও অনেক মিটিং-মিছিল করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি। মল্লিকা খবরের কাগজে এই ঘটনার প্রত্যেকটি রিপোর্ট খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছে। আর তখন থেকেই মোহনদাস জোয়ারদার নামের এই লোকটার ওপরে ওর বিজাতীয় এক রাগ আর আক্রোশ তৈরি হয়েছে। মল্লিকার তো আর কিছু হারাবার ভয়ডর নেই। সুতরাং ও সটান বেলঘরিয়ার আস্তানা থেকে একদিন চলে এসেছে রাজা রামমোহন সরণিতে, 'পশ্চিমবঙ্গ নারী কল্যাণ সমিতি'-র ছোট্ট অফিসে। সেখানে ও দেখা করেছে সেক্রেটারি বেলা সরকারের সঙ্গে।

ড্যাম্প ধরা ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু, মাদার টেরেজা, ইন্দিরা গান্ধী আর কিরণ বেদির ছবি। এদিকে-ওদিকে কিছু ঝান্ডা আর পোস্টার। ঘরের কোণে আঠা-রং-তুলি। দুটো বেঞ্চে দুজন মহিলা বসে রয়েছে।

বেলা সরকার একটা বড় টেবিল সামনে রেখে বসেছিলেন। তাঁর বয়েস হয়েছে, চোখে চশমা, পোড়খাওয়া মুখ, সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই।

মল্লিকা ওঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চেয়েছে। সুতরাং বেলা সরকার নরম গলায় কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন দুই সদস্যাকে। ওরা সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মল্লিকা বুঝতে পেরেছিল, 'বেলাদির' নির্দেশ সহজে অমান্য করা যায় না।

মল্লিকা নিজের আক্রোশের কথা জানিয়েছিল বেলা সরকারকে। বলেছিল, 'দিদি, মোহনদাস জোয়ারদারকে আমি শায়েস্তা করতে চাই।'

বেলাদি অবাক হয়ে বলেছেন, 'তুমি—তুমি কেমন করে পারবে! সমিতি থেকে লড়াই করে আমরাই কিছু করতে পারলাম না...।'

'আমি পারব!' জেদের গলায় বলেছে মল্লিকা।

বেলা সরকার অবাক চোখে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখছিলেন। একে কবজায় পেলে মোহনদাস কিছুতেই ছাড়বে না—চোখের পলকে গতি করে দেবে। সুলক্ষণা নামের মেয়েটা কীভাবেই না নাস্তানাবুদ হয়েছে! এবার এই মেয়েটা হেনস্থা হতে চায়—সাধ করে!

বেলা সরকারের কোনও বারণই শোনেনি মল্লিকা। শুধু বলেছে, 'আপনি আমাকে একটা সুযোগ দিন, প্লিজ। আপনাদের না-জানিয়েও আমি যেতে পারতাম...কিন্তু পরে যদি কোনও পুলিশি ঝঞ্ঝাট হয়, সেইজন্যে আপনাদের জানিয়ে কাজে নামতে চাই। আপনারা তখন আমার পেছনে দাঁড়াবেন। দাঁড়াবেন তো?'

মেয়েটার কথায় কী যেন ছিল। বেলা সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিলেন। মল্লিকাকে ওঁর কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছিল। কোথায় যে দেখেছেন মেয়েটার মুখ!

মল্লিকা কাজে নামার আগে আরও দু-দিন বেলাদির সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেছিল। তারপর সোজা মোহনদাস জোয়ারদারের দপ্তরে।

কিন্তু শায়েস্তা করতে যুদ্ধে নেমে এ কী করুণ অবস্থা মল্লিকার! বারবার বুড়ি মায়ের কথা মনে পড়ছে। চোখ ফেটে জল আসছে। বাইরে বাজ পড়ার শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠছে ও।

ভয়ার্ত চোখে মোহনদাসকে দেখল মল্লিকা। ফরসা, টিকলো নাক, মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, গাল দুটো সামান্য ফোলা। চোখে রিমলেস চশমা। বয়েস কত হবে? বড়জোর পঁয়তাল্লিশ। দেখে কে বলবে সুশ্রী ভদ্র এই মানুষটার খোলসের ভেতরে একটা অমানুষ লুকিয়ে আছে!

মোহনদাস তখন আবার গুনগুন করে গান ধরেছে: 'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়, চুনরি কে নিচে কেয়া হ্যায়...।'

সুর ভাঁজতে-ভাঁজতেই গ্লাস-বোতল ইত্যাদি আবার ক্যাবিনেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল মোহনদাস। চোখ থেকে চশমা খুলে রেখে দিল ক্যাবিনেটের ওপরে। তারপর আবার এসে বসল সোফায়। গদির ওপরে হাতের চাপড় মেরে বলল, 'এসো, আর দেরি কোরো না...

তোমাকে তো আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। এসো, এসো—তোমার কোনও চিন্তা নেই—এটা সোফা নয়, সোফা-কাম-বেড।' বিশ্রীভাবে হাসল, গদিতে আলতো করে তিনটে চাপড় মেরে বলল, 'সোফা মানে তো জানোই। আর কাম কিংবা বেডও তোমার নিশ্চয়ই জানা। কাম, কাম...ফালতু ঝামেলা কোরো না, লক্ষ্মীটি—' সোফা থেকে উঠে আর কলকব্জা নেড়ে পিঠের গদিটাকে পেতে দিল মোহনদাস, বলল, 'সোফার কাজ শেষ। এখন শুধু কাম আর বেডের ব্যাপার...'

হঠাৎই মল্লিকার বুকের ভেতরে সমস্তরকম ঝড়-ঝঞ্ঝা থেমে গেল। চোখের কোণে জল থাকলেও বুকের গভীরে উথালপাথাল আর নেই। সাপ যখন ছোবল মারবেই তখন আর কীসের ভয়।

প্রতিশোধের কথা মনে পড়ছিল মল্লিকার, মনে পড়ছিল ওই চারটে মেয়ের কথা। আর একটু পরেই মল্লিকা ওদের দলে যোগ দেবে। তারপর? তারপর সত্যিই কি ক্ষান্ত হবে মোহনদাস? মল্লিকা কি পারবে লোকটার বিষদাঁত ভেঙে দিতে?

মল্লিকা অবাক হয়ে দেখল, ও ধীরে-ধীরে মোহনদাসের সোফা-কাম-বেডের দিকে এগিয়ে চলেছে—সাপের চোখের টানে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। তবে মল্লিকার শরীরটা এক স্থির কম্পাঙ্কে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। আর কান্না অথবা গোঙানির একটা আওয়াজ পা টিপে-টিপে উঠে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে। কিন্তু মল্লিকা দাঁতে দাঁত চেপে শব্দটাকে বন্দি রেখে দিয়েছে গলার ভেতরে।

মল্লিকাকে বেশিদূর এগোতে হল না। অধীর উত্তেজিত মোহনদাস নিজেই উঠে এল সোফা-কাম-বেড থেকে। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একেবারে জাপটে ধরল মল্লিকাকে। মল্লিকা যে সামান্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল সেটা বোধহয় প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বশে। কারণ, ওর চোখে তখন কোনও দৃষ্টি ছিল না, হৃৎপিণ্ডে কোনও শব্দ ছিল না, ফুসফুসে কোনও বাতাস ছিল না। একটা কোমল মৃতদেহ যেন আত্মসমর্পণ করল মোহনদাস জোয়াদারের হাতে।

ঘরে টিউব লাইট জ্বলছিল। সেই ঝকঝকে আলোতেই মল্লিকার জামাকাপড় ধরে বেপরোয়া টানাটানি শুরু করে দিল মোহনদাস। আর একইসঙ্গে মল্লিকাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে চলল সোফা-কাম-বেডের দিকে। বলল, 'রুকমিনি, রুকমিনি, শাদি কে বাদ কেয়া কেয়া হুয়া...হাঃ, হাঃ, উঁ-উঁ-উঁ—'মল্লিকার গলার খাঁজে মুখ ঘষতে-ঘষতে আরও বলল, 'ফুল ছাড়াই ফুলশয্যা করছি বলে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি...' মোহনদাসের মুখ থেকে হুইস্কি মেশানো বাতাস বেরিয়ে এল।

মল্লিকা আর বাধা দিচ্ছিল না। ওরা পৌঁছে গেল শয্যায়। উজ্জ্বল আলোয় জীবনে এই প্রথম সম্পূর্ণ নগ্ন হল মল্লিকা। মোহনদাস নিজের পোশাক ছিঁড়ে-টিড়ে কোনওরকমে খুলে একেবারে হামলে পড়ল মল্লিকার শরীরের ওপরে।

ঘরের টিউব লাইটটা এ-দৃশ্য হয়তো বহুবার দেখেছে, কিন্তু মোহনদাসের জানোয়ারের মতো আচরণে সে-ও একবার কেঁপে উঠল। আর বাইরের বৃষ্টি যেন নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মাথা কুটে মরতে লাগল বাইরের দেওয়ালে, জানলার শার্সিতে।

আর ঠিক তখনই অদ্ভুত কান্না একেবারে ভাসিয়ে দিল মল্লিকাকে।

মোহনদাস জোয়ারদার মল্লিকার কান্না খেয়াল করেনি। কারণ মল্লিকা কাঁদছিল প্রায় নিঃশব্দে—শুধু ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠছিল। মোহনদাস অর্ধেক চোখ বোজা অবস্থায় সেটাকে মল্লিকার সুখের সংকেত বলে ভুল করল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ওর আদরের

তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। ব্যাট করার আনন্দে খেলার নিয়ম-কানুনের ব্যাপারটা মোহনদাসের আর খেয়াল ছিল না।

খেলা যখন শেষ হল মল্লিকা তখনও কাঁদছে। এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চলছিল ওর মনের ভেতরে। কাজটা কি ঠিক হল? শাস্তির পরিমাণটা পাপের তুলনায় বেশি হয়ে গেল না তো! ও চারটে অসহায় মেয়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মন থেকে দুঃখবোধটা মুছে যাচ্ছিল না। মোহনদাস যখন ওকে ছেড়ে দিল, তখনও ওর চোখে জল।

মোহনদাস ক্লান্তভাবে নিজের পোশাক ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, আর সতর্ক চোখে দেখছিল মল্লিকাকে। মেয়েটা দারুণ! কিন্তু হঠাৎ করে কোনও পাগলামি করে বসবে না তো! বেশ মনে আছে, অনুশ্রী না তনুশ্রী নামের বছর পঁয়ত্রিশের মেয়েটা সবকিছু মিটে যাওয়ার পর হঠাৎই ঘরের টেবিল থেকে একটা পেন-স্ট্যান্ড তুলে নিয়ে ক্ষিপ্তের মতো আক্রমণ করেছিল মোহনদাসকে। কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। মোহনদাস সতর্ক তো ছিলই, তা ছাড়া ওর গায়ে জোরও যথেষ্ট। প্রচণ্ড থাপ্পড়ে মেয়েটাকে কাহিল করে দিয়েছিল মোহনদাস।

কাঁদতে-কাঁদতেই শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পরে নিল মল্লিকা। টিউব লাইটের আলোয় ওর দু-গাল অশ্রুতে চকচক করছিল।

মোহনদাস বিরক্ত জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হল, এখন আবার কাঁদছ কেন? কান্নার কী আছে?'

মল্লিকা ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'আপনার জন্যে কাঁদছি।'

বাইরে বৃষ্টির তেজ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল পলকে। কোথাও বাজ পড়ল কান-ফাটানো শব্দে।

ব্যঙ্গের একটুকরো হাসি তেরছাভাবে ছড়িয়ে গেল মোহনদাসের মুখে: 'কেন, হঠাৎ আমার জন্যে দুঃখু হচ্ছে কেন?'

মল্লিকা শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে সেটা দিয়ে চোখ-গাল মুছে বলল, 'আপনি আর নেই বলে—।'

'কী যে সব উলটো-পালটা কথা বলো!' সোফা-কাম-বেড থেকে উঠে দাঁড়াল মোহনদাস জোয়ারদার। ক্যাবিনেটের ওপরে রাখা চশমাটা চোখে দিয়ে মল্লিকাকে কাছে ডাকল: 'এসো, এদিকে এসো। আর-একটু আদর করি। তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। দেখলে তো, একটু-আধটু বুলবুলি করে তোমার লাইফ একটুও নষ্ট হয়নি! আরে বাবা, একি ঘটি-বাটি যে টোল খেয়ে যাবে!'

মল্লিকা পিছিয়ে গিয়েছিল ঘরের এককোণে রাখা একটা টেবিলের কাছে। আলোর দিকে পিঠ করে দাঁড়ানোয় ওর মুখটা আবছা দেখাচ্ছিল। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে শক্ত গলায় মল্লিকা বলল, 'আমি লক্ষ্মী নই—অলক্ষ্মী। তা ছাড়া আমার লাইফ বলে কিছু থাকলে তবে তো আপনি নষ্ট করবেন। তখন ভয় পেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতো কথা বলেছি। আসলে আমি আপনার কাছে চাকরি নিয়েছিলাম আজকের দিনটার জন্যে। আপনি যে একটার-পর-একটা মেয়ের সর্বনাশ করে যাচ্ছিলেন, সেটা রোখবার জন্যে...আর আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে।'

'শায়েস্তা! আমাকে!' বেশ জোরে হেসে উঠল মোহনদাস।

কিন্তু মল্লিকার কানে হাসিটা ফাঁপা শোনাল। ও বলল, 'খুব খারাপ লাগছে, জানেন—' আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিল মল্লিকা: 'কিন্তু কী করব! আমার তো আর কোনও উপায় ছিল না—?'

'তুমি কী করেছ আমাকে?' চাপা কর্কশ গলায় মোহনদাস কথা বলল।

মল্লিকা ঘাড় ঘুরিয়ে অদ্ভুত চোখে দেখল মোহনদাসকে। হেসে বলল, 'এখনও বোঝেননি? আপনার না আই, কিউ. ভীষণ কম। এইডস-এর নাম শুনেছেন?'

মোহনদাস জোয়ারদারের চোখের সামনে গোটা ঘরটা দুলে উঠল। এইচ.আই.ভি., এইডস—কাগজে এ-নিয়ে কত লেখালেখি চলেছে গত কয়েকবছর ধরে। মেয়েটা কি সত্যি বলছে, না মিছিমিঠি ভয় দেখাচ্ছে? মোহনদাসের শরীরের ভেতরে কতকগুলো অশরীরী পোকা যেন কিলবিল করে উঠল। ও এপাশ-ওপাশ তাকাল অসহায়ভাবে। আবার বসে পড়ল সোফায়। আমতা-আমতা করে বলল, 'তুমি...তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। ঠাট্টা করছ।'

মল্লিকার ভীষণ স্নান করতে ইচ্ছে করছিল। মাথায় টিপটিপ ব্যথা আর গা-বমি ভাব। ও সোফায় বসে থাকা লম্পট জানোয়ারটাকে দেখছিল। ওটার দাঁত-নখ আর নেই। সব খতম। মল্লিকার কেমন যেন মায়া হল। বলল শান্ত নরম গলায়, 'না, ভয় দেখাচ্ছি না। আপনার অবস্থাটা এখন ঠিক কীরকম জানেন? ধরুন, সাঁতার জানে না, এমন একজন লোক হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিল গঙ্গায়। হিসেবমতো জলে ডোবার পর কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেয়ে তারপর লোকটা মারা যাবে। ওর ফুসফুসে বাতাসের বদলে হুহু করে ঢুকে পড়বে গঙ্গার জল। তারপর একসময় বেচারা মরবে।'

একটু থামল মল্লিকা। কপাল থেকে চুল সরাল। আয়না দেখার কোনও উপায় নেই। গলার কাছে, গালে সামান্য জ্বালা করছে। শরীরে সামান্য ব্যথা। হাতব্যাগটা রয়েছে রিসেপশান কাউন্টারের ডেস্কের মধ্যে। ওটা পেলে নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিত।

'এ তো গেল ডাক্তারি হিসেব।' মল্লিকা আবার বলতে শুরু করল। এতটা মন খুলে নিজের অসুখের কথা কাউকে বলতে পারেনি ও: 'কিন্তু আমার হিসেব কী বলে জানেন? যে-মুহূর্তে লোকটা ব্রিজের আশ্রয় ছেড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে সেইমুহূর্তেই খতমের খাতায় ওর নাম উঠে গেছে। শূন্যে ভেসে থাকার সময়টুকুই ওর বিচিত্র জীবন—যা থেকেও নেই —অনেকটা মরীচিকার মতো।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মল্লিকা: 'আপনার-আমার জীবনটা এখন তাই। আমার... আমার স্বামী জাহাজে কাজ করত। কোথা থেকে, কোন বিদেশ থেকে, সে এইডস-এর জীবাণু নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। যখন সব জানা গেল, তখন সে-ও শেষ...আর, আমিও—।'

'মল্লিকা, এসব তুমি কী বলছ!' শিশুর মতো অসহায় সুরে কথা বলল মোহনদাস জোয়ারদার। ওর গলার স্বরে আতঙ্ক নিশ্চিত ছাপ ফেলেছে। ও ভাবতেই পারছে না, ওর জীবনটা এখন শুধু মায়া—'আছে' অথবা 'নেই', এই দুইয়ের মাঝখানে দুলছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশের লালচে আভার কথা মনে পড়ল মোহনদাসের। সেতারের তারে শেষবারের মতো টান মেরে সেতারি যখন চলে যায়, তখন সেই সুরের রেশ কী চেষ্টাই না-করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে! মোহনদাসের বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠল। একটু আগেই ওর জীবন কী সম্পূর্ণ ছিল! আর এখন...সব ফাঁকা!

মল্লিকা তখন আপনমনেই বিড়বিড় করে নিজের কথা বলে যাচ্ছে: '...আমার স্বামীর প্রথম ফ্লু মতো হয়েছিল। তারপর জ্বর, গলা ব্যথা। আর দেখতে-দেখতে, বছরখানেকের মধ্যে, সব শেষ।...কিন্তু আমি রয়ে গেলাম...হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়া ওই মানুষটার মতো...শূন্যে...এখনও গঙ্গা ছুঁতে পারিনি।'

পায়ে-পায়ে মোহনদাসের কাছে এগিয়ে এল মল্লিকা: '...গত বছর কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছিল। আপনি বোধহয় ছবিটা খেয়াল করেননি। অবশ্য কেই-বা খেয়াল করে! জানেন, অসুখটা হওয়ার পর এটা নিয়ে কত খোঁজখবর করেছি, কতবার সুইসাইড করার কথা ভেবেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আমি মরে গেলে আমার বুড়িমা-টাকে যে দেখার কেউ নেই!' হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল মল্লিকা। এমনভাবে বারবার মুখে হাত বোলাতে লাগল যেন অদৃশ্য কতকগুলো মাছি ঘনঘন বসছে ওর মুখের ওপরে: 'আপনি হয়তো জানেন না, এইডস ছড়ালে ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ২৬৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাতে ছ-মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। আবার ২৭০ নম্বর ধারায় এ-জাতীয় রোগ ছড়ালে দু-বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে, ফাইন হতে পারে, এমন কথাও লেখা আছে।' হাসল মল্লিকা—তেতো হাসি, বলল, 'এসব আইনই হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, প্লেগের কথা ভেবে। তবে প্লেগের বদলে লেখা হয়েছিল বিপজ্জনক কোনও সংক্রামক অসুখ। এখন তো এইডস এসেছে...আর, প্লেগও একবার উঁকিঝুঁকি মেরে গেছে।...কিন্তু শাস্তির ভয় আমার থাকবে কী করে! ফাঁসির আসামি কখনও জেলের ভয় পায়! তা ছাড়া আমি তো আপনাকে শায়েস্তা করতে এসেছিলাম।'

হঠাৎই মোহনদাস হাউহাউ করে ভাঙা গলায় কাঁদতে শুরু করল। জড়ানো গলায় কীসব বলতে লাগল কে জানে!

মল্লিকা শাড়ি-টাড়ি ঠিকমতো গুছিয়ে নিল শেষবারের মতো। মুখে আঁচল ঘষল কয়েকবার। তারপর বলল, 'নিন, এবার দরজা খুলে দিন...আমি বাড়ি যাব...মা চিন্তা করবে।' একটু হেসে: 'নাকি আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন?'

আচমকা মল্লিকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনদাস জোয়ারদার। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে-করতে টিপে ধরল মল্লিকার গলা। লোকটার মুখ থেকে জন্তুর মতো শব্দ বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে মদের গন্ধ।

মল্লিকা প্রাণপণে বাধা দিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'কী ছেলেমানুষি করছেন! আপনি বুঝতে পারছেন না, আমরা দুজনে কেউই আর ঠিকমতো বেঁচে নেই। আপনি আমাকে খুন করতে চান করুন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। একটা মড়া আর একটা মড়াকে খুন করলে কার কী আসে যায়—' ধস্তাধস্তি করতে-করতেই হাসি পেয়ে গেল মল্লিকার। ও হেসে উঠল শব্দ করে।

মোহনদাস কেমন যেন হতভম্ব হয়ে ছেড়ে দিল মল্লিকাকে। লোকটার ফরসা মুখ নীলচে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, প্রথম সুযোগেই কি এইচ. আই. ভি. বাসা বাঁধে শরীরে? মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজল মোহনদাস। ওর শরীরের সব শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। ও সম্মোহিতের মতো প্রাইভেট অফিসের দরজা খুলে দিল। ভয়ঙ্কর সুন্দরী মেয়েটা সহজ পা ফেলে বেরিয়ে গেল বাইরে। মোহনদাসকে রেখে গেল শূন্যে—হাওড়া ব্রিজ আর গঙ্গার মাঝখানে।

তুমুল বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল মল্লিকা। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল, মোহনদাসের হাতে হেনস্থা হওয়া চারটে মেয়ের কথা। ওদের কথা

ভাবতে-ভাবতে মল্লিকা নিজের ভেসে থাকা জীবনের একটা মানে খুঁজছিল।

ছলাবউ কলাবউ

সত্যি বলছি স্যার, বউটা আমার যাকে বলে একেবারে স্পেশাল ছিল। 'ছিল' মানে পাস্ট টেন্স। আমাদের ভগবান লোকটা বড় মজার। একদিনের মধ্যে আমার ডাগর সোমত্ত বউটাকে প্রেজেন্ট টেন্স থেকে পাস্ট টেন্স করে দিল। কী বললেন? না, স্যার—সত্যি বলছি—আপন গড, ঋতুপর্ণাকে আমি খুন তো দূরের কথা, ছুঁইনি পর্যন্ত। ছুঁইনি মানে ক্ষতি করার জন্যে ছুঁইনি। ওই আদর-টাদর করার সময় ছুঁতে হয়েছে। না ছুঁয়ে আবার আদর করা যায় না কি!

দুঃখের কথা কী জানেন? বউটা স্বর্গলোকে গিয়েও আমাকে রেহাই দিল না। ওর জন্যেই আমাকে আপনাদের এই থানায় আসতে হল—থানা দেখতে হল, আবার শ্মশানও দেখতে হবে। সবই আমার কপাল!

ঋতুপর্ণা ছিল ভারি অদ্ভুত। প্রবল ঋতুমতী। পুরুষগুলো বোধহয় ওর গন্ধ পেত। সবসময় ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করত। তবে ও বেশিরভাগ সময়েই লোকগুলোকে পাত্তা দিত না। অবশ্য ওদের একেবারে বিদেয় করতেও চাইত না। কারণ, ওরা চলে গেলেই তো ঋতুর বাজারদর পড়ে যাবে।

যখন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তখন আমাদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাই ভেবেছিল, কোষ্ঠীর ছকের কী দারুণ মিল। বিয়ে তো নয়, যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বিয়ের পরে-পরেই আমার বিধবা পিসিমা ঋতুকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, আহা, বউ তো নয়, কলাবউ!

শুনে আমি তো স্যার বেশ তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। দুগগাপুজোর সময় কলাবউ দেখে আসছি সেই বাচ্চা-বয়েস থেকে। তা কলাবউ বলতে লালপেড়ে সাদা শাড়ি আর একহাত ঘোমটা—শুধু এইটুকুই বুঝি। কাপড় খুললে তো স্রেফ কলাগাছ! ঋতুর সঙ্গে কলাবউয়ের মিলটা কোথায় কে জানে!

তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি ঋতুপর্ণা কী জিনিস। সত্যি, আমার পিসিমা জ্যোতিষী ছিলেন, স্যার। ঋতু তো শুধু কলাবউ ছিল না—একেবারে ছলাবউ কলাবউ। এত ছলাকলা জানে—মানে, জানত। ওরও সেই আধহাত ঘোমটা দেওয়ার অভ্যেস ছিল—গুরুজন বা বাইরের লোকের সামনে—ঠিক যেন কলাবউ। কিন্তু ওই ঋতুই আবার আধহাত ঘোমটার নীচে সাতহাত খ্যামটা নাচত। আর কাপড় খুললে কলাবউয়ের মতো শুধু কলাগাছ তো নয়, একজোড়া মোচা তার সঙ্গে ফ্রি।

তবে ওই মোচাই সার—কলাটলা কখনও হয়নি। সে ওর জন্যে, না আমার জন্যে, তা জানি না। আমার কলাবউ নামেই কলাবউ—ফলের বেলায় কাঁচকলা। কিন্তু স্যার তা নিয়ে

কোনও দুঃখ ছিল না আমার। শুধু মাথার ভেতরে মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলে উঠত। ঋতুর কাণ্ডকারখানা দেখতাম, একা-একা ঘরময় ঘুরে বেড়াতাম, আর মাথার ভেতর দুনিয়াটা চড়চড় করে জ্বলত, পুড়ত।

এই করে স্যার দশটা বচ্ছর কাটল—দশটা বচ্ছর! আমি অফিস যাই, ফিরে আসি। ঋতু ওর বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকে, আমাকে যেন স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না। শুধু মাঝে-মাঝে মাঝরাতে কলাগাছে জ্বালা ধরলে আমার হাত ধরে টানাটানি করে, আঁচড়ে-কামড়ে দেয়। শাস্ত্র আমাদের মিথ্যে বলেনি, ইন্সপেক্টরসাহেব। ঋতু ছিল একেবারে হস্তিনী টাইপের। আর হাতির সঙ্গে কলাগাছের রিলেশান তো সব্বাই জানে।

তো একদিন—তা কতদিন হবে? বোধহয় বছরখানেক আগে—ঋতু বাড়ি ফিরল টিপসি হয়ে। আমি দরজা খুলতেই আমাকে 'ডার্লিং' বলে একেবারে জাপটে ধরে 'চকাৎ' 'চকাৎ' করে হাফডজন চুমু খেল। আমার ভীষণ ঘেন্না করছিল, গা রি-রি করছিল। আর মাথার ভেতরে ধুনিটা তখনও জ্বলছিল।

হঠাৎ করে কী যে হয়ে গেল! সেই ধুনিটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের লাল জিভগুলো লকলকিয়ে উঠল। এক ধাক্কা দিয়ে ছিটকে দিলাম ঋতুকে। সত্যি বলছি, ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি গলা টিপে ওকে খতম করে দিই। কিন্তু না। আমি নির্বিরোধী ছাপোষা মানুষ। কাউকে খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, স্যার। যদি আমিই ঋতুকে কাল রাতে খুন করেছি বলে আপনি ভেবে থাকেন, তবে সেদিনই তো ওকে আমি খতম করে দিতে পারতাম। সত্যি বলছি স্যার, খুনের কথা শুনলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। তাই সেদিন ঋতুকে কিচ্ছু বলিনি। বড়লোকের ইংরেজি-জানা ফুরতি-ফারতা বাঁজা বউ পার্টি-ফার্টি করে একটু-আধটু মাল খেয়ে ফিরবে এ আর আশ্চর্য কী!

না, ওকে কিছু বলিনি। তবে ওই যে বললাম, মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। তাই সেটা নেভানোর জন্যে অন্য একটা কেলেঙ্কারি করে ফেললাম। তার জন্যে মার্জনা চাইছি, স্যার।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলছি। আমরা—মানে, আমি আর ঋতু—দু-জোড়া বদরি পাখি পুষতাম। না, এখন আর একটাও নেই—সব কটা মরে গেছে। শুধু হা-হা খাঁচাটা পড়ে আছে। তো সেদিন রাতে মুরগির মাংস রান্না করেছিল অতসী—আমাদের রান্নার লোক। ডাইনিং-টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ছিল রাতের খাবার। একটা গোলাপি রঙের কারুকাজ করা বড় চিনেমাটির বাটিতে ঢাকা দেওয়া ছিল গরম মুরগির ঝোল। কী বলছেন? মুরগির মাংসের সঙ্গে বদরি পাখির কী রিলেশান? আছে, আছে—আর-একটু বললেই বুঝতে পারবেন।

ঋতুর ওই কাণ্ডের পর আমার মাথার ভেতর কী যেন একটা হয়ে গেল। টেবিল থেকে গরম মাংসের পাত্রটা তুলে নিয়ে চলে গেলাম একটু দূরে, ঘরের এককোণে রাখা বদরি পাখির খাঁচার কাছে। মাংসসমেত গরম ঝোল হুড়হুড় করে ঢেকে দিলাম মাখনরঙের পাখিগুলোর গায়ে। তারপর চিনেমাটির পাত্রটা ধরে মেঝেতে এক আছাড়।

পাখিগুলো কিচিরমিচির করে ছটফটিয়ে উঠল। দুটো পাখি গরম মাংসের ঝোলে স্নান করে নেতিয়ে পড়ল। আর ঋতু ওই টিপসি অবস্থাতেই এক চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি কিন্তু ওকে একটি কথাও বলিনি।

ওর চিৎকারে যখন সামনের ফ্ল্যাটের বনমালীবাবু আর তাঁর হোঁতকা স্ত্রী ছুটে এলেন আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়, তখন আমি বললাম যে, অসাবধানে আমার হাত থেকে

মাংসের পাত্রটা পাখির খাঁচার ওপরে পড়ে গেছে। আর ঋতু তো একটু নার্ভাস টাইপের, তাই…।

ওঁরা ভদ্রতা দেখিয়ে দু-চারটে কথা বলে চলে গেলেন।

ব্যস, সেদিন থেকেই আমার প্রতিবাদের শুরু। তবে সবসময় যে ভেবেটেবে কিছু করতাম তা নয়। যেমন একদিন হঠাৎ করে কী খেয়াল চাপল, বাজার থেকে একটা জ্যান্ত মুরগি কিনে নিয়ে এলাম। ওটা দেখে ঋতু ঠাট্টা করে বলল, কী ব্যাপার, বাড়িতে কি পোলট্রি খুলবে নাকি? আমি কোনও জবাব না-দিয়ে শুধু হাসলাম।

তারপর, সেদিন রাতে, মুরগিটাকে আমাদের শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলের পায়ার সঙ্গে একটা হাতচারেক লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। ওটা ঘরের মেঝেতে দিব্যি চরে বেড়াতে লাগল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঋতু তো রেগে আগুন। বলল, এসব কী পাগলামি শুরু করেছ! আমি বললাম, হানি, আসল পাগলামি তো এখনও শুরু হয়নি। দ্যাখো না, কীরকম মজা হবে। ও হ্যাঁ, আজ ডক্টর আহুজার পার্টি কেমন জমল? ঋতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের নীচে কী একটা মোলায়েম মলম মাখতে-মাখতে বলল, ইট ওয়াজ আ ফিয়াসকো। একদম গুবলেট।

ওর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি যে ঝুঁকে পড়ে খাটের তলা থেকে আমার হকিস্টিকটা বের করে নিয়েছি, সেটা ও প্রথমে ঠিক খেয়াল করেনি। ছেলেবেলায় এই হকিস্টিকটা নিয়ে আমি স্কুলের মাঠে হকি খেলতাম।

তো হকিস্টিকটা আমার হাতে দেখে ঋতু মলম লাগানো বন্ধ করে আয়নার মধ্যে দিয়ে চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, আমার হকিস্টিক বাগিয়ে ধরার জঙ্গি ভঙ্গি দেখে ও ভয় পেয়েছে।

না, না, ইন্সপেক্টরসাহেব, হকিস্টিক দিয়ে ওকে একটুও মারিনি। আপনিও ঠিক ঋতুর মতোই আমাকে ভুল বুঝলেন। ঋতুকে অবাক করে দিয়ে আমি হকিস্টিক চালাতে শুরু করলাম মুরগিটার ওপরে।

ওটা ডানা ঝাপটে 'কঁক-কঁক' শব্দ করে এদিক-ওদিক পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পালাবে কোথায়! পায়ে তো দড়ি বাঁধা! প্রথম দুটো হিট আমি মিস করলাম, তবে তিন নম্বরটা সোজা গিয়ে লাগল মুরগিটার পাঁজরে। একটা 'ওঁক' শব্দ করে ওটা ছিটকে গেল শূন্যে, কিন্তু দড়িতে টান পড়তেই মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে। আর তখন আমি ঋতুর চোখের সামনেই ওটাকে পাগলের মতো পিটতে শুরু করলাম—যেমন করে ধোপারা মুগুর দিয়ে কাপড় কাচে।

ঘরের মেঝেটা একেবারে যা-তা হয়ে গেল। পালক, রক্ত, মাংস, চটচটে নোংরা—সব একেবারে মাখামাখি। আমার মাথার ভেতরে বিকট স্বরে কতকগুলো দাঁড়কাক ডাকছিল। সেইজন্যেই বোধহয় ঋতুর চিৎকার আমি শুনতে পাইনি। আমি ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে লেপটে বসে পড়েছিলাম। অল্প-অল্প হাঁফাচ্ছিলাম। হকিস্টিকটা তখনও হাতে ধরা। সেই অবস্থায় কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আমি ঋতুর দিকে তাকালাম।

ওর মুখচোখ ফ্যাকাসে। বয়েসটা যে ভালো জায়গায় নেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

একটু পরে ও গালিগালাজের তুবড়ি ছোটাল। আমি যে একটা পাগল, জানোয়ার, অমানুষ—সে-সব বিস্তারিতভাবে আমাকে জানাল। অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখ চলল।

তারপর যখন বলল, আমাকে পুলিশে দেবে, তখন আমি হেসে বললাম, ডার্লিং, মুরগিটার বদলে যদি তোমার এই হাল করতাম, তবে তুমি—বা অন্য কেউ—পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারতে! মুরগি পিটিয়ে মারলে সেটা দোষের নয়।

আপনিই বলুন, স্যার, আমি কি ভুল বলেছি?

ঋতু সে-রাতে অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিল, যা-নয়-তাই বলে গালিগালাজ করেছিল আমাকে, কিন্তু আমি একটি কথাও বলিনি।

ঘরটা পরিষ্কার করার সময় আঁশটে গন্ধে ঋতু বমি করে ফেলেছিল। আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদ-তারা দেখছি, আর ছেলেবেলার কথা ভাবছি।

এখন তো বুঝতেই পারছেন, ইন্সপেক্টরসাহেব, খুন করার হলে সেদিনই ওকে আমি খুন করে ফেলতাম। কিন্তু আপনাকে তো বারবার বলেছি, ঋতুর গায়ে কোনওদিন একটা আঁচড় পর্যন্ত আমি কাটিনি। যা কিছু আঁচড় কেটেছি সবই নিজের গায়ে।

তো এমনি করেই চলতে লাগল। আমি যখন খুশি নিজের গায়ে আঁচড় কাটি, আর ঋতু দ্যাখে। আর তখন থেকেই একটু-একটু করে ও পালটাতে শুরু করেছিল। না, না—ওর পার্টি-ফার্টি ছাড়েনি। পালটাতে শুরু করেছিল মানে আমার সঙ্গে কম কথা বলত। এমনকী মাঝে-মাঝে যে গলা ছেড়ে গান গাইত, সে-ও বন্ধ হয়ে গেল, স্যার।

কী বললেন? আমি আর কী করেছিলাম? দাঁড়ান, বলছি! একগ্লাস জল খাওয়াবেন? ওঃ—এবার শুকনো গলাটা একটু জুড়োল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একদিন রাতে—সেদিন ঋতু বাড়ি থেকে বেরোয়নি—ও বিছানায় বসে কী একটা ইংরাজি বই পড়ছিল। ওর কোন এক রীতেনদা আছে—সে নাকি ওকে বইটা পড়তে দিয়েছে। দারুণ বই নাকি। এরকম যে ওর কত 'দাদা' আছে!

আমি ঋতুকে জিগ্যেস করলাম, রাতে কী-কী আছে। মানে, অতসী কী-কী রান্না করেছে। বিয়ের পর প্রথম-প্রথম এরকম প্রশ্ন করলে ঋতু বলত, তুমি কী-কী খাবে বলো। ভাত আছে, ডাল, ইলিশমাছ ভাজা—আর আমি। তখন স্যার আমার রাতের খাওয়া-দাওয়ার লিস্টে লাস্ট আইটেম ছিল ঋতু। ওরও তাই। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরকম খাওয়া-খাওয়ি চলত। তবে ব্যাপারটাকে ওরাল সেক্স ভাববেন না, স্যার। বরং প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল মরাল সেক্স।

তো সেদিন ও কী-কী বলেছিল আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, লাস্ট আইটেমটা বাদ ছিল।

রাতে খেতে বসেছি, এমনসময় একটা ফোন এল। ঋতু উঠে গিয়ে ফোন ধরল। রীতেনদার ফোন। বইটা কেমন লাগছে? হি-হি-হি-হি। বলেছিলাম না, দারুণ। খুব ডিপ ব্যাপার। আপনিও তো খুব ডিপ মানুষ, রীতেনদা। তো দশ মিনিট ধরে দুজনে মিলে হা-হা-হি-হি করে এইরকম ডেপথ চর্চা চলতে লাগল।

ব্যস। আবার সেই ধুনির আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথায়। দাঁড়কাক ডাকতে লাগল 'কা-কা' করে। ঋতু ফোন সেরে খাওয়ার টেবিলে ফিরে আসতেই আমি বললাম, এসব খেতে আর ভালো লাগছে না। ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে? আমি বললাম, মাংস খেতে ইচ্ছে করছে। ঋতু একইরকম চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, এখন মাংস কোথায় পাব!

ব্যস। আমি চোখে পলকে আমার বাঁ-হাতে এক হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলাম। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব, ইন্সপেক্টরসাহেব! কিন্তু আমি কামড় ছাড়িনি। আমার হাতটাকে বোধহয় ঋতুর গলা কিংবা রীতেনের ঘাড় ভেবেছিলাম। আমার মুখ দিয়ে 'গোঁ-গোঁ' শব্দ বেরোচ্ছিল। মাথার সবকটা শিরা ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল বারবার। তবুও আমি কামড় ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত একটুকরো মাংস ছিঁড়ে এল হাত থেকে। আর একেবারে যাচ্ছেতাই রক্তারক্তি কাণ্ড। আমি মেঝেতে পড়ে গলাকাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগলাম আর চিৎকার করতে লাগলাম। ঋতুও চিৎকার করছিল। তারপর ঠিক কী হয়েছে জানি না। আমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, তাই।

এরপর বেশ কিছুদিন ধরে আমার চিকিৎসা চলল। ঋতু দু-তিনরকম ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল আমার জন্যে। তার মধ্যে একজন তো স্রেফ ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়ে চলে যেত, আর কাঁড়িকাঁড়ি প্রশ্ন করত। কিছু মনে করবেন না—ঠিক আপনাদের পুলিশি জেরার মতো। তবে ভীষণ উলটোপালটা প্রশ্ন। যেমন, ছোটবেলায় আমি চুপচাপ থাকতাম কিনা। প্রথম 'ইয়ে' শুরু করেছি কত বছর বয়েসে। লাল রং পছন্দ করি কি না। একা-একা থাকতে ভালো লাগে, না খারাপ লাগে। এইসব ফালতু প্রশ্ন। আপনিই বলুন, কোনও মানে হয়!

ঋতু একটু-একটু করে মনমরা হয়ে যাচ্ছিল। বাইরে বেরোনোটাও বেশ কমিয়ে দিল। আগের চেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে লাগল আমার।

কী বললেন? ঋতুকে ডিভোর্স করিনি কেন? ডিভোর্স করা মানে তো হেরে যাওয়া। আমার মা আমাকে কখনও হারতে শেখায়নি। আর ঋতু আমাকে ছেড়ে চলে যায়নি কেন? হাসালেন। কী করে যাবে! আমার যে অনেক বিষয়-আশয়। টাকার লোভ বড় সাঙঘাতিক জিনিস, স্যার। অনেক মহান মানুষকে দেখেছি টাকার লোভের কাছে কাবু হয়ে যেতে। ঘরে তারা চুরি করে, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে পরোপকারী, মহান সেজে ঘুরে বেড়ায়।

যাই হোক, এরপর তিনবার আমি ক্ষুর দিয়ে আমার বুকে-পেটে-পায়ে দাগ টেনেছি। কাটারি দিয়ে বাঁ-হাতের দুটো আঙুলের ডগা উড়িয়ে দিয়েছি। এই তো, দেখুন না। এই যে—এইসব সেলাই আর দাগ দেখছেন, এইগুলো। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এসবই করেছি ঋতুর চোখের সামনে। না, কেন করেছি জানি না। হয়তো নিজেকে কষ্ট দিয়ে ওকে বদলাতে চেয়েছিলাম। নাকি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছি?

না, স্যার, অতশত ভেবে কিছু করিনি। তবে ওই যে বললাম, আমার মাথার ভেতরে একটা ধুনি জ্বলত সবসময়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঋতুকে আমি খুন করিনি। আমার যে কী অবস্থা তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না, স্যার। আমি না-পারি মারতে, না-পারি মরতে। এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ছটফট করেই গেলাম। আমি নিজেই যেন পায়ে দড়ি বাঁধা একটা মুরগি। ভগবানের মুরগি। আড়ালে থেকে কেউ যেন পাগলের মতো আমাকে হকিস্টিক দিয়ে পেটাচ্ছে...পেটাচ্ছে।

স্যার...স্যার...ঋতুকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কোথায় রেখেছেন আমার বউকে? আমার কলাবউকে একবারটি দেখান না, স্যার। একটিবার ওর মরামুখ দেখতে না-পেলে আমি পাগল হয়ে যাব, একফোঁটা শান্তি পাব না। বিশ্বাস করুন, স্যার, সত্যি বলছি...।

অস্থির কলঙ্করেখা

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আদমের পাঁজর থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন প্রথম রমণী—ইভ। আর সেইমুহূর্ত থেকেই বোধহয় বক্ররেখার বাঁকা অর্থ জন্ম নিয়েছিল। সুতরাং ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা রেখায় যদি আমি নগ্ন তরুণীর লাস্য খুঁজে পাই, তা হলে সে আমার দোষ নয়। তা ছাড়া তারক হালদার সবিস্তারে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সবকিছু। সেইদিন থেকেই ধোঁয়া দেখলে আমি ভয় পাই। বিশেষ করে সিগারেটের ধোঁয়া।

সিগারেটের অগ্নিবিন্দু থেকে সাদা ধোঁয়ার রেখা যখন সাবলীল ভঙ্গিতে শূন্যে ভেসে যায়, তখন মনে হয় কোনও নর্তকী যেন তার বুক-কোমর-নিতম্ব হেলিয়ে দুলিয়ে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ছলাকলা বিস্তার করছে শূন্যে। অন্যায় কলঙ্কের রেখা এঁকে যাচ্ছে আপনমনে।

না, আগে আমার এমনটা মনে হত না। সবকিছুর মূলে ওই তারক হালদার—এক অদ্ভুত বিচিত্র মানুষ। তিনি আমাকে স্পষ্ট করে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, সিগারেট খাওয়া কেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে লেখা ওই বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের আসল অর্থই-বা কী।

তারক হালদারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অনুপম। না, সরাসরি ঠিক পরিচয় করিয়ে দেয়নি। তারক হালদারের একটা ভিজিটিং কার্ড ও আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, 'ট্রাই করে দেখ, এই মানুষটা তোর জীবন একেবারে বদলে দেবে। প্রমিস—।'

অনুপমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। অফিসের মিটিং-এ দিল্লি যাব বলে ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছি। কাচের দেওয়ালের বাইরে ভোরের সকাল। রানওয়ের ওপরে কুয়াশা জমে আছে। তারই মাঝে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে এয়ারবাস। আমাদের দিল্লি নিয়ে যাবে। আমি আনমনাভাবে বসে মৌসুমীর কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম ছেলে তাপসের কথা।

অফিসের কাজে মাসের মধ্যে ছ-সাতবার কলকাতা-দিল্লি করা নিয়ে কাল রাতেও একটু-আধটু ঝগড়া হয়েছে মৌসুমীর সঙ্গে। এমনিতে যে-কোনও ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করাটা মৌসুমীর বেশ পছন্দের। তার ওপর গতকালের বিষয় ছিল 'তাপসের পড়াশোনার ক্ষতি ও পিতার নির্লিপ্ত অবহেলা।' যথেষ্ট গুরুতর বিষয়। সুতরাং আলোচনা বেশ ভালোরকম তাপমাত্রায় পৌঁছেছিল। আমি সাধারণত যাকে 'ঝগড়া' বলি, মৌসুমী তাকেই বলে 'আলোচনা'।

মোল্ডেড প্লাস্টিকের চেয়ারে আরাম করে বসে সেই 'আলোচনা'র অ্যাকশান রিপ্লে করছিলাম মনের পরদায়, অঅর ডানহাতের দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ছিল। এমন সময় আমার পাশে এসে কেউ বসল। আলতো চাপড় মারল কাঁধে: 'কীরে, কেমন আছিস?'

তাকিয়ে দেখি অনুপম। ফিটফাট ঝকঝকে চেহারা। এই পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই বয়েসেও স্বাস্থ্য রেখেছে দারুণ। গত বছরেও ওর চোখে চশমা ছিল। এখন বোধহয় কনট্যাক্ট লেন্স নিয়েছে। ওর মধ্যে আমি ছাত্রজীবনের অনুপম মুখার্জিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ও 'ফর্টি প্লাস' নামে কোনও ট্যাবলেট খাচ্ছে নাকি?

অনুপম ছাত্রজীবনে আমার পাড়ার কাছাকাছি থাকত। দুজন দু-কলেজে পড়লেও ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনাও করেছি। পরে পাশটাশ করে ও 'সেঞ্চুরি পাবলিসিটি' নামের একটা অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি নেয়। এখন 'অ্যাডফোকস' অ্যাড এজেন্সিতে ডেপুটি ম্যানেজার। আর আমি আছি 'ফোর স্কোয়্যার কনসালট্যান্টস'-এ।

চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পরেই অনুপম বিয়ে করে বেলেঘাটার দিকে কোথায় যেন ফ্ল্যাট কিনে চলে যায়। তারপর থেকে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হতই না। হঠাৎ করে বছরদশেক ধরে ওর সঙ্গে আমার এয়ারপোর্টেই বলতে গেলে দেখা হয়। কোম্পানির কাজে ও দিল্লি-বম্বে-মাদ্রাজ করে বেড়ায়। আর আমিও তাই। সুতরাং এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে অথবা প্লেনে বসেই আমাদের সুখ-দুঃখের গল্প হয়। তা ছাড়া দিল্লি-বম্বে-মাদ্রাজে মিটিং-এর পর হাতে সময় থাকলে আমরা আড্ডা মারতে বসি হোটেলে-রেস্তরাঁয় বা কোম্পানির গেস্ট হাউসে।

অনুপমের সঙ্গে একবছর আগে আমার দেখা হয়েছিল দিল্লি এয়ারপোর্টে। দুজনে একসঙ্গে কলকাতা ফিরেছিলাম।

আমি ওর দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুই তো দেখছি বিশবছর বয়েস কমিয়ে ফেলেছিস!'

ও হাত নেড়ে বলল, 'আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি—।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ছাত্রজীবন থেকে যে অনুপম মুখার্জি চেইন স্মোকার, যে চেইন রিঅ্যাকশন ঘটিয়ে আরও অন্তত একশোজন চেইন স্মোকারের জন্ম দিয়েছে, গত বছর দিল্লিতেও যে চেইন স্মোকার ছিল, সেই অনুপম মুখার্জি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে!

আমিও চেইন স্মোকার হয়েছি অনুপমের হাতে পড়ে। সুতরাং হেসে বললাম, 'শোন, যারা তোর-আমার মতো চেইন স্মোকার তারা যদি মাঝে-মাঝে প্রতিজ্ঞা করে পাঁচ-সাতদিনের জন্যে সিগারেট না-ছাড়ল তবে আবার চেইন স্মোকার কীসের!' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললাম, 'রোহিণীকে ছুয়ে দিব্যি করেছিস না কি?'

রোহিণী ওর বউয়ের নাম। মৌসুমীকে ছুঁয়ে দিব্যি কেটে আমিও সাত-আটবার সিগারেট ছেড়েছি। তবে প্রত্যেকবারই ওই দিব্যির এফেক্ট সাত-আটদিনের বেশি স্থায়ী হয়নি।

আমার ঠাট্টায় অনুপম হাসল না। বরং বেশ সিরিয়াস মুখ করে বলল, 'নারে, আমি সত্যি-সত্যি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।'

আমি একটু হকচকিয়ে গেলেও ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখে বললাম, 'হঠাৎ এরকম সাধু মতলবের কারণটা জানতে পারি?' হাতের সিগারেট ছোট হয়ে গিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরালাম।

অনুপমের ফরসা মুখে সতেজ ছোঁয়া লাগল। অস্বস্তির ভাবটা ঝেড়ে ফেলে ও বলল, 'প্রথম-প্রথম বেশ কাশি হত, বুঝলি। তো ডাক্তার দেখলাম। তার তো একটাই প্রেসক্রিপশান: সিগারেট জীবনের মতো ছাড়তে হবে। কিন্তু তুই তো জানিস, আমার যে-রকম চেইন স্মোকিং-এর অভ্যেস—ছাড়ব বললেই কি আর ছাড়া যায়! রোহিণীও সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ঘ্যানঘ্যান করত। শেষকালে একেবারে বিরক্ত হয়ে ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সিগারেট কি আর অত সহজে আমাকে ছাড়তে চায়! দিনে পাঁচ-ছ' প্যাকেটের জায়গায় দু-তিনটে করে লুকিয়ে-চুরিয়ে খেতে লাগলাম। তো কাশিটা লেগেই রইল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, এভাবে কিছু হবে না, কিন্তু কী করব! তারপর একদিন...।'

এমনসময় আমাদের ফ্লাইটের অ্যানাউন্সমেন্ট হল। ক্লোজড সার্কিট টিভিতে ভেসে উঠল নির্দেশ। আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলাম। অনুপম ওর ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে বলল, 'চল, যেতে-যেতে বলছি—।'

রানওয়ের খোলা জায়গায় বেরোতেই বোঝা গেল শীত এখনও পুরোপুরি যায়নি। তার থাবায় আঁচড় কাটার মতো এখনও কয়েকটা নখ রয়ে গেছে। সূর্য বেশ খানিকটা ওপরে উঠে যাওয়ায় কুয়াশা ফিকে হয়ে এসেছে। প্যাসেঞ্জার কারে করে প্লেনের দিকে যাওয়ার সময় হুহু বাতাসে আমার বেশ শীত করে উঠল।

অনুপম সিট নিয়েছে নন-স্মোকিং জোনে। আর আমি যথারীতি ধোঁয়াটে অঞ্চলে। কিন্তু ওর গল্পের টান আমাকে যেন বঁড়শিতে গেঁথে ফেলেছিল। তাই ওর পাশেই একটা ফাঁকা সিট দেখে বসে পড়লাম। গল্পের শেষটুকু শোনা হয়ে গেলে স্মোকিং জোনে ফিরে যাওয়া যাবে।

লুকোনো স্পিকারে আলতোভাবে সেতারের সুর বাজছিল। মাথার ওপরে লাগেজ ক্যাবিনেটে হাতব্যাগ রেখে যাত্রীরা যে-যার সিট খুঁজে নিতে ব্যস্ত। আজকের ফ্লাইটে ভিড় খুব বেশি নেই।

অনুপমের পাশে গুছিয়ে বসে বললাম, 'তারপর কী হল বল—।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। একদিন আমার এক বন্ধু—কোম্পানির মিটিং করতে গিয়ে আলাপ, নাম বললে তুই চিনবি না—সে আমাকে একটা কার্ড দিল। এলগিন রোডের একটা কোম্পানি, তারা নাকি সিগারেট ছাড়ানোর ব্যাপারে স্পেশালিস্ট। তো আমি সেখানে গেলাম। ভাবখানা ছিল, গিয়েই দেখি না কী হয়। বিশ্বাস কর, তারপর থেকে আমি আর সিগারেট ছুঁইনি।'

আমি অবিশ্বাসের গলায় বললাম, 'কী করে ওরা তোর নেশা ছাড়াল? কোনও ওষুধ-টষুধ দিয়েছিল?'

'না, না, ও সব কিচ্ছু না—' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে তার ভেতরে কী খুঁজতে লাগল অনুপম, আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'দু-চারটে কার্ড আমার কাছে ছিল। ওরা বলেছিল বন্ধুবান্ধবদের দরকার পড়লে দেবেন। কোথায় গেল?...এই তো!'

মানিব্যাগ থেকে একটা সাদামাটা ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার হাতে দিল অনুপম।

Dr. Tarak Halder

Anti-smoking specialist

'Mukti'

7. LALA LAJPAT RAI SARANI

CALCUTTA-700020

Phone 475-2137

'জানিস তো, এলগিন রোডের নতুন নাম লাল লাজপত রাই সরণি। কার্ডটা ইচ্ছে হলে তুই রাখতে পারিস, রাজীব। ওরা তোর সিগারেটের নেশা একদম ছাড়িয়ে দেবে। পাক্কা গ্যারান্টি। "মুক্তি" নাম ওদের সার্থক।'

'কী করে ছাড়াবে বল তো!' কার্ডটা আমি পকেটে রেখে দিলাম।

'সেটা বলতে পারব না।'

'বলতে পারবি না? তার মানে?'

'ওদের ওখানে একটা এগ্রিমেন্ট আমাকে সই করতে হয়েছে। তাতে লেখা আছে, ওসব কথা কাউকে বলা যাবে না। তবে তোর চিন্তা নেই। প্রথমদিন ইন্টারভিউর সময় ডক্টর হালদার তোকে সব বলে দেবেন।'

'তোকে এগ্রিমেন্ট সই করতে হয়েছে?' আমি অবাক হলাম।

'হ্যাঁ—।'

'আর সেজন্যে তুই সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিস?'

'তা বলতে পারিস।' অনুপম একটু হাসল।

আমি একটু জেদ করেই বললাম, 'বাদ দে তোর এগ্রিমেন্ট! আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বল দেখি—কে আর জানতে পারবে!'

অনুপম কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল, এ-নিয়ে ও আর বেশি আলোচনা করতে চায় না। আমার কথায় মুখ ফেরাল, বলল, 'না রে, বলা যাবে না। দেখবি, এগ্রিমেন্ট সই করার পর তুইও ওসব কথা কাউকে বলতে পারবি না।'

'আচ্ছা ডক্টর হালদার যদি সত্যি করেই সিগারেট ছাড়ানোর স্পেশালিস্ট হন তা হলে এত লুকোচুরি কীসের? তা ছাড়া সিনেমায় বা টিভিতে "মুক্তি"র বিজ্ঞাপনও তো দেখিনি!'

অনুপম হাসল: 'ডক্টর হালদারের কোনও বিজ্ঞাপন লাগে না। হুইসপারিং ক্যামপেইনেই ওরা গাদা-গাদা ক্লায়েন্ট পেয়ে যায়। আর পাবে না-ই-বা কেন! ওঁর কোম্পানির সাকসেস রেট নাইনটি এইট পারসেন্ট।'

'তুই নিজে অ্যাড লাইনের লোক হয়ে এ-কথা বলছিস!'

অনুপম শুধু মুচকি হাসল।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিগ্যেস করলাম, 'ওরা কি হাত-পা বেঁধে একটার-পর-একটা সিগারেট খাওয়াতে থাকে, যতক্ষণ না সিগারেট দেখলেই বমি পায়?

অনুপম মাথা নাড়ল 'না।'

'এমন কোনও ওষুধ খাওয়ায় যাতে সিগারেট ধরালেই শরীর খারাপ লাগে?'

'না—।'

'সিগারেটের মতো দেখতে কোনও হালকা নেশার লজেন্স ধরিয়ে দেয়? পরে সেই লজেন্সের বদলে আরও হালকা কোনও লজেন্স ধরায়, তারপর...'

'না, তাও নয়।' এবার মজা পেয়ে চওড়া হাসল অনুপম, বলল, 'তুই নিজে গিয়েই দেখ না—তোর কি সিগারেট খেতে সত্যি খুব ভালো লাগে, বল?'

না, সিগারেট খেতে সত্যি যে আমার খুব ভালো লাগে তা নয়। কিন্তু এত পুরোনো একটা অভ্যেস—হাতে সিগারেট না থাকলেই মনে হয় কি যেন নেই।

অনুপম বেশ খুঁটিয়ে আমাকে দেখছিল। নরম গলায় বলল, 'ডক্টর হালদার আমার জীবনটা একেবারে বদলে দিয়েছেন। নিজেই বুঝতে পারি, আমার শরীর-স্বাস্থ্য আগের চেয়ে কত ভালো হয়েছে। রোহিণীর সঙ্গে রিলেশানও বেটার হয়েছে। বেশ আছি রে। ট্রাই করে দেখ, এই মানুষটা তোর জীবন একেবারে বদলে দেবে। প্রমিস—।'

'কিন্তু তুই তো আমাকে বেশ ঝামেলায় ফেললি। আমার যে ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, কী করে...।'

'সরি, রাজীব, আমাকে রিকোয়েস্ট করিস না। এসব ব্যাপারে নিজে সরাসরি জেনে নেওয়াটাই ভালো।'

অনুপমের সিরিয়াস মুখ আমাকে বলে দিল আমি কানাগলি দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করছি।

এরপর ও কথাবার্তা শুরু করলে অফিস নিয়ে। সামনের মাসে ও ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছে। এখন দিল্লিতে মিটিং-এ যাচ্ছে রইস ক্লায়েন্ট বাগাতে।

ম্যানেজার হওয়ার খবর শুনে আমি ওকে আগাম অভিনন্দন জানালাম। তারপর বললাম আমার অফিসের ঝামেলার কথা, বাড়ির অশান্তির কথা, শরীরের নানা সমস্যার কথা।

অনুপম হেসে চোখ মারল আমাকে : 'মুক্তি!'

প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি 'পরে আবার দেখা হবে' বলে স্মোকিং জোনে নিজের সিটে ফিরে গেলাম।

মাসখানেক পর একদিন দুপুরবেলা একটা ফারনেস ডিজাইনের কাজ নিয়ে ওয়েসম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে গেছি। কাজের শেষে অফিসের গাড়ি নিয়ে লালা লাজপত রাই সরণি, মানে, এলগিন রোড দিয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎই সাত নম্বর বাড়িটা চোখে পড়ল।

দু-আঙুলের ফাঁকে যথারীতি সিগারেট জ্বলছিল। কী কারণে জানি না, গলা খুসখুস করে উঠে কাশি হল কয়েকবার। আর ঠিক তখনও কোনও শয়তানি দাবার চালে সাত নম্বর

বাড়িটা দেখতে পেলাম। একইসঙ্গে 'মুক্তি' লেখা ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডটাও চোখে পড়েছিল আর অনুপমের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল।

অফিসের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি নেমে পড়লাম রাস্তায়। কটকটে রোদ্দুরে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম 'মুক্তি'র দিকে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে অনুপমের দেওয়া ভিজিটিং কার্ডটা একবার দেখে নিলাম।

ঝকঝকে শৌখিন তিনতলা বাড়িটার রং সাদা। বাড়ির ঠিক সামনে ফুটপাথের ওপরে একটা অশ্বত্থ গাছ। গাছতলায় এক টিয়াপাখি-জ্যোতিষী বসে ঝিমোচ্ছে।

বাড়িটার বাইরের দেওয়ালে অন্তত গোটা পাঁচেক কোম্পানির সাইনবোর্ড। দরজায় উর্দিপরা দারোয়ান। তাকে জিগ্যেস করে জেনে নিলাম, 'মুক্তি' দোতলায়। কিন্তু ভিতরে ঢোকার আগে কী ভেবে হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে দিলাম।

লিফট নেই। তবে আধুনিক চওড়া অথচ খাটো উচ্চতার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে কোনও কষ্ট হল না। সামনেই বড় কাচের দরজা। কাচের ওপরে লাল রং দিয়ে ভিজিটিং কার্ডের কথাগুলোই লেখা। দরজার নবে সোনালি শিকলিতে একটা প্লাস্টিকের বোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা : OPEN।

কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, সাজানো-গোছানো, সুন্দর। দেওয়ালে ক্রিম রঙের ডিসটেম্পার। হঠাৎ করে থ্রি স্টার হোটেলের রিসেপশান বলে ভুল হয়। ডানদিকে দেওয়াল ঘেঁষে বাদামি ভেলভেটে মোড়া সোফা সেট। তার সামনে পালিশ করা মেহগনি কাঠের টেবিলে কারুকাজ করা পিতলের ফুলদানি আর ম্যাগাজিন। দুজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক ব্যাজার মুখে সোফায় বসে আছে। কে জানে, আমারই মতো বৈরাগী হতে এসেছে কি না!

নীল রঙের ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকে মোড়া রিসেপশান কাউন্টারে সালোয়ার কামিজ পরা একটি সুন্দরী মেয়ে বসে ছিল। সামনে রাখা পারসোনাল কম্পিউটারের কিবোর্ডে ওর নেলপালিশ রাঙানো সরু আঙুল দ্রুত নড়াচড়া করছে।

আমাকে দেখে আঙুল থামাল মেয়েটি। কম্পিউটারের পরদা থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। ওর গভীর দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

আমি একটু ইতস্তত করে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। গোলাপি আর কালোয় ছাপা সালোয়ার-কামিজে বেশ মানিয়েছে ওকে।

পকেট হাতড়ে মানিব্যাগ বের করে তার ভেতর থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করলাম। সেটা তরুণীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা এক বন্ধু আমাকে দিয়েছিল। ও এখান থেকে ট্রিটমেন্ট করিয়েছে...।'

মেয়েটি হাসল, বলল 'আমাদের ক্লায়েন্টরা আমাদের কখনও ভোলে না। আপনার নাম?'

'রাজীব দত্ত।'

কম্পিউটারের কিবোর্ডের ওপরে মেয়েটির হাত চলতে শুরু করল আবার।

'ঠিকানা?'

'থ্রি বাই ফোর গৌরীবাড়ি লেন, ক্যালকাটা ফোর।'

'আপনি কি ম্যারেড, মিস্টার দত্ত?'

‘হ্যাঁ—’ কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সিগারেটের সম্পর্ক কী!

‘ওয়াইফের নাম?’

‘মৌসুমী দত্ত।’

‘ছেলেমেয়ে?’

‘একটি ছেলে—’

‘নাম?’

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘তাপস দত্ত।’

‘আমাদের কোম্পানির কথা আপনাকে কে বলেছে, মিস্টার দত্ত?’

‘আমার এক পুরোনো বন্ধু—অনুপম মুখার্জি।’

কিবোর্ডের ওপরে মেয়েটির আঙুল পেশাদারি ভঙ্গিতে চলতেই লাগল। একটু পরে ও কী একটা বোতাম টিপতেই পাশে রাখা ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে একটা ফ্যানফোল্ড পেপার ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল। সেটা হাতে নিয়ে মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, ‘একটু ওয়েট করুন, মিস্টার দত্ত। আমি দেখছি যাতে আপনাকে বেশিক্ষণ বসতে না হয়।’

মেয়েটি স্বচ্ছন্দ পা ফেলে একটা কাচের দরজা ঠেলে মসৃণ করিডর ধরে চলে গেল ভেতরে। আর আমি দোনামনা পায়ে এগিয়ে লম্বা সোফায় একপ্রান্তে গা এলিয়ে বসে পড়লাম। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে লক্ষ করলাম, টেবিলে কোনও অ্যাশট্রে নেই। এটাই কি ডক্টর হালদারের ট্রিটমেন্টের প্রথম ধাপ? সুতরাং সিগারেটের মায়া ছেড়ে টেবিল থেকে একটা ‘সানডে’ ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। আড়চোখে দেখলাম, সোফায় বসা অন্য দুজন ভদ্রলোক বেশ উসখুস করছে।

ঠিক তখনই মিষ্টি গলা কানে এল ‘মিস্টার দত্ত, আপনি ভিতরে যান—।’

রিসেপশানের সুন্দরী ফিরে এসেছে।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ভেতরে যাওয়ার দরজা ঠেলে করিডরে পা রাখলাম।

এবার কোনদিকে যাব? এ-কথা ভাবামাত্রই কোথা থেকে একজন স্বাস্থ্যবান লোক এসে হাজির হল আমার পাশে। তার পরনে জিনস, আর নীল টি-শার্ট। টি-শার্টে লেখা: ‘CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH’। লেখাটার ঠিক নীচেই একটা নরকরোটির ছবি। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

লোকটা চাপা গলায় আমাকে বলল, ‘আমার সঙ্গে আসুন—।’

অনেকগুলো বন্ধ দরজা পার হয়ে গেলাম আমরা। তারপর করিডরের শেষে ডানদিকে ঘুরেই একটা দরজা সামনে পেলাম। দরজার গায়ে প্লাস্টিকের হরফে ডক্টর তারক হালদারের নাম লেখা। নামের নীচে গোটা তিনেক ডিগ্রি। তার মধ্যে এম. বি. বি. এস.-টাই শুধু আমার চেনা।

দরজায় টোকা দিয়ে সামান্য অপেক্ষা করল লোকটি। কয়েকসেকেন্ড পরেই বেশ মোলায়েম গলায় কেউ বলে উঠল ‘কাম ইন—’

দরজা ঠেলে আমরা দুজন ভেতরে ঢুকলাম।

ছোট অথচ ছিমছামভাবে সাজানো ঘর। এক অদ্ভুত ঠান্ডা নরম স্নিগ্ধ আলো সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। বেশ বড় মাপের একটা টেবিলের ও-পাশে বসে আছেন ডক্টর হালদার। দোলানো চেয়ারে অল্প-অল্প দুলছেন। সৌম্য চেহারায় আত্মীয়ের ছাপ। ডানহাতে একটা কাগজ।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, 'আসুন মিস্টার দত্ত, বসুন। আপনার ডেটা শিটটাই দেখছিলাম।' হাতের কাগজটা সামান্য নাড়লেন তিনি। তারপর আমার সঙ্গের লোকটিকে বললেন, 'প্রতাপ, তুমি এখন এসো। আমরা একটু প্রাইভেট কথাবার্তা বলব—।'

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতাপ চলে গেল ঘর থেকে।

চেয়ারের দুলুনি থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর হালদার। আমি এবার ওঁকে মনোযোগ দিয়ে দেখলাম।

বয়স বড়জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। ফরসা। মাথার সামনেটা টাক, তবে পেছন দিকে ঘাড় পর্যন্ত চুল। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। তীব্র চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা। নাকের ডগায় একটা আঁচিল। পরনে সাদা অ্যাপ্রন। আর গলায় স্টেথো ঝুলছে।

ঘরের দুটো জানলাই পরদা ঢাকা। এ ছাড়া ডক্টর হালদারের পেছনের দেওয়ালে ছোট মাপের আয়তাকার লম্বা একটা জানলা—তার ওপরেও সবুজ পরদার আড়াল।

ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে বেশ বড়সড় একটা তেলরঙ ছবি। ছবিতে আপাদমস্তক শীর্ণকায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে দামি পোশাক। চোখে খর দৃষ্টি। গাল ভাঙা। এবং হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমার গলা খুসখুস করছিল। পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটার ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম। খাঁচায় বন্দি আমার পোষা পাখি।

পায়চারি করতে-করতেই ডক্টর হালদার মোলায়েম আন্তরিক গলায় বললেন, 'মিস্টার দত্ত, আপনি কি সত্যি-সত্যি সিগারেট ছাড়তে চান?'

আমি ইততস্ত করে একবার ঢোঁক গিলে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ...ছাড়তেই তো এসেছি।'

'ভালো কথা—খুব ভালো কথা।' আমার চোখে সরাসরি তাকিয়ে হাসলেন তারক হালদার। হাতের কাগজটা টেবিলে রাখলেন। চেয়ারের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা ড্রয়ার খুললেন। তার একটু পরেই একটা টাইপ করা এগ্রিমেন্ট বের করে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

'আমাদের ক্লিনিকের কয়েকটা ফরম্যালিটি আছে। এই এগ্রিমেন্টটা পড়ে নিয়ে সই করে দিন, প্লিজ—।'

আমি চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম কাগজটায়। 'মুক্তি'-র চিকিৎসাপদ্ধতি আমি গোপন রাখব। কোনওভাবেই ক্লিনিকের স্বার্থবিরোধী কাজ করব না। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সুতরাং টেবিল থেকে একটা বলপয়েন্ট পেন তুলে নিয়ে খসখস করে সই করে দিলাম।

ডক্টর হালদার মুখে তৃপ্তির একটা শব্দ করলেন। আমার কাছে এসে কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে এগ্রিমেন্টের কাগজটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন টেবিলের ও-পাশে। ড্রয়ারে আবার রেখে দিলেন কাগজটা।

হাতে হাত ঘষে শব্দ করে হাত ঝাড়লেন তারক হালদার। হেসে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, এভাবেই রিলেশান তৈরি হয়। এখন থেকে আপনি আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড। আসলে যারা

স্মোক করে তাদের সবার সঙ্গেই আমি রিলেশান তৈরি করতে চাই।'

টেবিলের ডানপাশে একটা পারসোনাল কম্পিউটার বসানো ছিল। তার সফট হোয়াইট মনিটরে আয়তাকার কারসর দপদপ করে জ্বলছে। ওটার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ডক্টর হালদার বললেন, 'আমার কাছে যতগুলো কেস আছে, তার সবকটাই আমি নিজে হ্যান্ডল করি। নেহাত পেরে না-উঠলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের সাহায্য চাই...।'

তারক হালদার চেয়ারে বসে পড়লেন। কম্পিউটারের কিবোর্ডের বোতাম টিপতে-টিপতে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন আমাকে: 'বলতে পারেন, ভারতে প্রতি সেকেন্ডে কটা সিগারেট বিক্রি হয়?'

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে আন্দাজে ঢিল ছুড়লাম: 'দুশো?'

শব্দ করে হাসলেন হালদার। কম্পিউটারের পরদায় তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই বললেন, 'উঁহু, আড়াই হাজারের ওপর। বছরে বিক্রি হয় প্রায় আশি বিলিয়ন সিগারেট।'

সংখ্যাটা আমাকেও নাড়া দিল। কিন্তু গলাটা ভীষণ শুকনো লাগছে। এখান থেকে বেরিয়েই যদি একটা সিগারেট না-ধরাই তা হলে আমি আর বাঁচব না। কেন যে অনুপমের কাছ থেকে কার্ডটা রাখতে গেলাম!

'মিস্টার দত্ত, সিগারেট খেলে স্বাস্থ্যের অনেকরকম ক্ষতি হয়।' কম্পিউটারের দিক থেকে সরে এসে আমার মুখোমুখি তাকিয়ে হালদার বললেন, 'টোব্যাকোতে নিকোটিন আছে তা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। প্রায় ৪০০ বছর ধরে তামাকের ব্যবহার চলে আসছে। সেই তুলনায় সিগারেট খাওয়ার শখ মাত্র ৯০ কি ১০০ বছরের পুরোনো। আমরা এটা অভ্যেস করেছি সাহেবদের কাছ থেকে।' তারক হালদার মাথা নাড়লেন: 'খুব খারাপ অভ্যেস—।'

হায় ভগবান। এরকম জ্ঞান দিয়েই কি ডক্টর হালদার আমাকে সিগারেট ছাড়াবেন?

'সিগারেটের ধোঁয়াতে, বুঝলেন, মিস্টার দত্ত—চার হাজারেরও বেশি জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটা ফারমাকোলজিক্যালি অ্যাকটিভ: অ্যান্টিজেনিক, সাইটোটক্সিক, মিউটাজেনিক আর কারসিনোজেনিক। এগুলো নানাভাবে শরীরের ক্ষতি করে।'

আমার মুখের চেহারা দেখে হালদার বোধহয় কিছু একটা অনুমান করলেন। একটু তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'জানি, আমি একটু টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলছি, কিন্তু তবু এসব আপনার জানা উচিত। আজকেই যা আমাদের একটু বেশি সময় লাগবে। এরপর থেকে সবই খুব ছোটখাটো ব্যাপার।'

কম্পিউটারের মনিটরের দিকে একবার তাকিয়ে থুতনিতে আলতো করে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'সাধারণত তামাকপাতায় কার্বোহাইড্রেট, ননফ্যাটি অরগ্যনিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড আর রেজিন থাকে। সিগারেট ধরালে ঠোঁটের দিকটায় টেম্পারেচার হয় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর আগুনের দিকে প্রায় ৯০০ ডিগ্রি। এই হিটে পাইরোলিসিস রিঅ্যাকশান হয়ে নানারকম রাসায়নিক তৈরি হয়। তার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগই হল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। বাকি ১০ ভাগে গ্যাস, বাষ্প বা সূক্ষ্ম কণার অবস্থায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, টার, নিকোটিন, ফিনল, বেনজোপাইরিন এইসব। ধোঁয়ার এক মিলিলিটারে ০.৩ থেকে ৩.৩ বিলিয়ন পার্টিকল থাকে। এদের মাপ হল, ০.২ থেকে ০.৫ মাইক্রোমিটার। সুতরাং খুব সহজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে চলে যায় এসব তথ্য আপনাকে জানানো আমার ডিউটি।'

তারক হালদার হাসলেন মিটিমিটি। হাতে হাত ঘষে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, ব্যাপারটা অনেকটা চণ্ডীপাঠের মতো শোনাচ্ছে, তাই না? আপনার হয়তো ঘুম পাচ্ছে—।'

আমি তাড়াতাড়ি একটু নড়েচড়ে বসে জবাব দিলাম, 'না, না খারাপ লাগছে না—আপনি বলুন। এরকম করে আমাকে কখনও কেউ বুঝিয়ে বলেনি।'

শালা অনুপম! দাঁড়া, আবার কখনও তোর সঙ্গে আমার এয়ারপোর্টে দেখা হোক! তোর ইয়েতে আমি চারমিনারের ছ্যাঁকা দেব।

এখন এই ঠগটা কত টাকা চাইবে কে জানে! একটা সিগারেট পেলে ভালো হত।

'মিস্টার দত্ত, আমরা চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু করি বটে, তবে জুতো সেলাই দিয়ে খতম করি। আচ্ছা, বলুন তো, দিনে মাত্র এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়া মানে বছরে সিগারেটে মোট টান দেওয়া?'

আমি মাথা নাড়লাম। আন্দাজে বোকার মতো উত্তর দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

সবজান্তার ঢঙে মাথা দোলালেন তারক হালদার 'সত্তর হাজারেরও বেশি। এতে কী হয় জানেন? মুখ, নাক, ফ্যারিংস আর ট্রাকিওব্রংকিয়াল ট্রি-র মেমব্রেণগুলোতে তামাকের ধোঁয়া লাগে। ধোঁয়ার কতকগুলো কম্পাউন্ড সরাসরি মেমব্রেনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে, আর বাকিগুলোর কিছু রক্তে মিশে যায়, নয়তো মুখের লালার সঙ্গে পেটে চলে যায়। যারা রেগুলার স্মোক করে তাদের দেখবেন মাঝে-মাঝে শ্বাসকষ্ট হয়, কাশি হয়। তা ছাড়া কার্ডিয়াক প্রবলেম, পেপটিক আলসার হওয়া ছাড়াও লাংস, ল্যারিংস বা ফুড পাইপেও ক্যান্সার হতে পারে।'

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বাঁ-হাতটা বরাভয় ভঙ্গীতে তুলে স্মিত হাসলেন হালদার, বললেন, 'জানি, এ নিয়ে বিতর্ক আছে—তবে এসব রোগের ভয়টা নিছক অহেতুক নয়।'

ডক্টর হালদার আবার কম্পিউটারের দিকে মনোযোগ দিলেন, কিবোর্ডের বোতাম টিপলেন পটাপট। তারপর আমার দিকে না-তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোন ব্রান্ডের সিগারেট খান, মিস্টার দত্ত?'

'উইলস ফিল্টার—।'

'হুঁ। একটা সিগারেটের লেংথ ৭৪ মিলিমিটার, ফিল্টারের লেংথ ২২ মিলিমিটার, ডায়ামিটার সাড়ে সাত মিলিমিটার। আর একটা সিগারেটের ওজন ৯৪০ মিলিগ্রাম। নিকোটিনের পরিমাণ তেমন মারাত্মক নয়। বরং চারমিনারের ওজন ৮৬৫ মিলিগ্রাম আর লেংথ ৬৮ মিলিমিটার হলেও নিকোটিনের সমস্যাটা একটু বেশি। আসলে নিকোটিন নিয়েই যত সমস্যা আমাদের।'

'হ্যাঁ, দেখেছি—রুমালে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে হলদে ছাপ পড়ে।'

'না, না।' মাথা নাড়লেন ডক্টর হালদার 'পিওর নিকোটিনের কোনও রং নেই। দশটা কার্বন পরমাণু, চোদ্দোটা হাইড্রোজেন পরমাণু, আর দুটো নাইট্রোজেন পরমাণু দিয়ে এই ভয়ঙ্কর বিষ তৈরি। প্রকৃতির এমনই লীলা, তামাক পাতার মধ্যে এই বিষ রয়েছে—অবশ্য খুব সামান্য পরিমাণে। আসলে কী জানেন? নিকোটিনের মধ্যেই একটা নেশার টান থাকে। যার জন্যে অনেকেই সহজে সিগারেট ছাড়তে পারে না। আমার কাছে এলে অবশ্য আর কোনও প্রবলেম থাকে না—।'

এই লোকটার কথা যতই শুনছি ততই সিগারেটের তেষ্টা পাচ্ছে আমার।

'আমরা কীভাবে সিগারেটের নেশা ছাড়াই সেটা বলার আগে ক্লিনিক কী করে সেটা একটু বলি। ডাক্তাররা প্রায় সকলেই একমত যে, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু আশ্চর্য, সিগারেটের নেশা ছাড়ানোর ব্যাপারে ডাক্তারদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। যেসব ডাক্তাররা সিরিয়াসলি ট্রিটমেন্ট করতে চান, তাঁরা কেতাবি ঢঙে পেশেন্টদের সাহায্য করেন। যেমন, পেশেন্টের স্মোক করার হিস্ট্রি জানতে চান। বন্ধুর মতো তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, সিগারেট খাওয়া কী-কী কারণে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সিগারেটের নেশা ছেড়ে দিলে আখেরে কী-কী লাভ হতে পারে সেগুলোর ওপরে জোর দেন। সিগারেট ছাড়ার ব্যাপারে পেশেন্টকে পরামর্শ দেন, তাকে অ্যাসিস্ট করেন। পেশেন্টের সেলফ-হেলপ-এর জন্যে বইপত্তর পড়তে দেন। দরকার হলে ফরমাল ট্রিটমেন্ট প্রোগ্র্যামে পেশেন্টকে ভর্তি করে নেন। সিগারেট ছেড়ে দেবার পর পেশেন্ট যাতে আবার সিগারেট না ধরে তার জন্যে পেশেন্টকে সাহায্য করেন, উৎসাহ দেন। মোট এই সাতটি কেতাবি ধাপ। আমি এর নাম দিয়েছি "সপ্তপদী"।'

কথাটা বলে বেশ মজা করে হেসে উঠলেন তারক হালদার। টেবিলে ছোট্ট একটা চাপড় মেরে বললেন, 'কী বিচিত্র চিকিৎসা! এতে সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা এতটুকু কমেছে বলে আপনার মনে হয়?'

আমি প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললাম, 'শুনেছি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলে মাথা ঘোরে, মাথা টনটন করে, পেট ফেঁপে যায়...।'

তারক হালদার মাথা নাড়লেন, বললেন, 'এর বেশিরভাগটাই মনের অসুখ। তবে সিগারেট হঠাৎ ছেড়ে দিলে কিছু-কিছু অসুবিধে হয় বইকি। এ-জন্যে বিদেশে নিকোটিনওলা চুয়িংগাম পাওয়া যায়। সিগারেটের বদলে পেশেন্টরা ওটা খায়—অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই খায়।'

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'ডক্টর হালদার, আপনি এখনও আমার ট্রিটমেন্টের কথা কিছুই বলেননি—।'

তারক হালদার মিষ্টি করে হাসলেন। কম্পিউটারের কিবোর্ডে একটা চাটি মারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনিটরের সব লেখা মুছে গেল। কালো পরদায় শুধু একটা ডস প্রম্পট আর সাদা কারসর দপদপ করতে লাগল।

চোখের চশমাটা খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন হালদার। মাথা ঝুঁকিয়ে দু-আঙুলে নাকের গোড়া টিপলেন কয়েকবার। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। তাঁর লম্বা চুল-ঝাঁকুনি খেল। হঠাৎই আবার মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখের কনীনিকা সামান্য কটা বলে মনে হল এখন।

'মিস্টার দত্ত, আমার ট্রিটমেন্টের কায়দা কোনও বইতে লেখা নেই। এটা খুব সহজ, কিন্তু দারুণ কাজ দেয়। কে কী বলল-না-বলল তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা স্রেফ রেজাল্ট চাই—পজিটিভ রেজাল্ট।'

ডক্টর হালদার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। হাত নেড়ে হেসে বললেন, 'আমরা কোনও ওষুধ দিই না, নিকোটিনওলা কোনও চুয়িংগামও দিই না। মহাপুরুষদের বাণী শুনিয়ে জ্ঞান দিই না। পেশেন্টকে কোনওরকম ডায়েটিং করতে বলি না। আর—' চওড়া করে হাসলেন হালদার। তাঁর সুন্দর দাঁতের সারি দেখা গেল। বললেন, 'পেশেন্ট সিগারেট

ছেড়ে যদি টানা একবছর থাকতে পারে তবেই আমরা টাকা নিই। আর তাও খুব সামান্য —পেশেন্টের পাঁচবছরের সিগারেটের নেশার খরচ।'

'সে কী!' আমার মুখ দিয়ে শব্দ দুটো যান্ত্রিকভাবে বেরিয়ে এল। ডক্টর হালদার বলছেন কী! এত সস্তা!

'কেন, অনুপমবাবু আপনাকে এ-কথা বলেননি?'

'না—।'

'আচ্ছা, ভালো কথা, মিস্টার মুখার্জি কেমন আছেন? ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ভালো আছে।'

'বাঃ, ফাইন। এবারে কয়েকটা প্রশ্ন করব, মিস্টার দত্ত। প্রশ্নগুলো একটু...ব্যক্তিগত, তবে কথা দিচ্ছি এর উত্তরগুলো আর কেউ জানবে না।'

'বলুন?' আমার গলাটা শুকিয়ে যেন সাহারা হয়ে গেছে।

'আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসেন?'

আমি বিরক্ত চোখে তারক হালদারের দিকে তাকালাম, কিন্তু তিনি অবিচলিতভাবে তীকষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

সুতরাং অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোবাসি—'

'বাঃ, বেশ, বেশ।' টেবিলের পাশ দিয়ে আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন ডক্টর হালদার। তারপর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'আপনার ছেলে তাপসকে আপনি ভালোবাসেন?'

আমি বেশ রেগে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অনেকটা চেঁচিয়ে বললাম, 'সিগারেট ছাড়ার সঙ্গে এসব প্রশ্নের কী সম্পর্ক?'

অবুঝ ছেলের রাগ দেখে বুদ্ধিমান পিতা যেমনভাবে ক্ষমার হাসি হাসেন, ঠিক সেইভাবে হাসলেন তারক হালদার। তারপর বললেন, 'সম্পর্ক আছে, মিস্টার দত্ত। বসুন। উত্তেজিত না-হয়ে আপনি দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন—'

'হ্যাঁ, ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি,' বলে আবার বসে পড়লাম চেয়ারে।

'বাঃ, চমৎকার! কোন স্কুলে পড়ে তাপস?'

'সে জেনে আপনি কী করবেন?' একটা সিগারেট! ওঃ, একটা সিগারেট কেউ দয়া করে আমাকে দিক!

তারক হালদার হাসলেন। থুতনিতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, বলতে হবে না। আমরা জেনে নেব। কাল বিকেল তিনটে থেকে আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। যদি আপনার কোনও প্রশ্ন থাকে তা হলে কাল তার উত্তর পাবেন।'

'আজ তা হলে আসি—' আমি উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়েই সিগারেট ধরাতে হবে।

ডক্টর হালদার আবার ফিরে গেছেন নিজের চেয়ারের কাছে।

'শেষ একটা প্রশ্ন, মিস্টার দত্ত। প্রায় ঘণ্টাখানেক আপনি কোনও সিগারেট খাননি। কেমন লাগছে বলুন—।'

'ভালোই লাগছে,' মিথ্যে কথা বললাম। এই বুজরুকটাকে আমি নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। তবে ওর ট্রিটমেন্টের টেকনিকটা জানার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।

'ভালো, খুব ভালো,' স্মিত হেসে বললেন হালদার। চশমাটা টেবিল থেকে তুলে আবার বসালেন নাকের ওপর: 'আজ যত পারেন সিগারেট খান। কাল ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার পর থেকে আর কখনও আপনি সিগারেট খাবেন না। সিগারেটে আপনার অ্যালার্জি হয়ে যাবে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, মিস্টার দত্ত। এটা আমার গ্যারান্টি।' দেওয়ালের ছবির মানুষটার দিকে একপলক তাকিয়ে আমি ডক্টর হালদারের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

প্রতাপ কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল আমার পাশে। চুপচাপ আমাকে এগিয়ে দিল রিসেপশান পর্যন্ত।

পরদিন 'মুক্তি'-র রিসেপশানে যখন হাজির হলাম তখন কাঁটায়-কাঁটায় তিনটে।

গতকাল সারাটা সন্ধে আর আজ সকালটা শুধু দোটানায় ভুগেছি: তারক হালদারের সঙ্গে আর দেখা করব কি করব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো কারণে দেখা করতে এসেছি। প্রথমত, অনুপমের একটা কথা আমার কানে বাজছিল: 'ট্রাই করে দেখ, এই মানুষটা তোর জীবন একেবারে বদলে দেবে। প্রমিস—।' আর দ্বিতীয়ত, আমার কৌতূহল।

মৌসুমীকে 'মুক্তি'-র কথা কিছু বলিনি। কে জানে, গোটা ব্যাপারটা হয়তো একটা ধাপ্পা। পরে ও উঠতে-বসতে এ নিয়ে আমাকে খোঁটা দেবে। ব্যাপারটা আর একটু এগোক, তারপর না-হয় দেখা যাবে।

'মুক্তি'-র অফিসে ঢোকার আগে বাড়িটার দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে সিগারেটের টান দিয়েছি। একেবারে ফিল্টার পর্যন্ত খেয়ে তারপর টুকরোটা ফেলেছি। এটাই বোধহয় আমার জীবনের শেষ সিগারেট—অন্তত ডক্টর হালদার গতকাল সে-রকমই বলেছেন। কিন্তু সিগারেটের শেষ টানটা কেমন বিচ্ছিরি লাগল।

রিসেটশানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ভেতরে যাওয়ার ডাক পেলাম। প্রতাপ আমাকে পৌঁছে দিল ডক্টর হালদারের ঘরে। তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে।

তারক হালদার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। বললেন, 'আসুন, আসুন, মিস্টার দত্ত। আপনি এসেছেন—আমি খুব খুশি হয়েছি। আমাদের বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট প্রথম ইন্টারভিউর পর আর আসেন না। মনে হয়, তাঁরা সিগারেট ছাড়ার ব্যাপারে তেমন সিরিয়াস নন। আশা করি আপনার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যাবে—।'

হিপনোটাইজ-টিপনোটাইজ করে কিছু করবে না কি? এখন তো হিপনোটিজম ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় আসছে না।

'আমার—ইয়ে, মানে, ট্রিটমেন্ট কখন শুরু হবে?' ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম।

এবার তারক হালদার একটুও না হেসে বললেন, 'শুরু হবে নয়, শুরু হয়ে গেছে, মিস্টার দত্ত। আপনি আমার ঘরে ঢোকামাত্রই আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। এখন

আপনার সিগারেট না-ছেড়ে আর উপায় নেই। আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

আমি একটু অবাক চোখে ডক্টর হালদারকে দেখলাম বললাম, 'হ্যাঁ, আছে।'

ডক্টর হালদার প্রথমে চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন। সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সাদা অ্যাপ্রনটা খুলে ফেললেন গা থেকে। সেটা টেবিলের একপাশে রেখে হাত বাড়ালেন আমার দিকে।

'সিগারেটগুলো আমাকে দিন—।'

আমি প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে হালদারের হাতে দিলাম। প্যাকেটে তিনটে সিগারেট ছিল।

প্যাকেটটা টেবিলে রেখে তারক হালদার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বুঝতে পারলাম, মানুষটাকে এখন যেন অন্যরকম লাগছে। চশমা, স্টেথো আর অ্যাপ্রন খুলে ফেলায় হালদারকে মোটেই আর ডাক্তার বলে মনে হচ্ছে না। যদিও তাঁর ফুলহাতা চেক শার্ট আর টেরিকটনের প্যান্ট যথেষ্ট আধুনিক এবং নিখুঁত।

হঠাৎই ডানহাত মুঠো পাকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটার ওপরে এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলেন হালদার। তাঁর কটা চোখ জ্বলজ্বল করছে, সরু ঠোঁটে একচিলতে হাসি।

মুখের ভাব এতটুকু না পালটে প্যাকেটটার ওপরে ঘুষির-পর-ঘুষি মেরে চললেন তিনি। ঘুষির শব্দে বন্ধ ঘরটা যেন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। সিগারেটের প্যাকেটটা দলা পাকিয়ে গেল, থেঁতলে গেল, সিগারেটের টুকরো ছিটকে গেল, তামাক ছড়িয়ে গেল টেবিলে।

শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল, তারক হালদারের ঘুষির জোর নেহাত কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখের হাসিতে এতটুকু চিড় ধরেনি। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

তারক হালদার একসময় থামলেন। তাঁর স্বাস্থ্যবান শরীরটা সামান্য হাঁফাচ্ছিল। টেবিল থেকে তামাকের গুঁড়ো আর থেঁতলানো প্যাকেটটা নিয়ে ফেলে দিলেন বাজে-কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে। বললেন, 'মিস্টার দত্ত, বিশ্বাস করুন, এ-কাজে আমি দারুণ আনন্দ পাই। এত বছর হয়ে গেল এ-ব্যবসায় নেমেছি, কিন্তু এই তৃপ্তিতে একটুও ভাটা পড়েনি।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আপনার কি মনে হয় এতেই আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেব? এই বিল্ডিং-এর ঠিক উলটো দিকে একটা পানের দোকান রয়েছে —।'

'ধীরে, মিস্টার দত্ত, ধীরে।' হাত তুলে আমাকে বাধা দিলেন তারক হালদার 'এত অল্পে অধৈর্য হবে না। আমি ছেলেমানুষ নই যে, ভাবব এই সিগারেটের প্যাকেট থেঁতলানো দেখেই আপনি সিগারেটের নেশা ছেড়ে দেবেন। সবাই যদি এতই সুবোধ হত তা হলে আমাদের দেশে এত সমস্যা থাকত না। আর আমাদের মতো ডাক্তারের প্রয়োজন পড়ত না।'

মানুষটাকে আমার কেমন অসহ্য লাগছিল। কিছু একটা বলার জন্যে যেই মুখ খুলতে গেছি অমনি তারক হালদার বাধা দিলেন আমাকে। কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ে ফটাফট কিবোর্ডের বোতাম টিপলেন। একগাদা লেখা ফুটে উঠল মনিটরে।

সেদিকে তাকিয়ে হালদার বললেন, 'আপনার ছেলে হেয়ার স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। কথায় সামান্য তোতলামি ভাব আছে। বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর পদবি ছিল নন্দী। উনি

ইকনমিক্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছেন। আপনারা আগে—।'

আমি রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। উত্তেজিতভাবে বললাম, 'এসব আপনি কোত্থেকে জানলেন? কোন সাহসে আপনি আমার ফ্যামিলি—।'

তারক হালদার এতটুকু বিচলিত হলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'আমি তো কালই আপনাকে বলেছি, দরকার পড়লে আমরা সব জেনে নেব। তবে আপনার কোনও চিন্তা নেই, এসব আর কেউ জানতে পারবে না।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি চললাম।' সিগারেটের নেশা আমি ছাড়তে চাই না।' আমি চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে এগোতে গেলাম দরজার দিকে।

'মিস্টার দত্ত!'

তারক হালদারের ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম মানুষটার মুখ ভাবলেশহীন। বাঁ-হাতে ঘাড়ের কাছে লম্বা চুলগুলো একটু নেড়ে তিনি বললেন, 'এখুনি যাবেন না, মিস্টার দত্ত। দয়া করে একটু বসুন, কথা আছে।'

আমি ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলাম। হালদার তখন মিটিমিটি হাসছেন—যেন এরকম ছেলেমানুষি উত্তেজনা দেখে-দেখে তিনি ক্লান্ত।

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, মিস্টার দত্ত। আমরা কাজের লোক—শুধু কাজ বুঝি। আমরা শুধু রেজাল্ট চাই, রেজাল্ট। সিগারেটের নেশা ছাড়ানো যে কী ঝামেলার তা আমরা হাড়ে-হাড়ে জানি। এ-নেশা যাঁরা ছাড়েন তাঁদের শতকরা প্রায় সত্তরভাগ আবার পুরোনো হ্যাবিটে ফিরে যান। অথচ দেখুন, ড্রাগের নেশা যাঁরা একবার ছাড়েন, তাঁদের শতকরা পাঁচজনও ওই ড্রাগের নেশায় আর ফিরে যান না। সেদিক থেকে সিগারেটের নেশাটা বড় অদ্ভুত। এককথায় এক্সট্রর্ডিনারি।'

ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দিকে চোখ গেল আমার। প্রায় ইঞ্চিদেড়েক লম্বা একটা সিগারেটের টুকরো দেখা যাচ্ছে। ওটা ধরিয়ে অনায়াসে গোটাকয়েক টান দেওয়া যায়। কিন্তু তারক হালদার আমাকে লক্ষ করছিলেন। একটু হেসে টুকরোটা তুলে নিলেন বাজে-কাগজ-ফেলার ঝুড়ি থেকে। দু-আঙুলে রগড়ে ওটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন।

'ছবির ওই মানুষটাকে দেখুন, মিস্টার দত্ত—' আঙুল তুলে অয়েল পেন্টিং-এর শীর্ণকায় মানুষটিকে দেখালেন তারক হালদার: 'সিগারেটের বিষাক্ত ধোঁয়া ওই কর্মঠ মানুষটার জীবন অকালে শেষ করে দিয়েছে। প্রথমে স্মোকার্স লাঙ, তারপর লাঙ ক্যান্সার, আর সবশেষে মৃত্যু—অকালমৃত্যু। লক্ষ-লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন ভদ্রলোক। যখন বুঝতে পারলেন, শেষদিন আর বেশি দূরে নেই, তখন তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা বলেছিলেন: সিগারেটের কুৎসিত নেশাকে উচ্ছেদ করতে হবে। সিগারেটের ধোঁয়া তাঁর চোখে ছিল অশ্লীল। তাই অঢেল টাকা ঢেলে গড়ে তুলেছিলেন "মুক্তি" ফাউন্ডেশন। মারা যাওয়ার সময় আমার দু-হাত চেপে ধরে জানিয়েছিলেন তাঁর সাধের কথা। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম। তাই আমার চোখের সামনে এই ছবি রেখেছি। ছবির ওই মহৎ মানুষটা সবসময় তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে, আমাকে শাসনে রেখেছে—যেন আমার শপথের কথা আমি কখনও ভুলে না যাই।'

কথা বলার সময় তারক হালদারের মুখের রেখা নরম হয়েছিল। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন তিনি। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন ধীরে-ধীরে,

'মিস্টার দত্ত, সবচেয়ে আশ্চর্য হল, ওই মানুষটি নিজে ডাক্তার ছিলেন—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ হালদার। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তিনি সিগারেটের নেশা ছাড়তে পারেননি। এটাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি।'

'উনি কি আপনার কেউ...'

'হ্যাঁ। আমার বাবা। আমার নাম উনি রেখেছিলেন তারকনাথ। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পর অকালে যখন অনাথ হলাম নিজের নাম থেকে ওই নাথটুকু আমি ছেঁটে ফেলে দিয়েছি। এখন আমার সামনে শুধু একটাই লক্ষ্য। আমার ক্লিনিকের লাভটা বড় কথা নয়, কাজটাই বড় কথা।'

তারক হালদার হাত বুলিয়ে মুখ মুছলেন, বললেন, 'আচ্ছা, মিস্টার দত্ত, সিগারেটের ধোঁয়া যখন এঁকেবেঁকে শূন্যে ভেসে যায় তখন মনে হয় না কোনও তরুণীর শরীরের কোমল ভাঁজ-খাঁজ এসব ফুটে উঠছে?'

আমি বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম, 'না, কখনও ভেবে দেখিনি।'

'এবার থেকে ভেবে দেখবেন। আসলে পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা বিকৃত যৌনকামনা লুকিয়ে আছে। এই যে লম্বা সরু সিগারেট দু-ঠোঁটে চেপে ধরে আপনারা চোষেন—মানে টানেন, সেটাও ওই সেক্সের ব্যাপার। ফ্রয়েড দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। অথচ দেখুন, সিগারেটের নেশাকে আমাদের সমাজ মোটেই অন্যায় বলে মনে করে না—' একটু চুপ করে থেকে চোয়ালের রেখা শক্ত করে তারক হালদার চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি অন্যায় বলে মনে করি। সমাজ অসুস্থ বলে আমি তো আর অসুস্থ হতে পারি না—।'

'এবারে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা দয়া করে বলবেন?' আমার ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল।

'হ্যাঁ, এবার সে কথাই বলব।' দাঁত বের করে হালদার হাসলেন: 'দেখবেন, আমার টেকনিকটা শোনার পর আপনার সমস্ত রাগ গলে জল হয়ে যাবে। আসুন, এদিকে আসুন—।'

তারক হালদার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, পেছনের দেওয়ালের সবুজ পরদা ঢাকা ছোট জানলাটার কাছে গেলেন। কী। একটা বোতাম টিপতেই পরদা সরে গেল। ততক্ষণে আমি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

গোটা জানলাটা কাচে ঢাকা। কাচের মধ্যে দিয়ে ও-পাশের একটা ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে। ঘরের মেঝেটা ইস্পাতের তৈরি। তার ঠিক মাঝখানে একটা প্লেটে কিছু কচি ঘাস আর লেটুস পাতা রয়েছে। গলায় টুকটুকে লাল ফিতে বাঁধা একটা সাদা-কালো খরগোশ প্লেটের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আপনমনে ঘাস-পাতা খাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক মাথা নাড়তেই ওর লম্বা-লম্বা কান দুটো নড়ছে।

প্রাণীটার মখমলের মতো লোম এত লোভনীয় যে, হাত বুলিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ডক্টর হালদার খরগোশটা আমাকে দেখাচ্ছেন কেন? খরগোশের সঙ্গে সিগারেটের সম্পর্ক কী?

'খরগোশটার দিকে নজর রাখুন, মিস্টার দত্ত।' কথাটা বলেই তারক হালদার জানলার তাকে লাগানো একটা লাল বোতাম টিপতে লাগলেন, আর নিরীহ প্রাণীটা খাওয়া থামিয়ে তিড়ি-তিড়িং করে লাফাতে লাগল।

ওটার চোখ গোল-গোল হয়ে গেল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল শজারুর কাঁটার মতো। আর লাফাতে লাগল পাগলের মতো।

‘কী করছেন কী! খরগোশটাকে মেরে ফেলবেন না কি!’

আমার চিৎকারে এতটুকুও বিচলিত না-হয়ে তারক হালদার বললেন, ‘না, মরবে না। খুব অল্প ভোল্টেজের ইলেকট্রিক শক দিয়েছি—।’

লক্ষ করলাম, একটা সরু তার কোথা থেকে যেন এসে খরগোশটার গলার ফিতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

‘দেখুন খরগোশটা এবার কী করে।’ বোতাম থেকে হাত সরিয়ে তিনি বললেন।

খরগোশটা প্লেট থেকে প্রায় ছ-সাত ফুট দূরে সরে গেছে। গুটিসুটি মেরে বসে থরথর করে কাঁপছে। চোখে দিশেহারা ভয়।

‘খাওয়ার সময় যদি খরগোশটাকে বারবার এরকম শক দেওয়া হয় তা হলে ও ধরে নেবে, খেতে গেলেই ব্যথা পেতে হবে। সুতরাং, ও খাওয়া ছেড়ে দেবে। শক দিতে-দিতে এরকম একটা অবস্থা আসবে, মিস্টার দত্ত, যখন সামনে খাবার থাকা সত্ত্বেও খরগোশটা ভয়ে খাবার ছুঁয়ে দেখবে না। স্রেফ উপোস করে মরে যাবে। এটাকে বলে ”অ্যাভারশন ট্রেনিং”। আমি এর বাংলা নাম দিয়েছি ”বিতৃষ্ণা-থেরাপি”।’

কথা শেষ করে হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর হালদার। ওঁর চোখ অদ্ভুতভাবে চকচক করতে লাগল। আর আমি সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমার সিগারেটের নেশা ছাড়াতে ওঁর ট্রিটমেন্ট ঠিক কোন পথ ধরে এগোবে। সুতরাং আর একটি কথাও না-বলে আমি সোজা এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে।

‘মিস্টার দত্ত, প্লিজ, আমার কথাটা আগে শুনুন—।’

আমি দরজার হাতল ধরে টান মারলাম।

দরজা বন্ধ!

‘ডক্টর হালদার, যদি এক্ষুনি দরজা না খুলে দেন তা হলে দশমিনিটের মধ্যে পুলিশ এখানে চলে আসবে।’

বরফের মতো ঠান্ডা গলায় তারক হালদার বললেন, ‘বসুন, মিস্টার দত্ত।’

তারক হালদারের সবকিছুই যেন এখন পালটে গেছে। ওঁর চোখে এখন মহেন্দ্রনাথ হালদারের শোণিত দৃষ্টি। চোয়ালের রেখা শক্ত। জিভ বুলিয়ে নিলেন ঠোঁটে। টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের পেশি ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের একটা কোণ সামান্য বেঁকিয়ে এক অদ্ভুত বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কপালের একটা শিরা কাঁপছে। সব মিলিয়ে শিকারি যেন শিকারের দৌড় দেখছে।

মানুষটাকে এই প্রথম সাইকোপ্যাথ বলে মনে হল। এই মুহূর্তে একটা সিগারেটের বিনিময়ে আমি একটা সাম্রাজ্য দিয়ে দিতে পারি।

‘আমার সহজ ট্রিটমেন্টের কায়দাটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি।’

‘ঢের হয়েছে, ডক্টর হালদার। আপনার ট্রিটমেন্টে আমার আর কোনও আগ্রহ নেই। এই সোজা ব্যাপারটা আপনার মাথায় কেন যে ঢুকছে না বুঝতে পারছি না!’

‘না, ব্যাপারটা বরং উলটো। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, মিস্টার দত্ত, আপনার আর ফেরার পথ নেই। আমি যখন বলেছি আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে তখন সত্যি-সত্যিই শুরু হয়ে গেছে। বসুন, আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি...।’

‘সে আপনি যতই বোঝান, এখান থেকে বেরিয়েই আমি পাঁচ প্যাকেট সিগারেট কিনব। তারপর সেগুলো টানতে-টানতে থানায় পৌঁছে যাব।’ টের পাচ্ছিলাম, নেহাত অকারণেই আমার বুকের ভিতরে হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে।

‘আপনার যা মরজি। তবে আমার ধারণা, পুরো ব্যাপারটা শোনার পর আপনি বোধহয় মত পাল্টাবেন।’ তারক হালদার একইভাবে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো বললেন।

আমি বিরক্তভাবে চেয়ারের কাছে এলাম। অযথা শব্দ করে চেয়ারটা হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিয়ে বসে পড়লাম: ‘বলুন, শুনি—।’

‘ট্রিটমেন্টের প্রথম মাসটায় আমার লোকেরা আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখবে। চব্বিশ ঘণ্টায় যদি আপনাকে ওরা সিগারেট খেতে দ্যাখে তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ফোন করে জানাবে।’

‘আর আপনি আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসে ওই খরগোশের খেলা খেলাবেন?’ আমার কথায় খানিকটা ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া ছিল, কিন্তু মনের গভীরে একটা আতঙ্ক জন্ম নিচ্ছিল ধীরে-ধীরে। আমি বোধহয় কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছি।

‘না, না। আপনি ভুল বুঝেছেন, মিস্টার দত্ত।’ তারক হালদার সাপের মতো হাসলেন: ‘এই ইলেকট্রিক শক আপনাকে দেওয়া হবে না—দেওয়া হবে আপনার স্ত্রীকে। আর আপনি জানলা দিয়ে দেখবেন। আপনি তো জানেন, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।’

আমি স্তম্ভিত হয়ে ডক্টর হালদারকে দেখছিলাম। আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসেন? আপনার ছেলে তাপসকে আপনি ভালোবাসেন? এসব অদ্ভুত প্রশ্নের কারণ বোধহয় এখন বোঝা যাচ্ছে।

‘মিস্টার দত্ত, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এই বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ আপনি বহুবার দেখেছেন, কিন্তু আমল দেননি। এর কারণ কী জানেন? কারণ, এই ওয়ার্নিং-এর আসল অর্থটা আপনি বোঝেননি।’

তারক হালদার আক্ষেপে মাথা নাড়লেন, হাতে হাত ঘষলেন।

‘আপনার আর কী দোষ! এই ওয়ার্নিং-এর আসল অর্থটা বেশিরভাগ লোকই বোঝে না। আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আপনি সিগারেট খেলে শুধু আপনার নয়, আপনার ফ্যামিলিরও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, আপনার ছেলের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, আর আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো হবেই। হাইলি ইনজুরিয়াস।’

ডক্টর হালদার পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর সহজ ট্রিটমেন্টের কায়দাটা জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন আমাকে।

আমার প্রথম ভুলের জন্যে মৌসুমীকে তুলে নিয়ে এসে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হবে। দ্বিতীয়বার অবাধ্য হলে আমার কপালে জুটবে ওই শাস্তি। তৃতীয়বার আমাদের দুজনকেই শক দেওয়া হবে। আর চতুর্থবার যদি সিগারেট ধরানোর ভুল করি তা হলে বাধ্য হয়ে

ডক্টর হালদার তাপসের স্কুলে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে ধরে একটু 'পালিশ' দেওয়া হবে।

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে ডক্টর হালদার বললেন, 'বাচ্চাটার কী কপাল দেখুন! বাপি কথা শুনছে না দেখে সে মার খাচ্ছে—।'

'আপনি মানুষ না জানোয়ার!' রাগে আমার মাথা দপদপ করছিল। বুকের ভিতরেও কেমন এক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে।

তারক হালদার মোলায়েম হেসে বললেন, 'তবে ভয়ের কিছু নেই, মিস্টার দত্ত। আমার কাছে যত ক্লায়েন্ট আসে তাদের ফর্টি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে কোনও স্টেপ আমাকে নিতে হয় না। আর তিন-তিনবার অবাধ্য হয় এরকম ক্লায়েন্টের সংখ্যা মাত্র টেন পার্সেন্ট। এতে আপনার ভরসা পাওয়া উচিত।'

ভরসা দূরের কথা, একটা ঠান্ডা ভয় আমাকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরছিল।

'যদি পাঁচবারের বার আপনি একই ভুল করেন, তা হলে...।'

'কী বলতে চান আপনি?'

হালদার নিষ্পাপ হাসলেন: 'আপনাকে আর মিসেস দত্তকে শক দেওয়া হবে। তাপসকে আবার পালিশ দেওয়া হবে, আর মিসেস দত্তকে একটু-আধটু রগড়ে দেওয়া হবে—।'

আমি ধৈর্য হারিয়ে ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম ডক্টর হালদারের ওপরে। ওঁর জামাটা খামচে ধরে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে লাগলাম। কিন্তু ডক্টর হালদার চোখের পলকে একটু সরে গিয়ে হাঁটু চালিয়ে দিলেন আমার তলপেটে। বাঁহাতে আমার চুলের মুঠি ধরে টান মেরে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন একপাশে। তারপর ডানহাতের শক্ত আঙুলে আমার টুটি টিপে ধরে সজোরে এক ধাক্কা মারলেন। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম মেঝেতে। আহত জন্তুর মতো হাঁফাতে লাগলাম।

'শান্ত হয়ে বসুন, মিস্টার দত্ত। আপনাকে তো বলেছিলাম, আমরা চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু করি...আর জুতো সেলাই দিয়ে শেষ করি।'

হাত ধরে আমাকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন তারক হালদার। তাঁর ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি।

'আসুন, এবার ভদ্রলোকের মতো কথাবার্তাগুলো শেষ করে নেওয়া যাক।'

আমি বড়-বড় শ্বাস নিতে-নিতে ভাবছিলাম, এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন কখন শেষ হবে।

'মুক্তি'-র চিকিৎসা পদ্ধতিতে শাস্তির ধাপ রয়েছে দশটি। ছ'নম্বর, সাত নম্বর আর আট নম্বর ধাপ হল ইলেকট্রিক শক আর পালিশ। তবে শকের ভোল্টেজের মাত্রা যেমন বাড়বে তেমনই বাড়বে পালিশের তেজ। সেইসঙ্গে মিসেস দত্তকে শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে ধর্ষণের ভয় পর্যন্ত দেখানো হবে। ন'নম্বর ধাপ হল তাপসের যে-কোনও একটা হাত ভেঙে দেওয়া।

'আর দশ নম্বর?' আমার গলার ভিতরে ধুনি জ্বলছে। টের পাচ্ছি, ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে। শীততাপনিয়ন্ত্রণ গোল্লায় গেছে।

তারক হালদার হতাশভাবে মাথা নেড়ে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে।

‘তখন আমরা হাল ছেড়ে দিই, মিস্টার দত্ত। মাত্র টু পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমার ট্রিটমেন্ট ফেইল করে। আপনি তখন সেই টু পার্সেন্টের দলে পড়বেন—।’

‘সত্যি আপনি হাল ছেড়ে দেন?’

‘বলতে গেলে একরকম তাই।’ কথা বলতে-বলতে ডক্টর হালদার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলেন: ‘তবে সেই অবাধ্য দু-পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট জীবনে আর কখনও সিগারেট খায় না। আমার আগমার্কা গ্যারান্টি—’

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে টিভিতে ‘দ্য ওয়ার্ল্ড দিস উইক’ দেখছিলাম। মৌসুমী থালায় ভাত-তরকারি সাজিয়ে দিচ্ছিল আর মাঝে-মাঝে টিভির দিকে তাকাচ্ছিল। তাপস আগেই খেয়েদেয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলাম, আর অন্যমনস্ক হয়ে বারবার দাঁত দিয়ে নখ কাটছিলাম।

খাওয়া শুরু করেই মৌসুমী জিগ্যেস করল, ‘তোমার কী হয়েছে বলো তো! সেই তখন থেকে কেমন করছ!’

আমি খেতে-খেতেই গম্ভীরভাবে বললাম, ‘না, কিছু না। মানে...আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।’

এরকম ঘোষণা মৌসুমী আগে অনেক শুনেছে। তাই খাওয়া থামিয়ে ও হাসল। হাসলে ওর ডান গালে টোল পড়ে। দারুণ দেখায়। ওকে প্রায়ই বলি, ‘তোমার ওই টোলে পড়ে আমার আইবুড়ো জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল।’ এখন বলতে ইচ্ছে করল না।

ওর চোখে তাকিয়ে সিরিয়াসভাবে বললাম, ‘সত্যি ছেড়ে দিয়েছি।’

ও হেসে বলল, ‘কখন ছেড়েছ? পাঁচমিনিট আগে?’ আবার খেতে শুরু করল।

‘না, বিকেল তিনটে থেকে।’

‘তখন থেকে একটাও সিগারেট খাওনি!’ মৌসুমীর খাওয়া একেবারে থেমে গেছে।

‘না।’ আমি কখন আবার যেন দাঁত দিয়ে নখ কাটতে শুরু করেছি।

‘এরকম একটা দারুণ খবর—কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না। কিন্তু হঠাৎ ছাড়তে গেলে কেন?’

‘তোমার জন্যে...আর, তাপসের জন্যে...।’

মৌসুমী এবার চোখ বড় করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর একটু দূরে একটা খাটো টেবিলে রাখা অ্যাশট্রের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, ‘হঠাৎ এই সুবুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে জানি না, তবে এই প্রতিজ্ঞা টিকলে হয়।’

এই প্রতিজ্ঞা টিকবে, মৌসুমী। না টিকলে তোমাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে-দিয়ে ওরা নীল করে দেবে। তোমার গালের ওই টোল সমান করে দেবে ক্ষুর দিয়ে। তাপসকে ওরা চুরমার করে দেবে। আমাদের জীবন একেবারে বদলে দেবে।

মুখে বললাম, ‘এবার আমাকে পারতেই হবে।’

মৌসুমী খেতে শুরু করল আবার: ‘পারলে তো ভালোই। পয়সা বাঁচবে। তা ছাড়া তোমার সিগারেটের ওই উৎকট ধোঁয়া আমার একটুও ভালো লাগে না।’

ডক্টর হালদারের ভাবলেশহীন মুখটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। তলপেটটা এখনও ব্যথা করছে। আতঙ্ক জমাট বেঁধেছে শরীরের ভেতরে কোথাও। দরকার পড়লে ওই মানুষটা যে নির্মম হতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছি আমি। আমার সঙ্গে বন্দি খরগোশটার কোনও তফাত নেই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু চোখে ঘুম এল না।

মৌসুমী তাপসের সঙ্গে পাশের ঘরে শুতে চলে গেছে। যাওয়ার আগে আমার বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে আদর করে গেছে। আর নিচু গলায় বলেছে, ‘ইচ্ছে করলে সিগারেট খেয়ো। আমি রাগ করব না।’ রাগ না-করলে মৌসুমীর কোনও তুলনা নেই।

আমি উত্তর না দিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরেছি। অকূল সাগরে মৌসুমী আর তাপসই আমার খড়কুটো।

ওর হাতে আলতো করে চুমু খাওয়ার পর ও চলে গেল। দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাতে শোওয়ার আগে একটা সিগারেট আমার বড় প্রিয় ছিল। বিছানার পাশেই তাকে রয়েছে সিগারেট আর লাইটার। অন্ধকারে ওগুলো ব্যবহার করছি সাতবছর ধরে। চোখে না দেখতে পেলেও ওদের স্থানাঙ্ক আমার ভুল হয় না। যদি হাত বাড়াই তা হলে এখনও ভুল হবে না। প্যাকেটে এখনও চারটে সিগারেট আছে আমি জানি। কিন্তু...। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলাম একবার। তাকালাম মাথার কাছের জানলার দিকে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। কেউ কি এখনও লক্ষ রাখছে আমার ওপরে?

তারক হালদারের কথাগুলো মনে পড়ছিল। প্রথম মাসে চব্বিশ ঘণ্টা আমার ওপরে নজর রাখা হবে। পরের দু-মাসে আমি নজরবন্দি থাকব দিনে আঠেরো ঘণ্টা করে। কিন্তু কোন আঠেরো ঘণ্টা সেটা বুঝতে পারব না। চতুর্থ মাসটাই পেশেন্টেদের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। তখন তাদের মনটা আঁকুপাঁকু করে একটা সিগারেটের জন্যে। সেই কারণেই তারক হালদার তখন আবার চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা করেন—পেশেন্টেদের স্বার্থে। তারপর আটমাস ধরে দিনে বারো ঘণ্টা করে। একটানা বারো ঘণ্টা নয়, এলোমেলো বারো ঘণ্টা। তারপর?

তারপর সারা জীবন ধরে চলবে এই নজরদারি। তারক হালদারের খেয়ালখুশি মতো।

সারাটা জীবন আমাকে ‘মুক্তি’-র বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

ডক্টর হালদারের ভয়ঙ্কর হাসিটা মনে পড়ল।

‘সবসময়েই আপনাকে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হবে, মিস্টার দত্ত। কেউ কি এই মুহূর্তে লুকিয়ে লক্ষ করছে আমাকে? দু-বছর পর হয়তো একদিন-বাদে-একদিন নজর রাখব আপনার ওপরে। কিংবা টানা একসপ্তাহ, বা মাসে দশদিন। আপনি কিচ্ছু টের পাবেন না। যদি কখনও লুকিয়ে সিগারেট টান দেন, তা হলে সে-রিস্ক আপনার। যদি সাধ করে সাপ নিয়ে খেলতে চান খেলবেন। কিন্তু আপনার মনে ভয় থাকবে: কেউ কি জানতে পেরেছে? তাপসকে কেউ কিডন্যাপ করেনি তো? আমার বউকে কেউ তুলে নিয়ে যায়নি

তো? কী চমৎকার কায়দা বলুন তো, মিস্টার দত্ত! এই অবস্থায় যদি আপনি সিগারেটে লুকিয়ে একটি টানও দেন, তা হলে দেখবেন কী বিচ্ছিরি তার টেস্ট। মনে হবে, আপনি যেন বউ আর ছেলের রক্ত চুষে খাচ্ছেন।'

কিন্তু এখন, এই নিঝুম রাতে, কেউ কি সত্যিই নজর রেখেছে? মনে হয় না। তাছাড়া জানলা দিয়ে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তারক হালদার বলেছিলেন, 'নজরদারির কাজ যারা করবে তাদের দু-একজনকে হয়তো আপনি চিনে ফেলবেন, কিন্তু সবাইকে চিনতে পারবেন না...।'

নিকুচি করেছে তারক হালদারের! উচ্ছন্নে যাক 'মুক্তি' আর ওই সিড়িঙ্গে বুড়ো মহেন্দ্রনাথ হালদার!

আমার অবাধ্য হাত অন্ধকারে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। অন্ধকারে আগুন জ্বলে উঠল। উপোসী ঠোঁট যেন একযুগ পর সিগারেটের স্বাদ পেল। আঃ—!

কীসের একটা শব্দ হল না? কোনদিক থেকে এল শব্দটা? বুকের ভেতরে আচমকা একটা টিপটিপ শব্দ শুরু হয়ে গেল। সিগারেট ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল অবাধ্য হয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসের ভিতরে জট পাকিয়ে কাশি পেল। দম আটকে যেতে চাইল কাশির দমকে। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা নিভিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম জানলা দিয়ে। আবছা অন্ধকারে হাত নেড়ে ধোঁয়ার রেখা সাফ করে দিতে চাইলাম। হে ভগবান, কেউ যেন দেখতে না-পায় আমার এই অবাধ্য আচরণ! মৌসুমী...তাপস...সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

শত চেষ্টাতেও ঘুম আসতে চাইল না চোখে। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে রইলাম অন্ধকারে। শুনতে লাগলাম আমার ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি।

সকালে চায়ের কাপ, খবরের কাগজ, শীতের বারান্দা—অথচ সিগারেট নেই! প্রাত্যাহিক কাজে টয়লেটে বন্দি, অথচ সিগারেট নেই! অফিসের ইয়ার এন্ডিং-এর বাড়তি কাজ বাড়িতে বয়ে নিয়ে এসে রাত জেগে ফাইল ওলটানো, অথচ সিগারেট নেই! রাতের খাওয়া সেরে খোলা বারান্দায় 'ওয়াক এ মাইল' অথচ সিগারেট নেই!

শেষ পর্যন্ত আমি বাঁচব তো!

কী করে যে এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম! স্রেফ অনুপমের জন্যে! ও তো স-ব জানত! তবু কেন আমাকে এই ভয়ঙ্কর ফাঁদে ফাঁসাল? ওকে একবার হাতের কাছে পাই!

আবার কানে এল শব্দটা। দরজার কাছ থেকে কি শব্দটা ভেসে এল?

উঠে দরজার কাছে গিয়ে শুনব ভালো করে?

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। অন্ধকারে পা টিপে-টিপে গেলাম দরজার কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরজা খোলার সাহস পেলাম না।

পায়ে-পায়ে আবার বিছানায় ফিরে এলাম। এই অসহায় মুহূর্তে আমার মন ভীষণভাবে মৌসুমীকে পাশে চাইছিল। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে সময় কাটতে লাগল আমার।

ভোরবেলার দিকে বোধহয় সামান্য তন্দ্রা এসে থাকবে, কারণ মৌসুমীর ডাকে ঘুম ভাঙল। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে ও বলল, 'এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছ, অফিসে যে দেরি হয়ে যাবে।'

জানলা দিয়ে চোখে রোদ এসে পড়ছিল। বিছানায় উঠে বসলাম। চোখ জ্বালা করছে। মাথা দপদপ করছে। জিভে তেতো স্বাদ।

তড়িঘড়ি চায়ের কাছে চুমুক দিতে গিয়ে জিভে ছ্যাঁকা লেগে গেল।

মৌসুমী চোখ মটকে বলল, 'এখনও তুমি সিগারেট-অনশন চালিয়ে যাচ্ছ, না কি একটা-আধটা টেনেছ?'

আমি জড়ানো গলায় জবাব দিলাম, 'না, খাইনি।'

কাল রাতের ওই একটা-দুটো টানকে কি আর খাওয়া বলে!

'দেখবে, অফিসে গিয়েই তোমার প্রতিজ্ঞা পিঠটান দেবে—।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী হচ্ছে, মউ! আমি কোথায় সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাতে হেলপ না-করে তুমি উলটে...।'

'আচ্ছা বাবা, ভুল হয়েছে, সরি—।'

আমি বাঁ-হাতটা মৌসুমীর কাঁধে রাখলাম। ওর ঘাড়ের কাছে আলতো করে আঙুল চালালাম। এ যে কী মারাত্মক প্রতিজ্ঞা সেটা তোমাকে কেমন করে বোঝাই বলো তো, মউ! এ যে আমার ভীষণ গোপন কথা।

বাথরুমের দরজায় আওয়াজ হল।

'যাই, তাপস বোধহয় স্নান করে বেরিয়েছে—'মৌসুমী সরে গেল আমার কাছ থেকে। তাপসকে ও ভীষণ ভালোবাসে—হয়তো আমার চেয়েও বেশি। কিন্তু আমি যে ওদের দুজনকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ওরা যদি জানত, আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা শুধু ওদেরই জন্যে!

অফিস থেকে বাড়িতে ফিরেই একটা ধাক্কা খেলাম।

কলিংবেল বাজাতে দরজা খুলল শান্তির মা। কিন্তু মৌসুমী বাড়িতে থাকলে ও-ই দরজা খোলে। আমার বেল বাজানোর ঢং ওর খুব চেনা। এসময়ে ও কোথায় বেরোল?

তাপস চাটার্ড বাসে করে স্কুলে যায়-আসে। যাওয়ার সময় মৌসুমী ওকে নিয়ে যায় অরবিন্দ সেতুর মুখে, বাসে তুলে দেয়। আর ছুটির সময় তাপসকে বাস থেকে নামতে হয় ওই একই জায়গায়। সেখান থেকে ওকে নিয়ে আসে আমাদের কাজের লোক শান্তির মা। তাপসকে নিয়ে বাড়ি ফিরে ও বউদিদিমণিকে পায়নি। কলিংবেলের শব্দে কেউ সাড়া দেয়নি। তখন পাশের ফ্ল্যাট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে শান্তির মা আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলে। এমার্জেন্সি অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে আমাদের ফ্ল্যাটের একটা বাড়তি চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রাখা থাকে। শান্তির মা সেটা জানে।

শান্তির মায়ের কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাপস সরল নিষ্পাপ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর স্কুল থেকে ফেরার সময়ে মৌসুমী কখনও ফ্ল্যাট ছেড়ে যায় না। হঠাৎ গেলেও খবর রেখে যায়। পাশের ফ্ল্যাটের রবীনবাবুকে সে ব্যাপারে জিগ্যেস করতে যাব ভাবছি, এমনসময় টেলিফোন বেজে উঠল।

কে ফোন করছে? কোনও হসপিটাল থেকে? না কি পুলিশ?

'দাদাবাবু, একটু আগে কে একজন আপনাকে ফোন করেছিল...।'

শান্তির মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে চেপে ধরেছি।

'হ্যালো—।'

'রাজীব দত্ত?' একজন পুরুষের গলা।

'কথা বলছি।' অকারণেই আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল।

'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।'

এইবার গলাটা চিনতে পারলাম। ডক্টর তারক হালদার।

কিন্তু আমি কিছু বলে ওটার আগেই তিনি বললেন, 'দত্তবাবু, আপনি সাতটা নাগাদ আমার চেম্বারে একবার আসতে পারবেন? একটু দরকার ছিল।'

'মৌসুমী...আমার স্ত্রী কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার কাছে।' হালদার চিবিয়ে-চিবিয়ে হাসলেন।

আমার চোখের সামনে হাজার-হাজার সরষে ফুল নাচছিল আর একটা সাদা-কালো খরগোশ লাফাচ্ছিল পাগলের মতো। কাল রাতে আমি সিগারেটে দুটো টান দিয়েছি।

'ডক্টর হালদার, প্লিজ, ওকে কিছু করবেন না...ছেড়ে দিন। কাল রাতে...আমি মাত্র দুটো টান দিয়েছি...শরীরটা কেমন খারাপ লাগছিল...প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন!'

আমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। আরও অনেক কিছু বলতে চাইছিলাম, কিন্তু—।

'সাতটায় আমাদের দেখা হচ্ছে।' তারক হালদার নির্লিপ্ত গলায় বললেন, তারপরেই টেলিফোনের লাইন কেটে গেল।

ঠিক সাতটার গিয়ে হাজির হলাম 'মুক্তি'-র রিসেপশানে।

ফাঁকা ঘরে বসে রিসেপশানিস্ট মেয়েটি কম্পিউটারের বোতাম টিপছিল। আমাকে দেখে একচিলতে হেসে টেলিফোন তুলে নিল। আমার উদভ্রান্ত অবস্থাকে কোনও আমল দিল না।

'ডক্টর হালদার, মিস্টার রাজীব দত্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'যান, ভিতরে যান।'

করিডর ধরে হেঁটে এগিয়ে চলেছি, প্রতাপ কোথা থেকে এসে হাজির হল আমার পাশে। একটু হাসল। ওর হাতে একটা রিভলভার।

ডক্টর হালদারের ঘরে ঢুকতেই উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে : 'আসুন, মিস্টার দত্ত। এ কী চেহারা হয়েছে আপনার!'

আমি তারক হালদারের কাছে এগিয়ে গেলাম, বললাম, 'ডক্টর হালদার, প্লিজ, এবারের মতো ছেড়ে দিন। আমি...আমি যা টাকা লাগে দেব...।'

'অবুঝ হবেন না, মিস্টার দত্ত। ক্যান্সার আমার বাবাকে ছেড়ে দেয়নি। আসুন, এই জানলার কাছে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি, মিসেস দত্তর তেমন একটা লাগবে না—অন্তত এই প্রথমবার।'

আমি রাগে কাঁপতে লাগলাম। এই সাংঘাতিক লোকটাকে তুলোধোনা করতে পারলে তবে আমার মন শান্ত হবে।

ডক্টর হালদার পেছনের দেওয়ালের ছোট জানলার কাছে গিয়ে পরদা সরিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় আমার মনের অবস্থা আঁচ করতে পারলেন। তাই ঠান্ডা গলায় বললেন, 'উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, দত্তবাবু। প্রতাপ আপনার উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করবে। না, গুলি করবে না। বাজে খরচ আমি অপছন্দ করি। ও রিভলভারের বাঁট দিয়ে আপনার মাথায় একটু ইয়ে করবে। আর মিসেস দত্তকে আমার ক্লিনিকের নিয়মমাফিক শক দেওয়া হবে। সুতরাং আপনার ওসব ছেলেমানুষি উত্তেজনা দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আসুন, এদিকে আসুন।'

আমি আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে গেলাম জানলাটার কাছে। পেছন থেকে প্রতাপ একবার আমাকে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিল।

শয়তান ডাক্তারটা মউকে এখন ইলেকট্রিক শক দেবে, আর আমাকে সেটা দেখতে হবে।

'বাস্টার্ড!' বলতে চাইনি, কিন্তু কীভাবে যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল শব্দটা।

তারক হালদার আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলেন: 'মিস্টার দত্ত, এ-পর্যন্ত যত গালাগাল আমি খেয়েছি, গালাগালপিছু প্রত্যেকে যদি একটা করে টাকা আমার হাতে দিত তা হলে এতদিনে আমি টাটা বিড়লা হয়ে যেতাম। তা ছাড়া, যারা সমাজের জন্যে, দেশের জন্যে, ভালো কাজ করতে চায় তাদের কপালে চিরকাল গালাগালই জোটে। আসুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে—।'

জানলা দিয়ে মৌসুমীকে দেখতে পেলাম।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও হতবাক হয়ে এদিক-ওদিক দেখছে। ওর ডানহাতের কবজিতে একটা সরু তার জড়ানো।

'মউ! মউ!' আমি বিপন্ন গলায় চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে।

ডক্টর হালদার আমার পিঠে হাত রাখলেন: 'ডেকে লাভ নেই। ও-ঘর থেকে কিছু শোনা যায় না, কিছু দেখা যায় না।' কাচের জানলাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এটা সাধারণ কাচ নয়, ওয়ান ওয়ে মিরার। ও-ঘর থেকে এটাকে আয়না বলে ভুল হয়। যাকগে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিই। আপনার প্রথমবারের ছোটখাটো ভুল—পনেরো সেকেন্ডের বেশি দেওয়াটা ঠিক হবে না। প্রতাপ—।'

প্রতাপ হাতের রিভলভারটা আমার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরল। আর ডক্টর হালদার লাল বোতামটা টিপে ধরলেন।

আমার জীবনের দীর্ঘতম পনেরো সেকেন্ড শেষ হল একসময়। মাথা ঝিমঝিম করছে, পা দুটো যেন রবারের, চোখের নজর ঝাপসা।

ডক্টর হালদার আমার পিঠে মোলায়েমভাবে হাত রেখে বললেন, 'গা গুলোচ্ছে? বমি পাচ্ছে?'

আমি কোনওরকমে মাথা নেড়ে 'না' বললাম।

তারক হালদার জানলার পরদা টেনে দিলেন। আমার হাত ধরে বললেন, 'আসুন—।'

'কোথায়?' কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে আমার।

‘আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন আসুন।’

কী করে মৌসুমীকে মুখ দেখাব আমি? ওকে আমি ভালোবাসি! এই আমার ভালোবাসার নমুনা!

প্রতাপ আগেই কখন যেন ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আমি আচ্ছন্নের মতো ডক্টর হালদারকে অনুসরণ করলাম।

করিডর দিয়ে কিছুটা পথ চলার পর ডক্টর হালদার একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, ‘যান, ভেতরে যান। কোনও চিন্তা নেই, উনি আপনাকে ভুল বুঝবেন না।’

আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে উনি চলে গেলেন। ধবধবে সাদা দেওয়ালে ঘেরা ঘরটায় শুধু একটা লম্বা সোফা রয়েছে। মৌসুমী সোফায় বসে মুখ নিচু করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

‘মউ!’

ও চমকে তাকাল আমার দিকে। সোফা থেকে প্রায় ছুটে এসে জাপটে ধরল আমাকে। বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে উঠল, ‘রাজীব! রাজীব!’

আমি ওর মাথায় হাত ঝুলিয়ে দিলাম। চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। কপালে, মাথায় চুমু খেলাম বারবার।

মৌসুমী ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে যা বলল তার সারমর্ম হল এই: দুপুর দুটো নাগাদ অচেনা তিনটে লোক হঠাৎই ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে; ও ভেবেছিল ওরা বোধহয় ডাকাত, বা অন্য কোনও বদ মতলবে ঢুকেছে; কিন্তু লোকগুলো মৌসুমীর নাকে ভেজা তুলো চেপে ধরে; সেই অবস্থাতেই ওকে চাদরে মুড়ে তুলে নেয়; তারপর ওর আর কিছু মনে নেই; পরে জ্ঞান ফিরল দ্যাখে একটা ছোট ঘরে ও বন্দি; তারপর...তারপর...।

‘রাজীব, এই লোকগুলো কেন আমাকে এরকম টরচার করল বলো তো—?’

‘আর বলতে হবে না, মউ, থাক।’ আমি দু-হাতে আঁজলা করে মৌসুমীর মুখটা তুলে ধরলাম। ধরা গলায় বললাম, ‘তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে, মউ। এই মুহূর্তে সব খুলে না-বলতে পারলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। এসো, বসো এখানে—’

ওকে সব কথা বলার পর আমি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। বিড়বিড় করে বললাম, ‘ছি ছি! তোমার চোখে কত ছোট হয়ে গেলাম আমি...।’

মৌসুমী আমার থুতনিতে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরল ওর দিকে। গাঢ় স্বরে বলল, ‘রাজু, তোমাকে আমি এখনও আগের মতোই ভালোবাসি।’

‘সত্যি!’ আমার চোখে জল এসে গেল।

‘হ্যাঁ, সত্যি। ডক্টর হালদার তোমার ভালোর জন্যই সব করছেন। সিগারেট খাওয়া তুমি একেবারে ছেড়ে দাও।’

এখন তো আর না-ছেড়ে উপায় নেই। আমি অবাক চোখে মৌসুমীকে দেখছিলাম। গালে টোল পড়া মেয়েটা হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে টপ করে গালে একটা চুমু খেল। বলল, চলো, ‘বাড়ি চলো। তাপস অনেকক্ষণ ধরে একা আছে...।’

দু-সপ্তাহ পর একদিন রাতে টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই ডক্টর হালদারের গলা চিনতে পারলাম। একটা দলাপাকানো ভয় উঠে এল গলার কাছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ডক্টর হালদার, আপনি ভুল করছেন। আমি একটিবারের জন্যেও সিগারেট ঠোঁটে ছোঁয়াইনি—বিশ্বাস করুন—।'

'না, সে আমি জানি। একটা কাজের ব্যাপারে ফোন করছি। কাল বিকেল পাঁচটায় আমার চেম্বারে একবার আসতে পারবেন? একটু কথা আছে।'

'সেটা কি...?'

'না, না, সিরিয়াস কিছু নয়। আসুন, একটু আলোচনা করব। ও হ্যাঁ, তাপসের পরীক্ষার রেজাল্ট তো খুব ভালো হয়েছে! তাপসকে কনগ্র্যাচুলেশান জানাবেন। কাল ওর জন্যে একটা চকোলেটের বাক্স পাঠিয়ে দেব।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'জানতে হয়, মিস্টার দত্ত। জানাটা আমার ট্রিটমেন্টের একটা ভাইটাল পার্ট।'

তারক হালদার ফোন কেটে দিলেন।

সেই মুহূর্ত থেকেই আমি পরদিন বিকেল পাঁচটার অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পরদিন পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিটে তারক হালদারের মুখোমুখি যখন হাজির হলাম তখন বুঝলাম, অকারণেই আমি ভয় পেয়েছি।

হালদার আমার মুখের চেহারা লক্ষ করে হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার? মুখটা এরকম করে রেখেছেন কেন? ভয় নেই, কেউ আপনাকে শক দেবে না। আসুন, এটার ওপরে উঠে দাঁড়ান।'

ওজন করার একটা যন্ত্র।

'সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার পর আমার ওজন বোধহয় একটু বেড়ে গেছে—।'

'সেটাই স্বাভাবিক। আমার ক্লায়েন্টেদের প্রায় সিক্সটি সেভেন পার্সেন্টের এরকম সিমটম দেখা গেছে। আসুন, উঠুন এটার ওপরে—।'

যন্ত্রের প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়ালাম। আটষট্টি কেজি।

'আচ্ছা, নেমে আসুন।' বলে অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটি ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকের কার্ড বের করে তারক হালদার কী যেন দেখতে লাগলেন।

'আপনার হাইট কত, মিস্টার দত্ত?'

'পাঁচ-পাঁচ।'

'তা হলে আপনার ওজন হওয়া উচিত তেষট্টি কেজি। কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, এগুলো ঠিকমতো খাবেন। আর বডি ওয়েটের দিকে খেয়াল রাখবেন। আজ এপ্রিল মাসের তিন তারিখ। আপনি প্রতিমাসের ঠিক তিন তারিখে আমার কাছে ওজন নিতে আসবেন। যদি কখনও না আসতে পারেন তা হলে আগে ফোন করে অবশ্যই খবর দেবেন। যেন কোনওরকম ভুল না হয়।'

'যদি আমার ওয়েট তেষট্টি কেজির বেশি হয়ে যায়?'

তারক হালদার হাসলেন, বললেন, 'ওজন বেড়ে যাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যদি আপনার ওজন তেষট্টির বেশি হয়ে যায় তা হলে আমার লোক আপনার বাড়িতে যাবে। চপার দিয়ে আপনার বউয়ের একটা কড়ে আঙুল কেটে নেবে। ঠিক আছে, তা হলে সামনের মাসের তিন তারিখে আমাদের দেখা হচ্ছে, মিস্টার দত্ত—।'

এরপর তিনমাসের মধ্যে আমার মেদ আর বয়েস, দুটোই অনেকটা করে কমে গেল। জামা-প্যান্টগুলো সব ঢোলা-ঢোলা হয়ে গেল। তা নিয়ে মৌসুমী কম ঠাট্টা করল না। তাছাড়া একদিন রাস্তায় কেনাকাটায় বেরিয়ে ও বলল, 'তোমার পাশে এখন আমাকে বুড়ি-বুড়ি লাগে।'

আমি বললাম, 'তোমার কথার কোনও মাথামুন্ডু নেই!' কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ভালো লাগল।

আজকাল পাড়ায় আর অফিসে পরিচিত সকলেই বলে, আমার বয়েস নাকি বোঝা যায় না। ওরা এর রহস্য জানতে চায়। আমি বলি, 'সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি, তাই।'

'আমিও অনেকবার ছেড়ে দিয়েছি, ভাই। কিন্তু এমনই বদ অভ্যেস, আবার ঘুরে এসেছে।'

একদিন রাতে তারক হালদারের ফোন পেলাম।

'মিস্টার দত্ত, কেমন আছেন?'

'ভালো—'

'কোনওরকম অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না, না।'

'আমার ক্লিনিকের জন্যে একটা ছোট্ট উপকার করতে হবে আপনাকে। কালই আমি আমার পঞ্চাশটা ভিজিটিং কার্ড আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আজ থেকে ঠিক এক বছরের মধ্যে অন্তত চারজন ক্লায়েন্ট আমি চাই। মনে হয় না, চারজন স্মোকারকে সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কনভিন্স করাতে আপনার কোনও অসুবিধে হবে। আপনার বন্ধু, মিস্টার অনুপম মুখার্জি, আপনাকে নিয়ে মোট ছ'জনকে পাঠিয়েছে। সুস্থ সমাজ তৈরির জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, মিস্টার দত্ত। একাজে আপনারা সবাই যদি হেল্প না করেন, তা হলে...।'

'চারজনকে আ-আমি পাঠাব।' এরই নাম হুইসপারিং ক্যামপেইন!

তারক হালদার হাসলেন: 'জানতাম আপনি রাজি হবেন। ও হ্যাঁ, আমাদের এগ্রিমেন্টের ওই পয়েন্টটা মনে আছে তো? মানে, ট্রিটমেন্টের কায়দা একদম টপ সিক্রেট?'

'হ্যাঁ, ভুলিনি।'

'থ্যাঙ্ক যু। আমরা কিন্তু নজরদারির কাজ চালিয়ে যাচ্ছি—' তারক হালদারের গলাটা হঠাৎই কেমন ঠান্ডা শোনাল। সঙ্গে-সঙ্গে খরগোশটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। ডক্টর হালদার ফোন রেখে দিলেন।

এর মাসদেড়েক পর একদিন বিকেলে নিউ মার্কেটে অনুপমের সঙ্গে দেখা হল আমার। ও একা নয়—সঙ্গে রোহিণীও ছিল।

অনুপমের বউকে আমি এই প্রথম দেখলাম। ফরসা, লম্বা, সুশ্রী। চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। অনুপম আমার সঙ্গে ওর বউয়ের আলাপ করিয়ে দিয়ে মজা করে বউকে বলল, 'আমার দশবছরের হাওয়া-দোস্ত, বুঝলে! বলতে গেলে, শুধু এয়ারপোর্ট আর প্লেনেই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। কলেজ লাইফের পর এই প্রথম কলকাতার ডাঙায় দেখা হল, কী বলিস?' কথা শেষ করে আমার কাঁধ চাপড়ে দিল অনুপম। একটু থেমে আবার বলল, 'রাজীব, তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। ডায়েটিং করে স্লিম হয়েছিস?'

'না রে, আমি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। ডক্টর তারক হালদার আমার জীবনটা একেবারে বদলে দিয়েছেন।' আমার বুকের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছটফট করছিল।

অনুপম আমার দিকে গভীর চোখে তাকাল। আমিও ওকে দেখলাম। এখন আমরা সত্যিকারের বন্ধু। পরস্পরের গোপন ব্যথা আমরা জানি।

ঠিক তখনই রোহিণীর বাঁহাতের কাটা কড়ে আঙুলটা আমার নজরে পড়ল।

গোলাপের জন্য গোলাপ

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল সুনীল। না, কোথাও কোনও খুঁত নেই। ভালোবাসায় হাবুডুবু খাওয়া এক দিগভ্রান্ত যুবক। আজ সকাল থেকেই ওর বুকের ভেতরে উলটোপালটা শব্দ হচ্ছে। কেমন একটা ভয়ও আঁকড়ে ধরেছে একইসঙ্গে। গোলাপ ওর কথা শুনবে তো!

এই তো সেদিন...সন্ধেবেলা...ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হ্রদের কিনারে বসে গোলাপের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল।

ঝগড়ার সূত্রপাত খুবই সামান্য ব্যাপার থেকে।

গোলাপ বলছিল, নানারঙের পাখি পুষতে ওর ভীষণ ভালো লাগে। সেই কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে সুনীল বলেছিল, 'পাখির মাংস খেতে আমার খুব ভালো লাগে।'

এই কথায় চোখ কপাল তুলে গোলাপ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছিল সুনীলের দিকে। তারপর চাপা গলায় নির্মম সুরে বলেছে, 'ছিঃ! তুমি পাগল না রাক্ষস!' এবং উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় আঁচল ঘুরিয়ে হনহন করে হাঁটা দিয়েছে। পড়ন্ত বিকেলের রোদ গোলাপের পিঠে মোলায়েম হাত রেখে পৌঁছে দিয়েছে বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে পিচের রাস্তায়।

তার পর থেকে গোলাপ আর ফিরে আসেনি সুনীলের কাছে।

সুনীল কত চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু গোলাপ দেখা করেনি। সুনীল কতবার যে টেলিফোন করেছে ওর বাড়িতে! কিন্তু গোলাপ একটিবারের জন্যেও 'বাড়ি ছিল না।'

সুনীল একা-একা বিছানায় মুখ গুঁজে কত দিন কত রাতে চোখের জল ফেলেছে। তারপর ও ঠিক করেছে গোলাপকে রাস্তায় খুঁজবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গোলাপের খুব প্রিয়। হয়তো কোনও একদিন সন্ধেবেলা ও চলে আসবে সেখানে। নয়তো উলটোদিকের নৃত্যরত ফোয়ারার রঙিন আলোর ছ'টায় হঠাৎই একদিন দেখা যাবে গোলাপকে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রয়েছে চঞ্চল জলধারার দিকে। সুন্দর সবসময়েই গোলাপকে টানে—চুম্বকের মতো টানে।

তাই প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা সুনীল গোলাপকে খুঁজতে বেরোয়। গোলাপের পছন্দ মতো সেজেগুজে একগুচ্ছ গোলাপ হাতে নিয়ে ও ছায়া-নেমে-আসা রাস্তায় আকুল হয়ে খোঁজে অভিমানী মেয়েটাকে। একগুচ্ছ টাটকা গোলাপের সঙ্গে থাকে সুন্দর হাতের লেখায় আঁকা কয়েকটি লাইন। সাদা কার্ডের মোলায়েম আস্তরে নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে সুনীল লিখেছে :

বন্ধুত্ব করব বলে শত্রুতা করেছিলাম,

ভাব করব বলেই আমি সেদিন আড়ি করেছিলাম,

নতুন করে বাঁচব বলে সেদিন আমি মরেছিলাম।

গোলাপের দেখা পেলেই সুনীল ওর পথ আগলে দাঁড়াবে। গোলাপফুলের গুচ্ছ আর কবিতার কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলবে, 'গোলাপ, এই দ্যাখো, তোমার জন্যে গোপাল ফুল নিয়ে এসেছি। আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না, লক্ষ্মীটি। এতদিন মরে ছিলাম...এখন আমাকে দয়া করে বাঁচিয়ে তোলো। তুমি কি জানো, যাকে ভালোবাসি তাকে ভালোবাসতে না-পারলে কী কষ্ট!'

সুনীল জানে তারপর কী হবে।

গোলাপ টানা-টানা চোখ মেলে ধরবে সুনীলের করুণ মুখের ওপর। ওর চোখের কোণে অশ্রুর ফোঁটা চিকচিক করে উঠবে। গাছের ছায়ার আড়ালে সুনীলের বুকের ওপরে আছড়ে পড়বে গোলাপ। ওর বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলে উঠবে কান্না মেশানো গলায়, 'তুমি আমাকে ছেড়ে আর কখনও চলে যেয়ো না। যাবে না তো?'

প্রত্যেক শনিবার সুনীল যখন পরিপাটি সেজেগুজে তৈরি হয়ে রাস্তায় পা রাখে তখন ওর বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়তে থাকে। আজ নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে গোলাপের সঙ্গে। গোলাপের অভিমান ভাঙবে তো! গোলাপ শুনবে তো সুনীলের কথা! তারপর... তারপর শুধুই রঙিন ফোয়ারার মতো জীবন, যে-জীবনে কান্না নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। বাতাসে ভর করে ভালোবাসার ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দেবে ওরা দুজনে। চিরদিনের জন্য।

আজও ঠিক এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সুনীল। পকেটে হাত দিয়ে কবিতার কার্ডটা একবার অনুভব করল। তারপর একটা ফাঁকা ট্রামে চড়ে বসল।

ধর্মতলায় নেমে নিউ মার্কেট থেকে একগুচ্ছ লাল গোলাপ কিনল সুনীল। সোনালি রাংতা দিয়ে সেটাকে সুন্দর করে মুড়ে দিল ফুলের দোকানদার। তারপর সেলোফেন পেপারে মুড়ে গোলাপের তোড়াটা তুলে নিল নবীন যুবকের হাতে।

প্রৌঢ় দোকানি চশমার পুরু কাচের ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে দেখছিল সুনীলকে। ভালোবাসার বয়েসটাকে সবাই ভালোবাসে। কী সুন্দর চেহারা ছেলেটার! প্রাণবন্ত টগবগে যুবক। মনে হচ্ছে, ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে এক্ষুনি ছুট লাগাবে ওর ভালোবাসার মেয়ের কাছে। মেয়েটা যত দূরেই থাক, এই যুবকের কাছে সেটা মোটেই দূর নয়। গোটা পৃথিবী এখন ওর হাতের মুঠোয়।

দোকানদারকে ফুলের দাম মিটিয়ে দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে রাস্তায় নেমে এল সুনীল। কী অপরূপ সুন্দর এই গোপাল ফুলগুলো! তবে গোলাপের চেয়ে বেশি সুন্দর নয় মোটেই। সুনীল ফুলের তোড়াটাকে নাকের কাছে নিয়ে এল। আলতো করে ঘ্রাণ নিতে চাইল তাজা গোলাপের। ওর মনে পড়ে গেল গোলাপের কথা। দুই গোলাপ যখন মুখোমুখি হবে তখন কী দারুণ হবে! সময় থেমে যাবে আচমকা। পাখিরা গাছের পাতার ফাঁকে ঘুম ভেঙে সুরেলা শিস দিয়ে উঠবে। গাঢ় অন্ধকার ছায়া-ছায়া পথ চোখের পলকে ভেসে যাবে পড়ন্ত বিকেলের সোনালি রোদে। বারবার সূর্য উঁকি দেবে পুব আকাশে। সূর্যাস্ত বলে আর কিছু থাকবে না।

সন্ধে গাঢ় হয়েছে। রাস্তার এপাশে-ওপাশে বিদ্যুতের আলোর ঝিলিক। সার বেঁধে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে চলেছে অসংখ্য গাড়ির চাকা। গাড়ির হেডলাইটের আলো, গাড়ির সারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চকিতে রাস্তা পার হয়ে যাওয়া ব্যস্ত পথচারী, নানা সুরের অধৈর্য হর্ন, আর অজস্র মানুষের ভিড়—সব মিলিয়ে এক গোলকধাঁধা। সুনীলের কেমন পাগল-পাগল লাগছিল। ও চটপট পা চালিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিট পিছনে ফেলে পৌঁছে গেল চওড়া রাস্তায়। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথ ধরে পার্ক স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। এদিকটায় ভিড় অনেক কম। ও বেশ নিশ্চিন্তে গোলাপের কথা ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে চলল। ওর কোনও তাড়া নেই। সন্ধে আরও ঘন হোক, আঁধার হোক। তখনই গোলাপকে খুঁজে পেতে সুবিধে হবে। সুনীলের ঠোঁটে তখনও গুনগুন গানের কলি: '...ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়...'।

বিড়লা তারামণ্ডলের কাছে পৌঁছে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল সুনীল। ওকে অতিক্রম করে চলে যাওয়া প্রতিটি মেয়েকে খুঁটিয়ে নজর করে দেখল। না, গোলাপ নেই। তখন...কতক্ষণ পর কে জানে...ও হাঁটতে শুরু করল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। বড়-বড় গাছপালায় সাজানো রাজপথ এখন আরও অন্ধকার, আরও রহস্যময়।

হঠাৎই দূর থেকে হেঁটে আসা একটি মেয়েকে দেখতে পেল সুনীল। মেয়েটি একা নয়। তার সঙ্গে একজন পুরুষ রয়েছে। হালকা শীতের বাতাস কেটে যেন ভেসে-ভেসে ওরা এগিয়ে আসছে। মেয়েটি গোলাপ নাকি? এরমধ্যেই সুনীলকে ভুলে গিয়ে অন্য পুরুষকে পছন্দ করে ফেলেছে! অসম্ভব! একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল সুনীল। আরও একটু কাছাকাছি এগিয়ে আসুক ওরা। তখন ভালো করে দেখা যাবে।

কিন্তু ওরা দুজনে আরও এগিয়ে আসতেই তৃতীয় একজন পুরুষকে দেখতে পেল সুনীল। লোকটার ভাবভঙ্গি এমন, যেন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনকে অনুসরণ করছে সে।

কে ওই লোকটা? সুনীলের মতোই কেউ...যে তার নিজের গোলাপকে খুঁজছে! না কি...।

হঠাৎই ভয় পেল সুনীল। ওই লোকটা সেই লোকটা নয় তো!

গত তিন বছরে চারজন মানুষ খুন হয়ে গেছে এই এলাকায়। তিনজন তরুণী, একজন যুবক। অচেনা অজানা কোনও বিকৃত মনের নৃশংস মানুষ ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে খতম করেছে ওই চারজন হতভাগাকে। পুলিশ অনেক ফাঁদ পেতেও ধরতে পারেনি খুনিকে।

মনটা কু-ডাক ডেকে উঠল সুনীলের। গোলাপের কিছু হয়নি তো!

ঠিক তখনই সেই পুরুষ ও রমণী সুনীলের কাছে পৌঁছে গেল। অচেনা দুটো মুখ। নিজেদের কথাতেই ওরা বিভোর। সুনীলকে ওরা খেয়ালই করল না। সহজ ছন্দে পা ফেলে ওরা সুনীলকে পেরিয়ে গেল।

না, অনুসরণ করে আসা লোকটাকেও ওরা দেখতে পায়নি।

কিন্তু ওই লোকটা দেখতে পেল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সুনীলকে।

অনুসরণের কাজ বন্ধ রেখে সে চকিতে সরে এল গাছের গুঁড়ির দিকে—সুনীলের খুব কাছে।

লোকটার চেহারা পেটানো। অন্ধকারে মুখচোখ স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে না। পরনে ফুলহাতা শার্ট, কালচে রঙের প্যান্ট। লোকটার বাঁ-হাতে নলের মতো পাকানো কিছু কাগজ—হয়তো খবরের কাগজ।

সুনীল ভয় পেয়ে হকচকিয়ে গেল।

লোকটা একটু রুক্ষ অথচ চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, এখানে একা-একা ঘুরঘুর করছেন কেন?'

'না...মানে...এমনই...মানে একজনের আসার কথা আছে...।'

সুনীলের নিষ্পাপ বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটার কেমন মায়া হল। আশ্চর্য! কত বয়েস হবে এই ছেলেটার? বাইশ, তেইশ...নয়তো বড়জোর চব্বিশ। এর মনে কি এতটুকু ভয়ডর নেই?

তখনই সুনীলের হাতে-ধরা ফুলের তোড়াটা দেখতে পেল সে। লোকটার ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি খেলে গেল। ছেলেটার মুখ দেখেই বোঝা গিয়েছিল, বেচারা নবীন প্রেমিক। ফুলের তোড়াটা দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল। প্রেমে পড়লে ভয়ডর নির্ঘাত কমে যায়।

লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে সুনীলের মুখের ওপরে আলো ফেলল। ভয়ে সুনীলের বুক কেঁপে উঠল।

'নাম কী? কোথায় থাকেন?' প্রশ্ন দুটো শেষ হওয়ামাত্রই আলো নিভে গেল।

সুনীলের গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু অনেক চেষ্টায় কোনওরকমে যা-হোক-কিছু উত্তর দিল ও।

সেটা শুনে লোকটা বলল, 'এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। জায়গাটা ভালো নয়। কাগজে পড়েননি, এদিকটায় তিন-চারটে মার্ডার হয়ে গেছে।'

কথা বলার সময় আধো-আঁধারিতে লোকটার দাঁত দেখা গেল।

সুনীল ঠোঁটের ওপরে জিভ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি...আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। মানে...এই ফুলটা দিয়েই...।'

লোকটা হাসল, বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি। সেটা না-বুঝলে আপনাকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করতাম। আমরা সন্ধের পর থেকে এই এলাকায় রেগুলার ওয়াচ রাখছি। যান, যান—জলদি কেটে পড়ুন।'

লোকটা আর দাঁড়াল না। জোর পায়ে হেঁটে চলে গেল বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের দিকে।

সুনীলের বুক ঠেলে স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ওঃ, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। ফুলের তোড়াটাই আজ বোধহয় ওকে বাঁচিয়ে দিল।

গোলাপ ফুলের তোড়াটার কথা মনে পড়তেই ওর মনে পড়ে গেল অন্য গোলাপের কথা। সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হয়ে পড়ল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

অন্ধকার পথে পা চালিয়ে যাওয়ার সময় সুনীলের বুকের ভেতরে এক অদ্ভুত বাজনা শুরু হয়ে গেল। গোলাপের খোঁজে যখনই ও এখানে আসে তখনই এই বাজনার শব্দ শুনতে পায়।

নির্জন শুনশান এলাকা পেরিয়ে সুনীল চলে এল আরও নির্জন এলাকায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সদর দরজা, নাচনি-ফোয়ারা সব পিছনে ফেলে ও এগিয়ে এসেছে। রাস্তার ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের কমলা রঙের আলো। তারই কিছু অংশ শুয়ে আছে ফুটপাথে।

অনুসন্ধানী চোখে এদিক-ওদিক তাকাল সুনীল। কোথায় গোলাপ? ওই তো! আনন্দে চোখে জল এসে গেল সুনীলের। এতদিনে তা হলে অপেক্ষা শেষ হল!

রাস্তার ওপারে গাছের ছায়ার আড়ালে ধীরে-ধীরে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েটি। কমলা রঙের আলো ওর সুঠাম শরীরে লুকোচুরি খেলছে।

চট করে রাস্তা পার হয়ে ওর কাছাকাছি চলে গেল সুনীল। একটা গাড়ি গর্জন তুলে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল রাস্তা দিয়ে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

'গোলাপ!' সুনীল ভালোবাসার গলায় ডেকে উঠল।

গোলাপের ফাঁপানো হর্স টেইল করা চুল। চুলের গোড়ায় রঙিন বো। এ ছাড়া পারফিউমের গন্ধও যেন ভেসে এল সুনীলের নাকে।

'গোলাপ, আমি এসেছি—।'

মেয়েটি ঘুরে তাকাল। পাউডারে-পাউডারে মুখ ফ্যাকাসে, ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিকের রং। নাকে নাকছাবি, কপালে কাচপোকা টিপ।

সুনীলের দিকে কটাক্ষ হেনে তাকিয়ে পেশাদারি গলায় ও বলল, 'পঞ্চাশ টাকা লাগবে। বারগেইনিং চলবে না।'

'গোলাপ!' গাঢ় স্বরে বলল সুনীল।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, 'গোলাপ বলে ডাকো আর জবা কি শেফালি বলে ডাকো—ওই পঞ্চাশ টাকাই লাগবে।'

সুনীলের বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। ও কার জন্য গোলাপ নিয়ে এসেছে! এ তো গোলাপ নয়! এ তো একটা খারাপ মেয়ে! গোলাপ, গোলাপ তুমি কোথায়?

গোলাপের তোড়াটা হাত থেকে ফেলে দিল সুনীল। অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল মেয়েটির প্রায় গায়ের ওপরে। কড়া পারফিউমের গন্ধে সুনীলের গা গুলিয়ে উঠল। প্যান্টের পকেট থেকে চোখের পলকে ও একটা ছুরি বের করে নিল। বোতাম টিপতেই ঝকঝকে ফলাটা ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এল সামনে।

মুহূর্তে মেয়েটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। চিৎকার করার জন্য বিশাল মাপের হাঁ করে ফেলল ও। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

এতবড় আস্পর্ধা! চিৎকার করতে চাইছে! একলহমায় সুনীলের ছুরি নিষ্ঠুরভাবে ছোবল মারল মেয়েটির গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, কিন্তু সুনীল থামল না। আবার ছুরি চালাল, ছুরি চালাল, ছুরি চালাল...।

মেয়েটি লুটিয়ে পড়েছে ধুলোর ওপরে, তবে একফোঁটা চিৎকার করতে পারেনি। ও গোলাপ নয়, তাই ওর বেঁচে থাকার মানে হয় না। সুনীলের শুধু গোলাপকে চাই, আর কাউকে না, কাউকে না! তিনটি বছর ধরে ও একনাগাড়ে গোলাপকে খুঁজে চলেছে, কিন্তু পায়নি।

সুনীলের সারা শরীরে উত্তেজনায় কাঁপছিল। ছুরিটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল ও। ওর জামাকাপড় রক্তে ভেসে গেছে। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই। গাছের আড়ালে গিয়ে জামাকাপড় খুলে সেগুলো লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে সুনীল। তারপর শুধু অন্তর্বাস পরে ও চলে যাবে নিরাপদ জায়গায়। তবে যাওয়ার আগে গোলাপের তোড়াটা নিয়ে যেতে ও ভুলবে না। কারণ, পুলিশের জন্য কোনও সূত্রই ও রেখে যেতে চায় না।

ওকে যে এখনও অনেকবার গোলাপের খোঁজে আসতে হবে!

আমার স্ত্রীর আততায়ী

ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা দেখেই বুকটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল।

কোনও-কোনওদিন অফিস থেকে ফিরে দরজা যে সামান্য খোলা পাই না তা নয়। কিন্তু আজ এমনভাবে এমন ভঙ্গিতে দরজার পাল্লাদুটো খোলা রয়েছে যে, দেখামাত্রই একটা অশুভ ঘণ্টা বুকের ভেতরে ঢং-ঢং করে বাজতে শুরু করেছে। ঘুমন্ত মানুষ ও মৃতদেহের মধ্যে ঠিক এইরকম তফাতই বুঝি থাকে। অজান্তেই বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে।

চকিতে নজর চলে গেল হাতঘড়ির দিকে। সাড়ে সাতটা সবে পেরিয়েছে। রোজ এরকম সময়েই অফিস থেকে ফিরি। বন্ধ দরজায় ঠকঠক করলে কুসুম এসে দরজা খুলে দেয়। সকালে আমি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সারাটা দিন বলতে গেলে ও একাই থাকে। শুধু কাজলের মা এসে সকাল-বিকেল দু-বেলার ঠিকে কাজটুকু সেরে দিয়ে যায়। কুসুমকে সবসময় বলি দরজা বন্ধ করে সাবধানে থাকতে। দরজায় কেউ নক করলে হুট করে দরজা না-খুলতে। ওর সুবিধের জন্য দরজায় একটা 'ম্যাজিক আই' বসিয়ে দিয়েছি। যাতে দরজায় দাঁড়ানো মানুষটিকে ভেতর থেকেই ও দেখতে পায়। বুঝতে পারে সে চেনা কি অচেনা।

ফ্ল্যাটের দরজার আলোটা জ্বলছিল। পঁচিশ পাওয়ারের বালব। এ-বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলোর বেশিরভাগেরই দরজায় কোনও আলো নেই। বালব লাগানোর দরকার মনে করেনি ভাড়াটেরা। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ-খরচ বাঁচিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী কুসুম একা থাকে। রাতে দরজায় কেউ নক করলে 'ম্যাজিক আই' দিয়ে নজর করে আগন্তুককে ওর দেখা দরকার। তাই আমি বিদ্যুৎ খরচের কথা ভাবিনি।

খোলা দরজা পেরিয়ে সরু একচিলতে করিডর। ডানদিকে রান্নাঘর আর বাথরুম। দুটোই অন্ধকার। বাঁদিকে বসবার ঘর। সেখানে আলো রয়েছে। সামনে শোওয়ার ঘর। সেখানেও আলো জ্বলছে।

কুসুমের নাম ধরে মাঝারি গলায় বারদুয়েক ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই। বুকের ধুকধুকানি বাড়তে লাগল।

জুতোজোড়া করিডরে একপাশে চটপট খুলে রেখে বসবার ঘরে ঢুকলাম। আবার কুসুমের নাম ধরে ডাকলাম।

বসবার ঘর খালি। একজোড়া সোফা, টেবিল, বুককেস, ফুলদানি—সবই জায়গামতো পরিপাটি করে সাজানো। ঘরে কেউ নেই। এসেছিল বলেও মনে হয় না। কারণ সোফার গদিতে কোনও গভীর ছাপ নজরে পড়ল না।

উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় প্রথমে খেয়াল করিনি। কিন্তু এখন একধরনের থমথমে নীরবতার মধ্যে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর কানে এল। ভেতরে শোওয়ার ঘরে কেউ যেন কথা বলছে। কিন্তু সদর দরজা হাট করে রেখে শোওয়ার ঘরে বসে কুসুম কারও সঙ্গে কথা বলবে কি? বসবার ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলাম। প্রায় ছুটে শোওয়ার ঘরে গেলাম। পুরুষের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেই একটা ভীষণ ধাক্কা খেলাম।

যে-লোকটির কথা বসবার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম এখন তাকে দেখতে পেলাম। টিভি-র চৌকো ফ্রেমের মধ্যে সে অভিব্যক্তিহীন মুখে খবর পড়ছে। ঘরে কেউ নেই। গোটা ঘর লন্ডভন্ড। যেন একডজন কালবৈশাখী জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে হাডুডু খেলেছে।

প্রথমেই চোখে পড়ে বিছানা। কুসুম খুব গোছানো স্বভাবের মেয়ে। ঘর গোছানো ওর শখ। কিন্তু এখন, এইমুহূর্তে, বিছানার যে-হাল চোখে পড়ছে তা আর বলার নয়। বেডকভারটা কেউ খামচে টেনে এনেছে খাটের কিনারায়। কিছুটা অংশ শাড়ির আঁচলের মতো ঝুলছে। বম্বে ডাইং-এর সুন্দর চাদরটা ছিঁড়ে ফালাফালা। একটা বালিশ মেঝেতে। অন্য আর-একটা বিছানার মাঝখানে। ফেটে তুলো বেরিয়ে এসেছে। অন্য বালিশগুলোও এলোমেলো।

টিভি-তে পড়া খবরের একটা শব্দও আমার কানে ঢুকছিল না। বুকের ভেতরে বারবার বাজ পড়ছিল। চেষ্টা করে চোখের নজর পরিষ্কার রাখতে হচ্ছিল।

চট করে হাত বাড়িয়ে টিভি অফ করে দিলাম। নিস্তব্ধতার প্যারাশুট নিঃশব্দে ঘরে নেমে এল। আমি কুসুমের নাম ধরে নরম গলায় বারকয়েক ডাকলাম। দেখছি ঘর খালি, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছিল, আমি যদি তেমন করে ডাকতে পারি তা হলে কুসুম নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনও উপায়ে কোথাও-না-কোথাও থেকে আমার সামনে এসে হাজির হবে।

অগোছালো ঘরের ছোট-বড় টুকিটাকি চিহ্নগুলো একে-একে নজরে পড়ছিল। ড্রেসিং-টেবিলের আয়না ভেঙে চৌচির। মাকড়সার জালের মতো ফাটল একটা বিন্দু থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আয়নার পরিসীমার দিকে। ড্রেসিং-টেবিলে সাজিয়ে রাখা চিরুনি, পাউডার, লিপস্টিক, সিঁদুর—সবই এখন ছত্রখান। কুসুম সাজতে ভালোবাসত, সাজাতে ভালোবাসত। এখন কষ্ট করেও সেটা বোঝবার উপায় নেই।

মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একটা পেতলের ফুলদানি, জল, থেঁতলানো রজনীগন্ধার স্টিক, কাচের চুড়ির টুকরো, ভাঙা শাঁখা, আর ছোট মাপের কয়েকটা কালচে ছোপ। রক্ত কি না জানি না। পরীক্ষা করে দেখতে ভয় করল।

আমার কান্না পাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে এই ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরে। ভাঙা গলায় কুসুমের নাম ধরে আবার ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই।

এখন কী করব? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব, না পুলিশে খবর দেব? সন্দেহ নেই, চোর, লুঠেরা অথবা ডাকাতের দল হানা দিয়েছিল ফ্ল্যাটে। কিন্তু তারপর তারা কী করেছে? কুসুমকে কিডন্যাপ করেছে, না কি...?

ভয়ঙ্কর কতকগুলো সম্ভাবনা মাথায় রঙিন বালবের মতো দপদপ করে উঠল। মাথায় হাত চেপে ছন্নছাড়া মেঝেতে বসে পড়লাম। শরীরের ভেতর থেকে তৈরি হয়ে নির্লজ্জভাবে বেরিয়ে আসা থরথর কাঁপুনিকে চেষ্টা করেও বশে আনতে পারলাম না। আর ঠিক তখনই একটা অস্পষ্ট চাপা গোঙানির শব্দ আমার কানে এল। আমাকে দারুণভাবে চমকে দিল।

বেডকভারটা খাটের কিনারায় ঝুলে থাকায় খাটের তলাটা একরকম আড়ালই হয়ে গিয়েছিল। মনে হল যেন গোঙানির শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেলাম। একটানে বেডকভারটাকে ফেলে দিলাম মেঝেতে। খাটের তলায় চোখ গেল। কুসুম—অথবা কুসুমের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম।

খাটের তলায় আধো অন্ধকার, তবে দেখতে কোনও অসুবিধে হল না। বিচিত্র ভঙ্গিতে দলা পাকিয়ে কুসুম পড়ে রয়েছে। জায়গার অভাবে একটা ট্রাঙ্ক আর একজোড়া সুটকেস খাটের নীচে থাকত। সেগুলো এখন ছিটকে গেছে দেওয়ালের গায়ে কোণের দিকে। সেই একটা সুটকেস অদ্ভুতভাবে আঁকড়ে ধরে কুসুম কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। গোঙাচ্ছে।

কুসুম। কুসুম!—অনেক কিছু মিশে ছিল এই ডাকের মধ্যে উদ্বেগ, ভয়, স্বস্তি, আনন্দ, আরও কত কী!

ঝুঁকে পড়ে খাটের নীচে ঢুকে গেলাম খানিকটা। হাত বাড়িয়ে কুসুমকে ধরলাম। ছোঁওয়ামাত্রই ও যেন আঁতকে উঠল। ছিটকে সরে যেতে চাইল আমার কাছ থেকে। একটা অদ্ভুত চাপা-আর্তনাদ করে উঠল।

আমি অন্ধকারের মধ্যেই ওর কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম। বললাম, কুসুম, আমি রণবীর—রুণু।

তারপর ওকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম খাটের তলা থেকে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলাম ছত্রখান বিছানায়। দেখলাম, সেখানে ও চমৎকার মানিয়ে গেছে। কারণ, ওর শরীরটাও ছত্রখান।

খোঁপা খুলে চুল এলোমেলো। সিঁদুর ঘষে গিয়ে ফরসা কপাল লালচে। ডান-চোখের নীচটা বিশ্রীভাবে ফুলের রয়েছে, কালসিটে পড়ে গেছে। বাঁ-গালে ছোট-ছোট দুটো ক্ষতের দাগ, চামড়া কেটে মাংস দেখা যাচ্ছে। ওপরের ঠোঁট জখম হয়ে কষ বেয়ে রক্তের দাগ নেমেছে। একইরকম রক্তের দাগ দেখলাম হাতে, বাহুতে, কোমরে। শাড়ি ছিঁড়ে জট পাকিয়ে কোমরের কাছে জড়ানো। ব্লাউজ গলার কাছে টান মেরে ছেঁড়া। ধবধবে গলায়, বুকে, নখের আঁচড়ের কয়েকটা সমান্তরাল দাগ চোখে পড়ল। অন্তর্বাস জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ছিঁড়েছে ব্লাউজের হাতা, কোমরের কষি।

সব মিলিয়ে সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

কুসুম কোনওরকমে চোখ খুলে আমাকে দেখতে চেষ্টা করল। তারপর আমার কোলে মুখ গুঁজে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। আমি ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল।

কুসুম, কী হয়েছিল?

যতটা সম্ভব শুশ্রূষা, পরিচর্যা করে কুসুমকে কিছুটা সুস্থ করে তুলেছি। এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দিতে যাব। কিন্তু তার আগে, সবকিছু জানাজানি হওয়ার আগে, পরিস্থিতির ওজনটুকু আঁচ করা দরকার।

কুসুমের সামনে যতই সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তুলি না কেন ভেতরে-ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর রাগ দাপাদাপি করছিল। যে করেই হোক, আমার বউয়ের ওপরে এই অত্যাচারের শোধ তুলতেই হবে। যেমন করেই হোক বদলা আমার চাই-ই চাই। অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে শুয়ে থাকা কুসুমকে আবার নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছিল, কুসুম?

দুর্বল অস্পষ্ট গলায় থেমে-থেমে বহুক্ষণ ধরে ও যা বলল তার সারমর্ম হল এই: হাতের কাজ-টাজ সেরে রোজকারমতো ছটা বত্রিশে ও টিভি দেখতে বসে। কাজলের মা তার একটু আগেই চলে গেছে। কতক্ষণ টিভি দেখেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ শোনে দরজায় কেউ নক করছে। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল, নক করার ভঙ্গিটা ঠিক আমার মতো। ভেবেছিল, আমি হয়তো অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। তবুও অভ্যাসবশে দরজার কাছে গিয়ে ও 'ম্যাজিক আই'-এ চোখে রাখে। যে নক করছিল সে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল, কারণ, শুধু তার কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল।। আর আশ্চর্য, যে-নীল রঙের জামাটা কুসুমের চোখে পড়ে আমার ঠিক সেইরকম একটা জামা আছে—যদিও আজ অন্য রঙের জামা পরে আমি অফিসে গেছি। কিন্তু সেইমুহূর্তে কুসুমের সেটা খেয়াল হয়নি। মোটামুটিভাবে আমি ফিরে এসেছি ভেবেই ও দরজা খুলে দেয়।

লোকটি ঢুকেই বলে যে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, একটু অপেক্ষা করবে। অস্বস্তি হলেও কুসুম তাকে ঠিক মুখের ওপরে 'না' বলতে পারেনি। বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলেছে। কিন্তু মনে আছে, লোকটা সোফায় না-বসে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। অপরিচিত একজন পুরুষ ফ্ল্যাটে ঢোকার ফলে ইচ্ছে করে ফ্ল্যাটের দরজাটা ও আর বন্ধ করেনি। হাট করে খুলে রেখে দিয়েছে। তারপর চায়ের আয়োজন করবে বলে শোওয়ার ঘরে আসে কাচের আলমারি খুলে সুদৃশ্য কাপ-প্লেট বের করার জন্যে: অতিথি-অভ্যাগত এলে তবেই এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শোওয়ার ঘরে ঢুকে আলিমারির কাছে পৌঁছনোর আগেই দরজায় একটা শব্দ শুনতে পায় কুসুম। পেছন ফিরে দেখে সেই লোকটা শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তখন তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। কুসুম কিছু একটা বলতে যাবে, তার আগেই লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। দাঁত বের করে হেসে বলে, 'শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন কেন, মাইরি!' কুসুম চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু সেই চিৎকার আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা বোধহয় শুনতে পায়নি। প্রথমত, ভয়ে কুসুমের গলা প্রায় বুজে গিয়েছিল, তাই চিৎকারের আওয়াজটা হয়তো ঠিকমতো বেরোয়নি। দ্বিতীয়ত, ঘরে টিভি চলছিল। আর তৃতীয়ত, 'সান্ধ্য আইন' অনুযায়ী এ-বাড়ির প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাটেই জোরাল ভলিয়ুমে টিভি চলে।

এরপর যা হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কুসুমের পক্ষে অস্বস্তিকর। লোকটা হঠাৎই খ্যাপা জানোয়ার হয়ে ওকে আক্রমণ করে। কুসুম নিজেকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণপণ লড়াই করেছে। শেষ মরিয়া হয়ে ও ঢুকে পড়ে খাটের তলায়। ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে। হঠাৎই সিঁড়ির কাছে কয়েকজনের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ শোনা যায়। লোকটা তাতেই কেমন যেন ভয় পেয়ে কুসুমের মুখে একটা ঘুষি মেরে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ওকে ছেড়ে দেয়। ওর তখন মাথা ঝিমঝিম করছে, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে রয়েছে,

শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করার মতো সাড়টুকুও নেই। দেখল, লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারির আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লোকটা চলে যেতেই কুসুম বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। কারণ, আমার ডাকে চেতনা ফিরে পেয়ে ও আমাকেই হঠাৎ সেই আততায়ী বলে মনে করেছিল।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কুসুম বারবার কেঁদে ফেলছিল। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলাম। আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ জ্বালা করছিল। অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কা আমার টুটি টিপে ধরছিল বারবার।

শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্নই করলাম ওকে।

লোকটাকে কেমন দেখতে? আবার দেখলে চিনতে পারবে?

কুসুম ইতস্তত করে বলল, গায়ের রং কালো। মুখ ভালো করে দেখিনি—আর আমার মুখের ওপরে যখন মুখ নিয়ে এসেছিল তখন কিছু দেখে থাকলেও মনে নেই। তবে মনে হয়, লোকটার ঠোঁটের নীচে ডানদিকে একটা বড় আঁচিল ছিল। আর ভুরু দুটো খুব ঘন, জংলা—তার নীচ দিয়েই লোকটার চকচকে চোখজোড়া তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। আর...।

আমার মনে পড়ল, কুসুম বলেছে লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসেছিল। তাই জিগ্যেস করলাম, লোকটার দাঁতগুলো মনে আছে?

কুসুম ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার চোখে। তারপর বলল, সত্যিই তো একদম খেয়াল করিনি—লোকটার ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত অর্ধেকটা ভাঙা ছিল। এছাড়া আর কিছু মনে নেই।

আর কিছু? আমি মনে-মনে হাসছিলাম।। আততায়ীর যে খুঁটিনাটি বর্ণনা কুসুম দিয়েছে তাতে একে খুঁজে বের করতে পুলিশের সাতদিনও লাগবে না—যদি অবশ্য আমি পুলিশে খবর দিই। চেষ্টা করলে আমি নিজেও হয়তো ওই ইতর ছোটলোকটাকে খুঁজে বের করতে পারব। লোকটাকে খুঁজে পাবই, এ-বিশ্বাস মনের মধ্যে নিশ্চিত হলেও একটা ব্যথা বুকের ভেতরে আঁচড় বসাচ্ছিল বারবার: কলকাতা শহরে এত বাড়ি থাকতে ওই ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত আততায়ী আমার ফ্ল্যাটটাই বেছে নিল। বুঝতে পারছি, আমার নামটা জানতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি। কারণ, সেটা প্ল্যাস্টিকের হরফে ফ্ল্যাটের দরজার গায়েই লেখা আছে।

কুসুমকে বললাম, আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।

আমাদের বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে ডক্টর দাস থাকেন। অসুখ-বিসুখ হলে উনিই আমাদের দেখেন। ওঁর নানারকম বিলিতি ডিগ্রি আছে। ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময় কুসুমকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বললাম, আমার গলা না পেলে তুমি একদম দরজা খুলবে না। শুধু আজ বলে নয়, কোনওদিনই এরকম হুট করে আর দরজা খুলবে না।

কুসুম সেই তখন থেকেই মুখ নামিয়ে রয়েছে। আমার দিকে যেন সহজভাবে তাকাতে পারছে না। আমার কথায় কুসুম ছোট্ট করে বলল, হুঁ। তারপর দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

আমি সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম।

ডক্টর দাস অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে কুসুমকে পরীক্ষা করলেন।

আমি শোওয়ার ঘরের দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ কাটছিলাম। ঘরটা আমিই ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করেছি। আতঙ্কের দুনিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাইরেটুকু অন্তত। শুধু ভাঙা আয়নাটা স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘরটা দেখে, কুসুমকে দেখে, বিশ্বাসই হতে চাইছে না কোনও আততায়ী মাত্র ঘণ্টাদেড়েক আগে ঢুকে পড়েছিল এই ঘরে।

সিঁড়িতে কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ শুনে লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে যারা উঠছিল বা নামছিল, তারা নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাটবাড়িরই বাসিন্দা বা তাদের আত্মীয়স্বজন। আমার ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা দেখেও তারা কৌতূহলী হয়নি, ফ্ল্যাটের ভেতরে উঁকি মারেনি। নিজেদের মনে ঠাট্টা-মশকরাও করতে-করতে চলে গেছে। যদি কেউ একবার ফ্ল্যাটে ঢুকত তা হলে ওই লোকটা নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। আমি এ-বাড়িতে কিছুদিন হল এসেছি। এখনও ভালো করে সবার সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়নি। সেই জন্যেই কি সিঁড়ির মানুষগুলো আমার ফ্ল্যাটের খোলা দরজাকে উপেক্ষা করেছে? না কি এটাই ওদের অভ্যাস?

ডক্টর দাস কুসুমকে ইঞ্জেকশান দিলেন। তারপর ব্যাগ গুছিয়ে উঠে এলেন। আমাকে ডেকে বললেন, একটু বাইরে আসুন—কথা আছে।

করিডরে বেরিয়ে আসার আগে লক্ষ করলাম, কুসুম কৌতূহলী নজরে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে।

বসবার ঘরের কাছে এসে ডক্টর দাস আমার দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন: ওষুধগুলো আনিয়ে নিন। প্রথম ট্যাবলেটটা রাত দশটা নাগাদ খাইয়ে দেবেন, বাকিগুলো কাল থেকে শুরু হবে। সব লেখা আছে। এখন ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়েছি—রেস্ট দরকার। যা ধকল গেছে!

আমি যন্ত্রের মতো সব কথা শুনে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শেষ কথাটায় একটা ধাক্কা খেলাম। চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ডক্টর দাস তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, আরে না, না! ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই।—আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন সান্ত্বনার ঢঙে।—আপনি যা ভাবছেন সেরকম কিছু হয়নি। ভাগ্যিস লোকটা মাঝপথে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

কুসুমের কাছে শোনা সব কথাই ডক্টর দাসকে খুলে বলেছি। কিছুই লুকোইনি। আমি ওঁর মুখটা লক্ষ করছিলাম। লক্ষ করতেই-করতেই পকেট থেকে ভিজিটের টাকা বের করে ওঁর হাতে দিলাম। শুনতে পেলাম উনি আরও বলছেন; ইউ আর এ লাকি ডগ। নেহাত কপাল ভালো, নইলে আরও অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। যাকগে, এ-নিয়ে আর থানা-পুলিশ করে কোনও ঝামেলা করতে যাবেন না যেন। সেরকম কিছু হলে তখন না-হয় থানা-পুলিশ করতেন। প্রতিবেশী হিসেবে এটাই আমার সাজেশান।

আমি অবাক হয়ে বিলিতি ডিগ্রিওয়ালা মধ্যবয়েসি ডাক্তারবাবুকে দেখছিলাম। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক আমার স্ত্রীকে আক্রমণ করল, তাকে অপমান করল, এমনকী মারধোরও করল, সেটা আমাকে মুখ বুজে সইতে হবে! অবশ্য ডাক্তারি মতে আমার স্ত্রীর 'সতীত্ব' ক্ষুণ্ণ হয়নি। হলে পরে থানা-পুলিশ, হইচই, আরও অনেক কিছু করা যেত।

করিডরের উলঙ্গ বালবের আলো ডাক্তার দাসের মুখে পড়েছে। উনি এমনিতে ফরসা, তবে এখন কেন যেন ভীষণ কালো দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো কেমন চকচক করছে। ভুরু দুটো কী ঘন, জংলা! ইস, ঠোঁটের নীচে ডানদিকে যদি একটা বড় আঁচিল থাকত, আর ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত যদি খানিকটা ভাঙা থাকত! জানি না, ওঁর এই চেহারাটা কুসুমের নজরে পড়েছে কি না। পড়লে হয়তো ও আঁতকে উঠত।

ডক্টর দাস ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোনোর সময়েও বারবার বলতে লাগলেন, ওঃ আপনার স্ত্রী খুব বাঁচান বেঁচে গেছে, মশাই, খুব বাঁচান বেঁচে গেছে। কলকাতা শহর বলে কথা, এখানে একটু সাবধানে না-থাকলে চলে—।

উনি চৌকাঠ পেরোনোমাত্রই আমি দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কি খেয়াল হতে 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রাখলাম। দেখলাম, নীল জামা পরা একটা শরীরের অংশ দরজার ওপিঠে সরে গেল।

পরদিন সকালেই অন্যান্য ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল।

মনে হল, গতকাল ওরকম একটা ঘটনা না-ঘটলে ওদের সঙ্গে কবে ভালো করে আলাপ হত কে জানে! হয়তো কোনওদিনই হত না। কী করে ওরা খবর পেল জানি না, আমি ওদের কিছু বলিনি। কিন্তু গতকাল রাতে কি ওরা খবর পায়নি? কাল তো কেউ আসেনি। আজ, এই রোদ-ঝকঝকে সকালে, ওরা এসে হাজির। ওদের দেখলে মনে হয় পৃথিবীর কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই—কোনওদিন ছিল না।

আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়লাম। কুসুমের এখন বিশ্রাম দরকার। তা ছাড়া, এমন একটা সময়ে অপরিচিত মানুষগুলোর মুখোমুখি হওয়াটা ওর কাছেও রীতিমতো অস্বস্তিকর। কিন্তু কাউকে সে কথা বলতে পারছিলাম না, আর ওরাও নিজে থেকে বুঝতে পারছিল বলে মনে হল না। যথাসম্ভব সংক্ষেপে গতকালের ঘটনা ওদের বলতে একরকম বাধ্য হয়েছি।

নানাজনে নানা কথা বলছিল।

আচ্ছা, আমাদের পাড়ার পুঁটেদা, চ্যাংলাদা, ওদের দলের কারও কি সামনের দাঁত ভাঙা আছে?

রণবীরবাবু, আপনি খবরের কাগজের আপিসে যান। ওদের সব খুলে বলুন। এইসব রেপ কেসগুলো আজকাল বড্ড বেড়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ নাড়াচাড়া হওয়া দরকার।

আমার মনে হয়, ঘটনাটা পুলিশে জানানো উচিত। লোকটা যখন একবার এই বাড়িটা নোট করে গেছে তখন আবার এখানে ঘুরে আসতে পারে। আপনার ফ্ল্যাটে হয়তো আর কিছু করবে না, তবে আমাদের কারও ফ্ল্যাটে হানা দিতে পারে। আপনারা কি বলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সিকিওরিটি বলে একটা ব্যাপার আছে তো!

আমার স্ত্রীও তো মশাই সারাটা দিন একা বাড়িতে থাকে!

চ্যাটার্জিদা, আপনার ওসব ভয় নেই! বুড়োবুড়িদের ফ্ল্যাটে ওসব লোক ঢুকবে না।

তুমি তো ভালো কথাই বললে, ভায়া! আমাদের বুড়ো-বুড়ির না-হয় ভয় নেই, কিন্তু ছুঁড়ি ঝি-টা রয়েছে না!

ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী যেন নাম? লতা, তাই না। হ্যাঁ, ওর চেহারাটা বেশ ডাগর-ডোগর...

আপনার স্ত্রীর কমপ্লিট রেস্ট দরকার। একটা মেন্টাল চাপও তো গেছে। আপনি না-হয় কিছুদিন অফিস ছুটি নিয়ে নিন।

যদি বলেন তো আমি লোক্যাল থানায় ইনফর্ম করতে পারি। থানার ও.সি. আমার চেনা।

আপনার স্ত্রীর ক্ষমতা আছে। ওইরকম একটা অবস্থার মধ্যেও লোকটার চেহারা মনে রেখেছে। দেখবেন, পুলিশ দু-দিনেই লোকটাকে পাকড়াও করে ফেলবে।

শুনেছি এসব লোকদের আবার না কি পুলিশে হাত থাকে। কে জানে, ধরার দু-দিন পরে আবার ছেড়ে দেবে কি না। তখন লোকটার আক্রোশ আরও বাড়বে।

আচ্ছা, আপনি আমাদের সত্যদাকে একটু ধরুন না।

সত্যদা?

আরে আমাদের লোক্যাল এম-এল-এ। সত্যরঞ্জন চাকলাদার। শুনেছি উনি লোক্যাল লোকেদের খুব হেল্প-টেল্প করেন। ওঁর হেল্প পেলে লোকটার সাজা হবেই হবে। গ্যারান্টি।

চলি, আমার আবার আপিস যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

ভাবছি, বউকে আর ছেলেকে ক'দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে রেখে আসব।

আপনিও সেখানে চলে যান না, মিস্টার গুপ্ত, তা হলে একটা ফ্ল্যাট খালি হয়। আমার শালা অনেকদিন ধরে বলছিল।

কেন, আমার কি শালা নেই নাকি?

চলি, কাল আবার খবর নেব।

খবরের কাগজের ব্যাপারটা ভুলবেন না যেন।

চলি—।

ওরা সব চলে গেল। আমি বসবার সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম। জানি, কর্তারা অফিস-কাছারিতে বেরিয়ে গেলেই এরপর একে-একে এ-বাড়ির নানা ফ্ল্যাটের মেয়েরা-বউরা আসবে। কিন্তু এখন কী করব? কী করা উচিত? নাঃ, থানায় খবর একটা দেওয়া দরকার। আমি খবর না-দিলেও অন্য কেউ খবরটা দিতে পারে। সকলের সিকিওরিটির ব্যাপার রয়েছে।

সুতরাং কাজলের মাকে সতর্ক থাকতে বলে, কুসুমকে ওষুধ খাইয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোলাম। ডক্টর দাস আজ রাতে একবার দেখতে আসবেন বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তার বোধহয় আর দরকার হবে না। ঠিক করলাম থানায় যাওয়ার পথে ওঁর বাড়িতে জানিয়ে দেব।

রাস্তায় পা দিয়ে প্রতিটি পথচারীকে আমি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। খুঁজতে লাগলাম নীল জামা, জংলা ভুরু, আঁচিল, আর ভাঙা দাঁত। এই শহরেই কোথাও-না-কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে শয়তানটা।

আমার শরীর আবার জ্বালা করছিল।

রেপ কেস?

ডায়েরির খাতায় ওপরে পেনসিল থামিয়ে অফিসারটি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারলাম না।

ও-সির সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনিই একজনকে ডেকে আমাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ঘরটা বেশ বড়। তিনটে টেবিল, গোটাচারেক চেয়ার আর কয়েকটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। মাথার ওপরে, পরস্পরের কাছ থেকে কিছুটা দূরে দুটো জম্পেশ ফ্যান ক্যাঁচক্যাঁচ করে ঘুরছে।

ফাঁকা ঘরে মিনিটকয়েক অপেক্ষা করার পর একজন উর্দি পরা অফিসের খাতা-পেনসিল হাতে নিয়ে ঢুকেছেন। হয়তো এস-আই টেস-আই হবেন। আমার মুখোমুখি বসে খাতা খুলে প্রথমেই আমার নাম-ঠিকানা সব টুকে নিলেন। তারপর বললেন, কী কমপ্লেন আছে বলুন।

আমি মোটামুটি সব খুলে বলতেই তিনি বললেন, রেপ কেস?

এটা প্রশ্ন না মন্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অফিসার পেনসিল দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। শব্দ করে ডায়েরির খাতাটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাই তুলে বললেন, লোকটা ধরা পড়লে আপনার স্ত্রীকেই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। উকিলদের জানেন তো, ওদের মুখে কিছু আটকায় না। কাঠগড়ায় আপনার বউকে দাঁড় করিয়ে উকিলরা অনেক খারাপ-খারাপ প্রশ্ন করবে। যেমন, লোকটা ঠিক কী-কী করেছে। শরীরের ঠিক কোথায়-কোথায় হাত লেগেছে। তারপর, ধরুন, ইয়ে করার সময় আপনার বউ ঠিক কী-কী ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সরকারি ডাক্তাররা আপনার স্ত্রীকে নানা পরীক্ষা করে দেখবে, জোর করে —মানে ইয়ের সময় জবরদস্তির চিহ্ন আছে কি না...।

হঠাৎই টেবিলে দু-হাতের ভর দিয়ে অফিসার সামনে ঝুঁকে এলেন। আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, পারবেন এসব সহ্য করতে?

আমি মিনমিন করে বললাম যে, উনি যা ভাবছেন ঠিক তা নয়। মানে, এটা ঠিক রেপ কেস নয়। বরং অ্যাসাল্ট বা মলেস্টেশান বলা যেতে পারে। আমি সেইরকমই একটা অভিযোগ দায়ের করতে চাই। সোশ্যাল সিকিওরিটির একটা ব্যাপার রয়েছে...।

অফিসার অবাক চোখে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর হেসে বললেন, আপনি তো আজব লোক মশাই। রেপ-টেপের ব্যাপার কিছু হয়নি আর ফালতু-ফালতু ডায়েরি লিখিয়ে গায়ে কাদা ছেটাতে চাইছেন! আপনি জানেন...

অফিসার আরও কী-সব বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। আমি একনজরে অফিসার ভদ্রলোককে দেখছিলাম। ওঁর বাঁ-গালের ওপরে একটা আঁচিল রয়েছে। গায়ের রঙ কালো। মোটা জংলা গোঁফ। সামনের কোনও দাঁত ভাঙা নেই।

খুব ইচ্ছে করছিল ওঁর গালের আঁচিলটা একখাবলায় তুলে নিয়ে ঠোঁটের নীচে ডানদিকে বসিয়ে দিই। গোঁফজোড়া উপড়ে নিয়ে সমান দু-ভাগে কেটে বসিয়ে দিই চকচকে দু-চোখের ওপরে সূক্ষ্ম ভুরুর জায়গায়। আর ভারি নোড়ার গুঁতোয় ভেঙে দিই ওপরের পাটির সামনের একটা দাঁত। তারপর শুধু একটা নীল জামা পরিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা।

হঠাৎ দেখি আমার চোখের সামনেই আঁচিলটা গালের ওপর দিয়ে হেঁটে পৌঁছে গেল ঠোঁটের নীচে ডানদিকে। গোঁফজোড়া জায়গা ছেড়ে উঠে এল, দুভাগে ভাগ হয়ে বসে গেল ভুরুর ওপরে। একটা অদৃশ্য নোড়া যেন দাঁতের পাটিতে গুঁতো মারল। একটা নীল জামা...।

আমি বললাম, ডায়েরিটা ক্যান্সেল করে দিন।

এরপর থানা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

এখন কী করা উচিত? কুসুমের নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা আমাকে যে করতেই হবে। আর ওই অত্যাচারের শোধ নিতে চেয়েছিলাম, তাই-বা নেব কেমন করে? শরীরের ভেতরে রক্ত যেন ফুটছে।

অজান্তেই আমার পা-জোড়া এগিয়ে যাচ্ছিল সত্যরঞ্জন চাকলাদারের পার্টি-অফিসের দিকে, কিন্তু আমি জোর করে তাদের থামালাম। রাস্তার গনগনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে সত্যরঞ্জন চাকলাদারের মুখটা ভেসে উঠছিল: গায়ের রং কালো, চকচকে চোখ, জংলা ভুরু, ঠোঁটের নীচে আঁচিল, ভাঙা দাঁত। আমি জানি, সত্যি-সত্যি যদি ভদ্রলোককে ওরকম দেখতে নাও হয়, আমার স্ত্রী আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শুনলেই তাঁর মুখের চেহারার রদবদল হবে। শেষ পর্যন্ত ওই একইরকম হয়ে যাবে। এমনকী প্রতিবেশীদের পরামর্শমতো খবরের কাগজের অফিসে গেলেও সেখানকার সাংবাদিক বা সম্পাদকের চেহারাও হয়তো পালটে যাবে একইভাবে। সুতরাং বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

ফেরার পথে আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, রাস্তার প্রত্যেকটি মানুষকে একইরকম দেখতে; কালো রং, চকচকে চোখ, জংলা ভুরু...।

জানি, বাড়ি ফিরে গিয়ে অন্যান্য ফ্ল্যাটের মানুষগুলোকে যদি দেখতে পাই তা হলে তাদেরও হয়তো একইরকম চেহারা দেখব। সত্যিই কি গোটা শহরের প্রত্যেকটি মানুষ একইরকম দেখতে হয়ে গেছে? এবং গতকাল রাতের ঘটনার জন্য কি আমি, আমরা, প্রত্যেকটি মানুষ, সমানভাবে দায়ী? আমরা প্রত্যেকেই কি সমানভাবে কুসুমের আততায়ী?

তাই যদি হয়, তা হলে এখন থেকে শোওয়ার ঘরের ওই ভাঙাচোরা আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার বেশ ভয় করবে।

রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল

আপনি 'সুনন্দা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই আপনাকেই শোনাব এই বিচিত্র কাহিনি। তারপর আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব: যদি পারেন আমাকে একটু সাহায্য করবেন, কারণ আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে। শুধু আমি কেন, আপনার কাছ থেকে সামান্য একটু সাহায্য পেলে প্রায় দেড়শোটা পরিবার বেঁচে যাবে। ওদের সকলের সমস্যা মাথায় নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি উদভ্রান্তের মতো। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোয় এলোমেলোভাবে উঠে পড়ছি, নেমেও পড়ছি একইভাবে। যে-কোনও স্টেশন থেকে ট্রেন ধরছি, নেমে পড়ছি যে-কোনও স্টেশনে। ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি একজনকে। রাতের ট্রেনেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

ঘটনাটা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, তবে যা বলব তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।

আমি একটা পত্রিকা অফিসে কাজ করি। সেই হাউসের চারটি ম্যাগাজিন আছে। তিনটি ইংরেজি, একটি বাংলা। বাংলা পত্রিকাটি পাক্ষিক। নাম 'চারুলতা'। নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পত্রিকাটির চরিত্র 'সুনন্দা'র মতোই। আমি এই পত্রিকার সারকুলেশানের দায়িত্বে রয়েছি।

তিন বছর ধরে 'চারুলতা' প্রকাশিত হচ্ছে। নামী লেখকরা নিয়মিত এই পত্রিকায় লেখেন। অনেক খরচ করে যত্ন নিয়ে এই রঙিন পাক্ষিকটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিন বছরে এই পত্রিকার সারকুলেশান পনেরো হাজারেও পৌঁছয়নি।

আমাদের হাউসের মালিক সর্বেশ্বর নাগ অনেক আশা নিয়ে ম্যাগাজিনটি বের করেছিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার আগে চুলচেরা মার্কেট সার্ভে করা হয়েছিল। তার পজিটিভ আউটকাম দেখেই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

তিন বছর ধরে আমি মুখে রক্ত তুলে 'চারুলতা'-র বিক্রি বাড়াতে চেষ্টা করেছি। ইস্টার্ন রিজিওনের বাঙালি অঞ্চলে ঘনঘন টুর করেছি। কিন্তু কিছুতেই 'চারুলতা'-র মাইনাস পয়েন্ট বের করতে পারিনি।

গত কয়েকমাসে মিস্টার নাগ আমাকে ডেকে বেশ কয়েকবার প্রচ্ছন্ন ধমক দিয়েছেন। যার অর্থ হল, যদি আগামী ছ-আট মাসে ম্যাগাজিনের বিক্রি বাড়াতে না-পারি, তা হলে উনি ম্যাগাজিন বন্ধ করে দেবেন। আর যদি শুধু ইংরেজি পত্রিকাই বের করতে হয়, তা হলে কোনও অবাঙালি বিজনেস পার্টনার নিয়ে দিল্লি বা মুম্বই থেকে তিনি সেগুলো বের করবেন। অর্থাৎ, কলকাতা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেবেন। যার বাংলা মানে হল, প্রায় দেড়শো স্টাফ বেকার হবে। সেইসঙ্গে দেড়শো পরিবার এক চরম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবে।

এইরকম একটা বিপন্ন অবস্থায় আমি পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর কাজে আসাম আর উত্তরবঙ্গ টুরে গিয়েছিলাম। অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম ফেলে দুটো সপ্তাহ মরিয়া হয়ে কাজ করেছি। তারপর নিতান্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে উঠে পড়েছি হাওড়া ফেরার ট্রেনে।

নভেম্বরের শেষ। এ-সময়ে কলকাতায় শীত তেমন জাঁকিয়ে না-বসলেও এদিকটায় ঠান্ডা আছে।

আমার ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে দূরপাল্লার যাত্রী কেউ ছিল না। তাই কারও সঙ্গেই তেমন করে আলাপ জমেনি। কিন্তু সন্ধের পর একটা বড়সড় ব্রিফকেস হাতে এমন একজন যাত্রী কেবিনে ঢুকলেন, যাঁর চেহারা রীতিমতো নজর কেড়ে নেয়।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে। ফরসা স্বাস্থ্যবান শরীর। পরনে গাঢ় রঙের সুট, টাই। মাথার সামনেটা টাক পড়লেও পিছন দিকে ঘন কাঁচাপাকা বাবরি চুল। কপালে সমান্তরাল কয়েকটা ভাঁজ। চোখে কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচ এতই পুরু যে, কয়েকটা সাদা রিঙের মতো দাগ চোখে পড়ছে।

ভদ্রলোকের পুরুষ্টু গোঁফ আর জুলপি দেখে মনে হয় এককালে মিলিটারিতে ছিলেন। মুখেও সেই ধাঁচের একটা রাশভারী ভাব। আর তীব্র চোখের নজর যেন তির বেঁধানো।

কামরায় উঠেই ভদ্রলোক একটা চুরুট ধরালেন। তারপর ব্রিফকেস খুলে একটা বই বের করে নিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। বইটার নামটা অদ্ভুত বলেই আমার মনে আছে: ‘হেটেরোসাইক্লিক কেমিস্ট্রি।’

আমি ‘সুনন্দা’-র নতুন সংখ্যাটা নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আজই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ওটা কিনেছি। পত্রিকাটা কী ম্যাজিক জানে আমি বলতে পারব না। তবে লক্ষ করেছি, ম্যাগাজিনটা হাতে নিলে আমার আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ঘণ্টাখানেক পরেই কেবিনের অন্য দুজন যাত্রী নেমে গেল। ফলে কামরায় শুধু আমরা দুজন। আমার সহযাত্রী এইবার বোধহয় আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলেন।

‘হাওড়া পর্যন্ত যাবেন বুঝি?’ ওঁর গলার স্বর বেশ ভারী। ঠোঁটের কোণে সামান্য একচিলতে হাসি।

এইভাবেই আলাপ শুরু।

কথায়-কথায় আমার ম্যাগাজিনের কথা বললাম। ব্যাগ থেকে এককপি ‘চারুলতা’ দেখিয়ে বললাম, ‘আমি এই ম্যাগানিজের সারকুলেশান ডিভিশনের চিফ।’

ভদ্রলোক কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, ‘ম্যাগাজিনটা খুব একটা বিক্রি হচ্ছে না তো —।’

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ভেতরের খবরটা উনি কী করে জানতে পারলেন?

ভদ্রলোক সবজান্তা হাসি হাসলেন চাপা গলায়। তারপর বললেন, ‘না, না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি ‘চারুলতা’-র লোক হয়ে ‘সুনন্দা’ পড়ছেন, তাই বললাম —’চুরুটের ঘন ধোঁয়ায় নিজেকে ঝাপসা করে দিয়ে বললেন, ‘তা ছাড়া ম্যাগাজিন লাইনে আমারও একটু-আধটু ইন্টারেস্ট আছে।’

আমি আর কথা বাড়ালাম না। হাউসের সিক্রেট যাকে-তাকে বলা ঠিক নয়। তবে ভদ্রলোকের কথায় একটা ঠান্ডা অস্বস্তি আমার শিরদাঁড়ায় কাঁকড়াবিছের মতো হেঁটে বেড়াতে লাগল।

প্রশ্ন করে জানলাম, ভদ্রলোক পেশায় কনসালট্যান্ট। তবে ঠিক কীসের কনসালট্যান্ট তা উনি স্পষ্ট করে বললেন না। ওঁর কথায়, আচরণে, আর হাসিতে কোথায় যেন একটা রহস্য জড়িয়ে রইল। উনি আবার ওঁর কেমিস্ট্রি বইটায় মন দিলেন। আমিও 'সুনন্দা'-র পাতায় ফিরে গেলাম।

'সুনন্দা'-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা গল্পে আমার চোখ আটকে গেল। আমি ভুল দেখছি না তো! গল্পের নামটা একটু রহস্যময়। কিন্তু তার প্রথম লাইন দুটো আমাকে পাথর করে দিল।

রাতের ট্রেনে দেখা হয়েছিল

সোমদত্ত সেনচৌধুরী

আপনি 'সুনন্দা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। তাই আপনাকেই শোনাব এই বিচিত্র কাহিনি। তারপর আপনাকে একটা...

গল্পটা পড়তে-পড়তে আমি অন্য কোথাও হারিয়ে যাচ্ছিলাম। হুবহু আমার কথা লিখেছেন লেখক। আমাদের হাউসের গোপন খবর কেউ কি বেনামে গল্প লিখে ফাঁস করে দিচ্ছে? সোমদত্ত সেনচৌধুরী নামটা বেশ অদ্ভুত। চারটে পদবি নিয়ে তৈরি নাম। নিশ্চয়ই কারও ছদ্মনাম। কিন্তু এই ছদ্মনামের আড়ালে কে লুকিয়ে রয়েছে?

গল্পটায় ঘটনা হুবহু একইভাবে এগিয়েছে। অন্তত সহযাত্রী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত। তবে লেখকের পত্রিকার নাম 'চারুলতা' নয়, 'কাজললতা'। এ ছাড়া সবকিছুতেই আশ্চর্য মিল। এমনকী 'হেটেরোসাইক্লিক কেমিস্ট্রি' পর্যন্ত।

আমি নিশি-পাওয়া মানুষের মতো গল্পটা পড়তে শুরু করলাম :

...'সুনন্দা'-র পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কী মনে হওয়ায় ব্যাগ থেকে 'কাজললতা'-র নতুন সংখ্যাটা বের করলাম। 'সুনন্দা'-য় এমন কী আছে যা আমার পত্রিকায় নেই? এবারের টুরে পরের মাস থেকে সারকুলেশান কতটা বাড়বে কে জানে! যে করে হোক, আগামী ছ-মাসের মধ্যে সারকুলেশান আমাকে বাড়াতেই হবে। তা না-হলে মালিকের কাছ থেকে 'হে বন্ধু বিদায়।'

'সারকুলেশান কিছুতেই বাড়াতে পারছেন না, তাই না?' ভদ্রলোকের গম্ভীর গলা মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দিল আমার দিকে।

আমি চমকে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মিলিটারি গোঁফের কোণে দুর্জ্ঞেয় হাসি। হাতের চুরুট মাপে ছোট হয়ে এলেও তার ধোঁয়ায় তেজ কমেনি।

ভদ্রলোক আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বেশ মজা পেলেন। বারকয়েক মাথা নেড়ে বাবরি চুলে হাত চালিয়ে বললেন, 'ওপর-ওপর দেখলে মনে হবে 'সুনন্দা'-য় যা-যা আছে সবই আপনার ম্যাগাজিনে আছে। নামী-দামি লেখক, সুন্দর-সুন্দর ছবি, দামি কাগজ, ভালো ছাপা—বলতে গেলে তেমন কোনও তফাত নেই।'

আমি চটপট বারতিনেক ঘাড় নাড়লাম। কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছেন। কিন্তু কিছু বলতে গিয়ে টের পেলাম, আমার মুখের ভেতরে জিভটা যেন গিরগিটির খসখসে লেজ। একই সঙ্গে গলা শুকিয়ে কাঠ।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের বইটা ব্রিফকেসের ওপরে নামিয়ে রাখলেন। চুরুটে আয়েস করে ঘনঘন দুটো টান দিলেন। হাত নেড়ে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে নিছকই ট্রেনে আলাপ। এ বিষয়ে বেশি কথা বলা ঠিক হবে কি না জানি না। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছেন...তাই বলছি...।'

আমি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাতের ট্রেন কোনও একটা স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ট্রেনের খটাখট শব্দ হঠাৎ যেন কয়েক ধাপ বেড়ে গেল। বন্ধ কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস ঢুকছিল। কিন্তু আমি শীত গ্রাহ্য না-করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর চশমার ডান-কাচে কেবিনের একটা আলোর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওঁর বাঁ-চোখ লেন্সের ভেতর দিয়ে আমাকেই দেখছিল।

ভদ্রলোক সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, "সুনন্দা"-র বিক্রি আড়াই লাখেরও বেশি। শুধুমাত্র ভালো লেখা, ছাপা, রংচঙ বা দামি কাগজ দিয়ে এই সারকুলেশানে পৌঁছনো যায় না। এর অন্য একটা সিক্রেট আছে...।'

'কী সিক্রেট?' আমি চাপা গলায় প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রলোকের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়লাম।

ভদ্রলোক চুরুটটা আশট্রেতে গুঁজে দিয়ে সামান্য হাসলেন: 'সিক্রেটটা হল হিউম্যান কেমিস্ট্রি। আমি জানি, আপনি এর নাম শোনেননি—শোনার কথাও নয়। কারণ ব্যাপারটা সতেরো শতকের অ্যালকেমির মতোই খুব গোপনে চর্চা করা হয়...।'

হিউম্যান কেমিস্ট্রি! কেমিস্ট্রির এরকম কোনও শাখা আছে বলে কখনও শুনিনি। তা ছাড়া সেই ছোটবেলা থেকেই কেমিস্ট্রিকে ভয় পেয়ে বড় হয়েছি। প্রায় রোজই করুণাময় ঈশ্বরকে প্রাণপণে ডেকেছি, কবে কেমিস্ট্রি আমার নগণ্য জীবন থেকে অদৃশ্য হবে। আর শেষকালে ম্যাগাজিনের রেকর্ড সারকুলেশানের সিক্রেট কিনা 'ইয়ে' কেমিস্ট্রি!

'বুঝতে পারছি, রসায়নশাস্ত্র ব্যাপারটার প্রতি আপনার খুব একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। অ্যালকেমি সম্পর্কেও বেশিরভাগ মানুষের এইরকম ধারণা ছিল। অ্যালকেমি শব্দটার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে অপরসায়ন। কিন্তু যাঁরা জানার তাঁরা ঠিকই জানেন কোন-কোন ধাতু থেকে কীভাবে সোনা তৈরি করা যায়। সুতরাং, অ্যালকেমি একেবারে অলীক ব্যাপার নয়।'

প্রসঙ্গ পালটে যাচ্ছে দেখে আমি অধৈর্য হয়ে ভদ্রলোককে খেই ধরিয়ে দিতে চাইলাম: 'কিন্তু সারকুলেশানের সঙ্গে হিউম্যান কেমিস্ট্রির কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে—খুব গভীর সম্পর্ক। অ্যালকেমির মতো হিউম্যান কেমিস্ট্রিও খুব গোপনে চর্চা করা হয়। সারা পৃথিবীতে এই বিষয় নিয়ে এখন গবেষণা করছে বড়জোর

শ-দুয়েক বিজ্ঞানী। আমি এই লাইনে গবেষণা করছি প্রায় ৪০ বছর...।'

'আপনি যে বললেন, 'আপনি...ইয়ে...মানে, কনসালট্যান্ট?'

ভদ্রলোক ভরাট গলায় নীচু পরদায় হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ম্যাগাজিনের সারকুলেশান কনসালট্যান্ট—যদিও আসলে ব্যাপারটা পুরোপুরি হিউম্যান কেমিস্ট্রি।'

আমি আর থাকতে না পেরে একটু খোঁচা দিয়েই বললাম, 'আপনার ওই হিউম্যান কেমিস্ট্রি দিয়ে সারকুলেশান বাড়ানো যায় না কি?'

ভদ্রলোক বিন্দুমাত্রও আহত না-হয়ে জবাব দিলেন, 'একমাত্র হিউম্যান কেমিস্ট্রি দিয়েই কোনও ম্যাগাজিনের সারকুলেশান ফিনোমিনাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব—ঠিক যেমনটা "সুনন্দা" করেছে। দাঁড়ান, ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি...।

'আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকশন বা রিঅ্যাকশনের জন্যে আমাদের শরীরের ভেতরে নানারকম জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যায়। যেমন ধরুন, আপনি হঠাৎ রেগে গেলেন, কিংবা ভয় পেলেন, অথবা উত্তেজিত হলেন—এইরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার শরীরের ভেতরে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে। এই বিক্রিয়াগুলো এতই জটিল যে, এর অনেকটাই এখনও বিজ্ঞানীদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থেকে গেছে। আমাদের শরীরে কতরকম অ্যামিনো অ্যাসিড আর প্রোটিন মলিকিউল রয়েছে। এরা আবার নানারকম কেমিক্যাল চেইন তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে সে এক মিরাকিউলাস ব্যাপার। সেইজন্যেই এর বেশিরভাগটাই রহস্য থেকে গেছে।' একটু থেমে নতুন একটা চুরুট ধরালেন ভদ্রলোক। তারপর চুরুটে বারকয়েক টান দিয়ে জড়ানো গলায় বললেন, 'তবে আমি এই মিস্ট্রির কিছুটা সলভ করেছি। কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে যে আমাদের শরীরের ভেতর কী করতে পারে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।' হেসে কথা শেষ করলেন তিনি। ধোঁয়া ছাড়লেন আয়েস করে।

ভদ্রলোকের কেমিস্ট্রির কচকচি আর চুরুটের ধোঁয়ার কটু গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক কয়েকবার কেশে উঠলেন। তারপর মাথা নেড়ে ঠোঁটের কোণে হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, 'এবারে আসি ট্যাকটাইল ফিডব্যাকের কথায়...।'

'ট্যাকটাইল ফিডব্যাক?' নিজের অজান্তেই উচ্চারণ করে ফেললাম শব্দ দুটো।

'হ্যাঁ, ট্যাকটাইল ফিডব্যাক। মানে, আমাদের স্পর্শ অনুভূতির যে-খবর মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তাকেই বলে ট্যাকটাইল ফিডব্যাক। এই খবর পৌঁছনোমাত্রই আমাদের শরীরের ভেতরে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়...।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বলে উঠলাম, 'হিউম্যান কেমিস্ট্রি!'

ভদ্রলোক বেশ জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন। আচ্ছা, বলুন তো, কোনও কিছু টাচ করলে কী করে আপনি সেটা টের পান?'

'কেন, চোখে দেখে।' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলাম আমি।

'উহুঁ, হল না। চোখ বুজে টাচ করলে বুঝি টের পান না?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'হ্যাঁ, পাই।'

'শুধু তাই নয়, চোখ বুজে কোনও জিনিস ছুঁয়ে আপনি অনেক সময় এটাও বলে দিতে পারেন, জিনিসটা কী। যেমন, লোহা ছুঁলে যেরকম অনুভূতি হবে কাঠ ছুঁলে সেরকম হবে না। তেমনই কাচ, কাপড়, কিংবা কোনও মেয়ের নগ্ন শরীর—এসবের স্পর্শ অনুভূতিও একরকম নয়। এক-একরকম স্পর্শ অনুভূতির জন্যে আমাদের শরীরের ভেতরে এক-একরকম বিক্রিয়া হয়। একটা বিক্রিয়ার সঙ্গে আর একটা বিক্রিয়ার কোনও মিল নেই। দাঁড়ান, আপনাকে ব্যাপারটা একটু দেখাই...' বলে ভদ্রলোক চুরুটে জোরালো টান দিয়ে বাঁ-হাতে নিজের ব্রিফকেসটা খুলে ফেললেন। একটা মোটাসোটা ডায়েরি বের করলেন ভেতর থেকে। অতি ব্যবহারে পাতাগুলো সেলাই কেটে খানিকটা করে বেরিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক ডায়েরিটা খুলে সাবধানে তার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

আমি অদ্ভুত মানুষটিকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত পাগলের পাল্লায় পড়লাম না কি! হিউম্যান কেমিস্ট্রি, ট্যাকটাইল ফিডব্যাক...আমার কপালের পাশটা দপদপ করছিল।

'এই দেখুন—' বলে ভদ্রলোক খোলা ডায়েরিটা আমার সামনে এগিয়ে দিলেন।

ডায়েরির দুটো পৃষ্ঠা জুড়েই নানারকম রাসায়নিক সংকেত আর সমীকরণ। তবে একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত মনে হল। কেমিস্ট্রিতে আমার যেটুকু জ্ঞান, তাতে দেখেছি সবরকম রাসায়নিক সমীকরণেই শুধুমাত্র যোগচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের ডায়েরির খোলা পাতায় যে-সব সমীকরণ লেখা রয়েছে সে-গুলোতে উনি অকাতরে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্ন ব্যবহার করেছেন—ঠিক সরল অঙ্কের মতো। এ-আবার কী ধরনের রাসায়নিক সমীকরণ!

ভদ্রলোক শব্দ করে ডায়েরিটা বন্ধ করে রেখে দিলেন ব্রিফকেসের ভেতরে। চুরুটে টান দিয়ে কেবিনের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব কেমিক্যাল ইকুয়েশন আপনি কিছুই বুঝবেন না। কারণ প্রথাগত বিজ্ঞান এখনও এই বিচিত্র বিজ্ঞানের খবর পায়নি। হিউম্যান কেমিস্ট্রির এই বিক্রিয়াগুলো আমার গত ১৮ বছরের গবেষণার ফল।

'যাই হোক, যা বলছিলাম—' ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসে আমার দিকে সরাসরি তাকালেন, 'একটা বিশেষ ধরনের ট্যাকটাইল ফিডব্যাকের জন্যে শরীরের ভেতরে একটা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবার যদি এমন করা যায়, আপনি ছোঁবেন একটা জিনিস অথচ আপনার শরীরের ভেতরে তার জন্যে নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হবে না —হবে অন্য কোনও বিক্রিয়া। যার ফলে আপনার ব্রেন আপনাকে অন্যরকম অনুভূতির খবর দেবে। তা হলে কী হবে বলুন তো?'

'স্পর্শ অনুভূতির ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাবে।'

'ঠিক তাই। এবার ধরুন, আপনি একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছেন—বা ম্যাগাজিনটা স্রেফ ছুঁয়ে আছেন। অথচ যে-স্পর্শ অনুভূতি আপনার মস্তিষ্কে পৌঁছচ্ছে সেটা কাগজ ছোঁওয়ার নয়—আপনার যেন মনে হচ্ছে, আপনি আপনার প্রিয়তম নারীর নগ্ন শরীর ছুঁয়ে আছেন। তখন কী হবে?'

সারকুলেশান বাড়ানোর সঙ্গে হিউম্যান কেমিস্ট্রির সম্পর্কটা এবারে যেন আমি আঁচ করতে পারছি। তাই ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম।

ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'কিন্তু আমার চোখ তো দেখবে আমি একটা ম্যাগাজিন ছুঁয়ে আছি! তা হলে—।'

আমাকে বাধা দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। চোখ যে-ইনফরমেশান ব্রেনে পাঠাবে তার সঙ্গে ট্যাকটাইল ফিডব্যাকের ইনফরমেশান মিলবে না। তখন এই দুটো পরস্পরবিরোধী খবরের মধ্যে যেটা আপনার প্রিয় সেটাই আপনি মেনে নেবেন। এই কারণেই "সুনন্দা" পত্রিকাটা আপনি কখনও কাছ-ছাড়া করতে চান না। ওটা সবসময় আপনার হাতের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে।'

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বিমূঢ় চোখে আমার কোলের ওপর রাখা 'সুনন্দা' পত্রিকাটার দিকে তাকালাম। এটাই তা হলে ম্যাগাজিনটার গোপন ম্যাজিক!

' "সুনন্দা"-র ব্যাপারটা আমি ভালো করেই জানি,' ভদ্রলোক তখনও বলে যাচ্ছেন, 'আমি ওদের কনসালট্যান্ট। অবশ্য এটা ওরা সিক্রেট রেখেছে। "সুনন্দা"-র ট্যাকটাইল ফিডব্যাকের রাসায়নিক বিক্রিয়া পালটে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার ওই হিউম্যান কেমিস্ট্রির কারিকুরি। জানি, আপনার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যা সত্যি তাই আপনাকে বললাম...বিশ্বাস করা-না-করাটা আপনার ব্যাপার।'

'একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে...' একটু ইতস্তত করে আমি বললাম, 'ট্যাকটাইল ফিডব্যাকের ইনফরমেশানটা আপনি পালটাচ্ছেন কেমন করে?'

ভদ্রলোক আমার দিকে সরাসরি চোখ রেখে মুচকি হাসলেন। চুরুটে গভীর টান দিলেন। চুরুটের ডগার আগুনটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, 'ট্যাকটাইল ফিডব্যাক আমি চেঞ্জ করেছি পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন দিয়ে—।'

'পাইরোনিকি...।'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, পাইরোনিকি-অ্যামিনোথিলিন। প্রথাগত রসায়নশাস্ত্র কখনও এই কেমিক্যালটার নাম শোনেনি। এটা হিউম্যান কেমিস্ট্রির ব্যাপার...আমার ল্যাবরেটরিতে অনেক ঝঞ্ঝাট করে তৈরি। "সুনন্দা" যে-কাগজে ছাপা হয় তার মধ্যে এই কেমিক্যাল নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে দেওয়া আছে। এ-ব্যাপারে পেপার মিলের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। আর যে-কালিটা ওরা ছাপার জন্যে ব্যবহার করে তার মধ্যেও মেশানো আছে ওই পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন। এটাই হল "সুনন্দা"-র গোপন ম্যাজিক। তাই আপনাকে বলছিলাম, শুধুমাত্র ভালো লেখা, ছাপা, রংচঙ বা দামি কাগজ দিয়ে আড়াই লাখ প্লাস সারকুলেশানে পৌঁছনো যায় না—এর অন্য একটা সিক্রেট আছে। এবার তো সেই সিক্রেট আপনি জেনে গেলেন।'

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। কৌতুকের নজরে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

শীতের মধ্যেও আমার কপালে বোধহয় ঘাম জমছিল। ভদ্রলোকের এই অবিশ্বাস্য কাহিনি কি বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু 'কাজললতা'-র সারকুলেশানের যা অবস্থা তাতে মরিয়া হয়ে কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। আগামী ছ-আট মাসের মধ্যে সারকুলেশান বাড়ানোর কোনও ব্যবস্থা না করতে পারলে মালিক কলকাতার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবেন দিল্লি অথবা মুম্বইতে। সুতরাং ডুবে যাওয়া মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো আমি ভদ্রলোককে অনুনয়ের সুরে বললাম, 'আমাদের ম্যাগাজিনটার একটা হিল্লে করে দিন না। আর কয়েক মাসের মধ্যে যদি ওটার সারকুলেশান না বাড়াতে পারি...।'

ভদ্রলোককে আমার দুরবস্থার কথা খুলে বললাম।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, 'আপনার পজিশনটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তবে আমারও একটা অসুবিধে আছে। "সুনন্দা"-র সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। সেই কন্ট্রাক্ট পিরিয়ড শেষ হতে এখনও একটা বছর বাকি। আমি একটা ম্যাগাজিনের হয়ে কখনও পাঁচ বছরের বেশি কাজ করি না। কারণ, একটা ম্যাগাজিন চিরকাল সারকুলেশানের টপে থাকতে পারে না—অন্তত থাকা উচিত নয়—সেটাই ন্যাচারাল। সেই অর্থে আমি কখনও নেচারের বিরুদ্ধে যেতে চাই না। সুতরাং আপনার ম্যাগাজিনের সারকুলেশান কনসালট্যান্ট হতে আমার কোনও অসুবিধে নেই—শুধু ওই কন্ট্রাক্টের ব্যাপারটা ছাড়া। একটা বছর আপনাকে ওয়েট করতেই হবে।'

'এক বছর!'

আমার হতাশা দেখে ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'একটা বছর মানে ৩৬৫ দিন। ও দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। তা ছাড়া আমার ফিজের ব্যাপারটা নিয়েও আপনার মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। আপনি যেভাবে হোক একটা বছর ম্যানেজ করে নিন। তারপর আমি এসে গেলেই দেখবেন ম্যাজিক। তখন আপনার ম্যাগাজিন সোয়াহিলি ভাষাতে ছাপা হলেও এই পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের কৃপায় রমরম করে বিক্রি হবে—।'

খেয়াল করিনি কখন ট্রেনের গতি কমে এসেছিল। আর ভদ্রলোকও কাচের জানলা দিয়ে হঠাৎ একবার উঁকি মেরে আপনমনেই বললেন, 'ও, এসে গেছে।' তারপর চট করে ব্রিফকেস গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, 'চলি। যা বললাম, ওই একটা বছর কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিন।'

কেবিনের দরজা ঠেলে তিনি করিডরে পা রাখতেই আমি পিছু ডেকে বললাম, 'আপনার অ্যাড্রেসটা?'

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন আমার দিকে। মুচকি হেসে বললেন,'অ্যাড্রেসের দরকার নেই। এক বছর পর আমিই আপনার অফিসে ফোন করে কনট্যাক্ট করে নেব। "কাজললতা" তো, আমার মনে থাকবে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে আমি একা বসে রইলাম।

কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে স্টেশনের নামটা পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কুয়াশা আর টিমটিমে মলিন আলো আমার চেষ্টায় বাদ সাধল।

ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করল। আমি 'সুনন্দা' পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলাম। তারপর চোখ বুজে 'সুনন্দা'-র পাতায় হাত বোলাতে লাগলাম। মনে হল, একটা অদ্ভুত আমেজ যেন টের পাচ্ছি। পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিন তা হলে মিথ্যে নয়!

একটা বছর সত্যিই দেখতে-দেখতে কেটে গেল। কিন্তু কোনও টেলিফোন এল না আমার অফিসে। তারপর আরও দশটা দিন কেটে গেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক আমাকে ফোন করেননি।

মালিককে অনেক বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরে আমি পত্রিকাটা এখনও চালু রেখেছি। ওঁকে বলেছি ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা, পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের কথা। তাতে উনি খুব হেসে ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাতে এতটুকুও টলেনি। তাই আমি এখনও মরিয়া হয়ে একটা টেলিফোনের জন্যে

অপেক্ষা করছি। আমি জানি ফোন আসবেই। কারণ সেই ফোনটার ওপরে প্রায় দেড়শো পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আর 'সুনন্দা'-র পাঠক হিসেবে আপনাকে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ করব। যদি কখনও সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পান, দয়া করে আমাকে টেলিফোন করার কথাটা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, আমরা সবাই ওঁর মুখ চেয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছি।

আমিও অবশ্য একেবারে হাত গুটিয়ে বসে নেই। দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে—বিশেষ করে রাতের ট্রেনে—খেয়ালখুশিমতো উঠে পড়ছি। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই ভদ্রলোককে।

আমি জানি, একদিন-না-একদিন ওঁকে আমি খুঁজে পাবই। যে করে হোক খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।

গল্পটা শেষ করে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। হাত-পা কাঁপতে লাগল। কপালের কাছটায় একটা অদ্ভুত ব্যথা শুরু হয়ে গেল।

এমন সময় চমকে উঠে খেয়াল করলাম, ট্রেনের গতি কমতে শুরু করেছে। বোধহয় সামনে কোনও স্টেশন আসছে।

কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক ব্রিফকেস গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাচের জানলা দিয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে বললেন, 'চলি, আমার স্টেশন এসে গেছে—।'

আমি তখন মরিয়া হয়ে ওঁকে বললাম আমার ম্যাগাজিনের কথা।

তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে অনেক কথা জড়িয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রলোক আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে মসৃণ হেসে হাত নেড়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। সব বুঝতে পেরেছি। পাইরোনিকিঅ্যামিনোথিলিনের ব্যাপার তো! আসলে আমার সঙ্গে "সুনন্দা"-র কন্ট্রাক্ট শেষ হতে এখনও এক বছর বাকি। এই একটা বছর কোনওরকমে ম্যানেজ করে নিন, তারপর...।'

'আপনার অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বার যদি দেন—।'

ভদ্রলোক কেবিনের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। মুচকি হেসে বললেন, 'ওসবের দরকার নেই। এক বছর পর আমিই আপনার অফিসে ফোন করে কনট্যাক্ট করে নেব। "চারুলতা" তো, আমার মনে থাকবে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে শুধু চুরুটের গন্ধ ভেসে রইল।

তারপর এক বছর কেটে গেছে, কিন্তু আমার অফিসে কোনও ফোন আসেনি। বছর পেরিয়ে আরও দশদিন কেটে গেছে, কিন্তু ওই কনসালট্যান্ট ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি।

তবে আমি কিন্তু এখনও হাল ছাড়িনি। মরিয়া হয়ে একটা টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করছি। আর দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে—বিশেষ করে রাতের ট্রেনে—খেয়ালখুশিমতো উঠে পড়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই ভদ্রলোককে।

আমি জানি, একদিন-না-একদিন ওঁকে আমি খুঁজে পাবই। যে করে হোক খুঁজে আমাকে পেতেই হবে।

আর 'সুনন্দা'-র পাঠক হিসেবে আপনাকেও একান্ত অনুরোধ, যদিও কখনও সেই ভদ্রলোককে কোথাও দেখতে পান, দয়া করে আমাকে টেলিফোন করার কথাটা ওঁকে একবার মনে করিয়ে দেবেন। বলবেন, দেড়শোটা পরিবার ওঁর মুখ চেয়ে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে।

জঙ্গলে, চাঁদের আলোয়

মানুষ-নেকড়ে, অথবা নেকড়ে-মানুষ—ওরা যখন-তখন চেহারা পালটে ফেলতে পারে। এটাই ওদের ছদ্মবেশ। তবে ওদের চোখের তারায় থেকে যায় হিংস্র দ্যুতি আর ওত-পেতে-থাকা অপেক্ষার ছাপ। সবাই সে-দৃষ্টি চিনতে পারে না। যারা পারে তারা পারে। রাতের আকাশে চাঁদ ওদের আরও ক্ষুধার্ত, আরও উতলা করে তোলে। তখন ওরা ভদ্র-সভ্য ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়... পাগলের মতো নাচে... এই কাহিনির মতো।

শেষ কবে যে মানুষের স্বাদ পেয়েছি তা প্রায় ভুলেই গেছি। তা ছাড়া গ্রামের একেবারে শেষে মাঠঘাট পেরিয়ে কোনও মানুষ কখনও এই পুরোনো বাড়িটায় আসে!

প্রায় মাসখানেক আগে, ঝাপসাভাবে মনে পড়ছে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এসেছিল গুঁড়ো সাবান বিক্রি করতে। তখন সন্ধে হয়-হয়। শিবনাথ বুদ্ধি দিল ওদের চা-জলখাবার দিয়ে আটকে রাখতে। তারপর সন্ধে একটু বাড়তেই আমরা চারজন ওদের দিয়ে জলখাবার সেরে নিলাম। শিবনাথ পাগলের মতো খাচ্ছিল। ওর আবার খিদে একটু বেশি—আর অপেক্ষা করার ধৈর্যও বড় কম।

বাড়িটায় আমরা চারজন আস্তানা গেড়েছি। আমি, শিবনাথ, রমা আর বিনোদ। তার আগে, টিলার ওপাশে, আমি আর শিবনাথ জোড় বেঁধে বেশ ছিলাম। একদিন রাতে, পুকুরে জল খেতে গিয়ে রমা আর বিনোদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। ওরা দুজন খুশিমতন চেহারা পালটাচ্ছিল আর এ ওর ঘাড় কামড়ে ধরছিল, ফষ্টিনষ্টি করছিল।

আমরা ওদের চিনতে পেরেছিলাম, ওরাও আমাদের চিনতে পেরেছিল। তারপর থেকে আস্তানা খুঁজতে-খুঁজতে শেষে এই খাঁ-খাঁ করে পুরোনো বাড়িটায়। খিদে পেলে খাবার খুঁজতে চলে যাই টিলার ওপাশে, জঙ্গলে—অথবা, নদীর কিনারায় ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকরে।

এমনিতে মানুষ সেজে থাকতে আমাদের খারাপ লাগে না। লোকজনের সঙ্গে একটু-আধটু মিশে, ভাত-ডাল-পাঁউরুটি-বিস্কুট খেয়ে দিন কেটে যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ভেতরের লুকোনো জন্তুটা অস্থির হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন পাগলের মতো লাগে। রক্তের নেশাটা ভুলে থাকার জন্যে শিবনাথ তখন আমার ঘাড় কামড়ে আমাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে। ওই খিদে-তেষ্টার মধ্যেও বেশ টের পাই আমি আসলে রমণী।

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে শিবনাথ আজ আবার ওর পুরোনো পথ বেছে নিয়েছে। আমাকে ঘরের কোণে কোণঠাসা করে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরেছে প্রাণপথে।

আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিনোদ তেষ্টার চোখে আমাদের দেখছে। রমা আশেপাশে নেই—বাইরে কোথায় খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে।

এমনসময় দরজায় কেউ কড়া নাড়ল, সেইসঙ্গে স্পষ্ট চিৎকার: 'মাসিমা, মাসিমা!'

রাত প্রায় আটটা বাজে। কে ডাকতে এল এই অসময়ে?

শিবনাথ তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়ে ষাট-পেরোনো মোটাসোটা টাক মাথা এক প্রৌঢ়ের চেহারা নিল। বিনোদ সেজে গেল তার পঞ্চাশ-বাহান্নর গিন্নি। মুখে একগাল হাসি, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ, পরনে লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি।

আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। চট করে হয়ে গেলাম বছর কুড়ির সুন্দরী তরুণী, সতেজ ফুলের মতো ফুটফুটে। শিবনাথ আমার এই চেহারাটা বেশি পছন্দ করে। কিন্তু উত্তেজনার সময়, মনের স্বাভাবিক আবেগগুলো যখন স্বাধীন হয়ে পড়ে, তখন আর ছদ্মবেশটা ঠিকঠাক ধরে রাখা যায় না।

ঠিক সেইরকম রমা পেছনের খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল। ওর গায়ে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ।

আমাদের দেখেই ও বুঝতে পারল কী করতে হবে।

বাইরে থেকে আবার ডাক এল 'মাসিমা, দরজা খুলুন—।'

রমা পালটে গেল। ও হয়ে গেল আমার ছোট ভাই। বয়েস বারো বছর, গোলগাল ফরসা চেহারা—অল্পেতেই অভিমান করে ঠোঁট ফোলায়।

আমরা চারজনে এখন সুখী পরিবার।

বিনোদ এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুজন যুবক। একজনের হাতে দুটো ভারি ব্যাগ। আর-একজন বোধহয় এই এলাকারই ছেলে। মুখটা চেনা-চেনা।

বিনোদকে দেখে ছেলেটি বেশ আশা নিয়ে বলল, 'মাসিমা, একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট ছিল। মানে—' সঙ্গের ব্যাগওয়ালা যুবককে দেখিয়ে সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'এর নাম জিতেন দাস। চালাবাজারের মাঠে আজ রাত থেকে যাত্রা আছে। এ ইলেকট্রিকের লাইন করতে এসেছিল। ফেরার সময় ইস্টিশানে গিয়ে দেখে কেস জন্ডিস—লাস্ট ট্রেন মিস। তা রাতটা কোথায় এস্টে করাব...আমাদের তো জায়গা-ফায়গা নেই। তার ওপর বৃষ্টি হলেই কেস ক্যাচাল। তো লালটু বলল, আপনাদের বাড়িতে হেভি জায়গা আছে—মানে, রাতে এস্টে করা যায় তাই একে নিয়ে এলাম—শুধু আজকের রাতটা একটু শেলটার দিন। কাল ভোরেই এ চলে যাবে...।'

বিনোদের উত্তর দিতে একটু দেরি হল। কারণ, সব শুনে, আর ওদের শরীরের লোভনীয় গন্ধে ওর কথা বোধহয় জড়িয়ে যেতে চাইছিল।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দরজার কাছে। গলাখাঁকারি দিয়ে বিনোদকে সামান্য পাশে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নো প্রবলেম—তুমি শুধু আজ রাতটা কেন, দু-চারদিনও থেকে যেতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

বিনোদ সাত-তাড়াতাড়ি সায় দিল 'স্বামী'-র কথায়: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি অনায়াসে থাকতে পারো। 'তুমি' বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো!'

অভিনয়ের ব্যাপারে বিনোদ একেবারে জিনিয়াস। ওর শেষ কথাটার আগাপাস্তলায় মাতৃস্নেহ একেবারে উথলে উঠছিল।

সুতরাং ওর ভারী-ভারী ব্যাগসমেত জিতেন দাস ঢুকে পড়ল আমাদের বাড়িতে। ওর সঙ্গী ছেলেটি 'থ্যাঙ্ক ইউ মাসিমা' বলে এক কাঁধ বেঁকিয়ে হাঁটা দিল যাত্রার আসরের দিকে।

বিনোদ আমাকে ডেকে বলল, 'রিনি, জিতেনকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দে—' তারপর জিতেনকে লক্ষ করে বলল, 'তুমি বাবা হাত-মুখ ধুয়ে নাও। ইচ্ছে হলে স্নানও করতে পারো। আর রাতে আমাদের সঙ্গে দুটি খেয়ে নিয়ো।'

জিতেন বিব্রতভাবে বলল, 'না, না, মাসিমা, আমি রাতে কিছু খাব না—খেয়ে এসেছি—।'

'সে পরে দেখা যাবে'খন।'

আমি জিতেনের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও কি আমার ফেরোমোনের গন্ধ পাচ্ছে? আমি কিন্তু অন্যরকম একটা গন্ধ পাচ্ছি।

আমি জিতেনকে দেখছিলাম।

ছিপছিপে ফরসা চেহারা। তবে পাতলা হাওয়াই শার্টের নীচে শক্তিশালী পেশি টের পাওয়া যায়। গাল সামান্য ভাঙা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। চোখ টানা-টানা। সারাটা মুখে কেমন এক মমতা মাখানো।

আমি অদ্ভুত এক আকর্ষণ টের পাচ্ছিলাম। অথচ আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, শিবনাথ আর রমার ঠোঁটের কোণে লালা গড়াচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি জিতেনকে নিয়ে ভেতরে চলে যেতে চাইলাম। ওরা কি আজ রাতেই ওকে শেষ করে দেবে?'

'আমার সঙ্গে আসুন—' জিতেনকে নরম গলায় ডেকে নিলাম।

ও লাজুক মুখে আমাকে অনুসরণ করল। একবার শুধু বলল, 'আপনারা খুব ভালো। নইলে অচেনা-অজানা লোককে কে আর থাকতে দেয়...।'

ওর কথায় আমার নবীন সমাজদারের কথা মনে পড়ে গেল।

নবীন সমাজদার স্কুল-মাস্টার ছিল। গত বছর বর্ষার সময় এক দুর্যোগের রাতে আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে-ও ঠিক এই কথাই বলেছিল, 'আপনারা খুব ভালো লোক—' আর সেই রাতেই আমরা ওকে খতম করেছিলাম।

সাধারণত কোনও শিকারকে খতম করার আগে তাকে ঘিরে আমরা পাগলের মতো নাচি। তখন ভয়ে-আতঙ্কে তার চিৎকার করার মতো অবস্থাও থাকে না। কিন্তু নবীন মাস্টার হঠাৎই এক চিৎকার দিয়ে উঠেছিল। তখন শিবনাথ আর রমা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর সব শেষ।

তার কিছুদিন পরে কী করে যেন নবীন মাস্টারের বউ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। মেয়েটার সে-কী বুকফাটা কান্না! সে-কান্নার মানে আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি।

বউটাকে তো কোনওরকমে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই এল পুলিশ আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির লোক। আমাদের নানাভাবে জেরা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি। ডেডবডির কোনওরকম চিহ্ন না-পাওয়াতে ওরা বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। সন্দেহের হাত থেকে আমরা একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম। কে জানে, পুলিশ এখনও ব্যাপারটা নিয়ে লেগে রয়েছে কি না!

আজও ঠিক ওই কথাটাই বলল জিতেন, 'আপনারা খুব ভালো।'

জিতেনকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে বসবার ঘরে ফিরে এলাম। সেখানে তখন আমার 'মা', 'বাপি' আর 'ভাই' জিতেনকে নিয়ে আলোচনায় মশগুল।

রমা ওর গোলগাল বাচ্চা-বাচ্চা মুখ নিয়ে একেবারে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। বারবার শুধু বলছে, 'আমি আর ওয়েট করতে পারছি না...।'

ও যে আর অপেক্ষা করতে পারছে না সেটা ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে । ও কিছুতেই ওর ছদ্মবেশ ধরে রাখতে পারছে না। থেকে-থেকেই ওর চোয়ালটা লম্বা হয়ে সামনে এগিয়ে আসছে, হাত-পায়ের লোম বড়-বড় হয়ে যাচ্ছে, কথাগুলো জড়িয়ে গিয়ে চাপা-জান্তব গর্জন বেরিয়ে আসছে, আর ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে।

শিবনাথের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। ছদ্মবেশটাকে কোনওরকমে সামলে রেখে ও বলল, 'রিনি, চেয়ার-টেবিলগুলো সরিয়ে ঘরটা ফাঁকা করে দাও। তারপর ও এলেই আলোগুলো নিভিয়ে দেবে...।'

তা হলে জিতেন এ-ঘরে আসামাত্রই শুরু হবে আমাদের কাজ। কিছুতেই কি আর দু-চারটে দিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি না? জিতেনকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। ওর চেহারায় এমন নিষ্পাপ একটা ব্যাপার আছে যে, আমার সেই বালিকা বয়েসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সুবীরদার কথা মনে পড়ছে। ওকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠত। সুবীরদা আমেরিকায় পড়াশোনা করতে চলে গেছে। কত বছর আগের কথা, তবুও মনে হয় এই তো সেদিন! বিদেশ যাওয়ার আগে একদিন আমি সুবীরদার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সেদিন লোডশেডিং ছিল, বাড়িতে আর কাউকে চোখে পড়েনি। সুবীরদা কখনও আমাকে আশাকারা দেয়নি, কিন্তু আমার কী যে হয়েছিল। সেইদিন সুবীরদা আমাকে নিয়ে যা-খুশি করতে পারত। আমিও মনে-মনে সেটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু সুবীরদা আমাকে বকুনি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, জীবন এত সহজ-সরল নয়।

আমি সেদিন সে-কথার মানে বুঝিনি। পরে, নিজের জীবনটা যখন হাতের বাইরে চলে গেল, অনেক জটিল হয়ে গেল, তখন বোধহয় খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম।

কিন্তু আজ, জিতেনকে দেখার পর থেকে, আমার নিজের কেমন অন্যরকম লাগছে।

আমার ছদ্মবেশটা ঠিকঠাক রেখে সিরিয়াস গলায় ওদের বললাম, 'আজ রাতেই কিছু করাটা ঠিক হবে না। নবীন সমাজদারের ব্যাপারটা কি তোমরা এত সহজে ভুলে গেলে! পুলিশ হয়তো কেসটা নিয়ে এখনও লেগে আছে। কে জানে, জিতেনকে ওরা টোপ হিসেবে এখানে পাঠিয়েছে কি না !'

'তা হলে তোমার কী মত?' বিনোদ জানতে চাইল।

'আমার ইচ্ছে দু-চারদিন অপেক্ষা করা—।'

শিবনাথ ওর ছদ্মবেশের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'দু-চারদিন কেন, একটা দিন ওয়েট করলেই তো হয়!'

সমর্থনের আশায় ও বাকি দুজনের দিকে তাকাল।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'না! তাড়াহুড়ো করলে চলবে না...।'

এমনসময় পায়ের শব্দ পেলাম।

চমকে ঘুরে তাকিয়ে দেখি জিতেন দাস আসছে। এরই মধ্যে ও স্নান-টান সেরে পরিপাটি। মুখটা এখন আরও বেশি ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ লাগছে।

সুখী পরিবার একজন অতিথিকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানায় সেভাবেই আমরা জিতেনকে খাওয়ার টেবিলে সাদরে আমন্ত্রণ জানালাম।

'মা' গরম ভাত, মুগের ডাল, মোচার ঘণ্ট আর মুরগির মাংস সাজিয়ে রাখল খাওয়ার টেবিলে। তারপর আমাদের পরিবেশন করতে লাগল। মুরগির ঠ্যাং রমার খুব প্রিয়। মানে, মুরগি হোক আর যা-ই হোক, ঠ্যাং হলেই হল। ও বারবার বায়না করছিল।

'বাপি' জিতেনকে বলল, 'লজ্জা করে খেয়ো না। ঘরের ছেলের মতো চেয়ে-চেয়ে খাও।'

আমি বললাম, 'বাপি, আমাদের বাড়ির ওয়্যারিংগুলো তো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। জিতেনবাবুকে যখন হাতে পেয়েছি তখন ওগুলো পালটে ঠিকঠাক করে নিলেই তো হয়।'

'মা', 'বাপি', আর 'ভাই' সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল। ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং বদলানোর নাম করে আমি কি জিতেনকে বেশ কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি?

শিবনাথ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'তা ঠিকঠাক করে নিলেই হয়। কিন্তু ওর কি সময় হবে?...ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ...কাল ভোরেই চলে যাবে বলছে...।'

আমি উজ্জ্বল চোখে জিতেনের দিকে তাকালাম।

লাজুক ছেলেটা আমার দিকে আড়চোখে দেখল, তারপর বলল, 'না, না—ব্যস্ত আর কীসে—এটাই তো আমার কাজ। তা হলে কাল সকালে বাড়িতে একটা এস. টি. ডি. করে দেব। তারপর গোটা বাড়ির ওয়্যারিংগুলো একবার ভালো করে টেস্ট করে নেব। যদি কেউ সঙ্গে থেকে একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দেয়...' আমার দিকে আবার তাকাল জিতেন। তারপর: 'তারপর একটা এস্টিমেট দিয়ে কাজ শুরু করে দেব।'

জিতেনের তাকানোর ব্যাপারটা ওরা তিনজনেই খেয়াল করেছিল। 'মা' তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কোনও চিন্তা নেই। রিনিই তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। ও এসব একটু-আধটু বোঝে—ফিউজ হয়ে গেলে ও-ই ফিউজ তার পালটে ঠিক করে দেয়—।'

জিতেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও অপ্রস্তুত হাসলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে জিতেন নিজের ঘরে শুতে চলে গেল। আমি ওকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভোর সাড়ে ছ'টায় চায়ের কাপ নিয়ে গিয়ে আমি আপনার ঘুম ভাঙাব। সাড়ে ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠেন তো?'

ও অদ্ভুতভাবে হাসল, বলল, 'এমনিতে উঠি না—তবে আপনি ডাকলেই উঠে পড়ব।'

যখন আবার খাওয়ার ঘরে ফিরে এলাম তখন 'মা' টেবিল পরিষ্কার করে গুছিয়ে ফেলেছে, 'বাপি' খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, আর 'ভাই' মুখ গোঁজ করে বসে আছে।

আমাকে দেখেই 'ভাই'—মানে, রমা—একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল: 'ভেবেছিস ওকে একা খাবি? সেটা কিছুতেই হতে দিচ্ছি না।'

'আমার ওকে খাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।'

'তা হলে তোমার মতলবটা কী? ওকে এরকম আগলে-আগলে রাখছ কেন?' প্রশ্নটা করেছে শিবনাথ। ওর খিদে রমার চেয়ে কিছু কম নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'জিতেনকে তোমরা যা করার কোরো। তার আগে আমি শুধু একবার ওকে চেখে দেখতে চাই...।'

'তার মানে?' 'মা' বিনোদ অবাক হয়ে জানতে চাইল।

আমি হেসে বললাম, 'ওর গায়ে আমি অন্যরকম একটা গন্ধ পেয়েছি। আমার পুরোনো সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে খুব ইয়ে করতে ইচ্ছে করছে।'

রমা একইরকম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'মানুষের সঙ্গে আমাদের আবার ইয়ে কী! এমন ইচ্ছে তো আমাদের কখনও হয় না! আসলে তুই ওকে একা খাওয়ার প্ল্যান করেছিস—।'

কথা বলার সময় রমার চোয়াল লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, হাত-পায়ের নখ বেরিয়ে আসছিল, শরীর লোমশ হয়ে উঠেছিল।

আমি শান্তভাবে বললাম, 'আমার ওসব কোনও প্ল্যান নেই। জিতেন আমাকে পুরোনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি ওকে একবার চেখে দেখতে চাই....'

আমার গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে, ওরা তিনজন চুপ করে গেল।

একটু পরে 'মা' রমাকে বলল, 'তুই আর-একটু চিকেন কারি খাবি? এখনও অনেকটা আছে—।'

রমা একই ভঙ্গিতে বলল, 'চিকেন কারি না—আমি জিতেন কারি খাব।'

এ-কথা শুনে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

মাঝরাত থেকেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছিল।

এমনিতেই রাতে আমাদের ভালো করে ঘুম আসে না, তার ওপর বৃষ্টি আর জিতেন আমাদের জাগিয়ে রাখল।

একসময় জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই গাছপালা আর বৃষ্টির আড়াল ভেদ করে শিবনাথ আর রমাকে দেখতে পেলাম। ওরা বোধহয় শিকার ধরতে বেরোচ্ছে।

অন্ধকারে আমাদের দেখতে অসুবিধে হয় না। তাই ওরাও আমাকে দেখতে পেল। চাপা গর্জন করে শিবনাথ একবার আমাকে ডাকল। আমি সাড়া দিলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিতেনের কথা ভাবতে লাগলাম। ওর জন্যে কেন যে এমন অদ্ভুত টান টের পাচ্ছি কে

জানে! আমি জানি এটা ভালোবাসা নয়। কারণ, আমাদের মধ্যে ভালোবাসা, মমতা, ঈর্ষা—এইসব মানবিক বোধ নেই। এককালে যে ছিল সেটাই কোন যুগে ভুলে গেছি।

চোখের সামনে বৃষ্টি নিয়ে নিজেকে ঘৃণা করতে চাইলাম। যদি আমি জিতেনের মতো সুস্থ-স্বাভাবিক থাকতাম তা হলে কত ভালো হত! কিন্তু বহুবছর আগে রাতের ট্রেনে আমি পালটে গিয়েছিলাম মানুষ থেকে অমানুষে।

কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায় মাসির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলাম। রাত বারোটার পরই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল—বাঙ্কে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মাঝরাতে হঠাৎই একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সামনে একরাশ অন্ধকার।

ট্রেন মাতালের মতো ছুটছে। চাকায় শব্দ উঠছে ঝমাঝম।

তখনই খেয়াল করলাম, অন্ধকারের মধ্যে দুটো আলোর বিন্দু—ক্ষুধার্ত, হিংস্র, পাশবিক।

চিৎকার করতে গিয়ে আমি চিৎকার করতে পারিনি। কোনওরকমে সামনে হাত বাড়িয়েছিলাম। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি ছুঁয়ে ফেলেছিলাম লোমশ এক শরীর।

পরক্ষণেই সব ঝাপসা হয়ে এসেছিল। আলোর বিন্দু দুটো সরে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে।

একটু পরেই আমার চেতনা ফিরে এসেছিল। কিন্তু এ কোন নতুন চেতনা—যা মানুষের চেতনার থেকে শতযোজন দূরের!

মাসির বাড়ি আমার আর যাওয়া হয়নি। রাতের অন্ধকারে কোন একটা স্টেশনে যেন আমি নেমে পড়েছিলাম। তারপর হারিয়ে গেছি অন্য জগতে। চিরকালের জন্যে।

ওই পশুটাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ঘেন্না করি। তেমনি ঘেন্না করি নিজেকেও। শিবনাথ, রমা, বিনোদকেও। কিন্তু আমার শরীরটা ওদের মতো বলে ওদের পছন্দের কাজ আমাকে করতে হয়। আমার মনটা যে পুরোপুরি এখনও ওদের মতো হয়ে ওঠেনি সেটা বেশ বুঝতে পারি।

একটা চাপা গর্জন কানে এল। চমকে উঠে দেখি শিবনাথ আর রমা ফিরে এসেছে। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলছে।

আর তখনই খেয়াল করলাম, আমার সারা গায়ে বড়-বড় কুৎসিত লোম, আর চোয়ালটাও নেকড়ের মতো লম্বা হয়ে গেছে।

আমি এ-ঘর থেকেই জিতেনের গন্ধ পাচ্ছিলাম—অন্যরকম গন্ধ। সেই গন্ধে পাগল হয়ে বাকি রাতটুকু ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করে কাটিয়ে দিলাম।

ভোর হতেই টের পেলাম খিদেয় আমার পেট জ্বলছে। তাই ছদ্মবেশ ধরে চলে গেলাম বাড়ির বাইরে।

বৃষ্টি এখন আর নেই। তবে এখানে-ওখানে জল জমে আছে। গাছের পাতায়, ঘাসে, জলের ফোঁটা।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে টিলার ওপারে চলে গেলাম। কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটা বনবেড়ালকে দেখতে পেলাম। ওটাকে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের খাঁজে

কোণঠাসা করে ফেললাম। বনবেড়ালটা মরিয়া হয়ে থাবা বাগিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। আমি থাবা দিয়ে সপাটে এক থাপ্পড় কষাতেই ওটা ঘাড় মটকে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

ভোরের প্রথম আলোয় খিদে মিটিয়ে নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরে এলাম, জিতেন তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছে।

আমাকে দেখেই ও জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, মর্নিংওয়াকে গিয়েছিলেন বুঝি?'

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কাল আমাকে নিয়ে যাবেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

জিতেন গলা বাড়িয়ে থুথু ফেলল ঘাসের ওপর। তারপর বলল, 'সাড়ে ছ'টায় আমাকে ডাকবেন বলেছিলেন—দেখুন, তার আগেই আমি উঠে পড়েছি।'

খিদের চোটে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। চমকে হাতঘড়ি দেখলাম: সবে সাড়ে ছ'টা বাজে।

জিতেন আড়চোখে আমার বুকের দিকে দেখছিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'আপনার চা-বিস্কুট নিয়ে আসছি—।'

'হ্যাঁ, চা-টা খেয়েই ফোন করতে বেরোব। তারপর এসে ওয়্যারিংগুলো চেক করতে শুরু করব।' একটু থেমে আমাকে দেখে নিয়ে: 'আপনি আমার সঙ্গে থেকে হেল্প করবেন কিন্তু—।'

আমি ওর গন্ধ পাচ্ছিলাম। শরীরটা কেমন অবশ লাগছিল। ছদ্মবেশ ধরে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

ওর কথার উত্তরে ছোট্ট করে বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি 'মা' উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। জিগ্যেস করে জানলাম 'বাপি' আর 'ভাই' এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

সারাটা দিন আমার জিতেনের সঙ্গে কাটল।

ও প্রত্যেকটা ঘরের ওয়্যারিং টেস্ট করে দেখছিল, আর আমি পাশে-পাশে থেকে ওকে সাহায্য করছিলাম।

ভাঁড়ার ঘরের ওয়্যারিং টেস্ট করতে-করতে জিতেন বলল, 'ম্যাডাম, আপনাদের ওয়্যারিং-এর আর কিছু নেই। তারের রবারগুলো একেবারে নরম হয়ে গেছে। সব চেঞ্জ করে দিলে ভালো হয়—।'

আমি বললাম, 'আমার নাম ম্যাডাম নয়—রিনি। তা ছাড়া আমি আপনার চেয়ে বেশ ছোট।'

'দশ ঘণ্টার আলাপে নাম ধরে ডাকব?' হাসল জিতেন: 'তাতে আর কেউ কিছু মনে করতে পারে...।'

'আমার বাপি-মা খুব ভালো। ওরা কিচ্ছু মনে করবে না।'

জিতেন একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে ওয়্যারিং দেখছিল। হঠাৎই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের বাড়িটা বেশ পুরোনো—বোধহয় ব্রিটিশ আমলের। কিন্তু তোমরা বেশ মডার্ন— মানে, ডাইনিং-টেবিল, টিভি এইসব আর কী।' একটু চুপ করে থেকে তারপর: 'তোমরা এ-বাড়িতে ক'বছর আছ?'

আমি ভয় পেলাম। কী করে বলব, একটা পড়ে-থাকা-বাড়ি আমরা জবরদস্তি করে দখল করেছি। আমাদের কথাবার্তা, চালচলন যে এই বাড়ির চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না সেটা ও এই অল্প সময়েই টের পেয়েছে। ভাগ্যিস রমা, বিনোদ, শিবনাথরা এখন আশেপাশে নেই! থাকলে হয়তো বলত, 'দেরি করে কোনও লাভ নেই। আজ রাতেই...'

আমি কোনওরকমে একটা গল্প বানিয়ে ওকে বললাম। আমার 'বাপি'র এক জ্যাঠামশাই বছরচারেক আগে মারা যান। তিনি বিয়ে-থা করেননি। তাই এই বাড়ি, বাগান, আর ছ'বিঘে ধান জমি 'বাপিকে' দিয়ে গেছেন। 'বাপি' রিটায়ার করার পর আমরা কলকাতা ছেড়ে এখানে চলে এসেছি।

জিতেন হঠাৎই টুলটার ওপরে বসে পড়ল, বলল, 'রিনি, একটানা কাজ করতে ভালো লাগছে না। এসো, দু-মিনিট গল্প করি।'

জিতেন ওর নানা কথা বলছিল। আমি স্বপ্ন দেখার মতো ওকে দেখছিলাম, ওর কথা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে শুনছিলাম।

কলকাতায় গড়িয়াতে ওর বাড়ি। বাড়ি মানে ভাড়া করা একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেখানে ওর বুড়ি মা আছে, আর আছে ছোট দু-বোন—ঝুমপা আর টুমপা। ওর বড়দা কেশব ভালো চাকরি করত। কিন্তু বছরদশেক আগে ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে! বাবা রিটায়ার করার পর হার্টের অসুখে মারা যান। মাত্র একবছরের মধ্যে দুজনেই চলে গেছে। তারপর থেকে জিতেন একা সংসারের হাল ধরেছে। ছোট্ট একটা ইলেকট্রিকের দোকান আছে ওর। সেটাকে আঁকড়ে ধরেই অভাবের সঙ্গে ওর লড়াই। ওর খুব সাধ ভালো ঘরে দু-বোনের বিয়ে দেবে। তারপর ও নিজের বিয়ের কথা ভাববে—যদি অবশ্য তখনও ওর বিয়ের বয়েস থাকে।

জিতেনকে দেখে আমার বুকের ভেতরে অদ্ভুত এক কষ্ট হচ্ছিল। ওর মধ্যে এত আকাঙক্ষা, এত স্বপ্ন...অথচ...।

ভাবলাম, ওকে বলি, 'তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও—' কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। শিবনাথরা সহজে ওকে ছাড়বে না। ওকে তাড়া করবে। দরকার মতো ছদ্মবেশ পালটে-পালটে ওকে অনুসরণ করবে। তারপর প্রথম সুযোগেই। ওকে খতম করবে।

আমার ভীষণ মনখারাপ লাগছিল—সুবীরদা আমেরিকা চলে যাওয়ার সময় যেরকম মনখারাপ লেগেছিল।

কথা বলতে-বলতে জিতেন কতবার যে বলল, 'রিনি, তোমরা খুব ভালো। কত সহজে অচেনা লোককে আপন করে নাও।'

জিতেন আমাকে নানা কথা জিগ্যেস করছিল। 'বাপি' কোথায় চাকরি করত, 'ভাই' কোন স্কুলে পড়ে, আমি কলকাতার কোন স্কুলে পড়তাম, কোন কলেজে পড়তাম,

লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম কেন, কলকাতার কোথায় আমরা থাকতাম, আমাদের আত্মীয়স্বজন কোথায়-কোথায় থাকে—এরকম আরও কত প্রশ্ন।

আমি ওর প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছিলাম। ঠিকমতো গল্প বানাতে না-পারলে পাশ কাটানো জবাব দিচ্ছিলাম।

আমরা যখন 'বাপির' শোওয়ার ঘরের লাইন টেস্ট করছি তখন শিবনাথ কোথা থেকে এসে ঘরে ঢুকল। ওর হাতে সিগারেট। গলাখাঁকারি দিয়ে ও বলল, 'আজ বাজার থেকে বড়-বড় পাবদা মাছ নিয়ে এসেছি। বলেছি পাবদা মাছের ঝাল রান্না করতে। জিতেন, তুমি পাবদা মাছ খাও তো?'

জিতেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে 'হ্যাঁ' বলল।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল রমা। 'বাপি'কে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, 'বাপি', পাবদা মাছের ঝালের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'বাপি' রমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'খাবি, খাবি—সময় হোক, খাবি—'

কথাটা বলার সময় 'বাপি' জিতেনের দিকে তাকিয়ে ছিল, যাতে আমি অন্তত তার কথার ঠিকঠাক মানে বুঝি।

রমা বলল, 'আমি আর ওয়েট করতে পারছি না—গন্ধে আমি পাগল হয়ে যাব।'

রমা একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ছদ্মবেশ ধরে থাকতে রমার এখন কষ্ট হচ্ছে। তাই জিতেনের সামনে থেকে ও পালাল।

এরপর শিবনাথ জিতেনের সঙ্গে ওয়্যাংরি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। জিতেন কাগজ-পেন বের করে 'বাপি'কে কী-সব হিসেব বোঝাতে লাগল।

একটু পরে 'বাপি' চলে যেতেই জিতেন আবার ওর কাজ শুরু করল, আর আমিও ওকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম।

কাজ করতে-করতে যখন বেলা একটা বাজল তখন আমি জিতেনকে স্নান করতে যাওয়ার তাড়া দিলাম।

ও আমার দিকে কেমন একটা চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'খেয়েদেয়ে আবার শুরু করব, কেমন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

আমি ক্লান্ত পায়ে বসবার ঘরে আসতেই ওরা তিনজন আমাকে ছেঁকে ধরল।

রমা হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর সাধ মিটেছে? আমরা আর ওয়েট করতে পারছি না।'

শিবনাথ বলল, 'শুধু-শুধু দেরি-করেই বা লাভ কী! আজ রাতেই তো সেরে ফেললে হয়...' ও সমর্থনের আশায় বিনোদের দিকে তাকাল।

বিনোদের গায়ে পলকের জন্যে বড়-বড় লোম দেখা গেল, তারপরই আবার ও গিন্নিবান্নি চেহারার 'মা' হয়ে গেল। ও মেয়েলি গলায় আমাকে বলল, 'রিনি, তোমার যা করার আজ সন্ধের মধ্যে সেরে নাও। জিতেন বেশিদিন আমাদের এখানে থাকলে সবাই সন্দেহ করবে...'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের খিদের সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। জিতেন যে কেন মরতে আমাদের বাড়িতে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর কাজ শুরু করতে-করতে প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেল। আকাশে তখন আবার মেঘ জমেছে, ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ছে।

জিতেনের কাছে আসার আগে ওরা তিনজন আমাকে আবার তাড়া দিয়েছে। তার মধ্যে রমা তো বলতে গেলে আমকে একরকম শাসিয়েছে। বলেছে, আমার যদি অন্য কোনও মতলব থাকে তা হলে বিশেষ সুবিধে হবে না।

জিতেনকে যে-ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘরটায় কাজ করছিলাম আমরা।

আশ্চর্য! একটা দিন এখনও পুরো হয়নি, এরই মধ্যে জিতেনের গন্ধে ঘরটা টইটম্বুর।

জিতেন একটা চেয়ারের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে লাইন টেস্টার দিয়ে লাইনটা টেস্ট করছিল। হঠাৎই টাল সামলাতে না-পেরে ওর দেহটা নড়ে উঠল। ও পড়ে যেতে পারে ভেবে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার হাত-মুখ-বুক সব ওর শরীরে লেপটে গেল। জিতেন খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আমি গালে টের পাচ্ছিলাম, ওর শরীর আয়তনে বাড়ছে।

জ্বর হওয়া গলায় জিতেন বলল, 'কেউ এসে পড়বে...।'

'না, কেউ আসবে না।'

জিতেন তখন সাহস করে আমার বাঁধন ছাড়িয়ে নেমে পড়ল চেয়ার থেকে। লক্ষ করলাম, ওর শরীর কাঁপছে।

ও কোনওরকমে দরজার কাছে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েই ফিরে এল আমার কাছে। আমাকে এক ঝটকায় জাপটে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। আমাদের শরীরের তাপ বিনিময় হতে লাগল। আমার ছদ্মবেশ ধরে থাকার ক্ষমতা বোধহয় শিথিল হয়ে আসছিল। কারণ হঠাৎই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক টুকরো চাপা গর্জন।

জিতেন চমকে উঠে আমাকে ছেড়ে দিল, অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি ছদ্মবেশ সামলে নিয়ে জড়ানো গলায় বললাম, 'আমি আর পারছি না...'

জিতেনের অবাক ভাবটা পুরোপুরি মিলিয়ে গেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'এখানে আমার ভয় করছে, রিনি। যদি কেউ হুট করে এসে পড়ে!'

ওকে বলতে পারলাম না যে, কেউ আসবে না। কিংবা এলেও কোনও ক্ষতি নেই। তা হলে ও নির্ঘাত সন্দেহ করবে।

তাই বললাম, 'সন্ধে হলে আমরা বাইরে কোথাও চলে যাব।'

জিতেন সায় দিল।

সন্ধের অন্ধকার নেমে আসতেই আমি জিতেনকে নিয়ে বেরোলাম। বেরোনোর সময় শিবনাথ আমাকে আলাদা ডেকে নিল, বলল, 'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু—।'

রমা বলল, 'উলটোপালটা কোনও মতলব ভেঁজে সুবিধে হবে না।'

আমি বললাম, 'কোনও ভয় নেই। তোমরা ওকে আস্তই পাবে—।'

তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

জিতেন কেমন একটু থম মেরে ছিল। বোধহয় আগামী উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ওর বুকের ভেতরে পাক খাচ্ছিল। ও বারবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছিল।

বৃষ্টি এখন আর নেই। কিন্তু চারপাশে বৃষ্টির আদরের ছোঁওয়া লেগে রয়েছে। গাছের পাতায়, ঘাসে, মাটিতে, আকাশে, বাতাসে—কোথায় নয়!

মেঘ সরে গেছে একপাশে। চাঁদ আবার দেখা দিয়েছে—চতুর্দশীর কিশোরী চাঁদা। গত দু-দিন ও গা-ঢাকা দিয়েছিল।

চাঁদ দেখলে আমাদের কেমন পাগল-পাগল লাগে। আমি জানি, বাড়িতে শিবনাথরা এখন চাঁদ দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার ভেতরে এখন সেই অস্থির ব্যাপারটা টের পেলাম না। আমি জিতেনের হাত ধরে ছিলাম। সেই ছোঁওয়া আমাকে পালটে দিচ্ছিল। টের পেলাম, ওর গায়ে কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব।

ভিজে মাটিতে পা ফেলে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। অন্ধকারে আমার দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না। জিতেনকে বললাম, 'আমার হাত ধরে এসো—কোনও ভয় নেই।'

দুটো ধান খেত পেরিয়ে কয়েকটা বড় গাছের জটলার নীচে আমরা দুজনে পাশাপাশি বসলাম।

হঠাৎ একঝলক বাতাস গাছের পাতায়-পাতায় শব্দ তুলল। রাতপাখির ডাক শুনতে পেলাম। আর কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপরে আমরা ভালোবাসাবাসি শুরু করলাম।

জিতেন দিশেহারা হাউইয়ের মতো আমাকে এলোমেলো আদর করতে লাগল। মরণাপন্ন দানব যেভাবে প্রাণভোমরা আঁকড়ে ধরতে চায়, ও পাগলের মতো আকুল হয়ে সেই প্রাণভোমরা খুঁজতে লাগল আমার শরীরে।

জিতেন হাঁফাচ্ছিল, দাপাদাপি করছিল, কিন্তু ক্লান্ত হয়নি এতটুকু। ছদ্মবেশ ধরে রাখতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে-মাঝেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল চাপা গর্জনের টুকরো। কিন্তু জিতেন সেগুলোকে তৃপ্তির শব্দ বলে ভাবছিল।

পশুপ্রবৃত্তি আমাকে পেয়ে বসল। কোনওরকমে শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে উলটোদিকে ঘুরে গেলাম। তাতে জিতেনের যেন সুবিধেই হল। ও পেছন থেকে আমাকে আদর করতে লাগল। আর আমি যেন শূন্যে ভেসে যেতে লাগলাম।

চূড়ান্ত মুহূর্তে জিতেন এক ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। তখন ওকে হঠাৎই শিবনাথ বলে মনে হল। দু-চারটে পাখি ডেকে উঠল গাছের আড়াল থেকে। আর আমরা আনন্দে কুটিকুটি হয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ আমরা অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়ে রইলাম। তারপর জিতেন আমাকে পরম যত্নে চুমু খেতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, 'রিনি, আই লাভ ইউ। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না....'

আমার কান্না পেল। কারণ, শিবনাথ-রমাদের কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু চোখে আমার জল এল না। একটা নাম-না-জানা কষ্ট ভেতরে-ভেতরে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর আমরা উঠলাম। আমি মানুষ না অমানুষ সেটাই আমার কাছে গুলিয়ে যাচ্ছিল। জিতেন আমার এই জঘন্য জীবনে একটা নতুন মানে জুড়ে দিয়েছে।

অন্ধকারে গাছপালার আড়াল দিয়ে ফিরতে-ফিরতে নানা কথা মনে হচ্ছিল। জিতেনের গলায় দাঁত বসিয়ে আমি কি ওকে আমাদের একজন করে নিতে পারি না? তা হলে অন্তত ও প্রাণে বেঁচে থাকবে। কিন্তু তখন যে ও সারাটা জীবন আমাকে ঘেন্না করবে, যেমন রাতের ট্রেনের ওই শয়তানটাকে আমি ঘেন্না করি। ওর ঘৃণা সহ্য করে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তার চেয়ে এই ভালো—আমরা দুজন-দুজনকে ভালোবাসি—এটাই শেষ সত্যি হয়ে থাক জিতেনের কাছে।

যখন আমরা বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লাম, তখন জিতেনকে বললাম, 'তুমি আগে চলে যাও। দুজনে একসঙ্গে গেলে মা-বাপি সন্দেহ করবে।'

জিতেন কপট ভয়ের সুরে বলল, 'ওরে বাবা! এসব জানতে পারলে তোমার বাবা আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

জিতেন বুঝতে পারল না, ও কতবড় সত্যি কথাটা বলল।

ওকে বললাম, 'তুমি বলবে, রিনি গাছপালার আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল। ওকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে আমি চলে এসেছি। তা হলেই হবে—।'

ও আমার ঠোঁটে গভীর চুমু খেল। তারপর বলল, 'বেশি দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি চলে এসো...।'

আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম।

জিতেন অন্ধকার থেকে এগিয়ে গেল আলোর দিকে। সেখানে ওর জন্যে নতুন এক অন্ধকার অপেক্ষা করছে।

এইবার আমার কান্না পেল। আকাশের চাঁদের দিকে তাকালাম। ছদ্মবেশের নিয়ন্ত্রণের কথা ভুলে গিয়ে চারপায়ে দাঁড়ালাম। আমার বুকফাটা হাহাকার জন্তুর গর্জন হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। একে কি কান্না বলে? আমার একমাত্র ভালোবাসার মানুষটার জন্যে কান্না?

ওই বাড়িতে আমি আর ফিরতে পারব না। আমি জানি, সব আলো নিভিয়ে দিয়ে শুরু হয়ে গেছে ওদের নাচ। ওরা পাগলের মতো জিতেনকে ঘিরে নাচছে। আর জিতেন সাদা, ফ্যাকাসে মুখে ওই ভয়ঙ্কর তিনটে প্রাণীর দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরিয়ে আসতে পারছে না। তবে ওর নিশ্চয়ই বৃদ্ধা মায়ের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে ছোট-ছোট দুটো বোনের কথা—যাদের ও ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল।

আচ্ছা, জিতেনের আমার কথাও একটু-একটু মনে পড়ছে তো?

সতেরো শব্দের ম্যাজিক

খুন করলে শাস্তি পেতে হয়। সেটাই নিয়ম। আর আমি তো নিয়মের বাইরে নই! এখন যে এই জেলে বসে ফাঁসির জন্যে অপেক্ষা শুরু করেছি সেটাও নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

কিন্তু কারও প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। কারণ, খুন করলে যে ফাঁসি হতে পারে সেটা আমার জানাই ছিল। তার ওপর নিজের দোস্তকে খুন করেছি, আর সেই খুনের কথা পুলিশের কাছে কবুলও করেছি।

একটু আগে টেলিফোন করে আমি নিজেই পুলিশে খবর দিয়েছি।

আমার পায়ের কাছে শুভঙ্করের দেহটা চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। ওর গলার ফুটো দিয়ে এখনও রক্ত বেরিয়ে আসছে—ঠিক কর্পোরেশনের ফুটো হয়ে যাওয়া জলের পাইপের মতো। হ্যাঁ, শুভঙ্করের হাত-পা তখনও সামান্য নড়ছিল। ঝাপসাভাবে একটু-আধটু চিন্তাও বোধহয় করতে পারছিল। ও কী ভাবছিল আমি জানি। আমিও একই কথা ভাবছিলাম। সতেরোটা শব্দের জন্যে ওকে মরতে হল। আমাকে মারতে হল ওই ক'টা শব্দের জন্যে। ওই সতেরোটা শব্দ দুনিয়ার আর কেউ জানে না। শুধু আমি জানি। আর শুভঙ্কর জানত।

এও জানি, সবাই অবাক হয়ে ভাববে বহুদিনের পুরোনো বন্ধু শুভঙ্কর মিত্রকে কেন আমি খুন করলাম। বিশেষ করে যে-শুভঙ্কর দিনকয়েক আগেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে একরকম অলৌকিকভাবে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে!

যদি আপনারা বিরক্ত না হন তা হলে শুরু থেকে সব খুলে বলি—শুধু ওই সতেরোটা শব্দ ছাড়া।

শুভঙ্কর আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, কলেজে পড়েছি। তবে ওই একসঙ্গে পড়েছি পর্যন্তই। পড়াশোনায় কখনও ওর ধারেকাছেও আমি আসতে পারিনি। পড়াশোনায় ও যদি জিরাফ হয়, আমি তা হলে ছারপোকা—এতটাই উচ্চতার ফারাক ছিল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ছিল শুভঙ্কর। কী সহজভাবেই না আমার সঙ্গে মিশত! পরের উপকার করার জন্যে সবসময় এক-পা বাড়িয়েই থাকত। পরের দুঃখে দুঃখ পেত, পরের সুখে সুখ। আমাকে পড়াশোনায় ভালো করে তোলার ব্যাপারেও ও কম মেহনত করেনি। কিন্তু ধন্য আমার অপদার্থ মেধা! সে তার জায়গা থেকে একচুলও নড়েনি।

সুতরাং শুভঙ্কর সব পরীক্ষায় পাশ করত লাফিয়ে-লাফিয়ে, আর আমি গড়িয়ে-গড়িয়ে। কিন্তু একদিনের জন্যেও ওকে আমি ঈর্ষা করিনি। ও ছিল এমন মানুষ যাকে ঈর্ষা করা যায় না, শুধু ভালোবাসা যায়।

শুভঙ্কর বইয়ের পোকা ছিল। নানান ধরনের বই পড়ত ও। বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে চীনা আর তিব্বতি পুঁথির কপিও ওর প্রিয় ছিল। সবসময় দেখতাম চিন্তায় কেমন বিভোর হয়ে আছে। কিছু জিগ্যেস করলেই বলত, আত্মার শক্তির মূল রহস্যে পৌঁছনো দরকার। তা হলেই হাতে পাওয়া যাবে চরম শক্তি।

আমি যে ওর কথাবার্তার একটি বর্ণরও মানে বুঝতাম না, সেটা নিশ্চয়ই আর বলার প্রয়োজন নেই!

দুর্দান্ত রেজাল্ট করে রীতিমতো দার্শনিক হয়ে শুভঙ্কর কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ইউনিভার্সিটির দিকে এগোল। আর আমি সেই গড়িয়ে-গড়িয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে পড়াশোনার চাকা থামালাম। এবং চাকরি পেলাম পুলিশে।

শুভঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ আর ছিল না। কী করে যেন দশ-দশটা বছর কেটে গেল। তারপর হঠাৎই একদিন শুভঙ্করের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

ওর বয়েস যেন দশের জায়গায় পনেরো বছর বেড়ে গেছে। মাথায় অনেকটা টাক পড়েছে। আর জ্ঞানও নিশ্চয়ই বহু-বহুগুণ বেড়েছে এই সময়ে। কারণ, এখনও ওর চোখে সেই কলেজজীবনের ভাবুক দৃষ্টি। আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল দীপ্তি। চশমার কাচদুটোও যেন সেই দীপ্তিতে চকচক করছে। একেই কি বলে জ্ঞানের আলো?

'আরে, প্রদীপ না!'

'শুভঙ্কর, তুই!'

এরপর রাস্তায় দাঁড়িয়েই হাত ঝাঁকানো, পিঠ চাপড়ানো, আর পুরোনো দিন নিয়ে নানা কথা।

'কী করছিস এখন তুই?' শুভঙ্কর জিগ্যেস করল।

'আমি এখন চিফ মিনিস্টারের বডিগার্ড।' আমি একটু গর্বের সঙ্গে বললাম। রাজ্যের হর্তাকর্তা বিধাতার প্রাণরক্ষী হওয়াটা নিশ্চয়ই খুব ফেলনা নয়!

খেলাধুলো বরাবরই আমার প্রিয়। ঝুঁকি নিতেও খারাপ লাগে না। তাই এই পাহারাদারির কাজটা বেশ মেজাজি ঢঙে করতে পারি। এই কাজের কতকগুলো ইন্টারেস্টিং দিক আছে। উঁচুমহলের কিছু-কিছু গোপন খবর আগেভাগেই জানা যায়। সেজন্যে বাঁকা-পথে কমবেশি কু-প্রস্তাব যে আসেনি এমন নয়। কিন্তু আমি অনায়াসে সেগুলো খারিজ করে দিয়েছি। বিশ্বাসঘাতকতা আমার ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মে নেই। তা ছাড়া দেশের জন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজি, নিতেও।

অনেক সময় মুখ্যমন্ত্রীর কোনও অনুষ্ঠানে পাশ পাওয়ার জন্যে কেউ-কেউ আমাকে ধরে। আমি এরকম পাশ অনেককেই জোগাড় করে দিয়েছি। শুভঙ্করও আমাকে হঠাৎ একই অনুরোধ করল।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে সামনের শনিবার চিফ মিনিস্টার একটা আলোচনা-চক্র ডেকেছেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খরা, বন্যা ইত্যাদি নিয়ে বিশিষ্ট বক্তারা তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হিসেবে হাজির থাকবেন নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন। তিনি বলবেন, এইসব বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে কীভাবে উন্নত করা যায়।

শুভঙ্কর একেবারে নাছোড়বান্দার মতো আমাকে চেপে ধরল।

আমি ওর ফোন-নাম্বার নিলাম। বললাম, দেখছি, কী করা যায়। যদি একটা পাশ জোগাড় করতে পারি তা হলে ওকে ফোন করে দেব।

ও বলল, 'স্টেজের একটু কাছাকাছি দিতে চেষ্টা করিস।'

তাই দিলাম। এবং অনুষ্ঠানের দিন দেখি শুভঙ্কর তৃতীয় সারিতে বসে আছে। ওর টানা-টানা ভাবুক চোখ বিশিষ্ট মানুষদের আলোচনা শুনতে মগ্ন। অবশ্য আমার কানে ওসব কথাবার্তা ঢুকছিল না। আমি দর্শকদের ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। কারও এতটুকু বেচাল দেখলেই আমার ক্ষিপ্র ডানহাত পৌঁছে যাবে কোমরে আঁটা সার্ভিস রিভলভারে।

শেষ পর্যন্ত রিভলভারে হাত আমাকে দিতেই হল।

হলের চতুর্থ সারি থেকে তিনজন লোক হঠাৎই প্যাসেজে বেরিয়ে এল। তারপর আচমকা চিৎকার করে ওদের দুজন রিভলভার বের করে গুলি ছুড়তে শুরু করল।

এসব ঘটনা তো আপনারা কাগজে পড়েছেন! তবে আমি আপনাদের যেসব খুঁটিনাটি তথ্য দেব সেগুলো কাগজে বেরোয়নি।

অসমের একটা জঙ্গি দল—নাম, বিটা ফ্রিডম—গত কয়েকমাস ধরেই কলকাতায় নানারকম উৎপাত করছিল। এরা গুলি ছোড়ার আগে চেঁচিয়ে সেই নামটাই বলেছে। আর এদের সুইসাইড স্কোয়াড কখনও বেঁচে ফেরার কথা ভাবে না।

এসব জঙ্গি-ফঙ্গির কেসে আমিও ওদের সঙ্গে একমত। ওদের বাঁচিয়ে অ্যারেস্ট করার কোনও সিন নেই। অন্তত আমার কাছে। তাই স্টেজের একপাশ থেকে চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে নেমে এলাম নীচে—প্রথম সারির দর্শকদের সামনে। রিভলভারসমেত ডানহাত তৈরি।

ওদের গুলিতে একটা ফুলদানি ঠিকরে পড়ল। স্টেজের দুজন আহত হয়ে বসে পড়েছে। সবাই দুদ্দাড় করে ছুটে পালাচ্ছে।

দর্শকরাও চিৎকার করে উদভ্রান্তভাবে ছোটাছুটি শুরু করেছে। তারই মধ্যে দেখি শুভঙ্করও ছুটে আসছে আমার কাছে।

আমি নিখুঁত নিশানায় গুলি করলাম। এজনের কপালে, আর-একজনের বুকে। ওরা জমার খাতা থেকে পলকে ঢুকে পড়ল খরচের খাতায়।

তিন নম্বরকে গুলি করতে গিয়েই আমি থমকে গেলাম।

লোকটা পিন টেনে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে দিয়েছে প্যাসেজে—আমার কাছাকাছি। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।

ওকে গুলি করার কথা ভুলে গিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম গ্রেনেডটার ওপরে—যদি ফেটে যাওয়ার আগে ওটাকে দরজার বাইরে ফাঁকা জায়গায় ছুড়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিয়ে এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় শুভঙ্কর মিত্র গ্রেনেডটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পরদিনের কাগজে আমাদের দুজনকেই হিরো বানিয়ে দেওয়া হল। পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সরকারি পুরস্কারও ঘোষণা করা হল। কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুভঙ্কর মিত্র একেবারে গ্রেনেডটার ওপরে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী-এক আশ্চর্য কায়দায় ও গ্রেনেডটাকে এমনভাবে দরজা দিয়ে ছুড়ে দিয়েছিল যে, গ্রেনেডটা ফেটে গেলেও কেউই মারাত্মকরকম জখম হয়নি।

গ্রেনেডের বিস্ফোরণে কাঠ, লোহা, কাচ তিরবেগে ছিটকে গেছে নানা দিকে। কিন্তু সবাই বেঁচে গেছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় শুভঙ্কর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার ছ'ঘণ্টা পর ওর জ্ঞান ফিরেছিল। তারপর প্রায় তিরিশ ঘণ্টা ও একেবারে শয্যাশায়ী ছিল।

সব মিলিয়ে বিশ্বাস-হতে-চায়-না এমন একটা ঘটনা শুভঙ্কর ঘটিয়ে দিয়েছে।

দু-দিন পর সন্ধেবেলা ওর বাড়িতে গেলাম।

ও আমাকে দেখে খুশি হয়ে হাসল। হাসিটা কলেজজীবন থেকে নেওয়া। দেখে ভালো লাগল। আমাদের দুজনের বয়েস কমতে লাগল।

'বোস, প্রদীপ। একেবারে কান ঘেঁষে বেঁচে গেছি, কী বলিস! বছরচারেক আগে তিব্বতে একবার এরকম সিচুয়েশন হয়েছিল।'

'ওসব তিব্বত-টিব্বতের ব্যাপার জানি না। তুই সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিস।'

'আরে না, না। আমি শুধু সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম...তারপর সব কপাল। লাক, বুঝলি, লাক!'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'তুই বলছিস লাক। কিন্তু কাগজে তোর কথা যা লিখেছে...ফ্যান্ট্যাসটিক। লিখেছে, তুই চোখের পলকে যে-অ্যাকশান নিয়েছিস তা এক-কথায় অকল্পনীয়। কেউ দেখেশুনে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাজ শেষ।'

শুভঙ্কর লজ্জা পেয়ে গেল। চোখ নামিয়ে বিনয়ের সুরে আমতা-আমতা করে বলল, 'ওরা সবকিছু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লেখে। আসলে আমার দিকে কেউ অতটা খেয়াল করেনি...।'

আমি অল্প হাসলাম: 'আমি কিন্তু খেয়াল করেছি। কারণ, খেয়াল করাটাই আমার কাজ।'

শুভঙ্কর চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। ওর চোখে কেমন যেন একটা ধরা-পড়ে-যাওয়ার ভয়।

আমি বলতে লাগলাম, 'শুভঙ্কর, তোর আর গ্রেনেডটার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুই আমাকে পেরিয়ে কী-করে ওটার কাছে গেলি সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। এই দেখলাম তুই দূরে দাঁড়িয়ে—তারপরই দেখি তুই একেবারে গ্রেনেডটার ওপরে। তা ছাড়া...।'

শুভঙ্কর আপত্তির ঢঙে মাথা নেড়ে আমাকে থামাতে চাইল। কিন্তু আমি থামলাম না। বলার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল।

'তা ছাড়া তুই পড়েছিলি গ্রেনেডটার একেবারে ওপরে। ওটা ফেটেছে তোর বডির নীচে। উহুঁ—আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না, কারণ, আমি বলতে গেলে তোর ওপরে গিয়ে পড়েছিলাম। গ্রেনেডের এক্সপ্লোশানের ধাক্কায় তুই ছিটকে শূন্যে উড়ে গিয়েছিস। তারপর—তুই কি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছিলি?'

শুভঙ্কর গলাখাঁকারি দিয়ে সময় নিল। তারপর বলল, না, আসলে ঠিক তা নয়....'

আমি ঠান্ডা চোখে শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শুভঙ্কর, তুই হয়তো ব্যাপক বুদ্ধিমান। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, আমি এক ব্যাপক মূর্খ।'

শুভঙ্কর তা সত্ত্বেও চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ থেকে চশমা খুলে চোখ মুছল। তারপর: 'তুই কি ভালো করে কাগজ পড়িসনি! গ্রেনেডটা অনেকটা দূরে ফেটেছে...।'

'শুভঙ্কর, আমি কিন্তু তোর কাছেই ছিলাম।' অনেকটা গার্জেনি সুরে বললাম আমি।

শুভঙ্করের মুখ হঠাৎই কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলল আবার। মেপে নেওয়ার চোখে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে কোনও তীব্র ভাব ছিল না—বরং কেমন যেন বিষণ্ণ, শান্ত। ওকে দেখে আমার মায়া হচ্ছিল।

শুভঙ্কর একচিলতে হাসল। অদ্ভুত এক দুর্জ্ঞেয় হাসি। তারপর হঠাৎই চাঙ্গা হয়ে উঠে টান-টান হয়ে বসল চেয়ারে, বলল, 'নাঃ, আর গোপন করার কোনও মানে হয় না। একদিন তো কাউকে বলতেই হবে! তা তোকেই বলি।'

এরপর ও সব খুলে বলল আমাকে।

না, ওর সব কথা আমি আপনাদের বলতে পারব না। অন্তত সতেরোটা শব্দ— হ্যাঁ, সতেরোই তো—আমাকে বাদ দিতে হবে। এই সতেরোটা শব্দ কোনওদিন কাউকে বলা যাবে না।

বাকিটা আপনাদের বলছি।

'তুই দেখছি কলেজ-লাইফের ব্যাপারগুলো মনে রেখেছিস—' শুভঙ্কর বলল, হাসল পুরোনো কথা ভেবে: 'সেই যে ক্যান্টিনে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তর্ক। কথা বলতে-বলতে নির্জন পথে উদ্দেশহীন হেঁটে যাওয়া। আত্মা নিয়ে কত কী বকবক করে গেছি আমি। আর তুই একটুও বিরক্ত না হয়ে চুপচাপ শুনে গেছিস—মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ে। সেদিন ইনডোর স্টেডিয়ামের ওই ব্যাপারটার পর আরও বেশি করে সব মনে পড়ে গেছে। তুই বলতি, আত্মার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। চিন্তার গভীরতা আর তীব্রতা দিয়ে সেটা প্রমাণ করা যায়। শুধুমাত্র আত্মার শক্তি দিয়ে এক-পা-ও না হেঁটে, কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই কোনও মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। তুই বলতি, আত্মার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

এসব পুরোনো কথা বলতে গিয়ে নিজেকে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল। এসব অবাস্তব উদ্ভট চিন্তার কোনও মানে হয়! শুধুমাত্র চিন্তার জোরে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাওয়া! রাবিশ!

কিন্তু সেদিন ইনডোর স্টেডিয়ামের ওই ব্যাপারটা! আমি তো সেখানে হাজির ছিলাম, সব দেখেওছি!

কেমন যেন হতবুদ্ধিভাবে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম শুভঙ্করের দিকে। কী বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

হেসে ফেলল শুভঙ্কর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল আমার পাশে। পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলল, 'প্রদীপ, তুই যা-যা বললি সেগুলো একদিক থেকে ভুল, আবার একদিক থেকে ঠিকও বটে। যখন এসব কথা বিশ্বাস করতাম তখন আমার বয়েস কম ছিল, জ্ঞানও। শুধু আত্মার পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়। কিন্তু...' ওর চোখ উত্তেজনায় চকচক করে উঠল, ওর কথা বলার গতিও বাড়ছিল একইসঙ্গে: 'কিন্তু এমন কিছু

স্পেশাল টেকনিক আছে যা মনের সঙ্গে আমাদের জগতের সবরকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগ তৈরি করে দেয়। মানে, মাইন্ড আর ফিজিক্যাল ফোর্সের একটা স্পেশাল লিঙ্ক। ফলে, শুধুমাত্র মন দিয়ে, আত্মার শক্তি দিয়ে সবকিছু—যা খুশি করা যায়। যেমন ধর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে চাস? চোখের পলকে সেটা সম্ভব, প্রদীপ। একটা গ্রেনেডের এক্সপ্লোশানকে সামাল দিতে হবে? কোনও ব্যাপারটা নয়! তুই তো নিজের চোখেই দেখেছিস! তবে এ-কাজেও বহু শক্তি খরচ করতে হয়। শক্তির নিত্যতা সূত্রকে তুই তো আর এড়াতে পারিস না! দেখলি তো, ওই ব্যাপারটার পর আমার কী সাঙঘাতিক অবস্থা হয়েছিল! অবশ্য ওই কাজটা অনেক টাফ ছিল। সেই তুলনায় একটা বুলেটের নিশানা ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ মোটামুটি জলভাত। আর তার চেয়েও সহজ হল ফায়ার করার আগেই বুলেটগুলো নিজের পকেটে নিয়ে আসা। তা হলে ফায়ার করার ব্যাপারটাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কোহিনূর দেখবি? নিয়ে আসব?'

'কোহিনূর!' ওর আচমকা প্রশ্নে আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

হাসল শুভঙ্কর: 'হ্যাঁ রে, হিরে কোহিনূর।'

'তুই ভবিষ্যৎ দেখতে পাস?' আমি প্রসঙ্গ পালটে জিগ্যেস করলাম।

'না। ওসব ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ দেখার ব্যাপারটা...।'

'তুই মনের কথা টের পাস? টেলিপ্যাথি?'

'ওঃ, ক্যান্টিনের আড্ডার টপিকগুলো তুই ভুলিসনি দেখছি! না, ভাই, টেলিপ্যাথি জানি না—অন্তত এখনও। দু-চারবছর লেগে থাকলে হয়তো কোনও রেজাল্ট পেলেও পেতে পারি। তবে এখনই আমি অনেক কিছু পারি যেগুলো টেলিপ্যাথির চেয়ে কম ইন্টারেস্টিং নয়। ইচ্ছে করলেই আমি যে-কোনও শব্দ, যে-কোনও কথা শুনতে পারি। যা ইচ্ছে তা-ই দেখতে পাই। যেমন ধর, অ্যাস্টারয়েড বেল্টের গ্রহাণুগুলোর চেহারা আমি দেখেছি—এবড়োখেবড়ো পাথর...।'

আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে চাপা স্বরে বললাম, 'আমাকে কিছু একটা করে দেখা তো!'

হাসল শুভঙ্কর। ভারি অদ্ভুত সে-হাসি। যেন অঙ্কে ডক্টরেট কোনও পণ্ডিতকে ক্লাস ওয়ানের অঙ্ক করতে বলা হয়েছে।

আমি অবাক চোখে শুভঙ্করকে দেখছিলাম। বিশ্বাস হতে চায় না, অথচ বিশ্বাস না করেও তো উপায় নেই। এই মানুষটা সব পারে! এই মানুষটা এখন ভগবান!

দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর ও একই স্বপ্ন নিয়ে কাটিয়েছে। নানারকম জটিল তত্ত্ব, পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করেছে। বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। সফল হতে পারেনি। কিন্তু তিলতিল করে ও এগিয়ে গেছে সাফল্যের দিকে—থামেনি একলহমার জন্যেও। শেষ পর্যন্ত হাতের নাগালে এসেছে অমৃতের পাত্র...।

আমাকে এসব কথা বলতে নিশ্চয়ই ওর ভালো লাগছিল। নিজের নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর কৃতিত্বের কথা কার না বলতে ইচ্ছে করে!

'কিছু একটা করে দেখাব?' শুভঙ্কর যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলল, 'দাঁড়া—' ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল ও: 'ওই জানলাটা দেখছিস?'

ঘরের একটা বন্ধ জানলার দিকে তাকালাম। খট করে শব্দ করে জানলাটা খুলে গেল। পরমুহূর্তেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'টিভিটা দেখ!' বলল শুভঙ্কর।

সঙ্গে-সঙ্গে টিভি-টা অন হয়ে গেল।

'ওটার দিকে তাকিয়ে থাক।'

টিভি-টা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। কিন্তু দেখলাম টিভি-টার সারা গায়ে মিহি বরফকুচি লেগে আছে।

'ওটাকে হিমালয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল শুভঙ্কর।

এবার ও তীব্র চোখে টিভি-র মেইনস কর্ডটার দিকে তাকাল।

আমার হতভম্ব দৃষ্টির সামনে কর্ডটা শূন্যে ভেসে উঠল সাপের মতো—তার শেষ প্রান্তে প্লাগটা যেন সাপের ফণা। ওটা এগিয়ে যাচ্ছিল দেওয়ালে বসানো সকেটের দিকে।

কিন্তু সকেটের কাছে পৌঁছনোর আগেই প্লাগটা আচমকা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

শুভঙ্কর কেমন একটা বিরক্তির শব্দ করে উঠল, বলল, 'নাঃ! দাঁড়া, তোকে আরও কঠিন কিছু দেখাই।'

ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কাঁপা গলায় ও বলল, 'টিভি-টার দিকে লক্ষ কর, প্রদীপ। সকেটে প্লাগ না গুঁজেই ওটা তোকে চালিয়ে দেখাব। স্রেফ বাতাস থেকে ইলেকট্রন নিয়ে...।'

রঙিন টিভি সেটটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শুভঙ্কর।

হঠাৎই পাওয়ার অন হওয়ার ছোট্ট লাল বাতিটা জ্বলে উঠল। বারকয়েক দপদপ করে জ্বলল-নিভল। তারপর জ্বলেই রইল। টিভির স্পিকার থেকে শব্দ বেরোতে শুরু করল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আলতো পায়ে পৌঁছে গেলাম ওর পেছনে। কোমর থেকে সার্ভিস রিভলভারটা বের করে নিলাম।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, একটা বিরাট জুয়া খেলছি—কিন্তু এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই।

রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওর বাঁ-কানের পেছনে প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিলাম। টুঁ শব্দ না-করে শুভঙ্করের দেহটা ভাঁজ খেয়ে উলটে পড়ল মেঝেতে। আরও একটা ঘা বসিয়ে দিলাম ওর মাথায়। পরখ করে নিশ্চিন্ত হলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওর জ্ঞান আর ফিরছে না। সুতরাং আমার কাজ শুরু করলাম।

পেশাদারি ঢঙে ওর ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে সার্চ করতে লাগলাম। একটু পরেই একটা ড্রয়ারে ওর গবেষণার কাগজপত্রগুলো পেলাম। যা চাই সবই রয়েছে সেখানে। লেখা রয়েছে ওর অলৌকিক ক্ষমতার গোপন রহস্য। জুয়ায় আমি জিতেছি।

টেলিফোন তুলে নিয়ে পুলিশে ফোন করলাম।

তারপর মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে থাকা শুভঙ্করের গলায় রিভলভার ঠেকিয়ে ফায়ার করলাম। পুলিশ এসে পৌঁছতে-পৌঁছতে শুভঙ্কর মিত্র মরে কাঠ।

শুভঙ্কর আমার বন্ধু ছিল। এমন বন্ধু যাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ওই গোপন রহস্য জানার পরেও বিশ্বাস করা যায় কি না সেটাই প্রশ্ন।

মাত্র সতেরোটা শব্দে শুভঙ্করের অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার রহস্য ফাঁস করা আছে গবেষণার কাগজে। এই মন্ত্রটা একবার কেউ পড়ে নিলেই হল! চোর-ডাকাত-খুনি-পাগল —যে-কেউ এটা পড়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে, এতই সহজ সেই সূত্র।

শুভঙ্কর এমনিতে খুব সৎ, আদর্শবাদী। কিন্তু এই ক্ষমতা হাতে নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ও নিজেকে ভগবান ভাবতে শুরু করবে। তখন?

ধরা যাক, আপনি ওই সতেরোটা শব্দ জেনে গেছেন। তখন আপনি অনায়াসে যে-কোনও ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে পড়তে পারবেন, যে-কোনও বন্ধ ঘরে উঁকি মারতে পারবেন, দেওয়াল ভেদ করে ইচ্ছেমতো যাতায়াত করতে পারবেন। পিস্তল বা রিভলভারের গুলি আপনাকে খতম করতে পারবে না। গ্রেনেড কিংবা অ্যাটম বোমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েও আপনার বিন্দুমাত্র ভয় করবে না। কারণ চোখের পলকে—শুধু ইচ্ছে করলেই —আপনি হাজার-হাজার মাইল দূরে চলে যেতে পারবেন।

এরকম ক্ষমতা যদি পান, তখন?

লোকে বলে, ক্ষমতা থেকে দুর্নীতির জন্ম হয়। সুতরাং চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতে পেলে জন্ম নেবে চূড়ান্ত দুর্নীতি। ওই সতেরোটা শব্দই চূড়ান্ত ক্ষমতার শেষ কথা। সুতরাং, শুভঙ্কর আমার বন্ধু হলেও আমি ওকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছি। ওই সতেরোটা শব্দের ক্ষমতা হাতে দিয়ে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—শুভঙ্করকেও না।

তবে নিজেকে বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি নেই।

আপনার কোনও আপত্তি আছে নাকি?

অসুর

শীতের দুপুরে কোনও এক শহরতলিতে তিনতলা বাড়িটা ছিল একা-একা দাঁড়িয়ে। সামনে একফালি বাগান, আর দু-পাশে খোলা মাঠের নির্জনতা। পিছন-দিকটায় কিছু জংলা ঝোপ। বাড়ির বাসিন্দা ছ'জন মানুষ। কিন্তু ছ'জনের একজন গরহাজির ছিল সেই নির্জন দুপুরে। এবং ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হল সপ্তম ব্যক্তি...।

পরনে ফুল হাতার কালো জামা, কালো কর্ড-এর প্যান্ট। চোখে-মুখে কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টি। চেহারা তার রোগার দিকেই। কিন্তু চোয়ালের কঠিন রেখা ভেতরের শক্তির একটা আভাস দিচ্ছে। পা ফেলায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। অলসভাবে মেঠো পথ ধরে সে এগিয়ে আসছিল। আধা-গ্রাম আধা-শহর মিশিয়ে তৈরি এই শহরতলিতে তার আসা এই প্রথম। এবং বোধহয় এই শেষ।

রাস্তার দু-পাশে ঘাসের ছোঁওয়া এখনও আছে। চোখ তুলে তাকালে দূরে দেখা যায় ওভারহেড লাইন। সেই তারে বসে আছে কয়েকটা ফিঙে। লেজ নাড়িয়ে দোল খাচ্ছে।

এ-অঞ্চলের বাড়িগুলোকে কেউ যেন সযত্ন পরিকল্পনায় হিসেবি দূরত্বে বসিয়ে দিয়েছে। কোনওটা একতলা, কোনওটা দোতলা, আর কোনওটা-বা তিনতলা। শীতের দুপুর। সব বাড়ির জানলা, দরজা বন্ধ। হয়তো বাসিন্দারা বিশ্রাম নিচ্ছে।

তিনতলা হলদে বাড়িটা তাকে টানল কোন অদ্ভুত কারণে, তা সে নিজেই জানে না। হয়তো বাড়ির সামনের ওই একফালি বাগানটা।

নির্জন মাঠের এদিক-ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে সে বাড়িটার দিকে তাকাল।

আধুনিক পরিকল্পনার ছোঁয়াচ বাড়িটার সর্ব অঙ্গে।

ভারি কাঠের দরজার ওপরে নেমপ্লেট। তাতে লেখা—

সুশান্ত মল্লিক, অ্যাডভোকেট

তার একটু ওপরে, ডান পাশে কলিংবেলের সুইচ। বাগান চিরে যে-পথ দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার দু-ধারে গেঁথে দেওয়া ইটে সাদা রঙ করা; খাটো বাঁশের বেড়াও রয়েছে একটা।

শ্লথ পায়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে কী যেন চিন্তা করল সে। চোখ তুলে তাকাল দোতলার বারান্দার দিকে। সাদা রঙের গ্রিলে ঘেরা বারান্দা জনশূন্য। এবং যে-হলদে দরজাটা বাড়ি এবং বারান্দার যোগসূত্র, সেটা বন্ধ।

চিন্তায় ইতি ঘটিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলিংবেলের বোতামে হাত রাখল সে। ভেতরে ঝনঝনিয়ে ওঠা চাপা আওয়াজটা কানে আসতেই হাসল; বাঁ-হাতটা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পকেটে ঢুকিয়ে অনুভব করল ভাঁজ করা স্টিলের ছুরিটা।

আর একবার হাসল সে।

একটা হালকা লেপ গায়ে দিয়ে বারান্দার লাগোয়া ঘরটাতে শুয়েছিলেন সুশান্ত মল্লিক।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য দিনকয়েক ওকালতিকে ছুটি দিয়েছেন তিনি। পঞ্চাশ পার হওয়ার পর থেকে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন শরীরের সঙ্গে লাগাতার বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। সবাই জানে, এ সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা বারণ। সাধারণত গল্পের বই পাশে নিয়ে শোন। মাথার কাছে রিডিং-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ পড়েন, তারপর একসময় আলো নিভিয়ে পাশ ফিরে ঘুমোনোর আয়োজন করেন।

সুশান্ত মল্লিকের একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন কলিংবেলের শব্দ। অর্থাৎ দরজায় কোনও অতিথি অপেক্ষা করছে। কিন্তু তিনি ব্যস্ত হলেন না। কারণ, বেলা এখন সবে দুটো। তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, বিধবা বোন এবং বাড়ির কাজের লোক—সকলেই এখন জেগে। কলিংবেলের শব্দ ওরা কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে থাকবে। তারপর ওদের কেউ যাবে দরজা খুলে দিতে।

প্রমাণিত হল, সুশান্ত মল্লিকের অনুমান নির্ভুল। তাঁর স্ত্রী, রমলা মল্লিক, দোতলার রান্নাঘরে এঁটো বাসন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কলের জলের শব্দে কলিংবেলের শব্দটা তাঁর কানে যায়নি। রান্নাঘরের পাশেই একটা মাঝারি ঘর। সে-ঘরে সিনেমার পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতে ব্যস্ত ছিল সুমনা—সুশান্ত মল্লিকের মেয়ে। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর সুযোগ্য পাত্রের অপেক্ষায় দিন গুনছে। ঘণ্টার শব্দটা ওর কানে গেলেও বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা সুমনা করল না। কারণ ও জানে, আর কেউ-না-কেউ শব্দটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়ে থাকবে। তাই পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেও ওর কান পড়ে রইল সদর দরজার দিকে: কখন শুনতে পাবে দরজা খোলার শব্দ। তারপর না-হয় জানলা দিয়ে এবার উঁকি মেরে দেখবে, কে এল।

সুমনার বিধবা পিসি প্রভা রায়গুপ্ত পুজো-আর্চ্চা সেরে খাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন, কানে এল ঘণ্টার শব্দ। এ-বয়সে মানুষ হয়তো একটু অধৈর্য এবং খুঁতখুঁতে হয়। তাই খাওয়ার ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি বাইরের করিডরে বেরিয়ে এসে ডেকে উঠলেন, 'সুমু, দেখ তো কে এল।'

সুমনা দোতলায় নির্বিকার থাকলেও প্রভাদেবীর চিৎকারটা রমলাদেবীর কানে গেল। তিনি বাসন মাজা থামিয়ে চাকর অবিনাশকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বললেন, 'অবিনাশ, দরজা খুলে দে। কে এল দেখ—' কথা শেষ করে আবার হাতের কাজে মন দিলেন তিনি।

অবিনাশের বয়স বাইশ-তেইশ। কালো স্বাস্থ্যবান চেহারা। এ-বাড়িতে সে আছে প্রায় চার বছর। রোজকার মতো একতলায় বসে সে কাপড় কাচছিল। কাপড় কাচা হলে স্নান সেরে দোতলায় গিয়ে ঢেকে খাকা খাবার খাবে। তারপর একটু গড়ানোর ব্যবস্থা করবে।

কাপড় কাচার শব্দে ঘণ্টির শব্দ চাপা পড়ে যাওয়ায় সে এতক্ষণ খেয়াল করেনি। কিন্তু 'মা'য়ের গলার আওয়াজে হাতের কাজ থামাল সে। শুনতে পেল ঘণ্টার অধৈর্য শব্দ।

একটু বিরক্ত হয়ে অবিনাশ উঠল। ভিজে হাত থেকে সাবান-জল ঝাড়তে-ঝাড়তে দরজার কাছে এগিয়ে এল।

নীরবে অপেক্ষা করতে-করতেই তার নজর পড়ল টেলিফোনের তারটায়। দরজার বাঁ-পাশ দিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে নেমে গেছে।

মনে-মনে হাসল সে।

বিজ্ঞানের লম্বা হাত এত দূরেও এসে পৌঁছেছে! এই ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের হাসি কালো ঠোঁটজোড়ায় ছায়া ফেলল। বাঁহাতে ছুরিটা বের করে বুড়ো আঙুলে চাবি টিপতেই ঝলসে উঠল স্টিলের ফলাটা। এবং পরমুহূর্তেই নিখুঁত হাতে বিচ্ছিন্ন হল টেলিফোনের তার।

রোদ-ঝকমকে নীল আকাশে হঠাৎই যেন ছায়া ফেলল একটুকরো ঘন কালো মেঘ।

এমন সময় সশব্দে খুলে গেল সদর দরজা।

দরজায় দাঁড়িয়ে বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক। খালি গা। পরনে চেক লুঙ্গি। খাটো করে পরা। কোথাও-কোথাও সামান্য ভিজে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিজে হাত দুটো লুঙ্গিতে মুছতে লাগল ছেলেটি। প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

উত্তরে মৃদু স্বরে সে বলল, 'সুশান্ত মল্লিক, অ্যাডভোকেট।'

'উনি অসুস্থ। এখন বিশ্রাম করছেন।'

নীরবে খোলা দরজার চৌকাঠ পেরোল সে। ছেলেটির বিস্ফারিত চোখের সামনে পিঠ দিয়ে বন্ধ করে দিল সদর দরজা। তারপর বাঁহাতটা উঁচিয়ে ধরল ছেলেটার চোখের সামনে। হাতে-ধরা বস্তুর চরিত্র এই আধো-অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝল ছেলেটা। হয়তো আসন্ন বিপর্যয়ের কথা অনুমান করেই এক হৃদয়বিদারী চিৎকারের জন্য ভোক্যাল কর্ডকে তৈরি করে হাঁ করল। এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই অভ্যাসলব্ধ পেশাদারি ভঙ্গিতে সাপের মতো ক্ষিপ্রতায় আগন্তুকের বাঁহাত ছোবল মারল ছেলেটির গলায়। একইসঙ্গে তার চিৎকার এবং শ্বাসনালিকে মাঝপথেই বিচ্ছিন্ন করল স্টিলের ফলাটা।

অদ্ভুতভাবে ছেলেটার শরীরটা সামনে মাথা ঝুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে কয়েকমুহূর্তের জন্য। তারপরই সিমেন্টের মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল। মেঝে তখন রক্তে ভিজে উঠেছে।

ছটফট করে শরীরটার দিকে একপলক দেখল সে। দেখল বাঁ-হাতের রক্তাক্ত ছুরিটার দিকে। তাকাল কালো জামায় ছিটকে আসা রক্তের রেখার দিকে। তারপর নির্বিকারভাবে ছুরিটা ঘষে-ঘষে মুছে নিল জামার কাপড়ে। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ছেলেটার দেহটা ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। পা থেকে চটিজোড়া এককোণে খুলে রেখে নিঃশব্দ পায়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে...।

সুমনা শুয়ে-শুয়েই শুনতে পেল সদর দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। সুতরাং অতিথির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার শব্দের প্রতীক্ষায় ও সময় গুনতে লাগল। কিন্তু মিনিটপাঁচেক পরেও যখন কারও পায়ের শব্দ ওর কানে এল না, তখন একটু অবাক হল ও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিনেমা-পত্রিকাটা বালিশের পাশে রেখে বেশবাস গুছিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল।

ভেজানো দরজা খুলে বাইরের অলিন্দে এল সুমনা। ডান পাশেই রান্নাঘর, এখান থেকে মায়ের বাসন মাজার শব্দ বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে। মা-কে আর ব্যস্ত না-করে বাঁদিকে এগোল সুমনা। একপলক দেখল তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে, তারপর তাকাল বাবার ঘরের দরজার দিকে। দরজা রোজকার মতোই ভেজানো—যাতে কোনও অবাঞ্ছিত অতিথি সুশান্ত মল্লিকের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়।

এবার নীচে নামার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে সুমনা। যতই নামে ততই ও অবাক হয়। কারণ, একতলার বাথরুম থেকে অবিনাশের কাপড় কাচার একটানা শব্দ মোটেও শোনা যাচ্ছে না। এটা রোজকার নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং অস্বাভাবিক।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নেমে কলতলার দিকে এগিয়ে চলল সুমনা।

কলতলা এবং বাথরুমের একটাই দরজা, এবং সেটা হাট করে খোলা।

ভেতরে উঁকি মারতেই কোনও শব্দ না-শোনার কারণটা বোঝা গেল: কলতলায় অবিনাশ নেই। বালতি, সাবান, কাপড়চোপড় সব ছড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে, কাপড় কাচতে-কাচতে হাতের কাজ ফেলে অবিনাশ উঠে গেছে সদর দরজা খুলতে।

বাথরুম দেখা শেষ করে সদর দরজার দিকে চলল সুমনা।

সদর দরজার হাতপাঁচেকের মধ্যে পৌঁছতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা জিনিসটা যে অবিনাশ সেটা ও বুঝতে পারল।

কিন্তু সদর দরজা বন্ধ!

আর রক্তে ভেসে যাওয়া সিমেন্টের মেঝেতে বিস্রস্তভাবে পড়ে আছে অবিনাশ। দু-চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা। এবং গলার নলিটা কে যেন সযত্নে দু-টুকরো করে দিয়েছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুমনা কয়েকমুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ল। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ওর মুখ থেকে সঙ্গে-সঙ্গে কোনও চিৎকার বেরিয়ে এল না। বুকে জমাট বাঁধা

নিশ্বাসটা যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখনই শোনা গেল ওর উন্মাদ চিৎকার। যেন কসাইখানায় খতম হওয়ার সময় কোনও শুয়োর ভাঙা, মর্মন্তুদ, কর্কশ স্বরে আর্তচিৎকার করছে।

দোতলায় ওটার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সে। দেখল, বাঁদিকে একটা ভেজানো দরজা। দ্বিধা কাটিয়ে দরজায় হাতের চাপ দিল। ধীরে-ধীরে সেটা খুলে গেল। এবং নিঃশব্দ পায়ে আগন্তুক ভেতরে ঢুকল। আবার ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

যে-ঘরটায় সে পা রাখল সেটা অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার জন্য আধা-ড্রইংরুমগোছের একটা ঘর। দরজার বাঁ-পাশে রেফ্রিজারেটর। সামনে সাজানো সোফাসেট এবং একটা ছোট টেবিল—হলদে কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাঁদিকের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের তাকে বসানো রেডিও। এখন বন্ধ।

ঘরের আসবাবপত্রের ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে সে এগিয়ে চলল।

সামনেই আর-একটা দরজা। আলতো করে ভেজানো।

দ্বিতীয় দরজা অতিক্রম করেই সে পৌঁছল বারান্দার লাগোয়া বড় ঘরটায়। ঘরে আবছা অন্ধকার। ডানদিকে এবং বাঁদিকে দুটো বড় খাট। ডান পাশে দাঁড় করানো একটা বিশাল কাঠের আলমারি। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা চেয়ার ও টেবিল।

পরমুহূর্তেই তার চোখ পড়ল বাঁদিকের খাটে দেওয়ালের দিকে মুখ করে লেপ গায়ে ঘুমিয়ে রয়েছে একজন মানুষ। শুধুমাত্র তার মাথার পিছনটুকু অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে। খাটের বাঁদিকে সাজানো একটা স্টিলের আলমারি, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল। টেবিলে কয়েকটা জিনিস রাখা আছে বোঝা গেলেও আবছা আঁধারে ঠিকমতো নজরে এল না। স্টিলের আলমারির গায়ে লাগানো এক বিশাল আয়না। সেই আয়নায় নিজেকে একপলক দেখে বাঁদিকের খাটটার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

খাটের খুব কাছে দাঁড়িয়ে সে লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা মাথাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জানলায় লাগানো কাচের শার্সির দৌলতে সামান্য আলো ঠিকরে পড়েছে শুয়ে-থাকা মানুষটির গায়ে। তার নজরে পড়ল কাঁচা-পাকা চুলের হালকা আস্তরণ মাথার পিছনটা ঢেকে রেখেছে। মনে-মনে কী ভাবল সে। তারপর পকেট থেকে ইস্পাতের ছুরিটা বের করে বাঁহাতে উঁচিয়ে ধরল। চাবির ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ দিতেই একটা 'খট' করে শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে ছিটকে এল ঝকঝকে ফলাটা। শুয়ে-থাকা লোকটা সে-শব্দ শুনতে পেল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

সুতরাং নিশ্চিত ভঙ্গিতে সে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ল, দু-চোখের কালো তারা কেন যেন ধকধক করে জ্বলছে...।

চিৎকারটা প্রথমে শুনতে পাননি রমলাদেবী। কারণ ধাতব বাসনে ছিটকে পড়া জলের শব্দ আর-সব শব্দ ঢেকে দিয়েছিল। আচমকা কলটা বন্ধ করতেই কারও গলা চিরে

বেরিয়ে আসা তীব্র চিৎকারটা পাগলের মতো তার কানের পরদায় এসে আঘাত করল। একবার—দুবার—তিনবার...।

সম্পূর্ণ হতভম্ব রমলাদেবীর হাত থেকে অ্যালুমিনিয়ামের হাতাটা খসে পড়ে গেল। দিশেহারাভাবে কয়েকমুহূর্ত তিন উবু হয়ে বসে রইলেন। তারপর বয়েসের তুলনায় ক্ষিপ্র চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালেন। ভিজে হাত দুটো পরনের শাড়িতে মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এলেন বাইরের অলিন্দে। স্বভাবমতো ডেকে উঠলেন, 'কী হল? চেঁচাচ্ছে কে—কী ব্যাপার—?'

অলিন্দ ধরে কয়েক পা এগিয়েই তিনি বুঝলেন, চিৎকারের শব্দটা আসছে একতলা থেকেই। সুতরাং নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ সুমনার কথা মনে হতেই আবার ফিরে এলেন রান্নাঘরের পাশের ঘরটায়। হ্যাঁ, চোখের কোণ দিয়ে যেটুকু তাঁর নজরে পড়েছিল তা সত্যি।

ঘরে সুমনা নেই।

সিনেমার পত্রিকাটা বালিশের পাশে নামানো। ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

এবার রমলা মল্লিক ভয় পেলেন। 'সুমু—সুমু' বলে চিৎকার করতে-করতে তিনি টলোমলো পায়ে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নামার পরই বিপরীত দিক থেকে উদভ্রান্ত ভঙ্গিতে ছুটে আসা সুমনার সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল।

সুমনার দু-চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করা। ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর ভারি বুক দুটো উঠছে-নামছে।

মাকে সামনে পেয়ে জাপটে ধরল সুমনা। মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। রুদ্ধ আবেগে ওর শরীরটা রমালাদেবীর দু-হাতের মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

সেকেন্ডকয়েক পর সুমনার কাঁপা স্বর—'অবিনাশ—মরে গেছে—' এই শব্দ তিনটে উচ্চারণ করল এবং করেই চলল।

পাঁচবারের বার রমলাদেবী ওর কথার অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন। তখন আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন মেয়েকে। চাপা স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'অবিনাশ মরে গেছে? কী করে?'

সুমনা নীরবে সদর দরজার দিকে আঙুল দেখাল। ওর শরীরের কাঁপুনি তখনও থামেনি।

রমলাদেবীর অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। প্রথম কয়েকমিনিট তিনি দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, সুমনা মিথ্যে কথা বলছে না। কিন্তু ওর দেখা ও শোনার মধ্যে কোথাও হয়তো কোনও গলদ রয়েছে, তাই এরকম অসংলগ্ন আচরণ করছে। সুতরাং তিনি মেয়েকে সাহস দেখিয়ে বললেন, 'চল তো, দেখি কী ব্যাপার—।'

সুমনা শূন্য চোখে মায়ের চোখের দিকে দু-পলক চেয়ে রইল, তারপর নীরবে তাঁর কথা মেনে নিল। মায়ের হাত ধরে ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ওর শূন্য দৃষ্টি সামনে—যেন অবিনাশের মৃতদেহটা ওর চোখের তারায় ভাসছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নামতেই রমলা মল্লিকের সন্ধানী নজর পড়ল এককোণে রাখা মামুলি একজোড়া চটির ওপর। কিছু একটা বলতে গিয়েও তিনি থমকে গেলেন। ক্লান্ত সুমনার দিকে মনোযোগ দিলেন: 'চল, আস্তে-আস্তে চল। কোনও ভয় নেই, আমি তো আছি।'

সুমনা মাকে নিয়ে মৃত অবিনাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু রক্তের কালচে রং, আর কিছু কালো মাছি ছাড়া দৃশ্যপটের আর কোনও পরিবর্তন হয়নি।

রমলাদেবীর মুখ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল। সুমনা ভাব-অনুভূতিহীন, নির্বিকার।

সংবিৎ ফিরে পেতে রমলাদেবীর যেটুকু দেরি হল সেটা তিনি পুষিয়ে নিলেন আচমকা ছুট দিয়ে। মেয়েকে ফেলে রেখে তিনি পাগলের মতো দৌড়লেন সিঁড়ির দিকে; মেয়ের কথা তাঁর মনেও রইল না।

মাকে উধাও হতে দেখে সুমনাও চুপ করে থাকল না। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে মাকে অনুসরণ করল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে যে-দৃশ্য ও দেখল তাতে অবাক হওয়ারই কথা। এবং সেইসঙ্গে ভয়ের পরশও বুঝি দোলা দিয়ে যায়...।

সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরে দাঁড়িয়েই নীচের তলার শোরগোলটা তার কানে গেল। একটু যেন বিচলিত হয়েই তার বাঁহাত পকেট ছুঁয়ে দেখল, অনুভব করল ইস্পাতের ভরসা। তারপর বেড়ালের পায়ে বেরিয়ে এল বসবার ঘরে। সিঁড়ির লাগোয়া দরজায় কান পেতে শুনতে পেল একাধিক নারীকণ্ঠ। ওরা কথা বলছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই কথা মিলিয়ে আসতে লাগল—ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

সুতরাং সে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে, চোরা পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে—পলকের জন্য রেলিঙের পাশ দিয়ে তার চোখে পড়ল রঙিন শাড়ির আভাস। নির্লিপ্তভাবে ওদের অনুসরণ করল সে।

যখন সে সিঁড়ির শেষ ধাপে, নজরে পড়ল তার রেখে যাওয়া চটিজোড়া, এবং কানে এল একটা চাপা অদ্ভুত চিৎকার—যদি তাকে চিৎকার বলা যায়। পরক্ষণেই যে কারও ফিরে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরেই চট করে চটিজোড়া হাতে তুলে নিল সে, শ্বাপদের মতো ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল। পিছনে ভেসে আসছে পায়ের শব্দ।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে লুকোনোর চেষ্টায় আবার বসবার ঘরেই ঢুকেই পড়ল সে। চঞ্চল চোখে জরিপ করে ডানদিকের দেওয়ালের গায়ে, সোফা সেটের ঠিক বিপরীত দিকে, সে আবিষ্কার করল একটা ছোট দরজা। ঝটিতি সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। হাতের চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আবার দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর ভালো করে দেখতে লাগল ঘরটা।

আটফুট বাই চারফুট ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর। টুকিটাকি জিনিসে—হাঁড়ি, কড়াই, টিনের কৌটো, বালতি আর একটা বিশাল আলমারিতে ঠাসা। কোনওরকমে জনাতিনেক পাশাপাশি দাঁড়ানো যায়।

আলমারির পাশে একটা সবুজ কাঠের মই। মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। তার এক জায়গায় একটা চৌকো ফোকর—অর্থাৎ, ওপরের কুঠরি-ঘরে যাওয়ার দরজা। সেই চৌকো তক্তাটা একটা আংটা দিয়ে বাইরের কাঠের সঙ্গে আটকানো। এবার কাঠের মইটার অর্থ বুঝতে পারল সে। এই মই বেয়ে উঠে কাঠের চৌকো তক্তাটা খুলে একজনের পক্ষে ওপরের কুঠরি-ঘরে যাওয়া সম্ভব। মই বেয়ে ওপরে ওঠার ইচ্ছেটা

একবার তার মনে চাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল বসবার ঘরের দরজা। হাঁফাতে-হাঁফাতে কেউ ঢুকল ঘরে। তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ছুটতে শুরু করল।

কান খাড়া করে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে। চোখ ভাঁড়ার ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে দূরের রোদে-ধোওয়া নীল আকাশে। মনে-মনে পরিস্থিতির ওজন মাপতে চাইল সে। পারল না। সব চিন্তা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছে মশার গুনগুন একটানা কান্না…।

জমাট পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন রমলা মল্লিক। তেমনি নিশ্চল তাঁর বিস্ফারিত দু-চোখ। তাকিয়ে আছেন সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দেওয়ালের পাশে একটি বিশেষ জায়গার দিকে। মায়ের হতবাক হওয়ার কারণ সুমনা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারল। মায়ের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে ও সেইদিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনও কিছুই ওর নজরে পড়ল না।

সুমনা ভয় পেয়ে দু-হাতে ঝাঁকুনি দিল মাকে: ‘কী হয়েছে মা? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?’

ক্লান্ত আচ্ছন্ন স্বরে রমলা মল্লিক বললেন, ‘সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একজোড়া চটি দেখেছিলাম, এখন দেখছি না।’

কথার অর্থটা মনের গভীরে কেটে বসতে সুমনার যেটুকু সময় লাগল। তারপরই ও ক্ষিপ্র পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। পিছন থেকে মায়ের ভেসে আসা ‘কী হল, সুমু?’-র? উত্তরে ও কোনওরকমে বলল, ‘দাঁড়াও মা, অফিস-ঘরের চাবিটা দিয়ে আসি।’

রমলা মল্লিক মেয়েকে চোখের আড়াল করতে চাইলেন না। ওকে অনুসরণ করলেন। সুমনা তখন একধাক্কায় বসবার ঘরের দরজা খুলে ফ্রিজের ওপরে রাখা অফিস-ঘরের চাবিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। দ্রুতপায়ে পাশ কাটিয়ে নেমে যেতে-যেতে মাকে ও বলল, ‘তুমি শিগগির বাবাকে ডাকো! আমি পুলিশে ফোন করছি।’

মাকে বিহ্বল অবস্থায় সিঁড়িতে রেখে সুমনা ছুটে গেল একতলার অফিস-ঘরে। অ্যাডভোকেট সুশান্ত মল্লিকের অফিসে।

মানসিক অস্থিরতায় তালার গায়ে চাবিটা ঢোকাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর। তারপর একঝটকায় দরজা খুলে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁ-প্রান্তে বসানো টেলিফোনের কাছে পৌঁছে গেল সুমনা। কাঁপা হাতে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে যেতেই বুঝল, রিসিভার নিস্তব্ধ। তাতে ডায়াল টোনের সুপরিচিত ‘কড়-কড়’ শব্দ শোন যাচ্ছে না। শতচেষ্টাতেও যখন কিছু হল না, তখন রূঢ় বাস্তবটা সুমনা বুঝতে পারল।

ওদের বাড়ির টেলিফোনের লাইন কেউ কেটে দিয়েছে…।

সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে রমলা মল্লিক যখন সচল হলেন, তখন বেশ কয়েকসেকেন্ড কেটে গেছে। স্বামীকে অবিশ্বাস্য ঘটনা কীভাবে বিশ্বাস করাবেন সেই কথা ভাবতে-ভাবতে তিনি উঠে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে চাইলেন

নীচের চটিজোড়ার মতো এই বসবার ঘরে কোনওরকম গরমিল চোখে পড়ছে কি না। পড়ল না। সুতরাং ধীরে-ধীরে তিনি এগোলেন সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরের দিকে।

ঘরের ভেজানো দরজায় হাত রাখতেই অস্পষ্টভাবে কারও নড়াচড়ার শব্দ তাঁর কানে এল—বোধহয় ভাঁড়ার ঘরের দিক থেকে। থমকে দাঁড়ালেন রমলাদেবী। চোখ এবং পা যথাক্রমে ফেরালেন ভাঁড়ার ঘরের ভেজানো দরজার দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে পা বাড়ালেন।

ভেজানো দরজায় হাত ছোঁয়াতেই তাঁর বুক কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়। তবু সাহসে ভর করে দরজায় চাপ দিলেন। ক্ষীণ প্রতিবাদে ক্যাঁচকাঁচ সুরে খুলতে শুরু করল দরজা। খানিকটা খুলতেই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে চাইলেন কিন্তু বিশেষ কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। অতএব মনকে বোঝালেন শব্দটা অবাধ্য ইঁদুরের। তারপর ফিরে এলেন শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে।

ঘরে ঢুকে প্রথমে যে অস্বাভাবিক ব্যাপারটা রমলা মল্লিকের নজরে পড়ল অথবা বলা যায়, 'কানে এল'—সেটা সুশান্ত মল্লিকের ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপস্থিতি। ঘরের প্রতিটি জিনিসই নিজের-নিজের জায়গায় স্বাভাবিকভাবে বর্তমান। এমনকী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কান পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে সুশান্ত মল্লিকও স্বাভাবিকভাবে শুয়ে আছেন।

হঠাৎ যেন গতি এবং সংবিৎ ফিরে পেলেন রমলাদেবী। দ্রুতপায়ে পৌঁছে গেলেন স্বামীর বিছানার কাছে। ঝুঁকে পড়লেন খাটের ওপর। স্বামীর গায়ে হাত রেখে ধাক্কা দিলেন, ডাকলেন, 'ওগো, শুনছ? শিগগির ওঠো। সর্বনাশ হয়েছে—।'

কিন্তু বারবার ডেকেও কোনও সাড়া না-পেয়ে রমলা মল্লিক অবাক হলেন। আর তখনই তাঁর চোখ পড়ল স্বামীর মাথার দিকে। এবং অসঙ্গতিটা তাঁর নজরে পড়ল।

তাঁর হাতের ধাক্কায় স্বামীর শরীরটা নড়ছে ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে মাথাটা প্রায় নড়ছে না-বললেই চলে।

বুকভরা আশঙ্কা নিয়ে একঝটকায় লেপটা তুলে নিলেন রমলাদেবী। এবং বুঝলেন, মাথাটা কেন ঠিকঠাক নড়ছিল না।

সুশান্ত মল্লিকের মাথা এবং শরীরের মাঝে প্রায় চার আঙুল পরিমাণ ফাঁক যেন হাঁ করে রমলা মল্লিককে গ্রাস করতে আসছে।

রক্তাক্ত বিছানা-বালিশের রং হঠাৎ যেন হলুদ ফুলে বদলে গেল রমলাদেবীর চোখের সামনে। তিনি টলে পড়লেন মেঝেতে।

হয়তো সেই কারণেই, সুশান্ত মল্লিকের খাটের নীচে রাখা ফল-কাটার ধারালো রক্তাক্ত বঁটিটা তাঁর নজরে নড়ল না।

রমলাদেবীর পড়ে যাওয়ার ভারী শব্দটাও তার কানে গেল। এর আগের ছোটখাটো শব্দগুলো তার কানে গেলেও মাথায় ঢোকেনি। শেষ শব্দটায় সে চমকে উঠল। সন্তর্পণে খুলে ফেলল ভাঁড়ার ঘরের দরজা। ডাইনে-বাঁয়ে একপলক করে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না-পেয়ে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে।

ওপরে যাওয়ার এবং নীচে নামার সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে একটু যেন দ্বিধায় পড়ল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিল এবং নীচে যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

'নিঃশব্দ' শব্দটা যেন তার পায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সুতরাং অবিচলিত ধীরপায়ে সে নেমে এল অফিস-ঘরের দরজার সামনে। চটিজোড়া আবার খুলে রাখল সিঁড়ির গোড়ায়। সামনেই বাথরুম। তার খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ছে ছড়িয়ে রাখা ভেজা কাপড়চোপড়, সাবান-জল ভরা বালতি, সব মিলিয়ে অসমাপ্ত কাজের ইশারা।

এবার তার মনোযোগ পড়ল অফিস-ঘরের দিকে।

কিছুটা কৌতূহল কিছুটা আগ্রহ নিয়ে সে ভেতরে উঁকি মারল।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে, তার দিকে পিছন ফিরে, টেলিফোন নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে একটি মেয়ে—যুবতী।

হাসল সে। ফোনের তার তো সে আগেই কেটে দিয়েছে, তা হলে?

নীরবে মেয়েটির পিছনে গিয়ে থামল সে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করতে লাগল। এবং নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই মেয়েটি তার মুখোমুখি হল।

মুহূর্তের নীরবতা।

তার কালো পোশাক এবং সাদা হাসির পরস্পরবিরোধী চেহারায় মেয়েটির চোখজোড়া অবাক হল, বিস্ফারিত হল।

এবং কোনও শব্দ তৈরির আশায় নরম ঠোঁটজোড়া স্ফুরিত হতেই বিদ্যুতের মতো তার থাবা আছড়ে পড়ল মেয়েটির মুখে...।

রমলাদেবীর জ্ঞান ফিরলেও আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে বেশ সময় লাগল। তিনি 'কোথায়, কী করে, কেন?' এইসব প্রশ্নের উত্তরগুলো ধীরে-ধীরে তাঁর মনকে ভারি করে তুলল। মাথাটা দু-হাতে চেপে ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নীরবে তাকালেন স্বামীর শরীরের দিকে। স্বামীর লেপে-ঢাকা দেহটা জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। দু-চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল, জ্বালা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন। ইতস্তত তাকিয়ে ঝুঁকে পড়লেন খাটের নীচে, ফল-কাটার বঁটিটা টেনে নিতে গিয়ে থমকালেন। কারণ, বঁটি রক্তে মাখামাখি। কিন্তু মনের দ্বিধা কাটিয়ে আস্থা-ভরা ডানহাতে তুলে নিলেন বঁটিটা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলে এলেন বসবার ঘরে। ভাঁড়ার ঘরের খোলা দরজা দেখে সচকিত হলেন। ঢুকে পড়লেন ভেতরে।

কেউ নেই।

বসবার ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ফ্রিজের ওপর থেকে তালা এবং চাবিটা তুলে নিলেন। বঁটিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দরজায় তালা দিলেন রমলাদেবী। চাবিটা কোমরে গুঁজে দোতলার বাকি দুটো ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, প্রতিটির দরজার কড়া সরু পাটের দড়ি

দিয়ে বাঁধলেন। পাটের দড়ির বাকিটা ফেলে দিলেন বারান্দার একপাশে। তারপর মেঝে থেকে রক্তাক্ত বঁটিটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দরজার কড়ায় দড়ি বাঁধার উদ্দেশ্য নিয়ে রমলাদেবীর মনে কোনওরকম ভুল ধারণা ছিল না। তিনি একমুহূর্তের জন্যও ভাবেননি, ওই হালকা দড়ি দিয়ে অদৃশ্য খুনিকে তিনি আটকে রাখতে পারবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অজান্তে কেউ কোনও ঘরে ঢুকলে সেটা যেন তিনি বুঝতে পারেন। আর বসবার ঘরের দরজায় তালা দেওয়ার কারণ, সুশান্ত মল্লিকের শোওয়ার ঘরেই তাঁদের টাকা-পয়সা, গয়না-সম্পত্তি ইত্যাদি থাকে। অনুপ্রবেশকারী যদি কোনও চোর-ডাকাত হয় তা হলে সেগুলো যাতে তার হাতে না-পড়ে সেইজন্যই এই সাবধান হওয়া।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রমলাদেবী মনস্থির করতে কয়েকমুহূর্ত খরচ করলেন। তারপর গলা তুলে ডাকলেন, 'সুমু—সুমু—উ—উ!'

বদ্ধ বাড়িতে তাঁর ডাক কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

দু-মিনিট অপেক্ষার পরও কোনও উত্তর পেলেন না। শুধুই নিস্তব্ধতা।

সুতরাং এইবার সাততাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন তিনি। লক্ষ্য অফিস-ঘর। বাইরের পৃথিবী তখন তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে। তা নইলে রমলাদেবী হয়তো শুনতে পেতেন প্রভা রায়গুপ্তের উৎকণ্ঠিত স্বর। তিনি তখন একনাগাড়ে রমলা মল্লিক এবং সুমনা মল্লিকের কুশল সম্পর্কে প্রশ্ন করে চলেছেন।

অফিস-ঘরে পৌঁছে ঘরের যা অবস্থা রমলাদেবীর নজরে পড়ল, তাতে ঘরটাকে অফিস-ঘর বাদে আর সব কিছু বলা চলতে পারে। কাচের টেবিলের কাচ শতটুকরো, টেলিফোনটা পড়ে আছে মেঝেতে, খাতাপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে। একটা চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে, আর সুমনা পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। ওর বাঁ-কানের পাশে পড়ে আছে কালো টেলিফোন-রিসিভারটা।

রমলাদেবী হাতের বঁটিটা একপাশে নামিয়ে রাখলেন। এগিয়ে গিয়ে সুমনার দেহের পাশে হাঁটুগেড়ে বসলেন। হাতের ধাক্কায় একমাত্র মেয়ের দেহটা চিৎ করে ফেললেন। বুঝলেন, ও আর বেঁচে নেই।

সুশান্ত মল্লিকের বেলায় রক্তপাতের যেমন ছড়াছড়ি ছিল এখানে তা নেই। টেলিফোনের কালো কর্ডটা সুমনার নরম গলায় আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো। তার চাপে সুমনার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, মুখের ভেতরে জিভের আর জায়গা হয়নি।

চাপা রাগে, আক্রোশে রমলাদেবীর বুকের ভেতরটা যেন টুকরো-টুকরো হয়ে গেল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে। সম্ভবত দোতলায় যে-কয়েকমিনিট তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই ঘটে গেছে অফিস-ঘরের তাণ্ডব। উঠে দাঁড়াতে গিয়েই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন রমলাদেবী। তাই হাত বাড়ালেন বঁটিটার দিকে।

এবং দেখলেন বঁটিটা তার জায়গায় নেই।

সুতরাং ভুল শোধরানোর সময়টুকু তিনি পেলেন না।

পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরের ওঠার চেষ্টাকে থামিয়ে দিল ধারালো কোনও কিছুর অমানুষিক আঘাত...।

প্রভা রায়গুপ্ত এবার অধৈর্য হয়ে পড়লেন। অফিস-ঘরের 'সশব্দ তাণ্ডব' তাঁর শুনতে না-পাওয়ার কারণ তখন তিনি বাড়ির পিছনদিকের ছাদে নিজের এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে রাখছিলেন। এবং প্রথমবারে সুমনার চিৎকার তিনি যে শুনতে পাননি তার কারণ, তখন তিনি নিত্যকার নিয়মমাফিক খাওয়ার আগে সেই ছাদে দাঁড়িয়েই পাখিদের খাওয়াচ্ছিলেন। পাখিদের খাওয়ানো হলে তবে তিনি নিজে খেতে বসেন।

কিন্তু রমলাদেবীর শেষবারের চিৎকারে তিনি বিচলিত হয়েছেন, এবং বারবার ভ্রাতৃবধূর ও তাঁর কন্যার নাম ধরে ডেকে উঠেছেন—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। মানুষের বয়েস হলে স্বভাব একটু খুঁতখুঁতে হয়, এবং অল্পেতেই ভয় পেয়ে যায়। হয়তো সেই কারণেই, রমলাদেবী অথবা সুমনার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

শীতের দুপুরে জানালা-দরজা ভেজিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শোয়াটা প্রভাদেবীর পুরোনো অভ্যেস। প্রথমত, সেই অভ্যাস ভেঙে তাঁকে বিছানা ছাড়তে হল। দ্বিতীয়ত, সাত বছরের পুরোনো বাতের ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে ঘরের বাইরে আসতে হল। তারপর নিরুপায় হয়েই তিনতলা থেকে তিনি নেমে আসতে লাগলেন দোতলায়।

দোতলায় এসে দাঁড়াতেই দুটো জিনিস তাকে ভীষণ অবাক করল।

এক, বসবার ঘরের দরজায় তালা দেওয়া, অন্যান্য ঘরগুলোর দরজার কড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দুই, অদ্ভুত অপার্থিব নীরবতা।

কিন্তু একটা আবিষ্কার তাঁর অবাক হওয়ার প্রথম কারণকে একটু কমজোরি করে দিল। বাথরুমের লাগোয়া খাওয়ার ঘরের দরজার কড়ায় দড়ি বাঁধা নেই। কিন্তু খোলা দড়িটা একটা কড়া থেকে ঝুলছে বলে সিঁড়ির কাছ থেকে তাঁর মনে হয়েছিল দরজা বুঝি বন্ধ।

আরও অবাক হলেন প্রভাদেবী। রমলাদেবী এবং সুমনার নাম ধরে আরও দু-চারবার ডাকলেন। তাঁর গলা ক্রমশ খাদে নেমে আসতে লাগল। একবার ভাবলেন, নীচটা দেখে আসি। সুতরাং বাথরুম, রান্নাঘর এবং সুমনার ঘরের দড়ি-বাঁধা দরজাগুলোর দিকে একপলক তাকিয়ে তিনি একতলার সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দটা কি ক্রমশ বেড়ে ওঠায় বুকের শব্দটা জোরালো ঠেকছে?

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে প্রায় একইসঙ্গে তিনটে জিনিসের ওপর প্রভাদেবীর নজর পড়ল।

বাথরুমের খোলা দরজা।

অফিস-ঘরের খোলা দরজা।

এবং একজোড়া চটি...।

চটচটে বঁটিটা নামিয়ে সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসল মাটিতে। দেখল একপলক নিজের তৈরি ধ্বংসস্তূপের দিকে।

এখন শীতকাল—সুতরাং শীত করার কথা। কিন্তু তার শরীরে যেন অসহ্য জ্বালা। সেই জ্বালা মাকড়সা-হুল ছড়িয়ে দিয়েছে তার ওলটপালট মস্তিষ্কে।

জটপাকানো অন্ধ-মস্তিষ্কে সুষম চিন্তা করতে চেষ্টা করল সে। ভাবতে চেষ্টা করল, সে কোথায়। এখানে এল কী করে? মেঝেতে শুয়ে আছে এরাই-বা কারা? কই, এদের কখনও দেখেছে বলে তো মনে পড়ছে না!

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর সে সিদ্ধান্তে এল, না, এদের কাউকেই সে চেনে না, এই বাড়িটাও তার অচেনা, এমনকী এই পৃথিবীটাও তার অচেনা। একমাত্র চেনা-পরিচিত যে ছিল, ও আজ কোথায়! সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ওকে। আর তখনই এই পৃথিবী তাকে বাধা দিয়েছে। গলা টিপে শেষ করেছে তার 'ইচ্ছে'কে। আর, এক 'ইচ্ছে'কে শেষ করতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে ওদের দ্বিতীয় 'ইচ্ছে'—যে 'ইচ্ছে' ওদের মনের মাঝে ছিল। ওরা যখন তার সব 'ইচ্ছে' শেষ করে দিচ্ছিল, তখন ওদের বাধা দিতে গিয়ে রুখতে গিয়ে মাথার ভেতরে ঘটে গেছে ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণ। তারপর?...তার পরের ইতিহাসে আছে সাদা ধবধবে চার দেওয়াল, দৈহিক অত্যাচার, ইলেকট্রিক শক, কালো ফ্রেমের চশমা, সাদা পোশাক, আর স্টেথোস্কোপ। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে মুক্ত খোলা আকাশ, নীরব সুন্দর চাঁদ, আর মুখর তারা।

সুদীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি সে কাটিয়ে উঠেছে। তারপর এসে পৌঁছেছে এইখানে, একশো দুশমনের মাঝখানে। এখন এই শত্রুহীন মুহূর্তে নিজেকে আর-একবার ক্লান্ত বলে মনে হল তার। অবসাদ যেন বরফ-ঠান্ডা আস্তরে তার মনকে জড়িয়ে রেখেছে। দু-চোখ যেন চাইছে বুজে আসতে। আ—ঃ। বড় হাঁ করে শ্বাস নিল সে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ঢিলে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দোতলায়। দোতলায় এসে অবাক হয়ে লক্ষ করল, সামনের দরজাটায় তালা দেওয়া। সুতরাং ডানদিকে এগোল সে। কী খেয়ালবশে থামল গিয়ে শেষপ্রান্তে, খাওয়ার ঘরের দরজায়। কড়ায় বাঁধা দড়িটা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। দরজা ভেজিয়ে দিল। সামনের টেবিলে রাখা জলের গেলাস দেখে তেষ্টা পেল তার। সুতরাং জল ভরতি গেলাসটা তুলে ঠোঁটে ঠেকাল সে—।

এবং সেই মুহূর্তে এক হৃদয়বিদারী তীক্ষ্ন চিৎকারে তার হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল।

থামল না সেই চিৎকার। বিভিন্ন লয়ে বিভিন্ন পরদায় কাটা রেকর্ডের মতো বেজেই চলল।

একরাশ বিরক্তি আর ঘৃণা নিয়ে পিছন ফিরে ঘরের দরজার দিকে তাকাল সে। দেখল চিৎকারের উৎস...।

অফিস-ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ দেখতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হল না প্রভাদেবীর। বরং ঘরের দুজন যে মৃত সেটা বুঝতেই তাঁর সময় লাগল।

হতভম্ব প্রভাদেবীর সমস্ত মন যেন জমাট বেঁধে গেল সেই মুহূর্তে। অবস্থাটা ভালো করে যাচাই করার জন্য আলো জ্বাললেন তিনি। এবারে আরও স্পষ্টভাবে সবকিছু তাঁর নজরে পড়ল।

সুমনা, রক্তমাখা বঁটি—যেটা এখন অচেনা লাগছে, এবং রমলার ধ্বংসাবশেষ।

পাকস্থলীর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় প্রভাদেবীর শরীরটা কেঁপে উঠল। গা গুলিয়ে উঠল। পেট চেপে ধরে উপুড় হয়ে বমি করতে লাগলেন তিনি। শরীরের প্রচণ্ড কাঁপুনি যেন কিছুতেই আর থামতে চাইছে না।

কিছুক্ষণ পর জল-ভরা লাল চোখে অফিস-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

এবং তখনই নজরে পড়ল অচেনা চটিজোড়া।

সুতরাং এবারে কৌতূহল হয়ে উঠল প্রবল। প্রভাদেবী আবার ফিরে চললেন দোতলায়।

প্রথমে দেখতে চাইলেন সুশান্তর শোওয়ার ঘর। বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে সুশান্তর শোওয়ার ঘরে যেতে হয়। দেখলেন, সেই দরজায় তালা। তা হলে কি সুশান্ত বাড়িতে নেই? কিন্তু না, এই তো ওর চটি, জুতো—দু-জোড়াই এখানে রয়েছে।

দোতলায় উঠেই সামনের অংশটুকু জুতো রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার হয়। সেখানে শুধু সুশান্ত মল্লিক কেন, সকলের চটি এবং জুতোই রয়েছে।

আচ্ছন্ন প্রভাদেবী এগিয়ে চললেন খাওয়ার ঘরের দরজার দিকে। কারণ, একমাত্র ওটার দরজাই বাইরে থেকে খোলা। সাধারণত আমিষাশীদের খাওয়ার ঘরে তিনি কখনওই পা দেন না, কিন্তু এই সংকট-মুর্হূতে সব নিয়মই ভাঙা যায়।

ভেজানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত ঠাকুরের নাম বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন প্রভাদেবী। তারপর হাতের চাপে খুলে ফেললেন খাওয়ার ঘরের ভেজানো দরজা।

সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ তাঁর বোধগম্য হল। বুঝলেন, তাঁর সামনে দাঁড়ানো এই একজনের উপস্থিতির ফলে, তাঁর সমস্ত আত্মীয় এখন অনুপস্থিত। মরতে ভয় পান না প্রভাদেবী। কিন্তু তবুও কেন জানি না তাঁর গলা চিরে বেরিয়ে এল এক অদ্ভুত চিৎকার। থামল না—বিভিন্ন লয়ে, বিভিন্ন পরদায় বেজেই চলল—।'

আর সেই মুহূর্তেই তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কালো পোশাক পরা লোকটা...।

সে তার ঘৃণাভরা চোখে, তেষ্টাভরা বুক নিয়ে, তাকাল তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বিধবা মেয়েছেলেটার দিকে। হঠাৎ জমাট আক্রোশ ফেটে পড়ল তার দু-চোখে। জলের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছ থেকে নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। কালো হাতায় ঢাকা দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দরজা লক্ষ্য করে তিরবেগে ছুটল। বিধবা বুড়িটার চিৎকার তখনও তার কানে দামামা বাজিয়ে চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে গেল, শূন্যে ছিটকে উঠল সাদা থান পরা শরীরটা। কালো দুটো হাতের একঝটকায় বারান্দার রেলিঙের আওতা ছাড়িয়ে একেবারে যেন উড়ে গেল বাইরে—বাড়ির বাইরে। তাঁর অন্তিম আর্তনাদটুকুর সাক্ষী রইল বাইরের ঘন নীল আকাশ, সোনালি রোদ্দুর, আর ধূসর প্রান্তর।

হতভম্বের মতো কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। বারকয়েক আক্ষেপে মাথা নাড়ল। তারপর পা বাড়াল বসবার ঘরের দিকে।

তালাবন্ধ দরজায় পৌঁছে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে চলল অফিস-ঘরের দিকে।

সেখানে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত মহিলার শরীর হাতড়ে চাবিটা একসময় পেল সে। সুতরাং আবার উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

তালা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে সোফায় কিছুক্ষণ সে বসল। নতুন করে অনুভব করল ক্লান্তি। তাই গা এলিয়ে দিল সোফায়।

ঘুমে যখন তার চোখ দুটো বুজে এসেছে তখন বসবার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে তিনটের সঙ্কেত বাজল, ঢং—ঢং—ঢং...।

এবার আমরা সেই অনুপস্থিত, এ পর্যন্ত অপাংক্তেয়, মানুষটির প্রসঙ্গে আসব। বয়েস তার তেরো। ক্লাস এইটের মেধাবী ছাত্র। বাড়ির ছ'নম্বর বাসিন্দা। সুশান্ত মল্লিকের একমাত্র ছেলে সুকান্ত মল্লিক। রোজকার মতো স্কুলেই গিয়েছিল ও। ফিরছে এখন, পাঁচটার সময়। শীতের বেলা, তাই আঁধার নেমে এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে রোজকার মতো দুলকি চালে মেঠো পথ ধরে হেঁটে বাড়ির দিকে আসছে ও। ওই দেখুন, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপছে ছেলেটা, হ্যাঁ, রোজকার মতো। কিন্তু ও জানে না, 'রোজকার মতো' নয় এমন কিছু এখন ওদের বাড়িতে রয়েছে—।

সময়ের ঘড়িতে এখন পাঁচটা। স্কুলের ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে দশ-পনেরো মিনিটের পায়ে-হাঁটা পথ পেরিয়ে আসতে কিছুটা সময় লাগে বইকি!

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে পরপর দুবার অবাক হল সুকান্ত, এবং একবার আশ্বস্ত হল।

প্রথম অবাক: দোতলায় বাবার ঘরের আলো, যা রোজই জ্বলে, আজ জ্বলছে না।

দ্বিতীয় অবাক: বাড়ির সদর দরজা বন্ধ, অন্যদিন যা ভেজানো থাকে। এ ছাড়া দরজার মাথায় বসানো আলোটা আজ নেভানো রয়েছে—সুতরাং ব্যতিক্রম।

আশ্বস্ত হওয়ার কারণ, রোজকার মতো একতলায় অফিস-ঘরের আলো জ্বলছে।

কলিংবেলে আঙুলের চাপ দিল সুকান্ত। পরিচিত 'বাজার' এর কড়কড় শব্দ জোরালো ভাবেই ওর কানে এল। কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বেল বাজাল ও। কিন্তু কেউই কলিংবেলের ডাকে সাড়া দিল না।

ভয় পেল সুকান্ত। দু-হাতে পাগলের মতো পিটতে শুরু করল সদর দরজা। কিন্তু কোনও ফল হল না।

তখন ও চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করল, 'মা—মা—! দিদি—দিদি!'

উত্তর নেই। তা হলে কি বাড়িতে কেউ নেই? উঁহু, তা সম্ভব নয়। কারণ, সদর দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। সুতরাং দ্বিতীয় পথের সন্ধানে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চলল সুকান্ত। ফুলবাগানের নরম মাটিতে পা ফেলে একজায়গায় এসে থামল। কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখল বইয়ের ঝোলানো ব্যাগটা। তারপর বহুবছরের অভ্যাসে পাঁচিলের গায়ে পা দিয়ে বেয়ে উঠতে চেষ্টা করল। এই পাঁচিল

ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতরে আগেও অনেকবার ঢুকেছে ও। এখন এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ ওর কাছে খোলা নেই।

পাঁচিল ডিঙিয়ে একলাফে ভেতরের ছোট্ট উঠোনে পড়ল সুকান্ত। জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার। শুধু সামনে অফিস-ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে একটুকরো আলোর রেশ।

সেদিকে না গিয়ে প্রথমে সদর দরজার দিকে এগোল সুকান্ত। উদ্দেশ্য দরজার ছিটকিনি খোলা।

কিন্তু ওর এই ইচ্ছেয় বাদ সাধল অবিনাশের মৃতদেহ। অবিনাশের দেহের ওপরে হোঁচট খেয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে কিছু নজরে আসে না। তাই হাতড়ে-হাতড়ে দেওয়ালের গায়ে বসানো আলোর সুইচ টিপল ও।

আলো জ্বালতেই গোটা দৃশ্যের বীভৎসতা ওর মুখে-চোখে আছড়ে পড়ল। ঘাড় মুছড়ে পড়ে আছে অবিনাশ। কালচে রক্তের ছোপ ওর সর্বাঙ্গে, মেঝেতে, এমনকী সাদা দেওয়ালের গায়েও ছিটেফোঁটা নজরে পড়ছে।

অস্ফুট এক শব্দ করে ডুকরে কেঁদে উঠল সুকান্ত। ওর ছোট বুকটা নিঃশব্দে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ও হাঁটতে শুরু করল অফিস-ঘরের দিকে। ও যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু ভেতরের প্রচণ্ড আবেগে ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

অফিস-ঘরে পৌঁছে ভেজানো দরজায় হাতের চাপ দিল সুকান্ত। ধীরে-ধীরে খুলে গেল নরকের দরজা।

পরের পাঁচমিনিট ও পাথর হয়ে গেল। সেই অবস্থাতেই তাকিয়ে দেখল সবকিছু।

সে-দৃশ্যের অভিঘাত বুঝি বৃদ্ধ, যুবক, শিশু বিচার করে না। সুতরাং নির্বাক, স্তম্ভিত সুকান্ত টলোমলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

মাকে এবং দিদিকে ও পরনের শাড়ি দেখেই চিনতে পেরেছে চিনতে পেরেছে ফলকাটার বঁটিটাও। তবে অন্যমনস্ক থাকায় সিঁড়ির গোড়ায় রাখা চটিজোড়া ওর নজরে পড়ল না।

দোতলায় পৌঁছে শুধুমাত্র বসবার ঘরেই যে আলো জ্বলছে সেটা ওর চোখে পড়ল। এবং পুরোপুরি অবাক হয়ে ওঠার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল ডান প্রান্তে খাওয়ার ঘরের আলোটা।

সুকান্ত প্রথমে উঁকি মারল বসবার ঘরে। কেউ নেই।

চাপা স্বরে ডেকে উঠল, 'বাবা—বাবা!'

উত্তর নেই।

তখন স্কুলের জামা-জুতো পরেই ও এগিয়ে চলল খাওয়ার ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকেই দেখল, কালো পোশাক পরা একজন অপরিচিত লোক ওর দিকে পিছন ফিরে বসে কী যেন খাচ্ছে। ঘলার স্বর ভারিক্কি করে ও বলে উঠল, 'তুমি কে?'

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল লোকটা। বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ঠেলে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি এখানে কী করছ? আমার মাকে, দিদিকে, অবিনাশদাকে মারল কে? তুমি?'

অত্যন্ত সরল প্রশ্ন। এবং তার উত্তর ঠিক ততটাই জটিল ঠেকল লোকটার কাছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে হাসল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল ইস্পাতের ছুরিটা।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির নিয়ম অনুযায়ী এই মুহূর্তে সুকান্তর আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে ঠিক বিপরীতটাই ঘটল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বসবার ঘর লক্ষ্য করে তিরবেগে ছুটতে শুরু করল ও।

একলাথিতে চেয়ারটা মেঝেতে ছিটকে ফেলে লোকটা ওকে তাড়া করল। অনেকক্ষণ বাদে তার মুখে-চোখে জিঘাংসার পুরোনো রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

অন্ধকার বারান্দার দৈর্ঘ্য পেরিয়ে দড়াম করে বসবার ঘরের আধ-ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুকান্ত। চকিতে দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার ওপাশে লোকটার শরীর এসে আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। গোটা বাড়িটা যেন সন্ত্রস্তভাবে কেঁপে উঠল।

পরের কয়েকসেকেন্ডে সুকান্ত ওর ভাবনা-চিন্তার কাজ শেষ করল। ও জানে, এই নির্জন লোকালয়ে, এই শীতের সন্ধ্যায়, সাহায্য আশা করা উদ্ভট কল্পনা। সুতরাং ওর এখন দরকার একটা নিখুঁত লুকোনোর জায়গা, কারণ, দরজার ওপিঠে ক্ষুব্ধ চিতাবাঘের মতো প্রচণ্ড শক্তিতে দরজার ধাক্কা দিয়ে চলেছে লোকটা। কাঠের খিল কতক্ষণ এ-অত্যাচার সইতে পারবে কে জানে!

কী ভেবে বসবার ঘর ছেড়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকল সুকান্ত।

ঘর অন্ধকার।

কিন্তু বহুবছরের চেনা ম্যাপে অন্ধকার কোনও বাধা নয়। তা ছাড়া এখন আলো জ্বালারও সময় নেই। দরজা পেটানোর দুদ্দাড় শব্দ কামানের বিস্ফোরণের মতো কানে এসে ঠেকছে। সুতরাং তড়িৎগতিতে ডানদিকের দেওয়ালে গাঁথা তাকের কাছে গেল সুকান্ত। তাকে রাখা টর্চলাইটের ধাতব শরীর অন্ধকারেও ঝিলিক মারছিল। সেটা হাতে করে বসবার ঘরে ফিরে এল ও। রেফ্রিজারেটরের মাথায় কয়েকটা চুলের কাঁটা ছিল—এখানে মা-দিদি যে এগুলো রাখে তা ওর বহুদিনের জানা। সেখান থেকে একটা কাঁটা নিয়ে সুইচবোর্ডের প্লাগ পয়েন্টে কাঁটার দুটো মাথা গুঁজে দিল। তারপর প্লাগ পয়েন্টের সুইচ অন করে দিল।

একটা চাপা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে গোটা বাড়িটার সমস্ত আলো নিভে গেল। আর সুকান্তের হাতের টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ও জানে কীভাবে বাড়ির সমস্ত আলো ফিউজ করতে হয়। আগেও একদিন করেছিল।

এবার ও ঢুকল ভাঁড়ার ঘরে। আলমারির পাশে রাখা কাঠের মইটা বেয়ে ওপরে উঠল। কাঠের সিলিংয়ের চৌকো অংশটায় জোরে চাপ দিতেই ডালাটা ভেতরে ঢুকে গেল, আর ওপরের কুঠরি-ঘরে ঢুকে পড়ল সুকান্ত।

এই ছোট্ট কাঠের 'কার'-এ ওদের চাল-গম-সরষের বস্তা থাকে। থাকে মুড়ি-চিঁড়ের সঞ্চয়। সুতরাং ইঁদুর-আরশোলার উপদ্রবও আছে। জ্বলন্ত টর্চটাকে একপাশে নামিয়ে রেখে, ছোট্ট দু-হাতে মইটাকে টেনে ওপরে তুলতে লাগল ও—যাতে আর কেউ এই মই বেয়ে ওপরে উঠতে না-পারে।

অতিকষ্টে, একরাশ ধুলো মেখে, মিনিটপাঁচেক পর ও সফল হল। মইটা অদ্ভুতভাবে 'কিছুটা ভেতরে কিছুটা বাইরে' অবস্থায় আটকে রইল।

সুকান্তর সামনে-পিছনে ধুলোমাখা বস্তা আর থলে। টর্চের আলোয় চোখে পড়ছে হলুদ আর শুকনো লঙ্কার ঠোঙা। এবং ওর সাধের হামানদিস্তে। প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পুজোর সময় যে হামানদিস্তে দিয়ে ও কাচ গুঁড়ো করে সুতোয় মাঞ্জা দেয়।

নিজের শরীরটাকে যতটা সম্ভব ভেতরে ঢুকিয়ে ও চুপটি করে বসল। নিভিয়ে দিল টর্চের আলো।

চারিদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যেতেই দরজা ধাক্কার শব্দটা বিকটভাবে কানে এসে বাজল। সুকান্ত শুনল, প্রতিবাদে-প্রতিবাদে ক্লান্ত কাঠের খিলের ক্ষীণ মচমচ শব্দ। ও বুঝল, বসবার ঘরের দরজা ভাঙতে আর দেরি নেই। কিন্তু বাবা, পিসিমণি—ওরা কি এ-শব্দ শুনতে পাচ্ছে না? শুনতে যদি পেয়ে থাকে তা হলে ছুটে আসছে না কেন?...তা হলে কি ওদের অবস্থাও মা-দিদি-অবিনাশদার মতো?

হঠাৎ সুকান্তর মনে পড়ল, টর্চ আনতে শোওয়ার ঘরে ঢুকবার সময় একটা বিশ্রী আঁশটে সুর্গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মেরেছিল। ও ফিসফিস করে ডেকে উঠল, 'বাবা বাবা—'

এক সময়, এক চূড়ান্ত মুহূর্তে, ভেঙে পড়ল শেষ প্রতিরোধ বসবার ঘরের দরজা।

লাথি মেরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্লাটাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল সে।

সামনে অন্ধকার, পিছনেও অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠছে তার হাতের ইস্পাতের ছুরিটা। কালো অন্ধকারে তার কালো পোশাক মিশে গেছে।

প্রথম কয়েকসেকেন্ড সে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে চেষ্টা করল কোনও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। তারপর ধীরপায়ে এগোল শোওয়ায় ঘরের দিকে।

এখানেও যথারীতি অন্ধকার। নজর চলে না। সুতরাং পকেট হাতড়ে একটা সস্তার লাইটার বের করল সে। চাবি টিপতেই একটা নীলচে আলোর শিখা লাফিয়ে জ্বলে উঠল। ডানহাতে লাইটার উঁচিয়ে ধরল সে। ক্ষীণ আলোয় বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা মৃতদেহটা আবছাভাবে চোখে পড়ল। নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখল সে। না, কেউই সেখানে লুকিয়ে নেই। এবং তারপরই শুরু হল তার তন্নতন্ন অনুসন্ধান পর্ব।

শোওয়ার ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁজে দেখার পর সে ফিরে এল বসবার ঘরে। ইস্পাতের ছুরিটা পকেটে রেখে শোওয়ার ঘর এবং বসবার ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ করল। বসবার ঘর থেকে এক গাছা দড়ি বের করে শক্ত হাতে বাঁধল দরজার কড়া দুটো। পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল আবার। কী এক অজানা প্রতিজ্ঞায় তার চোয়াল আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। এবার ছুরিটা বের করে বাঁহাতে উঁচিয়ে ধরল সে।

শোওয়ার ঘর শেষ করে এবার বসবার ঘরের পালা।

প্রথমে সোফাসেটগুলোকে টেনে এনে ভাঙা দরজার মুখে স্তূপাকারে রাখল সে। উদ্দেশ্য জলের মতোই সরল যাতে কেউ আচমকা দরজা ডিঙিয়ে পালাতে না পারে।

বসবার ঘরে আতিপাতি করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে নিশ্চিত হল, বাচ্চাটা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে।

বুকভরা ভারী শ্বাস নিয়ে জ্বলন্ত লাইটার হাতে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল সে। ডানদিকে-বাঁদিকে তাকাল। তাকাতেই ওই ছোট ঘরটায় যে-বিশাল পরিবর্তনটা তার নজরে পড়ল

তা হল সবুজ কাঠের মইটা। ওটার ওপরের দিকটা ঢুকে গেছে কুঠরি-ঘরের ভেতরে। আর বাকি অংশটা বেরিয়ে আছে বাইরে। নির্ঘাত কুঠরি-ঘরে ঢুকেছে ছেলেটা। ছুরি উঁচিয়ে ওপরে তাকাতেই একইসঙ্গে মইয়ের শেষটুকু আর বাচ্চাটার জ্বলন্ত চোখে তার চোখ পড়ল। একমুহূর্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির হয়ে রইল। তারপর...।

সুকান্ত চারপাশের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে রেখেছিল। শুধুমাত্র শব্দ শুনেই পাশের ঘরের কার্যকলাপের হদিশ পাচ্ছিল ও। অবশেষে, যখন লাইটারের আলোটা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় এসে থামল, তখন ও ভয় পেল। শরীরটাকে আরও গুটিয়ে নিল ভেতরে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর কৌতূহলে নীচের দিকে একবার উঁকি মারল সুকান্ত। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই কালো জামা পরা লোকটার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ত্রাসে পিছিয়ে আসার আগেই ও শুনতে পেল এক অদ্ভুত জান্তব চিৎকার। সে চিৎকারে ফেটে পড়ছে জয়ের উল্লাস। পরমুহূর্তেই নীচের কালো চেহারাটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল। ইস্পাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল সুকান্তর চোখের সামনে। ঝটিতি মুখ সরিয়ে নিল ও। লোকটার ছুরির ফলা হাওয়ায় শিস কেটে ফিরে গেল নীচে।

এবার অবাক হয়ে সুকান্ত লক্ষ করল, লোকটা ছুরিটার গায়ে চাপ দিয়ে ভাঁজ করে ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে। তারপর আংশিক বেরিয়ে থাকা মইটা লক্ষ্য করে আচমকা লাফ দিল সে। ভয়ে চমকে পেছোতে যেতেই হামানদিস্তের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুকান্ত। অন্ধকারে অনুভব করল জিভের ডগায় নোনতা স্বাদ। একটা ঘরঘড় শব্দ করে ওর গায়ে গা ঘেষে কাঠের মইটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই শব্দে সুকান্তর সংঘর্ষের শব্দটা চাপা পড়ে গেল।

একমিনিট...দু-মিনিট...।

সুকান্ত বুঝল, দেওয়ালের গায়ে মই লাগিয়ে, নিজেকে তৈরি করে, ওপরে উঠতে শুরু করেছে লোকটা। একটু করেই চৌকো কাঠের ফোকরে ভেতরে জেগে উঠল কালো মাথাটা। জ্বলজ্বলে চোখজোড়া নিঃশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লোকটা তার জ্বলন্ত লাইটার-ধরা হাতটা তুলে ধরতে গেল। আর সেইমুহূর্তেই এক অমানুষিক শক্তি সুকান্তর শরীরে ভর করল। হামানদিস্তের মোটা লোহার রডটা নিয়ে দু-হাতে সর্বশক্তি দিয়ে ও লোকটার মাথায় আঘাত করল। একবার, দুবার...।

ধীরে-ধীরে মইয়ের গা থেকে ঢলে পড়তে লাগল লোকটা। মইটা কাত হয়ে গিয়ে ঠেকল দেওয়ালের কোণে, আর শানবাঁধানো মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল লোকটার শরীর। জ্বলন্ত লাইটারটা নিভে গিয়ে কোথায় যেন ঠিকরে পড়ল।

কুঠরি-ঘরের ফোকর দিয়ে টর্চের আলোয় সুকান্ত দেখল, ঠিক নীচেই শ্লথ ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে লোকটা।

টর্চটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় পাশে নামিয়ে রেখে দু-হাতে গোটা হামানদিস্তেটা তুলে ধরল ও। তারপর, গুলি খেলার সময় যেরকম 'নাক্কু' করে, সেরকম ভঙ্গিতে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল হামানদিস্তেটা।

লোকটার মাথার সঙ্গে পাঁচ কেজি ওজনের লোহার সংঘর্ষের শব্দটা তেমন জোরদার হল না। 'ফট' করে একটা শব্দ হল শুধু।

জ্বলন্ত টর্চটা হাতে নিয়ে একটা পা আলমারির গায়ে দিয়ে, অন্য পা-টা হেলে যাওয়া মইটার গায়ে রেখে অতিকষ্টে মেঝেতে নেমে এল সুকান্ত। টর্চের আলোয় দেখল, লোকটার কালো পোশাকের সঙ্গে রক্তাক্ত মুখটা নিতান্তই বেমানান লাগছে। হামানদিস্তের দুটো অংশ দু-পাশে পড়ে রয়েছে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সুকান্ত লোকটার শরীর ডিঙিয়ে হামানদিস্তের রডটা তুলে নিল। তারপর কী ভেবে নিভিয়ে দিল টর্চটা। এবং লোকটার মাথা আন্দাজ করে রড দিয়ে পাগলের মতো আঘাত করে চলল—একবার, দুবার...।

জ্ঞানশূন্য মিনিটপাঁচেকের পর থামল সুকান্ত। রডটা নামিয়ে রেখে টর্চটা জ্বালাল। তারপর জ্বলন্ত টর্চটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে দু-হাতে চেপে ধরল লোকটার পা দুটো। অনেক কসরৎ করে পা দুটোকে টেনে নিয়ে এল ভাঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে। এবার শরীরের সমস্ত ক্ষমতা একজোট করে লোকটাকে টেনে নিয়ে এল বসবার ঘরে। সেখানে তাকে শুইয়ে রেখে ও ভাঁড়ার ঘরে আবার ঢুকল। পড়ে থাকা টর্চের আলোয় দেখতে পেল লাইটারটা। লাইটার ও টর্চটা তুলে নিয়ে ফিরে এল বসবার ঘরে। লাইটারটা পকেটে রেখে শোওয়ার ঘরের দরজায় বাঁধা রেশমি দড়িটা খুলতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিরাশ হয়ে ও লোকটার শুয়ে থাকা শরীরের পকেট হাতড়ে ছুরিটা বের করল। চাবি টিপতেই ফলাটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এরপর শোওয়ার ঘরের দরজা খোলা কয়েকসেকেন্ডের কাজ। সুতরাং...।

বাবার শরীর এবং মাথাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করেও বিচলিত হল না সুকান্ত। কারণ, ইতিমধ্যেই ও সবরকম ভাব এবং আবেগ নিঃশেষে খরচ করে বসে আছে। শুধু শ্লথ পায়ে ও ফিরে এল বসবার ঘরে। আধঘণ্টার চেষ্টায় অনেক শব্দ করে ও সরিয়ে ফেলল সোফাসেটগুলো। তারপর ভাঙা দরজা পেরিয়ে টর্চ জ্বেলে রওনা হল তিনতলার দিকে। এখন ও খুঁজতে চলেছে পিসিকে।

তিনতলা, দোতলা, একতলায় খোঁজ করেও পিসিকে পেল না ও। তাই ফিরে এল বসবার ঘরে। কালো-পোশাকি লোকটার গায়ে টর্চের আলো ফেলে কী চিন্তা করল। তারপর ফিরে চলল খাওয়ার ঘরে দিকে।

বারান্দার বাঁ-কোণে খাওয়ার ঘরের দরজার ঠিক মুখেই থাকে কেরোসিন তেলের টিনটা। সেটাকে একহাতে নিয়ে অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে বসবার ঘরে ফিরে এল ও। টর্চটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় একটা সোফার ওপরে রেখে কেরোসিন তেলের টিনটা লোকটার গায়ে উপুড় করে দিল।

একটু পরে খালি টিনটা একপাশে ছুড়ে ফেলল। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালল। আগুন ধরিয়ে দিল কালো পোশাকে। তারপর লাইটার ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল বসবার ঘর থেকে। আগুনের শিখা তখন লোকটার শরীরকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে।

অন্ধকারেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সুকান্ত।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে অন্ধকার অফিস-ঘরের সামনে একমুহূর্ত দাঁড়াল ও। তারপর এগিয়ে চলল সদর দরজার দিকে। অন্ধকার থাকলেও এবারে অবিনাশের মৃতদেহে হোঁচট খেল না ও। পা যথাসম্ভব উঁচু করে দরজার ছিটকিনিটা খুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর মেঠো পথ ধরে দিগভ্রান্তের মতো হাঁটতে শুরু করল।

আসুন, এদিকেই নরকের দরজা

এবার এদিকে আসুন...দেখবেন, মাথার দিকে খেয়াল রাখবেন, নইলে ঝুলে থাকা পাথরে যে-কোনও সময় চোট পাবেন। বুঝতেই তো পারছেন, ১৭০০ সালের দুর্গ এর চেয়ে আর কত ভদ্র হবে! সিঁড়ির ধাপগুলো নড়বড়ে হলেও তেমন ভয় নেই, কাঠগুলো দিব্যি মজবুত আছে। আমার আটবছরের চাকরিতে এ-সিঁড়ি ভেঙে কেউ কখনও পড়ে যায়নি। আসুন—ধীরে-ধীরে নেমে আসুন আপনারা। হ্যাঁ, এই যে—এটাই শেষ কুয়ো, যেখানে বিশ্বাসঘাতিনী নাফিসা বেগমকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন বাহাদুর শাহ। না, না, পুরো ইতিহাস আমি কী করে জানব? সবই আমাদের শোনা কথা। লোকমুখে যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। আর, এই যে বিশাল পাথরে বাঁধানো উঠোনটা দেখছেন, এখানেই বিকেলে বেড়াতেন বেগমরা। যাতে বাইরের কেউ তাদের দেখতে না-পায়, সেইজন্যে চারধারে রয়েছে পনেরো ফুট উঁচু পাথরের পাঁচিল। কী বলছেন, হারেম? উঁহু, এটাকে আপনারা দুর্গও বলতে পারেন, আবার ফষ্টিনষ্টির কারখানাও বলতে পারেন। ব্যস, এ-ই সব—আর দেখানোর কিছু নেই। কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে বলুন। নেই? তা হলে আপনারা এবার আস্তে-আস্তে ফিরে যান। যান, যান, কোনও ভয় নেই; যে-পথ দিয়ে এসেছেন, সেই পথ ধরেই ফিরে যান। এটা তো আর নবাব-বাদশাদের 'ভুলভুলাইয়া' নয়, বেরোতে কোনও অসুবিধেই হবে না—।

এ কী, স্যার, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে? কী বলছেন, আমি সবকিছু আপনাদের দেখাইনি? তাই কি কখনও হয়? এই দেখানোটাই যে আমার চাকরি! আপনারা যদি স্যাটিসফাইড না হন, তা হলে কালই মিস্টার সেনগুপ্ত আমার চাকরি খেয়ে নেবেন। এ-দুর্গের দেখাশোনার ভার ওঁর ওপরেই আছে কিনা। কুয়ো? কুয়োটা তো আপনারা দেখলেন, ওই তো! কী বলছেন? ওটা নয়? অন্য আর-একটা কুয়ো? যেখানে—যেখানে তিতু সরকার, মানে তিতির সরকার নামে কচি মেয়েটা আত্মহত্যা করেছিল?

শ-শ-শ-শ! আস্তে, স্যার, আস্তে বলুন! দেখছেন তো, এখনও জনাকয়েক ট্যুরিস্ট ওপাশটায় ঘোরাফেরা করছে। তা ছাড়া, মিস্টার সেনগুপ্ত যদি একবার এসব কথা শুনতে পান, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। তিনি চান না, দশবছর আগেকার ওই ঘটনা নিয়ে কেউ আর কোনওরকম ঘাঁটাঘাঁটি করুক।

হ্যাঁ, কুয়োটা আমি চিনি। কিন্তু ওই যে বললাম, মিস্টার সেনগুপ্তের বারণ আছে। না, স্যার, তা আমি পারি না। তা হলে আমার চাকরিটাই চলে যাবে।...আচ্ছা, আপনি যখন এত করে বলছেন—তা ছাড়া আপনার কাছ থেকে বকশিশ নেওয়ার পর তো আর আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি না! কুয়োটা আপনি সত্যিই দেখতে চান? কিন্তু হঠাৎ এ-কুয়ো দেখার সাধ হল কেন বলুন তো? ও, মেয়েটা মারা যাওয়ার পর যে-সব রিপোর্টার

এসেছিল, আপনি তাদের মধ্যে ছিলেন? তাই বলুন! কী যেন নাম বললেন মেয়েটার, তিতির সরকার?

না, তখন এ-চাকরি আমি করতাম না। কিন্তু আর-সবাইয়ের মতো খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। তা হলে স্যার আপনি একমিনিট অপেক্ষা করুন, আমি অন্য ট্যুরিস্টদের বেরোনোর রাস্তাটা দেখিয়ে দিই। তা ছাড়া পাঁচটা প্রায় বাজে, বন্ধ করার সময়ও হয়ে গেছে...।

নিন, এবার বলুন—এখন আর কোনও ভয় নেই। ওঃ, সারাটা দিন যা ধকল গেছে! শেষ দলটাকে বের করে দিয়ে এবার নিশ্চিন্তি! না, আর কেউ এখানে আসবে না। বাইরের জং ধরা ভারি দরজাটায় আমি খিল এঁটে দিয়ে এসেছি। না, না, বাইরের কোনও শব্দই এখানে শোনা যায় না, আর সেইজন্যেই আমাদের কথাও বাইরের কোনও প্রাণীর কানে যাবে না—অবশ্য নিশাচর প্যাঁচাদের কথা আলাদা। এই অন্ধকার ঠাসা দুর্গেই ওদের রাজত্ব। তা ছাড়া সন্ধেও তো হয়ে এল।

আপনি ওই কুয়োটা তা হলে দেখতে চান? যেখানে তিতির সরকার নামে মেয়েটা ডুবে মারা গিয়েছিল? কিন্তু কাজটা করা আমার ঠিক হচ্ছে না। মিস্টার সেনগুপ্ত যদি একবার জানতে পারেন, তা হলে ভীষণ রেগে যাবেন। না, আপনি ঠিকই বলেছেন, তাঁকে জানানোরই—বা দরকার কী? হাঃ-হাঃ-হাঃ...।

আসুন, স্যার, এদিক দিয়ে আসুন। এই বড় হলঘরটা পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। আমাকে আপনার পেছন-পেছন আসতে বলছেন? আমার কিন্তু অবাক লাগছে, না বলতেই ঠিক রাস্তাটা আপনি চিনলেন কী করে! দেখবেন, সাবধান, এখানকার পাথুরে মেঝেটা ভীষণ এবড়োখেবড়ো।

দশবছর আগেকার ওই ইতিহাস নিয়ে কেউ আবার নতুন করে চর্চা করুক, সেটা মিস্টার সেনগুপ্ত পছন্দ করেন না। কেন জানেন? কারণ, ওই ঘটনা ওঁর মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। মিস্টার সেনগুপ্তকেই গ্রামের লোকেরা তিতির সরকারের লাভার বলে সন্দেহ করেছিল। ওই লাভারই মেয়েটাকে ধীরে-ধীরে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে। সন্দেহ করার কারণও অবশ্য ছিল। মানে মেয়েটা ছিল মিস্টার সেনগুপ্তের কারখানার ফোরম্যানের বউ। ওরা ওঁর বাড়ির কাছাকাছিই থাকত। ফলে সরকারদের সঙ্গে ওঁর বেশ মেলামেশা ছিল। আর চুপিচুপি বলি স্যার, তিতির সরকারকেও সেনগুপ্তসাহেবের মনে ধরেছিল। বলতে গেলে তিনি ওদের পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে মেয়েটা ওভাবে মারা যাওয়ার পর ওঁকেই যে লোকে সন্দেহ করবে এ আর বেশি কথা কী! উনি যদি একবার জানতে পারতেন কারা ওঁর নামে এইসব বাজে কথা রটাচ্ছে, তা হলে আর দেখতে হত না—তাদের কোর্ট পর্যন্ত দৌড় করিয়ে ছাড়তেন। একবছর ধরে তো ওঁর সংসারে অশান্তি লেগে ছিল। বউয়ের সঙ্গে দিনরাত উনি ঝগড়া করে গেছেন। বারবার বলেছেন, ওঁর কোনও দোষ নেই। আমরা ভেবেছিলাম, মিসেস বোধহয় ওঁকে ছেড়েই চলে যাবেন...যাক সে-কথা, এখন ওঁরা বেশ সুখে আছেন, তা ছাড়া দশবছর সময়টাও তো নেহাত কম নয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখন যদি আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি নিয়ে জিভ চালাচালি হয়, তা হলে আমার অবস্থাটা কী হবে! না স্যার, আপনার কথা আমি বলছি না, আপনি সেরকম লোকই নন। তাই যদি ভাবতাম, তা হলে আপনাকে এত সব কথা বলতামও না, আর ওই কুয়োটা দেখাতাম না।

লোকে বলে, মেয়েটা নাকি আশ্চর্যরকম সুন্দরী ছিল। বয়েসও ছিল খুব কম—মাত্র একুশ। গায়ের রং ছিল যেন দুধে-আলতা। লোকে বলে, খবরের কাগজে মেয়েটার যে-

ছবি ছাপা হয়েছিল, তার চেয়ে অন্তত একশো গুণ সুন্দরী ছিল ও। চোখ ছিল কালো হিরের মতো উজ্জ্বল, চকচকে। কী বলছেন, কালো নয়? একটু কটা চোখে? কী জানি, হবে হয়তো। কারণ সবই আমার শোনা কথা, আর আপনি নিজে তো রিপোর্টার হিসেবে স্পটে হাজির ছিলেন। দেখবেন, সিঁড়ির শেষ ধাপটা খেয়াল রাখবেন—ওটা খানিকটা ভাঙা আছে। কিন্তু...কটা চোখ বলছেন? না, স্যার, এ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। শুধু ভাবছি আপনার কী স্মৃতিশক্তি!

যাকগে, মোটের ওপর মেয়েটা ছিল অল্পবয়েসি, অসম্ভবরকম সুন্দরী, নিষ্পাপ, আর কিছুটা সরল প্রকৃতির—সাধারণত গ্রামের মেয়েরা যা হয়ে থাকে। ওর বাবা মিস্টার সেনগুপ্তের বাগানেই মালির কাজ করত। আপনি হয়তো ওকে কখনও দেখেননি। না, না, খবরের কাগজওলাদের দেওয়ার মতো নতুন কোনও খবর ওর কাছে ছিল না। তবে লোকটা ভীষণ ধাক্কা খেয়েছিল। তারপরই তো ওর স্ট্রোক মতন হল। তখন মিস্টার সেনগুপ্ত ওকে টাকাকড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা চাকরিতে লাগিয়ে দেন। তারপর... দেখবেন, চৌকাঠে হোঁচট খাবেন না যেন। এইখান থেকেই শুরু হল অন্দরমহল। একটু দাঁড়ান, হ্যারিকেনটা জ্বেলে নিই। মাঝে-মাঝে সন্ধের পর আমি এদিকটায় আসি, তাই একটা হ্যারিকেন সবসময়েই এই দরজার পাশটায় রাখা থাকে। কী বললেন? কেন আসি? হুঁঃ—সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন! কেমন যেন নেশার মতো হয়ে গেছে।...দেশলাই আছে আপনার কাছে? আমারটা দেখছি একেবারে খালি! হ্যাঁ, এই—ই—ব্যস! নিন, এবার চলুন—।

আরে, ভয় পেলেন নাকি? হ্যাঁ, তা ভয় পাওয়ারই কথা। যেভাবে মূর্তিটা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে একেবারে জীবন্ত বলে মনে হয়। বর্শার ফলাটা দেখেছেন? একটু বাঁকানো। কেমন যেন অদ্ভুতরকমের, তাই না? কেন বানানো হয়েছিল মূর্তিটা? কী করে জানব বলুন! সবই রাজা-বাদশাদের খেয়াল। তবে মনে হয়, অন্দরমহলের যাদের ঢোকার হুকুম নেই, তাদের সাবধান করে দেওয়ার জন্যেই এটাকে তৈরি করা হয়েছিল। তা যে জন্যেই তৈরি হয়ে থাকুক, বাচ্চারা কিন্তু এটা দেখে ভীষণ মজা পায়। সত্যি কথা বলতে কী, যখন সব ট্যুরিস্টদের ফোর্ট দেখানো শেষ করে আমি সন্ধের পর জায়গাটা টহল দিতে বেরোই, তখন এই বাঁকানো ফলার বর্শাটা আমার সঙ্গে নিই। ওটাকে আমার কেমন বন্ধু বলে ভাবতে ভালো লাগে। এক হাতে হ্যারিকেন, এক হাতে বর্শা নিয়ে যখন মহল থেকে মহলে ঘুরে বেড়াই, তখন আমার নিজেকেই ১৭০০ সালের প্রেত বলে মনে হয়। অন্ধকারে এই জায়গাটা যেন ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, স্যার, তা হলে বর্শাটা আমি সঙ্গে নিচ্ছি। দেখেছেন তো, এতদিনের জিনিস হলেও এখনও কেমন ঝকঝক করছে! আসলে আমিই এটাকে শান দিয়ে পালিশ করে নতুনের মতো করে রেখেছি—এইজন্যেই মূর্তিটার টান বাচ্চাদের কাছে অনেক বেড়ে গেছে।

...হ্যাঁ, এটাই সেই অভিশপ্ত কুয়ো। সেই ঘটনার পরই এই লোহার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে করছে? কী বলছেন, আমার আপত্তি না থাকলে? না, না, আমার আবার আপত্তি কীসের! দেখানোটাই যে আমার কাজ। ওই তো, ঢাকনার মধ্যিখানে যে-আংটাটা লাগানো রয়েছে, এই বর্শার হাতলটা ওর ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিলে ঢাকনাটা সহজেই খুলে যাবে। তা ছাড়া এটা খোলা আমার অভ্যেস আছে...এই নিন, এবার দেখুন...।

দেখছেন, কুয়োর ভেতরের গা বেয়ে জং ধরা লোহার সিঁড়ি কেমন খাড়া নেমে গেছে? আগেকার দিনে এইরকম সিঁড়ি খুব ব্যবহার করা হত।...এই সিঁড়ি বেয়েই তো ভেতরে

নেমে গিয়েছিল তিতিরের স্বামী। তুলে এনেছিল কচি বউয়ের ডেডবডি। ভাবা যায় না, তাই না? কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরেছিল, ওর জন্যেই ওর বউ সুইসাইড করেছে। সেইজন্যেই হয়তো ওইরকম সাহসের কাজ করতে পেরেছিল।

তিতিরের স্বামীর খবর জিগ্যেস করছেন? কেন, শোনেননি আপনি? ওই ঘটনার পর সে পাগল হয়ে যায়। তখন তাকে পাঠানো হয় পাগলা-গারদে। এখনও সে সেইখানেই খাঁচায় বসে আছে।

যদ্দুর আমি শুনেছি, মেয়েটা অনেকদিন ধরেই স্বামীর আড়ালে ওইসব লটরপটর চালিয়ে যাচ্ছিল—বুঝতেই তো পারছেন...। তারপর একদিন যখন মেয়েটা বুঝল, ওর পেটে বাচ্চা এসেছে, তখন ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এত খোলামেলা ভালোবাসার জন্যে নিজেকেই শাপশাপান্ত করতে লাগল। তখন একদিন ও গেল ওর ভালোবাসার লোকের কাছে; জানতে চাইল, এখন ও কী করবে—।'

এবং লোকটা ওকে বোকার মতো কথা বলতে বারণ করল। বলল, এর মধ্যে করাকরির কী আছে? ওর তো জলজ্যান্ত স্বামীদেবতা রয়েছে একটা; তা হলে আবার ভয় কীসের! শুধু ওকে যা করতে হবে, তা হল মুখে কুলুপ এঁটে চুপচাপ বসে থাকা। ব্যস!

কিন্তু সে বুঝল, তার প্রস্তাবটা তিতিরের পছন্দ হয়নি। নিজের স্বামীকে ঠকিয়ে বাচ্চার দায় তার ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না। তিতির চেয়েছিল, সেই বিপদের সময় সে এসে ওর পাশে দাঁড়াক; চেয়েছিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে; চেয়েছিল, নিজের স্বামীকে আবার আগের মতো ফিরে পেতে। কারণ, আমার মনে হয়, মেয়েটা ওর স্বামীকে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত; শুধু ওই লোকটার চটকের কাছে ওর ভালো-মন্দ জ্ঞান কদিনের জন্যে গুলিয়ে গিয়েছিল...।

যাকগে, সে-কথা থাক, আসল কথায় ফিরে আসি। তারপর সেই লাভার ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। বলল, কিছুদিন তাকে ভাবার সময় দেওয়া হোক। তারপর তারা এ নিয়ে আবার আলোচনা করবে; দেখবে, কী করা যায়। এবং পরদিন তিতিরকে রেখে সে গ্রাম ছেড়ে সটকে পড়ল—জানি না কোথায়।

না, স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি তো তখন এখানে ছিলাম না, তাই সব কিছু ঠিক-ঠিক জানাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু কল্পনার রং মিশিয়ে গল্পটা আপনাকে বলছিলাম। হয়তো আসলে ঘটনাটাই ছিল অন্যরকম। না, আপনার কথামতন, মিস্টার সেনগুপ্তই যদি সেই লোক হন, তা হলে তিনি পালাননি—গ্রামেই ছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যথারীতি জঘন্য কাদা ছোড়াছুড়িও হয়েছিল। কিন্তু এখন শুধু আমি নয়, গ্রামের আরও অনেক লোকের ধারণা, মিস্টার সেনগুপ্ত হয়তো সত্যিই নির্দোষ ছিলেন।

যাই হোক, মেয়েটা ওর স্বামীর কাছে গিয়ে সরাসরি সব ঘটনা খুলে বলল—শুধু তার নামটুকু ছাড়া—সে-নাম ও কাউকেই বলেনি। সব শুনে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তা হওয়ারই কথা; কারণ, লোকে বলে, সে নাকি বউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করত, ভীষণ ভালোবাসত ওকে। শুনেছি, তিতিরকে ওই ঘটনার জন্যে সে কোনওরকম বকাঝকা করেনি। শুধু শান্ত নির্বাকভাবে মেয়েটার অবাক চোখের সামনে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। এবং যখন জলভরা চোখ নিয়ে মেয়েটা তাকে অনুসরণ করল, পা জড়িয়ে ধরল, তখন সে আর সইতে পারেনি—ঘুরে দাঁড়িয়ে এক চড় মেরেছিল বউয়ের গালে। নিজের কষ্ট-পাওয়া মনের অবস্থাটা সে আর চাপতে পারেনি। বলেছিল, শেষ পর্যন্ত এই আমার পাওনা ছিল?

হ্যাঁ, স্যার, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। আমি একটু সিনেমা-টিনেমা দেখতে ভালোবাসি। নইলে বানিয়ে-বানিয়ে ছবির মতো সব বলছি কী করে! আপনি তো জানেন, গাইডদের একটু-আধটু গল্প বানানোর ক্ষমতা না-থাকলে চলে না। তা ছাড়া, আপনি যদি আমার মতো দিনের-পর-দিন, একা, এই নির্জন নিঝঝুম দুর্গে ঘুরে বেড়াতেন, তা হলে আপনিও সমস্ত কিছু ছবির মতো দেখতে পেতেন। জানেন, মাঝে-মাঝে রাতের দিকে আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাই! হয়তো আমার মনের ভুল। আর কিছু না হোক, বয়েস তো হয়েছে।

জানেন, আমার মনে হয়, এটুকুও সেই অবুঝ মেয়েটার বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে, কত দুঃখে, কত হতাশায়, ওর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলেছে। ও ভাবল, এই বোধহয় ওদের সম্পর্কের শেষ। আর সে যদি ওকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে জীবনে আর রইল কী! তাই তিতির পারল না অপেক্ষা করতে, পারল না সে আঘাত সইতে, পারল না আশায় বুক বাঁধতে। ও দিশেহারা হয়ে ছুটে এল এই পোড়ো দুর্গে...বুক-ভরা কান্না নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুয়োর ভেতরে।

তারপর মাত্র পাঁচমিনিট—তার বেশি নয়। সে ফিরে এল ছুটতে-ছুটতে। পাগলের মতো ডাকতে লাগল বউয়ের নাম ধরে—কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। যখন সে ওকে কুয়োর ভেতর থেকে তুলে আনল, তখন ও মারা গেছে। ওর একরাশ কালো চুল ভিজে লেপটে রয়েছে মুখের ওপর, সুন্দর উজ্জ্বল কটা চোখজোড়ায় জমে রয়েছে কাদা। তিতিরের বডিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওর স্বামী কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

...ঠিক এইখানটায়, সেখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তারপর থেকেই এই ভারী লোহার ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া হল কুয়োর মুখে। যাতে সহজে কেউ এটাকে খুলতে না-পারে—শুধু আমি ছাড়া।

কেউ জানে না, এ-কুয়ো কত গভীর। দাঁড়ান, আলোটা আর-একটু তুলে ধরি। নিন, এবার ভালো করে দেখুন। সহ্যের শেষ সীমায় না-পৌঁছলে কোনও মেয়ে কখনও এভাবে প্রাণ দিতে পারে? আপনিই বলুন?

(তিতু—আমার তিতু, সোনামণি, তুই কোথায়?)

না, স্যার, আমি তো কিছু বলিনি। বরং আমার মনে হল, আপনি বোধহয় কিছু বলতে চাইছেন। দাঁড়ান, একমিনিট...।

কী করছি জিগ্যেস করছেন? চাবিটা ঘুরিয়ে দেখছি, তালাটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না। এখন তো সব মহলের দরজাতেই চাবি লাগাতে হবে, তাই একবার দেখে নিলাম, যাতে পরে ভুল না-হয়। জানেনই তো, মিস্টার সেনগুপ্ত এই ঘরটা সবসময় বন্ধ করে রাখারই পক্ষপাতী। গত তিনবছরে এ-ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ কখনও আসেনি—অন্তত আজ রাতের আগে। আর আমার মনে হয়, আগামী তিনবছরেও এ-ঘরে কেউ আসবে না; আর যদিও-বা আসে, কুয়োর ঢাকনাটা নিশ্চয়ই কেউ খুলে দেখবে না, কী বলেন? এই সমস্ত মহলের দেখাশোনা আমি নিজেই করি। এ ছাড়া সবকিছু ঝকঝকে তকতকে রাখতে আমি ভীষণ ভালোবাসি—দেখুন না, এই বর্শাটাই দেখুন! কেমন নতুনের মতো ঝকঝক করছে! ফলাটা দেখেছেন, কীরকম ধারালো!

ওঃ, কিছু মনে করবেন না, স্যার, আপনার লাগল নাকি?

পাগল বলছেন, স্যার? না, স্যার, আমি পাগল নই। পাগল তো ছিল তিতিরের স্বামী, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? সে তো এখন বন্দি রয়েছে পাগলা-গারদে। আমার শুধু

সামান্য স্ট্রোকমতন হয়েছিল—তাও বছরদশেক আগে। তাতে আমার শরীরের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। মিস্টার সেনগুপ্ত কিছু টাকা দিয়ে আমাকে হালকা কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও আমার গায়ের জোর দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সেইজন্যেই বলছি, আমি হলে এই মুহূর্তে এই বর্শাকে ঠেকানোর কথা চিন্তাও করতাম না, স্যার। তাতে আপনার ভালোর চেয়ে খারাপই হবে।

জানেন স্যার, বেশি জানাটাই অনেক সময় মানুষের বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তিতু সরকার, তাই না? ওই নামটাই তো প্রথমে বলেছেন আপনি? কিন্তু, স্যার, আপনি কি জানেন, মেয়েটার নাম ছিল সুবর্ণা সরকার। ওই নামটাই ছাপা হয়েছিল সব খবরের কাগজে। তিতির ছিল ওর ডাক নাম। তবে চেনাশোনা লোক আর রিলেটিভরা ওকে তিতির নামেই ডাকত। আর আমার কাছে, হয়তো ওর স্বামীর কাছে, হয়তো আরও একজনের কাছে ওর আদরের নাম ছিল তিতু। আর তা ছাড়া, আপনি কী করে জানলেন যে, ওর চোখ ছিল একটু কটা—কালো নয়? রিপোর্টাররা যখন এখানে আসে, তখন ওর চোখজোড়া বোঝাই ছিল। কিন্তু ওর সেই ভালোবাসার লোক জানত।

হ্যাঁ, স্যার, এখন আমি আপনাকে বেশ চিনতে পারছি। সেই সময় আপনি মিস্টার সেনগুপ্তের কাছে প্রায়ই আসতেন— দরকার ছাড়াও আসতেন। হয়তো তিতুর জন্যেই আসতেন। তিতিরের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া বাকি আছে। ওর স্বামী এখানে থাকলে ভালোই হত—তা হলে আসরটা বেশ জমত, হয়তো বেচারার পাগলামো কিছুটা সারত। যাক, সে যখন নেই, তখন মিছিমিছি তার কথা ভেবে লাভ কী! আসুন, এবার কাজের কথায় আসা যাক...।

ভাবতে অবাক লাগে, তাই না? ভালোভাবে চিন্তা করতে গেলে একে নিয়তির খেলা অথবা ঈশ্বরের লীলা ছাড়া আর কী-ই-বা বলবেন? কে জানত, আপনি এইভাবে, একা পায়ে হেঁটে এখানে আসবেন! এবং এই বর্শা আর চাবিটা আমি বাজি রাখতে পারি যে,—এ দুটো জিনিস আমার কাছে যে কত দামি, তা কি এখনও আপনাকে খুলে বলতে হবে, স্যার?—আপনি কোথায় যাচ্ছেন সে-কথা কাকপক্ষীকেও বলে আসেননি। অথচ এ-জায়গা ছেড়ে চলে যেতেও আপনি পারেননি। হয়তো তিতু আপনাকে দিনের-পর-দিন নিশির ডাকের মতো টেনেছে। আর আমার মনে হয়, আপনি বা আমি কেউই কোনওদিন বুঝতে পারব না, এখানে আসার পেছনে আপনার আসল কারণটা কী।

আপনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, তিতুর বুড়ো বাপ আজ আটটা বছর ধরে শুধু আপনারই অপেক্ষা করেছে? সুতরাং, আমার বিশ্বাস, আমার ইচ্ছেই আজ আপনাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই নরকের দরজায়...।

উঁহু, আমি হলে কিন্তু এরকম করে মোটেই চিৎকার করতাম না, স্যার। তাতে শুধু-শুধু আপনার শরীরেরই ক্ষতি হবে। কারণ জানেনই তো, এখানে আপনার চিৎকার শোনার লোক এক আমি ছাড়া আর কেউই নেই। আর আগেই তো আপনাকে বলেছি, এখানকার দেওয়ালগুলো ভীষণ মোটা। বিশ্বাস করুন, সত্যিকারের পাথরের তৈরি—একটুও বাড়িয়ে বলছি না...।

ক্রাইম ডট কম

নভেলেট

অনিন্দ্যসুন্দরের অপমৃত্যু

'মৃত্যুর সময়ে বয়স কত হয়েছিল? বাহান্ন—তাই তো?' দেবদূত সূর্যকান্ত প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ—বাহান্ন'। শ্রান্ত স্বরে জবাব দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী। তাঁর মনে হল, সেই এসে থেকে যেন শুধু প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

'মৃত্যুর কারণ?' দেবদূত বলে চলল।

'হার্ট অ্যাটাক। অন্তত আমার তাই ধারণা।' অনিন্দ্যসুন্দর উত্তর দিলেন।

'হুম।' দেবদূতকে যেন সামান্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হল, 'এইবারে শেষ প্রশ্ন। খাতায় লেখা আছে, হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক কারণ, যে-কোনও একটায় দাগ দিন: আত্মোৎসর্গ, দুর্ঘটনা, রক্তচাপ, কায়িক শ্রম, নির্বুদ্ধিতা, খুন ইত্যাদি। এখানে দেখছি "খুন" শব্দটায় টিক মার্ক দেওয়া আছে।'

অনিন্দ্যসুন্দর সোজা হয়ে উঠে বসলেন 'খুন?'

'হ্যাঁ,' সূর্যকান্ত বলল, 'খাতার এই পাতাটা আপনার নামে। এখানে তো দেখছি, খুনই বলা আছে। অবশ্য আমার ভুল হলে আপনি ধরিয়ে দেবেন বইকী। আপনি তো খুনই হয়েছেন, তাই-না, মিস্টার চৌধুরী?'

'না, মানে, আমি তো সেরকম ভাবিনি। আমি...।'

'তার মানে, আপনি যে খুন হয়েছেন, তা আপনি জানেন না?' সহানুভূতির সুরে বলল সূর্যকান্ত।

'না, এ-আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!'

সূর্যকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: 'হ্যাঁ, কখনও-কখনও যে এরকম হয় না তা নয়। তবে খুন হলে বেশিরভাগ লোকই সেটা বুঝতে পারে। অন্তত শেষ মুহূর্তে হলেও টের পায়। এধরনের খুনের খবর যে কীভাবে মোলায়েম করে ভাঙতে হয়, তা আমি আজও শিখলাম না।'

'এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।' বেশ কয়েকবার এই কথাটা আপনমনে উচ্চারণ করলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে দুঃখিত, মিস্টার চৌধুরী। তবে জানবেন, এখানে এসবে কিছু যায় আসে না।'

'মনে আছে, আমি স্টাডি-রুমে বসেছিলাম। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ এক সাংঘাতিক যন্ত্রণায় আমার ঘুম ভেঙে যায়...ঠিক বুকের ভেতর...তারপর আর কিছু ভেবে

ওঠার সময় পাইনি।'

'এছাড়া আরও একটা কথা এখানে লেখা আছে,' খাতায় চোখ বুলিয়ে সূর্যকান্ত বলল, 'আঘাতটা আপনার হার্টেই লেগেছিল, মিস্টার চৌধুরী। আপনারই কাগজ-কাটার ছুরি দিয়ে আপনাকে আঘাত করা হয়েছে...পিঠে...।'

'এতো রীতিমতো পৈশাচিক,' বিস্মিত সুরে বলে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'আমার কাগজ-কাটার ছুরিটা কী সুন্দর...ওটার হাতলটা সত্যিকারের হাতির দাঁতের তৈরি...কে এ-কাজ করেছে?'

'তার মানে? কে কী কাজ করেছে?'

'কে আমাকে খুন করেছে?'

'সেকী! আমি কী করে জানব?'

'আপনি না জানলে, কে জানবে! আমি তো ভেবেছি আপনার ওই নরকের খাতায় সব খবরই লেখা আছে।'

'এটা নরকের খাতা নয়।'

'সে যাই হোক, বলুন, কে আমাকে খুন করেছে?'

'মিস্টার চৌধুরী!' কঠোর স্বরে বলে উঠল সূর্যকান্ত, 'প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ইত্যাদিকে এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না—এটা আপনার জানা উচিত।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এমনিই জানতে চাই।'

'আপনাকে কে খুন করেছে, আমি জানি না, মিস্টার চৌধুরী। আমি দেবদূত হতে পারি, তাই বলে সবজান্তা নই। কারও সম্পর্কে আমরা সমস্ত তথ্য জানতে পারি তার মৃত্যুর পর। তখনই তার নামে খাতা তৈরি হয়। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার খুনের জন্যে যে দায়ী তার মৃত্যুর পর সব তথ্য আমার হাতে আসবে, তখন সহজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'সেটা কবে?'

'যদি খুনি ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়, তা হলে—বলতে পারেন, খুব শিগগিরই জানতে পারব। আর খুনি যদি সেরকম চালাক হয়ে থাকে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারে, তা হলে অনেক বছরের ধাক্কা।'

'অতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না! আমি এক্ষুনি জানতে চাই।' অনিন্দ্যসুন্দর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করলেন।

'মিস্টার চৌধুরী, আমি দুঃখিত...।'

'এখানে এমন কেউ নেই, যিনি সব জানেন?'

'অবশ্যই আছেন, দেবরাজ। উনি সব জানেন।'

'তা হলে তাঁকেই জিগ্যেস করুন।'

'অসম্ভব। এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে পারি না। মিঃ চৌধুরী, বসুন।'

কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না অনিন্দ্যসুন্দর, পায়চারি করেই চললেন। তারপর হঠাৎই সূর্যকান্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বলেছিলেন, এখানে আমি সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারব?'

'নিশ্চয়ই।' গভীর আশ্বাসের সুরে বলল সূর্যকান্ত।

'কে আমাকে খুন করেছে সেটা না-জানতে পারলে কী করে আমি সুখে-শান্তিতে থাকব বলতে পারেন?'

'তাতে অসুবিধেটা কী আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না, মিস্টার চৌধুরী!'

বেশ চেষ্টা করে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, তারপর সোনার চেয়ারে আবার বসলেন। শান্ত স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'সূর্যকান্তবাবু, দয়া করে বলবেন, আপনার খাতায় আমার পেশার জায়গায় কী লেখা আছে?'

'আপনি রহস্য-গোয়েন্দা গল্পের লেখক ছিলেন।'

'ঠিক তাই। সুন্দর সান্যাল ছদ্মনামে আমি পঁচাত্তরটা রহস্য উপন্যাস লিখেছি—তার একডজনেরও বেশি সিনেমা হয়েছে—এ ছাড়া অসংখ্য ছোট গল্প তো আছেই। এ থেকে কিছু আঁচ করতে পারছেন, সূর্যকান্তবাবু?'

'না, মানে, ঠিক...।'

'এখনও বুঝতে পারছেন না?' অনিন্দ্যসুন্দর প্রায় ধৈর্য হারালেন: 'আমি কে, না, প্রখ্যাত রহস্যকাহিনীকার সুন্দর সান্যাল, বিগত তিরিশ বছর ধরে যে শুধু প্রশ্ন করে গেছে, কে খুন করেছে? এবং বারবার তার উত্তরও দিয়েছে। আর, এখন! আমি নিজেই খুন হলাম অথচ জানি না, কে আমাকে খুন করেছে!'

দেবদূত সূর্যকান্ত হাসল। বলল, 'এবার আপনার কথা ধরতে পেরেছি, মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু যে-প্রশ্নের উত্তর আপনি জানতে চান তা যথাসময়ে আমাদের হাতে আসবে। এখন একটু ধৈর্য ধরে শান্ত হোক—।'

'খুনির পরিচয় আমাকে জানতেই হবে,' অনিন্দ্যসুন্দর উদ্দেশ্যে অটল, 'সেটা না-জানা পর্যন্ত আমার সুখ নেই, শান্তি নেই। পিঠে ছুরি মেরে খুন করেছে! ওঃ কী আস্পর্ধা!'

সূর্যকান্ত সান্ত্বনার সুরে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, অল্পেতে হতাশ হবেন না। আগে এ-জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখুন। যেসব সুখ-সুবিধে এখানে আছে...।'

অনিন্দ্যসুন্দর চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, মেঝের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'আমি কিচ্ছু দেখতে চাই না। এসব সুখ-সুবিধে শুধু কথার কথা।'

'মিস্টার চৌধুরী!'

'মিথ্যে। সব মিথ্যে। সুখ! শান্তি! আমার মনে এতটুকু সুখ নেই। আমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না।'

'এখানে আপনার ভালো লাগতে বাধ্য,' সূর্যকান্তের স্বরে আতঙ্ক উঁকি মারল 'এখানে সুখী না-হওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ এটা স্বর্গ—আপনি স্বর্গে রয়েছেন, মিস্টার চৌধুরী।'

'স্বর্গ না ঘেঁচু! আমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না।'

দেবদূত উঠে দাঁড়াল। সুন্দর মার্বেল পাথরের মেঝেতে নগ্ন পায়ে নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল। আপনমনেই বারকয়েক বিড়বিড় করে বলল, 'কী অদ্ভুত কাণ্ড! নাঃ, এ অসম্ভব!' তারপর অনিন্দ্যসুন্দরের দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার চৌধুরী, আর-একবার ভেবে দেখুন। আপনি…।'

'না, আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

'দয়া করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন, মিস্টার চৌধুরী।' সূর্যকান্ত অনুনয় করল, 'আপনি যদি এভাবে সারা স্বর্গে ঘুরে বেড়ান আর বলতে থাকেন, আপনার মনে এতটুকু সুখ-শান্তি নেই, তা হলে আমাদের সম্মান, সুনাম সব কোথায় যাবে বলুন তো? স্বর্গে এসে আপনার মনে সুখ নেই এ-কথা শুনলে, লজ্জায়, অপমানে দেবরাজ ইন্দ্রের যে মাথা কাটা যাবে!'

'বিশ্বাস করুন, আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই।' অনিন্দ্যসুন্দর আবার বললেন, এবং তাঁর অভিব্যক্তিতেও সে-ইঙ্গিত স্পষ্ট।

'ঠিক আছে, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে জিগ্যেস করে দেখছি।' সূর্যকান্ত বলল। তার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল, এইমুহূর্তে সুখ এবং শান্তি তার মন থেকেও উবে গেছে। একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'দেবরাজ এত ব্যস্ত থাকেন…তা ছাড়া আজকাল তাঁর মেজাজটাও ভালো নেই। কিন্তু তাঁকে তো বলতেই হবে। নইলে তিনি যদি একবার জানতে পারেন যে, স্বর্গে এসেও একজন মানুষ অসুখী, তা হলে আমাকেই দোষ দেবেন। আমি এই ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার, মিস্টার চৌধুরী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এখানকার সব দায়দায়িত্ব আমার ঘাড়েই চাপবে।'

'ভালো না-লাগলে কী করব বলুন!'

শিউরে উঠে দেবদূত আবার পায়চারি শুরু করল। খোলা জানলা দিয়ে মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে উচ্ছল হাসির টুকরো শব্দ, কখনও-বা সঙ্গীতের হালকা সুর। কিন্তু ঘরের ভেতরে অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী গম্ভীর হতাশ মুখে বসে।

হঠাৎই সূর্যকান্তের মুখে হাসি ফুটে উঠল। দ্রুতপায়ে নিজের টেবিলের কাছে ফিরে গেল সে, বসল চেয়ারে।

'মিস্টার চৌধুরী, আপনি তো রহস্য গল্পের লেখক,' দ্রুত স্বরে বলতে শুরু করল দেবদূত, 'সূত্র তৈরি করতে বা খুনিদের ফাঁদে ফেলতে আপনার জুড়ি নেই, কী বলেন?'

'তা বলতে পারেন।'

সূর্যকান্ত বলে চলল, 'যে-মতবলটা আমার মাথায় এসেছে সেটা পুরোপুরি বেআইনি, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ ছাড়া পথ নেই। মিস্টার চৌধুরী, যদি আপনাকে আবার পৃথিবীতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে আপনি পারবেন নিজের হত্যা-রহস্যের সমাধান করতে? কী মনে হয় আপনার?'

'সে আমি বোধহয়…।'

'এর বেশি আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।' কঠোর স্বরে বলল সূর্যকান্ত।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু আমি কীভাবে…?'

'খুব সহজ।' বাধা দিয়ে বলল সূর্যকান্ত, 'আপনি এখন পরলোকে বাস করছেন, সুতরাং সময় বলে এখানে কিছু নেই। আমরা শুধু যা করব, তা হল, একটা সময়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাব, মানে, অ্যাকশন রিপ্লে করব…ধরুন, একটা দিন। আপনি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে

আপনার মানবজীবনের শেষ দিনটা আবার নতুন করে বাঁচবেন। দেখুন...এই যে! আপনি মারা গেছেন রাত ঠিক এগারোটায়। সেইদিন সকাল ঘুম ভাঙার পর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত সময় আপনাকে দেওয়া হল।'

'মাত্র একটা দিন?' অনিন্দ্যসুন্দরের ভুরু কুঁচকে উঠল: 'ওইটুকু সময়ে কি পারব?'

'তা যদি না-পারেন, তা হলে চেষ্টা করে আর...।'

'না, পারব।' ঝটিতি বলে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'বলুন, কখন যেতে হবে?'

'এক্ষুনি। কিন্তু প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, মিস্টার চৌধুরী। জীবনের শেষ দিনটার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা এই খাতায় লেখা রয়েছে, সুতরাং সেরকম কোনও তথ্যগত পরিবর্তন আপনি করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরি তো আপনাকে করতেই হবে, যেটা আপনি প্রথমবারে করতে পারেননি। আর, দরকার হলে খাতায় অল্পস্বল্প মোছামুছি আমি করে নেব, কিন্তু সেরকম বড় কিছু পালটাতে গেলে ভীষণ মুশকিলে পড়তে হবে।'

'কিন্তু—।'

'সোজা কথায়, বড়সড় কোনও ওলটপালট ছাড়াই আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে। এতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মনে রাখবেন, মরণশীল প্রাণীদের যে-বর ক্বচিৎ-কখনও দেওয়া হয়, সেই অমূল্য বর আপনাকে দেওয়া হবে।'

'ভবিষ্যৎদৃষ্টি!' বিস্ময়ে বলে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

'হ্যাঁ। কিন্তু, মিস্টার চৌধুরী, আগেই বলে রাখি, আপনাকে কিন্তু আবার একইভাবে খুন হতে হবে।'

অনিন্দ্যসুন্দরের উজ্জ্বল চোখ মুহূর্তে নিভে গেল। হতাশ সুরে তিনি বললেন, 'আবার সেই পিঠে ছুরি খেয়ে মরতে হবে—।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল দেবদূত। বলল, 'খাতায় তাই লেখা আছে।' তারপর অমোঘ নির্ঘোষের মতো গর্জে উঠল তার মন্দ্রস্বর, 'আমার প্রস্তাবে রাজি হওয়া-না-হওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছে। মত দেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন।'

'না...আমি রাজি। কে আমাকে খুন করেছে জানতেই হবে।'

'বেশ, তা হলে তাই হোক। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন, মিস্টার চৌধুরী। এখানে সমস্ত আত্মাই সুখী হোক, সেটাই আমরা চাই।

'ধন্যবাদ।' অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর এবং বিশাল সোনার দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

...ঘুম ভাঙল তাঁর নিজের বিছানায়, নিজের বহুপরিচিত শোওয়ার ঘরে। বাড়িটা অন্ধকার ছায়াময় এক প্রাচীন প্রাসাদ। অনিন্দ্যসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ, তাঁর ধারণা, কোনও রহস্যকাহিনিকারের পক্ষে এ-বাড়ির প্রকৃতি ও পরিবেশ যথেষ্ট মানানসই। বসবার ঘরের সুপ্রাচীন পিতামহ-ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। শুয়ে-শুয়েই ঘণ্টার শব্দ গুনে চললেন তিনি, এবং হঠাৎই তাঁর মনে হল, এ-হয়তো রাত এগারোটার ইঙ্গিত

—কিন্তু সে-এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তের জন্য। তারপরই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন অনিন্দ্যসুন্দর। দেখলেন, পরদার ফাঁক দিয়ে তীব্র সূর্য ঘরের মেঝেতে জায়গা করে নিয়েছে। এখন তা হলে বেলা এগারোটা। সুপ্রসিদ্ধ লেখকের ঘুম থেকে ওঠার উপযুক্ত সময়ই বটে। অনিন্দ্যসুন্দর বরাবরই রাত জেগে লেখেন, ফলে এগারোটায় ভোর হওয়া তাঁর কাছে রোজকার ব্যাপার। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। ইস, কতটা সময় শুধু-শুধু নষ্ট হল। হাতে আর মাত্র বারোটা ঘণ্টা। মনে-মনে আপশোস করে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন।

দরজায় অনেকক্ষণ ধরেই কেউ নক করছিল।

'ভেতরে এসো।' অনিন্দ্যসুন্দর বললেন।

দরজা খুলে তাঁর সেক্রেটারি কিংশুক বোস ঘরে ঢুকল। বলল, 'একটু আগেই চিঠিপত্র এসেছে—।'

'তা কী হয়েছে?'

'দেখলাম, রমেন গুপ্তর একটা চিঠি রয়েছে।' কিংশুক একটা চিঠি এগিয়ে দিল অনিন্দ্যসুন্দরের দিকে।

রমেন গুপ্ত 'লহরী প্রকাশন'-এর মালিক এবং অনিন্দ্যসুন্দরের বহু রহস্য উপন্যাসের প্রকাশক। চিঠিটা হাতে নিয়ে কিংশুককে আবার নতুন করে জরিপ করলেন তিনি। কিংশুক বোস শিক্ষিত, নম্র স্বভাবের মানুষ। তাঁর বাড়িতেই থাকে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। কদাচিৎ হাসে। এখন, এই মুহূর্তে, ওর ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির ছোঁয়া। ও বলল, 'সাধারণ চিঠি ভেবে আমি ওটা খুলে পড়েছি। মনে হল, চিঠিটা আপনার পড়ে দেখাটা খুব জরুরি।

চিঠিটায় চোখ রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর :

প্রিয় অনিন্দ্য,

আশা করি, কুশলে আছ। জরুরি প্রয়োজনে তোমাকে এ-চিঠি লিখছি। যা বলবার খোলাখুলিই বলব। তোমার শেষ উপন্যাসটা, 'খুনের নাম পাপ', রীতিমতো দোনোমনো করেই আমি ছেপেছি। হয়তো ভালোই বিক্রি হবে—যদি হয় তা শুধু তোমার নাম আর খ্যাতির জন্যে। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়, ইদানীং তোমার লেখা বেশ ঢিলে হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা বই তার আগের বইয়ের চেয়ে দুর্বল। তোমার প্লটের সমুদ্র কি শুকিয়ে এসেছে? মনে হয়, তোমার একটা লম্বা বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু তোমার সঙ্গে আরও তিনটে বই ছাপার চুক্তি থাকায় আমি তো মহা মুশকিলে পড়েছি। সেই নিয়েই কথাবার্তা বলতে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ তোমার বাড়িতে যাব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি—

তোমার রমেন

'তোমার রমেন,' তিক্ত হাসি হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। প্রকৃত বন্ধুই বটে! হঠাৎই তাঁর খেয়াল হল কিংশুক এখনও দাঁড়িয়ে।

'আমার একটা সাজেশন আছে।' ও বলল।

'তাই নাকি!' কঠোর স্বরে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর।

‘রমেনবাবুর মত, আপনি কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিন। আমারও তাই মত। কিন্তু যে-কদিন আপনি বিশ্রাম নেবেন, বিখ্যাত সুন্দর সান্যালের রহস্য উপন্যাসের আনন্দ থেকে পাঠক-পাঠিকাদের বঞ্চিত করার কোনও প্রয়োজন নেই।’

‘তার মানে?’ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নেমে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর।

শান্ত স্বরে কিংশুক বলল, ‘সুন্দর সান্যাল ছদ্মনামে আমিই নতুন-নতুন বই লিখতে থাকব। রমেন গুপ্তকে জানানোর কোনও দরকার নেই। আর, আমাদের পাঠক-পাঠিকাদেরও জানিয়ে কোনও লাভ নেই।’

‘আমাদের পাঠক-পাঠিকা! তোমার কি ধারণা, আমার মতো ভাষা আর স্টাইলে তুমি লিখতে পারবে?’

‘তার চেয়েও বেশি পারব, মিস্টার চৌধুরী। আপনার চেয়ে আমি অনেক ভালো লিখব।’

‘কী—এতখানি আস্পর্ধা তোমার! এত দুঃসাহস!’

‘মিস্টার চৌধুরী, মনে করে দেখুন তো, আপনার শেষ কয়েকটা বইতে আমি কীভাবে আপনাকে হেল্প করেছি? প্লট নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে শুরু করে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সম্পাদনা—সবই আমি করেছি।’

‘বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। গেট আউট!’

‘...সুন্দর সান্যালের সুনাম বজায় রাখতে গেলে এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। বইয়ের রয়্যালটি যা পাব, আমি আর আপনি আধাআধি ভাগ করে নেব।’

‘কাল থেকে তোমাকে আর কাজে আসতে হবে না। তোমার ছুটি!’

‘মিস্টার চৌধুরী...।’

‘বেরিয়ে যাও!’

‘আমার মতো কাজের লোক আর আপনি পাবেন না। তা ছাড়া, আমি না-হলে আর একটা বইও আপনি নিজে লিখতে পারবেন না।’

‘শিগগির মালপত্র গুছিয়ে রওনা হও, কিংশুক, নইলে তোমাকে আমি ঘাড় ধরে বের করে দেব!’

‘আপনাকে এর জন্যে পস্তাতে হবে।’ এই কথা বলে কিংশুক ঘরে ছেড়ে চলে গেল।

হ্যাঁ, এইভাবেই অনিন্দ্যসুন্দরের জীবনের শেষ দিনটা শুরু হয়েছিল। রমেন গুপ্তর চিঠি এবং কিংশুকের সঙ্গে ঝগড়া। একই ঘটনা হুবহু দুবার ঘটলে কীরকম অদ্ভুতই না-লাগে। যেন এ-ঘটনা আগেও ঘটেছে—হয়তো কোনও স্বপ্নে...।

এ-চিন্তায় চমকে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। স্বপ্ন? দেবদূত সূর্যকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার ব্যাপারটা সত্যিই কোনও স্বপ্ন নয় তো?’

তাঁর অভিনব চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। এক্সটেনশান ফোনটা তাঁর হাতের কাছেই। সুতরাং যান্ত্রিকভাবেই ফোন তুললেন অনিন্দ্যসুন্দর।

‘হ্যালো?’

‘সূর্যকান্ত বলছি।’

‘কে সূর্য—ও হ্যাঁ, কী ব্যাপার? কোত্থেকে বলছেন?’

‘কোত্থেকে বলছি।’ সূর্যকান্ত অপরপ্রান্তে যেন অবাক হল: ‘বোকার মতো প্রশ্ন করছেন কেন, মিস্টার চৌধুরী?’

‘কী—কী চাই বলুন?’

‘দেখলাম, ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌঁছেছেন কিনা। কেমন চলছে?’

‘সবে তো এলাম—এখনও তো ভালো করে শুরুই করতে পারিনি!’

‘ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি কাজে লেগে পড়ুন, মিস্টার চৌধুরী। জানেন তো, হাতে সময় বেশি নেই। বিদায়।’

‘বিদায়।’ ফোন নামিয়ে রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

যাক, একটা ব্যাপারের অন্তত নিষ্পত্তি হল। কোনও স্বপ্ন তিনি দেখেননি। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে নেমে পড়া যাক। কিন্তু সূর্যকান্ত যদি সর্বক্ষণ এরকম উঁকি মেরে দেখেন, তা হলে কি স্বস্তিতে কাজ করা যাবে?

পরবর্তী তিরিশ মিনিট তাঁর কেটে গেল হাত-মুখ ধোওয়া, দাড়ি কামানো ও পোশাক-পরিচ্ছদ পালটানোর ব্যস্ততায়। কিংশুকের কথা ভাবছিলেন তিনি—শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী কিংশুক তার জঘন্য স্বরূপ প্রকাশের জন্য। এতদিন থাকতে আজকের দিনটাই বেছে নিল! হ্যাঁ, সুন্দর সান্যালের নাম ও খ্যাতির প্রতি কিংশুকের নির্লজ্জ লোভ রয়েছে—যে সুন্দর সান্যাল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। না, কিংশুক বোসের যথেষ্ট খুনের মোটিভ রয়েছে।

এরপর কী যেন হয়েছিল?

সবিস্ময়ে অনিন্দ্যসুন্দর আবিষ্কার করলেন, তাঁর কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে, ঠিক রাত এগারোটায়, স্টাডি-রুমে, হাতির দাঁতের হাতলওলা কাগজ-কাটার ছুরিতে তাঁকে খুন হতে হবে। তাছাড়া আর কিছুই তাঁর মনে পড়ছে না। দেবদূতের কাছ থেকে আরও কিছু খবরাখবর নিয়ে এলে ভালো হত।

কিন্তু অন্যদিকে ভাবতে গেলে, এই বেশ হয়েছে। ভবিষ্যতের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি আগে থেকে দেখতে পেলে তিনি হয়তো শিউরে উঠতেন। আর, এভাবে তিনি বেশ খোলা মনে তদন্তের কাজ করতে পারবেন।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার পথে অনিন্দ্যসুন্দর টের পেলেন, তাঁর খিদে পেয়েছে। খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখেন, রাঁধুনি সীতার মা তার মেয়ে সীতাকে নিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরির কাজে ইতি টানতে ব্যস্ত। সীতার মায়ের মোটাসোটা ঘামে ভেজা শরীরের দিকে তাকালেন তিনি। তার শ্রান্ত মুখটা তীক্ষ্ণ নজরে জরিপ করলেন। ওদিকে মেয়ে সীতা মা-কে টুকিটাকি সাহায্য করতে ব্যস্ত। মেয়েটা বেশিরভাগই তাঁর স্ত্রীর ফাইফরমাশ খাটে। কিন্তু তাঁকে খুন করার মতো কোনও কারণ ওদের দুজনের মধ্যে খুঁজে পেলেন না অনিন্দ্যসুন্দর। তা ছাড়া প্রতিদিন রাতে ওরা বাড়ি চলে যায়। সুতরাং সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে ওদের দুজনের নাম তিনি স্থির বিশ্বাসে বাতিল করলেন।

‘তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে নিন, বড়বাবু,’ সীতার মা পাঁউরুটি ও ডিমের পোচ তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘রান্নাবান্না সময়মতো শেষ করতে হবে। দুপুরে বৌদিমণি একজনকে নেমন্তন্ন করেছেন।’

‘কাকে?’

‘রণবিলাসবাবুকে।’

এইবার মনে পড়েছে! এ-ঘটনাও প্রথমবারের পুনরাবৃত্তি। রণবিলাস দত্ত। বিশাল চেহারার যুবক। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল।

‘গুডিমর্নিং, ডার্লিং।’

একটা ঠান্ডা চুম্বনের চকিত হালকা ছোঁয়ায় ঘুরে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর। একটা তীক্ষ্ন চিন্তা বর্শার মতো হাওয়া কেটে ছুয়ে গেল তাঁর মনের ভেতর দিয়ে—এ-চুম্বন বিশ্বাসঘাতী। কিন্তু নম্রস্বরেই তিনি উত্তর দিলেন, ‘গুডমর্নিং, তৃণা।’ বিব্রত অপ্রস্তুত চোখে একবার দেখলেন সীতা ও তার মায়ের দিকে। ওরা তখন চলে যাচ্ছে রান্নাঘরে।

প্রাতরাশের দিকে ক্ষণেকের জন্য অমনোযোগী হয়ে নিজের স্ত্রীকে চোখের নজরে ব্যবচ্ছেদ করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তৃণা চৌধুরী। আটাশের উগ্র যুবতী—প্রায় তাঁর অর্ধেক বয়েস। হাবেভাবে চলনে-বলনে যেন বিদেশি আধুনিকা। সর্বদা ভীষণ সেজেগুজে থাকে। তবে অপূর্ব সুন্দরী। সেই কারণেই ওকে বিয়ে করেছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর। নিজের বয়েসের কথাটা খেয়াল করেননি। তৃণার চোখে দেখতে চেয়েছেন নিজের সর্বনাশ। তাঁর সাধের তৃণা। কিন্তু...।

‘রণবিলাস তা হলে দুপুরে খেতে আসছে?’

‘তোমার কি আপত্তি আছে, ডার্লিং?’

‘হ্যাঁ, আপত্তি আছে। একটা কপর্দকহীন ইয়াং অ্যাথলিট আমার বাড়িতে ঘুরঘুর করে বেড়াবে আর আমার বউয়ের দিকে হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকবে, তাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে।’

‘তোমার কল্পনাশক্তির তুলনা নেই, ডার্লিং!’

‘ওকে তুমি ভালোবাসো, তৃণা?’

‘মোটেই না।’

‘তুমি মিথ্যে কথা বলছ, তৃণা। কাল আমি সব দেখেছি।’

অনিন্দ্যসুন্দর নিজেকে অবাক করলেন। কথাগুলো মুখ থেকে বেরোনোমাত্র, হঠাৎই তাঁর সব মনে পড়ে গেল। খুন হওয়ার উত্তেজনায় তিনি নিশ্চয়ই এসব ভুলে বসেছিলেন। এ সমস্ত ঘটনা হুবহু আগে একবার ঘটে গেছে!

‘বাগানে তোমাদের আমি দেখেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি ততটা অবাক হইনি। কারণ আগেও তোমরা কখনও তেমন সাবধান হওনি।’

তৃণার সমস্ত রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে, ও বসে পড়ল শ্লথ ভঙ্গিতে।

‘অবাক হলে, তৃণা? তা হলে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। রণবিলাস দত্ত আজ দুপুরে নেমন্তন্ন খেতে এলে আমার একটুও আপত্তি নেই। সত্যি বলতে কি, আমার পরামর্শ যদি শোনো, তা হলে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর তোমরা দুজনে একটু আলোচনা করে দেখো। আমি যে তোমাদের ব্যাপার সব জানি, সে-কথা ওকে বলো। তারপর দুজনে মিলে ঠিক করো কী করবে। এখন তোমার মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। প্রথমটা হল, আমাকে ছেড়ে রণবিলাসের সঙ্গে চলে যাওয়া। অবশ্য, এটা মনে রেখো, ওর পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই, আর আমি নিজের পয়সা খরচ করে তোমাদের প্রেমকুঞ্জ বানিয়ে দেব, এ-আশা তুমি নিশ্চয়ই করো না। রণবিলাসের সঙ্গে উপোস করে-

করে যখন তোমার সমস্ত শখ মিটে যাবে, তখন ইচ্ছে করলে আমার কাছে আবার ফিরে আসতে পারো। আর তোমার দ্বিতীয় পথ হল, এখানে থেকে যাওয়া। সেক্ষেত্রে আমি চাইব তোমার বিশ্বাস, সততা। আর শ্রীরণবিলাস দত্তকে অন্য কোনও আস্তানা থেকে দু-বেলা দু-মুঠোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

অনিন্দ্যসুন্দর মনে-মনে ভাবলেন, এতেই রণবিলাস-অধ্যায়ের একটা হেস্তনেস্ত হবে। তৃণা শুধুমাত্র ভালোবাসা অবলম্বন করে বেঁচে থাকার মেয়ে নয়। আয়েস-স্বাচ্ছন্দ্যে থেকে-থেকে ওর অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে—প্রাচুর্য আর বিলাসিতা ওর জীবনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত। কিন্তু এই চূড়ান্ত নোটিস তিনি আগেও একবার দিয়েছেন। শুধু একটা জিনিস তখন ভাবেননি। এখন ভাবছেন। তৃণার খুন করার মোটিভ।

সারাটা জীবনে লেখক হিসেবে যে-সুপ্রচুর অর্থ-প্রতিপত্তি তিনি অর্জন করেছেন, তার অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী এখন তৃণা। তাঁর উইলে সেই কথাই লেখা আছে। রণবিলাস যদি সে-কথা জানত! তাঁর তৃণা যদি সত্যিই ছেলেটাকে নিজের করে চায়, আর একইসঙ্গে তাঁর উইলে নিজের উত্তরাধিকারও বজায় রাখতে চায়, তা হলে ওর সামনে মাত্র একটা পথই খোলা আছে...।'

'তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে তো?' তৃণা তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'না,' উদার স্বরে উত্তর দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'শুধু-শুধু তোমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না। তা ছাড়া, এই তো, এত বেলায় জলখাবার খাচ্ছি। তারপর কিছু দরকারি কাজও আছে।'

এরপর তৃণা চলে গেল। অনিন্দ্যসুন্দর তাকিয়ে রইলেন ওর অপস্রিয়মাণ তন্বী শরীরের দিকে। তারপর মনোযোগ দিলেন ডিম ও পাঁউরুটির প্রতি, দ্রুতহাতে প্রাতরাশ শেষ করলেন।

মধ্যাহ্নভোজের অতিথির জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজনের দায়িত্ব সীতার মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাইনিংরুম থেকে।

এবার তিনি হাজির হলেন স্টাডি-রুমে—তাঁর রক্তে রঞ্জিত অকুস্থলে।

নিজের মরণ-কামরায় ঢুকে ভয় পেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। সমস্ত জানলায় পরদা টানা থাকায় গোটা ঘরটা ছায়াময় রহস্যে ছমছমে। অস্বস্তিভরে পরদাগুলো সরিয়ে দিলেন তিনি। সূর্যের আলো ঠিকরে এল ঘরের ভেতরে। এবার তিনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলেন।

ওই তো তাঁর মজবুত মেহগনি কাঠের টেবিল। নিশ্চয়ই তিনি টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে ছিলেন। হয়তো, প্রায়ই যেমন ঘুমিয়ে পড়েন, সেরকমই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—টেবিলে দু-হাত ছড়িয়ে এবং মাথা হাতের ওপরে এলিয়ে। সোজা কথায় খুনিকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছেন। আর, ওই তো সেই কাগজ-কাটার ছুরিটা। অনিচ্ছাভরে ছুরিটা তুলে নিলেন তিনি, যেন ওটার ফলায় লেগে রয়েছে শুকনো কালচে রক্ত।

অবশ্য রক্ত থাকার কথা নয়...অন্তত এখন!

না, জিনিসটা খুনের এক কুৎসিত হাতিয়ার, মনে-মনে ভাবলেন অনিন্দ্যসুন্দর। ছুরির হাতলটা মসৃণ ভারি হাতির দাঁতের তৈরি, প্রায় ইঞ্চিচারেক লম্বা। খুনি যদি অসতর্ক হয়, তা হলে তার স্পষ্ট হাতের ছাপ রেখে যাবে এই ছুরির বাঁটে। চকচকে ফলাটা বেশ লম্বা

—কিন্তু খুব ধারালো কিংবা ছুঁচলো নয়। তবে অব্যর্থ নিশানায় উপযুক্ত শক্তিতে প্রোথিত হলে কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট—কোনও মানুষের হৃৎপিণ্ড সহজেই স্তব্ধ হবে।

শিউরে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

দরজায় কারও নক করার শব্দে তাঁর চিন্তার ঘোর বিচ্ছিন্ন হল। কোনওরকম আমন্ত্রণের অপেক্ষা না-করেই যে নক করেছে সে ঘরে ঢুকল।

'ব্যস্ত আছ, সুন্দরকাকা?'

'না, না। আয় অভী, ভেতরে আয়।'

অভীক ভেতরে ঢুকে লাফিয়ে উঠে বসল টেবিলের ওপর। ওর শরীরের ওজনে আর্তনাদ করে উঠল মজবুত মেহগনি টেবিল। অভীকের প্যাঁচার মতো ছোট-ছোট চোখ পুরু চশমার কাচের পিছন থেকে জুল-জুল করে চেয়ে রইল।

'টাকা-পয়সার অবস্থা কীরকম, সুন্দরকাকা?'

'এবার কত লাগবে?' অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

'তিনহাজার।'

রিভলভিং চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। টেবিলের ওপরে বসা মাংসের স্তূপটিকে লক্ষ করতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, 'অভী, আগেরবারই তো তোকে বলেছি, এভাবে তোর ধার-দেনা আর আমি শোধ করতে পারব না। অন্তত, যদ্দিন না তুই একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিস। সুতরাং আমার সোজা উত্তর হল, না।'

'আমার অবস্থা খুব খারাপ, সুন্দরকাকা।'

'সে তুই বুঝবি।'

'তা কী করব বলবে তো?'

'সেও তোর ব্যাপার।'

'তা হলে আমাকে হুট করে যা-হোক একটা কিছু করতে হবে...।'

এই মন্তব্যে চমকে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তৃণা ও কিংশুকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার মতো অভীকের সঙ্গে তাঁর এই আলোচনা আগেও একবার হয়ে গেছে! তাঁর সম্পত্তির বাকি অর্ধেকের উত্তরাধিকারী অভীক—না, অনিন্দ্যসুন্দর ভালোবেসে এই অংশ ওকে দেননি, তাঁর একমাত্র আত্মীয় হওয়ার সুবাদে এই সম্পত্তি অভীকের প্রাপ্য। আর এখন সেই অকালকুষ্মাণ্ড ভাইপো তাঁর কাছে এসে টাকা চাইছে।

খুনের আরও একটা মোটিভ।

'হুট করে কিছু...করে বসবি...এর...এর মানে কী, অভী?'

'জানি না। কিন্তু তুমি টাকা না-দিলে যা-হোক একটা কিছু তো আমাকে করতে হবে—আর তার জন্যে পুরোপুরি দায়ী হবে তুমি।'

বিশাল স্তূপটা টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল দরজার দিকে, এবং নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে। এত মোটা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাইপো অভীকের চলাফেরায় কেমন একটা চাবুকের ভঙ্গি রয়েছে। আশ্চর্য, কই আগে তো কখনও অনিন্দ্যসুন্দর এটা খেয়াল

করেননি। অবশ্য, আজ তিনি এমন-এমন সব জিনিস আবিষ্কার করছেন, যা আগে কখনও লক্ষই করেননি।

জানলা দিয়ে ছিটকে আসা রোদ হঠাৎই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। না, এই মুহূর্তে ঘরটা তাঁর একটুও ভালো লাগছে না। বরং বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে এলে কেমন হয়! তা ছাড়া শীতের মধ্যে রোদের আমেজটা ভালোই লাগবে—আর ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা-ভাবনারও প্রয়োজন আছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

বাগানে এসে নির্জনতার পরিবর্তে হীরা সিংকে আবিষ্কার করলেন তিনি। বৃদ্ধ হীরা সিং বাগানের মালি, কেয়ারটেকার, ড্রাইভার—একাধারে সব, এবং কখনও-সখনও সীতা ও সীতার মায়ের অনুপস্থিতিতে রান্নাবান্নাও করে। এ ছাড়া হীরা সিংয়ের আরও-একটা পরিচয় হল, সে জেলখাটা কয়েদি। এখানে এসে অনিন্দ্যসুন্দরকে সে অনেক ভাবে সাহায্যও করেছে। মালিকের দেওয়া তরল নেশা গলায় ঢেলে ঘোরের মাঝে নিজের জীবনের বহু অপকীর্তির কথাই অনিন্দ্যসুন্দরকে শুনিয়েছে। আর অনিন্দ্যসুন্দর সেইসব কীর্তিকাহিনী টুকে নিয়েছেন নিজের ডায়েরিতে। বাড়িয়েছেন তাঁর প্লটের সঞ্চয়। তিনি জানতেন, এর কিছু-কিছু ঘটনা এখনও পুলিশের অজানা, এবং সেই অপরাধগুলোর জন্য কোনও শাস্তি পায়নি হীরা সিং। বহু জায়গাতে এখনও তার নামে হুলিয়া ঝুলছে।

এইমুহূর্তে প্লট সংগ্রহের মরজি অনিন্দ্যসুন্দরের ছিল না। কিন্তু হীরা সিংয়ের মনে বুঝি অন্য অভিসন্ধি ছিল।

‘নানা রকোম কোথা কানে আসছে, বড়েসাব।’

‘কী কথা, হীরা সিং?’

‘আপনার কিতাবের কোথা—।’

‘আমার বইয়ের কথা? কী হয়েছে আমার বইতে?’

‘শুনেছি কি আপনি আর কিতাব লিখবেন না?’

ও, কিংশুক দেখছি সবাইকে বলে বেড়িয়েছে! রমেন গুপ্তর চিঠির সারমর্ম তা হলে বাড়িতে আর কারও জানতে বাকি নেই। তৃণা জানে, রণবিলাস জানে, এমনকী অভীকও জানে।

‘সে-কথা যদি সত্যিও হয়, তা হলে তোমার কী আসে-যায়, হীরা সিং? চাকরি খোয়া যাবে?’

আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাল বৃদ্ধ হীরা সিং। প্রখর সূর্যের আলোয় তার কুৎসিত চেহারা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। সে উত্তর দিল, ‘নোকরির কোথা ভাবছি না, বড়েসাব, ভাবছি আপনাকে যে-সব কহানী সুনিয়েছি তার কোথা। যতোদিন আপনি কিতাব লিখছিলেন, ততোদিন সব ঠিক ছিল। কিন্তু আভি কিতাব লিখা বন্ধো হয়ে গেলে, আপনি হয়তো পুলিশের সাথে বাতচিত করতে পারেন। তাদের বোলতে পারেন আমার পুরানা কিসসার কোথা—।

‘সে আমি কেন বলতে যাব, হীরা সি? তুমি কবে কী করেছ, তাতে আমার কী? তুমি এখন ভালো হয়ে গেছ, আমার এখানে চাকরি করছ, সৎভাবে জীবনযাপন করছ।’

‘পুলিশ ওসব শুনবে না।’

‘আমি তো আর পুলিশকে কিছু বলতে যাচ্ছি না...হীরা সিং, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?’

স্পষ্টই বোঝা গেল বিশ্বাস সে করেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়ো লোকটা কোদাল দিয়ে আবার মাটি কোপাতে লাগল। তার কোদাল চালানোর ভঙ্গি বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্র, নিখুঁত। আর ভাঁজ-পড়া মুখ অন্ধকার এবং ভয়ঙ্কর।

অদ্ভুতভাবে অনিন্দ্যসুন্দরের আবার মনে পড়ল, এসবই আগে একবার ঘটে গেছে। নিজের বাগানে কবর খুঁড়ে এইমুর্হূতে তিনি আবিষ্কার করেছেন এক ভয়ঙ্কর সম্ভাব্য খুনিকে।

স্টাডি-রুমে টেবিলের কাছে আবার ফিরে এলেন তিনি, শ্লথ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন চেয়ারে। আশ্চর্য, প্রথমবারে যখন জীবনের শেষ দিনটা এইভাবে তিনি কাটিয়েছিলেন তখন তো এসব কথা তাঁর মনে আসেনি! তখন কেন বুঝতে পারেননি, তাঁকে ঘিরে রয়েছে এমন সব ভয়ঙ্কর মানুষেরা, যারা তাঁর মৃত্যুতে লাভবান হবে? একমাত্র সীতা আর সীতার মা ছাড়া তাঁকে খুন করবার উপযুক্ত মোটিভ প্রত্যেকেরই রয়েছে। এবং তাদের অন্তত একজনের সে-কাজ সম্পন্ন করবার দুঃসাহসও রয়েছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। কোনওরকম চিন্তা-ভাবনা না-করেই অনিন্দ্যসুন্দর টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

‘সূর্যকান্ত বলছি।’

‘ও...বলুন।’

‘কোনও গণ্ডগোল হয়েছে নাকি, মিস্টার চৌধুরী? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মুষড়ে পড়েছেন?’

‘ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছি।’

‘তাই নাকি?’

‘দুজন ঠিকে কাজের লোক ছাড়া আমার বাড়ির প্রত্যেকে আমি মরলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।’

‘এতে মন খারাপ করার কিছু নেই, মিস্টার চৌধুরী।’

‘নেই?’

‘যদি বোঝেন পৃথিবীতে কেউ আপনাকে চায় না, তা হলে এখানে ফিরে আসতে আপনার একটুও দুঃখ হবে না।’

‘হুম। ঠিকই বলেছেন।’

‘আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো, মিস্টার চৌধুরী?’

‘সত্যি বলতে কি, একটা অসুবিধে হচ্ছে। কোনও সূত্র এখনও পাইনি।’

‘খোঁজার চেষ্টা করুন।’

‘সেইখানেই তো হয়েছে বিপদ। এমনিতে আমার বইয়ে—কিংবা বাস্তবেও—সূত্র পাওয়া যায় খুনের পরে, আগে নয়। খুন করার পরেই খুনি সমস্ত সূত্র ফেলে যায়। এবার

বলুন, এখন তা হলে আমি কী করি?’

‘আমি কী-করে বলব, মিস্টার চৌধুরী? এখান থেকে রওনা হওয়ার আগে সে-কথা আপনার ভাবা উচিত ছিল।’

‘সেটা করলেই বোধহয় ভালো হত।’

‘এখন চুপচাপ বসে রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আপনার উপায় নেই। তা হলে তখনই দেখা হবে। চলি।’

ফোন নামিয়ে রেখে ফ্রিজ থেকে সামান্য হুইস্কি আর সোডা নিয়ে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। দুর্ভাবনার সময় মদ তাঁকে স্বস্তি এবং শান্তি দেয়। এখন দেবে কি না কে জানে!

দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল চারটে। তাঁর নির্ধারিত পুনর্জীবনের পাঁচ ঘণ্টা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। মাত্র আর সাত ঘণ্টা বাকি। বিষণ্ণ মনে জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আকাশে মেঘ করেছে, বৃষ্টি হতে পারে।

খুন করার পক্ষে উপযুক্ত রাত।

এইভাবে, আকস্মিক এক দুর্ঘটনাচক্রে, জানলায় আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তৃণা এবং রণবিলাস। তরুণ অ্যাথলিট রণবিলাস তাঁর স্ত্রীকে অটুট মনোযোগে চুম্বন করতে ব্যস্ত।

সেইমুহূর্তে অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরীর মনের গভীরে জন্ম নিল এক নতুন প্রতিজ্ঞা।

সাধারণ আবেগতাড়িত মানুষের মতো জানলার কাচে ঘুষি বসালেন না তিনি, মাথার চুলও ছিঁড়লেন না। পরিবর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। ইতিমধ্যে চুম্বন-অধ্যায় শেষ করে রণবিলাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিন্দ্যসুন্দরের এই প্রশান্তির কারণ, তাঁর মনে এক সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ক্রমে চেহারা নিয়েছে।

একটু পরে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন তিনি। সীতার মাকে উদ্দেশ্য করে সরবে ঘোষণা করলেন, ‘সীতার মা, রণবিলাসবাবু রাতে খেয়ে যাবেন। সেইসঙ্গে কিংশুক এবং অভীকও। আর হীরা সিংকে বোলো, রাতের খাবার যেন সে-ই পরিবেশন করে।’

কিংশুকের ঘরে পৌঁছে তিনি দেখেন, সে জিনিসপত্র গোছগাছ করছে।

‘সুটকেসটা এখন রেখে দাও, কিংশুক।’

‘কিন্তু আপনিই তো আমাকে চলে যেতে বলেছেন।’ তাঁর সেক্রেটারি গম্ভীর মুখে জবাব দিল।

‘তা বলেছি। কিন্তু আমার ইচ্ছে, আজকের রাতটা তুমি থেকে যাও। তাতে তোমার ভালোই হবে, কিংশুক।’

অভীক চৌধুরী তখনও দিবানিদ্রায় অচেতন ছিল, অনিন্দ্যসুন্দর তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন।

‘আজ রাতে তোর কোথাও যাওয়ার থাকলে, ক্যান্সেল কর, অভী। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। তাতে তোর লাভই হবে।’

এবার অনিন্দ্যসুন্দর উপস্থিত হলেন বাগানে।

'দুপুরে আপনার সঙ্গে খেতে বসতে পারিনি বলে মাপ চাইছি, রণবিলাসবাবু,' তৃণার ঠোঁটে চুমু এঁকে দেওয়া শিল্পীকে লক্ষ করে বললেন তিনি, 'কিন্তু রাতে আপনাকে না-খাইয়ে ছাড়ছি না।'

রণবিলাসের সুন্দর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু দ্বিধাভরা অস্ফুট স্বরে সে বলল, এ তো তার সৌভাগ্য। আর তৃণা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক।

গোপন উত্তেজনায় ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যদি তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়...।

নৈশভোজপর্ব শুরু হল রাত ঠিক সাড়ে আটটায়।

অন্ধকার এবং শীতের তীব্রতা এখন চরম অঙ্কে। সীতা ও সীতার মা চলে যাওয়ার পরই শুরু হয়েছে অপ্রত্যাশিত অঝোর বৃষ্টি। এখনও থামেনি। হীরা সিং নীরবে পরিবেশন করছে। তার মুখে করাল ছায়া থমথম করছে।

একমাত্র অনিন্দ্যসুন্দরই খুশি মনে খেয়ে চলেছেন। অন্যেরা যান্ত্রিকভাবে হাত ওঠা-নামা করলেও স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের মন অন্য দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। তৃণার চঞ্চল চোখ থেকে-থেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে রণবিলাসের মুখ, আর রণবিলাসও সে-দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। কিংশুকের শুকনো মুখ ভাবলেশহীন এক মুখোশ। সেই মুখোশ চিরে মাঝে-মাঝে ঝিলিক মারছে বিরূপ মনোভাবের ইশারা। সাধারণত অভীকের খাওয়া 'পেটুক' আখ্যা দেওয়ার মতো, কিন্তু আজ তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। চোরা দৃষ্টিতে সকলেই অনিন্দ্যসুন্দরকে লক্ষ করছে।

নটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হল। উঠে দাঁড়ালেন অনিন্দ্যসুন্দর। ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন: 'ঘণ্টাখানেক পরে তোমরা সবাই স্টাডি-রুমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। বিশেষ কিছুই না, বিদায় দেওয়ার আগে সকলের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করা—অনেকটা ফেয়ারওয়েল পার্টির মতো।'

এই সাংকেতিক মন্তব্যে সকলেই নিষ্পলক চোখে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে দোতলায় নিজের শোওয়ার ঘরে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর, একটা সুটকেস গুছোতে শুরু করলেন। দু-জোড়া মোজা সবে সুটকেসে ভরেছেন, টেলিফোন বেজে উঠল।

'সূর্যকান্ত বলছি।'

'ভাবছিলাম, আপনি বোধহয় এখুনি ফোন করবেন।'

'শেষ কয়েকটা ঘণ্টা ধরে দেখছি, আপনার মেজাজ একদম পালটে গেছে।'

'হ্যাঁ তা গেছে।'

'ওই সুটকেস নিয়ে কোথায় চলেছেন?'

'একটু পরেই তো আমাকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে, তাই না?'

'এখানে বাড়তি মোজার দরকার নেই, মিস্টার চৌধুরী। সবকিছুই আমরা দিয়ে দিই।'

'আপনি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছেন—।'

‘আমার গোয়েন্দাগিরি করবার দরকার হয় না।’

‘আপনি কি ভাবছেন, আপনাকে আমি ঠকাব—ফাঁকি দেব?’

কোনও উত্তর নেই। টেলিফোন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এটাই একরকম স্পষ্ট উত্তর। দেবদূত চিন্তায় পড়েছে। যদি ঠকানোর কথায় সে দুশ্চিন্তায় পড়ে থাকে, তা হলে তাকে ঠকানো নিশ্চয়ই সম্ভব! গোছগাছ করতে-করতে চাপা হাসিকে প্রশ্রয় দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

সুটকেসে দিনকয়েকের মতো জামা-কাপড় ভরে নিলেন তিনি। টুথব্রাশ ও শেভিং কিট নিতেও ভুললেন না। একটা দেওয়াল-সিন্দুকের কাছে গিয়ে সেখান থেকে দশ হাজার টাকা বের করে নিলেন। এটা তাঁর বিপদের সঞ্চয়। ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার থেকে তুলে নিলেন নিজের অটোমেটিক পিস্তল—পরীক্ষা করে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। এই অটোমেটিক পিস্তল তাঁর অতিরিক্ত জীবনবীমা।

কিন্তু প্রতিশ্রুতিমতো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি নীচে নামলেন না। সন্দেহভাজনদের তিনি উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখতে চান। তিনি জানেন, ওরা অপেক্ষা করবে। বিশেষ করে খুনি, সে...তাকে তো অপেক্ষা করতেই হবে। নরম সোফায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন অনিন্দ্যসুন্দর, মুখে ধূমায়িত পাইপ, মনে ভবিষ্যতের নতুন পরিকল্পনা।

প্রায় সওয়া দশটা নাগাদ সুটকেস হাতে নীচে স্টাডি-রুমে এলেন তিনি। উপস্থিত হলেন তৃণা ও অতিথিদের সামনে। আবিষ্কার করলেন, ওরা প্রত্যেকেই তাঁর পছন্দমাফিক কম-বেশি বিচলিত। কিংশুকের ফরসা মুখে লালচে আভা। অভীক বদমেজাজি শুয়োরের মতো মুখ কালো করে এককোণে বসে আছে। একটা সেটিতে নির্লজ্জভাবে ঘন হয়ে বসে আছে তৃণা ও রণবিলাস। আর বৃদ্ধ হীরা সিং বাইরের বারান্দায় থামের আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল, অনিন্দ্যসুন্দর তাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা তালা ও চাবি বের করে ঘরের দরজায় ভেতর থেকে তালা দিয়ে দিলেন। এবার তিনি এসে বসলেন নিজের মেহগনি-টেবিলে—ওদের মুখোমুখি।

‘তোমাদের কেউ কি আজকের দিনটায় এক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছ,’ বলতে শুরু করলেন তিনি, ‘যেদিনটা আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর শেষ হয়ে যাবে?’

ওরা স্বাভাবিকভাবেই কিছু বুঝে উঠতে পারল না। কয়েকমুহূর্ত তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিল বাড়ির গায়ে আছড়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার ধারাবাহিক শব্দ, এবং কখনও-কখনও বজ্রপাতের তীব্র সংঘাত।

‘কীসব বলছ, ডার্লিং, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!’ তাঁর স্ত্রী তৃণা। ও সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এক-পা এগিয়ে এসেছে।

শীতল দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করলেন তিনি। ওর পরনে আঁটোসাঁটো স্বচ্ছ জাপানি জর্জেট শাড়ি। সুগভীর নাভির ওপরে ও নীচে তিন ইঞ্চিব্যাপী মসৃণ ত্বক উন্মুক্ত। ব্লাউজের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, শুধুমাত্র তৃণার শরীরের গঠন সেটাকে স্বস্থানে বজায় রেখেছে। এসবই নিঃসন্দেহে রণবিলাস দত্তের উপকারের জন্য।

‘বোসো, তৃণা, উত্তেজিত হোয়ো না।’ তাঁর স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে তৃণা পিছিয়ে গেল, ‘ভেবেছিলাম, অন্য কেউ না-পারলেও তুমি হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ করবে। মেয়েদের সহজাত ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অনুভূতি দিয়ে।’

‘কী লক্ষ করব, অনিন্দ্য?’

‘আজকের দিনটায় এক অদ্ভুত ব্যাপার তুমি খেয়াল করোনি? একবারও তোমার মনে হয়নি, আজ সারাদিন ধরে তুমি যা-যা করছ, বলছ, সবই তোমার খুবই চেনা? হুবহু এসব কাজ তুমি আগেও একবার করেছ, বলেছ এই একই কথা?’

মুখভাবে স্পষ্টতই বোঝা গেল উপস্থিত সবাই তাঁকে মাতাল ভাবছে, কিংবা ভাবছে তিনি ওদের সঙ্গে রসিকতা করছেন।

একচিলতে হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে বলে চললেন অনিন্দ্যসুন্দর, ‘গতকাল রাতে আমি...না, হয়তো কাল রাতে নয়। কারণ, মরণোত্তর জগতে সময়ের হিসেব রাখা খুব শক্ত—অবশ্য আমি সেখানে খুব বেশিক্ষণ ছিলাম না, সুতরাং আমার বিশ্বাস, হয়তো কাল রাতেই হবে। কাল রাতেই আমি খুন হয়েছি।’

এক রুদ্ধশ্বাস অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তৃণার ঠোঁট চিরে।

‘বাঃ, তোমার তা হলে মনে পড়েছেন সোনা?’ প্রশ্ন করলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

‘মনে পড়েছে?’

অর্থাৎ, অনিন্দ্যসুন্দর কী বিষয়ে কথা বলছেন, সেটা তৃণা একটুও বুঝতে পারছে না। ওর মুখভাব দেখে তাঁর মনে হল, না, অভিনয় নয়। তিনি অন্যান্যদের দিকে তাকালেন, ওরা সকলেই অবাক অবুঝ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

সুতরাং তিনি খুলে বললেন। বললেন, সূর্যকান্তের কথা, কেন তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, সেই কথা। ওরা গভীর মনোযোগে শুনল, মাঝে-মাঝে এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল।

তাঁর কাহিনি শেষ হলে অভীক বলে উঠল, ‘সুন্দরকাকা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখাও।’

‘রমেন গুপ্ত বলেছে আপনার কিছুদিন বিশ্রামের দরকার,’ প্রতিহিংসার ব্যঙ্গে তীক্ষ্ন হল কিংশুকের কণ্ঠস্বর, ‘এখন দেখছি ঠিকই বলেছে!’

‘এ নেহাত পাগলের আড্ডাখানা!’ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রণবিলাস দত্ত: ‘আমি চললাম।’

‘বোসো সবাই।’ পকেট থেকে অটোমেটিকটা বের করে উঁচিয়ে ধরলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর অভিব্যক্তিতে স্থির প্রতিজ্ঞা।

ওরা সবাই আবার বসল। একইসঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল।

অনিন্দ্যসুন্দর ফোনটা তুলতেই অপর প্রান্তে কেউ বলতে শুরু করল, ‘কী হচ্ছে এসব, মিস্টার চৌধুরী?’

‘নিতান্তই সস্তা প্যাঁচ,’ সহজ সুরে জবাব দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, ‘সব রহস্য উপন্যাসেই এরকমটা হয়। একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে ডিটেকটিভ সন্দেহভাজন সকলকে একটা ঘরে জড়ো করে। তারপর নিজের তদন্তের কাহিনি শোনায়, আর তখন খুনি সাধারণত নিজের দোষ স্বীকার করে, কিংবা বেহিসেবি হয়ে ধরা পড়ে যায়। আপনাকে ওই খাতায় শুধু একটু মোছামুছি করতে হবে।’

‘ঠিক আছে, আপনার কথাই বিশ্বাস করলাম, মিস্টার চৌধুরী। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার হাতে আর মাত্র কুড়িমিনিট সময় আছে।’

অনিন্দ্যসুন্দর ফোন নামিয়ে রাখতেই রণবিলাস মন্তব্য করল, 'নিশ্চয়ই ওই দেবদূত ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ।' অনিন্দ্যসুন্দর বললেন।

রণবিলাস চুপ করে গেল।

'আমার হাতে যে আর সময় বেশি নেই, সেটাই সে মনে করিয়ে দিল।' অনিন্দ্যসুন্দর বলতে শুরু করলেন, 'যাই হোক, আমার গল্প তোমাদের বিশ্বাস হয়নি মানলাম, কিন্তু এবারে আমি তথ্যের দিকে নজর দেব। আশা করি, সেগুলো তোমরা বিনা বিতর্কে মেনে নেবে। এই ঘরে তোমরা পাঁচজন রয়েছ। এবং পাঁচজনের প্রত্যেকেই মনে-মনে চাও, আমার মৃত্যু হোক। কিন্তু তার মধ্যে একজন সেটা এত বেশি করে চায় যে, সে—খুন করতেও পেছপা হবে না।

'এই যে আমার প্রিয় ভাইপো অভীক। দেনায় ও গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। এ-দেনার হাত থেকে ওর রক্ষা পাওয়ার একমাত্র আশা, আমার উইলের উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু অর্থ লাভ করা। মানছি, অভীকের টাকার প্রয়োজনটা এই মুহূর্তে। কিন্তু আমি যদি মারা যাই, তা হলে উইলের প্রবেট নেওয়া হবে, আর ওর পাওনাদাররাও সাময়িক ধৈর্য ধরবে।

'তারপর রয়েছে কিংশুক, আমার প্রাক্তন সেক্রেটারি। কিংশুকের ধারণা, আমি পথ থেকে সরে গেলে, সুন্দর সান্যালের উন্নতি ও খ্যাতির দায়িত্ব সে একাই নিতে পারবে। আগামীকাল আমার প্রকাশক দেখা করতে আসছে, আর সেটাই হল কিংশুকের মস্ত সুযোগ—যদি আমি মারা যাই, তবেই।

'এবার আসছে হীরা সিং। ওর বিশ্বাস, আমি লেখা ছেড়ে দিলে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। কারণ তখন ওর অতীতের কীর্তিকলাপ আমার গল্পে আর কাজে আসবে না।

'সবশেষে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী তৃণা এবং ওর বন্ধু শ্রীযুক্ত রণবিলাস দত্ত। রণবিলাসবাবুর হাতে যদি সুপ্রচুর অর্থ থাকত, তা হলে তৃণা কবে আমাকে ছেড়ে চলে যেত। আমার সম্পত্তির অর্ধেক যদি ও হাতে পায়, তা হলে আমার কাছে যেমন সুখ-প্রাচুর্যে ছিল, সেরকম ভাবেই ওর জীবন কাটাতে পারবে। সুতরাং ওদের একজনের হয়তো মনে হতে পারে, আমাকে খুন করাটা জরুরি।'

'তোমার মনমেজাজ দেখছি ভালো নেই, সুন্দরকাকা।' অভীক শান্ত স্বরে বলল।

'মনমেজাজ ভালো নেই, তবে মাথার ঠিক আছে, অভী। এটা হল আমার কাগজ-কাটার ছুরি। হিসেব মতো, এই টেবিলে বসে আমার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক এগারোটায় খুনি—তোদের পাঁচ জনের একজন—এই কাগজ-কাটা ছুরিটা নিয়ে আমার পিঠে বসিয়ে দেবে, আমাকে খুন করবে।'

কিংশুক এখন ভীষণ মনোযোগে সব শুনছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অদ্ভুত রহস্য ওকে মুগ্ধ করেছে। ও বলে উঠল, 'মিস্টার চৌধুরী, ধরে নিলাম, আপনি যা-যা বললেন সব সত্যি। কিন্তু আপনি কি সময়মতো টেবিলে ঘুমিয়ে পড়ে খুনিকে খুন করার সুযোগ দেবেন?'

'কক্ষনও না, কিংশুক, কক্ষনও না। যখন আমি জেনেই ফেলেছি যে, আমি খুন হব, তখন চট করে ঘুমিয়ে পড়াটা কী খুব সহজ হবে? আমার তো মনে হয়, এই পরিস্থিতিতে ঘুম পাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব, কি বলো?'

‘তা হলে আর প্রথমবারের মতো ঠিক এগারোটার সময় আপনার খুন হওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।’

‘এগজ্যাক্টলি, কিংশুক। এই রহস্যের আসল অর্থটা তুমি নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছ। না, খুনটা এখন প্রথমবারের মতো নিয়ম মেনে আর হতে পারে না। খুনের পদ্ধতির সামান্য এদিক-সেদিক করতেই হবে। অবশ্য তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, দেবদূত বলেছিল, প্রয়োজন হলে তার খাতায় একটু-আধটু মোছামুছি করে নেবে।’

ঘরের প্রত্যেকে অধীর কৌতূহলে প্রতিটি কথা শুনছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য ওদের সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

‘মিস্টার চৌধুরী,’ কিংশুক বলে চলল, ‘কী করে যে আপনি নিজের খুনের তদন্ত করবেন, সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সাধারণত আমাদের বইতে—মানে, আপনার বইতে—খুন হয়, খুনি সূত্র ফেলে যায়, এবং তারও পরে ডিটেকটিভ এসে তার কাজ শুরু করে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন সূত্র ধরে আপনি এগোবেন? একটা সাদামাটা উদাহরণ আপনাকে দিই—ওই কাগজ-কাটা ছুরিতে খুব সুন্দর হাতের ছাপ পড়বে, কিন্তু খুন করার আগে তো খুনি সে-হাতের ছাপ ফেলবে না। আর যখন ফেলবে, তখন আপনার তদন্তের পক্ষে অনেক দেরি হয়ে যাবে।’

‘ভালো সমস্যা তুলে ধরেছ, কিংশুক। আমার সঙ্গে থেকে-থেকে তোমার উন্নতিই হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, একেবারে প্রথমে এই অসুবিধেটার কথা আমার মনে পড়েনি। সত্যিই তো, খুন হওয়ার আগে সেই খুনের সমাধান আমি করব কেমন করে?’

‘আর তোমার হাতে মাত্র দশমিনিট সময় আছে, সুন্দরকাকা।’ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল অভীক।

‘বড়েসাব, আপনি কি ভাবছেন, খুন করবার আগে খুনি সব কবুল করবে?’ এ-প্রশ্ন এল হীরা সিংয়ের কাছ থেকে।

‘তা হয়তো করতে পারে,’ সুষম কণ্ঠে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, ‘কিন্তু সে-ভরসায় আমি বসে নেই।’

‘তা হলে আপনি এভাবেই বসে অপেক্ষা করবেন—দেখবেন, খুনি আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে। তখনই খুনিকে চিনতে পারবেন এবং আপনার কৌতূহলও মিটে যাবে।’ এ-প্রস্তাব রণবিলাস দত্তের।

হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যেন বন্ধুমহলে কোনও তর্কের উত্তরে বলছেন এমন সুরে জবাব দিলেন, ‘না, তা নয়। সেরকম সাহস আমার নেই, রণবিলাসবাবু, যে শান্তভাবে টেবিলে বসে দেখব, খুনি এসে আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, এবং তারপর, তার ছুরির সামনে নিজেকে উৎসর্গ করব।’

‘তা হলে আর কী পথ আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না।’ বিরক্ত তীক্ষ্ন স্বরে তৃণা বলল।

‘সত্যিই তো, তুমি বুঝবে কেমন করে। মন দিয়ে শোনো, স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলছি। এতক্ষণে এটুকু নিশ্চয়ই আঁচ করেছ, একটা মতলব আমার মাথায় আছে। সূর্য্যকান্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব না—কারণ সে আমার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছে—এমনকী এই মাঝরাতে আমার এই স্টাডি-রুমে এসে পর্যন্ত আমার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খুনটা মোটেই আর হবে না!’

নিজেদের হতাশা ওরা গোপন রাখতে পারল না। অনিন্দ্যসুন্দর আবার হাসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'এগারোটার পরে দেবদূতের কাছে আমার আর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকছে না। নিয়মিত ছকে তার নির্ধারিত সময়টা খুনি কাজে লাগাতে পারছে না, ফলে আমি বেঁচেই থাকব—বহু বছর বাঁচব। কিন্তু যেহেতু তোমাদের আসল পরিচয়টা এখন আমার কাছে স্পষ্ট, সেহেতু এই বাড়িতে আর একটা দিনও আমি থাকব না। দেখতেই পাচ্ছ, আমার সুটকেস গুছিয়ে নিয়েছি! এ-জায়গা ছেড়ে আমি চলে যাব দূরে—বহুদূরে। তারপর, কী-করে, তৃণা, তোমাকে, আর অভী, তোকে, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায়, সে-ব্যবস্থা আমি করছি। আর লেখক হিসেবে আমার ভবিষ্যতের কথা যদি তোল, তা হলে বলে রাখি, আজকের এই ঘটনা নিয়ে একটা নতুন বই লেখার কথা আমার মাথায় এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কাহিনির অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য সুন্দর সান্যালের টলে যাওয়া আসনকে আবার নিজের জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। তুমি তোমার নিজের পথ বেছে নাও, কিংশুক। আর হীরা সিং, একজন দায়িত্বশীল আইন-মেনে-চলা নাগরিক হিসেবে আমাকে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

আরও একবার হাসলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

সন্দেহের ছায়ায় আবৃত পাঁচটি মানুষই নিস্পন্দ, নীরব। দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটা বাজতে ঠিক সাত মিনিট বাকি।

বৃদ্ধ হীরা সিংই প্রথম মুখ খুলল, 'বন্দুক দেখিয়ে এইভাবে আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখছেন, বড়েসাব? তা হলে ওই চাকু দিয়ে কোই ভি আপনাকে খুন করতে পারবে না। আপনি শেষ পর্যন্ত দেবতার সোঙ্গে বেইমানি করবেন?'

'বেইমানি আমি করব না।' শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'তোমাদের বন্দুক দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই।' নিজের বক্তব্য যেন প্রমাণ করতেই পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন তিনি: 'আমার পরিকল্পনা অনেক সহজ-সরল, তাতে বন্দুক-ছুরির কোনও ব্যাপার নেই।'

'সে-পরিকল্পনাটা কী আমরা জানতে পারি?' কিংশুক দাবি করল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এইতো আমি, নির্ধারিত জায়গায় নির্ধারিত সময়ে চুক্তিমতো বসে আছি। আর একইসঙ্গে, আমাকে যারা খুন করতে পারে, তাদেরও আমি এখানে হাজির করেছি। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?'

'এর মধ্যে কোথাও একটা চালাকি আছে।' তাঁর ভাইপো বলে উঠল।

'থাকাই তো উচিত, অভী। তোদের পাঁচজনের একজন হচ্ছে খুনি। এবার খুনি মহোদয়, আপনার সামনে দুটো পথ খোলা আছে। ঠিক এগারোটায় আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে খুন করতে পারেন—এই উজ্জ্বল আলোয়, আমাকে বাদ দিয়েও চার-চারজন সাক্ষীর সামনে। সেক্ষেত্রে পুলিশের হাতে আপনাকে ধরা পড়তেই হবে, কারণ আমি হলফ করে বলতে পারি, বাকি চারজন জঘন্য চরিত্রের মানুষ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু দ্বিতীয় একটা পথও আপনার আছে আমাকে খুন করার সুযোগটা আপনি ছেড়ে দিতে পারেন। সুতরাং আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে দায়ী হচ্ছেন আপনি নিজে, এবং সূর্যকান্তের সঙ্গে কোনওরকম বিশ্বাসঘাতকতা আমি করছি না। এগারোটা বেজে একমিনিটে এই বাড়ি ও তোমাদের জীবন ছেড়ে আমি চিরদিনের মতো চলে যাব।'

সশব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, 'হ্যালো দেবদূতসাহেব—কী ব্যাপার?'

'মিস্টার চৌধুরী, আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন! দেবদূত বলে উঠল।

'উঁহু, মোটেই না। খুনিকে বের করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। খুনের আগে কোনও সূত্র পাওয়া সম্ভব নয়, এবং খুনের পরে আমি আর বেঁচে থাকছি না। যদি খুনি নিজে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে আমাকে খুন করবে না, তা হলে আপনি আমাকে দোষ দিতে পারেন না।'

'আপনি খুব চালাক, মিস্টার চৌধুরী!'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু সেরকম চালাক নন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, রাত এগারোটায় খুনিকে একটা বিশেষ কাজ করতে হবে—আপনার মতো তাকেও সময় দেওয়া রয়েছে। সুতরাং তার একটা পালটা মতলব থাকতে পারে।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। এ-কথা তিনি একবারও ভাবেননি। মনোযোগী দর্শকদের কাছে তাঁর টলে যাওয়া আত্মবিশ্বাস গোপন রইল না।

'কটা বাজে?' অভীক প্রশ্ন করল। ও চোখে ভালো দেখতে পায় না।

'এগারোটা বাজতে তিন।' দেওয়াল-ঘড়ির সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিংশুক বোস।

একটা ভারী নিস্তব্ধতা ঘরে জাঁকিয়ে বসল। তৃণা ও রণবিলাস চকিত দৃষ্টি বিনিময় করল। অন্যান্যরা অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে। ওদের অবিশ্বাসী অভিব্যক্তি এখন পুরোপুরি অদৃশ্য। আর ওদেরই মাঝে বসে খুনি মনে-মনে এক চরম সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল রণবিলাস দত্ত, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ঘরের দরজার কাছে। ওর চলার শিকারি চিতার ক্ষিপ্রতা এবং এতটুকু পায়ের শব্দ নেই। সতর্ক হয়ে ওকে লক্ষ করতে লাগলেন অনিন্দ্যসুন্দর, অনুভব করলেন অটোমেটিকের স্পর্শ।

দরজার কাছে গিয়ে থামল রণবিলাস, চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

'মিস্টার চৌধুরী একটা কথা ঠিকই বলেছেন,' রণবিলাস দত্ত ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করল, 'অন্যান্যদের চোখের সামনে খুনি যদি খুন করে, তা হলে তাঁরা সাক্ষী দিতে পারবে। এবং তাঁদের নিরাপত্তা পুরোপুরি বজায় থাকবে। কিন্তু যদি সকলের চোখ এড়িয়ে খুনটা করা যায়, তা হলে? তখন কেউই সঠিক বলতে পারবে না, কে খুন করেছে। এ-কথা সত্যি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই খুনের মোটিভ রয়েছে, আমাদের সবাইকেই পুলিশ সন্দেহ করবে—এমনকী এরকমভাবেও তারা কেস সাজাতে পারে যে, আমরা পাঁচজনে মিলে প্ল্যান করে মিস্টার চৌধুরীকে খুন করেছি। কিন্তু পুলিশ যদি এই ঘরোয়া বৈঠকের কথা একেবারেই না জানতে পারে? তা হলে আমাদের কারওরই কোনও ভয় নেই, আর খুনি ঠিক প্রথমবারের মতোই আইনের চোখে ধুলো দেওয়ার একই ঝুঁকি নেবে। শুধু যা করতে হবে, তা হল, কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী না-রেখে রাত ঠিক এগারোটায় মিস্টার চৌধুরীকে খুন করতে হবে।'

এগারোটা বাজতে একমিনিট।

‘কিন্তু সেটা খুনি করবে কীভাবে?’ অনিন্দ্যসুন্দর চৌধুরী তীব্র স্বরে জানতে চাইলেন, কিন্তু সবিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন, তাঁর গলার স্বর কাঁপছে, ‘একঘর লোকের সামনে প্রত্যক্ষ সাক্ষী না- রেখে কী করে আমাকে খুন করবে সে?’

রণবিলাস দত্ত হাসল। ঘোরতর শত্রুর হাসি।

‘কেন, সে তো খুব সহজ,’ উত্তর দিল সে, ‘শ্রীযুক্ত সুন্দর সান্যাল, রহস্য-গোয়েন্দা গল্পের প্রখ্যাত লেখক, এটা কী করে আপনার চোখ এড়িয়ে গেল বলুন তো? আমাকে কাজের কাজ যা করতে হবে, তা হল, টুক করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেওয়া!’

অনিন্দ্যসুন্দর কিছু করে ওঠার আগেই রণবিলাসের আঙুল পৌঁছে গেল আলোর সুইচে। অন্ধকার নেমে এল চকিতে, অস্তিমান রইল। যে-বিদ্যুতের ঝলক এতক্ষণ প্রায় ধারাবাহিকভাবে আলোর বর্শা নিক্ষেপ করে চলেছিল, এখন, এইমুহূর্তে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্তের মতো স্তব্ধ হল। উত্তাল আক্রোশে বাইরের দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়া বৃষ্টির শব্দে লোপ পেল সমস্ত পায়ের শব্দ।

নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রেখে চলাফেরায় খুনির আর কোনও অসুবিধে নেই!

বিস্ময়ে সাময়িকভাবে বিমূঢ় হয়ে না-পড়লে অনিন্দ্যসুন্দর হয়তো কিছু করতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে।

কেউ একজন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত তাঁর মাথাটা ঠেলে দিল সামনে, টেবিলের ওপর। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ঠিক যেমনটা হত। অনিন্দ্যসুন্দর বুঝলেন, অন্য হাতটা তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে কাগজ-কাটা ছুরিটা...খুঁজে পেল...শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল।

আঘাতটায় সেরকম যন্ত্রণা অনুভব করলেন না তিনি।

আবছাভাবে অনিন্দ্যসুন্দর টের পেলেন, যে-হাতটা তাঁর মাথাটা টেবিলে ঠেলে ধরেছিল, সেটা এখন তাঁর প্যান্টের বাঁ-পকেট হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তুলে নিচ্ছে তাঁর রুমালটা...এবার খুনি ছুরির হাতল থেকে মুছে ফেলছে তার আঙুলের ছাপ...।

অনিন্দ্যসুন্দরের মাথার মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ শব্দে ঘণ্টা বেজে চলেছে...।

নাকি সেটা টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দ...।

‘সুস্বাগতম, মিস্টার চৌধুরী। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ফিরে এসেছেন।’

সূর্যকান্তের টেবিলের সামনে সোনার সিংহাসনে শ্লথ ভঙ্গিতে বসে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর।

‘পৃথিবীতে কেমন কাটালেন, মিস্টার চৌধুরী?’

‘আমি আবার খুন হয়েছি!’

‘নিশ্চয়ই!’

‘কে খুন করেছে আমাকে?’

দেবদূত সশব্দে হেসে উঠল। সেই হাসিতে গমগম করে উঠল শ্বেতপাথরে অলঙ্কৃত প্রাসাদ।

‘সেটা জানতেই তো আপনি আবার ফিরে গেলেন পৃথিবীতে! আর এখন কিনা সেই একই প্রশ্ন করছেন? আপনি নিশ্চয়ই তৃতীয়বার পৃথিবীতে যাওয়ার কথা ভাবছেন না?’

‘না, ধন্যবাদ,’ শ্রান্ত স্বরে বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, ‘কিন্তু এখানে আমি এতটুকু শান্তি পাব না—।’

‘আবার সেই পুরোনো কথা!’ তড়িঘড়ি বলে উঠল দেবদূত, ‘তার চেয়ে আসুন আপনার খুনের রহস্যটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো যাক। নিজেকে খুনির জায়গায় কল্পনা করুন, মিস্টার চৌধুরী। যখন রণবিলাসবাবু আলো নিভিয়ে দিলেন, তখন আপনি হলে কি টেবিলের কাছে গিয়ে খুনটা করতেন?’

দু-হাতে মাথা রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তারপর বললেন, ‘না, আমি সেটাকে একটা ফাঁদ বলে সন্দেহ করতাম। কারণ, ছুরি বসানোর সময় কেউ হয়তো আলোটা আবার জ্বালিয়ে দিতে পারত, এবং আমি হাতেনাতে ধরা পড়তাম।’

‘ঠিক বলেছেন, মিস্টার চৌধুরী। সেটা প্রচণ্ড ঝুঁকির কাজ হত। এবারে আর-একটা প্রশ্ন। আপনি যদি খুনি হতেন, তা হলে যাকে খুন করলেন তারই পকেট থেকে রুমাল বের করে ছুরি থেকে নিজের আঙুলের ছাপ মুছে ফেলার কী কারণ আপনার থাকতে পারে?’

‘এর একটাই উত্তর,’ বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, ‘নিশ্চয়ই আমার কাছে কোনও রুমাল ছিল না।’

‘ঠিক।’ সম্মতি জানাল দেবদূত: ‘এবার বলুন তো, ওই পাঁচজনের মধ্যে কে জানত যে, আপনি সবসময় প্যান্টের বাঁ-পকেটে রুমাল রাখতেন?’

‘বুঝেছি, আপনি কি বলতে চান!’ অনিন্দ্যসুন্দরের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল।

প্রত্যুত্তরে সূর্যকান্তও হাসল: ‘এবারে নিশ্চয়ই আপনি এখানে সুখী হবেন, মিস্টার চৌধুরী।’

‘তৃণার তরুণ প্রেমিক রণবিলাস ছিল আলোর সুইচের কাছে, ‘আত্মগতভাবেই বললেন অনিন্দ্যসুন্দর, ‘খুনটা ও শেষ না-করা পর্যন্ত রণবিলাস যে আলো জ্বেলে দেবে না, সে-ভরসা তৃণার ছিল। তা ছাড়া, তৃণার সঙ্গে কোনও রুমাল ছিল না। ছুরির হাতলটা যদি ও শাড়িতে মুছতে যেত, তা হলে শাড়িতে রক্ত লেগে যাওয়ার ভয় থাকত। সুতরাং আমার রুমালটাই ও বেছে নিয়েছে। আমি রুমাল কোথায় রাখি, সেটা সবচেয়ে ভালো জানত তৃণাই—আর কেউ নয়!’

‘ঠিক আমি যা ভেবেছি তাই, মিস্টার চৌধুরী।’

‘গোয়েন্দাগিরিতে আপনি দেখছি নেহাত কম যান না!’

দেবদূত কষ্টকৃত বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলল। নরম সুরে স্বীকার করল, ‘এখানে থাকতে-থাকতে টুকটাক কিছু শিখেছি আর কী। বলতে পারেন একরকম সঙ্গগুণ বা মেলামেশার ফল—।’

‘সঙ্গগুণ? মেলামেশা?’

‘কেন, আপনাকে বলিনি, মিস্টার চৌধুরী? ওঃ হো। প্রথমেই যদি বলতাম, তা হলে আপনি হয়তো এতটা অসুখী হতেন না, বরং খুশিই হতেন। ঠিক আছে, আর দেরি নয়। আসুন, সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন পাঁচকড়িবাবু, ইনি দীনেন্দ্রবাবু আর ইনি শরদিন্দুবাবু...।’

‘পাঁচকড়িবাবু, দীনেন্দ্রবাবু, শরদিন্দুবাবু!’

‘হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী। কেন, আপনি জানেন না, রহস্য-সাহিত্যিকরা মারা গেলে স্বর্গে আসেন!’

রক্তের দাগ ছিল

নিজের টেবিলে বসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে 'শার্লক হোমস অমনিবাস' পড়ছিল দশরথ সামন্ত। সারাটা জীবন ধরে সে ছিল তদন্ত-পাগল কনস্টেবল। বছরপাঁচেক হল রিটায়ার করেছে। রিটায়ার করার সময়েও সে প্রায়-কনস্টেবলই ছিল। কারণ, প্রোমোশন সে নেয়নি —নিলে সরাসরি তদন্তের জায়গা থেকে তাকে হয়তো সরে যেতে হত।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর হঠাৎই একটা ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দশরথের চোখে পড়ে। 'প্রাইভেট আই ডট কম' নামের ডিটেকটিভ এজেন্সি একজন বয়স্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইছে। তদন্তের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়।

একমুহূর্তও দেরি না-করে দশরথ সেখানে অ্যাপ্লাই করেছিল এবং ইন্টারভিউর ডাক পেয়েছিল।

ইন্টারভিউ নিয়েছিল এজেন্সির মালিক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। বছর তিরিশ-বত্তিরিশের টগবগে যুবক। লম্বা ফরসা চেহারা। মুখে কোথায় যেন একটা বেপরোয়া ভাব লুকিয়ে রয়েছে।

ইন্টারভিউর সময় দশরথ কাষ্ঠ হেসে ইন্দ্রজিৎকে বলেছিল, 'সময়মতো প্রোমোশন নিলে আমি স্যার পুলিশ কমিশনার হয়ে রিটায়ার করতে পারতাম—কিন্তু করিনি। কারণ, ওই যে বললাম, ডায়রেক্ট তদন্তের প্রতি দুর্দান্ত টান। ঠিক যেন সন্তানের প্রতি মায়ের টান! তদন্ত—মানে, ইনভেস্টিগেশান—ছাড়া আমি একটা মোমেন্টও থাকতে পারি না। তদন্ত আমার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ।'

ইন্দ্রজিৎ বেঁটেখাটো বৃদ্ধ মানুষটাকে দেখছিল। কাঁচাপাকা চুল, তোবড়ানো গাল, কালো চওড়া ফ্রেমের চশমা, কপালের বাঁ-দিকে একটা ছোট আঁচিল। বয়েসের ভারে চোখের রং খানিকটা ঘোলাটে হয়ে এলেও তা থেকে চনমনে ভাব উধাও হয়ে যায়নি। তা ছাড়া মাইনে খুব কম শুনেও মানুষটির উৎসাহে বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়েনি।

'আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিটেকটিভের পোস্টে নিলে আপনি আর-একটা ব্যাপারে মোস্ট বেনিফিটেড হবেন, স্যার। প্রচুর রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনি আমি গুলে খেয়েছি। আর গত পঞ্চাশ বছর ধরে শার্লক হোমস আমার গুরু, আমার দেবতা। আমার এই এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আপনার তদন্তের কাজে হেভি হেল্প করবে, স্যার। যেমন ধরুন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, পাঁচকড়ি দে থেকে শুরু করে আজকের তপজ্যোতি বর্মন, হরিহর ধর পর্যন্ত সবার লেখাই আমার নখদর্পণে। যখনই দরকার তখনই আমার কাছ থেকে রেডি রেফারেন্স পেয়ে যাবেন। পাঁচকড়ি দে-র "নীলবসনা সুন্দরী" কি আপনি পড়েছেন, স্যার? সেখানে...।'

দশরথের পাঁচালি শুনতে-শুনতে ইন্দ্রজিতের মাথা ঘুরতে শুরু করেছিল। ও কোনওরকমে বৃদ্ধ মানুষটিকে থামিয়ে বিদায় দিয়েছে। এবং পরে ঠান্ডা মাথায় অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রাইভেট আই ডট কম-এর অফিস ম্যাডান স্ট্রিটে—দুটি মাঝারি মাপের ঘর নিয়ে আধুনিকভাবে সাজানো।

বাইরের ঘরটা রিসেপশান গোছের। একপাশে বড় টেবিলে পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে জিনি রায়। ও একইসঙ্গে রিসেপশানিস্ট, টাইপিস্ট এবং ইন্দ্রজিতের সেক্রেটারি। বয়েস বাইশ-চব্বিশ হবে। ফরসা রোগা চেহারা। মুখের তুলনায় চোখ দুটো বেশ বড় মাপের। ঠোঁটে গাঢ় চকোলেট রঙের লিপস্টিক। চোখের পাতার ওপরে হালকা রঙের আস্তর। আর পারফিউমের সুগন্ধ ওকে চাদরের মতো জড়িয়ে রয়েছে।

ভগবান জিনিকে রূপ দিয়েছেন—তবে বুদ্ধির বিনিময়ে। কিন্তু তাতে জিনিস কোনওরকম দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। ও সবসময় নিজের সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত। অফিস ছুটির পর ওকে দিয়ে একটি মিনিটও ওভারটাইম করানো যায় না। হাবভাব দেখে মনে হয়, বিশাল বড়লোকের মেয়ে—চাকরি করছে নেহাতই সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু আসলে তা নয়।

জিনির মুখোমুখি চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছে দশরথ। 'শার্লক হোমস অমনিবাস' পড়তে-পড়তে ওর বারবার হাই উঠছিল বিনা কাজে এভাবে বসে থাকা যায়! সক্রিয় তদন্তের কোনও সুযোগ নেই। শুধু বিশ্রাম। মাইনেটাই কি সব!

দশরথ বই বন্ধ করে একটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ল্যামিনেট করে বাঁধানো একটা ফটো দ্বিতীয় ড্রয়ার থেকে বের করল। ফটোটা টেবিলে সুন্দরভাবে দাঁড় করাল।

দশরথের দেবতা শার্লক হোমসের ছবি।

দশরথ ধূপকাঠি-দেশলাই বের করল ড্রয়ার থেকে। তারপর ধূপ জ্বেলে শার্লক হোমসকে আরতি করল বারকয়েক। কষ্ট করে একটা হাই চেপে বলল আপনমনেই, 'হে শার্লক হোমস, যে করে হোক একটা কেস এনে কোম্পানিটার বউনি করিয়ে দাও, বাবা।'

জিনি একটা ছোট আয়না নিয়ে নিজের মেকাপ ঠিক করায় ব্যস্ত ছিল। একবার আড়চোখে দশরথকে দেখল। তারপর ছোট একটা 'হুঁঃ' শব্দ করে নিজের কাজে মন দিল।

দশরথের আরতি শেষ হতে-না-হতেই ভেতরের ঘরের কাচের দরজা খুলে গেল। বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। কপালে ভাঁজ।

জিনির দিকে একপলক তাকিয়ে দশরথের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল ইন্দ্রজিৎ, বলল, 'দশরথদা, আজকের দিনটা গেলে চোদ্দোদিন হবে। চোদ্দোদিন হল অফিস খুলেছি, একটা কেসের খবর নেই! শুধু শো-কেস হয়ে বসে আছি! বাবা প্রথমেই বলেছিল, আমার পয়সা নষ্ট কর ক্ষতি নেই। তবে তোর ওই ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে নষ্ট করিস না। এখন বোঝো ঠ্যালা—।'

দশরথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'চিন্তা করবেন না, স্যার। আজ গুরুকে মন-প্রাণ দিয়ে হেভি ডেকেছি। আজ একটা-না-একটা কেস আসবেই।' ঘরের ডিজিটাল ক্লকের দিকে একবার তাকিয়ে, 'এখনও তো বারোটা বাজেনি—।'

'না, বারোটা বেজে গেছে—আমার কোম্পানির।' বিরক্তভাবে সিগারেটের টান দিল ইন্দ্রজিৎ, 'কী করে তোমাদের মাইনে দেব কে জানে!'

জিনি এতক্ষণ সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ওদের কথাবার্তায় বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু ইন্দ্রজিতের শেষ কথাটা কানে যেতেই চট করে ফিরে তাকাল ওর দিকে। করুণ অথচ আদুরে গলায় বলল, 'মাইনে হবে না! কী বলছেন, স্যার!'

ইন্দ্রজিৎ তখন স্বপ্ন-দেখার চোখে ঘরের একটা কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, 'আমাদের কোম্পানি দাঁড়াবেই। দরকার শুধু একটা কেস। জাস্ট একটা কেস।'

দশরথ শার্লক হোমসের ফটোর সামনে হাতজোড় করে বলল, 'প্লিজ, জাস্ট ওয়ান কেস—।'

ইন্দ্রজিৎ সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'তোমার গুরুর বাড়ির ঠিকানাটা কী ছিল মনে আছে, দশরথদা?'

'মনে নেই আবার!' দাঁত দেখিয়ে একগাল হাসল দশরথ: '২২১বি, বেকার স্ট্রিট।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'ঠিক বলেছ। আমরা একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। বেকার—স্ট্রিট বেগার।'

দশরথ জ্বলন্ত ধূপকাঠিটা পাশেই একটা জানলার তাকে ধূপদানিতে বসিয়ে দিয়েছিল। ইন্দ্রজিতের শেষ কথাটা শুনেই হাত বাড়িয়ে ধূপদানিটা নিল। আর-একদফা ঘুরিয়ে দিল শার্লক হোমসের ফটোর সামনে। তারপর চোখে-মুখে তীব্র ভক্তি প্রকাশ করে কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'প্রভু, একটা কেস—জাস্ট একটা। তা হলেই...।'

ভেতরের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

ইন্দ্রজিৎ প্রায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

'হ্যালো—।'

'হ্যালো, প্রাইভেট আই ডট কম?' ভারী গলায় কেউ জানতে চাইল।

'ইয়েস—।'

'আমার নাম মহেন্দ্র সেন। সল্ট লেকে থাকি। কাগজে আপনাদের অ্যাড দেখেছি। তাই একটা জরুরি ব্যাপারে ফোন করছি। আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল। সেটা আপনাদের অফিসে গিয়ে বলতে চাই। বুঝতেই পারছেন, সিক্রেসিটা খুব ইমপরট্যান্ট।'

'অবশ্যই, অবশ্যই! আপনি এখনই আমাদের অফিসে চলে আসুন। ঠিকানাটা জানেন তো? পাঁচ নম্বর ম্যাডান স্ট্রিট। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে। আমরা আপনার জন্যে ওয়েট করছি।'

'আপনি কে কথা বলছেন জানতে পারি কি?'

'আমি এই কোম্পানির চিফ ডিটেকটিভ—ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী।'

মহেন্দ্র সেন 'ও. কে.' বলে লাইন কেটে দিলেন।

ইন্দ্রজিতের বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছিল। হাতের নিভে যাওয়া সিগারেটটা ও টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল। দু-হাত মুঠো করে ঝাঁকিয়ে উল্লাসের ভঙ্গি করল—ব্যাটসম্যানকে বোল্ড আউট করার পর বোলাররা যেমন করে। তারপর প্রায় নাচতে-নাচতে চলে এল বাইরের ঘরে। উত্তেজিতভাবে বলল, 'জিনি, দশরথদা—চটপট সবকিছু

সাজিয়ে-গুছিয়ে নাও। এক্ষুনি আমাদের প্রথম ক্লায়েন্ট আসছেন! কথা শুনে মনে হল লাখপতি কি কোটিপতি হবে।' আনন্দে হাতে হাত ঘষল ইন্দ্রজিৎ 'আমাদের কোম্পানির প্রথম কেস।'

দশরথ একবার চোখ তুলে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাল। একবার চোখ বুজল। বোধহয় কাউকে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর শার্লক হোমসের ফটোটাকে প্রায় গড় হয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করল।

জিনি নিজের টেবিলটা চটপটে হাতে গুছিয়ে নিল। কম্পিউটারের কিবোর্ডে খটাখট করে কয়েকটা বোতাম টিপল। তারপর নিজের মেকাপ মেরামত করতে শুরু করল।

দশরথ শার্লক হোমসের ফটোটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলল। টেবিলটা টিপটিপ করে সাজিয়ে নিল। তারপর নিজের পোশাকটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গুছিয়ে বসল।

ইন্দ্রজিৎ ঢুকে গেল ভেতরের ঘরে। নিজের গদিওয়ালা চেয়ারে বসে নতুন একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর বিষয়ে লেখা একটা মোটা ইংরেজি বই নিয়ে পড়তে শুরু করল।

প্রাইভেট আই ডট কম-এর তিনজনেই প্রথম ক্লায়েন্টের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সল্ট লেকে চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে চোখ-ধাঁধানো বাড়ি বলতে একটাই—'সেন কটেজ।' স্যান্ড স্টোন আর গ্রানাইট দিয়ে আধুনিক ধাঁচে তৈরি তিনতলা বাড়ি। দরজা-জানলায় মেহগনি কাঠ আর টিন্টেড গ্লাস।

ইন্দ্রজিতের রানি-রং মারুতি ভ্যান বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ঠিক বিকেল চারটেয়। গাড়ি থেকে নামল ইন্দ্রজিৎ, জিনি, আর দশরথ।

মারুতি গাড়ির জানলার কাচে, নিজের ছায়া দেখছিল জিনি, মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল। হঠাৎই বাড়িটার দিকে চোখ পড়তে ও একেবারে হতবাক হয়ে গেল। ওর ঠোঁট চিরে আবছাভাবে বেরিয়ে এল : 'ফ্যানট্যাস্টিক!'

দশরথ হেসে বলল, 'এই অট্টালিকা যদি কটেজ হয়, স্যার, তা হলে হিমালয়কে আপনি উইয়ের ঢিবি বলতে পারেন।'

ইন্দ্রজিৎ সামান্য মাথা নাড়ল। চোখ থেকে 'রে বান' সানগ্লাসটা খুলে পকেটে রাখল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দশরথদা, যা-যা বলেছি মনে আছে তো! তুমি চোখ-কান খোলা রাখবে, কোনও কিছু যেন নজর এড়িয়ে না যায়।' ইন্দ্রজিৎ ঘুরে তাকাল জিনির দিকে : 'জিনি, আমি যখন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, তখন তুমি শর্টহ্যান্ডে নোট নিয়ে যাবে। কোনও কথা যেন বাদ না যায়।'

জিনি তখনও মুগ্ধ চোখে বাড়িটা দেখছিল। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ও বলল, 'এটা বাড়ি নয়—স্বপ্ন। এরকম একটা স্বপ্নের বাড়িতে এরকম অঘটন ঘটেছে এটা ভাবা যায় না।'

জিনি একটু বেশিরকম স্বপ্ন দেখে—বৈভবের স্বপ্ন। এ-ধরনের স্বপ্ন দেখা বোধহয় ওর শখ।

দশরথ চটপটে গলায় বলল, 'চলুন, স্যার, আমরা তদন্তে নেমে পড়ি। শুধু-শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই—।'

পাথর বসানো পথ ধরে বাড়ির সদর দরজার দিকে এগোতে-এগোতে ইন্দ্রজিতের কয়েক ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ছিল। যখন মহেন্দ্র সেন ওর ম্যাডান স্ট্রিটের অফিসে এসে হাজির হয়েছিলেন।

মহেন্দ্রকে দেখেই ইন্দ্রজিতের মনে হল, উনি লাখপতি নন—কোটিপতি।

মহেন্দ্রর চেহারা মোটাসোটা, পরনে ধবধবে পাঞ্জাবি আর সরু পাজামা। গা থেকে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। ডানহাতের চার আঙুলে মোটা-মোটা চারটে সোনার আংটি। তাতে যথাক্রমে হীরা, চুনি ও পান্না বসানো—চার নম্বর পাথরটা ইন্দ্রজিৎ চিনতে পারল না।

মহেন্দ্রর গলায় সোনার ডগ চেন। বাঁহাতের বাহুতে সোনার তাবিজ। তাতেও বড় মাপের তিনটে পাথর।

মহেন্দ্রর বয়স খুব বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ হবে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা—সোনারও হতে পারে। মাথায় শতকরা সত্তরভাগই টাক। থলথলে মুখে ঘাম। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামান্য হাঁফাচ্ছেন।

ইন্দ্রজিতের অফিসে ঢুকেই মহেন্দ্র জরিপ-নজরে সবকিছু মেপে নিচ্ছিলেন। বোধহয় বুঝতে চাইছিলেন প্রাইভেট আই ডট কম ওঁর সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি না।

ইন্দ্রজিতের মুখোমুখি চেয়ারে বসে আরামের একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করলেন মহেন্দ্র। তারপর পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেট বের করলেন—নিজে একটা নিলেন, ইন্দ্রজিৎকেও একটা দিলেন। সুরেলা শব্দ তোলা বিদেশি লাইটার দিয়ে দুজনের সিগারেট ধরালেন।

ইন্দ্রজিৎ ইন্টারকমে জিনিকে ডেকে নিল। জিনি শর্টহ্যান্ডের খাতা আর পেনসিল নিয়ে তৈরি হয়ে বসল। দশরথ তখন দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে। তদন্তের কৌতূহল ওকে সিটে বসে থাকতে দেয়নি।

মহেন্দ্র যেন একটু সময় নিয়ে বলতে শুরু করলেন।

'ইন্দ্রজিৎবাবু, আমার বাবা জিতেন্দ্রনাথ সেন বেশ বড়লোক। মানে, লাস্ট ফিনানশিয়াল ইয়ারে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছি বারো কোটি টাকা। আমাদের কোম্পানির নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন—"সেন কেমিক্যাল প্রোডাক্টস"।'

ইন্দ্রজিৎ মাথা নাড়ল—নামটা ও শুনেছে। শুধু ও কেন, পশ্চিমবঙ্গের সবাই হয়তো শুনে থাকবে। 'সেন কেমিক্যাল প্রোডাক্টস' দারুণ নামজাদা কোম্পানি।

'আপনাদের প্রবলেমটা কী হয়েছে একটু বলবেন?'

'হ্যাঁ—বলছি। ব্যাকগ্রাউন্ডটা না-বললে প্রবলেমটার গুরুত্ব বোঝা যাবে না।' একটু থেমে মহেন্দ্র সেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের ফ্যাক্টরি দুটো—গড়িয়ায়, আর সোনারপুরে। বেশ বড় মাপের ফ্যাক্টরিই বলা যায়। বাবা-ই সবকিছু দেখেন—মানে, দেখতেন। তা ছাড়া লোকজন তো আছেই। আমরা খুব একটা সময় দিতে পারি না।'

'আমরা মানে!'

ছোট করে দুবার কাশলেন মহেন্দ্র। তারপর বললেন, 'আমরা মানে আমি, আমার ছোটভাই সুরেন্দ্র, আর ছোটবোন নবনীতা। আমরা আমাদের কাজকর্ম, শখ-আহ্লাদ নিয়ে থাকি। সে যাকগে, যা বলছিলাম—।'

মহেন্দ্রকে বাধা দিল ইন্দ্রজিৎ: 'একটু আগে আপনি বললেন আপনার বাবা সবকিছু দেখেন—মানে, দেখতেন। "দেখতেন" বলছেন কেন? এখন কি আর উনি দেখেন না?'

'না—কারণ, পাঁচদিন আগে উনি কিডন্যাপড হয়েছেন।'

'কিডন্যাপড হয়েছেন!'

'হ্যাঁ। গত সোমবার ভোররাতে একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘর দোতলায়। আর বাবা একতলায় বড় একটা ঘরে থাকতেন। আমি সিঁড়ির কাছে আসামাত্রই দেখতে পাই কয়েকটা কালো ছায়া কিছু একটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে উঠতেই তাদের মধ্যে একজন আমার দিকে রিভলভার তুলে শাসায়। বলে, "চেঁচালে বা পুলিশে খবর দিলে আপনার বাবাকে খতম করে দেব। পরে আপনাকে ফোন করব। যান, ঘরে চলে যান। গিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকুন। সকালে কেউ জিগ্যেস করলে বলবেন জিতেনবাবু কোম্পানির কাজে ট্যুরে গেছেন। যা-যা বললাম মনে থাকে যেন!

'আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। সেই অবস্থাতেই কোনওরকমে ঘরে ফিরে গেছি।'

'বাড়ির সবাই খবরটা জেনেছে?' ইন্দ্রজিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল।

'হ্যাঁ—সকালে সুরেন আর নবনীতা জেনেছে। আর পরানদাও জেনেছে।'

'পরানদা কে?'

'বাবার আমলের কাজের লোক। বয়েসে বাবার চেয়েও অনেক বড়। আমাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।'

'কিডন্যাপারদের কোনও ফোন এসেছিল? টাকা-পয়সা কিছু চেয়েছে?'

'হ্যাঁ, সোমবার সকালে ওরা ফোন করেছিল। পুলিশে কিছু জানাতে বারণ করেছে। তবে টাকা-পয়সা এখনও কিছু চায়নি—বলেছে, পরে জানাবে। তারপর থেকে আর কোনও ফোন আসেনি।'

ইন্দ্রজিৎ কপালে ভাঁজ ফেলে চিন্তা করছিল। মহেন্দ্র সেন আশা-ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎই খেয়াল হওয়াতে হাতের নিভে যাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি আজ বিকেলে আমাদের বাড়িতে একবার আসুন। স্পটটা একবার দেখে নিন। তা ছাড়া আমার কতকগুলো পারসোনাল কথাও বলার আছে। আমাকে লেখা বাবার একটা চিঠিও আপনাকে দেখাব। আর তার ওপর রয়েছে অনিমেষ সরকারের সমস্যা। বাবার ছোটবেলার বন্ধু—উনি গত পরশু আমাদের সল্ট লেকের বাড়িতে এসে উঠেছেন। বাবা নেই, অথচ...সে এক বিরাট সমস্যা—।'

'তার মানে! আবার কীসের সমস্যা?'

'ব্যাপারগুলো এখানে ঠিক ডিসকাস করা যাবে না। আপনি প্লিজ আমাদের বাড়িতে আসুন—তখন সব খুলে বলব।'

'আমি একা নয়—আমরা তিনজনে আজ বিকেল চারটের সময় আপনাদের বাড়িতে যাব।'

তাই এসেছে ইন্দ্রজিৎ—সঙ্গে জিনি আর দশরথ।

কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলল। একজন বয়স্ক কাজের লোক। বোধহয় পরান—ভাবল ইন্দ্রজিৎ।

জমকালো ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেসে ওদের আপ্যায়ন করে বসাল পরান।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হাজির হলেন মহেন্দ্র। হেসে বললেন, 'আপনারা এসেছেন—ভীষণ খুশি হয়েছি।'

ইন্দ্রজিৎ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছিল। এরকম ঘর হিন্দি ছবিতেই দেখা যায়। আসবাবপত্রও ঘরের সঙ্গে মানানসই। দূরে, ঘরের শেষ প্রান্ত থেকে, সুন্দর বাঁক নেওয়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার দিকে।

'আপনারা বসুন—আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।' মহেন্দ্র সৌজন্য করে বললেন।

'না, মিস্টার সেন। আগে বরং একটু কাজ সেরে নিই।' ইন্দ্রজিৎ গা-ডুবে-যাওয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল: 'চলুন, আপনার বাবার ঘরটা আগে দেখি—।'

জিনিকে চোখের ইশারা করে পা বাড়াল ইন্দ্রজিৎ। জিনি ওর শর্টহ্যান্ড খাতা আর পেনসিল নিয়ে ইন্দ্রজিতের ছায়া হয়ে গেল।

মহেন্দ্র ইন্দ্রজিৎদের পথ দেখিয়ে দক্ষিণদিকে নিয়ে গেলেন। সেখানেই জিতেন্দ্রনাথের শোওয়ার ঘর। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে চাপা গলায় একান্তে কিছু কথাবার্তা বলছিল। ইন্দ্রজিৎদের দেখে চট করে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলল।

মহেন্দ্র সেন আলাপ করিয়ে দিলেন।

'আমার ছোট ভাই, সুরেন—আর বোন, নবনীতা। ইনি ডিটেকটিভ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। বাবার কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে আমি ওঁর হেল্প চেয়েছি। তোদের তো আগেই বলেছিলাম...।'

নবনীতা হঠাৎই খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে ওর উদ্ধত শরীরে নানারকম ভাঙচুর হতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বেশ কষ্ট করে ও বলল, 'বড়দা, তোমার এই গুডি-গুডি ইমেজটা এবার ছাড়ো তো! ভেতরে-ভেতরে তো আমাদেরই মতো তেষ্টায় মরে যাচ্ছ। অথচ মুখে একটা বেড়াল-তপস্বীগোছের ভাব ফুটিয়ে রেখেছ। নাঃ, সিনেমা-লাইনটাই তোমার আসল লাইন ছিল। কেন যে ফর নাথিং একটার-পর-একটা নতুন-নতুন বিজনেস ট্রাই করে যাচ্ছ কে জানে!'

'নীতা! ইন্দ্রজিৎবাবু আমাদের গেস্ট। ওঁর সামনে তুমি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ! বাবা এখন কীরকম কষ্টের মধ্যে কী অবস্থায় আছে কিছুই জানি না। যে করে হোক বাবাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের প্রথম কর্তব্য—।'

'কর্তব্য!' আবার একদফা কাচের-চুড়ি-ভাঙা হাসি। সে-হাসির মধ্যে শঙ্খচূড়ের বিষ ছিল। তারপর হাসি থামতেই: 'জানি, বড়দা, আসল কথাটা বলতে তোমার ভদ্রতায় আটকাচ্ছে। ও. কে., আমি বলে দিচ্ছি—' ইন্দ্রজিতের দিকে ঘুরল নবনীতা: 'ওয়েল

মিস্টার শার্লক হোমস, আসল ঘটনা হল বাবাকে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা দরকার। নইলে টাকার তেষ্টায় আমরা মরে যাব—তিনজনেই—বড়দা, ছোড়দা, এবং আমি। বাবা ছাড়া আমাদের টাকার জোগান দেবে কে! কী ছোড়দা, কিছু ভুল বলছি?' সুরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে নবনীতা জানতে চাইল। তারপর আবার ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ করে: 'পুলিশের ওপরে আমাদের কনফিডেন্স নেই—তাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এবার দেখুন চেষ্টা করে, বাবাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না! তবে যা করার চটপট করুন—নইলে আমাদের যা ড্রাই অবস্থা! মরুভূমির চেয়েও খারাপ...।'

ইন্দ্রজিৎ বেশ খুঁটিয়ে নবনীতাকে দেখছিল। জিনিও। তবে ও বোধহয় নবনীতার সাজগোজ লক্ষ করছিল।

নবনীতার ফরসা সুন্দর চেহারা। টানা-টানা চোখ, শ্যাম্পু করা চুল। চোখের কোলে অল্পবিস্তর দ্রুত জীবনযাপনের ছাপ। পরনে দামি চুড়িদার। গলায় সোনার চেন, কানে সাদা পাথর বসানো দুল—বোধহয় হিরেই হবে। এইসব জাতের বড়লোকেরা কখনও নকল গয়না পরে না। শুধু নকল জীবনের পিছনে ছোটে।

'ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে আমি পরে ডিটেইলে কথা বলব। আগে জিতেনবাবুর ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ইন্দ্রজিতের কথার উত্তরে সুন্দর করে হাসল নবনীতা। বলল, 'আপনার সঙ্গে ডি-টে-ই-লে কথা বলতে আমার বেশ ভালো লাগবে। য়ু লুক স্মার্ট। আপনাকে ডিটেকটিভ হিসেবে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। টা-টা...।' হাত তুলে আঙুল নাড়ল নবনীতা: 'আমি দোতলায় আছি—দরকার হলেই ডাকবেন। আই উড লাভ টু কাম।'

মহেন্দ্র মুখ-চোখ লাল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবনীতা চলে যাওয়ার পর চাপা গলায় শুধু বললেন, 'অসভ্য! মডেলিং-এর লাইনে আর কত ভদ্রতা শিখবে! অথচ ওকে নিয়ে মায়ের অনেক আশা ছিল...।'

'আপনাদের মা-কে দেখছি না—।' ইন্দ্রজিৎ বলল।

'আমাদের মা নেই। প্রায় পনেরো বছর আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

সুরেন্দ্র এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখন একটু ফাঁক পেয়ে বললেন, 'আমাকে কি এখন থাকতে হবে, ইন্দ্রজিৎবাবু?

ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে সুরেন্দ্রর দিকে তাকাল। কারণ, গলার স্বর বেশ মেয়েলি। হয়তো সেইজন্যই কম কথা বলেন।

'না, আপনি এখন যেতে পারেন—আমি পরে ডেকে নেব।'

সুরেন্দ্র চলে যেতেই মহেন্দ্রকে সঙ্গে করে ঘরের ভেতরে পা রাখল ইন্দ্রজিৎ।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা বিশাল মাপের একটা অয়েল পেইন্টিং। টকটকে সিঁদুর পরা এক মাঝবয়েসি মহিলা। ছবিটা মালা-চন্দনে সাজানো।

'আমার মা—।' মহেন্দ্র বললেন।

ইন্দ্রজিৎ এবার ঘরটার দিকে মনোযোগ দিল।

বিলাসবহুলভাবে সাজানো প্রকাণ্ড ঘর। ভোমরার শব্দ করে এয়ারকুলার চলছে দেওয়ালে বিদেশি কোয়ার্ৎজ ঘড়ি। পশ্চিমের রোদ একটা কাচের জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে

মার্বেল পাথরের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরের বাঁদিকে ঘেঁষে কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের খাট—তাতে ধবধবে সাদা বিছানা।

সেদিকে আনমনাভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আচমকা মহেন্দ্রর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ: 'আপনার ছোটবোন যা বলে গেল, সে-কথা কি ঠিক? জিতেনবাবু না থাকায় আপনারা টাকার অভাবে কাহিল হয়ে পড়েছেন?

মহেন্দ্র ইতস্তত করতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ এয়ারকুলার অফ করে দিল। একটা জানলার পাল্লা সামান্য খুলে দিল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটে বের করে একটা সিগারেট ধরাল। মহেন্দ্রকে অফার করল, কিন্তু তিনি আলতো করে বললেন, 'এখন না—পরে।'

'বলুন, নবনীতা কি ঠিক বলেছেন? আমার কাছে লুকোনোর চেষ্টা করবেন না।' ঘরে এয়ারকুলারের ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও মহেন্দ্র পকেট থেকে রুমাল বের করে কাল্পনিক ঘাম মুছলেন। তারপর খানিকটা সময় নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ—ঠিকই বলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলেন। তাতে আমরা—মানে, আমি, সুরেন্দ্র আর নবনীতা—মাসে মাসে একটা ফিক্সড টাকা পাব। তার বাইরে টাকার দরকার পড়লে সেটা বাবার কাছে চাইতে হবে। সেই এগ্রিমেন্টে আমরা সই করেছিলাম—না-করে উপায় ছিল না।'

মহেন্দ্র চুপ করে গেলেন। দুটো হাত সামনে জড়ো করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রজিৎ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখা শেষ করল। একটা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের রাস্তাটা একবার দেখল। তারপর ঘুরে তাকাল মহেন্দ্রর দিকে: 'আপনার বাবার ওপরে কারও রাগ ছিল?'

'মনে তো হয় না। তবে বিজনেসের ব্যাপারে কোনও জেলাসির ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।'

'হুঁ। আসলে আমি কিডন্যাপিং-এর মোটিভটা বুঝতে চাইছি। কিডন্যাপাররা এখনও টাকা চায়নি বলে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।' আচ্ছা, কিডন্যাপিং-এর সময় কি ধস্তাধস্তি হয়েছিল?'

'দোতলা থেকে আমি সেরকম কিছু টের পাইনি। তবে আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—বাবার বিছানার চাদরে বেশ খানিকটা রক্তের দাগ ছিল।'

'রক্তের দাগ!' ইন্দ্রজিতের শরীরটা চাবুকের মতো টান-টান হয়ে গেল: 'কোথায় সে চাদরটা? দেখি—।'

'দাঁড়ান, নিয়ে আসছি—।' বলে মহেন্দ্র চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ সিগারেট খেতে-খেতে ভাবছিল। কোটিপতি জিতেন্দ্রনাথের তিন ছেলেমেয়ে। তিনজনেই বোধহয় বড়লোকি চালে আয়েস করতে শিখেছেন। কেউই বিয়ে-থা করেননি। অথচ সবাই খরচ করতে ভালোবাসেন। বাবা কিডন্যাপড হয়েছেন বলে কারওরই তেমন দুশ্চিন্তা নেই। একমাত্র দুশ্চিন্তা খরচের টাকা পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে। নবনীতার কথাগুলো হয়তো রূঢ়, কিন্তু মনে হয় না ও একবর্ণও মিথ্যে বলেছে।

সিগারেটের শেষ-হয়ে-আসা টুকরোটা ইন্দ্রজিৎ জানলা দিয়ে ছুড়ে দিল বাইরে।

এমনসময় মহেন্দ্র চাদর নিয়ে ফিরে এলেন—সঙ্গে দশরথ ও পরান।

দশরথ ইন্দ্রজিতের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'স্যার, আমি একটু বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখছিলাম—মানে, ইনভেস্টিগেট করছিলাম আর কি!' আড়চোখে সন্দেহ এবং আশঙ্কার নজরে মহেন্দ্রকে কয়েকবার দেখল দশরথ: 'আপনি একা একটু পরানের সঙ্গে কথা বলুন। ওর কাছে প্রচুর মেটিরিয়াল আছে। ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল তাঁর "অপরাধ-বিজ্ঞান" বইতে বলেছিলেন, ইনভেস্টিগেশানে বাড়ির কাজের লোকদের রোল খুব ভাইটাল। আমি আপনার হয়ে পরানকে একটু-আধটু কোশ্চেন করছিলাম...।'

ইন্দ্রজিৎ হেসে জিগ্যেস করল, "অপরাধ-বিজ্ঞান" তুমি পড়েছ, দশরথদা?'

'হ্যাঁ, মানে, ছোটবেলায় অল্প-অল্প পড়েছিলাম।'

ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রকে বলল, 'মিস্টার সেন, চাদরটা দিন—।'

চাদরটা নিয়ে বিছানায় রাখল ইন্দ্রজিৎ। উলটেপালটে রক্তের দাগ লাগা জায়গাটা বের করল।

বেশ বড় একটা রক্তের ছোপ। তার খুব কাছে ছোট মাপের আরও দুটো ছোপ।

ইন্দ্রজিৎ চাদরটা ভাঁজ করে দশরথের হাতে দিল: 'এটা সাবধানে রাখো, দশরথদা। এটা ল্যাবে পাঠাতে হবে।'

যেন লাখ টাকা দামের একটা শৌখিন কাচের গ্লাস অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করছে, এইরকম ভঙ্গিতে চাদরটা গ্রহণ করল দশরথ। ওর কাছে এটা লাখ টাকার সূত্র।

চাদরটার দিকে মুগ্ধ অথচ সাবধানি চোখে তাকিয়ে ও জানতে চাইল, 'আমি কি এখন যেতে পারি, স্যার?'

'হ্যাঁ, যাও—জিনির কাছে বোসো গিয়ে।'

দড়ির ওপর পা ফেলে সন্তর্পণে হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে দশরথ চলে গেল।

ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রকে বলল, 'আপনি জিতেনবাবুর লেখা একটা চিঠি আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন। আর অনিমেষ সরকার নামে একজনের কথা বলছিলেন...অনিমেষবাবু এখন কোথায়? বাড়িতে আছেন?'

'না, উনি একটু বেরিয়েছেন। এলে আপনাকে খবর দেব।'

'ঠিক আছে। ও-ব্যাপারে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। তার আগে পরানের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

অদ্ভুত চোখে পরানের দিকে একপলক তাকিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে মহেন্দ্র চলে গেলেন।

জিতেন্দ্রনাথের ঘরের ডানদিকে একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার পাতা ছিল। ইন্দ্রজিৎ সেখানে গিয়ে বসল—পরানকেও বসতে বলল।

লম্বা, রোগা, তোবড়ানো গাল, গালে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। দেখেই বোঝা যায়, পরানের ওপর দিয়ে বহু ঝড়-জল বয়ে গেছে। ওর বড়-বড় চোখ দুটোয় কেমন এক সতর্ক ছাপ ছিল।

ওর কাছে বাড়ির লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইল ইন্দ্রজিৎ।

পরান খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তারপর মুখ খুলল। জিতেন্দ্রনাথের তিন ছেলেমেয়ে সম্পর্কে ওর মতন করে বলল।

ছোড়দি সিনেমা-লাইনে কীসব করে। মাঝে-মাঝে টি-ভি.-র বিজ্ঞাপনে ছোড়দিকে দেখায়। দিন-রাত্তির শুধু সাজগোজ করছে আর দুনিয়ার ছেলেবন্ধুর সঙ্গে রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরছে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়। অকে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। প্রত্যেকবারই বড়বাবু টাকা দিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট সামলেছে। ছোড়দির ছোট-বড় জ্ঞান নেই। যখন যা মুখে আসে বলে দেয়। বড়বাবুকে দিন-রাত টাকার জন্য বিরক্ত করত। এখন বড়বাবু নেই —তাই জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। তা ছাড়া বড়বাবুর বন্ধু অনিমেষবাবু দারুণ কড়া ধাতের মানুষ। এখন ওনার দাপটে তিন ভাই-বোন সবসময় কাঁচুমাচু হয়ে থাকে।

ছোড়দা গানবাজনা নিয়ে থাকে। প্রায়ই বাড়িতে গানবাজনার আসর বসিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। বড়বাবু অনেকদিন বারণ করেছে, কিন্তু ছোড়দা তাতে কান দেয়নি। বরং নানান জলসার জন্য বড়বাবুর কাছে টাকা চাইত। শুনছিলাম, কী একটা ব্যবস্থা করে নাকি তিরিশজনের দল নিয়ে ফরেনে গানবাজনা করতে যাবে। তার জন্য গত শনিবার বড়বাবুর কাছে টাকা চাইছিল। আর ছোড়দা ছোড়দির চেয়ে বড় হলেও ছোড়দিকে বেশ ভয় পায়।

বড়দা মহেন্দ্র এমনিতে খুব ভদ্র। তবে ব্যবসা করার একটা রোগ আছে। সেই কোন বয়েস থেকেই জেদ ধরেছে বাবার ব্যবসা নয়—সে নিজের হাতে গড়া ব্যবসাকে বড় করে তুলবে। বড়বাবু বহুবার বারণ করেছে, কিন্তু বড়দা নিজের জেদ থেকে সরেনি। অথচ প্রতিবারই নতুন-নতুন ব্যবসা ফাঁদার জন্য বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা চাইতেন। বড়বাবু প্রথমটা রাগারাগি করতেন বটে, কিন্তু শেষমেষ টাকা দিয়ে দিতেন। এই তো, গত শনিবারই বড়বাবুর সঙ্গে বড়দার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল—ওই টাকা নিয়েই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরান বলল, ‘শনিবার দিনটা বড়বাবুর খুব খারাপ গিয়েছে। টাকার জন্যে একের-পর-এক বিড়ম্বনা। আমি ওই জানলা দিয়ে স-ব দেখেছি। প্রথমে এল ছোড়দি, তারপর ছোড়দা—আর, সবশেষে বড়দা। তিনজনের সঙ্গেই বড়বাবুর রাগারাগি হল। কিন্তু ওই রাগারাগিই সার। ছেলেমেয়ের জন্যে অন্ধ স্নেহ—কী আর করবেন! টাকা-পয়সা সব দিয়ে-থুয়ে শেষ পর্যন্ত মায়ের ওই ফটোর সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন—’ ইশারা করে মিসেস সেনের অয়েল পেইন্টিংটার দিকে দেখাল পরান: ‘মা চলে গিয়ে বড়বাবু আরও কাবু হয়ে পড়েছেন। মা ছিলেন সত্যিকারের গৃহলক্ষ্মী। ...সবই আমাদের কপাল! মা-মরা ছেলেমেয়েগুলোর একটাও মানুষ হল না। অথচ বড়বাবুর কত আশা ছিল!’

শেষ কথা দুটো বলেই জিভ কাটল পরান। অনুনয় করে বলল, ‘আমাকে মাপ করবেন, স্যার। বাড়ির কাজের লোক হয়ে অনেক আস্পর্ধার কথা বলে ফেলেছি। এসব কথা যেন বড়দা-ছোড়দারা জানতে না পারেন। আসলে দোষ তো আমারও নয়। বড়বাবুদের সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো বছর জড়িয়ে গেছে। বড়দাদের সব আমিই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। বড়বাবু আমার সঙ্গে কক্ষনও চাকরের মতো ব্যবহার করতেন না। বরং একা-একা দুঃখ করতেন। বলতেন, পরান, তোর মা-কে আমি কথা দিয়েছিলাম ছেলেমেয়েদের আমি মানুষ করে তুলব। তুই তো জানিস, ওদের জন্যে আমি কী পরিশ্রম করেছি—কত কষ্ট সয়েছি! কিন্তু তার ফল কী হল? শূন্য! আমার বুকটা একেবারে শূন্য হয়ে গেছে রে, পরান, শূন্য হয়ে গেছে...।’

কথাগুলো বলতে-বলতে পরানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। পরনের গেঞ্জি দিয়ে চোখ মুছতে লাগল ও।

ইন্দ্রজিতের কাছে পারিবারিক ছবিটা ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের লোভের উৎপাতে অতিষ্ঠ এক স্নেহময় ধনী পিতা। সত্যি, জিতেন্দ্রনাথের জন্য বেশ কষ্ট হয়!

'শেষদিকটায় বড়বাবু প্রায়ই বলতেন, ওদেরকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। উচিত শিক্ষা। যাতে ওরা স্নেহ-ভালোবাসা ভাঙিয়ে আমার কাছ থেকে আর সুযোগ নিতে না পারে। লোভ ওদের শেষ করে দিয়েছে। ওদের কাছে সম্পর্কের আর কোনও দাম নেই।'

কথা শেষ করে হতাশায় মাথা নাড়ল পরান।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, পরান—তুমি এখন যাও। এসব কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। যদি সে-রকম বুঝি, তা হলে তোমার সঙ্গে পরে আবার কথা বলব।'

পরান উঠে দাঁড়াল। ইন্দ্রজিৎকে নমস্কার করে ধীরে-ধীরে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

কবজি উলটে ঘড়ি দেখল ইন্দ্রজিৎ। প্রায় ছ'টা বাজে। ঘরের কোয়ার্ৎজ ওয়াল-ক্লকটা পাঁচ মিনিট ফাস্ট। নাকি ইন্দ্রজিতেরটা পাঁচ মিনিট স্লো।

এমন সময় মহেন্দ্র সেন ঘরে এসে ঢুকলেন। স্মিত হেসে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি। দরকার হলে চায়ের পর আবার কাজ শুরু করবেন...।'

'চলুন—' বলে মহেন্দ্রকে অনুসরণ করে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে এসে হাজির হল ইন্দ্রজিৎ আর জিনি।

এসে দেখল দশরথ চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া শুরু করেছে।

চা খেতে-খেতে ইন্দ্রজিৎ জিতেন্দ্রনাথের একটা ফটো দেখতে চেয়েছিল। মহেন্দ্র উত্তরে বলেছেন, 'চা শেষ করে আমার ঘরে চলুন—ফটোও দেখাব, আর চিঠিটাও দেখাব।'

সুতরাং জিনি আর দশরথকে সোফায় বসিয়ে রেখে ইন্দ্রজিৎ মহেন্দ্রর সঙ্গে দোতলায় গেলেন। জিনি তখন মুগ্ধ চোখে ঘরে নানান আসবাবপত্র দেখছে। আর দশরথ এমনভাবে ড্রইং-ডাইনিং স্পেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন স্রেফ ঘ্রাণশক্তি দিয়েই সে যাবতীয় রহস্য উদঘাটন করে ফেলবে।

দোতলায় নিজের ঘরের ইন্দ্রজিৎকে বসিয়ে মহেন্দ্র একটা ডেস্কের কাছে গেলেন। একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে ইন্দ্রজিতের হাতে এনে দিলেন।

'আমাদের লেখা বাবার শেষ চিঠি। হাতের লেখাটা বাবার—আমরা চেক করে দেখেছি।'

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা খুলে দেখল।

কাগজের দু-পিঠে কালো কালি দিয়ে লেখা। বেশ বড় চিঠি।

'চিঠিটা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে, বাবা যেন জানতেন উনি আর বেশিদিন নেই। এটাকে কি আপনি সিক্সথ সেন্স বলবেন?'

‘আপনার কি ধারণা জিতেনবাবু আর বেঁচে নেই?’

‘সে-রকমই তো মনে হচ্ছে। কিডন্যাপাররা যখন আর কোনও সাড়া শব্দ করছে না...।’

ইন্দ্রজিৎ হাসল: ‘যে-হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কখনও কেউ খতম করে! হয়তো অন্য কোনও কারণে কিডন্যাপাররা চুপচাপ রয়েছে। তারপর...সময় এলে...আপনাদের ফোন করবে।’

ইন্দ্রজিৎ এবার চিঠিটা পড়তে শুরু করল। এয়ারকুলারের ঠান্ডা বাতাসে ওর বেশ শীত-শীত করছিল। মহেন্দ্রকে ওটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

চিঠিতে তিন ছেলেমেয়েকেই সম্বোধন করেছেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর লিখেছেন:

‘...পনেরো বছর আগে তোমাদের মা সীমন্তিনী যখন চলে যায় তখন আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের মানুষের মতো মানুষ করব। কিন্তু ব্যবসার চাপ, অন্ধ স্নেহ, আর তোমাদের লোভ আমার প্রতিজ্ঞা ছত্রখান করে দিয়েছে। এখন একা, গোপনে, তোমাদের মায়ের ছবির কাছে চোখের জল ফেলা ছাড়া আমার আর কোনও গতি নেই। ভুল আমারই—আমিই তোমাদের ঠিকমতো শাসন করতে পারিনি। আর শাসন করার পক্ষে এখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পিতা হিসেবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তোমাদের মানসিক অত্যাচারে আমি ক্লান্ত। আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। তাই যে-একমাত্র পথ খোলা আছে সেই পথেই আমি যাব। না, না—ভুলেও ভেব না আমি সুইসাইড করার কথা ভাবছি। আমার সেই একটিমাত্র পথ হল একটা নিষ্ঠুর গোপন কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরা। এ-কথা জানাতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই। তোমরাই এই কাজে আমাকে বাধ্য করেছ।

আমার যত ধন-সম্পত্তি, গাড়ি-বাড়ি, ফ্যাক্টরি—কোনও কিছুরই মালিকানা আমার একার নয়। আমি শতকরা মাত্র কুড়িভাগের মালিক—বাকি আশিভাগের মালিক আমার ছোটবেলার বন্ধু অনিমেষ সরকার। ওরা আরামবাগের বনেদি বড়লোক। আমার সঙ্গে ওর নিয়মিত টেলিফোনে যোগাযোগ আছে। অনিমেষ যে-কোনও মুহূর্তে এসে দলিলমাফিক ওর অংশ বুঝে নিলে আমার—এবং তোমাদের—অবস্থা হবে পথের ভিখিরির মতো। কিন্তু অনিমেষ আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। ছোটবেলায় আমরা ছিলাম হরিহর-আত্মা। তাই কখনও ও এইসব সম্পত্তিতে ওর অংশ আছে বলে ভাবেনি। ধম-কর্ম পুজো-আচ্চা নিয়েই এখন ও জীবন কাটায়। আর আমি সুখে আছি জানলেই ও সুখী।

সম্প্রতি অনিমেষকে আমি আমার মানসিক দূরবস্থার কথা জানিয়েছি। ও তাতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। লোভকে ও ঘৃণা করে। লোভীদের আরও বেশি। আমি ওকে চিঠি দিয়ে বলেছি, এখানে এসে ওর সমস্ত সম্পত্তি বুঝে নিয়ে ও যেন আমাকে মুক্তি দেয়। ও উত্তরে আসবে বলে জানিয়েছে। যে-কোনও দিন ও এসে হাজির হতে পারে। ওকে অমান্য বা অসম্মান করার সাহস আমার নেই—আশা করি তোমরাও তা করবে না। অবশ্য ও খুব কড়া ধাতের সাত্ত্বিক মানুষ। অভব্যতা দেখলে ও সঙ্গে-সঙ্গে শাস্তি দিতে পারে। তা ছাড়া এই বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা—সবকিছুরই তো ও আশিভাগের মালিক। ভাবছি, আমার কুড়ি ভাগও ওকে লিখে দিয়ে আমি মুক্তি নেব। তোমরা হয়তো মামলা করতে চাইবে...করে দেখো,অনিমেষ তার কেমন জবাব দেয়। ও কখনও অন্যায়ের কাছে কাবু হতে শেখেনি। ওকে সব দিয়ে দিলে আমি হয়তো পথের ভিখিরি হব, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই। তার বদলে অন্তত সুখ-শান্তি তো ফিরে পাব। তাই এখন আমি অনিমেষের আসার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

যদি আমার হঠাৎ করে কিছু হয়, তাই তোমাদের সব কথা জানিয়ে রাখলাম।

ইতি—

জিতেন্দ্রনাথ সেন

চিঠিটা বারদুয়েক খুঁটিয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন—উনি যেন জানতেন ওঁর খারাপ কিছু একটা হবে।'

'হ্যাঁ—সেটাই তো আপনাকে বলছিলাম। চিঠিটা বাবার বেডরুমে একটা টেবিলের ওপরে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া ছিল।'

'আপনার বাবার একটা ফটো দেখাতে পারেন?'

'একমিনিট। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।' মহেন্দ্র ফটোর জোগাড় করতে চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে কানে এল মিহি গলার কেউ গান গাইছে। সুরেন্দ্র গলা সাধছেন।

শুনে হাসি পেয়ে গেল ইন্দ্রজিতের। গানের জন্য এ-গলা তৈরি হয়নি। এ-গলা তৈরি হয়েছে শুধু দেহকে মাথার সঙ্গে জুড়ে রাখার জন্য। তবে একটা ব্যাপার ইন্দ্রজিতের ভালো লাগল। সুরেন্দ্র একজন নামী গায়িকার গাওয়া গানই প্র্যাকটিস করছেন। অর্থাৎ সুরেন্দ্র গায়ক নয়, গায়িকা হওয়ারই চেষ্টা করছেন।

মহেন্দ্র একটা অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এলেন। তার একটা পৃষ্ঠা খুলে ইন্দ্রজিৎকে দেখালেন। বছরতিনেক আগে চারদিনের ফুরসত পেয়ে জিতেন্দ্রনাথ তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফটোটা সেখানেই তোলা। আলো-ঝলমলে একটা রাস্তায় জিতেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। পিছনে দূরে একটা বাড়ির মাথায় গ্লো-সাইনে তৈরি একটা ড্রাগনের ছবি দেখা যাচ্ছে।

জিতেন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রজিৎ।

লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় বিস্তৃত টাক—শুধু দু-কানের পাশে চুলের ঝালর। চোখে চশমা নেই। নিশ্চয়ই কনট্যাক্ট লেন্স পরেছেন। প্যান্ট-শার্ট পরা জিতেন্দ্রনাথকে বেশ সুপুরুষই দেখাচ্ছে। ইন্দ্রজিতের মনে হল, সীমন্তিনী মারা যাওয়ার পর উনি অনায়াসেই বিয়ে করতে পারতেন।

ইন্দ্রজিৎ বলল, 'এই ফটোটা আর এই চিঠিটা—' হাতের চিঠিটা দেখাল ইন্দ্রজিৎ, 'আমি একটু রাখছি। কপি করে কাল বা পরশু আপনাকে ফেরত দেব।'

মহেন্দ্র রাজি হয়ে ঘাড় নাড়লেন। ফটোটা অ্যালবাম থেকে খুলে ইন্দ্রজিতের হাতে দিলেন।

'আমি এবার আপনার ভাই-বোনের সঙ্গে একটু কথা বলব...তারপর নীচে যাচ্ছি।'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে মহেন্দ্র নির্লিপ্ত মুখে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ পায়ে-পায়ে সুরেন্দ্রর ঘরে গিয়ে হাজির হল।

সুরেন্দ্রর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। এ-ঘরে এসি নেই।

বড় মাপের ঘর। ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ আর লতা মঙ্গেশকারের বাঁধানো ফটো ঝুলছে। এখানে-ওখানে হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। গোটা ঘরটায় কেমন অগোছালো ভাব। শিল্পীর ঘর বোধহয় এরকমই হয়।

ঘরের ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা শৌখিন শো-কেস। তাতে যত রাজ্যের ক্যাসেট। আর একপাশে শিভাস রিগালের বোতল এবং চারটি নকশা-কাটা কাচের গেলাস। শো-কেসের ওপরে বসানো রয়েছে চার হাজার পি. এম. পি. ও.-র একটি সনি সাউন্ড সিস্টেম। তার স্পিকার দু-দিকের দেওয়ালে বসানো।

সুরেন্দ্র হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিলেন। ইন্দ্রজিৎকে দেখেই গানবাজনা থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্যেই হাসি হেসে বললেন, 'আসুন—।'

মেঝেতে দামি কার্পেট পাতা ছিল। সেখানে ইন্দ্রজিতকে বসতে অনুরোধ করে সুরেন্দ্র নিজেও বসলেন।

'আমাকে কিছু জিগ্যেস করবেন?'

'হ্যাঁ।' মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল ইন্দ্রজিৎ, 'আপনার বাবার কিডন্যাপিং সম্পর্কে আপনার কি আইডিয়া?'

একটু ইতস্তত করে সুরেন্দ্র চাপা গলায় বললেন, 'ওপেনলি বলব?'

'অফ কোর্স!'

'আমার মনে হয় এটা দাদার কাজ!'

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠল। সুরেন্দ্রকে এমনিতে দেখে ওর ভিতু মনে হয়েছে। সুরেন্দ্র যে ওঁর দাদার নামে এরকম অভিযোগ করতে পারেন সেটা ও কল্পনাও করেনি। মনে-মনে নিজের কানটা মুলে দিল ইন্দ্রজিৎ। একজন তুখোড় ডিটেকটিভকে সবরকম সম্ভাবনার কথা হিসেবে রাখতে হয়।

'আপনার এরকম মনে হল কেন?'

'দাদা নিত্যনতুন বিজনেস দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে। সেজন্যে ওর মাঝে-মাঝেই অনেক টাকার দরকার হয়। এই তো শুনলাম এখন না কি গ্লাসউলের ফ্যাক্টরি খুলবে বলে ভাবছে। আসলে দাদার ব্যবসার কোনও মাথা নেই...।'

ইন্দ্রজিৎ বাধা দিয়ে বলল, 'যাঁর ব্যবসার মাথা নেই তাঁর কিডন্যাপিং-এ মাথা থাকবে?'

'খুব থাকবে!' প্রায় মুখ ভেংচে বললেন, সুরেন্দ্র, 'হাতে টাকা পাওয়ার জন্যে দাদা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর ব্যবসার বুদ্ধি না-থাকলে কি কারও মাথায় বদমাইশি বুদ্ধি থাকতে পারে না!'

'তাই যদি হয়, তা হলে মহেন্দ্রবাবু আমার কাছে গেলেন কেন? এতে তো ওঁরই অসুবিধে হবে—।'

'সাধ করে কি আর গেছে! আসলে আশপাশের লোকজন পাঁচরকম কথা বলছে, তাই।'

ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। তারপর আচমকা বলল, 'আপনি তো লাস্ট শনিবার জিতেনবাবুর সঙ্গে খুব তর্কাতর্কি করেছেন। গানবাজনার দল নিয়ে আপনি কোন বিদেশে যাচ্ছেন?'

সুরেন্দ্রর মুখ থেকে পলকে সব রক্ত সরে গেল।

‘কে বলেছে আপনাকে? নিশ্চয়ই পরানদা!’

সুরেন্দ্রর গলা মেয়েলি হলে কী হবে, ওঁর বুদ্ধির কোনও ঘাটতি নেই। ভাবল ইন্দ্রজিৎ।

‘যে-ই বলুক—ব্যাপারটা তো সত্যি।’

মাথা নীচু করলেন সুরেন্দ্র। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালেন ইন্দ্রজিতের দিকে ‘বাবার কালচার বলে কিছু ছিল না। গানবাজনার লেভেলটা বাবা ঠিক বুঝত না।...মা কিন্তু এরকম ছিল না।’

‘আপনার অনেক স্বপ্ন আছে, সুরেন্দ্রবাবু।’ রবীন্দ্রনাথের ছবির দিকে তাকিয়ে বলল ইন্দ্রজিৎ, ‘স্বপ্ন সবারই থাকে—স্বপ্ন থাকাটা দোষের নয়। তবে কথাটা কী জানেন, জিতেনবাবুরও হয়তো কিছু স্বপ্ন ছিল...।’

‘সেটা আমরা তিন ভাই-বোনে চুরমার করে দিয়েছি!’ খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন সুরেন্দ্র।

‘ওঁর অনেক দুঃখ-কষ্ট ছিল।’

‘দুঃখ-কষ্ট আমার নেই! আপনি জানেন, আমার এই মেয়েলি গলার জন্যে কত অপমান আমাকে ছোটবেলা থেকে সহ্য করতে হয়েছে—এখনও হয়! আমার ছোটবোন পর্যন্ত আমাকে এ-নিয়ে ব্যঙ্গ করে, খোঁটা দেয়!’

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল: ‘নিশ্চয়ই এই দুঃখ-কষ্টের প্রতিবাদে আপনি জিতেনবাবুকে কিডন্যাপ করেননি?’

সুরেন্দ্রর ফরসা মুখে রক্তের ঝলক ঝাপটা মারল। কথা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় ওঁর গলা চিরে গেল: ‘বাঃ, চমৎকার! এই না-হলে ডিটেকটিভ! আপনি বরং আমাকে অ্যারেস্ট করুন। অনিমেষকাকা বাড়িতে থাকলে আপনার এই ইনসাল্টের যোগ্য জবাব দিত। আপনার আর নবনীতার মধ্যে কোনও ডিফারেন্স নেই দেখছি!’

সুরেন্দ্রর অভিমান ইন্দ্রজিৎকে ছুঁয়ে গেল। ও বলল, ‘সরি, আমি ঠিক সিরিয়াসলি কথাটা বলিনি। এমনি ঠাট্টা করে বলছিলাম...।’

সুরেন্দ্র একটু স্বাভাবিক হলেন। দাঁত দিয়ে বারদুয়েক ঠোঁট কামড়ালেন। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

‘আচ্ছা, আপনার বাবার বন্ধু অনিমেষ সরকার কি খুব কড়া ধাতের লোক?’

‘হ্যাঁ...বাবার তুলনায় তো বটেই!’

‘জিতেনবাবুর চিঠির কথা তো আপনি সব জানেন!’

‘হ্যাঁ—দাদা সবাইকে ওটা পড়ে শুনিয়েছিলেন।’

‘চিঠির কথা সব সত্যি?’

ইতস্তত করে সুরেন্দ্র বললেন, ‘প্রথমটা তো বিশ্বাস হতে চায়নি। পরে, অনিমেষকাকা আসার পর বুঝলাম, শুধু সত্যি নয়—হাড়ে-হাড়ে সত্যি। টাকা-পয়সা, কোম্পানি—সবকিছুরই কন্ট্রোল অনিমেষকাকার হাতে।’

মনে-মনে হেসে ফেলল ইন্দ্রজিৎ। সবকিছুর কন্ট্রোল হাতে থাকায় অনিমেষবাবুর ‘অনিমেষকাকা’ হয়ে উঠতে আর দেরি হয়নি। এ-দুনিয়ায় লক্ষ্মী বড় শক্তিশালী!

‘আচ্ছা, সুরেন্দ্রবাবু—থ্যাঙ্ক য়ু ফর কোঅপারেশান। পরে দরকার হলে আবার কথা বলব। আপনার ছোটবোনের ঘরটা কোনদিকে?’

অদ্ভুত চোখে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখালেন সুরেন্দ্র। তারপর চাপা গলায় বললেন, ‘একটু কেয়ারফুল থাকবেন। খরচের টাকায় টান পড়ায় নীতা খুব চটে আছে। কাল ও অনিমেষকাকার কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল—অনিমেষকাকা স্রেফ ”না” করে দিয়েছেন। নীতা অনিমেষকাকার ওপরে একেবারে ফায়ার হয়ে আছে। বাবা ফিরে না এলে আমাদের এই দম আটকানো অবস্থা কাটবে না।’

সুরেন্দ্র ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন।

ইন্দ্রজিৎ মার্বেল পাথরের বারান্দায় পা ফেলে নবনীতার ঘরের দিকে এগোল।

ঘরে ঢুকতেই এয়ারকুলারের ঠান্ডা ছোঁয়া ইন্দ্রজিৎকে জড়িয়ে ধরল। আর একইসঙ্গে হালকা পারফিউমের গন্ধ ওকে আদর করল।

ঘরে কোথাও আলতো মিউজিক বাজছিল—কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না।

দরজার পাল্লা ঠেলে ঢোকার সময় নক করেছিল ইন্দ্রজিৎ। আর তখনই বিছানায় শুয়ে থাকা নবনীতা ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে ছিল ইন্দ্রজিতের দিকে। সুন্দর করে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল: ‘কাম অন ইন, শালর্ক। বড়দা বলছিল আপনার নাম না কি ইন্দ্রজিৎ? তা ইন্দ্রের সঙ্গে কতটা মিল আপনার?’

কথা বলতে-বলতে বিছানায় উঠে বসল নবনীতা। অবাধ্য চুলগুলোকে মাথার এক মনোরম ঝাঁকুনিতে পিঠের দিকে ফেরত পাঠাল। তারপর তেরছা চোখে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রজিতের দিকে—যেন একটু আগের প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করছে।

‘ধর্ম-টর্ম কিংবা দেবতা নিয়ে আমার তেমন একটা চর্চা নেই, ম্যাডাম। আমার কারবার অধর্ম আর শয়তান নিয়ে। বাট আই ডু লাভ ইট।’

‘ও—’ করে অদ্ভুত এক শব্দ করল নবনীতা। বসে-বসেই শরীরটাকে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে পা দুটো বিছানার বাইরে ঝুলিয়ে দিল। ভুরু কপালে তুলে প্রশংসার ঢঙে বলল, ‘স্মার্ট! স্মার্ট! আই ডু লাভ ইট। বিউটি আর ব্রেইন একই শরীরে...উঃ, ভাবা যায় না!’

দেওয়ালে নবনীতার অনেকগুলো ফটোগ্রাফ পোস্টারের মতো করে লাগানো ছিল। তাতে নবনীতাকে নানান পোশাকে দেখা যাচ্ছে। পোশাকগুলোর বেশিরভাগই বিদেশের সি-বিচে মানানসই।

অবশ্য নবনীতার এখনকার পোশাকটাও অনেকটা সেই ধরনের। পোশাকটা ম্যাক্সিগোছের, তবে গোড়ালি পর্যন্ত নয়। হালকা নীল আর সাদা জমিতে সুতোর কাজ করা। কাপড়টা এমনই স্বচ্ছ যে, বোঝা যাচ্ছে নবনীতা অন্তর্বাস পরেছে।

‘বলুন, মিস্টার, ডিটেকটিভ, আমার কাছ থেকে ডিটেইলে কী জানতে চান?’ ঠোঁট উলটে বলল নবনীতা। একটু থেমে তারপর: ‘ওই চেয়ারটায় বসতে পারেন—’ ইশারায় হাততিনেক দূরের একটা চেয়ার দেখাল ‘...অথবা এইখানটায় বসতে পারেন।’ বিছানায়

ঠিক ওর পাশটায় আলতো চাপড় মারল নবনীতা। তারপর খিলখিল করে জলতরঙ্গ শুনিয়ে দিল।

ইন্দ্রজিৎ বখে-যাওয়া মেয়েটাকে একপলক দেখল। তারপর চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

'আপনি মডেলিং করেন?'

বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছিল নবনীতা। পা দোলানো থেমে গেল: 'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

হাসল ইন্দ্রজিৎ: 'কেউ নিজের ইচ্ছায় উচ্ছন্নে গেলে আমার আপত্তি করার কী আছে!'

'উচ্ছন্নে! কী বলতে চান আপনি! জানেন ফ্যাশান টি-ভি চ্যানেলে আমাকে দেখিয়েছে!'

'বুঝেছি—আপনি নিজেকে ভীষণ দেখাতে চান। কিন্তু কেউ যদি দেখতে না-চায়?'

রাগে থমথম করছিল নবনীতার মুখ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ছুড়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ওকে ইশারায় থামতে বলল ইন্দ্রজিৎ। তারপর: 'ধীরে, ম্যাডাম, ধীরে। আমি আপনার বড়দা বা ছোড়দা নই। আর, বড়লোক হলেই কি অসভ্য হতে হবে!'

নবনীতার ভেতরটা কিছু একটা করার জন্য নিশপিশ করছিল। ওর চোখে আগুন জ্বলছিল। আক্রোশ-ভরা চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখছিল ও।

'আপনার বাবাকে কিডন্যাপ করার পেছনে কার হাত আছে বলে মনে হয়?' শান্ত গলায় জিগ্যেস করল ইন্দ্রজিৎ।

নবনীতা রাগে গুম করে ছিল। কাটা-কাটা জবাব দিল 'জানি না।'

'আপনার ছোড়দা বলছিলেন যে, মহেন্দ্রবাবুর হাত থাকলেও থাকতে পারে—।'

'হুঁঃ! ছোড়দা পুরুষ না কি! শুধু অন্যদের হিংসে করে। নিজের ইমপোটেন্সি ঢাকতে অন্যের নামে কাদা ছেটায়।'

'অনিমেষবাবু কেমন লোক?'

'খুব ভালো—' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল নবনীতা, 'শুধু বাবার ঠিক উলটো। ওই লোকটা যে সত্যি-সত্যি সবকিছুর মালিক সেটা ওর কথাবার্তায় বোঝা যায়। এক নম্বরের কঞ্জুস! সবসময় পুজো-আর্চ্চা নিয়ে থাকার ভান করে, গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে—বলে, ওটা নাকি খুব পবিত্র রং। আসলে পুরোটাই ঢং।'

ইন্দ্রজিৎ মনে-মনে সবকিছু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

অনিমেষ সরকারের ওপরে তিন ভাই-বোনের রাগ থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ, শুনে যতদূর মনে হচ্ছে, কড়া ধাতের কঞ্জুষ মানুষ কখনও স্নেহকাতর পিতার বিকল্প হতে পারে না। সুতরাং জিতেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনাটা দারুণ জরুরি। কিন্তু তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? বিছানার চাদরের ওই রক্তের দাগ বলতে চাইছে কিডন্যাপাররা নিষ্ঠুর, হিংস্র। কিন্তু ওই রক্ত কি সত্যিই জিতেন্দ্রনাথের? নাকি অন্য কারও? ল্যাব রিপোর্ট পাওয়ার আগে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

'অনিমেষ সরকার কি এ-বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন?' ইন্দ্রজিৎ জানতে চাইল।

'মানিয়ে নেওয়ার আর কী আছে!' হাত উলটে জবাব দিল নবনীতা, 'উনিই প্রায় সবকিছুর মালিক। দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন-ঘুরছেন, এনজয় করছেন—আর আমাদের

তেষ্টার ছটফটানি দেখছেন। বিনাপয়সার সার্কাস।'

ইন্দ্রজিৎ বিদায় নিতে যাচ্ছিল—হঠাৎই একতলার ড্রইং-ডাইনিং স্পেস থেকে প্রবল ধমকানির চিৎকার ওর কানে এসে ঢুকল।

ভরাট গলায় কেউ চিৎকার করে বলছে, 'ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আমাদের বাড়িতে এসেছেন চারটের সময়—আর এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। অথচ তোমরা কেউ আমাকে খবরটা দেওয়ার দরকার মনে করোনি! মহেন্দ্র, জিতেনের কাছে আগেই শুনেছিলাম তুমি একটু স্টুপিড টাইপের। এখন দেখছি ও ঠিকই বলেছে। কমনসেন্স বলেও তোমার কিছু নেই। তোমার কাছে সেন্সের মানে একটাই : ননসেন্স।'

ইন্দ্রজিৎ বারান্দায় চলে এল। সেখান থেকেই পাখির চোখে দৃশ্যটা দেখতে পেল।

জিনি আর দশরথের সোফার কাছাকাছি একটা জটলা মতন। সেখানে মহেন্দ্র, পরান এবং আরও একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করল, নবনীতা দরজা ফাঁক করে নীচের তলার ঘটনা দেখতে চেষ্টা করছে।

ইন্দ্রজিৎ তরতর করে সিঁড়ি নামতে লাগল। নামতে-নামতেই কথাবার্তাগুলো ওর কানে আসছিল।

মহেন্দ্র মিনমিন করে বলছিলেন, 'না...মানে...আপনি বাড়িতে নেই। কী করে খবর দেব ঠিক বুঝতে...।'

'না-বোঝার কী আছে! তোমাদের কাছে তো আমার মোবাইল নাম্বার রয়েছে!'

আর কোনও উত্তর নেই। মহেন্দ্র মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্রজিৎ ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। হয়তো মহেন্দ্রদের এরকম রুক্ষ শাসনের লাগামেই রাখা দরকার, কিন্তু তাই বলে পরানের সামনে, বাইরের গেস্টদের সামনে!

অনিমেষ সরকারকে ভালো করে দেখল ইন্দ্রজিৎ।

মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখে হাই-পাওয়ার চশমা, নাকটা অস্বাভাবিক মোটা, গালে হালকা চাপদাড়ি।

পরনে, নবনীতা যেমনটি বলেছিল, গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। হাতে সাধারণ একটা লাঠি। হয়তো চলার সময় ভর দেওয়ার দরকার হয়। লাঠিটা দেখে নতুন বলে মনে হল।

ইন্দ্রজিৎ পরিচয় দিয়ে একগাল হাসতেই অনিমেষ সরকারের মুখের রুক্ষতা কেটে গেল। কপালে ফুটে ওটা বিরক্তির ভাঁজও গেল মিলিয়ে।

'আসুন, মিস্টার চৌধুরী, আমার ঘরে আসুন। আপনাদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হয়নি তো?'

ইন্দ্রজিৎ বিনীতভাবে জানাল যে, না, হয়নি। তারপর বলল, 'আপনি ঘরে যান—ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি ওঁদের সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলেই যাচ্ছি—' ইশারা করে দশরথ আর জিনিকে দেখাল ইন্দ্রজিৎ।

‘ওইটা আমার ঘর—মানে, আপাতত ওখানেই আশ্রয় নিয়েছি।’ জিতেন্দ্রনাথের ঘরের লাগোয়া একটা ঘর দেখালেন অনিমেষ। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে এগোলেন সেই ঘরের দিকে।

পরান ইতস্তত পায়ে ওঁকে অনুসরণ করল।

মহেন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ‘আমি আসছি’ বলে চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ জিনির পাশে সোফায় গিয়ে বসল।

‘জিনি, ভেবেছিলাম দোতলায় গিয়ে ইন্টারোগেট করার সময়েও তোমাকে সঙ্গে থাকতে বলব, তুমি নোট নেবে—কিন্তু তাতে সিচুয়েশানটা এত এমব্যারাসিং হয়ে যেত যে...’ কথা শেষ করল না ইন্দ্রজিৎ।

জিনি মুখ ভার করে বলল, ‘বসে-বসে শুধু বোর হচ্ছি। দশরথদা যত রাজ্যের ডিটেকটিভ গল্প শুনিয়ে আমাকে আরও বোর করে দিচ্ছে।’

দশরথ আমতা-আমতা করে হেসে বলল, ‘ইনভেস্টিগেশানের মূল মন্ত্রটা ওঁকে বোঝাতে চাইছিলাম।’

‘সেটা কী?’ ইন্দ্রজিৎ জানতে চাইল।

দশরথ গম্ভীরভাবে বলল, ‘ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেট, ইনভেস্টিগেট। শুধু তদন্ত করে যাও, তা হলেই ফল মিলবে।’

ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেলল। তারপর জিনিকে বলল, ‘কয়েকটা ইমপরট্যান্ট পয়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি লিখে নাও। পরে হয়তো মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে।’

জিনি নোট-প্যাড আর পেনসিল নিয়ে তৈরি হল।

ইন্দ্রজিৎ সংক্ষেপে গড়গড় করে কিছু তথ্য আর কিছু মন্তব্য বলে গেল। জিনি পেশাদারি ঢঙে সেগুলো শর্টহ্যান্ডে লিখে নিল।

দশরথ কান খাড়া করে ইন্দ্রজিতের কথাগুলো শুনতে লাগল, আর মাঝে-মাঝে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

ডিক্টেশান দেওয়া শেষ হতেই ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ সরকারের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে আলোর কুচির নকশা ছড়িয়ে ছিল। তার উৎস খুঁজতে মুখ তুলে ওপরে তাকাল ইন্দ্রজিৎ।

কাট গ্লাসের ঝাড়লণ্ঠন থেকে আলোর টুকরো নানান দিকে ঠিকরে পড়ছে।

অনিমেষ সরকারের ঘরটা মাপে ছোট, তবে ছিমছামভাবে সাজানো। ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিলের ওপরে পাশাপাশি শিব ও কালীর ফটো—তাতে চন্দনের টিপ লাগানো।

খাটের ওপরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন অনিমেষ। ইন্দ্রজিৎকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন: ‘আসুন, আসুন। ওই চেয়ারটায় বসুন।’

আগে ততটা খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ করল, অনিমেষ সরকারের গলার স্বরটা কেমন যেন ফ্যাঁসফেসে।

ওঁর দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসল ইন্দ্রজিৎ।

'বলুন, জিতেনের খোঁজখবরের কোনও হদিশ পাওয়া গেল?'

কপালে ভাঁজ ফেলে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'এখনও পর্যন্ত পাইনি। তবে কতকগুলো ব্যাপারে খুব খটকা লাগছে। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ চাইতে এত দেরি করছে কেন। তারপর, কিডন্যাপিংটা যেভাবে হয়েছে—মানে, বাড়িতে এসে যেভাবে ওরা জিতেন্দ্রনাথকে তুল নিয়ে গেছে, তাতে কাজটা যে খুবই রিস্কি ছিল...। আই মিন, কিডন্যাপাররা হেভি রিস্ক নিয়েছিল। জেনারালি এতটা রিস্ক ওরা নেয় না। কিন্তু নিলই যখন, তা হলে টাকা চাইতে দেরি করছে কেন? যারা এত ডেসপারেট...।'

'ঠিকই বলেছেন। জাস্টিফায়েড পয়েন্ট। তবে ওরা হয়তো চাইছে, কটা দিন যাক—ব্যাপারটা থিতিয়ে পড়ুক, তারপর...।'

'কী জানি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ইন্দ্রজিৎ: 'ওসব যাকগে, এবারে আপনার কথা বলুন। এ-বাড়িতে কেমন লাগছে?'

'ভালো কী করে লাগবে বলুন!' কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা একটা টি-টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অনিমেষ: 'যার সঙ্গে এতদিন পর দেখা করতে এলাম সে-ই নেই। তার ওপর এরকম বাজে খবর...আমার মনটাই কেমন ডিপ্রেসড হয়ে গেছে।'

'মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা ওদের কেমন বুঝছেন?'

'হুঁঃ!' প্রবল বিরক্তির একটা শব্দ করলেন অনিমেষ, 'একেবারে উচ্ছন্নে গেছে! যে-কোনও কারণেই হোক, জিতেন ওদের বড্ড লাই দিয়ে মানুষ করেছে। আমাকে ও পরপর বেশ কয়েকটা চিঠিতে ওর দুঃখের কথা লিখেছিল। লাস্ট চিঠিটা পেয়েছিলাম দিনপনেরো আগে। এই দেখুন—' খাট ছেড়ে উঠে পড়লেন অনিমেষ। দেওয়ালের সুদৃশ্য হুকে ঝোলানো ওঁর কয়েকটা জামাকাপড়ের কাছে গেলেন। সেগুলোর পকেট হাতড়ে-হাতড়ে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করলেন। সেটা খুলে একবার দেখে নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ইন্দ্রজিতের কাছে এলেন: 'এটা পড়ে দেখুন, তা হলেই মোটামুটি সব বুঝতে পারবেন...।'

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা নিয়ে পড়ল।

হাতের লেখা যে জিতেন্দ্রনাথের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রাণের বন্ধুকে নিজের প্রাণের কথা লিখেছেন জিতেন্দ্রনাথ। বন্ধুকে এ-বাড়িতে আসার জন্য বারবার করে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, '...তোর বিষয়-সম্পত্তি তুই এবারে বুঝে নে। আমাকে মুক্তি দে। আমি বিবাগী হয়ে কোথাও চলে যাই। সংসারে আমার আর লোভ নেই।'

ইন্দ্রজিৎ চিঠিটা ফেরত দিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপন এ-চিঠির জবাব দেননি?'

'না। ফোনে কথা বলেছিলাম।' পা টেনে-টেনে খাটে গিয়ে বসলেন অনিমেষ, 'ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, তুই শক্ত হাতে ছেলেমেয়ের রাশ টেনে ধর। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদের শাসন করার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি।'

'আপনার পায়ে কী হয়েছিল?'

'পায়ে!' ইন্দ্রজিতের আচমকা এই প্রশ্নে অনিমেষ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বছরদশেক আগে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলাম। ফিমার বোনের শ্যাফট ভেঙে গিয়েছিল। ডাক্তাররা স্টিলের প্লেট বসিয়ে ওটা মেরামত করেছে বটে, তবে পায়ে একটু দোষ থেকে গেছে।' কথা শেষ করে মলিন হাসলেন অনিমেষ। চোখ থেকে চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে কাচ দুটো মুছলেন। তারপর আলোর দিকে চশমাটা তুলে ধরে কাচদুটো পরখ করে চশমাটা আবার চোখে দিলেন।

'আপনি এ-বাড়িতে এসেই যখন শুনলেন জিতেনবাবু কিডন্যাপড হয়েছেন, তখন পুলিশে ইনফর্ম করার কথা বলেননি?'

'না, বরং অন্যরকম সাজেশানই দিয়েছিলাম। মহেন্দ্রকে বলেছিলাম, পুলিশে খবর দিলে ব্যাপারটা পাঁচকান হবে। এতে সবারই লজ্জা। তা ছাড়া কিডন্যাপাররা শাসিয়েছে। পুলিশে ইনফর্ম করলে হয়তো জিতেনের বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে। হয়তো জিতেনের সঙ্গে কোনওদিনই আমার আর দেখা হবে না...।'

গলার স্বর ভেঙে গিয়ে বুজে এল। অনিমেষ সরকার মুখ নীচু করলেন। পকেট থেকে নীল-কালো চেক-চেক একটা রুমাল বের করে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে মুখ তুললেন। শক্ত গলায় বললেন, 'সেইজন্যেই আমি পুলিশে খবর দিতে বারণ করেছি। জিতেনের বাড়িতে আমি এই প্রথম এলাম, অথচ ওর সঙ্গে দেখা হবে না—এটা ভাবা যায় না।'

'জিতেনবাবু ফিরে আসার জন্যে আপনি কতদিন ওয়েট করবেন?'

'দেখি...আরও সপ্তাদুয়েক তো বটেই! আশা করছি এরমধ্যে কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করবে। ওরা যা-ই টাকা দাবি করুক দিয়ে দেব। টাকার অঙ্কে জিতেনের দাম মাপা যায় না। ও আমার কোন ছোটবেলার বন্ধু! জানেন, একবার...।'

জিতেন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিচারণ শুরু করলেন অনিমেষ। স্কুলের গল্প, কলেজের গল্প, একসঙ্গে বেড়ানোর গল্প, বিয়ের গল্প, ব্যবসার গল্প...গল্পের আর শেষ নেই।

ইন্দ্রজিৎ মোটেই বিরক্ত হচ্ছিল না, বরং গভীর মনোযোগে শুনছিল। অনিমেষের কয়েকটা গল্প এমনই যে, খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

কথার মাঝে পরান ঘরে এসে ঢুকল। অনিমেষের চায়ের কাপ-প্লেট তুলে নিয়ে ও চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই ওর চোখ পড়ল ইন্দ্রজিৎদের দিকে।

পরান যেন সামান্য অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না। আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করতে-করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ অনিমেষ সরকারকে দেখছিল আর ভাবছিল কিডন্যাপিং-এর পিছনে এ-বাড়ির কেউ নেই তো! মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা—ওঁরা কি স্রেফ টাকার লোভে জিতেন্দ্রনাথকে কিডন্যাপ করতে পারেন? আর অনিমেষ সরকার? উনি কি কিডন্যাপ করাতে পারেন জিতেন্দ্রনাথকে? কিন্তু সে নিশ্চয়ই টাকার লোভে নয়। অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে?

কুয়াশা দিয়ে তৈরি একটা ছবি ইন্দ্রজিতের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ছবিটা স্পষ্ট হতে গিয়েও বারবার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

অনিমেষ সরকারের গল্প শেষ হলে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'একটুকরো কাগজে আপনার অ্যাড্রেস আর সেল-ফোন নাম্বারটা একটু লিখে দেবেন?'

'কেন বলুন তো! এ-বাড়ির ফোন নাম্বার তো আপনি জানেন!'

'না, আপনার সঙ্গে আমার আলাদা কথা বলার দরকার হতে পারে—।'

'ঠিক আছে, লিখে নিন।'

'আমার পেনের রিফিল শেষ হয়ে গেছে।' মিথ্যে কথা বলল ইন্দ্রজিৎ।

তখন নিমরাজি হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলেন অনিমেষ। হাতে ধরা রুমালটা পকেটে রেখে পা টেনে কোণের টেবিলটার কাছে গেলেন। ড্রয়ার থেকে পেন বের করে একটা ছোট প্যাডের কাগজে খসখস করে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখলেন। তারপর পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে ইন্দ্রজিৎকে দিলেন।

'কী মনে হচ্ছে, মিস্টার চৌধুরী? এই কেসটা আপনি সলভ করতে পারবেন?'

ইন্দ্রজিৎ হাসল: 'সলভ তো করতেই হবে! এটা আমার প্রথম কেস।'

'উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।' হাসলেন অনিমেষ।

ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আপাতত ওর কাজ শেষ। তবে মারুতি ভ্যানে ওঠার আগে পরানের সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে ও ভুলল না।

ফেরার পথে স্টিয়ারিং-এ বসে ইন্দ্রজিৎ অনেক কথা বলল। দশরথ নানান প্রশ্ন করল ওকে। প্রশ্নের ঢংগুলো এমন যে, সে যেন কোনও অপরাধীকে থানায় ডেকে এনে জেরা করছে।

ইন্দ্রজিৎ হাসিমুখে দশরথের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, আর জিনিকে বলল কথাবার্তাগুলো যতটা সম্ভব টুকে নিতে।

'কাল অফিসে এগুলো ওয়ার্ড প্রসেস করে আমাকে একটা ড্রাফট প্রিন্ট-আউট দিয়ো।'

জিনি বলল, 'ও. কে., স্যার।'

উল্টোডাঙ্গা-ভি. আই. পি.-র মোড়ে গাড়ি আসতেই ইন্দ্রজিৎ ঘড়ি দেখল। রাত প্রায় নটা। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। জিনি আর দশরথদারও বোধহয় একই অবস্থা। তাই ও বলল, 'এসো, এখানে কোনও একটা রেস্তরাঁয় আমরা ডিনার সেরে নিই। জিনি, তুমি বাড়িতে একটা ফোন করে দাও। আমি তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।'

রাস্তার পাশ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল ইন্দ্রজিৎ। ওরা গাড়ি থেকে নামল।

জিনি বলল, 'আমি চট করে একটা ফোন করে আসছি।'

ও চলে যেতেই নিজের পেটে হাত বোলাল ইন্দ্রজিৎ: 'দশরথদা, পেটে একেবারে ছুঁচোয় ডন মারছে। তোমারও নিশ্চয়ই একই অবস্থা?'

দশরথ একগাল হেসে বলল, 'না, স্যার। পুলিশে চাকরি করার সময় ইউনিয়ন করতাম। তখন হাঙ্গার স্ট্রাইক করে-করে খিদে সহ্য করার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

ইন্দ্রজিৎ হো-হো করে হেসে ফেলল।

‘প্রথমেই সবাইকে জানাই—বিছানার চাদরে যে-রক্তের দাগ পাওয়া গেছে, সেটা মানুষের রক্ত নয়...মুরগির রক্ত।’

ইন্দ্রজিতের কথা শেষ হতে-না-হতেই দশরথ চাপা গলায় বলল, ‘মোরগেরও হতে পারে।’

সে-কথা ইন্দ্রজিতের কানে গেল বলে মনে হল না। ও তখন কৌতূহল নিয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখের দিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে।

ওঁরা সকলেরই চমকে উঠলেন।

অনিমেষ সরকার, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নবনীতা—আর পরান।

প্রথম চারজন সোফায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে ছিলেন। আর পরান একপাশে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে।

‘কী বলছেন, মিস্টার চৌধুরী!’ অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন অনিমেষ সরকার, ‘মানুষের রক্ত নয়! মুরগির রক্ত—!’

‘মোরগেরও হতে পারে।’ আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল দশরথ।

‘হ্যাঁ—মুরগির রক্ত।’

দশরথ আবার বিড়বিড় করল। কী বলল ঠিক বোঝা গেল না, তবে অনুমান করা গেল।

‘তা হলে বাবার কোনও বিপদ হয়নি!’ এবারে সুরেন্দ্র কথা বললেন।

ইন্দ্রজিৎ সুরেন্দ্রর কথাটা যেন শুনতে পেল না। সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজে বলল, ‘এই ইনফরমেশানটা ল্যাব থেকে পাওয়ার পরই আমি অন্য অ্যাঙ্গল থেকে ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করতে শুরু করলাম...।’

হঠাৎই চোখ খুলে হাসল ইন্দ্রজিৎ: ‘আর তখনই সব কেমন ঠিকঠাক খাপে-খাপে মিলে গেল। এবং কিডন্যাপিং রহস্যের উত্তরটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।’

‘সেন কটেজ’-এর ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে বসে কথা হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাতটার ঘরে পৌঁছে গেছে। বিচিত্র ঢঙের সুন্দর-সুন্দর সব বাতি ঘরটাকে প্রায় দেওয়ালির রাত করে তুলেছে। কিন্তু এখন আবহাওয়া খানিকটা থমথমে। সবাই কেমন যেন গম্ভীর। এমনকী নবনীতাও। আজ, এই মুহূর্তে, যেন গৃহকর্তার অভাবটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

রহস্যটা খতিয়ে দেখতে মাত্র তিনদিন সময় নিয়েছে ইন্দ্রজিৎ। জিনির টাইপ করে দেওয়া তথ্য, নিজের স্মৃতি আর বুদ্ধিকে বারবার ব্যবহার করে তারপর একটা অনুমানে পৌঁছেছে। তারপর অনিমেষ সরকারের লিখে দেওয়া ঠিকানা আর ফোন নম্বর ওকে একটা প্রায়-সিদ্ধান্তের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

সুতরাং, পুরোপুরি তৈরি হওয়ার পর ও মহেন্দ্র সেনকে ফোন করেছে। জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় চায়ের আসরে ও সব রহস্যের জট খুলবে। চেষ্টা করবে, কিডন্যাপড হয়ে-যাওয়া জিতেন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনতে।

‘...কিডন্যাপাররা টাকা চাইতে দেরি করায় আমার প্রথম খটকা লেগেছিল। তা হলে কিডন্যাপিংটা যে বা যারা করিয়েছে তারা খুবই বড়লোক? তাদের টাকার দরকার নেই?’ একে-একে মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং নবনীতাকে দেখে নিল ইন্দ্রজিৎ: ‘সাধারণত কিডন্যাপিং-এর কেসে যেটা হয়, পণবন্দিদের লুকিয়ে রাখাটা ভীষণ রিস্কি বলে কিডন্যাপাররা যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটায় তাড়াহুড়োর বদলে কেমন যেন ডিলি-ড্যালি গা-ছাড়া ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল।

'সেদিন আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হল, কিডন্যাপিং-এর মতো দুঃসাহসিক কাজ করার সাহস আপনাদের কারও নেই। আশা করি আমার এই মন্তব্যকে আপনারা প্রশংসা হিসেবে নেবেন। যাই হোক, বাকি আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি অনিমেষবাবুকে কয়েকটা কথা বলতে চাই—আর সেইসঙ্গে আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই, জিতেন্দ্রনাথকে কে কিডন্যাপ করেছে।'

সবাই উসখুস করতে লাগলেন। এ-ওর দিকে অস্বস্তির চোখে দেখতে লাগলেন।

অনিমেষ বললেন, 'বলুন, কী বলতে চান—।'

হাসল ইন্দ্রজিৎ—অপরাধীকে ধরে ফেলার হাসি: 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—জিতেন্দ্রনাথকে আপনিই কিডন্যাপ করেছেন।'

সবাই অবাক চোখে তাকালেন অনিমেষ সরকারের দিকে। ঘরে আলোচনা আর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। দশরথ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগল।

'একমিনিট!' সবাইকে কথা থামাতে ইশারা করল ইন্দ্রজিৎ: 'আর-একটা কথা অনিমেষবাবুকে আমার বলার আছে। জিতেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আপনার সারা জীবনেও আর দেখা হবে না। আপনি যদি একশো বছরও এ-বাড়িতে অপেক্ষা করেন, তা হলেও তাঁর দেখা পারেন না।'

'কেন, জিতেন কি আর বেঁচে নেই?' অনিমেষ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'সে তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন—।' চোখ মটকে বাঁকা হাসল ইন্দ্রজিৎ।

'বাবা...বাবাকে কি মেরে ফেলা হয়েছে?' মিহি গলায় প্রশ্ন করলেন সুরেন্দ্র।

'বাবা কি এ-বাড়িতে আর কখনও আসবেন না?' মহেন্দ্র।

'কীসব কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন। স্টপ বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ।' নবনীতা।

হাত তুলে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলল ইন্দ্রজিৎ। তারপর: 'অনিমেষ সরকার যতদিন এ-বাড়িতে আছেন ততদিন জিতেন্দ্রনাথের এ-বাড়িতে আসা সম্ভব নয়। ওঁরা দুজন হরিহর-আত্মা হলে ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে পাওয়া ইমপসিবল।'

'কেন? অনিমেষ প্রশ্ন করলেন।

'কারণ, আপনারা দুজনে একই লোক। হরিহর-আত্মা নন—একই আত্মা।'

পলকে সবাই চুপ করে গেলেন। নিস্তব্ধতা পুরু মোলায়েম চাদরের মতো বিছিয়ে গেল সারাটা ঘরে।

অনেক—অনেকক্ষণ পর জিতেন্দ্রনাথের গলায় কথা বললেন অনিমেষ, 'থ্যাংকু ইউ, মিস্টার চৌধুরী।' এবং পরচুলা, চাপদাড়ি ও চশমা খুলে ফেললেন। নাকের ডগা থেকে টেনে খুলে নিলেন একদলা প্লাস্টিসিন।

'বাবা!' মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং নবনীতা।

পরান ছুটে গিয়ে জিতেন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরল। কান্না-ভাঙা গলায় ডুকরে উঠল, 'বড়বাবু! আপনি বড়বাবু!'

জিতেন্দ্রনাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমি। আর কোনও চিন্তা নেই।'

এবার ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি খুব প্রমিসিং ডিটেকটিভ, মিস্টার চৌধুরী। এখন বলুন তো, আমাকে আপনি কী করে সন্দেহ করলেন?'

ইন্দ্রজিৎ মাথার ঝাঁকড়া চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর: 'প্রথম সন্দেহ হল, আপনি জিতেন্দ্রনাথের লেখা বহু চিঠির কথা বলেছেন, একটা চিঠি আমাকে দেখিয়েছেনও—কিন্তু আপনার লেখা কোনও চিঠির কথা বলেননি। বাড়িতে আপনার লেখা কোনও চিঠিও পায়নি কেউ। সবসময়েই অনিমেষ সরকার ফোন করে কথা বলতেন।

'দ্বিতীয়: আপনার লাঠিটা নতুন। আর আপনার সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটাটা মাঝে-মাঝে ঠিকঠাক স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল।

'তৃতীয়: আমি যখন সন্দেহ থেকেই আপনাকে অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার লিখে দিতে বলছিলাম, আপনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।

'চার নম্বর: আপনার রুমাল। আমি আর আপনি যখন সেদিন ও ঘরে বসে—' ইশারা করে ঘরটার দিকে দেখাল ইন্দ্রজিৎ: '—কথা বলছিলাম তখন আপনি রুমাল বের করে চোখ মোছার ভান করছিলেন। সেইসময়ে পরান চায়ের কাপ-প্লেট নিতে ঘরে ঢুকেছিল। আপনার হাতের রুমালটা দেখে ও চমকে উঠেছিল। আমি পরে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ওটা জিতেন্দ্রনাথের রুমাল। সে-রুমাল আপনার পকেটে গেল কেমন করে!'

'অবশ্য তখন আমি আপনাকে কিডন্যাপিং-এর নাটের গুরু বলে সন্দেহ করেছিলাম। পুরোপুরি জিতেন্দ্রনাথ বলে ভাবিনি।'

'সেটা ভাবলেন কখন?'

'ওই রক্তের রিপোর্টটা পাওয়ার পর। তখন বুঝলাম, পয়সা থাকলে একটা নকল কিডন্যাপিং-এর ব্যবস্থা করা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। তা ছাড়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে কিডন্যাপারদের যেন কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। এ ছাড়া আর-একটা ব্যাপার সবচেয়ে উদ্ভট ছিল...।

'কোনটা?'

'আপনার ওই "মালিক" বন্ধু অনিমেষ সরকারকে হঠাৎ করে "জন্ম" দেওয়া। আগে তো কখনও আপনি অনিমেষ সরকারের কথা ছেলেমেয়েদের বলেননি! তা হলে হঠাৎ করে এই ক্ষমতাবান "বন্ধু" এল কোত্থেকে!

'আসলে, মিস্টার সেন—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি দুটো করে ব্যক্তিত্ব আছে। একটা নরম, আর-একটা কঠিন। একজনের কাজ ভালোবাসা, অন্যজনের কাজ শাসন করা। যদিও ব্যাপারটা অ্যাবসলিউটলি আপনাদের ফ্যামিলির ব্যাপার—তবুও বলছি, আপনার একটা পারসোনালিটি বহুদিন ধরে ঘুমিয়ে ছিল। অনিমেষ সরকার। আপনি জিতেন্দ্রনাথ আর অনিমেষ—দুজনকেই সজাগ রাখুন। তবে দুজনের মধ্যে ব্যালান্সটা আপনাকেই মেইনটেইন করতে হবে। বেশি ভালোবাসাও যেমন ঠিক নয়, বেশি শাসনও তাই। যদি আপনি এবার থেকে এটা মেইনটেইন করতে পারেন তা হলে সবার ভালো হবে। আর সীমন্তিনীদেবীও খুশি হবেন।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বয়েসে ছোট হয়েও অনেক অপ্রিয় কথা বললাম—হোপ ইউ উডন্ট মাইন্ড।

আমাদের কাজ শেষ—আমরা এবার যাই।'

'একমিনিট, মিস্টার চৌধুরী।' উঠে দাঁড়ালেন জিতেন্দ্রনাথ। তারপর পরানকে বললেন, 'পরান, আমার চেকবইটা নিয়ে আয় তো।'

পরান তাড়াতাড়ি চলে গেল জিতেন্দ্রনাথের ঘরের দিকে।

জিতেন্দ্রনাথ ইন্দ্রজিতের কাছে এসে আন্তরিক গলায় বললেন, 'আপনার কথায় আমি কিছুই মনে করিনি। বরং আপনার কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব। আসলে মেন্টাল টরচারে-টরচারে আমি দিশেহারা হয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। তারপর, ঝোঁকের মাথায় এসব করে ফেলেছি...।'

চেকবই এসে গিয়েছিল। জিতেন্দ্রনাথ পেন নিয়ে খসখস করে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন। নামের জায়গায় এসে থমকালেন তিনি, 'কী নামে হবে চেকটা?'

'প্রাইভেট আই ডট কম।'

'কত টাকার চেক দিলে, বাবা?' নবনীতা জিগ্যেস করল।

জিতেন্দ্রনাথ ওর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'দ্যাট ইজ নান অফ ইওর ব্লাডি বিজনেস, লেডি।'

ইন্দ্রজিৎ বুঝল জিতেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন ভূমিকা শুরু করে দিয়েছেন।

ওরা তিনজনে বেরিয়ে এল 'সেন কটেজ' থেকে।

মারুতি ভ্যানে ওঠার পর দশরথ বলল, 'স্যার, কাল সকালে এই চেকটা শার্লক হোমসের ছবিতে ঠেকিয়ে তারপর ব্যাঙ্কে জমা দেবেন।'

ইন্দ্রজিৎ হাসল। গাড়ি স্টার্ট দিল।

জিনি বলল, 'আমাদের মাইনে নিয়ে আর তা হলে কোনও চিন্তা রইল না।'

ইন্দ্রজিৎ বলল, 'আজকেও ডিনার সেরে গেলে কেমন হয়?'

'আমি, স্যার, ঠিক এই রিকোয়েস্টটাই করব ভাবছিলাম। কিন্তু সংকোচ আর লজ্জা এসে আমার কণ্ঠরোধ করেছিল। যদিও আমার হাঙ্গার স্ট্রাইকের অভ্যেস আছে, তবুও...।'

মারুতি ভ্যানের মিউজিক সিস্টেম অন করে দিল ইন্দ্রজিৎ। সুরের ঝংকারে দশরথের শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।

সাবধান! সাপ আছে

‘চোখ বুজে ঘুরে দাঁড়াও, বিশ্বাস,’ অনন্ত কর মিঠে সুরে বললেন, সুতরাং আমি চোখ বুঝলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম, অনেকটা ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো। শুনলাম, অনন্ত কর সিন্দুক খোলার কম্বিনেশান ডায়াল ঘোরাচ্ছেন।

ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক।

ডানদিকে ষোলো ঘর। মনে-মনে হিসেব করলাম।

ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক।

বাঁদিকে এগারো ঘর। শয়তানি হাসি হাসলাম।

ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক—ক্লিক।

‘ডানদিকে ছাব্বিশ,’ জোরে বলে উঠলাম আমি। কিন্তু সৌভাগ্যবশত অনন্ত কর কানে কম শোনেন।

‘ঠিক আছে, বিশ্বাস,’ বললেন অনন্ত কর, ‘এবার ফিরে দাঁড়াতে পারো’।

ফিরে দাঁড়ালাম। লুব্ধ চোখে দেখলাম দশ আর একশোর নোটের বান্ডিলগুলো: দু-লক্ষ চল্লিশহাজার টাকা। আমার শোওয়ার ঘরের তাকে রাখা তাসের প্যাকেটের মতো সুবোধ শিশু হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে বান্ডিলগুলো।

অনন্ত কর আরও একটা একশোর বান্ডিল সযত্নে আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ করলেন।

দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার।

জলতরঙ্গের শব্দ করে সিন্দুকের ভারি দরজাটা বন্ধ করলেন তিনি।

‘আজকের মতো কাজ শেষ,’ অনন্ত বললেন, ‘সাড়ে পাঁচটা বাজে। তুমি এবার যেতে পারো। আমাকে আরও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হবে।’

‘আচ্ছা, স্যার,’ বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৃষ্ণার্ত চোখে তাকালাম সিন্দুকটার দিকে—যেন একটা কালো কোলাব্যাঙ বসে আছে। আর অনন্ত কর—তিনিও কোলাব্যাঙ, তবে সাদা—সোজা হয়ে দাঁড়ালেন নিজের পায়ে। লোকটা সত্যিই দয়ালু, যাকে দেখলে আমার ঠাকুরদার কথা মনে পড়ে যায়। তা না হলে হয়তো সেই মুহূর্তেই তাঁর দয়ালু মস্তকে এক ঘা বসিয়ে, সিন্দুকের ডায়াল নম্বর অনুযায়ী (আমার জন্মতারিখের চেয়েও যেটা আমার বেশি মুখস্থ) ঘুরিয়ে নোটের বান্ডিলগুলো আমার টেবিলের ড্রয়ারে লুকোনো পলিথিনের ব্যাগে ভরে (দীর্ঘ কয়েকবছরের চাকরি-জীবনে তেতাল্লিশটা ব্যাগ আমি জমিয়ে ফেলেছি টিফিন নিয়ে আসার অছিলায়—) সোজা রাস্তায় নেমে চম্পট দিতাম। লোকে ভাবত

'জনৈক নিরপরাধ, নিরীহ, কলিকাতাবাসী কৈকেয়ী-ঘরনির আদেশে ক্রয়-কর্ম সমাপনান্তে স্বগৃহে প্র্যাবর্তন করিতেছেন। অহো, উহার প্রতি আমাদিগের সমবেদনা রহিল।' সুতরাং কাজ শেষ।

কিন্তু সেটা ছিল আমার প্ল্যান নাম্বার ওয়ান। 'কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি'তে মাসখানেক কেরানি হিসেবে কাজ করার পর ওই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার মন রুখে দাঁড়িয়েছে। এত অবুদ্ধিমানের মতো এ-কাজ করাটা সুবিবেচনার পরিচয় নয়। অনন্ত করের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের টেবিলের দিকে এগোতে-এগোতে পরিকল্পনাটা আরও একবার নাকচ করলাম।

'কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি'র অফিস বলতে একটা 'এল' প্যাটার্নের ঘর, তার 'সবেধন নীলমণি' একটিমাত্র দরজা, কোনও জানলা নেই। অনন্ত করের টেবিল এবং সিন্দুকটা 'এল'-এর ক্ষুদ্রতর বাহুতে অবস্থিত, এবং 'এল'-আকৃতির জন্যে আমার টেবিল থেকে অদৃশ্যমান। আর 'এল'-এর দীর্ঘতর বাহুর প্রথম বাসিন্দা মিসেস রাও, আমাদের দু-হাজার বছরের পুরোনো স্টেনোগ্রাফার, এবং দ্বিতীয় বাসিন্দা আমি। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা আমার চতুষ্কোণ 'বাসস্থান', তারপর দুটি সোফা অতিথিদের জন্যে। অবশেষে—সবশেষে, দরজা। এ ছাড়াও কয়েকটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা জল-শীতল যন্ত্র, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, টেলিফোন, কিবোর্ড ইত্যাদি নিজের-নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং সেই কারণেই অফিসের যে-ষাট-সত্তরটা ম্যাপ আমি এঁকেছি তাতে এগুলোর কোনও ছবি নেই।

এককথায় বাড়িটা যেন চুরি-ডাকাতির সুযোগ-সুবিধের দিকে লক্ষ রেখেই তৈরি করা হয়েছে—অর্থাৎ, শুধু আমার জন্যে। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সাহসী, তস্করসম্রাট শ্রীনলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের জন্যে। বেআইনি কুকাজের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী, যার সম্পর্কে সারা পৃথিবী একসুরে বলবে, 'লোকটা জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারত।' কিন্তু কেউ জানবে না সে হল কলকাতার অন্যতম স্নেহাষ্পদ বাসিন্দা নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস।

এ পর্যন্ত আমি শুধু ম্যাপ এঁকে এবং তেতাল্লিশটা ব্যাগ জোগাড় করেই ক্ষান্ত হয়েছি। আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রয়োগে সিন্দুকের কম্বিনেশান নম্বরটাও জেনেছি (একবার, আমার কানের হিসেব নির্ভুল কি না পরীক্ষা করতে, আমি চোখ খুলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন স্পষ্টই অনন্ত করকে কম্বিনেশান ঘোরাতে দেখেছি। বলাই বাহুল্য আমার চক্ষু এবং কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়েছে)। অনন্ত করই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই কম্বিনেশান নম্বর জানেন। সুতরাং, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, সিন্দুক লুঠ হওয়ার পর তিনি যেন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন।

অনেক ভাবনাচিন্তার পর কতকগুলো পন্থা আমাকে বর্জন করতে হয়েছে। যেমন, অনন্ত করকে খুন অথবা আঘাত করতে আমি পারব না। তার প্রধান কারণ, আমার মানবিকতা বোধ এবং দয়া এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আর দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিমান এবং সাহসী হলেও অনন্ত করকে খুন, অথবা খুনের কাছাকাছি কিছু না-করে কীভাবে তাঁর উপস্থিতিতে সিন্দুক খালি করব তা আমি ভেবে পাইনি। ফলে শাস্তি এড়ানোর আশা তখন হয়ে পড়বে দুরাশা। অবশ্য এমন একটা ওষুধ আছে যেটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে চিরকালের মতো স্মৃতিভ্রংশ দেখা দেয়। বাথরুমে বসে সেই ওষুধ নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। কিন্তু সেই সব ধারাবাহিক পরীক্ষার শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ওষুধটার ওপর তেমন ভরসা করা যায় না। আমার কুকুর জিমিকে সেই ওষুধ খানিকটা ইনজেক্ট করে দিয়েছিলাম। ফলে মাত্র

ঘণ্টাকয়েক বেচারা লেজ নাড়তে পারেনি। সুতরাং পাকানো বুড়ো করের ওপর সেই ওষুধের প্রভাব (আদৌ যদি কিছু হয়) সহজেই অনুমেয়। অতএব টাকা লুঠ করতে হবে সম্পূর্ণ গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে। একবার যদি অফিস-বাড়িতে একা ঢুকতে পারি, তা হলে সিন্দুক খুলে টাকাগুলো পলিথিনের ব্যাগে ভরে নেওয়া একমিনিটের কাজ। অবশ্য এখনও অফিস লুকিয়ে বসে থাকা যায়, কিন্তু তাতে—।

'যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না,' অনন্ত ডেকে বললেন।

—অফিস থেকে আর বেরোতে পারব না, কারণ অফিসের দরজাটা ইস্পাতের তৈরি, এমনি বন্ধ করলেই সেটায় তালা লেগে যায়, আর সে-তালার একমাত্র চাবি শুধু করের কাছে।

অবশ্য মোম দিয়ে তালার ছাপ তুলে নকল চাবি বানিয়ে নেওয়া তেমন একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু তাতে লুকোনো বিপদঘণ্টির তো সুরাহা হবে না। প্রতি রাতে অফিস ছেড়ে বেরোবোর সময় মিস্টার কর বিপদঘণ্টিটা চালু করে দিয়ে যান। এরপর যে-ই অফিসের দরজা খুলুক না কেন ওটা ভয়ঙ্কর শব্দ করে বেজে ওঠে। রোজ সকাল দশটায় অফিসের দরজায় এসে মিস্টার কর তিনপ্রস্ত চাবি দিয়ে বিপদঘণ্টিকে অকেজো করেন—অবশ্য অকেজো হওয়ার আগে ওটা তারস্বরে মিনিটপাঁচেক ধরে চেঁচিয়ে (?) রাস্তার লোক জড়ো করে ফ্যালে।

আমার বাড়ি অফিস থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং ঘণ্টির চিল-চিৎকার আমিও শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি আবারও আমার অফিসে দেরি হতে চলেছে। ঘণ্টি এভাবে বেজে ওঠার আগে যদি ওটাকে অকেজো করা হয়, তা হলে অফিসের বন্ধ দরজা আর কোনওদিনই খুলবে না।

এই সব ধুরন্ধর মারপ্যাঁচ আমার কাছে, তস্করসম্রাট নলিনী বিশ্বাসের কাছে, এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত গ্রীষ্মটা এই সমস্যা সমাধানের চিন্তাতেই কেটে গেছে। কিন্তু এখন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময়, ঝরাপাতা বৃষ্টি মনে করিয়ে দেয় বয়ে যাওয়া সময়ের কথা।

মিস্টার করের কাছ থেকে হতাশ মনে বিদায় নিয়ে দরজা বন্ধ করে অফিস থেকে বেরোলাম। শুনতে পেলাম দরজা লক হয়ে যাওয়ার 'ক্লিক শব্দ। নেমে এলাম রাস্তায়। জনতার ভিড়ে আমি তখন এক অতি-সাধারণ নাগরিক।

অফিস-বাড়ির (লোহা ও কংক্রিট) এক প্রান্তে চিঠি ফেলার গর্ত (সিমেন্টে বসানো ইস্পাতের বাক্স)। গর্তটা ছ'ইঞ্চি চওড়া, মাটি থেকে সাড়ে তিন ফুট ওপরে। সুতরাং একচোখে উঁকি মারার পক্ষে উপযুক্ত। বহু অন্ধকার রাতে একচোখে অন্ধকার অফিসে উঁকি মেরে নানানরকম মতলব ভেঁজে সময় নষ্ট করেছি—লাভ হয়নি। এখন গর্তের লোহার ঢাকনাটা তুলে আর-একবার উঁকি মারলাম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অপরাধের অকুস্থলে। অনন্ত করের টেবিলের আলোয় অফিসটা হালকাভাবে আলোকিত। চুরির পরদিন সকালে পুলিশ এবং সন্ত্রাসিত জনতা যেভাবে বিস্ময় অধ্যুষিত চোখে ঘরটা দেখবে, সেভাবে এখন ওটা দেখতে চেষ্টা করলাম; কোনও ড্রয়ারের হাতলে আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নেই, একটা আলপিন পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয়নি। কীভাবে কোনওরকম সাক্ষর না-রেখে তস্করচূড়ামণি ভেতরে ঢুকেছে এবং বেরিয়ে এসেছে, সে-কথা ভেবে ওরা কূল পাবে না। অবশ্য এখন, আমার অবস্থাও ওদেরই মতো।

ঢাকনাটা আস্তে নামিয়ে রেখে পা চালালাম। আমার বাতিল করা দু-নম্বর প্ল্যান ছিল অফিস-বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্যে কোনও দুঁদে চোরের সাহায্য নেওয়া—যদিও তাতে নিজের তরফে ভয়ের ব্যাপার কিছুটা ছিল। প্ল্যানের বুদ্ধি জুগিয়েছি বলে লুঠের সিংহভাগ আমারই নেওয়া উচিত—হয়তো তাই নেব। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার কিংবা গণ্ডগোলটা সেই নির্বোধ দুঁদে চোরকে নিয়ে। এমনও হতে পারে, সে হয়তো অন্য কোনও স্থূলবুদ্ধির কাজে ফেঁসে গিয়ে ধরা পড়ল, আর চট করে পুলিশে আমার নামটা বলে দিল; এ ছাড়া নিজের ভাগে সন্তুষ্ট না-হলে সে হয়তো আমাকে পরে ব্ল্যাকমেলও করতে পারে; কিংবা পাতি চোর-ছ্যাঁচোড়রা যেরকম বদমাইশ আর অকৃতজ্ঞ হয়, সেরকমটা হলে সে চুরির সময়েই আমাকে খুন করতে পারে।

এ ছাড়া আরও একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে দাগি চোরদের সঙ্গে মেলামেশা করলে চট করে পুলিশের নজরে পড়বার ভয় থাকে। আমি সাধারণ চোর-ডাকাতদের থেকে আলাদা।

রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে দেখতে পাই ঝকঝকে লাল জাগুয়ারে আমি বসে আছি। আমার ডানহাতের কবজিতে ওমেগার লেটেস্ট মডেল জ্বলজ্বল করছে। আমার ঘরের দেওয়ালে একশো ওয়াট আউটপুটের স্টিরিও সিস্টেম। মেঝেতে কাশ্মীরি কার্পেট। রেফ্রিজারেটর। টি-ভি। আরও কত কী!

দু-লাখ পঞ্চাশ হাজারে দুনিয়া কেনা যায়।

তখন এই অকিঞ্চিতকর নলিনী বিশ্বাস টেরিউলের স্যুট পরে সকিঞ্চিতকর নলিনী বিশ্বাস হয়ে যাবে। নারীজাতির প্রতি তার এতদিনকার অবহেলাজনিত দোষ সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠবে। এবং তাদের সীমাহীন প্রশ্রয় দেবে বলে সেই মুহূর্ত থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে নিজের কাছে। জেগে উঠবে নলিনীরঞ্জন রমণীমোহন বিশ্বাস।

লুঠের অবশিষ্ট যাবে বিভিন্ন অর্থকরী উদ্যোগের বিনিয়োগ ও লগ্নী হিসেবে। এভাবে আমার টাকা কয়েকবছরেই ফুলে-ফেঁপে উঠবে। হয়তো কুড়ি বছর পরে বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে দু-লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গুনে-গুনে আমি ফেরত পাঠাব অনন্ত করকে। সঙ্গে থাকবে রহস্যময় এক চিঠি। অথবা আমার মনের দয়ালু অংশটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি তৈরি করে দেব অবৈতনিক স্কুল, হাসপাতাল, কিংবা বিশ্বাস ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি।

এসব ভাবনায় কোনও ফাঁক নেই, শুধু একটা জিনিস ছাড়া: যদি কোনও মতলব মাথা থেকে বের করতে হয় তবে তা আজ রাতেই করতে হবে। কারণ, আজ শুক্রবার। কাল সেকেন্ড স্যাটারডে। অতএব শনি-রবি কোম্পানি বন্ধ। আর সোমবার থেকেই শুরু হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ লগ্নীর ধারাবাহিক কর্মসূচি। অর্থাৎ, সেদিন থেকে আমার রেফ্রিজারেটর, টি-ভি, স্টিরিও ইত্যাদির টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিতরণ করা হবে রাজ্যের অভাবী ব্যবসায়ীদের।

সুতরাং এই আড়াই লাখ নিয়ে উধাও হওয়ার আজই শেষ সুযোগ। মিস্টার কর এখনও ঘণ্টাখানেক অফিসে থাকবেন, এবং তারপর অল্পসময়ের জন্যে হলেও অফিস-বাড়িটাকে দখলে পাওয়া যাবে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা না-করে এ-সুযোগ আমি ছাড়ছি না।

সুতরাং পায়চারি করতে-করতে ঢুকে পড়লাম 'বুক কর্নার' দোকানটায়।

দোকানের মালিক মোহন সরকার।

রহস্য-গোয়েন্দাকাহিনির নেশা আমার বহুকালের। এবং সেই সূত্রেই মোহন সরকারের দোকানে আমার যাতায়াত এবং ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব। বই কিনি আর না কিনি, ঘেঁটে দেখতে আমার ভালো লাগে। আর সেই সুযোগে সন্ধান করি নতুন কোনও রহস্য গল্পের, যেটাকে বাস্তব চেহারা দেওয়া যায়। অর্থাৎ কেতাবী অপরাধে আমার বিরাট আস্থা আছে।

মোহনের বইয়ের দোকানে ঢুকে ম্যাগাজিনের র‍্যাকের কাছে এগিয়ে গেলাম। মোহন কয়েকটা অল্পবয়েসি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল—সম্ভবত বই কেনা-বেচার ব্যাপারেই। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসল। আমি নতুন রহস্য-গোয়েন্দাজাতীয় পত্রিকাগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগলাম।

একটু পরে মোহন আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কী দেখছিস?'

আমি ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'এই, কিছু না—' গোছের একটা ভঙ্গি করলাম। তারপর ওকে বললাম, 'একগ্লাস জল খাওয়া তো—।'

একটু পরেই ও একগ্লাস জল নিয়ে এল। বলল, 'কিনবি-টিনবি না, ফালতু ঘাঁটাঘাঁটি করিস না। বই লাট হয়ে গেলে খদ্দের নিতে চায় না।'

'আরে গর্দভ, ম্যাগাজিন লাট না-হলে মানায় না।' হেসে ওকে বললাম।

'এগুলো লাট হলে তোকে লাট করে দেব।'

এমন সময় দোকানে জনৈক প্রৌঢ় খদ্দের আসতেই মোহন 'আসছি' বলে চলে গেল সেদিকে।

আমার প্রথম দিককার পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে একটা ছিল মোহনের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। অনন্ত করের অফিস থেকে 'বুক কর্নার' বেশি দূরে নয়। অতএব, ক্ষীণ আশা ছিল যে, চিৎকার শুনে মিস্টার কর অন্তত দু-এক আঁজলা জল নিয়ে মোহনের দোকানে ছুটে আসবেন। এবং এই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অফিসের দরজা তিনি হাট করে খুলে রেখে আসবেন। তারপর...। কিন্তু এ-মতলবটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে একটা কারণে: মিস্টার কর কানে শুনতে পান না, অতএব আগুন লাগার চিৎকার-চেঁচামেচি তাঁর কানেই ঢুকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মোহনের প্রতি ঈর্ষায় সে-মতলবটাকে কাজে লাগাতে ইচ্ছে হল। ওর ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক লাগানো নতুন কাউন্টারকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখলে আমার ভালোই লাগবে। সত্যি, অঢেল পয়সার অভাব শরীরে বড় কাঁটা দেয়! ভাবতে-ভাবতে তেষ্টা পেল। হাতের গ্লাস তুলে মোহনের দেওয়া জলে চুমুক দিলাম। তারপর আচ্ছন্নের মতো কাকিয়ে রইলাম কাচের গ্লাসটার দিকে।

জল, মনে-মনে ভাবলাম। যদি একবার অফিসের নর্দমাগুলো বন্ধ করে জলের কলগুলো সব খুলে দেওয়া যায়? কালা হোক বা না হোক, ব্যাপারটা অনন্ত করের নজরে পড়বেই। তারপরই তিনি দৌড়বেন কলগুলো বন্ধ করতে। কিন্তু কলের ওয়াশারগুলো আগেই আমাকে কেটে রাখতে হবে। তা হলে কর অফিসের বাইরে ছুটে যাবেন সাহায্যের আশায়। তাড়াহুড়োতে যদি তিনি দরজা খোলা রেখে যান তা হলে তো কথাই নেই। আর দরজা বন্ধ করে গেলেও ওই হই-হট্টগোলে, লোকজনের ভিড়ে, আমি ঠিক কাজ হাসিল করে নেব। কিন্তু অফিসের চার-চারটে কল নিয়ে লটঘট করা, নর্দমা বন্ধ করা, এসব অত্যন্ত ঝামেলার কাজ। সুতরাং আনরিয়্যালাইজেবল।

মোহন সরকারের দেওয়াল-ঘড়ির টিক-টিক শব্দে আচ্ছন্নতা কাটল। ছ'টা বাজতে কুড়ি মিনিট। হাতে আর পঞ্চাশ মিনিট। বড় কম সময়।

আরও কুড়ি মিনিট পরে, ঘড়িতে যখন ছ'টা বাজল, তখন আমার দু-দুটো নতুন পরিকল্পনা বাতিল করা হয়ে গেছে। প্রথম, ওপরতলার টি-ভি কোম্পানির মেঝে খুঁড়ে করের অফিসে নেমে আসা। আর দ্বিতীয়টা, অফিস-বাড়ির ছাদ থেকে সটান গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে করের অফিসে হাজির হওয়া। তা হলে কোনও চাবি-টাবির আর দরকার নেই।

মোহনের দিকে ফিরে তাকালাম। ও কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী একটা বই দেখছে।

'মোহন, তোকে দরজা-জানলা বন্ধ একটা ঘরে বন্দি করে রাখলে কী করে বেরোবি?' বুঝতে পারলাম, নেহাতই সময় কাটাচ্ছি।

'বেরোব না।' বই থেকে চোখ না-তুলেই মোহন জবাব দিল।

অতএব বেরোতে আমিও পারব না।

আরও একটা মূল্যবান মিনিট নষ্ট হল। একইসঙ্গে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে লাগল চকচকে লাল জাগুয়ার, ওমেগার লেটেস্ট মডেল, একশো ওয়াট আউটপুটের স্টিরিও-সিস্টেম, কাশ্মীরি কার্পেট, রেফ্রিজারেটর, টি-ভি...স্পষ্ট দেখলাম, লাস্যময়ী ললনার দল আমাকে হাত নেড়ে বিদায় নিচ্ছে। উঠছে গিয়ে মোহন সরকারের গাড়িতে।

ওহে বিশ্বাসবাবু, তুমি বুদ্ধিমান, তস্করকুলশিরোমণি হতে পারো, কিন্তু স্বীকার করে নাও, বুড়ো অনন্ত করের কাছে তুমি হেরে গেছ।

স্বীকার করে নিয়েই আনমনাভাবে হাত বাড়ালাম ম্যাগাজিন র‍্যাকের দিকে। তুলে নিলাম নতুন এক কপি 'মাসিক ক্রিমিনাল'। পাতা উলটেই যে-লেখাটা বেরোল সেটাই পড়তে শুরু করলাম:

বন্ধ ঘরের রহস্য

চিন্তাহরণ চাকলাদার

লালবাজারে ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী চুপচাপ চেয়ারে বসেছিলেন। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া। তিনি ভাবছেন ইন্সপেক্টর যুধাজিৎ সেনের কথা। এমন সময় ঘুরে ঢুকলেন লালবাজারের সেই বিখ্যাত প্রতিভাধর অফিসার যুধাজিৎ সেন। নিজের কর্মদক্ষতার জন্য ডি. সি.-র কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয়। তাঁকে ঢুকতে দেখেই ডি. সি. বললেন, 'বোসো, সেন। তোমার কথাই ভাবছিলাম। কী অদ্ভুত যোগাযোগ বলো!' একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'গত রাতে যশবীর মেহেরা নামে এক কোটিপতির ঘরে প্রায় দু-লাখ টাকা দামের একটা নেকলেস চুরি গেছে। মেহেরার বাড়ি সাদার্ন অ্যাভিনিউ। এই নাও তাঁর বাড়ির ঠিকানা।' সেনের দিকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন তিনি, 'এ-কাজে চৌধুরী আর বোস তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে।'

এইবার হাসলেন যুধাজিৎ সেন। বললেন, 'আমি ঠিক এটাই আশা করছিলাম, স্যার।' চেয়ারে আর-একটু আরাম করে বসলেন। চোখের সানগ্লাসটা খুলে রাখলেন টেবিলের ওপরে। ডি. সি.-র স্নেহ ও প্রশ্রয়ে যুধাজিৎ সেন যেন তাঁর বন্ধু হয়ে গেছেন। চোখ নাচিয়ে

তিনি বললেন, ‘কিন্তু আপনাকে আমি এ-কথাই বলতে এসেছি যে, ঠিক দশমিনিট আগে আমি মেহেরা নেকলেস কেস সলভ করে ফেলেছি। নেকলেসটা এখন পুলিশ হেফাজতে। কেস মিটলেই মিসেস মেহেরা ওটা ফেরত পেয়ে যাবেন। আর নেকলেস-চোর এখন লক-আপে বিচারের অপেক্ষায়।’

‘আশ্চর্য!’ অবাক বিস্ময়ে বললেন সমীর চক্রবর্তী, ‘কী করে ধরলে চোরকে?’

‘বলছি।’ সুবিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবরের চোখে ঝিলিক মারল খুশি। পকেট থেকে পাঁচশো পঞ্চান্নর একটা প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখলেন তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, ‘কেসটা বড় অদ্ভুত, আর একইসঙ্গে বড্ড কমপ্লিকেটেড’। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কী বিচিত্র ঘটনাচক্রেই না চোরকে আমি গ্রেপ্তার করেছি। তখন আমি জানিই না মেহেরাদের নেকলেস চুরি গেছে। গতকাল রাত দশটা নাগাদ আমি বাড়িতেই ছিলাম। সোফায় আরাম করে বসে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলাম। হঠাৎই শুনতে পেলাম দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি বেঁটেখাটো রোগা চেহারার একজন যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রথমে সে বিরক্ত করার জন্যে কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইল, তারপর জানাল যে, তার গাড়িটা আমার বাড়ির সামনে হঠাৎই বিগড়ে গেছে। কাছাকাছি কোনও মোটর গ্যারেজ নেই। আর এত রাতে লোকজনের সাহায্য পাওয়াও মুশকিল। সুতরাং আমি যদি আমার ফোনটা ব্যবহারের অনুমতি দিই তা হলে সে বাড়িতে ফোন করে একটা খবর দিতে পারে।

‘প্রথমটায় আমি তাকে ঠিক চিনে উঠতে পারিনি, কিন্তু তার অতিরিক্ত শৌখিন ভদ্র ব্যবহার আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। ফোন করা হয়ে গেলে আমি তাকে এগিয়ে দিলাম গাড়ি পর্যন্ত। আর তখনই মেহেরার নেকলেসটা আমার নজরে পড়ল—ওটা গাড়ির পেছনের সিটে নিরীহভাবে পড়ে ছিল। তখন নেকলেসটার ঠিকুজি-কুষ্ঠি না-জানলেও এটুকু বুঝেছিলাম, ওটার দাম কম করেও আকাশছোঁয়া। সুতরাং লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চেপে ধরলাম এবং খুব সহজেই সে সবকিছু স্বীকার করে বসল। তার নাম প্রশান্ত সরখেল। অসমসাহসী এবং বুদ্ধিমান সিন্দুক-ভাঙিয়ে হিসেবে নীচু মহলে তার নাম-ডাক আছে। গত কয়েকবছরে গোটা ভারত জুড়ে যেসব "আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব" চুরি-ডাকাতি হয়েছে, সেসব তারই কীর্তি। তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সমস্ত রাজ্যের পুলিশ।’

‘একেই বলে ঘটনাচক্র!’ সিগারেটটা টেবিলের ওপরে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ডি. সি. বললেন, ‘তোমার তারিফ করতে হয়।’

দারুণ, মনে-মনে বলে উঠলাম। তারপর পাতা ওলটালাম।

যুধাজিৎ সেন সামান্য হেসে মাথা ঝোঁকালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, ‘ঘটনাচক্রই বটে। তবে আমার কৌতূহল হচ্ছিল কী করে সরখেল এই অসম্ভব কাজ হাসিল করল। সুতরাং সরখেলের কাছ থেকে মেহেরা ম্যানসনের ঠিকানা নিলাম। নেকসেটা রাখলাম নিজের হেফাজতে। আর ওকে হাত-পা বেঁধে বন্দি করে রাখলাম বাড়িতে। তারপর রওনা হলাম সাদার্ন অ্যাভিনিউর দিকে।

‘রাত তখন এগারোটা। কিন্তু মেহেরা ম্যানসন আলোকসজ্জা আর মণ্ডপসজ্জায় ঝলমল। শুনলাম, মিসেস মেহেরার ছোট ছেলের আজ জন্মদিন। তাই এই উৎসব। বাড়ি অতিথি-অভ্যাগতে ভরপুর। চারপাশে রঙচঙে ব্যস্ত মানুষজনের আনাগোনা। আমি একজন সুন্দরী

তরুণীর পথ আটকে জানতে চাইলাম মিস্টার মেহেরাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে। বিশেষ দরকার। তরুণীটি জানাল, মিস্টার মেহেরা দোতলায় তাঁর স্ত্রী ও ছেলের কাছে আছেন।

'সুতরাং দোতলায় উঠলাম। কেউই আমাকে বাধা দিল না। উৎসব বাড়িতে কে-ই-বা কার খবর রাখে! যেমনটা হয়েছিল প্রশান্ত সরখেলের বেলায়। দোতলায় পৌঁছে খোঁজাখুঁজি করতে হল না। দেখলাম একটা ঘরের দরজায় নিওন সাইনে লেখা 'হ্যাপি বার্থডে' এবং সেই ফুলে আলোয় সাজানো ঘর থেকে পাঁচমিশেলি হইহুল্লোড় ভেসে আসছে। সুতরাং সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

'বাচ্চা-মেহেরাকে সাজিয়েগুজিয়ে একটা সুন্দর খাটে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে ঘিরে আত্মীয়-পরিজন অতিথিদের সমাবেশ। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই গুঞ্জন নীচু পরদায় নেমে এল। সকলেরই চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। আমি নীরবে পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে তুলে ধরলাম। গম্ভীর গলায় বললাম, অ্যাটেনশান প্লিজ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। মিস্টার মেহেরা কোথায়?

'আমার প্রশ্নে বাচ্চাটার পাশ থেকে বছর চল্লিশের জনৈক ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। চোখে চশমা, পুরুষ্টু গোঁফ। আমার সামনে এসে থামলেন তিনি: ইয়েস?

'আপনার স্ত্রীর একটা দামি নেকলেস চুরি গেছে।' শান্ত স্বরে বললাম।

'এ-খবরে সব্বাই নির্ঘাত চমকে গেছে।' টেবিলে টোকা মারতে-মারতে ডি. সি. চক্রবর্তী বললেন।

'সে আর বলতে!' সিগারেটে এক সুদীর্ঘ টান দিয়ে যুধাজিৎ সেন বললেন, 'নেকলেসটা যে ফিরে পাওয়া গেছে সে-কথা বলে ওঠবার আগেই একজন সুন্দরী মহিলা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঘরের মাঝখানে। সম্ভবত মিসেস মেহেরা। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, ঘণ্টাদুয়েক আগে নেকলেসটা সবাইকে দেখিয়ে মিসেস মেহেরা একতলার ভল্টে রেখে আসেন। এবং সেই ভল্ট পরিদর্শনের জন্যে তিনি অতিথিদের আহ্বান জানান। সঙ্গে-সঙ্গেই আমি অনুমান করলাম, সরখেলও নিমন্ত্রিতদের ছদ্মবেশে সেই ভল্টে সকলের সঙ্গে ঢুকেছিল। অবশ্য এটা নেহাতই সহজ কাজ।'

তারপর কী হল? মনে-মনে প্রশ্ন করে পাতা ওলটালাম।

যুধাজিৎ সেনের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে উৎসুক চোখে তাকালেন ডি.সি.।

লালবাজারের তীক্ষ্নধী অফিসার বলে চললেন, 'ভল্টের ভেতর একটা সিন্দুকে ছিল নেকলেসটা। তার সঙ্গে অন্যান্য গয়নাও ছিল। ভল্টের একটাই মাত্র দরজা—কোনও জানলা নেই। সেই দরজার চাবি সবসময়েই থাকে মিসেস মেহেরার কাছে। যদিও দরজার নকল চাবি তৈরি করতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তাতে উপকার হবে সামান্যই। কারণ, দরজায় লাগানো আছে একটা বিপদঘণ্টি। দরজা খুললেই সেই ঘণ্টি বাজতে শুরু করে। বিপদঘণ্টিটা বন্ধ করা যায় একমাত্র ভল্টের ভেতর থেকে। এবং সেটা করতে গেলেও তিনটে চাবির দরকার। এ ছাড়া, একটুও না-বাজতে যদি সেই ঘণ্টি বন্ধ করা হয়, তা হলে ভল্টের দরজা আর খুলবে না—বাইরে থেকেও না, ভেতর থেকেও না।'

'এ যে ময়দানবের দুর্গ!' অবাক হয়ে বললেন চক্রবর্তী।

'মেহেরা দানবের দুর্গ।' হেসে বললেন যুধাজিৎ সেন, 'তবে এ-দুর্গকে হার মানিয়েছে প্রশান্ত সরখেল। আমার অনুমান, অন্য সব অতিথিদের সঙ্গে সে ভল্টে ঢোকে, এবং মিসেস মেহেরার অলক্ষ্যে সিন্দুকের পেছনে লুকিয়ে থাকে। অন্যান্য অতিথিরা ভল্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান। সব শেষে যান মিসেস মেহেরা। নেকলেসটা সিন্দুকে বন্ধ করে বিপদঘণ্টি চালু করে তিনি বাইরে থেকে ভল্টের দরজা বন্ধ করে দেন। আমরা জানি প্রশান্ত সরখেল পাকা সিন্দুকবাজ। সুতরাং, সিন্দুক খুলে নেকলেস হাতানো তার কাছে নিতান্তই ছেলেখেলা। কিন্তু ওই বন্ধ ভল্ট থেকে বিপদঘণ্টি না-বাজিয়ে সে বেরোল কেমন করে?'

যুধাজিৎ সেন সিগারেটের শেষ টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেটটা রাখলেন পকেটে। তারপর টেবিলে রাখা সানগ্লাসটার গায়ে আঁচড় কাটতে লাগলেন। সানগ্লাসের দিকে নজর স্থির রেখেই তিনি বললেন, 'কেমন করে সরখেল বেরোল সে-কথা জানার জন্যে আমি মিসেস মেহেরাকে বললাম আমাকে সেই ভল্টে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে।' শান্ত স্বরে কথা শেষ করলেন যুধাজিৎ সেন।

'সাবাস!' বললেন ডি. সি., 'তোমার তুলনা নেই, সেন। কিন্তু তুমি বেরোলে কেমন করে?'

যুধাজিৎ সেন চোখ তুলে তাকালেন। মুখে ধূর্ত হাসি। বললেন, 'ভেবেই দেখুন না।'

'দরজা ড্রিল দিয়ে ফুটো করে?' সমীর চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন।

'উঁহু। মনে রাখবেন, সরখেল ঠিক যে-কায়দায় ওই ঘর থেকে বেরিয়েছে আমাকেও ওই একই কায়দায় বেরোতে হয়েছে। আর, একটা গোটা ড্রিল সঙ্গে করে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে কোনও মতেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া ভল্টের মধ্যে কোনওরকম খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন আমার নজরে পড়েনি।'

'তা হলে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কেউ তোমাকে বেরোতে হেল্প করেছে।' সমীর চক্রবর্তী তাঁর দ্বিতীয় অনুমান উচ্চারণ করলেন।

'না।'

'ফলস দেওয়াল?'

'উঁহু—।'

'লুকোনো দরজা?'

'তাও নয়।'

'দে বইটা দে।' হঠাৎ পেছন থেকে মোহনের গলা শুনতে পেলাম—শুনে চমকে উঠলাম।

'দাঁড়া, আর-একটু—।'

কিন্তু তার আগেই মোহন লোমশ হাত বাড়িয়ে বইটা ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে।

'যা, কাট। বললাম শালা বইগুলো লাট হয়ে যাবে, তাও—।'

'এই, মোহন—প্লিজ। শুধু ওই গল্পটা শেষ করতে দে।'

'হ্যাঁ, শেষ করতে দিই, আর পাতা উলটে দেখবি গল্পটার শেষে "ক্রমশ" লেখা আছে। ব্যস, তখন যে ক'মাস ওই গল্পটা শেষ না-হবে, সে ক'মাস তুমি আমাকে জ্বালাতে আসবে।'

ভগবানকে ডাকলাম, যেন মোহনের ধারণা ভুল হয়। 'বন্ধ ঘরের রহস্য' যেন এই সংখ্যাতেই শেষ হয়। কিন্তু অতীতে মাসিক 'ক্রিমিনাল' যে এরকম করেনি তা নয়। যুধাজিৎ সেন ও সমীর চক্রবর্তীকে মাসের পর মাস একই কাহিনি নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাঁদের খাওয়া নেই দাওয়া নেই, শুধু সিগারেটের পর সিগারেট উড়িয়ে মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত টেবিলে বসে একটাই রহস্যের সমাধান করে গেছেন। জানি না, অনেক পাঠক হয়তো এই মাসিক উৎকণ্ঠা পছন্দ করেন, কিন্তু আমি করি না। আমি ঝাড়াঝাপটা রহস্য পছন্দ করি। গল্পের রহস্যের কায়দা ও চালাকি মেশানো সমাধান আমার মোটেই ভালো লাগে না।

কিন্তু সে-কথা মোহনকে বোঝানোর প্রয়োজন দেখলাম না। শুধু বললাম, 'শোন, মোহন, ওই গল্পটা যদি এই সংখ্যাতেই শেষ হয়ে থাকে তা হলে ম্যাগাজিনটা আমি কিনব।'

'কিনবি? তুই?' ওর চোখ-মুখে হালকা বিস্ময়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ছ'টা পনেরো।

'বল। রাজি?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'ঠিক আছে।' নিমরাজি হয়ে মোহন বলল, 'তবে আমি দেখব গল্পটার শেষ আছে কি না। তোর কথায় আমি বিশ্বাস করি না।'

অপমানটা গায়ে না-মেখে বললাম, 'আয়, দুজনে মিলেই দেখি।'

দেখলাম।

দুজনে একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে পাতা উলটে চললাম।

দু-পাতা পরেই গল্পটা শেষ হয়েছে। (যুধাজিৎ সেনকে তা হলে বেশি কষ্ট করতে হয়নি)। দেখলাম, গল্পের নীচে লম্বা ড্যাশ—অর্থাৎ গল্প শেষ। একইসঙ্গে শেষ দুটো লাইনে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

'ও, তা হলে এই ব্যাপার,' বললেন সমীর চক্রবর্তী, 'সাবাস, সেন! তোমার জবাব নেই!'

মোহন ডানহাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিল—দামের জন্যে।

'এই নে—'পকেট থেকে পুরোপুরি তিনটে টাকা বের করে ওর হাতে দিলাম। বললাম, 'কমিশন চাই না। বাড়তি পয়সাটা তোর বই লাট করার ফাইন হিসেবে রেখে দে।'

দেওয়াল ঘড়িতে ছ'টা সতেরো।

'আজকের দিনটা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।' হেসে বলল মোহন, 'কারণ, তুই পুরো দাম দিয়ে আমার দোকান থেকে ম্যাগাজিন কিনেছিস।'

আমি চট করে ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু ও আরও তৎপর। ঝটিতি ওটা লুকিয়ে ফেলল পেছনে। হাসল দাঁত বের করে—অনেকটা বাঁদরের মতো। ডারউইন হাজির থাকলে এই মুহূর্তে মোহন সরকারকে মিসিং লিংক ভেবে তুলে নিয়ে যেতেন।

'ম্যাগাজিনটা তোর ভীষণ দরকার, নারে?'

'জানিস তো রহস্য গল্প আমার ভালো লাগে?'

'তাই নাকি? দেখি তো এই "বন্ধ ঘরের রহস্য"-তে কী এমন আছে। তোর ইন্টারেস্ট দেখে মনে হচ্ছে এ-গল্পের নায়ক নির্ঘাত ছুঁড়ি নিয়ে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিয়েছে।'

'নারে।' ওকে বললাম, 'বিস্ময়কর প্রতিভা যুধাজিৎ সেন শুধু রহস্যই ভালোবাসে, অন্য কিছু নয়।'

তা সত্ত্বেও মোহন গল্পটা উলটেপালটে দেখতে শুরু করল। আমি কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছেড়ে র‍্যাকের দিকে ফিরলাম। পয়সা যখন দিয়েছি, তখন দ্বিতীয় এককপি 'মাসিক ক্রিমিনাল' পড়বার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাকে দ্বিতীয় কোনও কপি দেখলাম না। কলকাতায় 'মাসিক ক্রিমিনাল'-ভক্তদের সংখ্যা অস্বাভাবিক। হয়তো মোহন সরকারের হাতের কপিটাই এ-শহরের শেষ কপি। হয়তো পৃথিবীরও শেষ কপি।

ঘড়িতে ছঁটা কুড়ি।

সুতরাং আবার কাড়াকাড়ি অধ্যায় শুরু করলাম।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিচ্ছি।' মোহন বলল, 'তবে তুই যা চাইছিস, ফষ্টিনষ্টি, সেসব এ-গল্পে নেই। দাঁড়া, ম্যাগাজিনটা প্যাক করে দিই।'

'না, না, ওসবের দরকার নেই। আমি গল্পটা পড়তে-পড়তে যাব।'

'আজ বড় পবিত্র দিন।' হেসে বলল মোহন। আমার ডারউইনের কথা আবার মনে পড়ল। তারপর: 'তুই আমার দোকান থেকে প্রথম বই কিনলি, সুতরাং এ-বই আমি জন্মদিনের রঙিন মোড়কে না-মুড়ে ছাড়ছি না।'

দোকানে অন্য খদ্দের নেই। সুতরাং মোহনের সব নজর এখন আমারই দিকে। বইটা হাতে করে ও অদৃশ্য হয়ে গেল কাউন্টারের পেছনে। আমার উৎকণ্ঠিত চোখের সামনে ঘড়িতে সময় বয়ে যায়: ছ'টা বাইশ, ছ'টা তেইশ, ছ'টা চব্বিশ।

ছ'টা পঁচিশে আমাকে ডারউইনের কথা তৃতীয়বার মনে করিয়ে দিয়ে মোহন বেরিয়ে এল কাউন্টারের পেছন থেকে। ম্যাগাজিনটাকে গোলাপি ফুল ছাপা কাগজে মুড়ে ও সোনালি ফিতে দিয়ে বেঁধে এনেছে।

'পত্রিকা কেনার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।' হেসে বলল মোহন।

ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম দোকান ছেড়ে। মোড়কটা ব্যস্ত হাতে ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে চললাম অফিসের দিকে। চঞ্চল বইয়ের পাতায় আমার চোখও চঞ্চল:

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও আমাকে।' চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন ডি. সি. চক্রবর্তী।

'ভাবুন স্যার।' বললেন যুধাজিৎ সেন, 'আরাম করে ভাবুন।' তাঁর চোখে দুষ্টুমির হাসি।

সামনের ড়ি সি. এম. শো-রুমের দেওয়াল-ঘড়িতে ছ'টা সাতাশ।

'কোনও যন্ত্রপাতি সঙ্গে ছিল না বলছ?' প্রশ্ন করলেন সমীর চক্রবর্তী।

আগেই তো সে-কথা আপনাকে একশোবার বলা হয়েছে, বিরক্ত হয়ে ভাবলাম।

'না।' যুধাজিৎ সেন ঠোঁটে হাসলেন—বাচ্চা ছেলের ব্যর্থতায় অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাসি:'সাধারণ কোনও মানুষের কাছে সাধারণ যেসব জিনিস থাকে আমার কাছে তার বেশি ছিল না। মানিব্যাগ, চিরুনি আর রুমাল।'

'মানিব্যাগটা নিশ্চয়ই সাধারণ মানিব্যাগ নয়?' ধূর্তস্বরে প্রশ্ন করলেন সমীর চক্রবর্তী।

যুধাজিৎ সেন হাসি চেপে বললেন, 'আপনি ভুল পথে চলেছেন, স্যার।

সরখেল এবং আমি শুধুমাত্র উপস্থিতবুদ্ধি ভাঙিয়ে ওই ভল্ট থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

'দারুণ! তুলনা নেই।' মনে-মনে বললাম। ম্যাগাজিনটাকে ঢুকিয়ে নিলাম জামার ভেতর। কারণ, আমি এখন অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু অনন্ত কর ভেতরে আছেন তো?

বেল বাজালাম। কোনও উত্তর নেই।

দরজায় দমাদম ঘুষি মারলাম। উত্তর নেই।

এবার চিৎকার করে উঠলাম, 'মিস্টার কর, মিস্টার কর?'

অরণ্যে রোদন।

রাস্তার ওপারে স্টেট ব্যাংক বিল্ডিংয়ের ঘড়িতে ছ'টা উনত্রিশ। বুড়ো নির্ঘাত ভেতরেই আছে, মনকে প্রবোধ দিলাম নীরবে। যদি কোনও লোক সাড়ে পাঁচটায় বলে আমাকে এখনও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হবে, তা হলে ছ'টা ঊনত্রিশে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকারই কথা।

আরও মিনিটখানেক দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পর আসল রহস্যটা মাথায় ঝিলিক মারল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, অনন্ত কর কানে শুনতে পান না। তা হলে তিনি নিশ্চয়ই ভেতরে আছেন। সাড়া দিচ্ছেন না আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন না বলে। সুতরাং নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে গেলাম চিঠি ফেলার গর্তের কাছে। উঁকি মারলাম। তাঁর টেবিলের আলোর রেশ অফিসের দেওয়াল থেকে ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু অফিসের 'এল' আকৃতির জন্যে অনন্ত কর আমার নজরের আড়ালে।

'মিস্টার কর!' আমি চিৎকার করলাম (ছ'ইঞ্চি চওড়া গর্তে যতখানি জোরে চিৎকার করা সম্ভব) 'মিস্টার কর, আমি বিশ্বাস!'

'বিশ্বাস?' তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, বিস্ময়।

'হ্যাঁ, স্যার, আমি!' ভোক্যাল কর্ডের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে উত্তর দিলাম।

'সে কী? আমি তো জানি তুমি অনেকক্ষণ আগে চলে গেছ।'

'হ্যাঁ, চলে গেছি! এখন আমি অফিসের বাইরে, মিস্টার কর! চিঠি ফেলার গর্তের কাছে!'

'ও।' অনন্ত করের গলায় দিশেহারা সুর, 'তা কী ব্যাপার, ফিরে এলে যে?'

'আমার ফাউন্টেন পেনটা ফেলে গেছি!' চিৎকার করে বললাম।

মানসচক্ষে দেখতে পেলাম অনন্ত কর গম্ভীরভাবে বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ছেন। সৌভাগ্যবশত আমার পরিকল্পনার একটা প্রধান অংশ ছিল দিনের-পর-দিন অনন্ত করের কাছে নিজেকে গর্দভ প্রতিপন্ন করা। কবে এই ইমেজ কাজে লাগবে, সে-কথা না-ভেবেই ফাইল উলটোপালটা জায়গায় রেখেছি, হিসেবে ভুল করেছি, অফিসে সুযোগ পেলেই হোঁচট খেয়ে পড়েছি, বোকার মতো মিসেস রাও এবং মিস্টার করকে প্রশ্ন করেছি, এবং নিজের টুকিটাকি জিনিস প্রায়ই ভুল করে ফেলে গেছি অফিসে। এজন্যে বারদুয়েক আমার চাকরি যেতে-যেতে বেঁচে গেছে। কিন্তু আজ, দু-মাস পরে, আমার সেই গর্দভ-ইমেজ কাজে লাগছে। বড় আনন্দের কথা।

'দাড়াও, নলিনী, দরজা খুলছি।' মিস্টার কর চেয়ার ঠেলে (শব্দ শুনে অনুমান করলাম) উঠে দাঁড়ালেন।

আমি স্থির চোখে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। কর অফিসের বাঁক ঘুরে আমার নজরবন্দি হলেন, এবং আমিও লেটার বক্স ছেড়ে এগিয়ে গেলাম বন্ধ দরজার কাছে।

দরজাটা সামান্য খুলে তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'এই সেদিন ম্যানিব্যাগ ফেলে গিয়েছিলে, আজকে আবার পেন?'

অবাক হতে যাচ্ছি, খেয়াল হল নিজের একটু আগে বলা মিথ্যে কথাটা: অফিসে পেন ফেলে গেছি।

'হ্যাঁ, স্যার,' সলজ্জ হাসলাম।

'আজ রাতটা পেন না-হলে চলছিল না?'

'মানে, একজনকে চিঠি লিখতে হবে, স্যার। তাই...'

অদ্ভুতভাবে হাসলেন কর, বললেন, 'প্রেমপত্র?'

চুপ করে রইলাম। জানি না, এসব প্রশ্নরাশির মহান কারণটা কী। তবে আমার মুখে বোধহয় একটা হতাশ বোকা-বোকা ছাপ স্পষ্ট হয়েছিল। কারণ, কর হঠাৎই সদয় হয়ে বললেন, 'এসো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। আমাকে ভেতরে ঢুকতে জায়গা দিলেন।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের কাছে। বিভিন্ন ড্রয়ার ফাইলপত্র ঘাঁটতে শুরু করলাম। মিস্টার অনন্ত কর দরজায় দাঁড়িয়ে পেচকজাতীয় চোখে আমাকে লক্ষ করতে লাগলেন। আমার পরিকল্পনায় তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল না।

‘কোথায় যে গেল পেনটা!’ উচ্চগ্রামে স্বগতোক্তি করলাম, ‘ওটা না-পেলে আজ ভীষণ মুশকিল হবে।’ আরও একটা ড্রয়ারকে ব্যবচ্ছেদ করতে শুরু করলাম: ‘পেনটা একজন আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল।’ অকারণেই যোগ করলাম।

মিস্টার করের মুখমণ্ডলে এবার যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল অল্প আলোয় সেটাকে বিরক্তি ও করুণার মিশ্রণ বলে চিনে নিতে ভুল হল না। তিনি থপথপ করে অফিসের বাঁক ঘুরে নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে ক্লান্ত স্বরে বললেন, ‘যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না, বিশ্বাস।’

বললাম, ভুলব না এবং ড্রয়ার ইত্যাদি নিয়ে আরও মিনিটখানেক খটাখট করার পর চিৎকার করে উঠলাম, ‘এই তো পেয়েছি! আলপিনের বাক্সের পেছনে পড়ে ছিল!’ গলার স্বর তুঙ্গে রেখেই বললাম, ‘আমি চললাম, মিস্টার কর!’

‘আচ্ছা—’ তাঁর আনমনা উত্তর শোনা গেল। রেলিংটা একলাফে টপকে দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা খুলে সশব্দে আবার বন্ধ করে দিলাম। তারপর পা টিপে-টিপে ফিরে এসে লুকিয়ে রইলাম আমার টেবিলের তলায়। জায়গাটা যেন একটা ছোট্ট গুহা, তবে সামান্য আলোর রেশ রয়েছে। সুতরাং ‘মাসিক ক্রিমিনাল’টা বের করে পড়তে শুরু করলাম। ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী এখনও হালে পানি পাচ্ছেন না।

‘আমি হার মানলাম, সেন।’ ডি. সি. মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বললেন। মুখে তাঁর এখনও কৌতূহলের ছায়া।

‘কী যে বলেন—’ হাসলেন যুধাজিৎ সেন: ‘আমি আর প্রশান্ত সরখেল পারলাম, সেখানে আপনি পারবেন না! বিশেষ করে আপনার এত বছরের পুলিশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। দাঁড়ান, পুরো ব্যাপারটা আর-একবার আপনাকে গুছিয়ে বলি। আপনি একটা ভল্টে বন্দি হয়ে রয়েছেন—।’

মিস্টার করের আলোর নিভে গেল। শুনতে পেলাম তাঁর এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। আমিও শব্দহীন, যদিও জানি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্গো নাচ নাচলেও মিস্টার করের মৃত কর্ণদ্বয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হবে না। চুপিচুপি গিয়ে তাঁর কানের কাছে আচমকা এক চিৎকার করতে ভীষণ ইচ্ছে হল। দেখতাম, বুড়ো কীরকম চমকে ওঠে। কিন্তু এখন বোকামি করার সময় নয়।

রুদ্ধশ্বাসে শুনলাম শীততাপ যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়ার শব্দ। শুনলাম বিপদঘণ্টি চালু করার শব্দ। দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ। এবং সবশেষে তালার চাবি ঘোরানোর মিষ্টি আওয়াজ।

আরও একমিনিট ঘাড় গুঁজে টেবিলের তলায় বসে রইলাম—অতিরিক্ত সাবধানতায়। তারপর একলাফে বাইরে এলাম। কলকাতার অন্যতম ধনী নাগরিক হতে আর মাত্র দু-পৃষ্ঠা (মাসিক ক্রিমিনালের) এবং দশমিনিট বাকি।

অফিসে কোনও জানলা নেই। সুতরাং একটা আলো জ্বালতে বাধা নেই। ইচ্ছে হলে সবকটা আলোই জ্বালাতে পারি, কিন্তু সে-আলো শীততাপ যন্ত্রের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকের নজরে পড়তে পারে। এছাড়া প্রতিফলিত আলোকেও বিশ্বাস নেই। তার ওপর চিঠি ফেলার গর্ত তো রয়েছেই। হয়তো দেরিতে আসা কোনও দ্বিতীয় বিশ্বাস সেই গর্ত

নিয়ে দেখছে এবং টাকা লুঠের মতলব ভাঁজছে। এখন অতিরিক্ত সাবধান হওয়ার সময়। আলিপুর জেল ও কলকাতার মুক্ত বাসিন্দাদের মধ্যে ফারাক শুধু এই অতিরিক্ত সাবধানতাটুকুর। সুতরাং শুধুমাত্র দেশলাই জ্বালানোর ঝুঁকি নেব ঠিক করলাম।

নিজের পকেট ও টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে স্পষ্ট বুঝলাম, সে-ঝুঁকিও আমাকে আর নিতে হবে না। কারণ দেশলাই কোথাও নেই। এই দুঃখের মুহূর্তে মনে পড়ল, একটা পকেট-টর্চ আমি কিনেছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র সিন্দুক লুঠ করবার তোড়জোড় শুরু করেছি। সযত্নে সংগ্রহ করেছি হিন্দি-সিনেমাজাতীয় পোশাক, (কালো প্যান্ট, কালো জামা, কালো মুখোশ—তাতে শুধু চোখের কাছে দুটো ফুটো এবং কালো রবারের জুতো) যাতে কেউ আমাকে অফিস-বাড়ি থেকে বেরুতে দেখলেও 'আমি' বলে সন্দেহ না করে। মনে পড়ছে, টর্চ লাইট ও পোশাকগুলো কিনেছিলাম নাকতলা অঞ্চল থেকে, যাতে কেউ পরে মধ্য কলকাতার অপরাধের দায়ে আমাকে শনাক্ত করতে না-পারে। এখন সেই চুরির সাজপোশাক, টর্চলাইট, সব পড়ে আছে খাটের নীচে।

আমার মতো প্রতিভাধর পুরুষও একমুহূর্তের জন্যে হতাশ হল। সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তার মাঝে শুনতে পাচ্ছি ওপরতলার টি-ভি কোম্পানির লটঘট কাণ্ড। কোম্পানির মালিক সুরোলিয়াকে সেক্রেটারি পামেলা হয়তো এই নিয়ে তৃতীয়বার 'অবৈধ সুরোলিয়া, জুনিয়ার' উপহার দিতে চেষ্টা করছে। তাই বোধহয় এত গানবাজনার আওয়াজ, খিলখিল হাসির শব্দ।

সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আমার আর প্রশান্ত সরখেলের পরিস্থিতির মধ্যে আর-একটু মিল খুঁজে পেলাম। অন্ধকার ভল্টে সরখেল যখন বন্দি, তখন ওপরতলা থেকে ভেসে আসছে আত্মীয়-পরিজনের হই-হুল্লোড়ের শব্দ। মিসেস মেহেরা ছেলের জন্মদিন-উৎসব নিয়ে খুশি জাহাজ। আর এখানে সুরোলিয়ার ছেলের আসল জন্মমুহূর্ত স্থির করে উঠতে পামেলা চিন্তা ও হুইস্কিতে মগ্ন। বড় পবিত্র মুহূর্ত।

হঠাৎই মনে পড়ল, অফিসে এসে অনন্ত কর রোজ ধূপ জ্বালান। সিন্দুকের মাথায় রাখেন। তখন আমি কোনও কথা জিগ্যেস করতে গেলে বলেন, 'এখন নয়, বিশ্বাস। এ বড় পবিত্র মুহূর্ত।' অতএব এই অফিসে, সম্ভবত পানিকরের ড্রয়ারে, নির্ঘাত কোথাও-না-কোথাও দেশলাই আছে।

চার সেকেন্ড পরেই বিশ্বাস-উপপাদ্যের সত্যতা প্রমাণিত হল। আমি বারদুয়েক পা ফেলে এগিয়ে গেলাম সিন্দুকের কাছে—হাতে দেশলাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই পিছিয়ে করের টেবিলের কাছে ফিরে এলাম।

কারণ, গ্লাভস আনতে ভুলে গেছি।

কিন্তু আইনস্টাইন নলিনী বিশ্বাস এতে স্তব্ধ হওয়ার নয়। নিপুণ দক্ষতায় রুমাল বের করে বাঁহাতে জড়িয়ে নিলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম মিসেস রাওয়ের টেবিলে। দেশলাইটা রাখলাম। তারপর টাইপ করার টিস্যু কাগজ গোটাকয়েক জড়িয়ে নিলাম ডানহাতে। কাগজের কোনাগুলো গঁদ দিয়ে সেঁটে দিলাম হাতে। এবার দেশলাই নিয়ে সুরোলিয়ার বাজনার তালে-তালে হাজির হলাম সিন্দুকের কাছে।

ডানদিকে ষোলো। বাঁদিকে এগোরো। ডানদিকে ছাব্বিশ।

ক্লিক।

হাতল ঘুরিয়ে টান মারতেই সিন্দুক খুলে গেল।

ফিরে এসে নিজের টেবিলের ড্রয়ার থেকে তেতাল্লিশটা পলিথিনের ব্যাগ বের করে নিলাম। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, ‘কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন কোম্পানি’র টাকার তুলনায় আমার ব্যাগের সংখ্যা বেশি। অতএব পনেরোটা ব্যাগ ফিরে গেল তার আগের জায়গায় —আমার ড্রয়ারে। এগুলো সোমবার দিন সরিয়ে ফেলব। এবং সেইদিনই আমার চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছেটা অনন্ত করের কাছে প্রকাশ করব।

মিস্টার কর, মিসেস রাও এবং ‘কর ফাইন্যান্স অ্যান্ড লোন’ কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। জানি কলকাতার বুকে এই অভূতপূর্ব চুরির ঘটনায় আপনারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত, শোকে অভিভূত— আমারই মতো। এই দুঃসময়ে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে, এ জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি ঠিক করেছি আগামী মাসের মধ্যেই এ-কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দেব। কারণ, ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা কোর্সে সামনের মাসেই আমি ভরতি হচ্ছি (কথাটা সত্যি—মিথ্যে বলে মনে হলেও)। আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি হৃদয়হীন, আমার বিবেক নেই। কিন্তু তা নয়। মিস্টার কর বরাবরই মানুষের উন্নতির চেষ্টাকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন, আশা করি আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না। এই দুঃখজনক ঘটনায় আমিও আপনাদের সঙ্গে সমব্যথী। সমবেদনার ভাষা...।

রোববার দিন বাকিটা ভেবে তৈরি করে নেব। চাকরিতে আমার তরফ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন হবে না। মিস্টার করই হয়তো কোম্পানির খরচ কমানোর জন্যে নিজে থেকেই আমাকে ছাঁটাই করে দেবেন। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেক।

টাকাগুলো ব্যাগে ভরে নেওয়ার পর সিন্দুক বন্ধ করলাম। কোম্পানির এই আর্থিক ক্ষতিতে শোক প্রকাশের জন্যে একমুহূর্ত নীরবতা পালন করলাম। মিস্টার করের পয়সা আছে। তিনি হয়তো ঠিক দাঁড়িয়ে যাবেন। কিন্তু মিসেস রাও? সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি পাওয়ার মূলধন ওঁর ফুরিয়ে এসেছে। তবে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি এমন কোনও ‘আদম’-এর অভাব কলকাতায় নেই। তাকে ওঁর জ্ঞানবৃক্ষর ফল খাওয়ালেই মিসেস রাও চটপট চাকরি পেয়ে যাবেন।

টাকার থলেগুলো পায়ের কাছে রেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। মিস্টার করের দেশলাই থেকে আর-একটা কাঠি জ্বাললাম। তারপর এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতিটি ধাপ মুখস্থ করার জন্যে মনে-মনে তৈরি হলাম। ‘মাসিক ক্রিমিনাল’টা নিয়ে বসলাম।

যুধাজিৎ সেনকে যে-অবস্থায় রেখে এসেছিলাম তিনি এখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছেন। অর্থাৎ মেহেরার ভল্টের চরিত্রের পর্যালোচনার পুনরাবৃত্তি করছেন। চর্বিতচর্বণ। সুতরাং পরের প্যারায় আমার চোখ ছিটকে গেল।

সমীর চক্রবর্তী যুধাজিৎ সেনের প্যাকেট থেকে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ‘নাঃ, আমার দ্বারা হবে না, সেন। তুমিই বলো, তালাবন্ধ ভল্ট থেকে বেরোলে কী করে?’

যুধাজিৎ সেন আন্তরিক হাসলেন, বললেন, ‘ব্যাপারটা খুবই সহজ, স্যার। মানছি, দরজা খোলা অথবা বিপদঘণ্টি নিয়ে কারসাজি করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা পথ আমার হাতে ছিল। সেটা হল...।’

পাতাটা সেখানেই শেষ। সুতরাং পরের পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে নজর দিলাম।

সুরজিৎ সেন হাসিমুখে দৃষ্টি মেলে দিলেন শোভনা রায়ের দিকে। বললেন, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, মিস রায়। বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

মোহন সরকার 'বন্ধ ঘরের রহস্য'র শেষ পাতাটা নিখুঁতভাবে ছিঁড়ে নিয়েছে।

কিন্তু আমিও তাতে হার মানার পাত্র নই। মানছি, প্রথমটা একটু হতাশ হয়েছি, কিন্তু পরক্ষণেই অফিসের টেলিফোন ও আমার সাহস আমাকে আশা দিয়েছে। সত্যি, এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা শুধুমাত্র নলিনীরঞ্জন বিশ্বাসের বুদ্ধিতেই সম্ভব।

প্রথমে পরিচিত বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে ফোন করলাম, যারা এ ধরনের পত্রিকা পড়ে। কেউ-কেউ বাড়ি নেই, আর বাকিরা গল্পটা পড়েনি। তাদের বললাম দৌড়ে গিয়ে এককপি পত্রিকা কিনে গল্পটা পড়ে নিতে। মুখে 'হ্যাঁ' বললেও আমি জানি পত্রিকা কিনতে ওরা কেউই যাবে না। তারপর একটা বইয়ের দোকানে ফোন করলাম, কিন্তু ওরা বলল টেলিফোনে গল্প পড়ে শোনানো ওদের ধর্ম নয়।

মোহনকে ফোন করলাম। আমার গলা শুনেই ও হাসল। তারপর ফোন নামিয়ে রাখল। আত্মীয়স্বজন দু-একজনকে ফোন করতেই তারা জিগ্যেস করল, আমি কোথা থেকে ফোন করছি। আমার কোনও বিপদ হয়েছে কি না। পুলিশে কি খবর দিতে হবে?

নীরবে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

এবার 'ক্রিমিনাল'টা উলটেপালটে দেখলাম। কোনও ফোন নম্বর দেওয়া নেই। দুটো নাম রয়েছে: সহদেব সাহা ও স্বপন সাহা। যথাক্রমে প্রধান উপদেষ্টা ও সম্পাদক। ডিরেকটরিতে তাঁদের নামে কোনও ফোন নম্বর খুঁজে পেলাম না যে ফোন করব। চিন্তাহরণ চাকলাদারের নাম ধরে ফোন নম্বর খোঁজার কোনও চেষ্টা করলাম না। কারণ, ছদ্মনাম দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

স্বীকার করছি, একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে ফোন করলাম লালবাজারে। না, ডি. সি. সমীর চক্রবর্তী বা ইন্সপেক্টর যুধাজিৎ সেনের নাম তারা কখনও শোনেনি। তবে প্রশান্ত সরখেল বলে একটা লোক বর্তমানে তাদের হাজতে আছে। সে অভিযুক্ত জালিয়াতির অপরাধে, চুরির অপরাধে নয়।

এবার ধীরে-ধীরে নিজেকে শান্ত করলাম। পত্রিকার বাকি গল্পগুলো (মোহনের কৃপায় যেগুলো অটুট আছে) পড়ে শেষ করলাম। বেরোনোর ব্যাপারটা নিয়ে আমি মোটেও আর ভাবছি না। সোমবারে সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত আমার হাতে সময় আছে। তার মধ্যে ফোনে এমন কাউকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব যে ওই গল্পটা পুরোটা পড়েছে। শুধু এখন ঈশ্বরকে ডাকছি, যুধাজিৎ সেন শেষ পর্যন্ত আমাকে ধোঁকা না-দেয়। কারণ, গল্পের রহস্যের কায়দা এবং চালাকি মেশানো সমাধান আমি একটুও পছন্দ করি না।

অর্ধেক পুরুষ
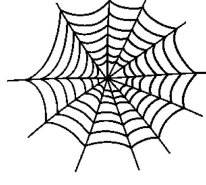
সুপ্রতিম একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর মন বলছিল, ফোনটা আসবে। যদিও স্টুডিয়োতে লাইন পাওয়া বেশ ঝকমারি, তবুও ওর মনে হচ্ছিল সেই মেয়েটি যেরকম নাছোড়বান্দা তাতে লাইন ও পাবেই।

সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা—এই আধঘণ্টা ধরে 'সাইবার চ্যানেল'-এর মুশকিল আসান' অনুষ্ঠান টিভিতে দেখানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সুপ্রতিম আর ওর অনুষ্ঠান-সঙ্গিনী মোনা। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। মাত্র চারমাসেই 'মুশকিল আসান' সকলের মন কেড়ে নিয়েছে।

দর্শকরা নানান প্রশ্ন পাঠান সুপ্রতিমদের কাছে। সুপ্রতিম আর মোনা পালা করে সেসবের উত্তর দেয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠান চলার সময় বহু ফোনও আসে ওদের স্টুডিয়োতে। কেউ-কেউ অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন, আর কেউ-বা নিজের কোনও সমস্যা তুলে ধরেন ওদের কাছে।

চিঠিপত্রের উত্তরগুলো 'সাইবার চ্যানেল'-এর অফিসে কয়েকজন বসে ঠিক করেন। সেখানে সুপ্রতিম আর মোনাও থাকে। তবে টেলিফোনে পাওয়া সমস্যাগুলোর সমাধান সুপ্রতিম বা মোনাকেই চটজলদি করে সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হয়। এর জন্য যে-বুদ্ধি এবং স্মার্টনেস দরকার, সেটা সুপ্রতিম আর মোনা দুজনেরই আছে।

সুপ্রতিমের চেহারা বেশ সুন্দর। ওর সৌন্দর্যে কীরকম যেন একটা বনেদি ঢং আছে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। ফরসা। স্বাস্থ্য মাঝারি। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। দাড়ি সুন্দর করে কামানো হলেও ফরসা গায়ে, থুতনিতে, নীলচে আভা থেকে গেছে। ঠোঁটের ওপরে কালো গোঁফ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। বয়েস পঁয়তিরিশ হলেও অনেক কম দেখায়।

সুপ্রতিম যত না সুন্দর তার চেয়েও অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারে। ওকে ঘিরে অনেক দর্শকেরই কৌতূহল—বিশেষ করে মেয়েদের। অনেকেই ওকে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি দেয়। আবার কেউ-কেউ ওকে নানান ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চায়। সেইসব প্রশ্নের পাশকাটানো মজার উত্তর দেয় সুপ্রতিম।

ওর ডান ভুরুর ওপরে একটা কাটা দাগ আছে। সেটা নিয়ে এক তরুণী জিগ্যেস করেছিল, 'আপনার ডান ভুরুর ওপরে ওই লাভলি কাটা দাগটা হল কেমন করে?'

সুপ্রতিম জবাব দিয়েছিল, 'ছোটবেলায় এভারেস্ট থেকে পড়ে গিয়ে।'

একজন কিশোরী চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, 'আপনার নামটা দারুণ। ভীষণ এক্সাইটিং।'

জবাবে সুপ্রতিম বলেছিল, ‘মোটেই তা নয়। সুপ্রতিম মানে হচ্ছে ভালোর মতো—কিন্তু পুরোপুরি ভালো নয়।’

একজন পুরুষের কৌতূহল: ‘আপনি কি বিয়ে করেছেন?’

সুপ্রতিমের উত্তম: ‘করিনি বললে আমার ছ’জন ওয়াইফ রেগে আগুন হয়ে যাবেন। আর বিয়ে করেছি বললে অনেক দর্শক দুঃখ পাবেন। তাই এই সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।’

আসল ঘটনা হল সুপ্রতিম বিয়ে করেছে। স্ত্রী নয়নার সঙ্গে ওর পরিচয় সাত বছরের। তার মধ্যে প্রথম তিনবছর ওর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে, আর বাকি চারবছর চুটিয়ে সংসার করেছে। এখনও করছে। সুপ্রতিম যা-কিছুই করে, সবসময় চুটিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে নয়নার সঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশ ঝামেলাও হয়।

নয়না দেখতে বেশ সুশ্রী, মিষ্টি মেয়ে। তবে সুপ্রতিমের চেহারার পাশে নিজের চেহারা নিয়ে সবসময় ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। সুযোগ পেলেই ওই প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে। সুপ্রতিম রোজ যখন অফিসে রওনা হয়, নয়না তখন আকুল চোখে স্বামীকে দ্যাখে।

সুপ্রতিম অবাক হয়ে বলে, ‘কী ব্যাপার! এমনভাবে তাকিয়ে আছ যেন এই প্রথম চার চোখের মিলন হল!’

নয়না ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় ওর দিকে, বলে, ‘ইচ্ছে করছে, থুতু ছিটিয়ে কানের লতিতে কুট করে কামড়ে দিই।’

সুপ্রতিম ওর দিকে বাঁ-কান এগিয়ে দিয়ে বলে, ‘এই নাও, তাই দাও। পারলে কপালের পাশে একটা কাজলের টিপও বসিয়ে দাও।’

নয়না ওর কানটা কষে মুলে দিয়ে বলে, ‘সাবধান! কারও দিকে বেশিক্ষণ তাকাবে না। কেউ যেন নজর না-দেয়। তা হলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যবে।’

‘টিভির মধ্যে দিয়ে কারও দিকে তাকানো যায়! তবে মোনা তো পাশে থাকে, ওর দিকে না-তাকিয়ে উপায় নেই…।’

‘মোনা খুব ভালো মেয়ে। বরং তোমাকেই বিশ্বাস নেই।’

মোনার সঙ্গে নয়নার পরিচয় আছে। মোনা অনেকবার সুপ্রতিমের বাড়িতে এসেছে। দরকারে-অদরকারে প্রায়ই ফোন করে। নয়না ওকে খুব পছন্দও করে।

মোনা এলাহাবাদের চৌকস মেয়ে। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। সুন্দর, স্মার্ট। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুলে সামান্য লালচে ভাব। টানা-টানা চোখ। শুধু ওর বাংলায় সামান্য টান আছে।

ও সুপ্রতিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। ওর কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তেই শেখার চেষ্টা করে। কথায়-কথায় বলে, ‘সুপ্রতিমদা, ইউ আর সিম্পলি লাজবাব। আপনি ”সাইবার চ্যানেল”-এর অ্যাসেট।’

‘মুশকিল আসান’ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে সুপ্রতিমের দারুণ লাগে। অনুষ্ঠানের কিছুটা অংশ আগে রেকর্ড করা হয়। আর খানিকটা লাইভ। দর্শকদের নানান ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য নামী-দামি ডাক্তার-উকিল-জ্যোতিষী ইত্যাদি নানান পেশার মানুষ পালা করে এই অনুষ্ঠানে আসেন। অনেক সময় বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ারদেরও নিয়ে আসা হয় বিশেষ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। তবে সবশেষে থাকে মজাদার প্রশ্ন-উত্তরের পালা। তখন সুপ্রতিম আর মোনা যেন আরও স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে 'মুশকিল আসান' একেবারে সুপারহিট।

দিনকুড়ি আগে একটা খাম এসে পৌঁছয় সুপ্রতিমদের দপ্তরে। খাম খুলেই সুপ্রতিম দ্যাখে ভেতরে একটা টাটকা লাল গোলাপ, আর একটা চিঠি। খামের ওপরে কোনও ডাকটিকিট ছিল না। বোধহয় কেউ কুরিয়ারে পাঠিয়েছে।

চিঠিটা পড়েই সুপ্রতিমের কেমন অস্বস্তি হল।

প্রিয় সুপ্রতিম,

তোমাদের অনুষ্ঠান আমি সবসময় দেখি। খুব ভালো লাগে। তবে তার চেয়েও ভালো লাগে তোমাকে। শুধু তোমাকে দেখার জন্যেই অনুষ্ঠানটা প্রাণভরে দেখতে হয়। অনুষ্ঠানগুলো আমি সবসময় ভিডিয়ো ক্যাসেটে ধরে রাখি। তারপর যখনই মনখারাপ লাগে, তখনই ওগুলো চালিয়ে তোমাকে দেখি। তোমার সব সুন্দর—নাক, মুখ, চোখ, ঠোঁট, এমনকী ভুরুর কাটা দাগটাও। জানো, তোমার ওই কাটা দাগটা নকল করে আমি আমার বুকের বাঁ-দিকে একটা কাটা দাগ এঁকেছি! তোমার প্রতিটি অঙ্গের জন্যে আমার প্রতিটি অঙ্গ সবসময় কাঁদে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্তু অনুষ্ঠান চলার সময় কিছুতেই স্টুডিয়োর ফোনের লাইন পাই না। তাই বলে চেষ্টা ছাড়িনি। আবার চিঠি দেব। সঙ্গে যে- গোলাপটা পাঠালাম, সেটার কথা টিভিতে বলবে তো! বললে বুঝব আমার ভালোবাসা তুমি ফিরিয়ে দাওনি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো—

ঝুমুর চৌধুরী

কলকাতা-১৪

'সাইবার চ্যানেল'-এর দপ্তরে প্রচুর 'প্রেমপত্র' আসে। তাতে মোনার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করতে চাওয়া চিঠিই বেশি, সুপ্রতিমের কম। মোনাকে বিয়ে করতে চেয়েও বেশ কয়েকজন 'সুপাত্রের' চিঠি এসেছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ওরা কেউই তেমন একটা মাথা ঘামায়নি। কারণ, এ-ধরনের স্পন্সরড প্রোগ্রামে এসব উৎপাত খুবই মামুলি ব্যাপার। কিন্তু এই চিঠিটা যেন ঠিক মামুলি নয়। কেমন যেন একটু অন্যরকম।

মোনা চিঠিটা নিয়ে সুপ্রতিমের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে পিছনে লেগেছিল। কিন্তু সুপ্রতিম পুরোপুরি সহজ হতে পারেনি। দু-একদিন চিন্তা করার পর ও মোনার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিঠিটার একটা নির্দোষ উত্তর দিয়ে দেবে।

সাধারণত অফিসের সমস্যা বাড়িতে খুব একটা আলোচনা করে না সুপ্রতিম। কিন্তু ঝুমুর চৌধুরীর চিঠিটার কথা বলল।

নয়না সেটাকে কোনও গুরুত্বই দিল না। বলল, 'ওর আর কী দোষ বলো! টিভিতে অমন হেসে-হেসে সুন্দর-সুন্দর করে কথা বলবে, আর প্রেমপত্র আসবে না—এ তো হতে পারে না! তুমি বরং বেচারিকে একটা সান্ত্বনাপত্র লিখে দিয়ো। আর শোনো, তোমাকে একটা গুড নিউজ দেব। আমি একটা বই লিখতে শুরু করেছি। নাম দিয়েছি "সুন্দর সোয়ামীর সমস্যা"—।'

'ঠাট্টা কোরো না, নয়না।' কপালে ভাঁজ ফেলে বলেছে সুপ্রতিম, 'চিঠিটার মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে।'

নয়না একটা হাতব্যাগে সুতোর নকশা বুনছিল, সিরিয়াস হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। খামের মধ্যে ফুল পাঠানো, ভুরুর ওই কাটা দাগ নকল করা...। তুমি বরং একটা মামুলি উত্তর দিয়ে দিয়ো। উত্তর না-দিলে আবার যদি কিছু হয়...।'

পরের 'মুশকিল আসান' অনুষ্ঠানে উত্তর দিয়েছিল সুপ্রতিম।

'কলকাতা চোদ্দো থেকে গোলাপফুল পাঠিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবাসা জানিয়েছেন ঝুমুর চৌধুরী। তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আর আপনারা, যাঁরা এখন এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনাদের জানাই—আপনারা যত খুশি প্রেমপত্র পাঠান, তবে মনে রাখবেন, সেগুলো যেন শুধু এই অনুষ্ঠানের নামেই হয়। আমার বা মোনার নামে নয়। কারণ, আমাদের জীবনে প্রচুর প্রেম আছে। আর বাড়তি প্রেম আমরা চাই না।' হেসে মোনার দিকে তাকিয়ে সুপ্রতিম জিগ্যেস করেছে, 'কী বলো, মোনা।'

'ঠিকই বলেছেন, সুপ্রতিমদা—এই অনুষ্ঠানের জন্যেই প্রেমপত্র দরকার। আর সেইসঙ্গে সমালোচনা। কারণ, এই অনুষ্ঠানকে আমরা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই। আমরা চাই, এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক আপনাদের আরও-আরও প্রিয়।'

এই উত্তর ঝুমুর চৌধুরীকে যে খুশি করতে পারেনি, বরং ব্যথা দিয়েছে, সেটা বোঝা গেল ওর পরের চিঠিতে।

প্রিয় সুপ্রতিম,

কিছু দিতেই যদি চাও, তা হলে দুঃখ দাও কেন! তোমার এড়িয়ে যাওয়া উত্তরে খুব দুঃখ পেয়েছি আমি। সারাদিন, সারারাত শুয়ে-শুয়ে কেঁদেছি। তোমাদের অনুষ্ঠানকে ভালোবেসে আমি গোলাপ পাঠাইনি, তোমাকে ভালোবেসে পাঠিয়েছি। তুমি বলেছ তোমার জীবনে প্রচুর প্রেম আছে, বাড়তি প্রেম তুমি চাও না। তোমার মতো সুপুরুষ দেবতাকে অনেকেই যে ভালোবাসবে, সে তো স্বাভাবিক। তাই এ-কথায় দুঃখ পাইনি। তবে তুমি জেনে রাখো, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। আমার বুকের কাটা দাগটায় আমি যখন আঙুল বোলাই তখন বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। মনে হয় যেন আমি তোমার ভুরুতে আলতো করে আঙুলের ছোঁওয়া এঁকে দিচ্ছি। তোমাদের স্টুডিয়োর লাইনটা কবে পাব বলতে পারো! সবসময় খালি এনগেজড! ভাবছি, এবার থেকে বাড়ির ফোনেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করব। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তোমার নাম্বারটা পাব তো! বাড়িতে ফোন করলে তুমি কি রাগ করবে? আমি জানি, তুমি রাগ করবে না—বরং খুশিই হবে। তারপর... একদিন...যখন আমাদের দেখা হবে...ওঃ! আমি আর ভাবতে পারছি না। বিশ্বাস করো সুপ্রতিম, তোমাকে না-পেলে আমি বাঁচব না—তুমিও না। আজ শেষ করছি। অসংখ্য ভালোবাসা নিয়ো—

তোমার, শুধু তোমার

ঝুমুর

চিঠিটা পড়ার পর সুপ্রতিম কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে বসে রইল। ঝুমুরকে ঘিরে এলোমেলো চিন্তা ছুটোছুটি করতে লাগল ওর মাথার ভেতরে। মেয়েটি কেমন যেন অস্বাভাবিকরকম নাছোড়বান্দা। তা ছাড়া চিঠির কোনও-কোনও জায়গায় কি পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছে? নইলে সুস্থ কোনও মেয়ে হলে প্রথম চিঠির এড়িয়ে যাওয়া উত্তরেই তো সব বুঝতে পারত, আর তার ভালোবাসার অসুখটাও সেরে যেত।

ঝুমুর বাড়িতে ফোন করতে পারে ভেবে সুপ্রতিম একটু ভয়ও পেল। যদি ও সত্যিই পাগল এবং নাছোড়বান্দা হয় তা হলে তো ফোন করে-করে জ্বালিয়ে মারবে। তখন হয়তো পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আর পুলিশে খবর দিলেই তো যত ঝামেলা। বাজে পাবলিসিটি।

আচ্ছা, ও যদি টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সুপ্রতিমের ঠিকানা জেনে বাড়িতে এসে হাজির হয়! তা হলে তো আবার সেই থানা-পুলিশ!

প্রায় দু-দিন নানান দুশ্চিন্তার পর সুপ্রতিমের আশঙ্কা ধীরে-ধীরে কেটে গিয়েছিল। ও নয়নাকে বলে রাখল ঝুমুর চৌধুরী নামের কেউ ফোন করলে নয়না যেন বলে দেয় সুপ্রতিম বাড়ি নেই।

পরের দু-দিনে তিনবার ঝুমুরের ফোন এল। তার মধ্যে দুবার সুপ্রতিম সত্যিই বাড়ি ছিল না। আর একবার নয়না আড়চোখে সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে ফোনে বলে দিল, 'উনি তো এখন বাড়ি নেই।'

'কখন ওঁকে পাওয়া যাবে বলুন তো?'

'ওঁর তো ফিরতে-ফিরতে রাত এগারোটা মতন হবে। আপনি বরং প্রোগ্রাম চলার সময় স্টুডিয়োতে ট্রাই করে দেখুন—।'

'ঠিক আছে। স্টুডিয়োতেই ট্রাই করব।' রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল ঝুমুর।

নয়না সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, 'মেয়েটার গলাটা কেমন যেন পিকিউলিয়ার।'

'পিকিউলিয়ার মানে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছে সুপ্রতিম।

'কেমন যেন আদুরে, খসখসে।'

হো-হো করে হেসে উঠেছে সুপ্রতিম। হাসতে-হাসতেই বলেছে, 'আদুরে! খসখসে! মাই গুডনেস! কী বিচিত্র অ্যাডজেকটিভ! তুমি সেলাই ছেড়ে সাহিত্য করলে পারতে।'

একটু পরে হাসি থামিয়ে সুপ্রতিম সিরিয়াস ঢঙে জানতে চাইল, 'অ্যাই, মেয়েটার বয়েস কীরকম হবে বলো তো? আঠেরো-উনিশ? নাকি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ?'

'ঠিক বোঝা গেল না। সাতাশ-আটাশ হবে বোধহয়।' ইতস্তত করে নয়না বলল।

তারপর থেকেই সুপ্রতিম কেমন এক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে লাগল। ঝুমুর চৌধুরীর ছবিটা ওর কাছে কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। এ-ধরনের গায়ে-পড়া প্রেমিকাদের ও বহুবার সামাল দিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ও যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। প্রতিদিনই অনুষ্ঠান শুরু করার পর থেকেই ও স্টুডিয়োতে ঝুমুরের ফোনের জন্য ভয়ে-ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আজ ওর মন বলছে, ফোনটা আসবে। আজ ওদের স্টুডিয়োর ব্যস্ত লাইনে টুক করে ঢুকে পড়বে ঝুমুর।

এবং সুপ্রতিমের আশঙ্কাই সত্যি হল। ঝুমুর যে ফোনটা করেছে সেটা ফোনে সাড়া দেওয়ার পরই ও বুঝতে পারল।

'হ্যালো—"মুশকিল আসান"—।'

'সু-সুপ্রতিম! আমি গো...আমি বলছি....ঝুমুর...।'

নয়না ঠিকই বলেছিল। খসখসে আদুরে গলা কেমন যেন ফিসফিসে সুরে কথা বলছে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পেশাদারি ঢঙে কথা বলল সুপ্রতিম, ‘কাইন্ডলি আপনার পুরো নাম বলুন।’

ও-প্রান্তের কণ্ঠস্বর একটু ধাক্কা খেল: ‘আমায়...আমায় চিনতে পারছ না! আমি ঝুমুর চৌধুরী। কলকাতা চোদ্দো থেকে বলছি। কত কষ্ট করে তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।’

ওদের টেলিফোন-ব্যবস্থাটা এমন যে, সব কথাবার্তাই টিভির দর্শকরা শুনতে পান। সেইজন্যে সুপ্রতিম বেশ বিব্রত হয়ে পড়ছিল। ও ভাবছিল, কন্ট্রোল প্যানেলের একটা সুইচ টিপে টেলিফোনের কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দেবে কি না। না কি রিসিভার নামিয়ে রেখে লাইন কেটে দেবে? কিন্তু পাগল মেয়েটা তো রোজ ফোন করার চেষ্টা করে জ্বালাতন করে মারবে!

এইসব ভাবতে-ভাবতেই সুপ্রতিম কষ্ট করে পেশাদারি হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে। তারপর ওর নিজস্ব ঢঙে জানতে চাইল, ‘বলুন ম্যাডাম, কী আপনার সমস্যা? ”মুশকিল আসান” নিশ্চয়ই তার সমাধান বাতলে দেবে।’

‘আমার...আমার প্রবলেম তুমি। আমি তোমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। যখন... যখন আর কেউ থাকবে না। বাড়িতে তিনবার ফোন করেছিলাম...তোমাকে পাইনি। কে ফোন ধরেছিল? তোমার...তোমার ওয়াইফ?’

শেষ প্রশ্নটা দর্শকরা শুনতে পাওয়ার আগেই কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপে কথাবার্তা শোনানোর ব্যবস্থাটা অফ করে দিল সুপ্রতিম। কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখল না। ঝুমুর চৌধুরী সম্পর্কে একটা কৌতূহল ওর মধ্যে মাথাচাড়া দিল।

‘হ্যাঁ—আমার বউ—নয়না। ওকে আমার ভীষণ ভালোবাসি।’ কথাটা বলার সময় আড়চোখে মোনার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল সুপ্রতিম। ওকে হাত নেড়ে ইশারা করল প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

‘হুঁঃ! জানতাম!’ বিরক্তি ফুটে উঠল ঝুমুরের গলায়। কিন্তু তারপরই ও কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। খসখসে আদুরে গলার হাসি?

একটু পরে হাসি থামিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘কাউকে আমি পরোয়া করি না। কেন জানো? কারণ, আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি। কবে তোমার বাড়িতে যাব বলো?’ শেষ প্রশ্নটায় যেন কোনও কিশোরীর মিনতি ঝরে পড়ল।

সুপ্রতিমের মন খুব দ্রুত চিন্তা করছিল।

মেয়েটি তো মনে হচ্ছে নিশ্চিত পাগল। ওর সঙ্গে দেখা করে সামনাসামনি বুঝিয়ে বললে কি ওর এই প্রেমের পাগলামি সারতে পারে? ওকে বলবে একবার বাড়িতে আসতে? কিন্তু নয়না যদি কিছু মাইন্ড করে!

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধেবেলা নয়না কাছাকাছি একটা সেলাই-স্কুলে এমব্রয়ডারির কাজ শেখাতে যায়। ছ’টায় বেরোয়, দু-আড়াই ঘণ্টা পর ফেরে। ওর হাতের কাজ খুব ভালো। তা ছাড়া সূক্ষ্ম সেলাই নিয়ে সময় কাটাতে ওর বেশ লাগে। মঙ্গলবার সাড়ে ছ’টা-সাতটা নাগাদ তা হলে ঝুমুরকে আসতে বলবে সুপ্রতিম! তখন ফ্ল্যাট ফাঁকাই থাকবে। ঠিকে কাজের লোক বিমলামাসিও রোজ সন্ধেবেলা বাসন মেজে, ঘর মুছে ছ’টার মধ্যেই চলে যায়।

কিন্তু ফ্ল্যাটে ওকে একা পেয়ে মেয়েটা কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসবে না তো! দুর, কী আর করবে! সুপ্রতিম নিজে ঠিক থাকলে আর ভয় কীসের! কিন্তু মেয়েটার বয়েস কত? সতেরো, আঠেরো, কুড়ি হলে তো ইমোশনাল প্রবলেম হতে পারে।

সুপ্রতিম কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছিল। ঠিকমতো আর ভাবতে পারছিল না।

'কবে যাব বলো?' খসখসে আদুরে গলায় আবার জানতে চাইল ঝুমুর।

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলা। ঠিক সাতটায়।' সুপ্রতিমের মুখ দিয়ে কেমন যেন আলতোভাবে খসে পড়ল কথাগুলো।

'তোমাদের ফ্ল্যাটবাড়িটা আমি দেখে এসেছি। কাঁকুড়গাছিতে।' সামান্য হাসল ঝুমুর। একটু থেমে তারপর বলল, 'তোমার ফ্ল্যাটটা তো একতলায়...।'

পলকে ঘাম ফুটে উঠল সুপ্রতিমের কপালে। এর মধ্যেই ওর ঠিকানা বের করে বাড়িটা চিনে এসেছে মেয়েটা! মেয়েটাকে বাড়িতে ডেকে আবার কোনও বিপদ হবে না তো! তখন হয়তো সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে। কিন্তু আর তা ফেরার পথ নেই! তির ছিটকে গেছে হাত থেকে।

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলা যাব। ঠিক...সাতটায়...। দেখা হওয়ার আগে আর তা হলে ফোন করব না।' একটু চুপচাপ। তারপর: 'আমাকে একপলক দেখলেই তুমি বুঝবে কেন আমার ভালোবাসা অন্যরকম।' চাপা গলায় কথাগুলো বলে অল্প হাসল ঝুমুর: 'আই লাভ ইউ, লাভ। তুমি অপেক্ষা কোরো । ঠিক সাতটায়...।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সুপ্রতিম। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্মার্ট ঢঙে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে গেল। তা সত্ত্বেও সুপ্রতিম মোনার সঙ্গে কথা বলে অনুষ্ঠানে সহজভাবে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল।

'মোনা, তুমি ভীষণ সেলফিশ।'

'কেন?' মোনা দুষ্টু হেসে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে।

'পাগলের প্রবলেমগুলো আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে দিব্যি মজায় আছ।' তারপর দর্শকদের লক্ষ করে: 'কী, আপনারাই বলুন—।'

মোনাও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মজার সুরে বলল, 'যারা অন্যকে পাগল করে সেইসব পাগলের প্রবলেম তাদেরই সলভ করতে হবে। এটা আপনাদের সকলের প্রতি আমার উপদেশ। আশা করি ঠাট্টা করলাম বলে আপনারা কিছু মনে করবেন না।' বড় করে হাসল মোনা। তারপর সুপ্রতিমের দিকে ফিরে বলল, 'সুপ্রতিমদা, এবার সাক্ষাৎকার-পর্ব শুরু করুন। হাতে আর সময় বেশি নেই—।'

'হ্যাঁ। আজ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন ডক্টর পার্থসখা মণ্ডল। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। উনি শিশু ও কিশোরদের মানসিক সমস্যা নিয়ে আমাদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেবেন...।'

এরপর শুরু হয়ে গেল আগে রেকর্ড করা ডক্টর মণ্ডলের সাক্ষাৎকার।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে সুপ্রতিম ঠিক করল ঝুমুরের বাড়ি আসার ব্যাপারটা ও নয়নাকে জানাবে না। মোনা ওকে টেলিফোনের কথাবার্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল। সুপ্রতিম ওকে সবই বলেছে। শুধু মঙ্গলবার সন্ধে সাতটার 'সাক্ষাৎকার'-এর কথা বলেনি।

সুপ্রতিম হিসেব করে দেখল মঙ্গলবার আসতে এখনও ঠিক তিনদিন বাকি। সেদিন ওকে স্টুডিয়ো থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

দরজায় কেউ 'টুং-টাং' করে কলিংবেল বাজাতেই সুপ্রতিম চমকে উঠল। চকিতে ওর নজর চলে গেল দেওয়ালে টাঙানো শৌখিন ইলেকট্রনিক পেন্ডুলাম ঘড়ির দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িও শব্দ করে ওকে জানিয়ে দিল এখন ঠিক সাতটা।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে ঝুমুরের জন্য অপেক্ষা করছিল সুপ্রতিম। অপেক্ষা করতে-করতে ওর টেনশান ক্রমে বাড়ছিল। নয়না, বিমলামাসি, অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। তখন থেকে সুপ্রতিম ফ্ল্যাটে একা। হাতে সময় পেয়ে সামান্য একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছে। শরীরের এখানে-ওখানে ডিওডোরান্ট স্প্রে করেছে। হয়তো অবচেতনে ঝুমুরের আসার ব্যাপারটা মাথায় ছিল।

আবার বেজে উঠল কলিংবেল।

ঘোর কাটল সুপ্রতিমের। চটপট উঠে দরজার কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক আই'-এ চোখ রাখল।

ঝুমুর নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। 'ম্যাজিক আই'-এর লেন্স দিয়ে যেটুকু বিকৃত ছবি দেখা গেল তাতে বলা যায় লোকটি ফরসা, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখে যেন একটা ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ ভাব।

দরজা খুলল সুপ্রতিম। সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশি পারফিউমের গন্ধ ওকে ভাসিয়ে দিল।

লোকটি, অথবা ছেলেটি, সামান্য হাসল। হাসিতে লজ্জা, সঙ্কোচ। কোনওরকমে বুকের কাছে হাত তুলে সৌজন্যের নমস্কারের ভঙ্গি করল। তারপর এক পা বাড়িয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পড়ল, বলল, 'একটু কথা আছে।'

উচ্চারণগুলো এতই অস্পষ্ট যে সুপ্রতিমকে বেশ কষ্ট করে কথাগুলো বুঝতে হল।

কখনও-কখনও দু-একজন যশোপ্রার্থী মানুষ সুপ্রতিমের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কী করে টিভিতে চান্স পাওয়া যায় তার কৌশল বা সুলুক-সন্ধান জিগ্যেস করে সুপ্রতিমকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে। ইনিও বোধহয় সেই দলের—ভাবল ও।

লোকটি বেশ রোগা, উচ্চতায় নিতান্তই খাটো, তবে মাথার চুল বেশ বড়—কষে তেল মেখে কীর্তনীয়াদের মতো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখ টানা-টানা—কেমন এক তন্দ্রার ভাব সেখানে জড়িয়ে আছে। বাঁ-গালে, চোখের সামান্য নীচে, সরষের মাপের একটা কালো জড়ুল। পুরুষটি মেয়ে হলে ওটাকে বিউটি স্পট বলা যেত। পরনে সাদার ওপরে হালকা নীল স্ট্রাইপ দেওয়া ফুল শার্ট, আর নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট।

আর বয়েস কতই-বা হবে! বড় জোর তেইশ-চব্বিশ।

'বুলন, কী দরকার?' সুপ্রতিম জিগ্যেস করল।

এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে গেল।

সুপ্রতিমের চোখে চোখ রেখে লোকটি ডানহাতে খোলা দরজার পাল্লাটাকে ঠেলে বন্ধ করে দিল। 'ক্লিক' শব্দে নাইট ল্যাচ আটকে গেল।

তারপর আদুরে খসখসে গলায় বলল, 'তোমাকে চাই গো, তোমাকে চাই—।'

এবং তাড়া-খাওয়া হরিণের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুপ্রতিমের গায়ে। ওকে আঁকড়ে ধরে 'চকাৎ' শব্দে এক তীব্র চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

গায়ে আরশোলা বা মাকড়সা পড়লে মানুষ যেমন ঘেন্না, অস্বস্তিতে শিউরে ওঠে, ঠিক সেইরকম এক প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল সুপ্রতিম। ওর গা ঘিনঘিন করছিল। হাতের পিঠ দিয়ে বারবার করে ঘষে-ঘষে ঠোঁট মুছল।

ছেলেটি পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে উঠে বসে কাতর আকুল চোখে তাকাল সুপ্রতিমের দিকে। অদ্ভুত এক মেয়েলি সুরে বলল, 'আমাকে তুমি...চিনতে পারোনি! আমি...আমি...ঝুমুর...ঝুমুর চৌধুরী।'

সুপ্রতিম ভীষণ একটা ধাক্কা খেল।

এতদিন এই ছেলেটাই ওকে মেয়ে সেজে চিঠি দিয়েছে, ফোন করেছে! একটা জঘন্য বৃহন্নলা! এইজন্যই পাগলটা চিঠিতে লিখেছিল: '...আমার ভালোবাসা অন্যরকম। এরকম ভালোবাসা তুমি জীবনে কখনও পাওনি।'

সুপ্রতিমের গা গুলিয়ে উঠল। 'ওয়াক' উঠতে চাইল গলা দিয়ে।

ঝুমুর তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা গোলাপ ফুল আর একটা রঙিন কাগজে মোড়া বাক্স বের করে ফেলেছে। সে-দুটো সুপ্রতিমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই ফুল আর একটা পার্কার পেন...তোমার জন্যে এনেছি। তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না...প্লিজ...।'

ঝুমুর যদি পুরুষ হয় তা হলে ওর গলাটা মেয়েলি। আর যদি ও মেয়ে হত তা হলে বলা যেত গলাটা কেমন যেন পুরুষালি। কিন্তু আসলে ও কী?

ঝুমুর উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে এল সুপ্রতিমের কাছে। মিষ্টি করে হেসে উপহার দুটো বাড়িয়ে দিল। বলল, 'আমি একটুও রাগ করিনি গো। আমার ভালোবাসায় প্রথম-প্রথম এরকম হয়—পরে সব ঠিক হয়ে যায়। এই নাও—।'

সুপ্রতিম কেমন এক অশুভ হাওয়া-বাতাসের ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুমুরের কথায় ঘোর কাটতেই প্রচণ্ড রাগে সপাটে এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে।

বিশ্রী একটা শব্দ হল। ঝুমুরের ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরিয়ে এল। ও আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে। উপহারগুলো হাত থেকে পড়ে ছড়িয়ে গেল।

সুপ্রতিম ভেতরে-ভেতরে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল। একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গিয়ে সব কথা কেমন যেন আটকে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরে অনেক কিছু দপদপ করছে। এখুনি যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হবে।

'এইমুহূর্তে বেরোও। জানোয়ার কোথাকার! আউট!' হাঁপাতে-হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলল সুপ্রতিম।

কিন্তু ঝুমুর ওর ধমক গ্রাহ্য করল বলে মনে হল না।

রক্তাক্ত মুখে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ছেলেটা। ওর সাদা জামায় রক্তের ছিটে লেগেছে। সেই অবস্থাতেই বিচিত্র বিভঙ্গে শরীর দুলিয়ে খিলখিল করে হসে উঠল ও। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি কিচ্ছু মনে করিনি, হানি। তোমাকে আমি চাই—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাই। হাজার টরচার করেও তুমি আমাকে টলাতে পারবে না। তোমার হাতের ছোঁওয়া আমার কাছে যে কী, তা তুমি জানো না। আর...আর এইটা দ্যাখো—।' বলে একটানে

জামাটা ছিঁড়ে দিল ঝুমুর। কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে গেল। বুকের কাছটায় অনেকখানি ফেঁসে গেল জামাটা। আর তখনই ঝুমুরের খালি বুক দেখা গেল।

ওর ঈষৎ মেয়েলি ঢঙের বুকে বাঁদিকে সত্যিকারের একটা ছোট্ট কাটা দাগ। সুপ্রতিমের ডান ভুরুর দাগটার তো।

ঝুমুর চিঠিতে লিখেছিল, ও বুকে একটা কাটা দাগ 'এঁকে' নিয়েছে। কিন্তু এ তো সত্যিকারের কাটা দাগ ব্লেড, ছুরি অথবা ক্ষুর দিয়ে চিরে ও তৈরি করেছে!

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমুর। রক্তমাখা মুখে ওর হাসি কেমন অলৌকিক দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই ও আবার ঝাঁপিয়ে এল সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম খপ করে এক হাতে ওর গলা চেপে ধরল। তারপর ওর পলকা শরীরটাকে পিছনদিকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গেল দরজার কাছে।

'য়ু সান অফ আ বিচ! ফাকিং গে বাস্টার্ড! আর কখনও যদি আমাকে ডিসটার্ব করো তা হলে একেবারে খুন করে ফেলব!'

দরজা খুলে ঝুমুরের দেহটাকে বলতে গেলে বাইরে ছুড়ে দিল সুপ্রতিম। ওর মাথাটা সিঁড়ির রেলিঙে ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। ও কাত হয়ে টলে পড়ে যেতে গিয়েও সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনওরকমে সামলে নিল। ঘোলাটে নজরে তাকাল ওর ভালোবাসার পুরুষের দিকে। জড়ানো খসখসে গলায় বলল, 'আমি কিছুই মাইন্ড করিনি। যতই ফিরিয়ে দাও, আবার আমি আসব। একদিন-না-একদিন তুমি আমাকে মেনে নেবেই...।'

ওর গায়ে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল সুপ্রতিম। তারপর দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিমের সারা শরীর অবসাদ আর ক্লান্তিতে কেমন ভারী হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে ও চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল।

এক অদ্ভুত গ্লানি সুপ্রতিমকে জড়িয়ে ধরেছিল। বারবার 'ওয়াক' উঠে আসতে চাইছিল ওর গলা দিয়ে। এরকম গা-ঘিনঘিনে ঘটনার কথা কাউকে কি বলা যায়! শেষ পর্যন্ত কি সত্যি-সত্যিই থানা-পুলিশ করতে হবে?

ঝুমুরকে ঘুষি মেরে সুপ্রতিমের ডানহাতের পিঠটা ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছিল। ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ঠোঁটে লাগিয়ে জোরে-জোরে কয়েকবার চুষল ও। তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা দলিত গোলাপ আর রঙিন প্যাকেটটার দিকে তাকাল। ঝুমুরের রক্ত-মাখা মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল আবার।

গোপনে কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা করলে সে ঘটনাটা নয়নার কাছে ও অবশ্যই গোপন করতে চাইত। কিন্তু এই ব্যাপারটা এত অস্বস্তির আর এত লজ্জার যে, এটা আরও বেশি করে গোপন করতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু নয়নাকে বলতে হবেই—সে ও যা-ই ভাবুক।

সব রকম দ্বিধা কাটিয়ে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল সুপ্রতিম। নয়নাকে সেলাই-স্কুলে ফোন করে এখনই বাড়ি আসতে বলবে। তারপর...।

নয়নাকে সব কথা খুলে বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের কান্না পেয়ে গেল। একটা অসহ্য রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা ওর ভেতরে দলা পাকিয়ে উথলে উঠছিল। নয়নাকে জড়িয়ে ধরে সুপ্রতিম বাঁচার একটা পথ খুঁজছিল। সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত ওর শত্রু হয়ে দাঁড়াল! এমনই সুপুরুষ-সৌন্দর্য যে, একজন পুরুষও তার প্রেমে পড়ে যায়!

সারাটা রাত ওদের উথালপাথালভাবে কাটল। শেষ পর্যন্ত নয়না ওকে বলল, ব্যাপারটা থানায় জানানো দরকার।

সুপ্রতিম রাজি হল। তারপর মোনাকে ফোন করে জানিয়ে দিল, আপাতত সাত-দশদিন ওর পক্ষে অফিস করা সম্ভব হবে না। না, না, তেমন সিরিয়াস কোনও ব্যাপার নয়। পারিবারিক কয়েকটা ব্যাপারে হঠাৎই চাপ এসে পড়েছে। ওরা যেন সুপ্রতিমের বদলে আর কাউকে দিয়ে কটা দিন কাজ চালিয়ে নেয়।

সুপ্রতিম জানে, ওরা বিপ্লব সরকার কিংবা অনির্বাণ পুরকায়স্থকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে। আগেও দু-একবার এরকম হয়েছে।

মোনা অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সুপ্রতিম ঝুমুরের ব্যাপারে মোনাকে বিন্দুবিসর্গও বলল না। ও চাইছিল না ব্যাপারটা বেশি জানাজানি হোক। অদ্ভুত এক লজ্জা আর সঙ্কোচ ওর গলা টিপে ধরছিল।

নয়না আর সুপ্রতিম বেলা বারোটা নাগাদ থানায় পৌঁছল।

বাইরের ঘরটায় কয়েকটা লম্বা-লম্বা বেঞ্চি পাতা। একপাশে বড় মাপের একটা টেবিল। তাকে ঘিরে চারটে চেয়ার। টেবিলে পুরোনো আমলের টেলিফোন, কিছু ফাইলপত্র, বড় কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

ঘরটা এমন অন্ধকার-অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও দু-দুটো টিউব লাইট জ্বেলে রাখতে হয়েছে। সিলিং-এ সাবেকি একটা বেঢপ পাখা ঢিমে তালে ঘুরছে। তার হাওয়ায় দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

টেবিলের ওপাশে সাদা ইউনিফর্ম পরে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। বয়েস বড়জোর পঁয়তিরিশ। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখে উদাসীন বিরক্ত ভাব।

টেবিলে রাখা কাঠের নেমপ্লেট পড়ে জানা গেল অফিসারের নাম টি. দাস, সাব-ইনস্পেকটর।

সুপ্রতিম আর নয়না বসল।

দাসবাবু সপ্রশ্ন নজরে ওদের দিকে তাকালেন।

একটু ইতস্তত করে সুপ্রতিম বলল, 'আমি...আমি...একটা ডায়েরি করতে চাই।'

কথা বলতে-বলতে ও চারপাশে দেখছিল। দু-একজন লোক এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। তাদের চোখেমুখে ব্যস্তসমস্ত ভাব।

সুপ্রতিমের মনে হল, দাসবাবু ছাড়া আর কেউ ওদের কথা শুনতে পাবে না। তাই দাসবাবু যখন ডায়েরি-বই নিয়ে ডটপেন বাগিয়ে বললেন, 'বলুন—।', তখন ও প্রথমে নিজের পরিচয় দিল, তারপর সহজভাবেই ঝুমুরের ব্যাপারটা বলে গেল। টেবিলের আড়ালে নয়না ওর একটা আঙুল ছুঁয়ে ওকে সাহস জোগাচ্ছিল। ও টের পেল, সুপ্রতিমের আঙুল কাঁপছে।

কিছু লেখার আগে দাসবাবু ব্যাপারটা শুনে নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে ছোটখাটো শব্দ করছিলেন, আর ডনপেনটা ডায়েরি-বইয়ের পাতায় ঠুকছিলেন।

শুনতে-শুনতে একসময় তাঁর মুখে মজা পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

হঠাৎই একজন সাদা-পোশাকের অফিসার সিগারেট টানতে-টানতে এগিয়ে এলেন। ধপ করে বসে পড়লেন দাসবাবুর পাশের চেয়ারটায়। আড়চোখে নয়নার সৌন্দর্য চেটে নিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'কী কেস, দাস?'

'হোমো কেস।' দাস মুচকি হেসে বললেন।

নয়না আর সুপ্রতিম 'হোমো' শব্দটা শুনে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।

'বলুন, তারপর কী হল—' সুপ্রতিমকে তাড়া দিলেন দাস।

খুঁড়িয়ে চলা ছ্যাকড়াগাড়ির মতো থতিয়ে-থতিয়ে কথা শেষ করল সুপ্রতিম। টের পেল, ওর ঘাড়ে, গলায়, কপালে ঘাম জমছে।

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্রই সাদা-পোশাকের অফিসারটি বলে উঠলেন, 'এ-ডায়েরি নিয়ো না, দাস—এই ভদ্রলোক ফেঁসে যাবেন।'

দাসবাবু ওঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, শঙ্করদা।'

নয়না অবাক চোখে জানতে চাইল, 'কেন? ডায়েরি নেবেন না কেন? লোকটা আমাদের লাইফ হেল করে দিচ্ছে...।'

'সবুর, ম্যাডাম, সবুর...।' সিগারেটে জোরালো টান দিয়ে সাদা-পোশাকের অফিসারটি বললেন, 'একটু মাথা খাটান, তা হলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। একটা ইয়াং ছেলে আপনার হাজব্যান্ডকে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" বলে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছে। মানছি, অন্যায় করেছে। কিন্তু তার বদলে আপনার হ্যাজব্যান্ড কী করেছেন? না ছেলেটাকে তুলোধোনা করে মুখ-মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছেন। কী, ঠিক বলছি তো?' শেষের প্রশ্নটা সুপ্রতিমকে লক্ষ করে।

সুপ্রতিম কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। নয়নাও ঠিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সাদা-পোশাকের অফিসারের কথায় খেই ধরে দাস সুপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই ছেলেটা যদি থানায় এসে আপনার নামে ডায়েরি করে তা হলে তো আপনি ভেতরে ঢুকে যাবেন। তখন বিচ্ছিরিরকম স্ক্যান্ডাল হবে, লোকজানাজানি হবে—একটা কেলো হয়ে যাবে।' একটু সময় দিলেন ওদের। তারপর: 'তার চেয়ে বরং বাড়ি যান। ছেলেটা আবার এলে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে নিন। ওর সঙ্গে মিউচুয়াল করে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনও ওয়ে আউট দেখছি না। শঙ্করদা কী বলেন?' সাদা-পোশাকের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন দাস।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে-দিতে শঙ্করবাবু বললেন, 'এ ছাড়া কোনও পথ নেই। এসব হোমো কেস নিয়ে ক্যাচাল যত কম হয় আপনাদের পক্ষে ততই ভালো। তবে এরপর কী হয়-না-হয় সেটা আমাদের ইনফর্ম করতে পারেন। সিরিয়াস কোনও টার্ন নিলে তখন...।'

সুপ্রতিম আর নয়না ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অফিসাররা যে ঠিক কথাই বলছেন, সে নিয়ে ওদের মনে কোনওরকম সন্দেহ ছিল না।

এক অদ্ভুত আতঙ্কে অবশ হয়ে শোলার পায়ে ওরা বাড়ি ফিরে এল। নয়না মনে-মনে ভাবছিল, কেমন দেখতে এই ঝুমুর চৌধুরীকে?

সুপ্রতিম যখন ফ্ল্যাটের দরজায় নাইট ল্যাচের চাবি ঘোরাচ্ছে তখন শুনতে পেল ঘরের ভেতর টেলিফোন বাজছে।

দরজা খুলে তাড়াহুড়ো করে ফোন ধরল সুপ্রতিম।

'হ্যালো—।'

'সুপ্রতিম...মাই লাভ...আই লাভ য়ু...।'

নয়না স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল ওর মুখটা চোখের পলকে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নয়না বুঝতে পারল, সুপ্রতিমকে কে ফোন করেছে।

ঝুমুরের টেলিফোনের উৎপাত চলতেই থাকল, কিন্তু সুপ্রতিম কিছুতেই আর বিরক্ত হল না। থানার দুই অফিসারের কথা ওর মনে ছিল। তাই ও মোলায়েমভাবে কথা বলে ঝুমুরকে নিরস্ত করতে চাইল। ওকে অনুনয় করে বলল, 'তুমি যেরকম ভালোবাসা চাও আমার মধ্যে সেরকম ভালোবাসা নেই। তুমি ভুল করছ—।'

ওকে বাধা দিয়ে আদুরে ঢঙে ঝুমুর বলল, 'না, না, ভুল নয়। তুমি আমার কাছে ধরা দিলেই বুঝবে আমি ভুল করিনি। আমি মনের মতো মনের মানুষ পেয়েছি।'

সুপ্রতিম অনেক চেষ্টা করেও গা-ঘিনঘিন করা ভাবটা চেপে রাখতে পারেনি। এবং টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

কিন্তু পরে আবার ঝুমুরের ফোন এসেছে।

সুপ্রতিম প্রতিবারই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। ফোনের ও-প্রান্তে ঝুমুর কেঁদে ভাসিয়েছে। আত্মহত্যা করবে বলে ওকে ভয় দেখিয়েছে। কখনও বলেছে, গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। কখনও বলেছে, ট্রেনের তলায় মাথা দেবে। আবার কখনও-বা বলেছে, গলায় দড়ি দেবে।

সুপ্রতিম বেশ বুঝতে পারছিল, ওর জীবনের কোথায় যেন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।

ঝুমুরের নিয়মিত ফোন আর ইনিয়েবিনিয়ে প্রেম সুপ্রতিমকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কয়েকদিন পর ওর মনে হতে লাগল ও বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই ঝুমুরের 'অন্যরকম' ভালোবাসার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে।

সুপ্রতিমের এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার সন্ধে সাতটা নাগাদ ওদের ফ্ল্যাটের কলিংবেল বেজে উঠল।

নয়না বাড়িতে নেই। সেলাইয়ের স্কুলে গেছে। সুপ্রতিমকে একা রেখে ও যেতে চায়নি, কিন্তু সুপ্রতিমই জোর করে ওকে পাঠিয়েছে, বলেছে, 'আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি! তা

ছাড়া ওই ঝুমুর চৌধুরীকে ভয়ের কী আছে! আগের দিন তো ওকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। আজ যদি হতচ্ছাড়াটা আসে তা হলে হকি স্টিক দিয়ে পেটাব।'

সুপ্রতিম একসময় হকি খেলত। ওর হকি স্টিকটা বেডরুমের দেওয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা থাকে। সেটা এখন ও ড্রইংরুমের সোফার তলায় এনে রেখেছে। কারণ, ওর মন বলছিল, ঝুমুর যেরকম খ্যাপা তাতে ও মঙ্গলবার সন্ধে সাতটায় আবার ওদের ফ্ল্যাটে এসে হানা দিতে পারে—সুপ্রতিমকে একা পাওয়ার জন্য।

তাই কলিংবেলের আওয়াজ শুনেই চমকে উঠেছিল সুপ্রতিম। তারপর সর্তক পায়ে দরজার কাছে গিয়ে 'ম্যাজিক আই' দিয়ে উঁকি মেরেছে।

না, ঝুমুর চৌধুরী নয়। দরজায় দাঁড়িয়ে ন্যাড়া মাথা গোঁপওয়ালা একজন লোক।

দরজা খুলে দিল সুপ্রতিম।

রোগা ছোটখাটো চেহারার লোকটি ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা ছোট ব্রিফকেস। শার্ট, প্যান্ট, টাই পরে একেবারে ফিটফাট। মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

সেলসম্যান নাকি! ভাবল সুপ্রতিম। কিন্তু এই সন্ধে সাতটায় কী বিক্রি করতে এসেছে?

সুপ্রতিম ভদ্রতা করে বলল, 'বলুন, কী চাই?'

'খুব ইম্পর্ট্যান্ট বিজনেস।' চাপা গলায় অস্পষ্টভাবে বলল লোকটি। তারপর খুব সহজ ভঙ্গিতে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল।

সুপ্রতিম লোকটির দিকে পিছন ফিরে সোফার দিকে একটা পা বাড়িয়েছিল, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ততক্ষণে ঝুমুর ওর নকল গোঁফটা একটানে খুলে ফেলে দিয়েছে ঘরের মেঝেতে। আর হাতের ব্রিফকেসটাও একপাশে নামিয়ে রেখেছে।

'তুমি!'

'হ্যাঁ, গো, আমি। তোমার কাছে না এসে থাকতে পারলাম না। ফোনেই তো বলেছিলাম, তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যদি তুমি মুখের ওপরে দরজা দিয়ে দাও, তাই মাথা ন্যাড়া করে নকল গোঁফ লাগিয়ে আসতে হয়েছে...।'

ঝুমুর বিচিত্র ঠমক-ঠামক করে কথা বলছিল। কটাক্ষ হানছিল। ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছিল।

সুপ্রতিম পাথর হয়ে তাকিয়ে ছিল অদ্ভুত এই প্রাণীটার দিকে। আর প্রাণপণে গা-ঘিনঘিন করা ভাবটাকে সামাল দিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল।

'তুমি রাগ করলে না তো! তোমার ওপরে আমার কোনও রাগ নেই। যাকে ভালোবাসি তার ওপরে কি রাগ করে থাকা যায়!'

কথাগুলো বলেই সুপ্রতিমের দিকে ঝাঁপিয়ে এল ঝুমুর। সুপ্রতিম ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ও আবেগজর্জর প্রেমিকার মতো সুপ্রতিমের বুকে মুখ ঘষতে লাগল, আর ইনিয়েবিনিয়ে বলতে লাগল, 'আমায় আদর করো। লক্ষ্মীসোনা, আমায় আদর করো। আমি আর পারছি না। প্লিজ...প্লিজ...। আমার শুধু বাইরেটা পুরুষ—ভেতরটা নয়।'

সুপ্রতিম মুখ নামিয়ে দেখল একটা ন্যাড়া মাথা ছেলে ওর বুকে মুখ ঘষছে। ও এমন নির্লিপ্তভাবে দেখছিল, যেন ওটা ওর বুক নয়—অন্য কোনও পুরুষের বুক।

হঠাৎই বিকট শব্দে 'ওয়াক তুলল সুপ্রতিম। ওর সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। এবং একইসঙ্গে এক ঝটকায় ঝুমুরকে ছিটকে ফেলে দিল ও। তারপর মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। মাথা ঝুঁকিয়ে বারবার বমির হেঁচকি তুলতে লাগল।

ওর গলার পাশে শিরা ফুলে উঠল। খানিকটা জল আর লালা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ঝুমুর তখন মেঝেতে সোজা হয়ে বসেছে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে সুপ্রতিমের দিকে। আর গুনগুন করে গাইছে, '...তোমার আদর পেলে আমি স্বর্গে চলে যাই/মর্ত্যে যে আর আমার কিছু নাই...।'

একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সুপ্রতিমের মাথায়। ওর চোখ চলে গেল সোফার নীচে—হকি স্টিকের দিকে। হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে ওটা। চুলোয় যাক দাসবাবু আর শঙ্করবাবুর হিতোপদেশ! দাঁত বের করে বসে থাকা ওই জানোয়ারটা ওঁদের তো কিছু করেনি! শুধু সুপ্রতিমের জীবনটাকে নরক করে তুলেছে।

কয়েকসেকেন্ড নিজের সঙ্গে লড়াই করল সুপ্রতিম। তারপর ডানহাত বাড়িয়ে দিল হকি স্টিকটার দিকে। ওটা আঁকড়ে ধরল শক্ত মুঠোয়।

আজ শুয়োরের বাচ্চাটার একদিন কি আমার একদিন। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল ও।

তারপর হকি স্টিক হাতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল ঝুমুরের কাছে। এবং খ্যাপা দাঁতালো শুয়োরের রাগ নিয়ে হকি স্টিক চালাতে শুরু করল।

ছোটবেলায় ধুনুরিদের লেপ-তোশক তৈরি করতে দেখেছে সুপ্রতিম। শীতের রোদে ছাদে বসে জমাট বাঁধা শক্ত তুলোকে তারা পিটিয়ে-পিটিয়ে নরম করে। এখন হকি স্টিক চালাতে-চালাতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। তবে ধুনুরিদের শব্দ যদি সত্তর-আশি ডেসিবেল হয় তা হলে সুপ্রতিমের আঘাতের শব্দ কম করেও একশো ডেসিবেল। তা ছাড়া ধুনুরিদের বেলা এমন রক্তারক্তি ব্যাপারটা ছিল না।

সুতরাং মেঝেতে বসে থাকা ছোটখাটো ছেলেটাকে নিষ্ঠুরভাবে তালগোল পাকিয়ে দিল সুপ্রতিম। ঝুমুর ওর পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে কুকুরছানার মতো কেঁউকেঁউ করতে লাগল। শব্দটা কেমন কান্না মেশানো গোঙানির মতো লাগছিল। ওর মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, জামায় রক্তের ফোঁটা ছিটকে লেগেছে, শরীরটা যেন ভাঙাচোরা 'দ' হয়ে গেছে।

উন্মত্ত রাগ কমে এলে সুপ্রতিম হকি স্টিকটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাপরের মতো হাঁপাচ্ছিল ও। ভাবছিল, এত শব্দ-টব্দ পেয়ে লোকজন না ছুটে আসে ওর ফ্ল্যাটে। তারপর থানা-পুলিশ...।

কয়েকসেকেন্ড অন্যমনস্ক হয়েছিল সুপ্রতিম। সেই ফাঁকেই ওর ঊরুতে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

তালগোল পাকানো ছেলেটা বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল। একবার, দুবার, তিনবার। প্রথম দুবার ঊরুতে, তৃতীয়বার হাঁটুর নীচে।

সুপ্রতিমের মনে হল ওর পায়ে জ্বলন্ত কয়লা ঘষে দিয়েছে কেউ। ও ঝুঁকে পড়ে পা চেপে ধরল।

আর তখনই ওর কোমরে ক্ষুর চালাল ঝুমুর।

যত না যন্ত্রণা পেল তার চেয়ে বেশি অবাক হল সুপ্রতিম। ও বিশ্বাসই করতে পারছিল না ওর পায়ের কাছে তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকা ক্ষীণজীবী মাংসপিণ্ডটা এইরকম ভয়ানক কাজ করতে পারে।

সুপ্রতিম পড়ে গেল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই পাগলটা লাফিয়ে উঠে এল ওর শরীরের ওপরে। ডানহাতে ধরা ক্ষুরটা চেপে ধরল সুপ্রতিমের বাঁ-কানের নীচে, খসখসে আদুরে গলায় বলল, 'ভালোবাসা আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই গো। তোমাকে খতম করে দিলে আমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ভালোবাসা না-পেলে কষ্ট যে আরও বেশি! আই লাভ য়ু, ডার্লিং...।'

খুব কাছ থেকে ঝুমুরের মুখটা লক্ষ করে এই প্রথম ওকে ভয় পেল সুপ্রতিম। ওরা দুজনেই হাঁপাচ্ছিল। একজনের নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাই-অক্সাইড ঢুকে পড়েছিল আর-একজনের নাকে। তাই ওদের দুজনেরই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

এক অজানা ভয়ে সুপ্রতিম কাঠ হয়ে গেল। ও টের পাচ্ছিল, ওর কোমর, ঊরু, পা থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। নয়না এখনই এসে পড়ছে না কেন! নয়নার ফিরে আসার জন্য মনে-মনে আকুল প্রার্থনা করতে লাগল ও।

ঝুমুর হিসহিস করে বলল, 'অসভ্যতা করলে গলা ফাঁক করে দেব। আর যদি চেঁচাও, তা হলে চিৎকারটা মুখ দিয়ে বেরোবে না—গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

ঝুমুর সুপ্রতিমের বুকের ওপরে উঠে বসল। বাঁহাতে টান মেরে সুপ্রতিমের জামা ছিঁড়ে দিল। তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর বুকে ক্ষুর চালিয়ে আড়াআড়ি দাগ টেনে দিল।

সুপ্রতিম যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করে ঝুমুর বলল, 'চুপ, সোনামণি। অনেক কষ্ট সয়ে তবেই আসল ভালোবাসা পাওয়া যায়।'

প্যান্টের পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করল ঝুমুর। ডান হাতে ক্ষুর নাচাতে-নাচাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সুপ্রতিমের মাথার দিকটায় গেল। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল। ক্ষুরটা হাতের কাছেই নামিয়ে রেখে 'নোড়ো না, লক্ষ্মীটি। নইলে বিপদ হবে।' বলতে-বলতে সুপ্রতিমের দুটো হাত বাঁধতে শুরু করল।

হাত দুটো শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেলে দড়িটা প্রান্তটা বেঁধে দিল একটা সোফার দু-পায়ার সঙ্গে। এখন অনেক চেষ্টা করে সুপ্রতিম সোফাটাকে সামান্য নাড়াতে পারবে হয়তো, কিন্তু সুপ্রতিম কোনওরকম চেষ্টা করছিল না। ও চোখ ঘুরিয়ে 'অন্যরকম' ঝুমুরকে লক্ষ করছিল, আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল।

দড়ির বাকি অংশটা ক্ষুর দিয়ে কেটে নিল ঝুমুর। চলে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। পা দুটো জোড়া করে শক্ত করে বাঁধল।

এমন সময় ঘরের টেলিফোন বাজতে শুরু করল।

ঝুমুর টেলিফোনটার দিকে একবার তাকাল শুধু। তারপর টেলিফোনের শব্দ কোনওরকম গ্রাহ্য না করে আর-একটা সোফা টেনে নিয়ে এল সুপ্রতিমের পায়ের কাছে। জোড়া পা বাঁধা পড়ল সোফার দু-পায়ার সঙ্গে।

ঝুমুর এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অদ্ভুতভাবে হাসল। ক্ষুরটা রেখে দিল সোফার ওপরে। তারপর নিজের পোশাক খুলতে শুরু করল। সুপ্রতিম ভয়ার্ত

চোখে ওকে দেখতে লাগল।

বাজতে-বাজতে ক্লান্ত হয়ে টেলিফোন থেমে গেল একসময়।

ততক্ষণে সুপ্রতিমের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়েছে প্রায়-নগ্ন ঝুমুর। ওর পরনে শুধু একটা গাঢ় নীল রঙের জাঙ্গিয়া।

ফরসা ফ্যাকাসে রোগা শরীর, ন্যাড়া মাথা, মাথায় রক্তের দাগ, গলায় সামান্য রক্তের ছিটে, মুখে চওড়া হাসি, অথচ ঠান্ডা চোখ। ঝুমুরকে কেমন যেন অলৌকিক প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল।

এইবার ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে মেঝেতে বসল ঝুমুর। ওটা খুলতেই দেখা গেল মেয়েলি প্রসাধনের নানান জিনিস। একটা হাত-আয়না নিয়ে ঝুমুর সাজতে বসল। আর একইসঙ্গে গুনগুন করে গাইতে লাগল: 'ভালোবাসার তুমি কী জানো? ভালোবাসার তুমি কী জানো? উঁ...উঁ...উঁ...পায়ের উপর পা-টি তুলে/হিসাবের খাতা খুলে/ বসে রও আপন ভুলে/যত বলি ঢের হয়েছে/মানা না মানো।/ভালোবাসার তুমি...উঁ...উঁ...উঁ...।'

মুখে পাউডার-ক্রিম ইত্যাদি মাখা হয়ে গেলে চোখে কাজল পরতে শুরু করল। তারপর চোখের পাতার ওপরে রং ঘষতে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান দিক থেকে নিজের প্রসাধন আয়নার পরখ করল।

প্রসাধনে সন্তুষ্ট হয়ে হাতে লিপস্টিক তুলে নিল ঝুমুর। লাল ডগাটা বের করে ঠোঁটে ঘষতে লাগল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল। কয়েকবার কোমর বেঁকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েলি নাচের ভঙ্গি করল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে এগিয়ে এল অসহায় রক্তাক্ত সুপ্রতিমের দিকে।

সুপ্রতিম শুয়ে-শুয়েই স্নো-পাউডারের গন্ধ পেল।

সুপ্রতিমের ঠোঁটে, মুখে, বুকে লিপস্টিক ঘষে দিল ঝুমুর। তারপর লিপস্টিক ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওকে কষে চটকাতে লাগল, আর জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি তোমায় বড় ভালোবাসি/তোমার বড় ভালোবাসি...আমি তোমায় বড় ভালোবাসি...।'

সুপ্রতিম ভাবছিল, ও কি বেঁচে আছে? এই ঘটনাগুলো কি সত্যি? না কি দুঃস্বপ্ন!

'বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো। একবার বলো, আমায় ভালোবাসো। তুমি আমার—আর কারও নয়। শুধু একবার বলো...।'

অসুস্থ উন্মত্ত ছেলেটা সুপ্রতিমের জামা সরিয়ে দিয়ে খোলা বুকে মুখ ঘষছে। ঠোঁটে, গালে, চোখে যথেচ্ছ চুমু খাচ্ছে। হাতড়াচ্ছে যেখানে-সেখানে। আর অনর্গল ভালোবাসার কথা বলছে।

ঝুমুর ওর প্যান্টের বোতাম খোলা শুরু করতেই সুপ্রতিম চাপা চিৎকার করে উঠল।

'কী, কষ্ট হচ্ছে?' ঝুমুর নিষ্পাপ স্বরে জিগ্যেস করল, 'তুমি শুধু একবার বলো, আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসবে...তা হলেই তোমার সব বাঁধন খুলে দেব। তুমি শুধু আমায় একটা চুমু খাও...একটা...তা হলেই আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে যাব।...শুধু একবার...।'

সুপ্রতিমের গলা দিয়ে বমি উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু গলা ফাঁক হয়ে যাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভালো।। ওর মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিছু

একটা করা দরকার, কিছু একটা করা দরকার...।

দাঁতে দাঁত চেপে সুপ্রতিম কোনওরকমে বলল, 'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ঝুমুর।'

প্যান্টের জিপার খুলতে গিয়ে ঝুমুরের হাত থেমে গেল। ও আদুরে গলায় বলল, 'কী বললে গো? আর-একবার বলো। প্লিজ...।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আরও ভালোবাসতে চাই...। আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও, প্লিজ...।' কথা বলতে গিয়ে সুপ্রতিমের দম আটকে যাচ্ছিল।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো চট করে উঠে পড়ল ঝুমুর। হাঁপাতে-হাঁপাতে সুপ্রতিমের বাঁধন খুলতে শুরু করল। উত্তেজনায় ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

বাঁধন খোলা হতেই সুপ্রতিমের কপালে হাত বুলিয়ে নরম সুরে ঝুমুর বলল, 'নাও, এবার ওঠো।'

ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে বসল সুপ্রতিম। কাটা জায়গাগুলো ভীষণ জ্বালা করছে।

ঝুমুরের আর তর সইছিল না। ও সুপ্রতিমের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। ওর কোলে উঠে বসল একেবারে।

সুপ্রতিমের মনে হল একটা কোলাব্যাঙ ওর কোলে বসে আছে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে ও ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে-গালে চুমু খেল। বিড়বিড় করে বলল, 'আই লাভ য়ু, ঝুমুর...।'

শরীরের ভেতর থেকে উঠে আসা বমির দমক রুখে দিয়ে সুপ্রতিম ভাবল, নয়না এখনও আসছে না কেন।

আর ঠিক তখনই ঝুমুরের নগ্ন কাঁধের ওপর দিয়ে সোফার ওপরে পড়ে থাকা ক্ষুরটা ও দেখতে পেল। হাতের প্রায় নাগালে রয়েছে ওটা।

ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে কোনওরকমে হাঁটুগেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুপ্রতিম। পলকা ছেলেটা সুপ্রতিমের আশ্লেষে আনন্দে টইটম্বুর হয়ে ভালোবাসার প্রলাপ বকছে শুধু। আর সুপ্রতিম নিজের প্রাণ বাঁচাতে একের-পর-এক চুমু খেয়ে চলেছে ওর স্নো-পাউডার মাখা মুখে।

ক্ষুরটা এখন পুরোপুরি সুপ্রতিমের হাতের নাগালে।

ও মুঠো করে অস্ত্রটা ধরল। তারপর ঝুমুরকে আদর করতে-করতে ক্ষুরটা দিয়ে এল ওর গলার খাঁজের কাছে।

কতক্ষণ আর সুপ্রতিমের শক্তি থাকবে কে জানে! মাথা ঝিমঝিম করছে। রক্তে চটচট করছে হাত-পা-বুক।

চুলোয় যাক ভদ্রতা, সভ্যতা, নীতি, দয়া ইত্যাদি।

আত্মরক্ষা মানুষের একটা আদিম ধর্ম।

বাঁহাতে ঝুমুরের মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়েই ডান-হাতে ক্ষুর টেনে দিল সুপ্রতিম।

ঝুমুরের ভালোবাসার প্রলাপ মাঝপথেই থেমে গেল। তার বদলে ঘরঘর শব্দ বেরোতে লাগল মুখ আর গলা দিয়ে।

রক্তে মুখ-গলা-বুক ভেসে গেল সুপ্রতিমের। ওর মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ও জ্ঞান হারিয়ে কাত হয়ে পড়ল মেঝেতে। ঝুমুরের মৃতদেহ

তখনও ওকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

একটি অচেতন দেহ ও একটি মৃতদেহ অসাড় হয়ে নয়না অথবা আর কারও জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রক্তের ধারা তখন মেঝেতে গড়িয়ে-গড়িয়ে সময়ের হিসেব রাখছিল।

সাসপেন্স ডট কম

গল্প

অপারেশান দাঁড়কাক

কথায় বলে কাক কাকের মাংস খায় না।

আমিও এতদিন তাই-ই জানতাম। কিন্তু একটা ০.৪৫৭ লুগার অটোমেটিক নিয়ে মহিন রায়ের আবির্ভাবের পর থেকে ওপরের প্রবাদ-বাক্যটা এই অধম ভুলতে বসেছে। লোকটা এমন এলোপাতাড়িভাবে ডাইনে-বাঁয়ে খুন করে যাচ্ছে যে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমার ক্লায়েন্ট কমে যাওয়ায় আমি যত না আঘাত পেয়েছি, তার চেয়েও বেশি পেয়েছি ওই 'খুন' শব্দটাকে মহিন রায় যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করছে বলে।

অর্থাৎ মোদ্দা কথা, এতদিনের পর সতীশ দেবনাথ—অথবা 'শার্প' দেবনাথ একজন উন্মাদ প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়েছে।

আমি সাধারণত এইসব মোক্ষলাভ করানোর ('খুন' শব্দটাকে আমি আবার ঠিক পছন্দ করি না) ব্যাপারে শিল্পীসুলভ মন নিয়ে কাজ করি। ডিটেলের দিকে দিই অখণ্ড গভীর মনোযোগ—যার জন্যে পুলিশ চিরকালই মুখোমুখি হয়েছে এক অদ্ভুত সমস্যার: সেটা হল, খুনের পদ্ধতি তারা কোনওদিনই খুঁজে পায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে প্রফেশনাল কিলার হিসেবে আমার নামডাক বেড়েছে বই কমেনি।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, একটা নিখুঁত খুনের পেছনে দরকার সময়, অধ্যবসায় ধৈর্য এবং সবার ওপরে বুদ্ধি। অন্য সবকিছুতে আমার চেয়ে ছোট হলেও একটা ব্যাপারে মহিন রায় আমাকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়েছে।

সে জিনিসটা হল সময়।

একটা নিখুঁত খুনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সময়। মহিন সময়ের ধার ধারে না—যার ফলে ওর খুনগুলো ঠিক নিখুঁত নয়। যেমন কোনও পাঁচিলের আড়ালে বা ঝোপের ফাঁকে লুকিয়ে থেকে ভিকটিমকে গুলি করে স্রেফ চম্পট দেওয়া—এই টাইপের। না, মহিনকে প্রথম শ্রেণির খুনি বলতে আমি একেবারেই নারাজ। সুতরাং, এই অপরাধের জগতে একমেবাদ্বিতীয়ম নিখুঁত প্রফেশনাল কিলার সতীশ দেবনাথ যেমন চিরকাল দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে এসেছে, তেমনি আজও করবে। সেখানে মহিন রায়ের মতো একটা থার্ড গ্রেড কিলারের কোনও জায়গা নেই। কারণ সবকিছু সহ্য করলেও খুন-শিল্পের অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

মহিনকে সরানোর প্ল্যান আমার তৈরিই ছিল। শুধু লাগসই জায়গা দেখতে-দেখতে কেটে গেল একটা মাস। মঞ্চ-সজ্জার কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে নাটকের প্রথম দৃশ্যের

জন্যে তৈরি হলাম। কিন্তু তখনও জানি না মহিন রায় আমার বিরুদ্ধের কী চক্রান্ত করে চলেছে!

রোজ রাতের মতো চৌরঙ্গি এলাকার একটি বিশেষ ল্যাম্পপোস্টের নীচে অলসভাবে দাঁড়িয়ে ছিল মহিন রায়।

মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো। মেয়েদের মতো মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা। চওড়া কপালের ডানদিকে একটা আঁকাবাঁকা নীলচে শিরার আভাস। ঘন ভুরুর নীচে ছোট-ছোট হায়েনা-চোখ। ভোঁতা নাকের নীচে গোঁফ। ক্ষুর দিয়ে চেরা কাটা দাগের মতো পাতলা ঠোঁট। গলায় রঙিন মাফলার। গায়ে কালো শার্ট, কালো প্যান্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট—তার গায়ে মনোগ্রাম করা 'এম. আর.।' অর্থাৎ, মহিন রায়।

রায় তার লোমশ ফরসা হাত দুটো পকেটে ভরে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখজোড়া বেজির মতো চঞ্চল। কিন্তু ওর চোখে পড়েনি, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা, রোগা-সোগা চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছে। হঠাৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটা রাস্তা পার হতে লাগল। তার হাঁটার ভঙ্গিতে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব মহিনের নজর এড়াল না। লোকটা চকিতে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর ধীরে-ধীরে মহিনের কাছে এগিয়ে এল। একটা নিওন সাইনকে তীকষ্ন মনোযোগে লক্ষ করতে-করতে ক'টা শব্দ ছুড়ে দিল, 'এম. আর.? পি. কে.?'

মহিন জানে, এর অর্থ 'মহিন রায়? প্রফেশনাল কিলার? তাই ও ছোট করে জবাব দিল, 'এল ০.৪৫৭।' 'যার অর্থ, লুগার ০.৪৫৭।'

রায়ের সম্মতি পেয়ে ভদ্রলোক ওর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালেন 'আমার নাম কাকু শর্মা। আপনার সঙ্গে কয়েকটা প্রাইভেট কথা আছে।'

শর্মা চট করে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন: 'প্লিজ কাম উইথ মি।' একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে হাত দেখিয়ে দাঁড় করালেন শর্মা। তারপর মহিনের দিকে ফিরে বললেন, 'লেটস গো।'

ট্যাক্সিতে উঠে শর্মা হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'মিস্টার রায়, আপনাকে একটা লোককে—।'

'শাট আপ, প্লিজ।' ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে শর্মাকে থামতে বলল মহিন।

ভদ্রলোক বারকয়েক ঢোঁক গিলে চুপ করে গেলেন। তাকে দেখে ভীষণ চিন্তিত মনে হল। মুখময় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। অনিদ্রায় চোখজোড়া করমচার মতো লাল। চুল উসকোখুসকো—চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ডান গালে একটা ছোট্ট তিল। সারা মুখে কেমন একটা হিংস্র, রুক্ষ ভাব।

মহিনের ইশারা কাকু শর্মা বুঝতে পারলেন। তাই চুপচাপ বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

শর্মার নির্দেশে একসময় ট্যাক্সি এসে থামল পার্ক সার্কাসের একটা ফ্ল্যাটের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে দুজনে পা বাড়ালেন অটোমেটিক এলিভেটরের দিকে।

চারতলায় পৌঁছে কাকু শর্মা পকেট থেকে চাবির গোছা বের করলেন। তাতে কম করেও প্রায় একডজন চাবি। মহিন পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সবই লক্ষ করতে লাগল। দরজা খুলে মহিনকে ভেতরে ডাকলেন শর্মা, 'আসুন—ভেতরে আসুন।'

মহিন ঢুকতেই অতি সাবধানে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন রহস্যময় ভদ্রলোক। কিন্তু দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই এক চরম বিস্ময়ের মুখোমুখি হলেন। তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। কোনওরকমে তোতলা স্বরে বলে উঠলেন, 'মি—মিস্টার রায়! এ—এ কী?'

মহিন তখন দাঁত বের করে হিংস্রভাবে হাসছে। ওর ডানহাতের অভ্যস্ত মুঠোয় এক বিচিত্র ভারসাম্য নিয়ে কাঁপছে একটা ০.৪৫৭ লুগার অটোমেটিক। তার নলটা কাকুর চোখে যেন বড় বেশি কুৎসিত মনে হল।

শর্মার দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে এল রায়। পেটে রিভলভার দিয়ে এক খোঁচা মারল: 'চলুন—ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসুন।'

শর্মা বিনা প্রতিবাদে মহিনের আদেশ পালন করলেন। মহিন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শর্মার জামাকাপড় সার্চ করতে শুরু করল। কিন্তু কিছু না পেয়ে একটু দূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল, 'মিস্টার শর্মা, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। এসবই হল প্রফেশনাল ব্যাপার। যাকগে, এবার আপনার দরকারটা খুলে বলুন।'

নির্বিকার ভঙ্গিতে রিভলভারটা জামার খাপে চালান করে দিল রায়। কাকু শর্মাকে এবার অনেকটা সহজ মনে হল। তিনি কাষ্ঠহাসি হাসলেন। মুখের চিন্তার ভাবটা আরও গভীর হল। তিনি থেমে-থেমে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন, 'মিস্টার রায়, আমি একটা লোককে খুন করাতে চাই।'

'দু-হাজার লাগবে।' মহিন শান্তভাবে জবাব দিল।

'জানি। আমার চেনা একজনের কাছ থেকে আমি আপনার সব খবর পেয়েছি। কিন্তু এই ব্যাপারটা একটু কমপ্লেক্স—।'

মহিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল: 'তার মানে?'

'মানে—এই খুনটায় আপনি রিভলভার ব্যবহারের চান্স পাবেন না। তাই আমার সাজেশান অনুযায়ী আপনাকে খুনটা করতে হবে।'

'কারণ?'

'কারণ আমার ভিকটিম বাড়ি ছেড়ে খুব একটা বেরোয় না। আর যখনই বেরোয় আর্মস নিয়ে বেরোয়।—অর্থাৎ সেও আপনারই মতো একজন প্রফেশনাল কিলার।'

'কী বলছেন আপনি? প্রফেশনাল কিলার?'

'হ্যাঁ—তার নাম সতীশ দেবনাথ। তবে শার্প ব্রেনের জন্যে সকলে তাকে শার্প দেবনাথ বলে ডাকে।'

মহিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে ফুটে উঠল আবেগহীন হাসি। শূন্য দৃষ্টিতে ও কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দেওয়ালের দিকে। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করল, 'মিস্টার শর্মা, আমার উত্তর শুনলে আপনি হয়তো খুব অবাক হবেন—।'

শর্মা জিজ্ঞাসার চোখে মহিনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

‘এ-খুনটার জন্যে একটা পয়সাও আমি আপনার কাছ থেকে নেব না। কারণ, সতীশ দেবনাথ আমার একনম্বর রাইভাল।’

‘ডোন্ট গেট এক্সাইটেড, মিস্টার রায়।’ হাত তুলে মহিনকে বসতে অনুরোধ করলেন কাকু শর্মা: ‘পুরো ঘটনাটা আগে আপনার শোনা দরকার—।’

মহিন রায় ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল। কিন্তু ওর ডান হাত বুকের কাছে লাগানো রিভলভারে খামচি মেরে রইল।

‘মিস্টার রায়, রিমা কাশ্যপকে আপনি চেনেন?’ হঠাৎই প্রশ্ন করলেন শর্মা।

‘উঁহু।’ মাথা নাড়ল মহিন।

‘রিমা কাশ্যপ ছিল একজন ক্যাবারে ড্যান্সার—”অশোক” বারে ও নাচত। ওর ক্যারেকটার খুব একটা ভালো ছিল না, কিন্তু তবুও আমি ওকে ভালোবাসতাম। হ্যাঁ, শুনে আপনার হয়তো অবাক লাগছে, মিস্টার রায়—বাট ইট ওয়াজ আ ফ্যাক্ট। বিয়ে-শাদি আমি করিনি। একা থাকি, দু-হাতে পয়সা খরচ করি। তাই জীবনের একমাত্র শখ হিসেবে পুষেছিলাম রিমাকে। কিন্তু তার বছরখানেক পরে, এই গত জুলাইয়ে, একটা ঘটনা ঘটল। এক ভদ্রলোক একটা ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটে রিমাকে জড়িয়ে ফেললেন। রিমা নিজে জানতেও পারল না, কখন ও এক ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যখন জানল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

‘সেই সময়েই এক ক্লায়েন্টের কথায় সতীশ দেবনাথ ওকে খুন করে। সতীশ রিমার জুতোর তলায় দুটো ছোট-ছোট স্টিলের বল লাগিয়ে দেয়। তাতে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় পা পিছলে রিমা এক প্যাথেটিক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। পুলিশ ঘটনাটাকে নিছক অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে দেখেছিল, কারণ, পরে রিমার জুতোর নীচে সেই স্টিলের বলদুটো আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

‘মিস্টার রায়, রিমা ছিল আমার সব। একজন তিনকুলে-একা পুরুষকে ও লোনলিনেস ভুলিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং সামবডি মাস্ট পে ফর রিমাজ অ্যাক্সিডেন্ট। এবং সেই সামবডি সতীশ দেবনাথ ছাড়া আর কেউ নয়। মানি ইজ নো প্রবলেম, মিস্টার রায়—তাই সতীশকে সরানোর দায়িত্ব আমি আপনাকেই দিতে চাই। এবং ইট মাস্ট লুক লাইক অ্যান অ্যাকসিডেন্ট—নট মারডার। যেমনটা হয়েছিল রিমার বেলায়।’

মহিন একমনে কাকু শর্মার কথা শুনছিল। শর্মা থামতেই ও নিচু গলায় বলে উঠল, ‘আমার ০.৪৫৭ ছাড়া আমি এক পা-ও চলি না—সেটাই আমার শেষ কথা।’

‘আমি তা জানি, মিস্টার রয়। আপনার মেশিন আপনি ইচ্ছে করলে সঙ্গে রাখতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই সেটা ইউজ করতে পারবেন না। আশা করি সেরকম দরকারও হবে না। উহুঁ, ব্যস্ত হবেন না। আগে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, সতীশ দেবনাথ বাড়িতে সবসময় রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না। নাম্বার টু, আপনি যখন ওকে ধাক্কা দিয়ে চারতলার ওই বারান্দা থেকে নীচে ফেলে দেবেন, তখনও ওর কাছে আর্মস থাকবে না। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে এ-কাজটা হাতে নিতে পারেন। রিমার মৃত্যুর বদলা নিতে যত টাকা লাগে, আমি খরচ করব। না, না—টাকা নিতে আপনার আপত্তি থাকলেও আমি শুনব না। কাজ শেষ হয়ে গেলে দু-হাজার টাকা আপনাকে আমি গিফট হিসেবে দিতে চাই।’

মহিন নীরব। একদৃষ্টে ও চেয়ে রইল শর্মার মুখের দিকে।

'আপনার যদি এ-কাজে আপত্তি না থাকে তো বলুন—' শর্মা বলে চললেন, '—কালই প্রিলিমিনারি ইনস্পেকশানটি সেরে ফেলি।'

'প্রিলিমিনারি ইনস্পেকশান?' ভীষণ অবাক হল রায়: 'তার মানে?'

'সেটা আপনাকে জানাব—যদি কাজটা আপনি হাতে নেন। তার আগে নয়।'

'ভালো।' বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সম্মতি জানাল মহিন।

'ধন্যবাদ।' পকেট থেকে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান আর দেশলাই বের করে মহিনের দিকে এগিয়ে দিলেন শর্মা। মহিন মাথা নেড়ে 'না' বলল। তখন নিজেই একটা ধরিয়ে প্যাকেট এবং দেশলাই আবার পকেটে চালান করলেন।

অলসভাবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'মিস্টার রায়, আমার একটা আশ্চর্য গুণ আছে। তা হল, পৃথিবীর যে-কোনও তালাই আমি মিনিটদুয়েকের মধ্যে খুলে ফেলতে পারি।'

'কিন্তু এর সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না?' শর্মাকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল মহিন।

'আছে, মিস্টার রায়, আছে। বহু কষ্টে আমি সতীশ দেবনাথের ফ্ল্যাটের ঠিকানা খুঁজে বের করেছি। কাল সতীশ যখন থাকবে না, তখন আপনাকে নিয়ে আমি একবার সতীশের ফ্ল্যাট ইনস্পেকশানে যেতে চাই। স্পটটা আগে থেকে দেখা থাকলে আপনার অনেক সুবিধে হবে, তাই না?'

'হয়তো তাই।' অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল মহিন। ওর মন তখন চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

'ঠিক আছে। তা হলে কাল সন্ধে সাতটায় আপনি আমার এখানে আসুন। তারপর এখান থেকে একসঙ্গেই বেরোনো যাবে। ইন দ্য মিন টাইম আমি ফোন করে জেনে নেব সতীশ কখন বাইরে বেরোবে। ব্যস, তারপর আর কোনও চিন্তা নেই।' হিংস্র উল্লাস খেলা করল কাকু শর্মার মুখে। আনমনে তিনি বলে চললেন, 'রিমার আত্মা এবার শান্তি পাবে—।'

'তা হলে কাল সন্ধে সাতটা।' মহিন চেয়ারে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

কাকু শর্মা তখন টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে ফেললেন। ড্রয়ারে থরে-থরে সাজানো নোটের বান্ডিল। আর তার পাশেই পড়ে রয়েছে একটা ০.৩৮ পুলিশ স্পেশাল। রিভলভারের গায়ে একটা হাত রাখলেন কাকু। দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করলেন, 'মিস্টার দেবনাথ, এবার তোমার পালা।'

পরদিন রাত আটটায় কাকু শর্মা আর মহিন রায় এসে দাঁড়াল সতীশ দেবনাথের বাড়ির সামনে। অন্ধকার এলাকায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার কোনও স্পষ্ট আদল পাওয়া গেল না। নীরবে দুজনে এগিয়ে চলল লিফটের দিকে।

লিফটে উঠে তিননম্বর বোতাম টিপলেন কাকু শর্মা। নিঃশব্দে উঠতে শুরু করলে লোহার খাঁচা। মহিনকে দেখে একটু উত্তেজিত মনে হল শর্মার। ওর হাত পোশাকের

আড়ালে—বোধহয় রিভলভারের ওপরে। শর্মা ওর কাঁধে হাত রাখলেন 'টেক ইট ইজি। আমি এখানে আসার আগেই ফোন করে জেনে নিয়েছি সতীশ দেবনাথ ওর ফ্ল্যাটে নেই। অতএব রিল্যাক্স।'

'এটা জাস্ট প্রিকশন।' বরফশীতল স্বরে জবাব দিল রায়।

মৃদু হেসে ঘাড় ঝাঁকালেন কাকু।

লিফট থামতেই সন্তর্পণে করিডরে পা দিলেন তিনি। মহিন রায়কে ইশারায় আহ্বান জানালেন। সামনেই একটা ফ্ল্যাটের দরজা। মহিন লক্ষ করল ফ্ল্যাটের নম্বর ১২। দরজার ডান পাশে একটা কলিংবেল। শর্মা বারকয়েক কলিংবেলে চাপ দিলেন। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না ভেতর থেকে।

শর্মা ঘাড় ফিরিয়ে মহিনের দিকে একপলক তাকালেন। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন চাবিভরতি রিংটা।

রায় চুপচাপ লক্ষ করে চলল শর্মার কার্যকলাপ।

মিনিটদুয়েক ধরে চাবির গোছা নিয়ে কীসব খুটখাট করলেন তিনি। তারপরই হাতল ঘুরিয়ে একটু-একটু করে খুলে ফেললেন ফ্ল্যাটের দরজা।

অভ্যাসবশে মহিন নিমেষের মধ্যে হোলস্টার থেকে বের করে নিল ওর লুগার অটোমেটিক। শর্মা কিন্তু ফিরেও তাকালেন না। আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকে পড়লেন। অতি সাবধানে তাকে অনুসরণ করল মহিন রায়।

শর্মা আলোর সুইচ অন করে অল্প পাওয়ারের একটা আলো জ্বেলে দিলেন।

একইসঙ্গে মহিনও ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল ফ্ল্যাটের দরজা।

'মিস্টার রয়, এই হল সতীশের ঘর। ভালো করে দেখে রাখুন।'

মহিন পেশাদার চোখে ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল।

দরজার ডান পাশে একটা ছোট টেবিল। তার ওপর অগোছালোভাবে পড়ে রয়েছে খানকতক ক্রিমিনোলজির বই। টেবিল থেকে, হাততিনেক দূরে একটা স্টিলের আলমারি। ডানদিনের দেওয়ালের ঝুলছে তিনটে ক্যালেন্ডার। ছবিগুলো নেহাতই ঠাকুর-দেবতার। দরজার মুখোমুখি একটা ছোট বারান্দা।

বারান্দার দু-দিকের দেওয়ালে দুটো জানলা। অত্যন্ত ছোট মাপের—গরাদ দেওয়া।

বাঁদিকের জানলার পাশে একটা বড় ওয়াল ক্লক। তার রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা এই অল্প আলোতেও জ্বলজ্বল করছে। ঘড়ির দিকে নীচেই একটা টিপয়। তার ওপরে একটা টেলিফোন, সাদা রঙের।

ঘরের বাঁদিকে একটা লম্বা-চওড়া খাট। বিছানার সাদা চাদর বহু ব্যবহারে ময়লা হয়ে গেছে। একজোড়া বালিশ খাটের ও-মাথায় পড়ে রয়েছে। তার পাশে কিছু জামাকাপড়। আর এ-মাথায় পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা ভাঁজ করা চাদর। খাটের নীচ থেকে উঁকি মারছে একটা সুটকেস, একটা ট্রাঙ্ক। দরজার বাঁদিকে একটা বড় কাঠের বাক্স তালাবন্ধ। তার পাশে একটা কুঁজো—কাচের গ্লাস দিয়ে ঢাকা দেওয়া। আর চোখে পড়ছে একটা ছোট দরজা। সম্ভবত বাথরুম।

প্রতিটি জিনিসের ওপরে চোখ বুলিয়ে মহিন রায়ের চোখ এসে স্থির হল কাকু শর্মার চোখে। কাকু বুঝতে পারলেন মহিনের নীরব প্রশ্ন। তাই জবাব দিলেন, 'এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখার ভীষণ দরকার আছে, মিস্টার রায়। এই ঘরের প্রতিটি ফার্নিচার এবং তাদের পজিশান আপনাকে এমনভাবে মনে রাখতে হবে, যাতে কেউ এ-বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করলে আপনি তার কারেক্ট আনসার দিতে পারেন।'

'কিন্তু কেন?' মহিন জিগ্যেস করল।

'কারণ, অপারেশান সতীশ এক্সিকিউট করতে হবে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সুতরাং ওই অন্ধকারে আপনার নিজের পজিশান সঠিক রাখার জন্যে অন্যান্য আসবাবপত্রের পজিশান আপনাকে মেমোরাইজ করতেই হবে।'

'তারপর?'

'এবার আমি খুনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই।'

মহিন সোজা গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল। রিভলভারটা আবার হোলস্টারে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর উৎসুক চোখ মেলে তাকাল কাকুর দিকে।

'রাত ঠিক বারোটার সময় আমি আপনাকে এই ফ্ল্যাটের কাছে পৌঁছে দেব। আর সঙ্গে দিয়ে দেব এই ফ্ল্যাটের দরজার চাবি। তারপর, আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, আপনি এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনবেন। কারণ ওই সময়ের মধ্যেই আমি রাস্তার ওপারে যে-ডাক্তারখানা আছে, সেখান থেকে সতীশকে ফোন করব। তখন আপনি ফোনের শব্দ শুনতে পাবেন। তারপর কথাবার্তায় যখনই বুঝবেন সতীশ রিসিভার টেবিলে রেখে বারান্দার কাছে যাচ্ছে, তখনই আপনি নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওর ঘরে ঢুকে পড়বেন।'

'কিন্তু আপনি কী করে শিয়োর হচ্ছেন যে, মিস্টার দেবনাথ বারান্দার কাছে যাবেন?'

'অধৈর্য হবেন না, মিস্টার রায়। বাইরের করিডর পুরো অন্ধকার থাকবে। অতএব সতীশ আপনাকে দেখতে পাবে না। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তবে সতীশ রিসিভার তুলে কথা বলার পর নিশ্চয়ই বারান্দার কাছে যাবে। কারণ, আমি তাকে ফোনে বলব, একটা লোক পাইপ বেয়ে তার বারান্দায় ওঠার চেষ্টা করছে: সম্ভবত লোকটার মতলব ভালো নয়—।'

'ও—। তা হলে দেবনাথ তখন বারান্দায় যাবেই। দেখতে চেষ্টা করবে, পাইপ বেয়ে সত্যিই কেউ ওঠার চেষ্টা করছে কি না। আর তখনই আমি...।'

'ছুটে গিয়ে ওকে বাইরে পড়তে সাহায্য করবেন। ক্লিয়ার?'

'অ্যাবসলিউটলি!' দাঁতে দাঁত ঘষে জবাব দিল মহিন।

'তা হলে নেক্সট উইকে, এই একই দিনে, আমরা এখানে আসব, আর সেটাই হবে সতীশ দেবনাথের শেষ রাত।'

কাকুর কথা শেষ হতে-না-হতেই একটা সামান্য শব্দে ওরা দুজনেই তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠল। কাকু তিরবেগে ছুটে গেলেন আলোর সুইচের দিকে। আর একইসঙ্গে রিভলভারটা বের করে মহিন দৌড়ল আলমারি লক্ষ করে।

রায় আলমারির আড়ালে লুকিয়ে পড়ামাত্রই নিভে গেল ঘরের আলো। অন্ধকারে ও কাকুকে দেখতে পেল না।

এদিকে বাইরের পায়ের শব্দ এসে থেমেছে দরজার কাছে। তারপর শোনা গেল দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ।

একটু পরেই সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে দরজার পাল্লা ফাঁক হতে শুরু করল।

বাইরের আলোর পটভূমি দেখা গেল দরজায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক ছায়ামূর্তি।

হঠাৎ রায় অনুভব করল কার হাতের স্পর্শ। ও চমকে উঠতেই কানে এল কাকুর ফিসফিসে চাপা গলা, 'সতীশ দেবনাথ!'

ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গেল আলোর সুইচের দিকে। আর সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই মুহূর্তে ঝনঝন করে বেজে উঠল ঘরের টেলিফোন। ছায়ামূর্তি আলো না জ্বেলে ফোনের দিকে পা বাড়াতেই বিদ্যুৎঝলকের মতো দরজা লক্ষ করে ছুটে গেল মহিন আর কাকু। পলকের মধ্যে দরজা খুলে ওরা করিডরে পা দিল।

মহিন কাকুর আগে আগে ছুটছিল। ও দৌড়ে লিফটে উঠতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ভীষণভাবে নিজেকে সামলে নিল।

লিফটের জায়গায় লিফট নেই। অথচ কোলাপসিবল গেটটা হাট করে খোলা। উঁকি মেরে দেখল, লিফট দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই একতলায়।

তা হলে কোলাপসিবল গেটটা খুলল কী করে? কে-ইবা খুলল?

মুহূর্তের মধ্যে সিঁড়ি লক্ষ করে দৌড়তে শুরু করল মহিন। ওর পিছনে-পিছনে কাকু। তার পিছনে কি কারও পায়ের শব্দ ভেসে আসছে?

কীভাবে যে ওরা শেষ পর্যন্ত রাস্তায় এসে পৌঁছল, তা ওদের মনে নেই। সতীশের বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে ওরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। আজ খুব জোর বেঁচে গেছে!

চলে যাওয়ার আগে কাকু মহিনের কাঁধে টোকা মেরে মনে করিয়ে দিলেন, 'আগামী শুক্রবার রাত এগারোটায় আমরা বেরোব। আপনি আমার বাড়িতে সময়মতো আসবেন, মিস্টার রায়। কারণ, পাংচুয়ালিটি আমি পছন্দ করি।'

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল মহিন রায়। লুগার অটোমেটিক তখন ওর হোলস্টারে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। কিন্তু ওর কপালে জমে ওটা ঘামের ফোঁটা রাস্তার আলোয় চকচক করছিল।

শুক্রবার। রাত সাড়ে এগারোটা।

সতীশ দেবনাথের ফ্ল্যাট থেকে কিছুটা দূরে একটা লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাকু। তার পাশে মহিন। ওর পরনের পোশাকে কোনও পরিবর্তন হয়নি। বুকের বাঁ-পাশটা সামান্য উঁচু হয়ে রয়েছে। না, অটোমেটিক লুগারকে মহিন রায় কোনও অবস্থাতেই কাছ ছাড়া করতে রাজি নয়।

দুজনের নজরই চারতলার অন্ধকার জানলার দিকে।

'এই নিন। সতীশের ফ্ল্যাটের চাবি।'

চুপচাপ কাকুর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে ডান পকেটে ভরে ফেলল রায়। এই উৎকণ্ঠাময় অপেক্ষা ও একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, ঘড়ির কাঁটা কখন গিয়ে ঠেকবে বারোটার ঘরে।

'মিস্টার রায়, বিরক্তিকর মনে হলেও ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আরও একবার আপনাকে মনে করিয়ে দিই।' কেশে গলা ঝাড়লেন কাকু: 'ঠিক বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় আমি আপনাকে সতীশের ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে দেব। করিডর অন্ধকার থাকবে। আশা করি আপনার চলাফেরায় কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আপনি এক থেকে একশো পযর্ন্ত মনে-মনে গুনবেন। তারপর চাবি নিয়ে ঘরে ঢোকার জন্যে তৈরি হবেন। ঠিক সেই সময়ে আপনি শুনতে পারেন টেলিফোনের শব্দ। টেলিফোনের কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ঠিক তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করে আপনি দরজা খুলবেন। আর আমার অঙ্কে যদি ভুল না হয় তবে দরজা খুলেই আপনি দেখবেন বারান্দায় দাঁড়ানো অসতর্ক সতীশকে। ব্যস, বাকি কাজটুকু এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই আপনাকে সারতে হবে। তারপর—' পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোটের বান্ডিল বের করে মহিনের চোখের সামনে নাচালেন কাকু: 'আপনি নিন বা না নিন, আমার ডিউটি আমি করব।'

'ক'টা বাজে এখন?' নিরুত্তাপ গলায় জানতে চাইল মহিন।

'পৌনে বারোটা। আর মাত্র দশ মিনিট।'

ধীরে-ধীরে সময় গড়িয়ে চলল।

'জিরো আওয়ার। চলুন যাওয়া যাক।' কাকু শর্মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন। মহিনের ডানহাতের পাঁচ আঙুল অনুভব করল লুগারের অস্তিত্ব। তারপর চুপচাপ ও কাকুকে অনুসরণ করল।

নিঝুম বাড়ি। সদর দরজার তালা খুলতে কাকুর লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ভেতরটা একেবারে অন্ধকার।

আন্দাজে ভর করে দুজনেই এগিয়ে চলল।

হাতড়ে-হাতড়ে লিফটের দরজা হাতে ঠেকল কাকুর।

'এদিকে—' চাপাস্বরে হতভম্ব মহিনকে আহ্বান জানালেন তিনি।

লিফটে ঢুকেই সুইচ অন করে অল্প পাওয়ারের আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন কাকু। তারপর চারনম্বর বোতাম টিপলে।

ওপরের দিকে নিঃশব্দে ছুটে চলল লোহার খাঁচা।

লিফট থামতেই সুইচ অফ করে কাকু আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে দরজা খুলে মহিনকে এগোতে ইশারা করলেন: 'যান—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনবেন। তারপর—।'

'আপনি আপনার কাজ করুন।' মৃদু খসখস শব্দ করে অন্ধকার করিডরে পা রাখল মহিন।

কাকু লিফটের দরজা বন্ধ করে—গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপলেন।

লিফট নামতে শুরু করল।

নিঃশব্দে সতীশের ফ্ল্যাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মহিন। লুগার অটোমেটিক হোলস্টার থেকে বের করে দু-হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ও। তারপর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে-মনে গুনতে শুরু করল, এক—দুই—তিন—।

রাস্তায় লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে হাতঘড়ি দেখলেন কাকু। তাঁর হাতঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা বাজতেই এগিয়ে গেলেন কাছেই এক ডাক্তারখানার দিকে। তাঁর কঠিন মুখে সিদ্ধান্তের আভাস।

ডাক্তারখানায় ঢুকে কাউন্টারের ওপর একটা আধুলি ছুড়ে দিলেন তিনি। কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের বাঁ-পাশে রাখা টেলিফোনের দিকে।

রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন। ডাক্তারখানার শীর্ণ চেহারার কর্মচারীটি জুলজুল করে কাকুকে দেখতে লাগল।

ঠিক বারোটা বাজতেই দরজার বাইরে দাঁড়ানো মহিনের কানে এল দেওয়ালঘড়ির স্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ। ঢং—ঢং—ঢং—।

রাত্রির নিটোল নিস্তব্ধতা চুরমার করে বারোবার বাজার পর থামল সেই দেওয়ালঘড়ির শব্দ।

তারপরই মহিনের কানে এল ভেতরে কারও নড়াচড়ার শব্দ। লুগার আঁকড়ে ধরে ওত পাতা জাগুয়ারের মতো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এল মহিন। অস্পষ্টভাবে ওর নজরে পড়ল কলিংবেলের সুইচ, রুম নম্বরের ঝাপসা সাদা অক্ষর দুটো: ১২। কিন্তু ওর কান সজাগ। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি টান-টান।

হঠাৎই টেলিফোনের কর্কশ বেসুরো ঝনঝন শব্দে মহিন ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে পকেট থেকে বের করল সতীশের ফ্ল্যাটের চাবি। ঘরের ভেতর কেউ রিসিভার তুলে নিল।

'হ্যালো—'

...

'কে কথা বলছেন?' এ-প্রান্তে দেবনাথের স্বর উত্তেজিত।

...

'অসম্ভব। বাইরের পাইপ বেয়ে ওঠা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়!'

...

'হতেই পারে না। ঠিক আছে, তবু একবার দেখছি। হ্যালো? হ্যালো? হ্যা—।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ। মহিন একমনে দেওয়ালে কান পেতে সব শুনছিল। সতীশের দ্বিতীয় কথা শোনামাত্রই চাবি ঢুকিয়ে দিয়েছিল দরজার ফুটোয়।

সতীশ রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে মহিনের পেশাদার হাতের নিখুঁত চাপে নিঃশব্দে দরজা খুলতে শুরু করল।

দরজা পুরোটা খুলতেই মহিন একপলক থমকাল। লুগারটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। দেখল...।

সামনের রাস্তায় অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছেন কাকু শর্মা। বারোটা পাঁচ বাজতেই তিনি সতীশের বাড়ির দিকে হেঁটে চললেন। পকেট থেকে বের করে নিলেন একটা পেনসিল টর্চ। তার আলোয় পথ দেখে তিনি খোলা সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন লিফটের দিকে। লিফটে উঠে চারনম্বর বোতাম টিপলেন। লিফট নিঃশব্দে উঠতে শুরু করল।

মহিনের প্রথম নজর গেল বারান্দায়। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘকায় ছায়ামূর্তি। দেখা যাচ্ছে বাইরের খোলা আকাশ। তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তিকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঠিক জমাট পাথরের মতো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে একই জায়গাতে। ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে।

বাঁ-পাশে চোখ সরাতেই নজরে পড়ল ছোট্ট জানলা। পাল্লা দুটো না দেখা গেলেও, গরাদের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাইরের কালো আকাশ। তার সামান্য পাশেই দেওয়ালে চকচক করছে দেওয়ালঘড়ির কাঁটা। ছোট কাঁটা আর বড় কাঁটা দেখে বোঝা যায় রাত বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটের কিছু বেশি। তার নীচেই আবছাভাবে চোখে পড়ছে টিপয়ের ওপরে বসানো টেলিফোন। ছোট জানলার সঙ্গে বারান্দার ডানদিকের জানলার তেমন কোনও তফাত নেই। ওটাও হাট করে খোলা। বাইরের সামান্য আলোয় খাট, বালিশ, বিছানাও মহিনের চোখ এড়াল না।

এইসব চোখ বুলিয়ে দেখতে মহিনের লাগল ঠিক ছ'সেকেন্ড। পরমুহূর্তেই ও জীবনপণ করে ছুটল ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। দুজনের মধ্যেকার দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে কমতে লাগল।

হঠাৎই মহিন আবিষ্কার করল ও ঠিক সতীশের পিছনে দাঁড়িয়ে। সর্বশক্তি দিয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে ও ঝুঁকে পড়া সতীশকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই কী যেন হয়ে গেল। দুলে উঠল বারান্দা, জানলা, ঘড়ি—এমনকী গোটা দেওয়ালটা। মহিন হঠাৎ যেন অনুভব করল ও শূন্যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর আকাশ। চারিদিকে ঠান্ডা বাতাস। জ্বলজ্বলে নক্ষত্ররা প্রতিফলিত হল মহিনের চোখের তারায়।

সমস্ত পৃথিবীটা মহিনের চোখের সামনে ঘুরপাক খেয়ে হঠাৎই উলটে গেল। দুটো ডিগবাজি খেয়ে 'জ্যাক নাইফ' ডাইভিং-এর মতো ও সোজা এসে পড়ল বাইরের বাঁধানো রাস্তায়। তখনও পুরো ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতা, বিস্ময় ওর মনকে ছুঁয়ে রেখেছে।

মহিনের কালো পোশাক পরা চেহারাটা ঠিক মরা দাঁড়কাকের মতো হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল। ঘাড় মটকে মাথাটা এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় পিছনদিকে চেয়ে রয়েছে। হাঁ করা

মুখের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে এসেছে। রক্তাক্ত মুখে নিষ্প্রাণ চোখজোড়ায় শুধুই বিস্ময়। মরে গিয়েও মহিন যেন এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

লিফট পাঁচতলায় এসে থামতেই কাকু শর্মা করিডরে পা দিলেন। পেনসিল টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে গেলেন ফ্ল্যাটের খোলা দরজার দিকে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর পেনসিল টর্চ পকেটে রেখে দেশলাই বের করলেন। অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে ঘরের এক কোনায় রাখা একটা হ্যারিকেন নিয়ে এলেন। বোঝা গেল, এ-ঘরের সঙ্গে তিনি ভীষণভাবে পরিচিত। হ্যারিকেনের আলো জ্বালতেই কতকগুলো জিনিস চোখে পড়ল।

খাট, বিছানা, বালিশ ও টিপয়ের ওপরে রাখা টেলিফোন ছাড়া পুরো ঘরটাই ফাঁকা। ঘরে আর কোনও আসবাবপত্র নেই। ঘরের সিলিং ঢালাই করা সিমেন্টের নয়—প্লাইউডের তৈরি বারান্দার দিকের দেওয়ালও দেওয়াল নয়—কালো রং করা প্লাইবোর্ড। বারান্দার জায়গাটা প্লাই কেটে তৈরি করায় বাইরের আকাশ চোখে পড়ছে। বারান্দার দু-পাশের জানালাও একইভাবে প্লাইউড কেটে গরাদের মতো করা। জানলায় কোনও পাল্লা নেই। দেওয়ালঘড়ির জায়গায় কালো প্লাইয়ের ওপরে লুমিনাস পেইন্ট দিয়ে মিনিটের কাঁটা আর ঘণ্টার কাঁটা আঁকা রয়েছে—এমনভাবে, যাতে অন্ধকারে বারোটা বেজে পাঁচ-সাত মিনিট বলে মনে হয়।

জিনিসগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে কাকু মুচকি হাসলেন। এগিয়ে গিয়ে বালিশের নীচ থেকে টাইম অ্যান্ড ক্লক ডিভাইস অটোমেটিক টেপ রেকর্ডার বের করলেন। রেকর্ডারের টেপ তখনও ঘুরে চলেছে। কাকু উলটোদিকে ঘুরিয়ে দিলেন টেপের গতি। তারপর একসময় সুইচ টিপে প্রথম থেকে চালাতেই—কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ 'ঢং—ঢং—ঢং—।' দেওয়ালঘড়ির ঘণ্টায় শব্দ। ঠিক বারোবার বাজল। তারপর শোনা গেল কারও চলাফেরার শব্দ। তারও কিছু পরে টেলিফানের 'ক্রিং—রিং—রিং—ক্রি—রিং—রিং', এবং সবশেষে মহিনের শোনা কথাবার্তা আবার হুবহু শোনা গেল। এমনকী রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দও বাদ গেল না।

কাকুর তৈরি এই নাটুকে ঘরের একদিকে দরজা, তার দু-পাশে দেওয়াল, কিন্তু আর-একটা দিকে এখনও দেওয়াল গাঁথা হয়নি—যেদিক দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েছে মহিন রায় এবং বারান্দায় দাঁড় করানো কার্ডবোর্ডের মূর্তিটা।

এবার ক্লান্তভাবে খাটের ওপরে বসলেন কাকু। বহুদিনের প্রতীক্ষার পর তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস।

ঠিকই আন্দাজ করেছেন আপনারা। সতীশ দেবনাথ এবং কাকু শর্মা এক ও অভিন্ন। আগেই তো বলেছিলাম, এই 'শার্প' দেবনাথের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে কেউ পেরে ওঠেনি—পারবেও না।

মহিনের মোক্ষলাভের ব্যাপারে কতকগুলো ব্যাপারে হয়তো আপনাদের ধন্দ লাগছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, একটা বড় সূত্র অনেক আগেই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। আজ

যখন মহিনকে নিয়ে আমি লিফটে উঠলাম, তখন কত নম্বর বোতাম টিপেছি বলতে পারেন? চার নম্বর। অথচ প্রথমদিন ওকে যখন আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসি, তখন টিপেছিলাম তিননম্বর। তা হলে? ব্যাপারটা একটু গোমেলে ঠেকছে না আপনাদের কাছে?

তা হলে প্রথম থেকেই বলি।

আপনাদের হয়তো মনে আছে, মহিনকে সরানোর ব্যাপারে লোকেশান ঠিক করতে আমার সময় লেগেছিল একটি মাস। কারণ, তৈরি হচ্ছে এইরকম একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি আমার প্রয়োজন ছিল। এবং প্ল্যানমতো পাঁচতলার একটা আধা-তৈরি ঘরের ঠিক নীচে, চারতলার ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। আসবাবপত্রে সাজিয়ে ফেললাম ঘরটা। আর ওপরতলার মরণ-ফ্ল্যাটের 'সেট' তৈরির সরঞ্জাম জোগাড় করে ফেললাম।

প্রথমে পরদাটাকে কাঁচি দিয়ে এমনভাবে কাটলাম, যাতে অন্ধকারে টাঙিয়ে রাখলে মনে হয় একটা বারান্দার দুপাশে দুটো জানলা (ঠিক আমার ফ্ল্যাটের মতো)। ব্যস, প্রাথমিক কাজ শেষ হল।

সুতরাং, তারপরই আমি দেখা করলাম মহিনের সঙ্গে। ও এই 'কিলিং বিজনেস'-এ নামার পর থেকেই মোটামুটি ওই একই জায়গায় ঘোরাফেরা করে। তাই ওকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না। তারপর কায়দামতো সাজিয়ে গুজিয়ে একটা ভুয়ো গল্প ফেঁদে বসলাম। আর সেই ফাঁদেই মহিন পা দিল।

প্রথম দিন ওকে নিয়ে গেলাম সেই মরণ-ফ্ল্যাট পরিদর্শনে। এমনভাবে ঘরের প্রতিটি জিনিস ওর মনে গেঁথে দিলাম, যাতে অন্ধকারেও ওর কোনও অসুবিধে না হয়। আমি যে সতীশ নই, সেটা প্রমাণের জন্যে একজন পেশাদার অভিনেতাকে ওই সময়ে আমার ফ্ল্যাটে আসার জন্যে বলে রেখেছিলাম। তা ছাড়া কী-কী করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে যে কীরকম কাজ হয়েছে তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। আজ অন্ধকারে মহিন যখন দেখল খাট, বিছানা, বালিশ, টেলিফোন, জানলা, বারান্দা, ঘড়ি—সবই ঠিক জায়গায় ঠিকমতোই রয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওর অবচেতন মন ধরে নিল, সেই একই ঘরে ও এসেছে। যে-যে ফার্নিচার ঘরে নেই, সেগুলোও আছে বলে ওর মন কল্পনা করে নিল। একে বলে সাইকোলজিক্যাল ইলিউশান, অথবা, সাইকোলজিক্যাল ইমপ্লিকেশান।

ঠিক একইভাবে অন্ধকারে প্লাইয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো একটা কার্ডবোর্ডের মূর্তিকে ও আসল মানুষ বলে ভুল করল। কারণ, আমার শোনানো সেই টেলিফোন করার গল্প। তার ওপর সাইকোলজিক্যাল কনভিকশানের জন্য সামান্য টেপরেকর্ডারের ব্যবস্থা। ব্যস। আমার বলে যাওয়া গল্প আর আপাতদৃষ্টিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা যোগ করে ও ধরে নিল, ও সেই একই ঘরে এসেছে, এবং সেই ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সত্যিই একটি জলজ্যান্ত মানুষ।

তারপর যা হওয়ার তাই হল। ছুটে গিয়ে ওই মূর্তিটাকে ধাক্কা দিতেই ও পলকা প্লাইয়ের বাঁধন ছাড়িয়ে শূন্যে পা দিল।

ও যদি অন্ধকার ঘরে একটু ঘুরে-ফিরে দেখত, তা হলে বুঝত—ওই খাট, টেলিফোন ছাড়া আর কোনও ফার্নিচারই ঘরে নেই। আর ঘড়ির কাঁটার জায়গায় রয়েছে লুমিনাস পেইন্ট দিয়ে আঁকা দুটো সরলরেখা। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করায় রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি বলে ভুল হয়। কিন্তু টেপরেকর্ডারের বারোটা বাজার ঘণ্টা, আর দেওয়ালের বারোটা পাঁচের লুমিনাস পেইন্টের দাগ দেখে ও ধরে নিল ওটা সত্যিই একটা দেওয়াল-ঘড়ি।

সুতরাং আপনারাই বলুন, এইরকম একটা বুদ্ধিদীপ্ত সাইকোজিক্যাল মার্ডার আমি ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব?

তবে মহিনকে একটা সূত্র দিয়েছিলাম লিফটের বোতাম টেপার সময়। আমার ফ্ল্যাট যদি চারতলায় হয়, তবে আমাকে তিন নম্বর বোতাম টিপতে হবে। কিন্তু মহিন বোঝেনি, চার নম্বর বোতাম টেপার পর যে-তলায় গিয়ে লিফট থেমেছে, সেটা আমার ফ্ল্যাট নয়। সেটা পাঁচতলার সেই অসম্পূর্ণ মরণ-ফ্ল্যাট। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ দরজায় লাগিয়ে দিলাম প্লাস্টিকের ১২ নম্বর ও একটা কলিংবেলের ক্যাপ—কারণ, ডিটেলের প্রতি আমি গভীর মনোযোগ দিই।

অতএব মনে রাখবেন বন্ধুগণ, প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম 'শার্প' দেবনাথ। এই কিলিং মার্কেটে যিনি মনোপলি বিজনেস করে চলেছেন। সুতরাং তার সঙ্গে দুশমনির কথা ভুলেও মনে আনবেন না। তা হলে আপনাদেরও অবস্থা হবে ওই মহিন রায়ের মতো। কাউকে মোক্ষলাভ করানোর পর আমি মনে-মনে ভীষণ দুঃখ পাই, বিশ্বাস করুন। কিন্তু কী করব, আমি নিরুপায়। আফটার অল, আই অ্যাম দ্য কিং অফ প্রফেশনাল কিলার্স। দ্য গ্রেট 'শার্প'। সুতরাং—।

তৃতীয়, রাকেশ

প্রথম খুনটা শুনতে পেল রাকেশ, স্বচক্ষে দেখল দ্বিতীয়টা, এবং তৃতীয়টা আর-একটু হলে নিজেই হয়েছিল।

দিনটা ছিল শনিবার। অফিস ছুটি হয়ে গেছে দুটোর সময়। বাড়িতে ফিরে অফিসেরই কিছু হিসেবনিকেশের কাজ করছিল রাকেশ। সঙ্গী কেবল ওপরের ফ্ল্যাটের পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেটা—বাপ্পি। ওর মা, ললিতা, বাপ্পিকে রাকেশের কাছে রেখে একটু কেনাকাটায় বেরিয়েছে। সুতরাং আজকের শনিবারটা গত বেশ কয়েকটা শনিবারের মতোই।

বাপ্পি একটা বিস্কুট হাতে চোখ গোল-গোল করে টিভি দেখছিল। ভিলেনকে লক্ষ্য করে নায়কের গুলি চালানোর একঘেয়ে শব্দ রাকেশেরও কানে আসছিল। ছেলেটা মায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখে-দেখে হিন্দি ছবির পোকা হয়ে গেছে। জানলার পাশে টেবিলে কাজে ব্যস্ত থাকলেও টেলিভিশনের পরদায় বাপ্পির চোখজোড়া যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেঁটে আছে সেটা রাকেশের নজর এড়ায়নি।

আচমকা একটা গুলির শব্দে রাকেশের হিসেবি চিন্তা ঝটকা খেল। শব্দটা টিভির গুলির আওয়াজের তুলনায় অনেক বেশি জোরালো। সুতরাং রাকেশের কৌতূহলী চোখ তিনতলার জানলা দিয়ে নজর মেলে দিল নীচের অশোকা রোডে। রাস্তার ওপারেই বিলানি টেক্সটাইলস—এ-অঞ্চলের অভিজাত শাড়ির দোকান। একটা লোক উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়ে এল সেই দোকান থেকে। লোকটার ডানহাতে একটা খোলা রিভলভার। ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে কয়েক মুহূর্ত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। কিন্তু তারপরই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল।

সারা রাস্তা জুড়ে তখন হইচই। সকলে দিশেহারা হয়ে ছুটছে। কেউ-কেউ বাড়ির দরজা লক্ষ করে, কেউ বা রাস্তায় পার্ক করা গাড়ির পিছনে লুকোনোর আশায়। পার্লামেন্ট স্ট্রিট থেকে অশোকা রোডে মোড় নেওয়া একজন পুলিশ সার্জেন্টকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল। সার্জেন্ট তক্ষুনি ছুটে এলেন লোকটার দিকে—ছুটন্ত অবস্থাতেই কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। লোকটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরল। গুলি করল: পরপর তিনবার। দু-পাশের দেওয়ালে সাড়া তুলে ভয়ঙ্কর তিনটি শব্দের প্রতিধ্বনি ক্রমে মিলিয়ে গেল। বার-দুয়েক হোঁচট খেয়ে ফুটপাতের ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়লেন অফিসার। তাঁর ছড়িয়ে থাকা হাত-পায়ের ভঙ্গি যেন নিঃশব্দ চিৎকারে বলছে, আমরা আর বেঁচে নেই।

লোকটা আর সময় নষ্ট করল না। রাস্তা পার হয়ে ছুটে এল রাকেশদের ফ্ল্যাটবাড়ি লক্ষ্য করে। রাকেশের জানলার ঠিক নীচে ফুটপাথের ওপরে ঘুরে দাঁড়াল। বিপরীতদিক নিশানা করে আরও দুবার গুলি করল। তারপর ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক, অবিশ্বাস্য ও ভয়ঙ্কর যে, সেটাকে কাল্পনিক দৃশ্য বলে ভাবতে ভালো লাগে। অতএব রাকেশ বরফের মূর্তির মতো স্থিরভাবে চেয়ারে বসে রইল, ওর অপলক চোখ তখনও রাস্তার দিকে।

কিন্তু দৃশ্যপট থেকে লোকটা অদৃশ্য হওয়ামাত্রই বাস্তবের গুরুত্ব বুঝতে পারল রাকেশ। না, গুলির শব্দগুলো মোটেই কাল্পনিক নয়। ফুটপাথে পড়ে থাকা অফিসারের মৃতদেহটাকেও কেউ মরীচিকা বলবে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা, রিভলভার হাতে লোকটা এখন রয়েছে এই বাড়িতেই। সামনেই রাকেশের ঘরের দরজা প্রায় হাট করে খোলা। যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা কাউকে সহাস্যে বলছে, 'সুস্বাগতম'।

রাকেশ চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাম্বিকে পাশ কাটিয়ে তিরবেগে ছুটে চলল দরজা লক্ষ্য করে, কিন্তু লোকটার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার গতিবেগ বোধহয় আরও বেশি ছিল—কারণ, রাকেশ দরজার দূরত্বের অর্ধেক পেরোনোর আগেই দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে হাতে সেই রিভলভার।

কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখাচোখির পর লোকটা ঘরের ভেতর পা রাখল। সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দিল। তারপর ব্যস্ত দৃষ্টিতে চট করে ঘরটা দেখে নিল।

—আপনি আর বাচ্চাটা ছাড়া ঘরে আর কে আছে?

ব্যাপারটা কী বলুন তো?—বিরক্তির সুরে জানতে চাইল রাকেশ।

বিশাল অটোমেটিকটা অধৈর্যভাবে নড়ে উঠল।

—কথা কম বলুন স্যার। আমার হাতে ন্যাকামো করার টাইম নেই! ঘরে আর কে-কে আছে?

রাকেশ আড়চোখে দেখল পাঁচবছরের বাম্বির দিকে। ওর বিস্ফারিত চোখ টিভির পরদা ছেড়ে এখন আগন্তুকের দিকে। হাতের বিস্কুট কখন যেন মেঝেতে পড়ে গেছে।

না—আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। উত্তর দিল রাকেশ।

লোকটা ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর এবং বাথরুমে নিজে চোখ বুলিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত হল। এবার খুব সাবধানে এগিয়ে গেল খোলা জানলার দিকে, পরদার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল।

—শালা, লাকটাই আজ খারাপ...।—বিড়বিড় করে সে মন্তব্য করল। রাস্তার দুদিক থেকে তখন পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে। শোনা যাচ্ছে ছুটন্ত পায়ের শব্দ, ব্যস্ত চিৎকার।

হাতে কার যেন ছোঁওয়া পেল রাকেশ। চোখ নামিয়ে দেখল, বাম্বি। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

—এই লোকটা কে, চাচু?

লোকটা চোখ ফিরিয়ে তাকাল ছেলেটার দিকে।

—তোমার চাচাজির দোস্ত, বাচ্চু। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো চুপটি করে থাকো দেখি।

—ওই পুলিশ অফিসারকে আপনি গুলি করেছেন—আমি নিজের চোখে দেখেছি। বলল রাকেশ। তারপর ছোট্ট করে প্রশ্ন করল, কেন?

—প্রথমে কাপড়ের দোকানের উজবুক ক্যাশিয়ারটাকে গুলি করেছি। শালা ঘণ্টি টিপতে যাচ্ছিল। এত দরদ, যেন ক্যাশের টাকাটা ওর বাপের!—জানলা ছেড়ে রাকেশের দিকে এগিয়ে এল লোকটা। তীক্ষ্ন চোখে রাকেশকে জরিপ করতে চাইল: আর পুলিশটার কথা বলছেন? ওকে না মারলে ওর জায়গায় এতক্ষণে আমি পড়ে থাকতাম।

—রাস্তার লোকরা আপনাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এখানে আসবে।

লোকটা এগিয়ে গেল জানলার দিকে। উঁকি মারল রাস্তায়।

—এর মধ্যেই শুয়োরের বাচ্চারা রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে।—ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। রিভলভার ধরা অবস্থাতেই এগিয়ে এল বাম্বির কাছে। হাঁটুগেড়ে বসল।

—তোমার নাম কী, খোকা?

ছেলেটা জিজ্ঞাসার চোখে রাকেশের দিকে একবার দেখল, তারপর বলল, বাম্বি।

লোকটা ওর হাত ধরল, টেনে নিয়ে গেল জানলা থেকে দূরে একটা চেয়ারের কাছে। নিজে চেয়ারটায় বসল। তারপর বাম্বির দিকে দু-হাত বাড়িয়ে বলল, এসো, বাম্বি, আমার কোলে এসো। লক্ষ্মীছেলে।

ওদের দিকে এক-পা এগিয়ে গেল রাকেশ।

—বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিন! ওকে কিছু করবেন না!—আশা নিয়ে সামনের দিকে হাত বাড়াল রাকেশ।

রিভলভারের নলটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঁচু হল। লোকটা একচোখে তাকাল রাকেশের ভয়ার্ত মুখ লক্ষ্য করে।

—লোকের মুখ থেকে 'না' শুনতে আমি একদম ভালোবাসি না। 'না' বলে রাস্তার মালগুলোর কী হাল হল দেখলেন তো! বলা যায় না, আপনারও একই হাল হতে পারে।

—দেখুন, বাচ্চাটাকে ওর মা আমার কাছে রেখে একটু দোকানে গেছে। ও এ-ফ্ল্যাটেই থাকে না।

—আপনিই তো বললেন, পুলিশ জানে, আমি এ-বাড়িতে আছি। তা হলে এ-ফ্ল্যাটে আসতে ওদের বেশি দেরি হবে না।—রিভলভারের নলটা রাকেশের দিক থেকে ঘুরে গেল, হালকাভাবে স্থির হল বাম্বির রগে।—তাই আমার কথা ওদের মানতেই হবে। এর মধ্যে 'হ্যাঁ'-'না'-র কোনও কেস নেই।

এই প্রথম দাঁত বের করে হিংস্রভাবে হাসল আগন্তুক।

বাম্বির জীবনে রাকেশ শেষাদ্রি ঢুকে পড়েছে বছর-দেড়েক। আর বাম্বির মা, ললিতা চারির জীবনে মাস-ছয়েক। বছর-দুয়েক আগে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যান অম্বিকানাথ চারি—বাম্বির বাবা। না, তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে রাকেশ তখন এগিয়ে আসেনি। বাম্বির বয়স তখন ছিল মাত্র তিন। তা ছাড়া, ব্যাবসার কারণে অম্বিকানাথ বেশিরভাগ সময়েই ঘরছাড়া থাকতেন। সুতরাং শূন্যস্থান টের পাওয়ার মতো বয়েস বা সুযোগ বাম্বির হয়নি।

দেড়বছর আগে প্রথম ললিতা চারি ছেলেকে রাকেশের দায়িত্বে দিয়ে যায়। বলতে গেলে সেদিন থেকেই বাম্বি এবং রাকেশ ভালোবাসার টানে জড়িয়ে গেছে। ফ্ল্যাটবাড়িতে আরও অনেকে ছিল যারা বাম্বিকে রাখতে রাজি হত, কিন্তু ললিতা বুঝেছিল বাম্বির একজন পুরুষের সান্নিধ্য দরকার। এর পরের সপ্তাহ-মাস-বছরগুলো নীরব ভালোবাসার

স্বপ্নঘেরা ইতিহাস। রাকেশের দৌলতে চিড়িয়াখানা, বিড়লা মন্দির, কুতবমিনার, হায়াৎ বক্স গার্ডেন, সব বাম্বির দেখা হয়ে গেছে। এক-একসময় ললিতাও ওদের সঙ্গী হয়েছে।

মাস-ছয়েক আগের একটা ঘটনা রাকেশের মনে হঠাৎই জায়গা করে নিয়েছে।

সেদিনটাও ছিল শনিবার। দশেরার আগেই উৎসবের কেনাকাটা সেরে বাম্বিকে নিতে এসেছিল ললিতা। নানান বাক্সে ওর দু-হাত জোড়া। ফরসা মুখে সূর্যের তাপ লালচে আভা তৈরি করেছে। সাদা শিফনের শাড়িতে প্রশান্তি। কপালে এলিয়ে পড়া একগুচ্ছ কালো চুলে কোমল আকর্ষণ। সেই মুহূর্তেই সর্বনাশ হল রাকেশের। ও ভালোবেসে ফেলল ললিতাকে। নিরুচ্চার এই ভালোবাসাকে মনে-মনে মেনে নিল রাকেশ শেষাদ্রি। আর তারপর থেকেই বাম্বিকে আরও বেশি করে ও ভালোবাসতে শুরু করেছে।

বাম্বি যে ওর কত বড় দায়িত্ব, সেটা এই মুহূর্তে, এখন, উপলব্ধি করল রকেশ। পিস্তলের নলটা ওর ছোট্ট মাথা স্পর্শ করামাত্রই রাকেশের হৃৎপিণ্ডের টাল-মাটাল দৌড় শুরু হয়ে গেছে। তিরিশ বছরের জীবনে শুধুমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে রাকেশকে দায়িত্ববোধে অবহেলা করার জন্য জবাবদিহি করতে হয়নি। কিন্তু এখন, বন্দুকধারীর শেষ শব্দগুলো প্রতিধ্বনি তুলতেই ও বুঝল, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য ও নিজেই দায়ী।

বাম্বির বাবা বেঁচে থাকলে এ ক্ষেত্রে কী করতেন? স্বাভাবিক বিবেচনা অনুযায়ী, রাস্তার ঘটনা দেখামাত্রই তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। অথবা রিভলভার হাতে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘটনার চূড়ান্ত মোকাবিলা করতেন।

সেই স্বাভাবিক বিবেচনা রাকেশ দেখাতে পারেনি। এবং ওর কোনও রিভলভারও নেই—কোনওদিন ছিলও না। রিভলভার সম্পর্কে ও একেবারেই অনভিজ্ঞ।

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার প্রচণ্ড শব্দে রাকেশ চমকে উঠল।

—দরজা খুলুন! পুলিশ!

রাকেশ হতবুদ্ধি চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে কী করে দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাকেশ দেখল, লোকটার চোখে বিন্দুমাত্রও ভয়ের ছোঁয়া নেই—অন্তত এখনও।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল: ভেতরে কে আছেন? দরজা খুলুন!

কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর প্রচণ্ড আঘাতে শৌখিন দরজা থরথর করে কেঁপে উঠল। ওরা দরজা ভাঙতে চেষ্টা করছে।

রাকেশ চটপট কেশে গলা পরিষ্কার করল। চেঁচিয়ে বলল, আপনারা—আপনারা ভেতরে আসবেন না।—নিজের বিকৃত ভাঙা স্বরে ও নিজেই অবাক হল।

—মিস্টার শেষাদ্রি? আমি গুপ্তা বলছি।—হর্মেশ গুপ্তা রাকেশের নীচের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। তিনি বললেন, বাইরের রাস্তায় একটু আগে ভীষণ গোলমাল হয়েছে। দুজন খুন হয়েছে। পুলিশ বলছে, খুনি নাকি আমাদের বাড়িতেই ঢুকেছে। ওরা গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। আর এখন প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট সার্চ করে দেখছে।

প্রথম লোকটির গলা দরজার ও-পিঠ থেকে ভেসে এল আবার, তাড়াতাড়ি খুলুন, মশাই! আমাদের হাতে সময় নেই!

আমি—আপনারা ভেতরে আসতে পারবেন না। লোকটা এখানে রয়েছে। যাকে আপনারা খুঁজছেন। ওর হাতে রিভলভার। আর একটা বাচ্চা ছেলে রয়েছে আমার ঘরে। —রাকেশের গলা কেমন শুকিয়ে গেল।

বাইরে থেকে কিছু গুঞ্জন শোনা গেল। অবশেষে, সবার গলা ছাপিয়ে ভেসে এল এক নারীকণ্ঠ, রাকেশজি, বাম্বির কিছু হয়নি তো?

ললিতা চারি।

রাকেশ যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ললিতার নরম মুখ, দেখতে পেল ওর গভীর দু-চোখে আতঙ্কের বিদ্যুৎ।

না, বাম্বি ঠিক আছে, ললিতা।—ও চেঁচিয়ে বলল।

আমাকে ভেতরে আসতে দিন! আমি ওর কাছে থাকব! প্লিজ...।

কেউ একজন বলল, আপনি নীচে যান, মিসেস চারি। ইন্সপেক্টর, আপনি এঁকে একটু নীচে পৌঁছে দিন।

না! রাকেশজি দরজা খুলুন! বাম্বিকে আমি দেখব। ওঃ ভগবান, আমার ছেলের যেন কিছু না হয়।—ললিতার স্বরে কান্না ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে।

হঠাৎ বন্দুক হাতে লোকটাকে আমল না দিয়েই রাকেশ বলে উঠল, কোনও ভয় নেই, ললিতা। বাম্বির কিচ্ছু হবে না—আমি তো আছি।

শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় রাকেশের মনে হল ওর কথাগুলো কী ফাঁপা। বন্দুকধারীর চোখে বিদ্রুপের চকিত ঝিলিকও ওর নজরে পড়ল।

বাইরের বারান্দায় লোকজনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন এবং জনতার চিৎকার ছাপিয়ে ঘরের ভেতরে রাকেশের স্পষ্ট কানে আসছে টিভির কথাবার্তা —সঙ্গে নিজের হৃৎপিণ্ডের হাতুড়িপেটা ঢিপঢিপ শব্দ!

ঠিক আছে। বলো তোমার কী চাই?—একজন পুলিশ চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল।

উত্তরে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা, পালাতে চাই। আমার সঙ্গে কোনওরকম চালবাজি করতে গেলে এই লোকটা আর এই বাচ্চাটাকে খতম করে দেব! আমাকে একটা গুলিভরা পিস্তল দাও, আর একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো। গাড়িটা বাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে বলো। আমি, এ-বাচ্চাটা, আর এই লোকটা—আমরা একসঙ্গে গাড়িতে উঠব!

পরিণতিটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল রাকেশের কাছে। এইরকম বিপজ্জনক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পুলিশ এই খুনিকে কখনওই ছেড়ে দেবে না—দিতে পারে না।

ললিতা ওর স্বামীকে হারিয়েছে। রাকেশ ওকে কথা দিয়েছে ওর ছেলের কোনও ক্ষতি হবে না। তা হলে এখন কী হবে?

বাইরে থেকে সেই পরিচিত স্বর আবার শোনা গেল, তোমার শর্তে রাজি হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। পুলিশ কমিশনারের পারমিশান না নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। তাতে সময় লাগবে।

—তোমাকে পাঁচমিনিট সময় দিলাম, অফিসার। পাঁচমিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হচ্ছি —নীচের দিকেই হোক আর ওপরদিকেই হোক!—লোকটা দাঁত বের করে হাসল।

রাকেশ লক্ষ করল, ও শূন্য দৃষ্টিতে টেলিভিশন-পরদার দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটার হাতে বন্দুক যদি নাও থাকত, রাকেশ তার সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠত না। কারণ, লোকটা রাকেশের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা-চওড়া। সুতরাং ওর ললিতাকে দেওয়া কথা নিছক কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

একমিনিট গড়িয়ে গেল। দু-মিনিট। ছোট্ট পরদায় অজেয় নায়ক পরপর গুলি ছুঁড়ে চলেছে! গুন্ডাদলের একজন বুকে গুলি খেয়ে বারান্দা থেকে ছিটকে পড়ল নীচে। বুক খামচে ধরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। রাকেশ অবাক হয়ে ভাবল, গুলি খেতে কীরকম লাগে? সত্যি, বড় জানতে ইচ্ছে করছে...।

বন্দুকের অবিরাম শব্দ টেলিভিশনের পরদায় ফেটে পড়তে লাগল।

বুদ্ধিটা রাকেশের মাথায় তখনই ঝলসে উঠল। যেন মুখোমুখি সংঘর্ষের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা ওকে সঠিক পথে নিয়ে এল। রাকেশের চোখ গেল একটু দূরে চেয়ারে টান-টান হয়ে বসে থাকা উৎকণ্ঠিত আগন্তুকের দিকে। বাম্বি চুপচাপ তার কোলে বসে হয়তো ভাবছে, এটা একরকম খেলা এবং সেই কারণেই এতটা নিশ্চিন্ত রয়েছে।

নাঃ, প্রচণ্ড ঝুঁকি থাকলেও কাজটা অসম্ভব নয়, ভাবল রাকেশ। একেবারে অসম্ভব নয়।

ও মনে-মনে হিসেব করতে শুরু করল।

বিলানি টেক্সটাইলস-এ একজন পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে তিনটে, আর সবশেষে রাস্তার এপারে এসে দুটো। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে, তখন কোনও সময় পাওয়া সম্ভব নয়। আর ফ্ল্যাটে ঢোকার পর লোকটা একবারও রাকেশের নজরের আড়ালে যায়নি।

কিন্তু রাকেশের ভুল হলে চলবে না। ও আবার হিসেব করল। না, ভুল ওর হয়নি। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটজোড়া চেটে নিয়ে ও লম্বা শ্বাস নিল।

তিনমিনিট হয়ে গেল! লোকটা বাইরের পুলিশ অফিসারকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল, আর দু-মিনিট বাকি, অফিসার!

রাকেশ তার দিকে এক-পা এগিয়ে গেল, বলল, আপনার ভুল হচ্ছে।

ও শুনতে পেল ওর গলার স্বর কী অদ্ভুত শান্ত, মসৃণ।

রাকেশ বলল, তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে।

লোকটার চোখের পাতা নড়ে উঠল।

—তার মানে?

রাকেশ আরও এক-পা এগিয়ে গেল।

—তার মানে, সময় শেষ হয়ে গেছে। এবার আমার একদিন কি তোমার একদিন।

—সাবধান, রাকেশবাবু।—দরজার ওপার থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন অফিসার, নিজে থেকে কিছু করতে যাবেন না—।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?—অচঞ্চল হাতে বন্দুকের নলটা বাম্বির মাথা থেকে সরিয়ে রাকেশের মুখোমুখি ধরল লোকটা। তীক্ষ্ন কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল, যা, শিগগির ফিরে যা নিজের জায়গায়!

রাকেশ কোনও উত্তর দিল না—ও আরও এক-পা এগিয়ে গেল। রিভলভারটা ক্রমশ ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, হাঁটু দুটো যেন হঠাৎই রবারের তৈরি বলে মনে হল। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে...ভাবল রাকেশ যদি...রাকেশ মাথা নাড়ল। এখন আর ফিরে যাওয়ার সময় নেই। খেলা খতম ওকে করতেই হবে।

—তোকে শেষবারের মতো বলছি, গাড্ডু, এখনও ফিরে যা—।

লোকটার চোখে একটা নতুন ছায়া সেই মুহূর্তে রাকেশের নজরে পড়ল। ছায়াটা ও সহজেই চিনতে পারল, কারণ এতক্ষণ এই ছায়া চোখে নিয়েই ও দাঁড়িয়ে ছিল: অন্ধ আতঙ্কের ছায়া।

একরাশ নিরাকার তেজ যেন রাকেশের শরীরে কেউ ঢুকিয়ে দিল। হাঁটুজোড়া ফিরে এল আগের সুস্থ অবস্থায়। এই মুহূর্তে রাকেশ শেষাদ্রি যেন অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। ও জানে, ভুল ওর হয়নি।

এইবার! বলে প্রাচীন যোদ্ধাদের মতো এক বিকৃত চিৎকার করে রাকেশ বন্দুকবাজকে লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

বারো ফুট দূরত্বের ফুট পাঁচেক পেরিয়েই এক প্রচণ্ড লাফ দিল রাকেশ। এখন আর ভুল হলে চলবে না, এবং ভুল যে ওর হয়নি সেটা লোকটার ভয়ের দৃষ্টিতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একটা বিকট শব্দ, মালগাড়ির সঙ্গে তীব্র সংঘাতের অনুভূতি, একমুহূর্তের বুক-ভরা জ্বলন্ত যন্ত্রণা এবং অবশেষে অন্ধকার।

—এতক্ষণে ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরে এসেছে, ইন্সপেক্টর।—কেউ একজন বলল।

রাকেশ শেষাদ্রি চোখ খুলল। ওর মনে হল, ও যেন ভুলে যাওয়া, সুদীর্ঘ, ক্লান্তিকর এক ভ্রমণ শেষে ফিরে আসছে। তারপর ওর মনে পড়ল বাপ্পির কথা।

—বাপ্পি—বাপ্পি কোথায়?

—ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। ও ভালো আছে।

তিনটে মুখ ভেসে বেড়াচ্ছে রাকেশের চোখের সামনে, শূন্যে। সাদা পোশাক পরা একজন বয়স্ক লোক, তার পাশে সাদা পোশাক পরা একটি মেয়ে—ললিতা নয়। তৃতীয় ব্যক্তির মুখে অভিজ্ঞতা এবং প্রতিজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু চোখে-মুখে, পোশাকে, কেমন একটা ক্লান্তির ছায়া।

—আমি ইন্সপেক্টর চিরিমার।—তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, আপনি যখন লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন বাইরের বারান্দায় আমিও ছিলাম। আপনি বড় বোকার মতো কাজ করেছেন, মিস্টার শেষাদ্রি। তবে আপনার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

—সেইসঙ্গে ভাগ্যেরও প্রশংসা করুন।—সাদা পোশাক পরা প্রৌঢ় হাসিমুখে মন্তব্য করলেন। সম্ভবত তিনিই ডাক্তার।—ডানদিকে আর ইঞ্চিখানেক গেলেই আমরা এতক্ষণে আপনার শ্রাদ্ধশান্তির তারিখ নিয়ে আলোচনা করতাম।

—লোকটা এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, গুলিটা সোজাসুজি করতে পারেনি।—ইন্সপেক্টর বললেন।

—কিন্তু আমি ভালো করে গুনে দেখেছি।—রাকেশ বলল, এক-এক করে হিসেব করেছি…। তা হলে হয়তো আমার হিসেবে ভুল হয়ে থাকবে।

—কীসের হিসেব?

—গুলির। আমি গুনে-গুনে দেখেছি, লোকটা ছ'বার গুলি করেছে।—জানি না, আমাকে ফাঁকি দিয়ে লোকটা আবার কখন গুলি ভরল—।

—দাঁড়ান, একমিনিট!—মাথার টাকে ধীরে-ধীরে হাত বোলালেন অফিসার। তারপর অবাক সুরে বললেন, তা হলে লোকটার বন্দুক খালি ভেবেই আপনি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন?

রাকেশ সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। যন্ত্রণার ছুরির তীক্ষ্নতা বাহু আর কাঁধে টের পেল।—হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম ওর ছ'বার গুলি করা হয়ে গেছে। সেইজন্যেই—।

অফিসার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—হিন্দি ছবি দেখে-দেখে আপনার মাথাটা গেছে। না, গুনতে আপনার ভুল হয়নি। মুশকিলটা হল, আমাদের শ্রীমানের হাতে ছ'ঘরা রিভলভার ছিল না, ছিল একটা অটোমেটিক। এর এক-একটা ক্লিপে সাতটা করে গুলি থাকে। ওই শেষ গুলিটাই আর-একটু হলে আপনাকে শেষ করে দিয়েছিল। গুলির শব্দ পেয়েই আমরা দরজা ভেঙে ফেলি। আমরা ভেবেছিলাম লোকটা হয়তো বাচ্চাটাকে গুলি করেছে।

সাতটা গুলি…কিন্তু তবুও, ভাবল রাকেশ, যদি ও নিশ্চিত জানত পিস্তলে আরও একটা গুলি রয়েছে, তা হলেও ওই একই পথ ওকে বেছে নিতে হত। কারণ, বাপ্পির দায়িত্ব পুরোপুরি রাকেশের।

ইন্সপেক্টর চিরিমার বলে চললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন, এখন খবরের কাগজের লোকেদের সঙ্গে দেখা করাটা আপনার শরীরের পক্ষে ঠিক হবে না। তবে দু-একজন পরিচিতের সঙ্গে কথা বললে আপনার হয়তো ভালোই লাগবে।

সাদা পোশাক পরা নার্স হাসল: একজন মহিলা, আর একটা বাচ্চা ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ললিতা। ভাবল রাকেশ।

ইন্সপেক্টর দিকে চেয়ে সে হাসল, বলল, অফিসার, ওই গুলির ব্যাপারটা ভদ্রমহিলাকে এখনই আর বলবেন না, কেমন?

একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন চিরিমার।

সুমনা, সুমনা

আমার বউ সুমনাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। বিয়ের পর আজ এগারোবছর কেটে গেছে, কিন্তু তবুও আমার ভালোবাসা এতটুকুও ফিকে হয়নি। ওর শরীরের প্রতিটি অলিগলি আমার নখদর্পণে, আমিও ওর কাছে খুব চেনা। তবে মাঝে-মাঝে ও রেগে যেত আমার ওপরে। রেগে গিয়ে যা-নয়-তাই বলত। আমি কিন্তু মুখ বুজে সব সহ্য করতাম। করবই তো! আমি যে ওকে ভালোবাসি। ওর উচ্ছৃংখল জীবন চলেছিল এক টানা একবছর। সবসময় বাড়ির বাইরে-বাইরে। আর আমার ওপরে এক অদ্ভুত আক্রোশ।

অবশেষে একদিন ওর মধ্যে পরিবর্তন এল। একেবারে পালটে গেল ও। দিনরাত বাড়িতেই থাকে। ঘর ছেড়ে একবারের জন্যেও বেরোয় না। আমিও বাড়িতে থাকি। কিন্তু আমাকে কোনওরকম কথা শোনায় না। ঠিক আগের স্বভাবের বিপরীত। তাই আমি ওকে আরও বেশি করে ভালোবাসতে থাকি। ওর এই হঠাৎ-পরিবর্তনে আমি তেমন অবাক হইনি। কারণ, এ-পরিবর্তনে আমার গভীর ভালোবাসার যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

পরিবর্তনের পরে দীর্ঘ আটবছর কেটে গেছে। আমরা এখনও কাছাকাছি। সারাদিনের মান-অভিমান রাতে বিছানায় ভুলিয়ে দিই। ওকে বুকে জড়িয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ও বাধা দেয় না, বিরক্ত হয় না—আগে যেমন হত। মাঝে-মাঝে।

ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার হাড়ে-হাড়ে চেনা। একবার—বিয়ের আগে—পড়ে গিয়ে ওর বাঁ-হাতটা ভেঙে গিয়েছিল। সেই ভাঙা জায়গাটা নিখুঁতভাবে আর জোড়া লাগেনি। এখনও স্পষ্ট দেখা যায়, সেই অদ্ভুতভাবে জুড়ে থাকা কনুইটা।

আমাদের কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। আমরা দুজনেই পরস্পরের আত্মীয়। সুখ-দুঃখ সব একসঙ্গে মিলেমিশে ভাগাভাগি করে নিই। আমাদের বাড়িতে কেউ আসে না। এলে চিৎকার-চেচামেচিতে অশান্তি হয়। অশান্তি আমার ভালো লাগে না। আমি ওর একরাশ কালো চুলে মুখ ডুবিয়ে শান্তি খুঁজি। ওর পরিচর্যাও করি। ওকেই জিগ্যেস করে দেখতে পারেন। ওর ঘন কালো চুলে আমি তেল মাখিয়ে দিই, আঁচড়ে দিই পরিপাটি করে। মুখে, গায়ে, তেল মালিশ করে ওর শরীর চকচকে করে তুলি প্রতিদিন। এমন ভালো বাধ্য বউ আপনি আর কোথায় পাবেন!

ওর স্বভাবের পরিবর্তন ওর ভালোর জন্যেই আমি করেছি। নইলে সেদিন, আটবছর আগে, ওকে আমি খুন করেছিলাম কার ভালোর জন্যে? আর এই আটবছর ধরে যে এত সেবা, যত্ন-আত্তি, সে কার ভালোর জন্যে? এই যে রোজ ওর চোখের কোটর, নাকের গর্ত, শিরদাঁড়া, পাঁজর তেল মেখে ব্রাশ দিয়ে পালিশ করি, এ কার ভালোর জন্যে? হলফ

করে বলতে পারি, মেডিকেল ছাত্রদের কাছেও এত সুন্দর, চকচকে, ধপধপে সাদা কঙ্কাল আপনি পাবেন না...কিছুতেই না...।

আস্তিনের তাস

প্রথমে হুমকি দেওয়া কয়েকটা ফোন পেয়েছিলাম। তারপর অফিসে দুবার হানা দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারপর আর আসতে পারেননি।

প্রথমবারে যখন আসেন তখন ওঁর চেহারায় পরিপাটি একটা ব্যাপার ছিল। ভেতরে উত্তেজনা থাকলেও মুখে শান্ত ভাব বজায় রেখেছিলেন। আমার চেম্বারে ঢুকে পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি সীমারেখার হাজব্যান্ড—অশোকেন্দু—মানে, অশোক বোস...।'

সীমারেখা। ওর শরীর আর যৌবনের কোনও সীমানা নেই। তাই ওকে সবসময় আমি 'অসীমা' বলে ডাকতে ভালোবাসি।

এই লোকটা—এই কালো চেহারার হোঁতকা কালাচাঁদ পাবলিকটা সীমারেখার স্বামী! ভাবাই যায় না।

সীমা অবশ্য বলেছিল, ওর স্বামীকে কুৎসিত দেখতে—শুধু দেখতে নয়, ভেতরটাও কুৎসিত। সুযোগ পেলেই ওকে মারধোর করে। আর ওই স্যাডিস্টটার সঙ্গে বিছানা মানে লাঞ্ছনা আর যন্ত্রণা।

আমি লোকটাকে বসতে বলিনি ইচ্ছে করেই। কারণ, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তা হলে এই লোকটাই গত ক'দিন ধরে আমাকে টেলিফোনে হুমকি দিচ্ছে।

সে-কথাই জিগ্যেস করলাম অশোকেন্দুকে। এবং আশ্চর্য! তিনি মুখের ওপরে সোজাসাপটা বলে দিলেন, 'হ্যাঁ—আমিই। আপনি সীমার সঙ্গে বৃন্দাবনটা এবার বন্ধ করুন। নইলে...।'

'নইলে কী?' শান্ত চোখে অশোকের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম।

'নইলে আজেবাজে কিছু হয়ে যেতে পারে। আমি সিরিয়াসলি বলছি। সেইজন্যেই ফোন ছেড়ে আপনার অফিসেই সোজা চলে এসেছি। আপনাকে এটাই আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট...।'

একবার মনে হল, লোকজন ডেকে হতচ্ছাড়া স্বামীটাকে কষে পালিশ করাই। কারণ, এই অফিসটার মালিক আমি। আমার মুখের এই অফিসের সংবিধান।

কিন্তু একটু পরেই মনে হল, না, তাতে কেচ্ছা ছড়াবে। তাই ওঁকে বসতে বলে ঠান্ডা গলায় কথা বলেছি। এমনকী বোয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কও আনিয়ে দিয়েছি।

অনেক করে বুঝিয়েছিলাম অশোকেন্দুকে। বলেছিলাম, 'দেখুন, ব্যাপারটা শুধু আমার একার নয়—সীমাও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ওকে আমি যেমন ভালোবাসি, তেমনই ও-

ও আমাকে...। মানে, আপনি ডির্ভোস টাইপের কিছু ভাবতে পারলে ভালো হত। মানে, আমাদের বাকি লাইফটা...।'

'অসম্ভব। সীমারেখাকে আমি হার্ট অ্যান্ড সোল—মানে, ওকে ছাড়া লাইফ আমি ভাবতেই পারি না। ও আমার কাছে...আমার কাছে...।'

অশোকেন্দুর গলা কাঁপছিল। কিছু-কিছু হাজব্যান্ড এমন সেন্টিমেন্টাল হয় যে, লজিক বুঝতে চায় না। এটাও দেখছি সেই টাইপের।

আমার চেম্বারে এসি চলছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সীমারেখার স্বামী ঘামছিল। লোকটা কি অন্য কোনও মতলব নিয়ে এসেছে নাকি? বারবার প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে, বের করছে। কেমন যেন উসখুস করছে।

আমার সন্দেহ ধীরে ধীরে বাড়ছিল। লোকটা কেমন যেন একটা দোটানায় ভুগছে।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু কোনও লাভ হল না। অশোকেন্দু তীকষ্ন নজরে আমাকে মাপছিলেন। সীমারেখাকে হারানোর ভয়টা ওঁর মুখে ছেয়ে ছিল।

আশ্চর্য! ক'দিন আগেও যে-মানুষটা আমাকে মোবাইল ফোনে হুমকি দিচ্ছিল, আজ সে একেবারে তুলতুলে টুলটুলি!

অশোকের চোখের কোণে দু-একফোঁটা জলও দেখতে পেলাম। মনে হল, বউকে তিনি সত্যি-সত্যিই ভালোবাসেন। কিন্তু কী করব? আমিও যে ওঁর বউকে ভালোবাসি!

অশোককে আমি বললাম, 'দেখুন, প্রবলেমটা ডিসকাস করার জন্যে আমার এই চেম্বারে আপনি আসতে পারেন...তবে একটু সন্ধে করে আসবেন। তখন অফিস একেবার ফাঁকা হয়ে যায়—ডিসটার্ব করার কেউ থাকে না। আমি তো মাঝে-মাঝে একা-একা বসে একটু এনজয়ও করি...' হাত বাড়িয়ে আমার ঠিক পেছনে টাঙানো একটা ভারী পরদা সরিয়ে দিলাম। তাকে সাজানো গ্লাস আর বোতলগুলো দেখা গেল। একটা শ্বাস টেনে বললাম, 'একদিন সন্ধের পর আসুন...দুজনে মিলে একটু ঠুনঠুন পেয়ালা করা যাবে। সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও রাখব। আপনার ভালো লাগবে...আই প্রমিস...।'

অশোকেন্দু এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি ঘেন্না করার মতো একটা কুপ্রস্তাব দিয়ে ফেলছি। কিন্তু আমি ওঁর চাউনি গায়ে মাখলাম না। জীবন কখন কী বাঁক নেয় কে বলতে পারে! হয়তো একদিন এই লোকটাই ছুটে আসবে আমার কাছে—আমার আসরে ভাগ বসাতে চাইবে।

শেষ পর্যন্ত আমাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে অশোকেন্দু চলে গেলেন।

অশোকেন্দু যখন দ্বিতীয়বার হানা দিলেন তখন ঠিক, যা ভেবেছিলাম, তাই হল। আমার একক আসরে ভাগ বসালেন তিনি। তবে তার আগে যেসব কাণ্ড হল তা রীতিমতো মারাত্মক।

রাত প্রায় আটটার কাছাকাছি। অফিসে আমার চেম্বারে একা-একা বসে একটু ঢুকুঢুকু করছিলাম। হঠাৎই এসি রুমের কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল অশোকেন্দু বোস।

ওঁর যা চেহারা দেখলাম তাকে এককথায় বলা যায় উদভ্রান্ত।

চোখের কোল বসে গেছে। মাথার চুল উসকোখুসকো। শার্টের দুটো বোতাম খোলা। কপালে ঘামের ফোঁটা। অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছেন।

ঘরে ঢুকেই আমার গ্লাসটপ টেবিলের ওপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন অশোক, 'সীমারেখা কোথায়?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন—।'

'শিগগির বলুন—রেখা কোথায়?' অশোকেন্দুর গলা কাঁপছিল।

আমি আর-একটা গ্লাস তৈরি করলাম। সুরা, সোডা এবং জল যথাযথ অনুপাতে মেশালাম। ওঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে শান্তভাবে বললাম, 'বসুন। এটা খেয়ে একটু রিল্যাক্স করুন। আপনি এসেছেন...ভালোই হয়েছে। আপনার সঙ্গে কতকগুলো জরুরি কথা আছে—।'

আমার নির্লিপ্ত মেজাজ দেখে অশোক কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। ওঁর উত্তেজনার বারুদে ধীরে-ধীরে যেন জল পড়ল। জামার হাতা দিয়ে মুখ মুছলেন। চোখও। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'পরশু থেকে রেখাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে আপনার ইস্যুটা নিয়ে ওর সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছিল তাতে ও রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ভেবেছিলাম দু-চার ঘণ্টা পর ফিরে আসবে—কিন্তু আসেনি। পরদিন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি। সরাসরি সব কথা তো সবাইকে বলা যায় না—তাতে নিজেদেরই কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে।' বড়-বড় শ্বাস নিলেন অশোক। চেয়ারে বসতে গিয়েও বসলেন না। গ্লাসটা ধরতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, '...তবু যতটা সম্ভব ঠারেঠোরে খোঁজ নিয়েছি। খোঁজ পাইনি। সীমারেখা কোথায় কেউই বলতে পারল না। তখন বাকি রইলেন আপনি...।'

কথা বলতে-বলতে টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে আমার কাছাকাছি চলে এলেন অশোক। আচমকা কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'তুই—তুই সব জানিস। বল, রেখা কোথায়?'

অশোক কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বটে, তবু একইসঙ্গে মসৃণ ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে আমার গলায় চেপে ধরেছেন।

'চেঁচালেই গলা ফাঁক করে দেব। বল, রেখা কোথায়।'

আমি ভয় পেলাম। হঠাৎই গলা শুকিয়ে জিভটা শিরীষ কাগজের টুকরোর মতো ঠেকল। কিন্তু বেশ কষ্ট করে মুখের হাসি-হাসি ভাবটা বজায় রাখলাম। কারণ, কানের নীচে ছুরির ধারালো চাপটা টের পাচ্ছিলাম। কোনওরকমে আওয়াজ বের করে বললাম, 'বলছি—সব বলছি। আপনি প্লিজ ঠান্ডা হয়ে বসুন। প্লিজ...।'

অশোকেন্দু কী ভাবলেন। গলায় ছুরির ছাপটা নরম হল। বুঝলাম, মানুষটার একরোখা ভাব একটু কমেছে। তাই 'লোহা গরম থাকতে-থাকতে পেটানো দরকার' সেই সূত্র মেনে অনুরোধ-উপরোধের বন্যা বইয়ে দিলাম।

কাজ হল। অশোকেন্দু আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন। ছুরিটাকে ঢুকিয়ে ফেললেন পকেটে। তারপর: 'এবার বলুন, সীমারেখা কোথায়?'

আমি গলায় বারকয়েক হাত বুলিয়ে বললাম, 'আপনি এক্সাইটেড হয়ে এসব কী কাণ্ড করতে যাচ্ছিলেন? যদি সত্যিই ওই ছুরিতে একটা অঘটন ঘটে যেত, আপনি কি পার পেতেন? সীমারেখাই পুলিশে খবর দিত। হয়তো এ-কথাও বলত যে, আমার মার্ডারের ব্যাপারে আপনাকেই ও সন্দেহ করে...।'

অশোকেন্দু অদ্ভুতভাবে হাসলেন, বললেন, 'অত ভেবে মানুষ খুন করে না। তা ছাড়া খুনের সাক্ষী পুলিশ পাবে কোথা থেকে? আপনার অফিসে তো এখন একটা দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। ঢোকার সময় ওকে পাঁচশো টাকা বকশিস দিয়েছি। টাকা নিয়ে ও হাওয়া খেতে গেছে। ও ফিরতে-ফিরতে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আপনার চেম্বারে ঢোকার প্যাসেজের দরজাটা আমি ভেতর থেকে লক করে দিয়েছি। এখানে আমাদের কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না...।' টেবিলে আঙুলের টোকা মেরে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন। তারপর:'আর সীমারেখার কথা বলছেন? আপনি খরচ হয়ে গেলে প্রথম ক'দিন হয়তো ও কান্নাকাটি করবে। তারপর সামলে নেবে। আর পুলিশ-টুলিশে খবর ও দেবে না। আপনিই যখন আর নেই তখন পুলিশে খবর দিয়ে ও শুধু-শুধু কেন কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির পাবলিসিটি করবে?' বরং দু-বেলা খাওয়া-পরা-ফূর্তির নিশ্চিন্ত জীবনকেই বেছে নেবে। আমার টাকায় লাইফকে এনজয় করতে রেখা ভালোবাসে... আমার হাসলেন—তবে এবারের হাসিটা আত্মবিশ্বাসের: '...তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছেন?'

আমি ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লাম, বললাম, 'হুঁ, বুঝতে পারছি—।'

'তা হলে শিগগির বলে ফেলুন, 'সীমারেখা কোথায়—।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম: 'নাঃ, আর লুকিয়ে লাভ নেই। সত্যি কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি...।'

'গুড।' ঠোঁট বেঁকিয়ে সামান্য হাসলেন অশোকেন্দু।

ওঁর গ্লাসটার দিকে ইশারা করে বললাম, 'নিন। চিয়ার্স—।'

অশোক গ্লাসটা এবার নিলেন, চুমুক দিলেন। আমার কথা শোনার জন্যে ওঁর চোখ আগ্রহ নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

টেবিলের একপাশে একটা শৌখিন টিফিনবক্স রাখা ছিল। সামান্য ঝুঁকে পড়ে ওটা কাছে টেনে নিলাম।

স্টিলের ঢাকনাটা খুলতেই মাটন কাবাবের ফুরফুরে গন্ধ ঝাপটা মারল। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম দিয়ে ফ্রাই করা ছোট-ছোট বোনলেস মাংসের টুকরো।

আমার চেয়ারের পেছনের পরদা সরিয়ে একটা টমেটো সসের শিশি বের করে নিলাম। শিশিটায় ঝাঁকুনি দিয়ে টিফিন কৌটোর চিত করা ঢাকনায় সস ঢাললাম। অশোকেন্দুকে ইশারা করে বললাম, 'নিন, দারুণ খেতে...।' তারপর আমি একটুকরো কাবাব তুলে নিয়ে সসে ঠেকিয়ে মুখে ফেললাম: 'আঃ, গ্র্যান্ড!'

অশোক হাত বাড়িয়ে একটুকরো কাবাব পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম সমেত গুছিয়ে নিলেন। সস মাখিয়ে মুখে দিয়ে তৃপ্তি করে চিবোতে-চিবোতে বললেন, 'উঁ, একসেলেন্ট। হ্যাঁ, আপনি কী যেন বলছিলেন...।'

'হ্যাঁ...বলছি। শুনলে আপনার অবাক লাগবে...সীমারেখা কখনও সেভাবে আমাকে ভালোবাসেনি। ও আমাকে—।'

আমাকে বাধা দিয়ে অশোকেন্দু বললেন, 'ওসব গালগল্প ছেড়ে আসল কথা বলুন।' তারপর গ্লাসে চুমুক দিলেন।

'বিশ্বাস করুন, এটাই আসল কথা। এটাই ভেতরের কথা। আর এটা আমি জেনেছি মাত্র তিনদিন আগে। অথচ ওকে বিয়ে করব বলে আমি মনে-মনে তৈরি ছিলাম। আমি... মানে, আমরা দুজনেই তৈরি ছিলাম।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'সবই আমার কপাল! সেদিন যখন রেখাকে বললাম, "এসো, এবার একটা দিন ঠিক করে সাতপাক হয়ে যাক," তখন ও বেঁকে বসল। বলল, "কেন, এই তো বেশ চলছে—এটা খারাপ কী! ডিভোর্সের ব্যাপারটা খুব ডেলিকেট। আমি অনেক ভেবে দেখেছি...আমি ওসব পারব না। প্লিজ, তুমি একটু আমার দিকটা ভেবে দ্যাখো...।"

'ব্যস, সব আশনাই শেষ। বললাম না, সবই আমার কপাল। সারাটা জীবন আমি ব্যর্থ প্রেমের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তাই আমি ড্রিঙ্ক করি মনের দুঃখে।'

আমি একটুকরো কাবাব মুখে দিলাম। স্বাদ নিতে-নিতে আয়েস করে চিবোতে লাগলাম। অশোকেন্দু কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছিলাম। চোখ না সরিয়েই টিফিনবাক্সের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, 'আপনার কাবাবে ভাগ বসাচ্ছি...আপনি কিছু মাইন্ড করছেন না তো?'

'দুর, কী যে বলেন! রেখার খোঁজে আপনি আসতে পারেন ভেবেই বেশি করে তৈরি করেছি।'

'আপনি এটা রান্না করেছেন নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলেন অশোক।

'হ্যাঁ। কেন, খেতে খারাপ লাগছে?'

'না, না। দারুণ...।'

'আসলে ব্যাচিলার মানুষ। একা-একা থাকি। তাই রান্না শিখতে হয়েছে বহুকাল আগেই...। যাকগে, যা বলছিলাম...।

'প্রথম আমি ভালোবেসেছিলাম তানিয়া চৌধুরীকে। হয়তো ও-ও আমাকে। তারপর একদিন বিয়ের কথা উঠল। তাতে ও অসভ্যের মতো হেসে ফেলল। বলল, আমার সঙ্গে নাকি বন্ধুত্ব করা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। হঠাৎ আমার মধ্যে এমন বিয়ের বাতিক জেগে উঠল কেন...বেশ তো চলছিল। তো এইরকম সব কথাবার্তা বলল তানিয়া। বিয়ে করার সাধটা যে একটা বাতিক সেটা ওর কাছেই প্রথম জানলাম।

'কিন্তু আমার মুশকিলটা কোথায় জানেন, মিস্টার বোস? আমি কখনও হার মানতে শিখিনি। তাই একদিন ডেকে পাঠালাম তানিয়াকে...ওকে গঙ্গার ধারে আসতে বললাম... আউটরাম ঘাটে।'

কথার ফাঁকে-ফাঁকে কাবাব আর গ্লাস চলছিল। গ্লাস খালি হলেই আমি সোডা, জল আর ইয়ে মিশিয়ে দিচ্ছিলাম। আর আয়েস করে কাবাব চিবোচ্ছিলাম দুজনেই।

'তারপর?' আগ্রহে জানতে চাইলেন অশোক। ওঁর চোখে কৌতুকের খেলা দেখে বুঝতে পারছিলাম আমার গল্পটা এখনও গল্পই থেকে গেছে ওঁর কাছে।

'...তানিয়া এল। সন্ধে হল। দুজনে বসে অনেক গল্প করলাম। আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম। তারপর হঠাৎ ওকে খুন করে ফেললাম।

'নির্জন রাত। নরম গলা। আর আমার শক্ত হাত। কোনও অসুবিধেই হল না ওকে খতম করতে।' মুখের কাবাবের টুকরোটা শেষ করে গ্লাসে চুমুক দিলাম: 'পরদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল। ওর প্রেমিক হওয়ার সুবাদে পুলিশ

আমাকে প্রচণ্ড হ্যারাস করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। কারণ, কোনও প্রমাণ ছিল না ওদের হাতে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'ব্যস। তানিয়া শেষ—তানিয়ার গল্পও শেষ। এবার কুন্তলিনীর গল্প শুরু...।'

অশোকেন্দুর মুখ থেকে কৌতুকের আস্তরণ অনেকটা সরে গেছে। শান্তভাবে গ্লাসে চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করলেও লক্ষ করলাম, ওঁর হাত কাঁপছে। একটু যেন উশখুশ করছেন এখন।

'কুন্তলিনী কে?'

'আমার দ্বিতীয় প্রেমিকা। কুন্তলিনী রায়। ও ম্যারেড ছিল—সীমারেখার মতো। ওর হাজব্যান্ডের নাম ছিল অলক।

'যাই হোক, দ্বিতীয়বারেও সেই একই গল্প। কুন্তলকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। ওর পাতলা চেহারা, টানা-টানা চোখ আর চওড়া ঠোঁটে যে কী ম্যাজিক ছিল কে জানে! তা ছাড়া খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। ওর দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে যেতাম। তাই ওকে "ছেলেভোলানো মেয়ে" বলে ডাকতাম—ওকে খ্যাপাতাম।

'মাসছয়েক চলেছিল আমাদের প্রবল প্রেম। তারপর, এক সন্ধ্যায়, ওর একক সঙ্গীতের আসর শেষ হওয়ার পর ওকে বিয়ের কথা বললাম।

'না, কুন্তল তানিয়ার মতো বাজে ভাবে হেসে ওঠেনি। বরং খুব সিরিয়াস মুখ করে বলে উঠেছে, "অলককে আমি ভীষণ ভয় পাই। বেসিক্যালি হি ইজ আ বিস্ট। ড্রিঙ্ক করলে ওর আর কোনও জ্ঞান থাকে না। ডিভোর্স-টিভোর্সের কথা বললে হি উইল জাস্ট গো ওয়াইল্ড। সব রাগে ছারখার করে দেবে, তছনছ করে দেবে। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, প্লিজ...।"

'ক্ষমা শব্দটা আমি খুব ঘেন্না করি, মিস্টার বোস। আমার দিকটা কুন্তলিনী মোটেই ভাবেনি। ও আমার সঙ্গে রিলেশানটা শেষ করে দিতে চাইল। তাই আমিও ওকে শেষ করে দিলাম...শেষ...চিরকালের মতো।'

আমি একটুকরো কাবাব তুলে নিয়ে সস ছুঁইয়ে কামড় দিলাম। বললাম, 'দারুণ টেস্টফুল, না? আসলে এটা একটা স্পেশাল কাবাব...।'

অশোকেন্দুও কাবাব চিবোচ্ছিলেন। একটু যেন থমকে গেলেন। জিগ্যেস করলেন, 'শেষ করে দিলেন মানে?'

হাসলাম আমি: 'শেষ মানে শেষ। ফুলস্টপ। ওকে আমি ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলাম। বাড়িতেই। সে-রাতে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছিল—রাত ন'টায় রাস্তায় কোনও লোক ছিল না। ও এল ভিজে একসা হয়ে। বলল, ওর হাজব্যান্ড ড্রিঙ্ক করে বেহেড হয়ে পড়ে আছে।

'বেশ জুত করে আমরা ডিনার সারলাম। তারপর ভারী চপারের এক কোপে কুন্তলের গলার নলি কেটে দিলাম। ডাইনিং টেবিলে সে একেবারে রক্তরক্তি কাণ্ড।

'যাই হোক, মাঝরাত পর্যন্ত খুব খাটুনি গেল আমার। ওর বডিটা টেনে নিয়ে গেলাম বাড়ির পেছনের ছোট বাগানটায়। রক্ত-টক্ত সব ধুয়ে-মুছে নিলাম। তারপর বডিটা ছোট-বড় টুকরোয় কুচিয়ে ছড়িয়ে দিলাম বাগানে।

'আপনাকে বলা হয়নি, আমার কুকুর পোষার শখ আছে। তিনটে ডোবারব্যাম। কালো রঙের। কান ক্রপ করা। ওদের দু-দিন না খাইয়ে চেন বেঁধে রেখেছিলাম। চেন খুলে

দিতেই গন্ধের টানে ওরা ছুটল বাগানে। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি চলল—তার সঙ্গে চাপা হিংস্র গর্জন। সেদিন প্রায় সারারাত ধরে ওদের ফূর্তি চলেছিল। এবং কুন্তলিনী জাস্ট ভ্যানিশ হয়ে গেল এই দুনিয়া থেকে।'

আমি চাপা বিষণ্ণ গলায় একঘেয়ে সুরে কুন্তলিনীর শেষকৃত্যের কথা শোনাচ্ছিলাম। লক্ষ করলাম, অশোকেন্দু বেশ গোল-গোল চোখ করে আমাকে দেখছেন। প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছেন, গল্পটা বানানো, না সত্যি।

গ্লাসে মদিরা ঢাললাম। অশোকেন্দুর গ্লাসেও। তারপর আমরা প্রায় একইসঙ্গে চুমুক দিলাম।

'পরশু সকালে, এই ন'টা নাগাদ, সীমারেখা আমাকে ফোন করেছিল। ওকে আবার রিকোয়েস্ট করলাম। হতভাগার মতো কেঁদেও ফেললাম। কিন্তু ও অটল-অনড়। যেমন চলছে চলুক না। ডিভোর্সের কথা বলে আমি নাকি ফর নাথিং কমপ্লিকেশান তৈরি করছি। এত অবুঝ হওয়ার কোনও মানে হয়!

আমি কান্না থামিয়ে মন শক্ত করলাম। সীমাকে বাড়িতে ডেকে পাঠালাম...।'

'হ্যাঁ, পরশু সন্ধে থেকেই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।' উত্তেজিতভাবে বললেন অশোকেন্দু। সামনে ঝুঁকে কাবাব তুলে নিলেন আবার। চিবোতে-চিবোতে জড়ানো গলায় বললেন, 'আপনি জানেন রেখা কোথায় আছে। বলুন, ও কোথায়?'

আমি গ্লাসে দুবার চুমুক দিয়ে বললাম, 'সীমারেখা আমার কাছেই আছে। ও আর ফিরবে না, মিস্টার বোস—।'

অশোকেন্দু আমার শেষ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ওঁর হাসিটা কেমন শুকনো দেখাল। তবু সহজ হওয়ার চেষ্টায় কাবাব খেতে-খেতে জড়ানো স্বরে বললেন, 'রেখা ফিরবে না এটা হতেই পারে না। বলুন, ও কোথায় আছে?'

আমি কাবাবসুদ্ধু টিফিনবক্সটা অশোকের মুখের সামনে তুলে ধরে বললাম, 'এইখানে। এই সীমাকাবাব আমি নিজের হাতে রান্না করেছি—।'

অশোক বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করলেন। কাশতে-কাশতে ওঁর মুখ বেগুনি হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। যন্ত্রণা কমাতে বুক খামচে ধরলেন। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন টেবিলের ওপরে। ওঁর গ্লাস, সসের শিশি, সব ভেঙে চুরমার। গোটা টেবিল সুরার গন্ধে ম'-ম' করে উঠল।

আমি আপনমনেই ঠোঁটের কোণে হাসলাম। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলাম। সীমারেখার নম্বর ডায়াল করলাম।

ও ফোন ধরতেই বললাম, 'সব শেষ। আর কোনও প্রবলেম নেই। অশোকেন্দু এইমাত্র বিষম খেয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। তোমার সঙ্গে অ্যাট লিস্ট ফিফটিন ডেজ আমার কোনও কনট্যাক্ট থাকবে না। আমাকে একদম ফোন-টোন করবে না। বরং বিধবার রোলে পারফেক্ট অ্যাক্টিং-এর চেষ্টা করো। তুমি এক্ষুনি হোটেল থেকে বাড়ি ফিরে যাও। ও. কে? আই লাভ ইউ, অসীমা...।'

'আই লাভ ইউ টু—।' মিষ্টি গলা ভেসে এল।

পরশু থেকে সীমারেখা হোটেল আইল্যান্ড-এ আছে। আর অশোকেন্দুর হার্ট প্রবলেমের খবর ও-ই আমাকে দিয়েছিল। তবে বাকি গালগল্প—মানে, তানিয়া, কুন্তলিনী ইত্যাদি সব

আমারই তৈরি।

আমি ছোট্ট করে বললাম, ‘চিয়ার্স’। তারপর আরাম করে গ্লাসে চুমুক দিলাম। একটুকরো কাবাব তুলে নিয়ে সস মাখিয়ে মুখে দিলাম।

সত্যি, নিখুঁত খুনের মজাই আলাদা।

হঠাৎ বজ্রপাত

এখন আমি আপনাদের যে-খুনটার কথা বলব সেটা কিন্তু যথেষ্ট চাতুর্যপূর্ণ।

সাধারণত হত্যাকারীরা খুনের পেছনে টাকা খরচ করে, কিন্তু বুদ্ধি খরচ করে না। ছোটবেলা থেকেই স্কুলের মাস্টারমশায়রা আমার মেধা লক্ষ করেছিলেন। সেই মেধা আমি লক্ষ করেছি আমার একমাত্র মেয়ে রাখীর মধ্যেও। ক্লাস ফোরে পড়লে কী হবে, সবাই ওর বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে ওর মা—আই মিন আমার ওয়াইফ, সবিতা—কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। যদি এরকম বউ কারও থেকে থাকে, তবে একমাত্র তিনিই বুঝতে পারবেন। মোটকথা ওরকম বউকে খুন করতেও কারও বাধে না—অন্তত আমার নয়।

সত্যিই আশ্চর্য ধাতুতে গড়া সবিতা। দিনরাত পার্টি, ফুর্তি আর কসমেটিকস-এর পেছনে লেগে আছে—তার সঙ্গে বারোজোড়া চটি—আটান্নখানা শাড়ি (এসবই রাখীর দৌলতে আমার জানা—ওর মায়ের কোন জিনিস ক'টা আছে তা ওর মুখস্থ—তা ছাড়া নতুন কিছু কেনা হলেই সবিতারও রাখীকে ডেকে কোলে বসিয়ে দেখানো চাই। ভয় হয়, শেষে রাখীও না ওর মায়ের মতো হয়!), আংটি, ঘড়ি, উইগ ইত্যাদির ঠেলায় আমার প্রাণ বর্তমানে গলার কাছে। আমি মাঝে-মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি। পরে ভেবে দেখেছি, অফিসের ক্যাশ ভাঙার চেয়ে বউকে খুন করা অনেক সহজ।

আমার বাড়ির বাগানে পেছনদিকে একটা বড় পিপুল গাছ আছে। তার গুঁড়িটা ফাঁপা চোঙার মতো। মাটি থেকে প্রায় আটফুট উঁচুতে গুঁড়িটায় একটা মাঝারি সাইজের ফোকর আছে। গুঁড়ির ভেতরটা বাইরের জমি থেকেও প্রায় দু-ফুট নীচু। ভাবলাম, এই গাছটাকেই সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ সেরে নেওয়ার পর পুরোপুরি তৈরি হয়ে একটা দিন ঠিক করলাম। সবিতাকে বললাম, চলো, আজ দুজনে একটা সিনেমা দেখে আসি। ও কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিল, অ্যাদ্দিন পর এ কী খেয়াল?

কথাটা বলে ও লিপস্টিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি জোরজবরদস্তি করে ওকে রাজি করালাম। তখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে। রাখীকে এসব কিছু না জানিয়ে বোঝালাম, তোর মা একটু পরে রাত আটটার ট্রেনে একজন বন্ধুর সঙ্গে (এসব ব্যাপার রাখীও জানত) শিলং বেড়াতে যাবে—আমি পৌঁছে দিয়ে আসতে যাচ্ছি—তুই ভেতরের ঘরে খিল দিয়ে সাবধানে থাকিস—।

শিলং বলার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, সবিতার অসংখ্য বন্ধুদের মধ্যে একজন—ইন্দ্রজিৎ দস্তিদার—শিলং যাবে সেদিনই রাতের ট্রেনে। আর দ্বিতীয়ত, এটা জানতে পেরে

আমিও ওই একই ট্রেনে একটা বার্থের রিজার্ভেশান টিকিট কেটে নিয়ে এসেছি (অনেক বুদ্ধি, পয়সা ও পরিশ্রম খরচ করে)।

আমাদের এলাকাটা তেমন জনবহুল নয়, তাই রক্ষে। রাখীকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে বলে দরজাটা বন্ধ করে বাইরের ঘরে এলাম। এ-ঘরটাই সবিতার। ওর বন্ধুবান্ধবের অভ্যর্থনার সুবিধের জন্যে ও এই বাইরের ঘরটাই থাকার জন্যে বেছে নিয়েছিল। ঘরে আলমারি, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিংটেবিল ইত্যাদি সাজানো। সবই সবিতার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

সবিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওকে বললাম, তোমার জন্যে একটা নেকলেস এনেছি—।

আমার দু-হাত তখন আমার পেছনে।

সবিতা নেকলেসের কথায় একেবারে লাফিয়ে উঠল—আনন্দে দু-একবার 'ডার্লিং' পর্যন্ত বলে ফেলল।

আমি ওকে বললাম, চোখ বোজো, পরিয়ে দিচ্ছি।

ও গয়নার নামে সরল মনে চোখ বন্ধ করল।

আমি শক্ত দড়িটা ওর গলায় পেঁচিয়ে টেনে ধরলাম।

আয়না দিয়ে দেখলাম, ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে উঠল—আপ্রাণ চেষ্টা করল দড়িটা ছাড়ানোর—পারল না। ওর দেহটা ধপ করে মাটিতে পড়ে যেতেই আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। একটা অজানা ভয় আমাকে ঘিরে ধরল।

নিজেকে শক্ত করে এবার মূল নাটকের প্রধান অংশে হাত দিলাম। তাড়াতাড়ি ওর দেহটা টেনে নিয়ে গেলাম বাগানে—পাশের দরজা দিয়ে। তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলাম। সবিতার দেহটাকে খাড়া করে পাশে বসিয়ে স্টিয়ারিং ধরলাম। গাড়ি স্টার্ট করার আগে ওর চোখে একটা সানগ্লাস বসিয়ে দিলাম (যাতে মৃত বলে বোঝা না যায়) আর ওকে বাঁ-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম, যাতে দেহটা টলে না পড়ে যায়।

সদর দরজা পার হয়ে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। সদর দরজায় তালা দিয়ে আবার ফিরে এসে গাড়িতে বসলাম। মৃতদেহটাকে যতটা স্বাভাবিকভাবে বসিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

এইভাবে রেলস্টেশন পর্যন্ত গেলাম। সেখানে একটা নির্জন জায়গা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম। তারপর কায়দা করে সবিতার বডিটাকে সিটের নীচে ঠেলে দিলাম। সবশেষে গাড়ি চালালাম বাড়ির দিকে।

বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে দরজা খুললাম। তারপর গাড়ি গ্যারেজে তুললাম। সবিতার বডিটা টেনে বের করলাম—ওর চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরলাম। তারপর ওর মৃতদেহটা গ্যারেজ থেকে পিপুল গাছ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে অতিকষ্টে ফোকর দিয়ে ফাঁপা গুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। বাগানের যত জঞ্জাল, গুঁড়ো মাটি, সব নিয়ে এসে ঢাললাম ওই গুঁড়ির ভেতরে।

একটু পরে চুপিচুপি ফিরে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে টুক করে বসবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। হাত-পা ধোয়ার পর চেঁচিয়ে

রাখীকে ডাকলাম (এটা বোঝাতে যে, গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে আমি সোজা এসে বাথরুমে ঢুকেছি)। বললাম, আমার তোয়ালে আর সাবান দিয়ে যা...।

ও এসে বলল, তুমি কখন ফিরলে?

আমি নির্বিকার গলায় জবাব দিলাম, তা অনেকক্ষণ হল। গাড়ির আওয়াজ শুনিসনি তুই? শরীরটা ভালো লাগছে না বলে এসেই সোজা বাথরুমে ঢুকেছি—হাত-পা ধুয়ে চান করতে।

ও—, জবাব দিল রাখী, মা বুঝি চলে গেল?

আমি কোনওরকমে জবাব দিলাম, হ্যাঁ—আমি আর স্টেশনের ভেতর পর্যন্ত যাইনি।

একটু পরে ও এসে তোয়ালে আর সাবান দিয়ে গেল।

এরপর কয়েকদিন ধরে হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ প্রয়োজন মতো কাপড় দিয়ে মুছে সাফ করেছি। গাছের ফাঁপা গুঁড়ির ভেতরে বেশ কয়েক বোতল ফর্ম্যালিন ঢেলে দিয়েছি। সত্যি বলতে কী এখন অনেক নিশ্চিন্তে আছি।

রাখী মাঝে-মাঝেই জিগ্যেস করে, বাবা, মা কবে আসবে?

আমি বলি, সে তো বলে যায়নি। তুই-ই বল না, কোনওবার তোর মা আমাকে বা তোকে বলে কোথাও গেছে?

এ-কথায় ও চুপ করে থাকত।

অবশ্য অস্বীকার করতে পারব না, বাড়িটা এখন বেশ ফাঁকা-ফাঁকাই লাগে। সবিতা সবসময় সেজেগুজে টিপটপ হয়ে থাকত—নিত্য বাইরে যেত-আসত। বলত গেলে গাড়িটা ও-ই ব্যবহার করত সর্বক্ষণ।

এইভাবে প্রায় পনেরোদিন যাওয়ার পর আমি ইন্দ্রজিৎ দস্তিদারের ঠিকানা জেনে তাকে একটা চিঠি দিলাম। অবশ্যই সবিতার খবর জানতে চেয়ে। কেন সে এখনও চিঠি দেয়নি? ইত্যাদি-ইত্যাদি। চিঠির শেষে রাখীও কয়েক লাইন সবিতাকে লিখেছিল।

চিঠির উত্তর কী এল আপনারা আশা করি বুঝতেই পারছেন।

ইন্দ্রজিৎ লিখল যে, সে আমার চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়েছে সবিতা তার সঙ্গে মোটেই যায়নি। সবিতা কোথায় তাও সে জানে না।

চিঠি পেয়ে অবাক হওয়ার ভান করলাম। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গাতেই সবিতার খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথাও ওর খোঁজ পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে নিয়মিত ফর্ম্যালিন ঢেলে মৃতদেহটাকে ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করেছি—আর মনমরা হয়ে থাকার ভান করেছি। এমনকী দু-চারদিন অফিসও কামাই করে ফেলেছি। শেষে পাড়ার কয়েকজন প্রতিবেশীর অনুরোধে আমি গেলাম পুলিশে খবর দিতে। সঙ্গে কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষীও গেলেন। সেখানে ডায়েরি করে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এলাম থানা থেকে।

আমার এই অভিনয় চালাতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। বরং রাখীর কাছ থেকে সহানুভূতি পাওয়ার আশায় একদিন রাখীকে না দেখার ভান করে বিছানায় উপুড় হয়ে

শুয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছিলাম। রাখী এসে আমার পিঠে হাত দিল। জানি না, বোধহয় আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ওইটুকু মেয়ে, কিন্তু আমার মতোই মেধা পেয়েছে—এটাও বুঝেছে যে, ওর মা-কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

পরদিন সকালবেলা পুলিশ এল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি তৈরি ছিলাম—তাই এতটুকু ছটফটে ভাব প্রকাশ পেল না আমার ব্যবহারে। ওদের অভ্যর্থনা করে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। কিছুক্ষণ আলোচনার পর একজন অফিসার আমাকে সবিতার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। আমি অবিচলিত কণ্ঠে বলে গেলাম যে, সবিতার কাছে শিলং যাওয়ার একটা রিজার্ভেশান টিকিট দেখেছিলাম, এবং এ-ও জানালাম যে, ও আমার কাছে বলেছিল ইন্দ্রজিতের সঙ্গে শিলং যাবে। কথাসূত্রে ইন্দ্রজিতের পরিচয়, ঠিকানা, ইত্যাদি বললাম এবং আমার চিঠির উত্তরে পাওয়া ওর চিঠিটাও দেখালাম। একইসঙ্গে বললাম যে, আমি নিজে গাড়ি করে সবিতাকে স্টেশান পৌঁছে দিয়েছি।

ইন্সপেক্টর সবিতার ঘর সার্চ করলেন, কিন্তু দরকারি বিশেষ কিছুই পেলেন না। বোধহয় এরকম অদ্ভুত নিরুদ্দেশের কেস তিনি আগে পাননি। যাওয়ার সময় তিনি বললেন, এই অন্তর্ধান রহস্য সমাধান করার জন্যে আমি আটমোস্ট চেষ্টা করব—তবে আমার মনে হয় আপনার স্ত্রী আর বেঁচে নেই—।

ইন্সপেক্টর এ-কথা বলামাত্র আমি খুব অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, না—না, অফিসার, এ কখনওই হতে পারে না। এ যে আমি চিন্তাও করতে পারছি না...ইত্যাদি-ইত্যাদি।

পরের সপ্তাহে ইন্সপেক্টর আবার এলেন। তিনি বললেন, 'আপনার ইনফরমেশানের ওপরে বেস করে আমি খোঁজ করেছি, মিস্টার বর্মন। কিন্তু সমস্ত জায়গায় এনকোয়ারি করেও আপনার মিসেসের খোঁজ আমরা পাইনি। এটা আমাদের পক্ষে সত্যিই খুব লজ্জার কথা। তবে একটা বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ জেগেছে। আশা করি আপনি সে-বিষয়টার এক্সপ্লানেশান দিতে পারবেন—।'

আমার ভুরু কুঁচকে উঠল। একটু চিন্তিত হলাম, বললাম, কী ব্যাপার?

মিস্টার বর্মন, একটি লোক আমাদের বলেছে যে, সে যখন আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে গাড়ি করে স্টেশানের দিকে যেতে দ্যাখে, তখন সে লক্ষ করে যে, আপনার ওয়াইফের চোখে একটা কালো চশমা ছিল...।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে লোকটি। সবিতা চায়নি যে, ওর বাইরে যাওয়ার খবর আর-কেউ জানুক—বোঝেনই তো, বিবাহিতা হয়ে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া...।

আপনি বাধা দেননি?

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, না বাধা দিইনি। কারণ, দিয়ে কোনও লাভ হত না।

ইন্সপেক্টর এবার রাখীকে নিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাখী আমার ধারণামতোই সুন্দরভাবে সব জবাব দিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর কোনও হদিশ করতে না পেরে চলে গেলেন।

সবকিছু আমার প্ল্যানমতো ঘটতে লাগল। আমার ইচ্ছে আছে, তদন্তের ঝামেলা মিটে গেলে মৃতদেহটার একটা বন্দোবস্ত করব।

একদিন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ইন্সপেক্টর এলেন দলবল নিয়ে। আমি তাদের নিয়ে সবিতার ঘরে গেলাম। ইন্সপেক্টর আজ সবিতা সম্পর্কে অনেক কথা জিগ্যেস করলেন—বারবার। আমিও সাধ্যমতো জবাব দিয়ে গেলাম। রাখীকেও এ-কথা সে-কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, মিস্টার বর্মন, এ-কেস সলভ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। হয়তো আপনার ওয়াইফ কোথাও নিজের ইচ্ছেয় লুকিয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর যে ভালো-মন্দ কিছু হয়েছে তার কোনও সূত্রই আমাদের হাতে নেই। তবে ভগবান করুন, তাঁর যেন কোনও অমঙ্গল না হয়। আপনার কথা ভেবে আমার সত্যিই খারাপ লাগছে।

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর।

রাখী আলনার কাছে বসে-বসে কী যেন করছিল, হঠাৎই উঠে দৌড়ে এল আমার কাছে। ওর ওই ছোট্ট গলায় তীক্ষ্ন স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, মা যদি শিলং গিয়ে থাকবে তবে মায়ের বারোজোড়া চটিই আলনায় পড়ে আছে কেন?

মা কি কোনওদিন খালি পায়ে বাড়ির বাইরে গেছে?

সমস্ত পৃথিবী আমার সামনে দুলে উঠল। পায়ের নীচে মাটি নড়ে উঠল। টলে পড়ে যাওয়ার আগে শুধু দেখলাম, ইন্সপেক্টর চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

অপারেশান ভারচুরিয়্যালিটি

অনেকক্ষণ ধরে ফোন করব কি করব না ভেবে শেষ পর্যন্ত নম্বরটা ডায়াল করেই ফেলল অভিলাষ।

কয়েক সেকেন্ড পার হতে-না-হতেই ও-প্রান্তে রিং বাজতে শুরু করল। অভিলাষের বুকের ভেতরে ধুকপুক শুরু হয়ে গিয়েছিল। লাইনটা কি এখনই কেটে দেবে? নাকি...।

না, না—লাইন কাটার কী দরকার! একটু কথাবার্তা বললে খোঁজখবর করলে ক্ষতি কী? আসল কাজে না এগোলেই হল।

'হ্যালো—' একটি মেয়ের গলা।

'এটা কি "এন্ড গেম"-এর অফিস?' প্রশ্নটা করতে গিয়ে অভিলাষের গলা কেঁপে গেল।

'হ্যাঁ—বলুন...।' রোবটের মতো গলায় মেয়েটি বলল।

'আ-আমি কয়েকটা ইনফরমেশান চা-চাই...।'

'এর জন্যে আপনাকে আমাদের অফিসে এসে কোনও একজন এক্সিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাদের অফিসটা হল থারটি ফাইভ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। "দ্য টাওয়ার্স" বিল্ডিং-এর সেভেনটিনথ ফ্লোর। উই আর ওপেন টুয়েন্টিফোর ইনটু সেভেন।'একটু দম নিয়ে মিষ্টি গলার মেয়েটি জিগ্যেস করল, 'মে আই নো হু ইজ মেকিং দিস কল?'

কয়েকবার ঢোঁক গিলে অভিলাষ বলল, 'মানে...আপনাদের একটা এসএমএস দেখে আ-আমি কল করেছি। আই মিন...।'

'ইটস ও. কে., স্যার। ইমপরট্যান্ট পারসনসদের মোবাইল ফোনে কনট্যাক্ট করাটা আমাদের অ্যাড ক্যামপেইনেও খুব হেলপ করে। আমাদের কোম্পানির মরাল হচ্ছে, "আ ক্লায়েন্টস সিক্রেট ইজ অলওয়েজ আ সিক্রেট।" ক্লায়েন্টদের সব ব্যাপার আমরা গোপন রাখি। ফর এক্স্যাম্পল, এই যে আপনি আমাদের ফোন করেছেন, এটা কেউ জানতে পারবে না। ইভন দ্য পুলিশ ক্যান নট ট্রেস দিস কল। বিকজ মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে আমাদের স্পেশাল এগ্রিমেন্ট আছে। উই পে দেম বিগ মানি। সো এভরিথিং ইজ হাশ-হাশ।' একটু থামল মেয়েটি। বোধহয় অভিলাষকে সাহস জোগানোর সময় দিল। তারপর: 'আই হোপ ইউ আর স্যাটিসফায়েড, স্যার। নাউ মে আই নো হু ইজ কলিং?'

অভিলাষ ঘামতে শুরু করেছিল। ওর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ও তাড়াতাড়ি লাইনটা কেটে দিল।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে কাল সকাল থেকে। ঘুম থেকে উঠেই চায়ের টেবিলে রঙ্গনার সঙ্গে প্রবল খটাখটি হয়ে গেল। ইস্যুটা খুবই সামান্য: অভিলাষের একটা নীলচে ফুলহাতার শার্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা রঙ্গনাকে জিগ্যেস করতেই ও ঠোঁট উলটে বলে বসল, 'তো আমাকে কী করতে হবে?'

তাতে বিরক্ত হয়ে অভিলাষ বলেছে, 'কেন, তোমাকে জিগ্যেস করাটা কি অন্যায় হয়েছে?'

'অন্যায় না হলেও ন্যায়ের বেসিসটাও তো খুব একটা খুঁজে পাচ্ছি না। শার্টটা নিয়ে কি আমি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি?' ভুরু উঁচিয়ে একটু তেরছা হাসি ছুড়ে দিয়েছে রঙ্গনা। তারপর: 'তুমি তো জানো, আমার ভাইয়েরা এত কম দামি শার্ট পরে না। দে অলওয়েজ গো ফর সুপারব্র্যান্ডস...।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল।

ওদের বিয়েটা প্রেম করে হয়েছিল ঠিকই, তবে রঙ্গনা একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না ওরা ব্যাপক বড়লোক। বিয়ের প্রথম তিন-চার বছরে সেরকম কোনও সমস্যা হয়নি। সমস্যা শুরু হয়েছে পাঁচে পা দেওয়ার পর। ওদের মধ্যে কোনওরকম ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হলেই দু-চার লাইন কথা চালাচালির পর রঙ্গনা ওর সেই গোরু রচনায় ফিরে আসে। অভিলাষকে মনে করিয়ে দেয় যে, ওরা টগবগে বড়লোক।

তো সকালের ঝগড়ার প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা পর অভিলাষের মোবাইলে এসএমএস-টা আসে।

অভিলাষ তখন অফিসে। ল্যাপটপ কম্পিউটারের কিবোর্ডে ওর আঙুল চলছিল। মোবাইল ফোনটা রাখা ছিল একটা পেন ড্রাইভের পাশে। হঠাৎই এসএমএস-এর রিং বেজে ওঠায় কাজ থামিয়ে ও মেসেজটা দ্যাখে। অচেনা নম্বর থেকে আসা এক অদ্ভুত এসএমএস:

Harassed with any nagging problem? Call us, the PROBLEM

SOLVER. We're the best.—END GAME (9832100051)

এসএমএস-টার মানে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি অভিলাষ। যে-কোনও ঘ্যাপচানো সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হলে 'এন্ড গেম' সব সমস্যার সমাধান করে দেবে? যে-কোনও সমস্যা বলতে...ওদের সমস্যার এলাকাটা ঠিক কতটা বড়? গ্যাসট্রিক আলসার থেকে কিডন্যাপিং বা মার্ডার পর্যন্ত কি?

বলতে গেলে ঠিক তখনই রঙ্গনাকে খুন করার ব্যাপারটা প্রথম ওর মাথায় আসে।

ওদের বিয়েটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এখন যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে অনায়াসেই বলা যায়, সম্পর্কটা উচ্ছে, পলতা পাতা, চিরতা, কালমেঘ, কি নিমপাতা—সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছে।

অভিলাষ মুখে তেতো স্বাদ পেল। এইভাবেই কি কাটবে বাকি দিনগুলো? নাকি...।

হঠাৎই দেখল সুমিতি ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

সুমিতির সঙ্গে জ্যামিতির যে একটা গাঢ় সম্পর্ক আছে সেটা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। শরীরের ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক মাপের বৃত্ত, উপবৃত্ত আর ত্রিভুজ বসানো রয়েছে।

সুমিতির পরনে হালকা গোলাপি শাড়ি। তার সঙ্গে হালকা ছাই রঙের ব্লাউজ। গলায় একটা সাধারণ কালো পুতির মালা—কিন্তু অসাধারণ লাগছে। ওর লম্বা কাঠামোর সঙ্গে বিদেশিনী মডেলদের মিল। গায়ের রং-ও সেইরকম। এমনভাবে অভিলাষের দিকে হেঁটে আসছে যেন মাটিতে পা পড়ছে না—ভেসে আসছে।

সুমিতি সিস্টেমস রিসার্চ ডিভিশানের প্রজেক্ট লিডার—এবং কোম্পানির অ্যাসেট। ওকে মনে-মনে অনেকেই চায়, কিন্তু মুখে বলার সাহস নেই। কারণ, ওর ব্যক্তিত্ব সহজে ভেদ করা যায় না।

অভিলাষের সঙ্গে কাজের কথা বলতেই এসেছিল সুমিতির। আলতো নরম গলায় ও কথা বলছিল। হালকা পারফিউমের গন্ধ অভিলাষকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

কাজের কথা শেষ করে চলে যাওয়ার ঠিক আগে সুমিতি বলল, 'আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব...?'

'কী?'

'মুখটাকে এরকম প্যাঁচার মতো করে রাখবেন না। যদিও এত হ্যান্ডসাম প্যাঁচা আমি আগে কখনও দেখিনি—।'

সুমিতি ঠোঁটের কোণে হেসে চলে গেল।

অভিলাষের সঙ্গে মাঝে-মাঝে এরকম হালকা মজা করে সুমিতি। হয়তো অভিলাষকে ও কিছুটা পছন্দও করে। কিন্তু শত সাধ থাকলেও অভিলাষ কখনও পা বাড়ায়নি, নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেনি।

কারণ রঙ্গনা। অভিলাষ জানে, ওকে ডিভোর্সের কোনও প্রস্তাব দিলে ও সেটাকে এ-পাড়া থেকে শুরু করে বাপের বাড়ি পর্যন্ত রাষ্ট্র করে ছাড়বে। কথার খোঁচায় অভিলাষকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। কিন্তু ডিভোর্স দেবে না।

রঙ্গনা এইরকম। কারণ, ওর লোভ—অর্থ আর শাসনের। অভিলাষের যা-কিছু আছে তার ওপরে দখল রাখতে রঙ্গনা ভালোবাসে, আর অভিলাষের ওপরে দখল রাখতে তার চেয়েও আরও অনেক বেশি ভালোবাসে।

এই দখলদারির বেড়া ভাঙতে চাইছিল অভিলাষ। তা হলেই ও অনেক স্বপ্ন দেখতে পারবে। এমনকী সুমিতিকে নিয়েও।

আরও আধঘণ্টা চিন্তাভাবনার পর অভিলাষ ঠিক করল 9832100051 নম্বরটায় ও ফোন করবে।

অভিলাষ ফোনটা করেছিল এসটিডি বুথ থেকে, যাতে কলার আইডি দেখে 'এন্ড গেম' ওকে ট্রেস করতে না পারে। কিন্তু সেই নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও অভিলাষ যেভাবে ঘেমে নেয়ে উঠল তা রীতিমতো লজ্জা পাওয়ার মতন। রঙ্গনা এ-দৃশ্য দেখলে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ত। আর সেই হাসির এক-একটা কণা ধারালো ছুঁচের ডগা হয়ে ওকে রক্তাক্ত করত।

রঙ্গনা আপাদমস্তক আকাঙ্ক্ষাময় যুবতী। অভিলাষ ওকে কখনওই ঠিকমতো সন্তুষ্ট করতে পারেনি—না দিনে, না রাতে। ওর ছোটখাটো চেহারা আর ছোটখাটো প্রত্যঙ্গ নিয়ে কম খোঁটা দেয়নি রঙ্গনা। অতৃপ্ত অবস্থায় স্বামীর কাছ থেকে বিযুক্ত হওয়ার পর রঙ্গনা প্রায়ই ওকে 'খোকা মেশিন' বলে ব্যঙ্গ করত। বলত, '...একে তোমার খোকা মেশিন, তাতে আবার আধখানা গুলি ভরা আছে!'

অভিলাষের বুকের ভেতরটা জ্বলতে লাগল। ও ধীরে-ধীরে বুঝতে পারল, ওর ভেতরে একটা খুনি জন্ম নিচ্ছে।

মোবাইল ফোনের এসএমএস-টা বারবার দেখতে লাগল অভিলাষ। আচ্ছা, ন্যাগিং প্রবলেম সলভ করতে 'এন্ড গেম' ঠিক কত টাকা নেয়?

টুয়েন্টি সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে এ ধরনের একটা অফিস ঠিক যতটা আধুনিক হওয়া সম্ভব 'এন্ড গেম'-এর অফিস ঠিক ততটাই আধুনিক।

মোলায়েম ঠান্ডা পরিবেশ। চারিদিকে ধবধবে সাদা আলো—তবে লুকোনো লুমিনেয়ারগুলো চোখে পড়ছে না। মসৃণ আলোর দীপ্তি থাকলেও বিরক্তিকর চোখধাঁধানো ব্যাপার নেই। গোটা অফিসটাই কাচ আর আয়না দিয়ে সাজানো। ফলে অবজেক্ট আর ইমেজ মিলেমিশে এক অদ্ভুত ইলিউশান তৈরি হয়েছে।

রিসেপশান থেকে প্রায় পুরো অফিসটাকেই দেখতে পাচ্ছিল অভিলাষ। টেবিল, চেয়ার, ফাইলিং ক্যাবিনেট, ল্যাপটপ কম্পিউটার, হলোগ্রাম ক্যালেন্ডার, আরও কত কী!

কাচ আর আয়না ঘেরা সরু-সরু অলিপথ ধরে তরুণ-তরুণীরা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। তবে কে যে অফিসের স্টাফ আর কে যে ক্লায়েন্ট সেটা একটুও বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎই অভিলাষের মনে হল, 'এন্ড গেম'-এর যা ব্যবসা তাতে এই ব্যাপারটা যত গুলিয়ে যায় ততই ভালো। ক্লায়েন্টদের সেফটি আরও জোরালো হবে। তা ছাড়া নানান জায়গায় নানান অ্যাঙ্গেলে দাঁড় করানো আয়নার জন্য সব মানুষের চলাফেরার গতিপথ ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না। কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল রাতে আরও দুবার 'এন্ড গেম'-এর অফিসে ফোন করেছিল অভিলাষ। দুবার-ই ও মাঝপথে ফোন কেটে দিয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বারে সাহস করে মেয়েটির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চালাতে পেরেছে।

অভিলাষকে একজন এক্সিকিউটিভের নাম আর মোবাইল নম্বর দিয়েছে মেয়েটি। বলেছে, 'এখন থেকে হি উইল বি ইয়োর ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড। ইউ মাস্ট ডিপেন্ড অন হিম। উই উইল গিভ ইউ ভ্যালু ফর মানি...।'

'এন্ড গেম'এর অফিসে ঢুকে সেই এফপিজি—মানে, ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইডকে ফোন করল অভিলাষ। সঙ্গে-সঙ্গে আশ্বাসের হাসি, সুপ্রভাত, আর 'কোনও চিন্তা নেই'-এর বন্যা বয়ে গেল। একইসঙ্গে গাইড্যান্সও পাওয়া গেল।

মোবাইল ফোনে পরের পর নির্দেশ দিয়ে অভিলাষকে গাইড করতে লাগলেন তিনি। আয়না আর কাচের গোলকধাঁধায় অভিলাষ অন্ধের মতো পথ খুঁজতে লাগল। বারবার

ধাক্কা খেতে লাগল কাচে অথবা আয়নায়। নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে ধাক্কা এড়াতে গিয়ে বেশ কয়েকবার নাকাল হল। তারপর, বহু ধস্তাধস্তির পর ও কিউব- ১১০১১-এ পৌঁছতে পারল।

তখনই ও ওর এফপিজি-কে প্রথম দেখতে পেল।

বেঁটে চেহারার মোটাসোটা মানুষ। ফরসা, গালে সাহেবদের মতো লালচে আভা। মাথার প্রায় পুরোটাই টাক। চোখে চৌকো কাচের শৌখিন চশমা। চোখজোড়া গোল-গোল। তাতে সবসময়েই একটা অবাক ভাব। নাকের নীচে ছোট চওড়া গোঁফ। আর থুতনির নীচে গলকম্বল।

গোটা অফিসটা এসি হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোকের কপালে আর টাকে বিনবিনে ঘাম। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে ঘন-ঘন ঘাম মুছছেন।

এফপিজির চেহারা অভিলাষকে হতাশ করল। এ যে দেখছি বোকা-বোকা একটা জোকার! যার সঙ্গে বুদ্ধির বা আই. কিউ-র কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভিলাষ। ভদ্রলোককে কয়েকবার জরিপ করল।

না, ভদ্রলোকের পোশাক বেশ স্মার্ট। ঘিয়ে রঙের ফুলশার্ট। গাঢ় নীল রঙের টাই। আর গাঢ় নীল টেরিউলের প্যান্টের ওপরে সরু-সরু সাদা স্ট্রাইপ।

এফপিজির নাম কমলপাণি। অভিলাষের সঙ্গে হাতমোলানোর সময় শুধু প্রথম নামটাই বললেন তিনি। তারপর ওকে নিয়ে কাচ আর আয়নায় ঘেরা একটা কিউবিকল-এ বসলেন।

অভিলাষ আগেই লক্ষ করেছিল, কিউবিকলগুলোর নম্বর ডেসিম্যাল নাম্বারে না লিখে বাইনারিতে লেখা। ও যখন এর কারণ ভাবছিল তখন কমলপাণি হাতে হাত ঘষে একটু খসখসে গলায় ওকে জিগ্যেস করলেন, 'বলুন, স্যার, আপনার ন্যাগিং প্রবলেমটা কী? আপনাকে এটুকু অ্যাশিয়োর করছি, নেচার অফ প্রবলেম যা-ই হোক না কেন, উই উইল সলভ ইট ফর গুড।'

অভিলাষ আর দেরি করল না। সমস্যাটা ও বলতে গেলে কমলপাণির মুখের ওপরে উগরে দিল।

'সমস্যাটা আমার ওয়াইফ। আই ওয়ান্ট টু বাম্প আর অফ—ওকে একেবারে খতম করতে চাই...।'

'গুড!' কমলপাণি চাপা হেসে মাথা নাড়লেন 'আপনার ওয়ে অফ এক্সপ্রেশান আমার ভালো লেগেছে, স্যার। বি ডায়রেক্ট অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট। সেভস টাইম।' কাচের টেবিলে আলতো করে আঙুলের টোকা মারতে শুরু করলেন কমলপাণি। সাদা সিলিং-এর দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইলেন। আস্তে-আস্তে বললেন, 'ওয়াইফকে...খুন...করতে...চান। তাই তো?' চোখ নামালেন অভিলাষের দিকে 'মোস্ট কমন প্রবলেম। হ্যাঁ, সলভ হয়ে যাবে। তবে মার্ডার করতে চান কোন মোডে—ভারচুয়াল মোড, না রিয়েল মোড?'

'তার মানে?'

'দেখুন, আমরা মার্ডার করি দু-ভাবে—ইন ভারচুয়ালিটি, অ্যান্ড ইন রিয়েলিটি...।'

অভিলাষ ফ্যালফ্যাল করে কমলপাণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মাথায় তখনও ভালো করে কিছু ঢুকছিল না। ভারচুয়াল? রিয়েল? এসব কী বলছে ওর এফপিজি!

তাছাড়া মানুষটা মার্ডার করার ব্যাপারটা এমন মামুলিভাবে উচ্চারণ করেছে যে, অভিলাষের স্পাইনাল কর্ড বেয়ে বরফজলের হিমস্রোত নেমে গেল।

কমলপাণি যতই কথা বলছিলেন অভিলাষ ততই বুঝতে পারছিল বোকা-বোকা জোকার-জোকার ভাবটা ওঁর ছদ্মবেশ। ক্ষুরধার বুদ্ধি না থাকলে 'এন্ড গেম'-এর এক্সিকিউটিভ হওয়া যায় না।

'...ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিই, স্যার...' দু-হাত নেড়ে বললেন কমলপাণি, 'ধরুন, আপনাদের কনজুগাল লাইফ একদম ঘেঁটে গেছে। মানে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা একেবারে বিষিয়ে গেছে—মিউচুয়াল হেট্রেড ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। তখন, ধরুন, আপনি ডিসাইড করলেন যে, আপনার ওয়াইফকে মার্ডার করবেন—এই যেমন আপনি ডিসাইড করেছেন।

'আমাদের সাইকোলজি ডিভিশান স্টাডি করে দেখেছে যে, এরকম কেস-এ প্রায় এইটিথ্রি পারসেন্ট মানুষের বেলায় রিয়েল মার্ডারের দরকার হয় না। ভারচুয়াল মার্ডার করলেই কাজ হয়ে যায়। মানে, য়ু গেট ইয়োর হেট্রেড আউট অফ ইয়োর সিস্টেম। তখন স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর রিলেশানটা আবার রিপেয়ার হয়ে যায়। এভরিথিং এন্ডস ওয়েল। ঠিক আছে?'

'ভারচুয়াল মার্ডার মানে?' হতবাক অভিলাষ জিগ্যেস করল।

কমলপাণি হাসলেন, ওঁর ভুঁড়ি হাসির দমকে কেঁপে উঠল আঙুলের ডগা খুঁটতে-খুঁটতে তিনি বললেন, 'ভারচুয়াল মার্ডার মানে নকল খুন। কিন্তু আপনি ভাববেন আসল খুনই হয়েছে। ব্যাপারটা আমাদের কোম্পানির ইনভেনশান—ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্টও নেওয়া আছে। এর ডিটেইল-এ এখন যাচ্ছি না—পরে আপনি দেখতেই পাবেন—যদি অবশ্য আপনি ভারচুয়াল মোডে যান।

'আমাদের কোম্পানির নিয়ম হল, ভারচুয়াল মার্ডার হলে সেটা অবশ্যই ক্লায়েন্টকে নিজের হাতে করতে হবে। আর...ইফ এনিবডি গোজ ফর রিয়েল মোড, "এন্ড গেম" টেকস কেয়ার অফ এভরিথিং। ক্লায়েন্টকে কোনও ঝামেলা ঘাড়ে নিতে হবে না। বরং আমরা ক্লায়েন্টকে জবরদস্ত অ্যালিবাই তৈরি করে দেব—পুলিশের বাবাও তাকে সেই মার্ডারের সঙ্গে জড়াতে পারবে না। তা ছাড়া মার্ডারটা আমরা এমনভাবে কমিট করব যে, সেটা একটা পারফেক্ট অ্যাক্সিডেন্টের মতো দেখাবে। এই ধরুন কার অ্যাক্সিডেন্ট, কিংবা মালটিস্টোরিড বিল্ডিং থেকে পড়ে যাওয়া—এই টাইপের। অ্যাবসোলিউটলি নো উয়ারিজ ফর দ্য ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্টকে শুধু আমাদের প্রপার ফি-টা ক্রেডিট কার্ডে জমা করতে হবে। ব্যস...।'

ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে অভিলাষকে সব বুঝিয়ে দিলেন কমলপাণি। তারপর ওকে একপৃষ্ঠার একটা ফর্ম ফিল-আপ করতে দিলেন। বললেন, 'শুনুন স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আপনাকে করব। তাড়াহুড়ো করে কোনও ডিসিশান নেবেন না। গো হোম। রিল্যাক্স। আপনার স্ত্রী যখন আপনার প্রেমিকা ছিল—আই হোপ শি ওয়াজ—সেইসব মিষ্টি দিনগুলোর কথা ভাবুন। ভাবুন আরও মিষ্টি রাতগুলোর কথা। ওহ! দৌজ ওয়ান্ডারফুল নাইটস!...এখন তো হতেই পারে, ওসব কথা ভাবতে-ভাবতে একসময় আপনার মনে হবে, ইউ ডোন্ট নিড আস অ্যাট অল।

'একটা কথা আপনাকে বলি, স্যার—উই ডোন্ট বেগ ফর বিজনেস। যদি আপনি আমাদের হেলপ না নেন, তা হলে আমরাই সবচেয়ে বেশি খুশি হব। কিন্তু যদি তিনদিন

পর আপনি আবার আমাদের কাছে ফিরে আসেন তা হলে বুঝতে হবে আপনার ডিসিশানটা জেনুইন। তখন আপনিই ঠিক করবেন কোন মোডে আপনি কাজটা করতে চান—ভারচুয়াল, না রিয়েল। যদি ভারচুয়াল অপারেশানে যান, তা হলে ওয়াইফকে আবার ফিরে পাবেন। আর যদি রিয়েল অপারেশানই আপনার ডিমান্ড হয়, তা হলে...ওয়েল শি উইল বি গন ফর গুড।' একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন কমলপাণি: 'তা হলে বাড়ি যান... ভাবুন...তিনদিন পর আমাদের দেখা হবে। সি য়ু...।'

ফর্মটা ফিল-আপ করার সময় মোডের জায়গায় 'ভারচুয়াল' লিখল অভিলাষ।

গত তিনদিন ধরে অনেক ভেবেছে ও। কমলপাণির কথাগুলো ওকে বেশ নাড়া দিয়েছে। কমলপাণি বলেছেন মিষ্টি দিনগুলোর কথা ভাবতে—যখন রঙ্গনা ওর প্রেমিকা ছিল। মিষ্টি দিন। আরও মিষ্টি রাত।

প্রথম যেদিন ওরা সবচেয়ে কাছাকাছি আসে সেদিন রঙ্গনা কী বলেছিল আজও অভিলাষের মনে আছে।

অভিলাষের ফ্ল্যাটে ওরা দুজনে সন্ধেটা কাটাচ্ছিল। অভিলাষ একটা সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। একটু আগেই ওর তৃতীয় পেগ শেষ হয়েছে। মাথায় ঝিমঝিম ভাব, মনের মধ্যে নানান রঙের স্বপ্নের ওড়াউড়ি। মিউজিক সিস্টেমে রঙ্গনার ফেবারিট জিমি এক্স-এর 'ক্লোজ টু ইয়োর হার্ট' বাজছিল। আর রঙ্গনা বসেছিল অভিলাষের হাতের নাগালে।

সুতরাং হাত হাতের কাজ করছিল, মন মনের।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রঙ্গনা এসে গিয়েছিল অভিলাষের বুকের ওপরে। তারপর, দু-চার প্রস্থ আদরের পর, রঙ্গনা অভিলাষের বুকে মুখ গুঁজে মিনমিনে জড়ানো স্বরে বলেছিল, 'তোমার নামের মানে জানো?'

'হ্যাঁ—জানি।' নীচু গলায় জবাব দিয়েছিল অভিলাষ।

'তা হলে আর দেরি করছ কেন?'

'না, আর দেরি করেনি অভিলাষ।

সেইদিন, আর তার পরের দিনগুলো! নাম অনুযায়ী কাজ করে চলেছিল।

ভাবতে-ভাবতে নরম হয়ে যাচ্ছিল অভিলাষ। আচ্ছা, রঙ্গনা কি নিজেকে একটু বদলে নিতে পারে না? দরকার হয় অভিলাষও নিজেকে একটু-আধটু বদলাবে।

সুতরাং, রঙ্গনার সঙ্গে কথাবার্তায় বা ব্যবহারে সচেতন হয়ে উঠল অভিলাষ। ওর সঙ্গে অতিরিক্ত মোলায়েম সুরে কথা বলতে লাগল, সংঘর্ষ এড়াতে নিজে হার মানল বহুবার। রঙ্গনা বেশ অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগল। একসময় তো বলেই বসল, 'কী ব্যাপার বলো তো? কোনও ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট খেয়েছ নাকি? তোমাকে ভারি পিকিউলিয়ার লাগছে...।'

অভিলাষ তাও চেষ্টা চালিয়ে গেছে। আর ওর মনটা ধীরে-ধীরে পালটাতে শুরু করেছে। মনে হয়েছে, রঙ্গনাকে আর-একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। দেখাই যাক না!

তাই কমলপাণির কাছে এসে ফর্মে মোডের জায়গায় ও লিখেছে, 'ভারচুয়াল।'

খুব তাড়াতাড়ি সবরকম ফর্মালিটিজ কমপ্লিট করে দিলেন কমলপাণি। চোখ তুলে দেখলেন অভিলাষের দিকে, বললেন, 'ইট ওয়াজ আ গুড ডিসিশান, স্যার। ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ভারচুয়াল মোড নো লেস এফেকটিভ দ্যান দ্য রিয়েল মোড...।'

অভিলাষ শুনল, কিন্তু কোনও কথা বলল না। শুধু মনে-মনে ও ভারচুয়াল মার্ডারের এফেকটিভনেসটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল।

কমলপাণি অভিলাষের ফ্ল্যাটের ঠিকানা এবং মোটামুটি লোকেশান জেনে নিলেন। তারপর হাতঘড়ির ডায়ালে তারিখ দেখে অভিলাষকে সাতদিন পরের একটা তারিখ আর সময় জানালেন, বললেন, 'আরও সাতদিন সময় হাতে পেলেন। কিপ ইয়োর কুল। ওইদিন ঘড়ি ধরে চলে আসুন। কমিট দ্য ক্রাইম অ্যান্ড বি হ্যাপি। ও. কে?'

'ও. কে.—' বলল অভিলাষ।

অন্ধকার ঠান্ডা ঘরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে রঙ্গনাকে দেখছিল অভিলাষ।

ওর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন এফপিজি কমলপাণি।

ওদের সামনে একটা বিশাল কাচের জানলা। জানলার ওপাশেই একটা আলো-ঝলমলে বেডরুম—অভিলাষের বেডরুম।

সুন্দর করে সাজানো বেডরুমের মোলায়েম বিছানায় আলুথালুভাবে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে রঙ্গনা। একহাতে ধরা একটা ইংরেজি পেপারব্যাক।

রঙ্গনার গায়ে লেসের কাজ করা গোলাপি রঙের একটা নাইটি। পোশাকটা ঠিকঠাক ওর গায়ে নেই। একটা পা ভাঁজ করা—পোশাকটা উঠে গিয়ে হাঁটু এবং ঊরুর খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল বালিশের ওপরে ছড়ানো। বাঁ হাতে কোমরের কাছটা চুলকোচ্ছে।

কমলপাণি ফিসফিস করে বললেন, 'স্যার, এটা আপনার বেডরুমের হলোগ্রাফিক লাইভ টেলিকাস্ট। আপনি যা দেখছেন সবটাই হলোগ্রাফিক ইমেজ—মানে মায়া। আমাদের ক্যামেরা এখন থেকে প্রতিমুহূর্তে আপনার ওয়াইফকে ফলো করবে। এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রী ফ্ল্যাটে যা-যা করবেন তার প্রতিটি কণা আমাদের থ্রি-ডি ক্যামেরা সিস্টেম লাইভ টেলিকাস্ট করে আপনাকে দেখাবে...।'

অভিলাষের তাজ্জব লাগছিল। কারণ, ওরা ওর ফ্ল্যাট থেকে অনেক দূরে 'এন্ড গেম'-এর অফিসে একটা স্পেশাল রুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কমলপাণি বোধহয় অভিজ্ঞতা থেকেই অভিলাষের অবাক হওয়াটা টের পেলেন। চাপা গলায় বললেন, 'আপনি যা দেখছেন, পুরোটাই ভারচুয়াল রিয়্যালিটি। কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে, আপনার স্ত্রীকে আপনি যেন সত্যি-সত্যি লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছেন। আসলে যে-কোঅর্ডিনেটে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এগজ্যাক্টলি সেই কোঅর্ডিনেটে আপনার ফ্ল্যাটের বেডরুমে একটা জানলা আছে— ফ্রস্টেড গ্লাস লাগানো জানলা। আমরা যেন সেই জানলার কাচ সরিয়ে আপনার ওয়াইফের প্রাইভেসিতে ইনভেড করছি। ইটস সো-ও-ও রিয়েল!' হঠাৎই কথা থামিয়ে অন্ধকারে অভিলাষকে ছুঁলেন কমলপাণি। চাপা গলায় বললেন, 'নিন—এটা ধরুন....'

জিনিসটা কমলপাণির হাত থেকে নিল অভিলাষ।

একটা রিভলভার।

আন্দাজে বুঝল, অস্ত্রটার ওজন প্রায় কেজিখানেক হবে।

'এটা আপনার মার্ডার ওয়েপন। মডার্ন। ইমপোরটেড। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, মডেল ফোর জিরো জিরো সিক্স। জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ক্যালিবার। ডাবল-অ্যাকশান। এর ম্যাগাজিনে এগারো রাউন্ড বুলেট আছে। এই হ্যান্ডগানটার নল-টল সব স্টেইনলেস স্টিলের—আর গ্রিপটা ব্ল্যাক, সিনথিটিক। প্রথম কয়েকটা শটে আপনার স্ত্রীকে মিস করলেও এগারোবার তো আর মিস করবেন না! নিন, এবার রেডি হোন...।'

অভিলাষ রিভলভারটা উঁচিয়ে রঙ্গনার দিকে তাক করল। ও অ্যামেচার হলেও এত ক্লোজ রেঞ্জে রঙ্গনাকে মিস করা প্র্যাকটিক্যালি অসম্ভব।

রঙ্গনার সমস্ত খোঁচা, উপহাস আর ব্যঙ্গগুলো মনে পড়ল ওর। খোকা মেশিন...আধখানা গুলি ভরা...। আর এখন। অভিলাষের হাতে একটি পূর্ণাঙ্গ মেশিন—তাতে এগারোখানা গুলি ভরা আছে।

'কাচ সরিয়ে দিলাম কিন্তু! গেট রেডি!' কমলপাণির গলা।

অভিলাষের হাত কাঁপছিল। ও মুঠো শক্ত করল বাঁটের ওপর।

'সড়সড়' শব্দ করে কাচের প্যানেল সরে গেল।

অভিলাষের মাথার মধ্যে খতমের সুর বাজছে।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কমলপাণি বললেন, 'ওয়ান, টু, থ্রি—ফায়ার!'

অভিলাষ ট্রিগার টিপতে শুরু করল। ফায়ারিং-এর শব্দে ওর কানে তালা লেগে গেল।

প্রথম বুলেটটা রঙ্গনার কোমরে গিয়ে লাগল। ওর হাতের বইটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ও চমকে ফিরে তাকাল জানলার দিকে...অভিলাষের দিকে। ওর অবাক হওয়া মুখটা পলকে ব্যথায় কুঁচকে গেল। কোমর থেকে চুঁইয়ে-চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে এল গোলাপি নাইটি লাল হতে লাগল। বিছানার চাদরও।

অভিলাষ কিন্তু থামেনি। চোখ বুজে পাগলের মতো ফায়ার করেই চলল। রঙ্গনার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত দেখে ওর খুনে মেজাজ যেন আরও চড়ে গেল। ও ভুলে গেল, এটা ভারচুয়াল মার্ডার।

বুলেটের ধাক্কায় রঙ্গনা বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছিল। মেঝেতে পড়ে থাকা ওর চিতপাত শরীর আর রক্ত দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ও আর বেঁচে নেই।

অভিলাষের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। ও হঠাৎই টলে পড়ে গেল মেঝেতে। কমলপাণি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লেন ওর ওপরে। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলেন, নাড়ি দেখলেন। তারপর পকেট থেকে নিমপাতার মতো ছোট্ট আর পাতলা একটা মোবাইল ফোন বের করে কথা বললেন, 'আমি ক্লায়েন্ট নাম্বার ট্রিপল ওয়ান ট্রিপল জিরো ডাবল ওয়ানকে নিয়ে ভারচুয়াল মার্ডার এক্সিকিউশান রুমে আছি। ভদ্রলোক সাডেন ট্রমায় সেন্সলেস হয়ে গেছেন। হেলপলাইনকে অ্যাকটিভ হতে রিকোয়েস্ট করছি।'

অভিলাষ সুস্থ হয়ে উঠল আধঘণ্টার মধ্যেই। ও শুধু রঙ্গনার কথা ভাবছিল। জ্ঞান ফেরার পর কমলপাণি ওকে বারবার আশ্বাস দিয়েছেন যে, রঙ্গনার কোনও ক্ষতি হয়নি। ইট ওয়াজ ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট আ ভারচুয়াল মার্ডার।

শি ইজ পারফেক্টলি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। অভিলাষ ইচ্ছে করলে এখনই ওর স্ত্রীকে ফোন করতে পারে।

কিন্তু তবুও অভিলাষের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

তাই রঙ্গনাকে ফোনই করল অভিলাষ।

'রঙ্গনা—।'

'হু ইজ দিস?'

'আমি—অভি। তুমি ঠিক আছ তো?'

'ক' পেগ খেয়েছ?

আহ! একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল অভিলাষ। এটাই তো রঙ্গনার ক্যারেক্টারিস্টিক আনসার! দিস প্রূভস শি ইজ অ্যালাইভ অ্যান্ড ও. কে.।

'রঙ্গনা, আই লাভ ইউ, বেবি—।'

'কখন বাড়ি ফিরছ?'

ঘড়ি দেখল অভিলাষ, বলল, 'এই ধরো সাড়ে দশটা নাগাদ—।'

'সাড়ে দশটাই কোরো। তার চেয়ে বেশি দেরি যেন না হয়...।'

এই কথায় প্রেমিকা রঙ্গনার ছায়া দেখল অভিলাষ। কমলপাণিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। কারণ, তিনিই প্রথম ভারচুয়াল মার্ডারের সাজেশান দিয়েছিলেন।

রাস্তায় নেমে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসল অভিলাষ। গাড়ি ছুটিয়ে দিল। রাতের বাতাস ওর গালে কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

রাতটা কী সুন্দর! আকাশের চাঁদটাও।

অভিলাষ যখন ওদের বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় এসে পড়ল তখনই একটা মালবোঝাই ফুল পাঞ্জাব ট্রাক পাগলাঘোড়ার মতো ছুটে এল ওর দিকে।

প্রবল সংঘর্ষের শব্দে নিঃস্তব্ধ রাত থরথর করে কেঁপে উঠল।

ট্রাকটা একটুও না থেমে উদ্দামগতিতে ছুটে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

অভিলাষের গাড়িতে আগুন ধরে গেল। তার একটু পরেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ।

অ্যাকশান ছবির দৃশ্যের মতো অভিলাষের গাড়িটা শূন্যে ছিটকে উঠল, আবার আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

রঙ্গনা টেনশানে পায়চারি করছিল। হঠাৎই ওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল রঙ্গনা। দশটা চল্লিশ।

তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে ‘হ্যালো’ বলতেই ও-প্রান্ত থেকে রোবটের গলায় একজন মহিলা বলে উঠল, ‘ম্যাডাম, ”এন্ড গেম” থেকে বলছি। আপনার কাজটা হয়ে গেছে। যেমন বলেছিলাম, ইট ওয়াজ আ পারফেক্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট...। একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কায়...।

দৈবের বশে

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল অরিসেন। ঘাড় ফিরিয়ে আর-একবার দেখল নীলাদ্রির দিকে। পরম নিশ্চিন্তে নীলাদ্রির দু-চোখ বোজা। মাথাটা যত্ন করে বসানো গ্যাসের উনুনের ওপরে। যেন আসন্ন কোনও বিশেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে নীলাদ্রি সেন।

রান্নাঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নীলাদ্রির চেয়ারের কাছে ঝুঁকে এল অরি। চেয়ারটাকে ঠেলে উনুনের আরও কাছে এগিয়ে দিল। নাঃ, দৃশ্যটা এখন বেশ স্বাভাবিক-স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু অরির হাতে এখন প্রচুর কাজ। প্রথমত, কাজগুলো সম্পূর্ণ নিখুঁত হওয়া চাই। এবং দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ওকে কাজ করতে হবে। নিখুঁত খুনের গোটাকয়েক কাহিনি ও পত্র-পত্রিকায় পড়েছে। তাতে খুনটাকে দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টাটাই বেশি। কিন্তু একটা স্বাভাবিক-সহজ-ধারালো পথকে সকলেই এড়িয়ে গেছে। তা হল, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে খুনির যে কোনও সম্পর্ক নেই, সেটাকে সামনে তুলে ধরা। অর্থাৎ, নীলাদ্রি সেন নামে কোনও লোককে যে জনৈক অরিসেন রায় কোনওদিন চিনত সেটাই পুলিশ প্রমাণ করতে পারবে না। উপরন্তু আত্মহত্যার দৃশ্যসজ্জা তো আছেই!

নীলাদ্রিকে খুন করার যুক্তিসঙ্গত কারণের সংখ্যা ক্রমশ এত বেড়ে যাচ্ছিল যে, অরির পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। গতমাসে নীলাদ্রির একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হাতে আসার পরই অরিসেন মনে-মনে ছকে ফেলেছে নীলাদ্রি-নিধনের পরিকল্পনা। চিঠিতে লেখা ছিল :

নিয়তি যখন পরিহাস করছে, তখন তাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? লোকের চিরটা জীবন তো আর সুখে কাটে না! সুতরাং পা হলেও এই পথই বেছে নিলাম।

ইতি—

নীলাদ্রি

নীলাদ্রি অবশ্য টাকার ইঙ্গিত দিয়ে অরিকে কিছুটা ব্যঙ্গ করেছে চিঠিটায়। অর্থাৎ, ওর নিয়তি যখন হাসিমুখে ওকে পরিহাস করছে (নীলাদ্রির মাধ্যমে) তখন সে-পরিহাস মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী! (সামান্য ক'টা টাকা পাঠানোর তো ব্যাপার)! লোকের (অরিসেনের) চিরটা জীবন তো আর সুখে কাটে না! এখন যেমন নীলাদ্রিকে টাকা দিতে

হচ্ছে মাসে-মাসে! সুতরাং পাপ হলেও (ব্ল্যাকমেইল করা নিশ্চয়ই পাপ!) এই পথই বেছে নিলাম (মানে, নীলাদ্রি ব্ল্যাকমেইল করার পথ বেছে নিয়েছে)।

না, চিঠির অর্থ ভুল বোঝেনি অরিসেন। কিন্তু একইসঙ্গে বুঝেছে, এই চিঠিটাই প্রযুক্তিবিদ্যার দক্ষতায় হয়ে দাঁড়াবে নীলাদ্রির মৃত্যুর সরল ব্যাখ্যা। তাই সবেধন নীলমণি করে চিঠিটাকে সযত্নে রেখে দিয়েছিল অরিসেন। আজ সময় হওয়ায় সেটা ও পকেটে করে নিয়ে এসেছে। এই চিঠিটাই হবে নীলাদ্রি সেনের আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী।

নীলাদ্রির বাড়িতে আজ যখন ও এসে ঢুকল, ওকে দেখে অবাক হলেও নীলাদ্রি বসবার ঘরে সারিকে আদরে আহ্বান জানিয়েছে। অরির অনুরোধে সদর দরজা ভেতর থেকে খিল এঁটে বন্ধ করে দিয়েছে নীলাদ্রিই। তারপর ওর মুখোমুখি বসে জানতে চেয়েছে অরির আসার কারণ।

কী ব্যাপার, হঠাৎ এ সময়ে?

তোর এ-মাসের কিস্তির টাকাটা দিতে এলাম।—বলতে-বলতে পকেট থেকে একগোছা পাঁচটাকার নোট বের করল অরিসেন: কিন্তু একটা কথা বলতে পারিস?

কী কথা?—মুচকি হেসে জানতে চাইল নীলাদ্রি। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল।

কবে তোর এই লুকোচুরি খেলা বন্ধ হবে?

মানে?

মানে, আর কতদিন এভাবে আমাকে টাকা দিতে হবে?—অরিসেনের স্বর কঠিন হল।

মানুষ ভুল যখন করে, তখন মাশুলের কথা ভাবে না।—একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখল নীলাদ্রি। তাতে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল: যেমন তোর পঁচিশবছর বয়েসের ভুলের মাশুল তুই আজও শুধে চলেছিস।

ভুল?

ভুলটার কথা আর-একবার মনে পড়ল অরির। তখন ওর বয়েস হয়তো পঁচিশই হবে। ও আর নীলাদ্রি গাড়ি করে যাচ্ছিল রানাঘাটের দিকে। তখন ওর সুখে-দুঃখে বন্ধু বলতে একমাত্র নীলাদ্রি।

রাত প্রায় দশটার সময় নৈহাটির কাছাকাছি ওদের গাড়ির তেল ফুরোল। নির্জন রাস্তায় সাহায্য চাওয়ার মতো কেউ ছিল না। গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক চাইতেই ওদের চোখে পড়ল একজন লোক একটা সুটকেস হাতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা কাছে আসতেই ওরা অবাক হল। কারণ, তার চোখে-মুখে আতঙ্কের বিশ্রী ছাপ। ওদের দেখেই, বলল, কাইন্ডলি আমাকে একটা লিফট দেবেন?

লিফট দেওয়ার ব্যাপারে ওরা আপত্তির কিছু দেখেনি। কিন্তু ওদের তেলের দূরবস্থার কথা জানিয়েছিল। লোকটি সে-কথা শুনে অতি উৎসাহী হয়ে সুটকেস রেখে একটা ক্যান নিয়ে তেল আনতে ছুটল।

সে চলে যেতেই স্বাভাবিক কৌতূহলবশে নীলাদ্রি সুটকেসের কাছে এগিয়ে গেল। ওটা তুলতে চেষ্টা করল। তখনই ও বুঝল, সুটকেসটা প্রচণ্ড ভারী।

সুটকেসটা লক করা ছিল। কিন্তু একটু টানাটানি করতেই লকটা খুলে গেল। একমুহূর্তও দেরি না করে সুটকেসের ডালা খুলে ফেলল নীলাদ্রি। সঙ্গে-সঙ্গে চকচকে আলোর ছটায়

ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সুটকেসে সুন্দর করে সাজানো অনেকগুলো সোনার বিস্কুট।

তাড়াতাড়ি ডালাটা আবার কোনওরকমে আটকে দিয়েছিল ওরা।

লোকটা ফিরে এসে সুটকেস খোলার ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে পারল না। সুতরাং তেল ভরে গাড়ি যখন নতুন করে রওনা হল, তখন ওদের দুজনের মাথাতেই ঘুরছে একই চিন্তা — ভাগ্য ফেরানোর এমন সুযোগ ওরা বোধহয় আর পাবে না।

অতএব পায়রাডাঙ্গায় লোকটি যখন নামবে বলল, তখন নীলাদ্রি ও অরিসেন মনে-মনে একই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। মুহূর্তের মধ্যে ওরা হিংস্র নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই স্মাগলারের ওপরে। মিনিটকয়েক পর যখন ধস্তাধস্তি থামল তখন বুঝল লোকটাকে ওরা খুন করে ফেলেছে। সুতরাং, তার মৃতদেহটা রাস্তার ধারে আগাছার জঙ্গলে ফেলে দিয়ে সুটকেস নিয়ে ওরা উধাও হল।

এ-ঘটনার মাসদুয়েক পরে নীলাদ্রি ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। কীভাবে ওর হাতের আংটি অকুস্থলে খুলে পড়েছিল ও বুঝতে পারেনি। যেহেতু সোনা-ভরা সুটকেসটা ওকে বাঁচাতে হবে তাই খুনের দায় ও একা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিল। বিচারে ওর সাজা হল বারোবছর সশ্রম কারাদণ্ড। সাময়িক উত্তেজনাবশে খুনটি ঘটে যাওয়ায় মৃত্যুদণ্ড থেকে ও রেহাই পেয়েছিল। কিন্তু চোরাই সোনার কথা পুলিশ জানতে পারেনি। সেগুলো লুকোনো ছিল অরিসেনের কাছে।

এরপর দিন-মাস-বছর ঘুরতে সময় লাগেনি। ধীরে-ধীরে অরিসেনের অবস্থা গ্যাসভরা বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। ওদিকে জেলে বসে হাত কামড়েছে নীলাদ্রি। সোনার ব্যাপারটা ও না পেরেছে গিলতে, না পেরেছে ওগরাতে।

এইভাবে বছরদশেক কেটে যাওয়ার পর একদিন ছাড়া পেল নীলাদ্রি।

জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই ও খুঁজে বের করল প্রাণের বন্ধু অরিসেনকে। শুরু হল এতদিনের ক্রোধ আর ঘৃণার ফল—ব্ল্যাকমেইলিং। রক্তচোষা বাদুড়ের মতো চুষে-চুষে ও অরিসেনকে ক্রমশ ঝাঁঝরা করে তুলেছে। হঠাৎ-উত্তেজনায়-করে-বসা ভুলের মাশুল অরিসেন আজও শোধ করে চলেছে নীলাদ্রির কাছে।

চিন্তার ধোঁয়াটে জল ছিঁড়ে গিয়ে হঠাৎই বাস্তবে ফিরে এল অরি, জিগ্যেস করল, একটু হুইস্কি হবে?

হাসল নীলাদ্রি: তুই আমার বড় মক্কেল। তোকে হুইস্কি খাওয়াব না তো কাকে খাওয়াব?

উঠে গিয়ে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এল নীলাদ্রি। এনে টেবিলের ওপরে রাখল। গ্লাসে হুইস্কি ঢালা শেষ হতেই ওর পিছনের একটা ফটোর দিকে তাকানোর ভান করে চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল অরি, আরে, মেয়েটাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল নীলাদ্রি: কে? ও—। ওটা আমার ওয়াইফের ফটো। আমি জেলে থাকার সময়ে মারা গেছে।

আচমকা নীলাদ্রির স্বর ভারী হয়ে এল।

কিন্তু ওই একমুহূর্তের মধ্যেই নিজের কাজ সেরে ফেলেছে অরি। হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি উপুড় করে ম্যানডেক্স ট্যাবলেটের গুঁড়োটা পুরোটাই নীলাদ্রির গ্লাসে ঢেলে দিয়েছে ও। সুতরাং গ্লাসের হুইস্কিটুকু শেষ করেই ঝিমোতে শুরু করল নীলাদ্রি।

একটু পরেই ও কপাল চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করল অরিসেন।

প্রথমেই নীলাদ্রির জামার পকেট ক'টা হাতড়ে নিল...এ কী? নীলাদ্রির পকেটে তারই নাম লেখা একটা চিঠি! কী করে ওর পকেটে এল চিঠিটা? তা হলে কি পিয়ন ভুল করে অরিসেনের চিঠিটা নীলাদ্রির ঘরে দিয়ে গেছে? হতেও পারে। পাশাপাশি বাড়ি তো! (জেল ছাড়ার পর অরির পয়সায় অরিরই বাড়ির পাশে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল নীলাদ্রি—বোধহয় অরিকে চোখে-চোখে রাখার জন্য) একমুহূর্ত দেরি না করে চিঠিটা নিজের পকেটে চালান করল অরিসেন। তারপর নীলাদ্রির জামাকাপড় ঘেঁটে বিপজ্জনক আর কিছু পেল না।

এবার হুইস্কির গ্লাস দুটো তুলে নিয়ে ও গেল রান্নাঘরে। ওগুলো ভালো করে ধুয়ে-মুছে একটা গ্লাস তাকে তুলে দিল। তারপর নিঃশব্দে (কারণ, অরিসেন প্রথম থেকেই ঘরে মোজা পরে চলাফেরা করেছে, যাতে পুলিশ ঘরে ওর কোনওরকম পায়ের ছাপ না পায়) অন্য গ্লাসটা নিয়ে ফিরে এল বসবার ঘরে। গ্লাসটা টেবিলের ওপরে রেখে তাতে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে দিল। নির্জীব নীলাদ্রির ডানহাত অতি সন্তর্পণে চেপে আঁকড়ে ধরাল গ্লাসটার ওপরে—যাতে পুলিশ গ্লাসের গায়ে শুধু নীলাদ্রির হাতের ছাপই পায়।

এইবার পকেট থেকে একজোড়া দস্তানা বের করে পরে নিল অরিসেন। তারপর পকেটের সেই বিশেষ চিঠিটা ভাঁজ করে রাখল টেবিলের ওপরে—একপাশে। যাতে সহজেই লোকের নজরে পড়ে।

নীলাদ্রির অজ্ঞান দেহটা একবার পরীক্ষা করল অরি। নাঃ, ওর অনুমান ভুল নয়: নীলাদ্রি এখনও বেঁচে আছে। চটপট ওকে টানতে-টানতে রান্নাঘরে নিয়ে গেল ও। বসবার ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে তার ওপর নীলাদ্রিকে বসাল। তারপর চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল গ্যাসের উনুনের কাছে...।

রান্নাঘরের দৃশ্যসজ্জা শেষ হয়ে যেতেই অরিসেন শোওয়ার ঘর আর বসবার ঘর আঁতিপাঁতি করে খুঁজল। নীলাদ্রিকে ওর লেখা ব্যক্তিগত চিঠি থেকে শুরু করে অরিসেন নামাঙ্কিত যে-ক'টা কাগজ পেল সবক'টাই পকেটস্থ করল।

যখন ও নিশ্চিত হল যে, নীলাদ্রির সঙ্গে ওর সম্পর্ক আবিষ্কার করার কোনও নিশানাই ঘরে নেই তখন ও স্বস্তি পেল। পুলিশ যেন নীলাদ্রির সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে নিছক প্রতিবেশীর সম্পর্ক বলেই বিচার করে। কারণ, অ্যালিবাইয়ের ব্যাপারটা অরিসেন ঠিক পছন্দ করে না। অপরাধজগতে যদি চরম অনিশ্চিত কোনও ব্যাপার থাকে, তা ওই অ্যালিবাই। অ্যালিবাই জাল করলেও লোকে ধরা পড়ে। আবার সত্যি হলে তখন তার কোনও জুতসই সাক্ষী পাওয়া যায় না।

অরিও তাই করবে। বলবে, ও একা-একা গঙ্গার পাড়ে হাওয়া খাচ্ছিল! শুধু-শুধু একটা অ্যালিবাই তৈরি করতে গিয়ে ও নিজের বিপদ ডেকে আনতে চায় না। প্রতিবেশীর মৃত্যুর তদন্তে পুলিশের লোক হয়তো ওর কাছে আসবে—তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তবে সে নিছকই তদন্তের খাতিরে ছকবাঁধা প্রশ্নমালা।

সুতরাং, সবকিছু আরও একবার যাচাই করতে রান্নাঘরে ঢুকল অরিসেন। গ্যাসের উনুনের ভালভটা পুরোটা খুলে দিল। একপলক নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর নীলাদ্রির বাড়ির দরজা খুলে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। যাওয়ার আগে নীলাদ্রির পকেট হাতড়ে পাঁচটাকার বান্ডিলটা তুলে নিতে ভুলল না। এখন শুধু ভোরের অপেক্ষা।

অরির পরিকল্পনামাফিক যদি সবকিছু হয় তা হলে ময়না তদন্তের রিপোর্ট বলবে গ্যাসের উনুনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে নীলাদ্রি সেন। কারণ ম্যানডেক্সের পরিমাণ মাপমতোই ব্যবহার করেছে অরি—যাতে মানুষ মারা না যায়, অথচ ঘণ্টাকয়েকের জন্য অচেতন হয়ে পড়ে। সুতরাং, অজ্ঞান অবস্থাতেই নীলাদ্রির ফুসফুসে গ্যাসের কাজ শুরু হবে...তারপর...।

তিনদিন পর সন্ধেনাগাদ অরিসেন রায়ের দরজায় হঠাৎই টোকা পড়ল। দরজা খুলতেই অরিসেন এক যুবকের মুখোমুখি হল। অল্প বয়েস, পরনে পুলিশি পোশাক, সজীব চেহারা, কোমরে ঝোলানো আগ্নেয়াস্ত্র।

এরকম পরিস্থিতির জন্য নিজেকে এ ক'দিন ধরে প্রস্তুত করেছে অরি। সুতরাং বিন্দুমাত্রও অবাক না হয়ে ও সাগ্রহে তাকে ভেতরে আহ্বান জানাল, আসুন অফিসার, ভেতরে আসুন—। কী ব্যাপার বলুন তো?

অফিসার হাসলেন। সোফায় বসে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নীল ডায়েরি আর একটা চিঠি বের করলেন।

উৎকণ্ঠায় সোজা হয়ে বসল অরিসেন। কী ওটা? ডায়েরি না? কার ডায়েরি?

মিস্টার রায়, আপনি বোধহয় আপনার পাশের বাড়ির নীলাদ্রি সেনের ব্যাপারটা শুনেছেন?

হ্যাঁ, লোকজনের মুখে শুনেছি। খুব স্যাড ব্যাপার।

আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে আপনার কীরকম পরিচয় ছিল?

সামান্যই। ওই পাড়াপড়শির সঙ্গে যেমন পরিচয় থাকে আর কী!

দেখুন তো, এই ডায়েরিটা চিনতে পারেন কি না?—নীল ডায়েরিটা অরির দিকে এগিয়ে ধরলেন অফিসার।

অরির বুকটা ধক করে উঠল। ডানহাত নিজের অজান্তেই প্যান্টের পকেটের ওপর গিয়ে থামল। কারণ, সেদিন রাতে এরকমই একটা ডায়েরি ও পকেটে ভরেছিল। তখন খুলে পড়েও দেখেনি ওর ভেতরে কী লেখা ছিল। তা হলে কি শেষ পর্যন্ত মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ওটা? নাকি ভুল করে ফেলেই এসেছিল ও?

অরি হাত বাড়াল ডায়েরিটার দিকে। ওর গলা যেন হঠাৎ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ডায়েরিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেশ কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখল অরি। ডায়েরিটার ব্যাপারটা কি ও অস্বীকার করবে, নাকি...?

অফিসার তখন বলে চলেছেন, আর এই যে চিঠিটা—এটা মিস্টার সেনের ঠিকানায় এলেও আপনারই নামে লেখা। যে-পিয়োন সন্ধের ডাকে চিঠি দেয়, সে-ই ভুল করে যে এ-কাজটা করেছে সেটা আমরা জানতে পেরেছি। সে আরও বলেছে, গত বৃহস্পতিবার (যেদিন নীলাদ্রিকে ও খুন করেছে—ভাবল অরি) এরকম ভুল সে আরও একটা করেছে—মানে, আপনার চিঠি সেদিনও সে ভুল করে নীলাদ্রির ঠিকানায় দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সে-চিঠিটা আমরা তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাইনি। তা ছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে এক ভদ্রলোক কী যেন ব্যাবসার কাজে মিস্টার সেনকে ডাকতে গিয়ে দেখেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ—কোনও সাড়া নেই। পুলিশে খবরটা তিনিই দেন। আমরা গিয়ে যা দেখলাম...।

থামছেন কেন, অফিসার?—অধৈর্য হয়ে মনে-মনে বলল অরি। এ উৎকণ্ঠা আর সহ্য করতে পারছি না আমি, প্লিজ।

...তাতে অবাক হওয়ারই কথা। কারণ, রান্নাঘরের আলো জ্বলছে। বাড়ির খিড়কি দরজা খোলা, এবং গ্যাসের উনুনে মাথা গুঁজে পড়ে আছেন নীলাদ্রি সেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাতাম না, কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, মিস্টার সেন কিছুদিন আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন—তাই ঘরগুলো সার্চ করতে গিয়ে আমরা এই ডায়েরি আর চিচিটা পেলাম। ডায়েরিটায় মিস্টার সেনেরই নাম লেখা, কিন্তু এতে কোথাও তাঁর আত্মহত্যার ইচ্ছের কথা লেখা নেই—যেমন একটা চিঠিতে আমরা সে-ইচ্ছের কথা দেখেছি। তারপর...।

আপনার কি এভাবে না থামলেই চলছে না, অফিসার? প্রচণ্ড বিরক্তিভরে ভাবল অরি। কেন, এখন কি ওর কিছু একটা বলা দরকার? কিন্তু কাঁপা ঠোঁটে স্থির দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল অফিসারের মুখের দিকে।

...আমরা ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। আবার এ-ও হতে পারে, মিস্টার সেন হয়তো কোনও কারণে ডায়েরিতে সে-ইচ্ছের কথা লিখতে ভুলে গেছেন।

তার মানে? আর কী লেখা আছে এই হতচ্ছাড়া ডায়েরিটায়?—ভাবল অরিসেন।

কিন্তু সেসব ছাড়াও আর-একটা ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট অবাক হয়েছি। তাই ভাবলাম আপনি হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আমি ওই গ্যাসের উনুনটার কথা বলছি—মানে, ব্যাপারটা অনেকটা আত্মহত্যার মতোই ঠেকছে আমাদের কাছে...।

আমারও তাই ধারণা।—দৃঢ় স্বরে জবাব দিল অরিসেন।

কিন্তু সেখানেই তো গোলমালটা বাধছে।—অর্থপূর্ণ চোখে হাসলেন অফিসার: মিসটার সেনের টেবিলের ওপরে একবোতল হুইস্কি ছিল—আর একটা কাচের গ্লাস। গ্লাসে মিস্টার সেনেরই হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। জানি না, ওই হুইস্কি খাওয়ার জন্যেই...।

তা হলে কি কোনও গন্ডগোল হয়ে গেছে? আসল ব্যাপারটা লোকটা খুলে বলছে না কেন?

যাই হোক, হুইস্কির জন্যেই হোক, বা পাগলামির জন্যেই হোক, মিস্টার সেনের তখন জ্ঞান ছিল না। নইলে কোনও লোক কখনও সব জেনেশুনে গ্যাসের উনুনে মাথা দিতে পারে?

অরিসেনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তর দিতে দেরি করলেন না অফিসার, বললেন, কারণ, ওঁর তো অন্তত জানা উচিত ছিল যে, গত কয়েকদিন ধরে গ্যাসের লাইন খারাপ থাকায় ওঁর উনুনে কোনও গ্যাসই বেরোয় না! যাই হোক, মিস্টার সেন এখনও সে-রাতের ঘটনা আমাদের কিছুই বলতে পারছেন না। একেবারে বেবাক সবকিছু ভুলে বসে আছেন! তাই ভাবছি, ওর মেমারি লস হল কী কারণে?...ও কী মিস্টার রায়, কী হল আপনার...?

অফিসারের চোখের সামনেই চোখ উলটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অরি।

নাড়ি দেখলেন অফিসার। না—এতবড় আঘাতটা অরিসেন আর সামলে উঠতে পারেনি। পুলিশ ঠিকই অনুমান করেছিল, তাই একটা মিথ্যে গল্প ফাঁদতে হল গ্যাসের উনুন নিয়ে। কারণ, কোনও জোরালো প্রমাণ পুলিশের হাতে আসেনি—তাই একটা কনফেশানের দরকার ছিল। কিন্তু মিস্টার রায় যে হঠাৎ হার্টফেল করবেন সেটা অফিসার ভাবতে পারেননি। নাঃ, খুনিদের নার্ভ দেখছি খুব দুর্বল হয়—ভাবলেন তিনি।

অরি জানল না, নীলাদ্রি সত্যি-সত্যিই গ্যাসের উনুনে মাথা দিয়ে সেই রাতেই মারা গেছে!

নিঃসঙ্গ শঙ্খচূড়
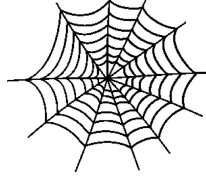
চিঠিটা পড়ে ছিল টেবিলেই। মিস সোম সেটা আর খুললেন না, খোলার প্রয়োজন ছিল না,অনেকদিনের আশঙ্কা আজ সত্যি হয়েছে। যে-খারাপ খবরটার জন্য এতদিন ধরে ভয় পেয়েছেন আজ সেই খবর বয়ে নিয়ে এসেছে চিঠিটা। ব্যাংক এবার তাঁর বাড়িটার দখল নেবে। কিন্তু দখল নিতে চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না! এটা তাঁর নিজের বাড়ি—এবং তাই-ই থাকবে। তাঁর হাতে যে ধার শোধ দেওয়ার মতো টাকা আছে তা নয়, তবে সোনাগয়না কিছু আছে। সেই সুন্দর জড়োয়া গয়নাগুলোই বাড়িটাকে বাঁচাবে।

সূক্ষ্ম কাজ করা মেহগনি কাঠের দেরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একটা টানা খুলে বের করলেন চোখধাঁধানো ঝিকমিকে জড়োয়া গয়নাগুলো। সেগুলো সযত্নে ভরে ফেললেন একটা ছোট্ট কালো ব্যাগে—পঞ্চাশহাজার টাকার গয়না। ‘দেখি, কী করে ওরা আমার বাড়ির দখল নেয়,’ ফিসফিস করে বললেন তিনি। জানলা দিয়ে দু-চোখ মেলে দিলেন বাইরে।

নীচের ঘাস-ছাওয়া লনে ঝরাপাতা হাওয়ায় উড়ে যায়, ঝোপের ফাঁকে উড়ে যায় ব্যস্ত চড়ুই, প্রায়-রিক্ত গাছের প্রশাখা থেকে ঝরে পড়ে নিঃসঙ্গ একটা হলুদ পাতা, তার বুকে হেমন্তের পরোয়ানা অদৃশ্য অক্ষরে লেখা।

মিস সোমের দৃষ্টি তখন অন্যমনস্ক। তাঁর মনোযোগ দেওয়াল-ঘড়ির বেজে চলা ঘণ্টার দিকে—ঘণ্টার শব্দ শুনছেন তিনি। অবশেষে সেই ছন্দোময় শব্দ থামল।

বেরোনোর সময় হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি এগোলেন দরজার দিকে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন।

নীচের বসবার ঘরে আলোছায়ার খেলা। একটা চেয়ারে পড়ে থাকা কাশ্মীরি শালটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। হেমন্ত মানেই শীতের পূর্বাভাস। দুঃসময়ের ইশারা।

বসবার ঘরের আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন মিস সোম। আয়নার অন্ধকার দিঘিতে ভাসছে তাঁর ফরসা মুখ। সে-মুখের বয়েস এই মুহূর্তে যেন তিরিশবছর কমে গেছে। অনেক, অনেক দিন আগে, যখন দেওয়ালের লাগোয়া আইভি গাছটা এই এতটুকু ছিল, তখন তাঁর মুখের ছায়া আয়নায় এমনটিই দেখাত। এখন সেই আইভি গাছ গোটা বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরেছে, ছেয়ে গেছে সারা দেওয়ালে।

বাহান্ন বছরের মিস সোম তাঁর বাইশ বছরের প্রতিবিম্বের প্রশংসা করলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রত্যাশিত শব্দটা শুনতে পেলেন।

ঢং।

এ-বাড়ির প্রাচীন দেওয়াল-ঘড়িতে পনেরোমিনিট অন্তর-অন্তর ঘণ্টা বাজে। কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে সদর দরজা খুলে বাইরে এলেন। ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে সদর দরজায় তালা দিলেন। সিঁড়ি নেমে এসে দাঁড়ালেন ঝরাপাতা ছাওয়া লনে।

রাস্তায় পা দিতেই একটা খালি ট্যাক্সি চোখে পড়ল। ড্রাইভার গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি টানছিল। মিস সোম ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বিড়িটা ফেলে দিয়ে মিটার ডাউন করল। তারপর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে ধরল। ছোট্ট ব্যাগটাকে দু-হাতে শক্ত করে ধরে ট্যাক্সিতে উঠলেন তিনি। ড্রাইভার নিজের আসনে বসতেই মিস সোম বললেন, 'রেল স্টেশান।'

স্টেশনের বাইরে সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ডের কাছে ট্যাক্সি এসে থামল। ড্রাইভার নেমে পিছনের দরজা খুলে ধরে মিস সোমকে নামতে সাহায্য করল। তিনি তখনও কালো ব্যাগটাকে বুকে আঁকড়ে আছেন। ভাড়া নেওয়ার পর মিটার তুলতে-তুলতে ড্রাইভার ভাবল, বুড়ির ব্যাগের ভেতর ক'লাখ টাকা আছে কে জানে।

মিনিটদশেক পরেই একটা ট্রেন হাঁপাতে-হাঁপাতে স্টেশনে এসে ঢুকল। টিকিট কাটাই ছিল। কামরায় উঠে জানলার ধারে একটা সিট পেলেন মিস সোম। আয়েস করে বসে কালো ব্যাগটাকে কোলের ওপরে রাখলেন, আঁকড়ে ধরে রইলেন দু-হাতে। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণে কামরার অন্য যাত্রীরা একটু অবাক হল। তাঁরা মুখ টিপে হাসতেও লাগল —তবে একজন বাদে। এই 'একজন' মিস সোমের সঙ্গেই ট্রেনে উঠেছে—একই স্টেশন থেকে। ছেলেটির বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরনে সাধারণ পরিষ্কার পোশাক। ট্রেন ছাড়তেই সে নিজের সিট ছেড়ে মিস সোমের পাশে গিয়ে বসল।

বৃদ্ধা ঘুরে তাকাতেই যুবকটি হাসল—সরল হাসি। উত্তরে ভদ্রতাবশে হাসলেন মিস সোম, এবং আবহাওয়া এবং ট্রেন-লেট-এর ব্যাপার নিয়ে দু-চারটে কথাও বললেন।

'এর মধ্যেই বেশ শীত পড়ে গেছে। গতবার এ সময়ে তো রীতিমতো গরম ছিল।' কথাপ্রসঙ্গে বলল যুবকটি।

'কিন্তু এ সময়টা বেশ ভালো লাগে। ঠিক শীতও নয়, অথচ শীত-শীত আমেজ।' খুশিমাখা গলায় বললেন মিস সোম।

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল যুবক। ট্রেন তখন ছুটে চলেছে ধু-ধু প্রান্তর চিরে।

গোধুলি পা বাড়ায় সন্ধের দিকে। প্রকৃতির শীত নিবারণ করতে ক্রমে কালো কোট হাতে এগিয়ে আসে রাত। কখনও পাহাড়, কখনও বুড়ো গাছ দুরন্ত গতিতে জানলার পাশ দিয়ে ছুটে যায়। ট্রেন সুষম ছন্দে দোলে এপাশ-ওপাশ। শোনা যায় ইঞ্জিনের মিষ্টি গম্ভীর হুইসল-এর শব্দ।

একইসঙ্গে মিস সোমের ক্লান্ত শরীর দুলতে লাগল। চোখ বুজে এল। কোলের ওপরে রাখা কালো ব্যাগের ওপর শিথিল হয়ে এল হাতের বাঁধন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আচমকা সোজা হয়ে বসলেন তিনি। ব্যাগটা শক্ত হাতে চেপে ধরে চকিতে চারপাশে তাকালেন। যাত্রীদের দেখলেন, দেখলেন পাশে বসা যুবকটিকে। সে তখন জানলা দিয়ে বাইরের ছায়া-অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে।

পরক্ষণেই তাঁর দিকে ঘুরে তাকাল যুবকটি। হাসি মুখে বলল, 'ঘুম পেয়ে থাকলে ঘুমিয়ে নিন না—আপনাকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

সর্বনাশ! তা হলে ছেলেটা দেখেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

‘না, না ঘুম পায়নি। হঠাৎই কেমন একটা ঝিমুনি এসেছিল। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়াটা আমার ঠিক হয়নি।’ মিস সোমের স্বরে ভদ্রতা মেশানো লজ্জা।

‘তাতে কী হয়েছে।’ হাসিমুখেই বলল যুবক, ‘কোথায় নামবেন আপনি?’

‘রূপনগর।’

‘আমিও ওখানেই নামব।’

কাকতালীয়?

রাত নেমেছে। দূরে ছুটে চলা আলোর বিন্দু মাঝে-মাঝে আঁধারে হারিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। মিস সোম আনমনা হয়ে পড়েন।

তাঁর চমক ভাঙে যুবকের কথায়।

‘রূপনগরে কোথায় যাবেন?’

‘স্টেশানের কাছাকাছি—’ ব্যাংকে যাব সে-কথা বলা ঠিক হবে না।

‘আত্মীয়ের বাড়ি?’

এত প্রশ্নও করতে পারে ছেলেটা?

‘না, একটা জরুরি কাজে।’ কালো ব্যাগের ওপর শক্ত হল মিস সোমের হাত।

ট্রেন থামল রূপনগরে।

যাত্রীরা ধাক্কাধাক্কি করে এগোল দরজার দিকে।

হুড়োহুড়ির মধ্যে নিজেকে, গায়ের চাদর, না কালো ব্যাগ, এই তিনটের মধ্যে কোনটা আগে সামলাবেন ভেবে পাচ্ছিলন না মিস সোম। সেই যুবকটি এগিয়ে এল তাঁকে উদ্ধার করতে, দিন না, ব্যাগটা আমি ধরছি।’

দ্বিধা। কিন্তু সে মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য।

তারপর ব্যাগটা যুবকটির হাতে তুলে দিয়ে গায়ের চাদর সামলাতে-সামলাতে ট্রেন থেকে নামলেন মিস সোম।

তাঁর খোটখাটো ভঙ্গুর শরীর নিয়ে সবার শেষে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে হেরে গেছেন প্রতিযোগিতায়। এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি পরপোকারী যুবকটির আশায় আশেপাশে তাকালেন। কিন্তু হতাশ হলেন।

কারণ যুবকটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হতবুদ্ধি চোখে অন্য যাত্রীদের ক্রমশ চলে যেতে দেখলেন মিস সোম। হুইসল দিয়ে ছেড়ে গেল ট্রেন, এবং অকস্মাৎ দু-হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। এক বিকৃত কান্নার চিৎকার বেরিয়ে এল তাঁর ঠোঁট চিরে।

প্ল্যাটফর্মে তখনও কাছাকাছি যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন সে-চিৎকারে চমকে উঠলেন। একজন দুজন করে ভিড় জমে গেল মিস সোমের চারপাশে। অসংখ্য প্রশ্ন তাঁকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল।

মিস সোম তখন ডাক ছেড়ে কাঁদছেন। তাঁর কান্নামেশানো গলায় উত্তরটা অস্পষ্ট হয়ে গেল। জনতা নানান আলোচনা করতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে সংবিত ফিরে পেলেন মিস সোম। বললেন, ‘আমার গয়না! পঞ্চাশহাজার টাকার গয়না! ওঃ—।’

চোখ মুছলেন তিনি: নামার সময় একটা ছেলেকে গয়নার ব্যাগটা ধরতে দিয়েছিলাম। সে ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

অতএব পরিণতি পুলিশ।

কিছুক্ষণের মধ্যে রেলপুলিশের একজন অফিসার ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। কৌতূহলী জনতাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর মিস সোমকে লক্ষ করে বললেন, 'আসুন, স্টেশনমাস্টারের ঘরে আসুন।'

স্টেশনমাস্টারের ঘরে তাঁকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। না, সেই যুবকটিকে মিস সোম চেনেন না, তার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, গায়ের রং ফরসা, হাসিটা মিষ্টি।

এর বেশি মিস সোমের কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারলেন না অফিসার। তারপর দুজন কৌতূহলী সহযাত্রীর জবানবন্দিও নিলেন তিনি। কিন্তু সেরকম কোনও সূত্র পাওয়া গেল না।

অবশেষে মাথা নাড়লেন অফিসার: 'আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব, মিস সোম। কিন্তু এগোনোর মতো তেমন কোনও ক্লু আপনি দিতে পারলেন না। আপনার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার রেখে যান। কোনও খোঁজ পেলেই জানাব।' একটু থেমে অফিসার আবার বললেন, 'কিন্তু যা-ই বলুন অতগুলো গয়না নিয়ে এভাবে বেরোনো আপনার ঠিক হয়নি।'

'কী করব? উপায় ছিল না। আমি গয়নাগুলো বিক্রি করতে এসেছিলাম। সেই বিক্রির টাকা দিয়ে ব্যাংকের ধার শোধ করতাম—ওদের কাছে আমার বাড়িটা মর্টগেজ দেওয়া আছে। ধার শোধের জন্যে ওরা আমাকে লাস্ট একমাসের নোটিশ দিয়েছে।'

'যাকগে, মন খারাপ করবেন না,' সান্ত্বনার সুরে বললেন অফিসার, 'মনে হয় দু-চার দিনের মধ্যে আপনার গয়নার খোঁজ পাওয়া যাবে।'

আলোচনা শেষের ইশারা পেয়েও মিস সোম দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণ জানতে সপ্রশ্ন হল অফিসারের দৃষ্টি।

'আমার কাছে বাড়ি ফেরার পয়সাও নেই।' লজ্জা-মেশানো নীচু গলায় বললেন মিস সোম।

'ওহ-হো, আমার তো খেয়ালই ছিল না।' তিনি ঘুরে তাকালেন স্টেশনমাস্টারের দিকে। স্টেশনমাস্টার আলোচনা সবই শুনেছেন। তিনিই মিস সোমের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ফিরতি গাড়িতে মিস সোমকে ট্রেনে তুলে দিলেন অফিসার। মিস সোম তখনও আপনমনে বিড়বিড় করছেন, 'এত চমৎকার ছেলেটা। কে বলবে তার মনে এই ছিল।'

মিস সোমের গয়না গেল, সেইসঙ্গে বাড়িটাও। তাঁর চোখে জল এল আবার। অফিসার তখনও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'মনখারাপ করবেন না। আপনার গয়না ঠিকই ফিরে পাবেন।'

সবুজ ঘাসের লনে ঝরাপাতার শব্দ, রাতের বাতাস তাদের চঞ্চল করে করে তুলেছে। বিশাল বাড়িটা অন্ধকার—চুপচাপ।

সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন মিস সোম। দরজা বন্ধ করলেন। বিশাল দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে ক্লান্তিকর ছন্দে: টিক-টিক-টিক।

আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই চেয়ারের পাশে রাখা টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলে উঠল। চেয়ারে বসে থাকা পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবকটি, ট্রেনে মিস সোমের ব্যাগটা যে সরিয়েছিল, হাসল মিষ্টি হাসি।

গায়ের চাদর নামিয়ে দিয়ে মিস সোম বললেন, 'সেকি, এর মধ্যেই তুই ফিরে এসেছিস, তুষার?'

'ট্রেনের হাজার চাকার চেয়ে চারচাকা জোরে ছোটে,' তুষার উত্তর দিল, 'তা রূপনগরে কেমন কাটল?'

'দারুণ। ঠিক প্ল্যান মতো সবকিছু হয়েছে। রেলপুলিশের আদিখ্যেতা আর ধরে না। আমার ফেরার টিকিটের ব্যবস্থা করে অফিসার নিজে আমাকে ফিরতি ট্রেনে তুলে দিয়েছে। বলেছে, তোকে ধরবার জন্য দারুণ চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু কোনওদিনই পারবে না।' তুষার শব্দ করে হাসল।

'যা চেহারার বর্ণনা দিয়েছি তা দিয়ে তো নয়ই।' বৃদ্ধা হাসিমুখে বললেন, 'ওঃ, পুরো ব্যাপারটা কী সহজ! ভীষণ সোজা, নারে, তুষার?'

'তা সত্যি, তরুপিসি। তোমার মতো একজন সরল নিষ্পাপ বুড়িকে দেখে যে-কেউই ঠকত—ওই অফিসার তো দূরের কথা।'

বিজয়ীর হাসি হাসলেন তরুলতা সোম। তারপর এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা কালো ব্যাগটা তুলে নিলেন। ব্যাগটা টেবিলে তুষারই রেখেছিল। তিনি বললেন, 'আহা রে আমার সোনার গয়না! তোদের ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি?' ব্যাগটা বলিরেখাময় গালে চেপে ধরলেন তিনি। চোখ বুজে বললেন, 'এখন ওই ইনশিওরেন্সের টাকাটা—।'

'পঞ্চাশহাজার টাকা,' বলল তুষার, 'অনেক টাকা।'

'ব্যাংকের ধার শোধ দিয়েও অনেক থাকবে। তিনি ইনশিওরেন্স কোম্পানি আবার সন্দেহ করে বসবে না তো?'

'করলে করুক, কিন্তু টাকা না দিয়ে ওদের পথ থাকবে না।' সহজ সুরে বলল তুষার 'অনিচ্ছে থাকলেও হাসিমুখে ওরা এসে টাকাটা তোমাকে গুনে-গুনে দিয়ে যাবে।'

'হুঁ, তা দেবে।' বৃদ্ধা হাসলেন। ব্যাগ খুলে একটা-একটা করে গয়না টেবিলে রাখলেন: 'কী দারুণ গয়নাগুলো! প্রাণ থাকতে এগুলো বিক্রি করা যায়!'

'সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই, তবে আমার পছন্দ মালটিচ্যালেন টিভি।'

'তা ঠিক। যার পছন্দ তার কাছে। কিন্তু এটা দ্যাখ।' একটা পাথর বসানো অপূর্ব ব্রেসলেট তুলে ধরলেন বৃদ্ধা।

'মালটিচ্যানেল টিভি এবং ক্যাশ টাকা।' তুষার বলে চলল।

'টিভি তো এই সেদিন কিনেছিস।' মনে করিয়ে দিলেন তরুলতা সোম: 'আর ক্যাশ টাকা? সে তো সময় হলেই আসবে। আমি আর ক'বছর আছি, বল?'

'ক'বছর?' তুষার মাথা নাড়ল, 'অদ্দিন কে অপেক্ষা করবে! তা ছাড়া তোমার এই গয়না চুরি করে ইনশিওরেন্স কোম্পানিকে ঠকানোর প্ল্যানটাও তো আমারই, তরুপিসি।

আমি না থাকলে কী করে—।’

‘হ্যাঁ, তুই না থাকলে, তোর মদ-জুয়া-পয়সা ওড়ানোর বদ নেশা না থাকলে, আজ আমি যা করলাম তা আমাকে করতে হত না।’ কঠিন স্বরে মুখিয়ে উঠলেন তরুলতা সোম, ‘তোর মতো লোভী অকৃতজ্ঞ আমি দুটি দেখিনি।’

‘হ্যাঁ লোভী,’ স্বীকার করল তুষার, ‘এবং চালাক।’ হেসে যোগ করল ও, ‘এরকম স্বভাব আমি কার কাছ থেকে পেলাম তাই ভাবছি।’

ব্রেসলেটটা ব্যাগে ভরে রাখলেন বৃদ্ধা, সেইসঙ্গে গয়নাগুলোও। তারপর ফিরে তাকালেন ভাইপোর দিকে।

‘কত চাস?’

‘এই তো আমার লক্ষ্মী পিসি। না, বেশি লোভ করব না। ইনশিওরেন্সের হাফ টাকা হলেই চলবে।’

‘আর বাকি হাফ আমি মারা গেলে পর। গয়নাগাটি আর বাড়িটার কথা তো বাদই দিলাম। হুম। তা ইনশিওরেন্স কোম্পানি টাকাটা দেওয়া পর্যন্ত তো অপেক্ষা করবি, নাকি?’

‘ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করব!’ দাঁত বের করে হাসল তুষার।

ওকে বসিয়ে রেখে দেরাজে গয়নাগুলো তুলে রাখতে গেলেন মিস সোম, গজগজ করতে লাগলেন আপনমনে, ‘লোভের একটা সীমা থাকা দরকার, লোভের একটা...।’

আধঘণ্টা বাদে তিনি তুষারকে ডাকলেন রান্নাঘরে। খেতে। তিনি নিজে শুধু চা খেলেন।

‘এখনও রাগ পড়েনি, তরুপিসি?’ হেসে জানতে চাইল তুষার, ‘নাও, একটা টোস্ট অন্তত খাও।’

‘খিদে নেই।’ বলে তুষারের গোগ্রাসে খাওয়া দেখতে লাগলেন মিস সোম।

লোভী এবং চালাক। বড্ড বেশি লোভ, তবে সেই অনুপাতে ততটা চালাক নয়, ভাবলেন তিনি, মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

তুষার ভাবল, ‘পিসিটা আমার মন্দ নয়। টাকাটা-পয়সাটা চাইলে রাগ করে বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আবার রাগ পড়ে যায়।’ তারপর মালকড়ি দিয়ে দেয়।

দেওয়াল-ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ হল।

তুষারের খাওয়া শেষ হয়ে আসে। পাঁউরুটি সে পছন্দ করে, মিষ্টি খেতেও ভালোবাসে, মাখনও তার প্রিয়। যেটা সে পছন্দ করে না সেটা তার তরুপিসি মাখনের সঙ্গে যত্ন করে মিশিয়ে দিয়েছেন—সেঁকো বিষ।

অশ্লীল-বিলাস

বড় রাস্তার ওপরেই দোকানটা। ফুটপাথ থেকে তিনটে ধাপ উঠে গেছে দোকানের কার্পেট পাতা মেঝে পর্যন্ত। বিশাল দরজা। দু-পাশের দ্রষ্টব্য শো-কেসে সাজানো রঙিন প্রচ্ছদের দেশি-বিদেশি বই। দরজার ওপরে মস্ত সাইনবোর্ডে। এবং তাতে মস্ত-মস্ত অক্ষরে লেখা, 'যোশি বুক শপ।' সাইনবোর্ডের চটকদার রং যে-কোনও কালার-ব্লাইন্ড লোককেও দোকানের কাছে টেনে আনবে।

মালিক মিস্টার যোশির নামটা কোন অক্ষর দিয়ে শুরু হবে ভাবতে-ভাবতে দোকানে ঢুকলাম। দোকানের ভেতরে আলো রেস্তোরাঁগোছের—বিশাল কিন্তু প্রায় টিমটিমে কয়েকটি ঘষা কাচের গ্লোব সিলিং থেকে ঝুলছে। দোকানের র‍্যাকগুলো বিভিন্ন ধরনের বইয়ে ('ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট' থেকে শুরু করে 'ফ্রয়েড' পর্যন্ত) ঠাসা। ভেতরে কোনও খদ্দের নজরে পড়ল না। তা ছাড়া বেলা বারোটায় এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে কে-ই বা বই কিনতে বেরুবে! অবশ্য বই কিনতে আমিও বেরোইনি—।

যথেষ্ট খোঁজাখুঁজির পর একটা বইয়ের র‍্যাকের পেছনে 'লুকিয়ে' বসে থাকা জনৈক প্রৌঢ়কে আবিষ্কার করলাম। তার সামনে একটা টেবিলে বিভিন্ন কাগজপত্র—এমন কি খবরের কাগজ পর্যন্ত—ছড়ানো। টেবিলের কাছাকাছি আর কোনও চেয়ার নেই। সুতরাং আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

তিনি তখন ফোনে কথা বলছেন।

'হ্যাঁ—কবে মারা গেছেন খোঁজটা নাও। আর ঠিকানাটা আমাকে বলো—লিখে নিই।'

উত্তরে সম্ভবত ঠিকানাটাই শোনা গেল, কারণ উনি খসখস করে একটা সাদা কাগজে কী যেন লিখে নিলেন। তারপর বারকয়েক 'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তাকালেন আমার দিকে।

প্রথমে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার সাদা গোঁফ, পেটানো শরীর। তারপর চোখ নেমে এল আমার হাতে ধরা রুপোবাঁধানো লাঠিটার দিকে।

আমিও তাঁর চশমা, টাক, ঈগল-নাক, থ্যাবড়া থুতনি, চঞ্চল কণ্ঠা ইত্যাদি জরিপ করে তাকালাম অস্থির, ধুরন্ধর চোখজোড়ার দিকে।

আমার সাহেবি পোশাক দেখেই তিনি বোধহয় কিছুটা আশান্বিত হলেন। বিগলিত স্বরে বললেন, 'বলুন স্যার, কী চাই?'

সামনের ছড়ানো কাগজগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তুষার-মানব দেখার মতো বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার গোঁফজোড়া দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ একচোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'মিস্টার যোশি?'

'হ্যাঁ, আমিই যোশি—বিলাস যোশি।'

'ও।' সত্যি কথা বলতে কী, এই বিলাস যোশিকে পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় বইয়ের দোকানের মালিক বলে কল্পনা করতে আমার বেশ কষ্ট হল: 'আমার নাম সেনবর্মা—প্রকাশ সেনবর্মা।'

'বলুন মিস্টার সেনবর্মা, কী বই চাই আপনার?'

'ও, আপনি দেখছি "সেনবর্মা" পদবিটা বেমালুম ভুলেই গেছেন!'

'তা—তার মানে?' চোখ থেকে সরু ফ্রেমের চশমাটা নামিয়ে উৎসুকভাবে তাকালেন বিলাস যোশি: 'না, নামটাতো ঠিক মনে পড়ছে না। সেনবর্মা? উঁহু, এ নামে কাউকে তো চিনি না।'

'তাই নাকি?' হাতের লাঠিটা বগলে পাচার করে পকেটে হাত ঢোকালাম। একটা মুখ ছেঁড়া সাদা খাম বের করে তার ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করলাম। কাগজটা একপলক দেখে ছুড়ে দিলাম টেবিলের ওপরে।

'দেখুন—এবার হয়তো মনে পড়বে।'

বিলাস যোশি চশমাটা নাকে লাগিয়ে তড়িঘড়ি আবার চেয়ারে বসলেন। হাতে নিলেন কাগজটা। কঠিন দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে সশব্দে নাক টানলেন।

'হুম—' কাগজটা গভীরভাবে দেখতে লাগলেন তিনি: 'এটা দেখছি একটা বিল।... আপনি হয়তো জানেন না, মিস্টার সেনবর্মা, আমি সাধারণত পোস্টেই খদ্দেরদের বইপত্তর পাঠিয়ে থাকি। তাদের অনেকের সঙ্গে আমার সামনাসামনি কোনও আলাপ নেই। তাই—' বিলের ওপর লেখা নামটা তিনি বিড়বিড় করে পড়লেন, 'প্রফেসর সুরপতি সেনবর্মা। ছয়ের তিন, গোলক মিত্র রোড। কলকাতা বারো। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে—।'

'তা পড়বারই কথা। স্বর্গীয় ডক্টর সুরপতি সেনবর্মা আমার বড় ভাই ছিলেন। তিনি—মারা গেছেন।'

'ডক্টর সেনবর্মা মারা গেছেন?' ভীষণ অবাক হওয়ার ভান করল বিলাস যোশি 'সেইজন্যেই বোধহয় শেষ কয়েকটা চিঠির জবাব পাইনি। কিন্তু আপনারা তো আমাকে তাঁর মারা যাওয়ার খবরটা অন্তত জানাতে পারতেন...।'

'পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই জানাইনি।' রূঢ় স্বরে জবাব দিলাম, 'কারণ আপনি হয়তো ভুল করে এই বিলটা পাঠিয়েছেন। আমার দাদা কোনওদিন এ ধরনের বইয়ের জন্যে অর্ডার পাঠাননি, আর কেনেনওনি। তা ছাড়া তাঁর লাইব্রেরি ঘেঁটেও আমরা এসব বইয়ের একটা কপিও খুঁজে পাইনি।'

বিলে লেখা বইয়ের লম্বা লিস্টটার ওপরে চোখ চালিয়ে বিলাস যোশি 'হুম' করে একটা শব্দ করলেন। তারপর অস্বস্তিতে কাশলেন বারকয়েক: 'মিস্টার সেনবর্মা, বইগুলো আমি সত্যিই পাঠিয়েছি। সুরপতিবাবু বইগুলো পেয়েছেন জানিয়ে আমাকে চিঠিও দেন। কিন্তু দামটা পেতে দেরি হওয়ায় আমি বেশ কয়েকটা রিমাইন্ডার তাঁকে দিই। অথচ কোনও রিপ্লাই পাইনি। তাই এই লাস্ট চিঠিটায় আমি রিমাইন্ডার বলে ভয় দেখিয়ে বিলটা পাঠিয়েছি—মাত্র সাতশো টাকার।'

এবার 'হুম' শব্দটা বলার পালা আমার।

আমাকে বিলাস যোশি বলতে লাগলেন, 'দাঁড়ান, আমি খাতা-পত্র দেখে আপনাকে কারেন্ট পজিশানটা জানাচ্ছি।' পাশের শেলফ থেকে একটা মোটা বিধ্বস্ত ফাইল বের করলেন তিনি:'সেনবর্মা—কিউ, আর, এস—এই তো!'

'অতসব ফাইল ঘাঁটাঘাঁটির কোনও দরকার নেই।' ঠান্ডা গলায় বিলাস যোশির উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢেলে দিলাম, বললাম, 'আপনার কোথাও একটা ভুল হয়েছে। আর ভুলটা একটু পিকিউলিয়ারও বটে। সুতরাং, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল আর না হয়, সে বিষয়ে আমি আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি। যদি আপনি এই ছবির বইয়ের নোংরা ব্যাবসা চালিয়ে যেতে চান, চালিয়ে যান—আমি বাধা দেব না। কিন্তু তাই বলে—।'

বিলাস যোশি বারকয়েক মাথা নাড়লেন, হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে: 'মিস্টার সেনবর্মা, আপনার কথার ওপরে কথা বলা ঠিক নয়। তা ছাড়া খদ্দের হল গিয়ে লক্ষ্মী। কোনও খদ্দেরের পছন্দ নিয়ে সমালোচনা করা আমার কাজ নয়। তা হলে আমাকে বইয়ের দোকান তুলে দিয়ে তেলেভাজার দোকান দিতে হয়। সে যাক, আমি শুধু এটুকু জানি, এই ঠিকানা থেকে...' আঙুল দিয়ে বিলটার ওপর ঠোকর মারলেন বিলাস যোশি: '...এই বইগুলো চেয়ে মিস্টার সেনবর্মা নামে একজন আমাকে অর্ডার পাঠান। এবং গত পনেরোই ডিসেম্বর বইগুলো আমি ওই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই। তারপর বইগুলোর কী হয়েছে না হয়েছে তা আমার জানার কথা নয়, আর জানতেও চাই না। তবে এটা তো বুঝতেই পারছেন যে, এসব বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খোলা জায়গায় ফেলে রাখার বই নয়। সাধারণত লুকিয়ে দেখা এবং রাখার জন্যেই এ বইয়ের জন্ম।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন বিলাস যোশি: 'তবে আমি জানতাম না আপনার দাদা মারা গেছেন—জানলে এ-চিঠি আর বিল এভাবে পাঠাতাম না। আই অ্যাম সরি, মিস্টার সেনবর্মা।'

'আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে আমিও কম দুঃখিত নই।' আমার কণ্ঠস্বরে দুঃখের লেশমাত্র নেই। কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠলাম, 'আপনি এখনও বলছেন প্রফেসর সেনবর্মা নিজে এসব বাজে বইয়ের অর্ডার দিয়েছিলেন? আপনার সাহস তো কম নয়! আপনি জানেন, আমার দাদা...?'

'উত্তেজিত হবেন না, স্যার।' দু-হাত তুলে মোলায়েম স্বরে আমাকে বাধা দিলেন বিলাস যোশি: 'আমাকেও কথা বলার একটু সুযোগ দিন। আপনি কী করে এত শিওর হচ্ছেন যে, আপনার দাদা এসব বইয়ের অর্ডার দিতে পারেন না? পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষই না রয়েছে। ফ্রয়েড বলে গেছেন...।'

'থামুন!' গর্জে উঠলাম আমি, 'ঢের ন্যাকামো হয়েছে, স্কাউন্ড্রেল কোথাকার!'

'আপনিও স্যার ন্যাকামো কিছু কম করছেন না।' সরল মুখে মন্তব্য করলেন বিলাস যোশি, 'আপনার দাদার চরিত্র জানতে আমার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই। আমি শুধু জানি, মাল যখন পাঠিয়েছি তখন তার দাম আমার পাওনা। আমি গরিব মানুষ। এই দোকান থেকেই আমার সংসার চলে। সুতরাং যদি কোনও খদ্দের আমাকে ফাঁকি দেয়, তা হলে—।'

'ফাঁকি? কীসের ফাঁকি? আপনাকে কতবার বলব এসব বই একটাও আমার দাদা কেনেননি।'

বিলাস যোশি ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করলেন, 'আপনি যে খুব ভদ্র ব্যবহার করছেন সেটা বলতে পারছি না বলে দুঃখিত, মিস্টার সেনবর্মা। এই বিলের টাকা বহুদিন বাকি থাকা সত্ত্বেও আমি কোনওরকম কেসকামারি করিনি। কারণ, আমি জানি, এ ধরনের বইয়ের

ক্যাচাল একবার চাউর হলে আমার খদ্দেরদের সুনাম নিয়ে টানাটানি হবে। তা ছাড়া শুধু আপনার দাদাই নন, এরকম অনেক খদ্দেরই আমার আছে। তাদের নামধাম আমি সবসময় গোপন রাখার চেষ্টা করি—।'

'তা হলে দাদার লেখা চিঠিগুলো আমাকে দেখান।'

আমার শান্ত স্বরে বিলাস যোশি একটু অবাক হলেন। বললেন, 'এবার আমাকে হাসালেন। কারণ, এটুকু আপনার বোঝা উচিত, এমন কোনও জিনিস আমি দোকানে রাখি না যাতে আমার খদ্দেরদের মানসম্মান নিয়ে টানাটানি হয়। তা ছাড়া এ-ব্যবসায় সিক্রেসিই হল ক্যাপিটাল। অবশ্য চালানের কার্বন কপিটা আমি আপনাকে দেখাতে পারি। আমার মনে হয়, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না।'

'উহুঁ, আপনাকে বুঝতে আমার এতটুকুও ভুল হয়নি।' আমাকে হাসতে দেখে আবারও অবাক হলেন বিলাস যোশি: 'এবং ভুল হয়নি বলেই এই মুহূর্তে আপনার কোমল শরীরে কিঞ্চিৎ লাঠ্যোïষধ প্রয়োগ করতে আমি উদগ্রীব।'

আমার বক্তব্যের গূঢ় অর্থ যতটা না কথায় তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেল আমার লাঠি বাগিয়ে ধরার ভঙ্গিতে।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন বিলাস যোশি। একহাতে তুলে নিলেন টেলিফোনের রিসিভার এবং তাঁর অন্য হাতে মুহূর্তের মধ্যেই গজিয়ে উঠল একটা ০.৪৫৭ লুগার অটোমেটিক।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলেন বিলাস যোশি: 'আপনি বোধহয় এটাই চাইছিলেন, তাই না? কিন্তু এখন আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এতক্ষণ ধরে ঢের আমড়াগাছি হয়েছে—আর নয়।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই শুনলাম, তিনি পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে একজন অফিসারকে জরুরি স্বরে ডেকে পাঠালেন, তারপর বললেন, 'আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি, তবে একটি শর্তে। আপনাকে কথা দিতে হবে যে, আমার পাওনা টাকা আমাকে মিটিয়ে দেবেন। আর ভবিষ্যতে দোকানে এসে এ ধরনের অসভ্যতা করবেন না। আর তা যদি না চান, তবে একজন পুলিশ অফিসারের জন্যেই ওয়েট করুন—।'

শক্ত মুঠোয় লাঠিটা চেপে ধরে জবাব দিলাম, 'আমার মনে হয় অফিসারের জন্যে ওয়েট করাটাই ঠিক হবে। পুলিশকে আমিও বলব আপনার কাল্পনিক খদ্দেরদের কথা! দেখি, আমাকে বিলটা দিন—।'

বিলাস যোশি টেবিলে রাখা বিলটার দিকে তাকালেন।

ওই একটা মুহূর্ত আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বিদ্যুৎঝলকের মতো আমার হাতের লাঠিটা আছড়ে পড়ল বিলাস যোশির রিভলভার ধরা হাতের কবজির ওপর। লুগারটা সশব্দে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। পলকের মধ্যে ওটাকে বুট দিয়ে চেপে ধরলাম। বললাম, 'প্ল্যানটা আপনার নেহাত কাঁচা নয়, মিস্টার যোশি। মারা যাওয়া লোকজনের আত্মীয়রা কে-ই বা চায় যে, এসব অশ্লীল বইয়ের ব্যাপারস্যাপার লোকজানাজানি হোক! সুতরাং খবরের কাগজের শোক সংবাদ এবং চ্যালাদের পাঠানো মৃত্যুর খবরগুলো পাওয়ামাত্রই আপনি কতকগুলো কাল্পনিক বইয়ের নাম করে একটা বিল সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। বইগুলো যে ধরনের তাতে এ নিয়ে

ঘাঁটাঘাঁটি করতে কেউই চায় না। সকলেই চুপচাপ বিনা প্রতিবাদে আপনার টাকা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু আপনি ভুল করলেন প্রফেসর সুরপতি সেনবর্মার বেলায়।'

'তা—তার মানে?' কবজিতে হাত বোলাতে-বোলাতে বলে উঠলেন বিলাস যোশি, 'কী—কী বলতে চান আপনি?'

'বলতে চাই, মিস্টার সেনবর্মা কখনও আপনাকে কোনও বইয়ের অর্ডার পাঠাননি—পাঠাতে পারেন না। সত্যিই তো, আপনি কী করে জানবেন যে, আমি সুরপতি সেনবর্মার ভাই নই। কী করে জানবেন যে—।'

এমন সময় দোকানের খোলা দরজায় এসে উপস্থিত হলেন একজন পুলিশ অফিসার—সঙ্গে দুজন কনস্টেবল। অফিসার আমাকে দেখেই সসম্ভ্রমে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালেন। তা দেখে বিলাস যোশি তাজ্জব হয়ে গেলেন।

আমি বলে চললাম, 'কী করে জানবেন যে, আপনার ফোনের উত্তরে একজন নয়, দুজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির হবেন?' আমার আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে বিলাস যোশির নাকের ওপরে তুলে ধরলাম: 'আর, কী করেই বা জানবেন যে, প্রফেসর সুরপতি সেনবর্মা পুরো অন্ধ ছিলেন?'

বিলাস যোশি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন টেবিলের ওপরে—বোধহয় অজ্ঞান হয়েই।

অবচেতন

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার আলতো করে হাত রাখলেন তার পোষা অ্যালসেশিয়ানের লোমশ পিঠের ওপরে। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। বিস্তৃত কপালে উড়ে আসা কয়েকগুচ্ছ রুপোলি চুলকে স্বস্থানে ফেরত পাঠিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন।'

আমি পাঁচফুট চওড়া টেবিলের এ-প্রান্তে বসে বলে উঠলাম, 'ডক্টর, স্বপ্ন হোক, দুঃস্বপ্ন হোক—এর মানে কী?'

আমার স্বরে উত্তেজনার আভাস পেয়ে কুকুরের পিঠ থেকে হাত তুললেন ডক্টর সমাদ্দার। সাইন পেনটা উচিয়ে ধরে সাদা প্যাডের ওপরে কিছু লেখার জন্যে তৈরি হয়ে বললেন, 'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার রায়, আপনার গল্পটা আমি প্রথম থেকে আর-একবার শুনতে চাই। কাইন্ডলি একটু স্লোলি বলবেন। নিন, শুরু করুন—।'

আমি, সুদর্শন রায়, চেয়ারে গুছিয়ে বসলাম। ঘরে এয়ারকুলার থাকা সত্ত্বেও মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। ঘর এবং আসবাবপত্রের রং নিষ্কলঙ্ক, সাদা। ডক্টর সমাদ্দারের গায়েও সাদা ট্রেচলনের স্যুট। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। হাতের অনামিকায় হিরের আংটি।

একমাত্র ব্যতিক্রম 'দুশমন' : ডক্টর সমাদ্দারের সাড়ে চারফুট লম্বা বিশাল অ্যালসেশিয়ান কুকুর। ওর রং কুচকুচে কালো। কাচের গুলির মতো চোখদুটো সবসময় ধকধক করে জ্বলছে।

ডক্টর সমাদ্দারের চেম্বারে আমি আগেও কয়েকবার এসেছি। কারণ, আমার মাঝে-মাঝে দেখা দুঃস্বপ্নগুলো। তাই দুশমন এবং তার প্রভু, দুজনের সঙ্গেই আমি যথেষ্ট পরিচিত।

আমার আগের দেখা দুঃস্বপ্নগুলো যেমনই অবাস্তব, তেমনই উদ্ভট। প্রথম দুঃস্বপ্নে দেখেছি, একটা এরোপ্লেন থেকে আমি একজন পাইলটকে ধাক্কা দিয়ে শূন্যে ফেলে দিচ্ছি। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখেছি জলের তলায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আমার মরণপণ যুদ্ধ চলছে। অবশেষে তাকে গলা টিপে খুন করে আমি জলের ওপরে ভেসে উঠছি (এবং একইসঙ্গে হাঁপাতে-হাঁপাতে বিছানায় উঠে বসেছি)।

দুঃস্বপ্ন হলেও সেগুলো কখনও স্থায়ী হয়নি। ক্ষণিকের দেখা, এবং ক্ষণিকেই তা মিলিয়ে গেছে। সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার বলেছিলেন, এ-দুঃস্বপ্ন দেখার কারণ মনের অবচেতনে অপরাধ করার সুপ্ত বাসনা—এর বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ চিন্তার কোনও কারণ নেই।

এসব ঘটনা প্রায় বছরখানেক আগের।

কিন্তু গত সাতদিন ধরে এক অদ্ভুত ধারাবাহিক স্বপ্ন আমি দেখে চলেছি। যা প্রথমে ছিল অর্থহীন, কিন্তু পরে...।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলাম। রুমাল বের করে চোখ মুছলাম। ডক্টর সমাদ্দার নীরবে আমার কথা বলার অপেক্ষায় রইলেন। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলতে শুরু করলাম, 'ডক্টর, সবকিছুর শুরু লাস্ট মঙ্গলবার। আমি বিয়ে করিনি। শুতে-শুতে রোজই বেশ রাত হয়। সেদিনও রাত হয়েছিল। কিন্তু ঘুম আসতে আমার কখনও দেরি হয় না। সুতরাং মিনিটকয়েকের মধ্যেই গভীর ঘুমে ডুবে গেছি। সে-রাতেই অদ্ভুত স্বপ্নটা প্রথম দেখলাম।

'দেখলাম, আমি একটা বিশাল বাড়ির ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে ব্যস্ত লোকজন সাদা পোশাকে চলাফেরা করছে। ফ্লুওরেসেন্ট আলো-ঝলমলে তেলচকচকে করিডর ধরে আমি ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছি। কাজে ব্যস্ত লোকজন কেউ যেন আমাকে দেখেও দেখছে না। এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আমি ঢুকে পড়লাম একটা ঘরে। সে-ঘরে সাজানো সারি-সারি স্প্রিং-এর খাট। তাতে শুয়ে আছে নানান বয়েসের নারী-পুরুষ। তাদের শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে।

'প্রথম দিনের স্বপ্ন এখানেই শেষ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললাম, 'কিন্তু দ্বিতীয় দিন এই স্বপ্ন আমি আবার দেখেছি! কিন্তু সেদিনের স্বপ্ন আমাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেল। দেখলাম, সেই বিশাল সাদা ঘরটার একপ্রান্তে একটা ছোট দরজা। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো যান্ত্রিকভাবে সেই ছোট দরজাটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম।

'দরজার চৌকাঠ পেরোতেই নজরে পড়ল একটা ছোট্ট ঘর। ঘরটা হয়তো রান্নাঘর, হয়তো বাথরুম, হয়তো ভাঁড়ার ঘর—ঠিকমতো কিছু বলতে পারব না। কারণ, ঘরের শুধুমাত্র ডানদিকের একটা অংশ আমার নজরে পড়েছে। সেটা একটা সাদা বেসিন। স্টিলের কল থেকে টইটম্বুর বেসিনে টপটপ করে জল পড়ছে। আর আমি যেন নেশার ঘোরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই জল পড়ার শব্দ শুনছি...।

'তৃতীয় দিনের স্বপ্নে প্রথম থেকে শুরু করে সেই বেসিন পর্যন্ত আসার পর খেয়াল করলাম, ঘরে আমি একা নই। একজন লম্বা মানুষ, পরনে সাদা ধবধবে আলখাল্লা, বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার মুখে ব্যঙ্গের হাসি। বিশ্বাস করুন ডক্টর, সেই সাদা পোশাক পরা ভদ্রলোকের চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে! যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার কালো জোড়া ভুরু, টিকোলো নাক, কালো কুচকুচে শৌখিন গোঁফ, ছোট-ছোট চোখ, ফরসা গালের বাঁ-দিকে একটা আঁচিল তিরতির করে কাঁপছে।'

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার এবার নড়েচড়ে বসলেন। বাঁ-হাতটা দুশমনের পিঠে রেখে বললেন, 'এক্সকিউজ মি ফর দ্য ইন্টারাপশন, মিস্টার রায়। এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে। একটা জিনিস আপনার জানা প্রয়োজন। সাধারণত কোনও স্বপ্নে আমরা যখন আমাদের অচেনা কোনও মানুষকে দেখি, তখন চেতনা ফিরে সেই স্বপ্নে দেখা মানুষের চেহারার নিখুঁত বর্ণনা আমরা কখনও দিতে পারি না। ইটস আউট অ্যান্ড আউট ইমপসিবল সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লম্বা লোকটিকে আপনি আগে কোথাও দেখেছেন। ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন হিম সামহোয়্যার। আই অ্যাম শ্যুওর অফ ইট!'

আমার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে সম্ভবত একটা বিহ্বল ভাব ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মিস্টার রায়। যেটা হওয়া উচিত সেটাই

আপনাকে এক্সপ্লেইন করলাম। নাউ গেট অন উইথ ইয়োর স্টোরি—' বলে চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে সাদা ফ্লানেলে লেন্সদুটো ঘষে নিলেন। তারপর চশমা চোখে দিলেন।

আমি ঘটনা-পরম্পরা একবার ভেবে নিয়ে বলে চললাম, 'তৃতীয়দিনের স্বপ্ন সেখানেই শেষ। চারনম্বর দুঃস্বপ্ন দেখলাম আরও দু-দিন পরে, এবং আগের মতোই তিননম্বর স্বপ্নের অসমাপ্ত অংশ এবারেও শেষ হল চারনম্বরে গিয়ে।'

একটু ইতস্তত করে আবার বলতে শুরু করলাম, 'ডক্টর, আমাকে দেখে সেই ভদ্রলোক হাসলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার রায়। আই অ্যাম ডক্টর শঙ্করদাস গিরি। আমি চুপ করে রইলাম। তারপর ডক্টর গিরি ঘুরে গেলেন বেসিনের দিকে। মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালেন কলের সামনে। বাঁ-পাশের ছোট্ট তাক থেকে একটা সাদা রঙের সাবান নিয়ে তিনি মুখে ঘষতে লাগলেন। আমি ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ধোওয়া লক্ষ করে চললাম। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা টের পেলাম। আমার হাতদুটো যেন অধৈর্য আর চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। শেষে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। এগিয়ে গেলাম ডক্টর গিরির কাছে—খুব কাছে। তারপর বিদ্যুৎঝলকের মতো ক্ষিপ্রতায় বেসিনের ওপর ঝুঁকে থাকা তাঁর মাথাটা চেপে ধরলাম। ডক্টর গিরির শরীরটা ঝটকা দিয়ে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। উনি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও তারপরেই সর্বশক্তি দিয়ে আমার সঙ্গে যুঝতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর মাথাটা বেসিন-ভরতি জলের দিকে ঠেলে নিয়ে চললাম। আমি পেছনে থাকায় ডক্টর গিরি বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। একসময় হেরে গেলেন।

'ডক্টর গিরির মাথাটা জলে ডুবিয়ে চেপে ধরতেই তাঁর শরীরটা প্রচণ্ড আক্ষেপে কেঁপে উঠতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চলল শরীরের ঝটাপটি। একসময় সব থেমে গেল।

'দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে যখন জেগে উঠলাম, তখন আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলাম। অসহায় চোখে তাকালাম অম্বিকা সমাদ্দারের দিকে। তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মাঝে-মাঝে প্যাডের কাগজে কী যেন লিখছেন।

হঠাৎই মুখ তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তারপর?'

আমি মৃদুস্বরে জবাব দিলাম, 'তারপর, গতকাল, অর্থাৎ, সোমবার, স্বপ্নটা আবার শুরু থেকে দেখতে শুরু করলাম। সেই করিডর, সেই ঘর, সেই ছোট দরজা—অবশেষে ডক্টর গিরির নিথর শরীরের কাছে দাঁড়িয়ে আমি।

'আমি গিরির বডিটা একটা ঘোরের মধ্যে কাঁধে তুলে নিলাম। ওঁর মাথার ভিজে চুল থেকে তখনও টপটপ করে জল পড়ছে।

'আগে খেয়াল করিনি, এখন দেখলাম, ছোট ঘরটার ডানপাশে, বেসিন থেকে কিছুটা এগিয়ে, একটা খোলা দরজা। আমি একটুও ভয় না পেয়ে শঙ্করদাসকে কাঁধে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সামনের করিডরে একটা অল্প পাওয়ারের বালব জ্বলছিল। সেটা পেরোতেই চোখে পড়ল একটা ছোট দরজা। দরজা খুলে আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে অন্ধকার খোলা মাঠ। দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে। আমি একটুও না থেমে হেঁটে চললাম। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না।

'একসময় দেখলাম, একটা হালকা জঙ্গলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে কয়েকটা বড়-বড় গাছ। কী গাছ জানি না। শঙ্করদাসের দেহটা ঘাসছাওয়া মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। তারপর একটা কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম। কোদালটা কোত্থেকে যে আমার হাতে এল বলতে পারি না।

'মাটি খোঁড়া শেষ হল। সেই গর্তে ডক্টর গিরিকে আমি শুইয়ে দিলাম। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, তাঁর চোখদুটো কোটর ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ওঁর ডানহাতের শক্ত মুঠোয় ধরা রয়েছে সেই সাদা সাবানটা।

'কেমন একটা ভয় আমাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল। তাড়াহুড়ো করে গর্তে মাটি ঢালতে লাগলাম। একসময় ভরাট হল গর্ত। কোদালটা হাতে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসছি, তখনই আমার নজরে পড়ল, ডক্টর গিরির ডানহাতটা কবরের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। সে-হাতের শক্ত মুঠোয় তখনও ধরা রয়েছে সাদা সাবানটা। আমি ভয় পেয়ে খোলা মাঠ ধরে ছুটতে শুরু করলাম। কোদালটা কোথায় হারিয়ে গেল জানি না...।

'একটু পরেই দেখি, আমি সেই বিশাল ঘরটায় দাঁড়িয়ে। যে-ঘরে সারি-সারিভাবে স্প্রিং-এর খাট সাজানো রয়েছে। ঘরে একটা নীল রঙের আলো জ্বলছে। সাদা চাদরে ঢাকা মানুষগুলোকে পেরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। দেখলাম, একেবারে শেষে একটা খাট খালি। কোনও লোক সেখানে শুয়ে নেই। আমি বাধ্য শিশুর মতো গিয়ে সেই ধবধবে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চাদরে ঢেকে ফেললাম আমার শরীর। ক্রমশ ঘুমে চোখ বুজে এল...।

'স্বপ্নটা এখানেই শেষ, ডক্টর।' আমার গলার স্বর যেন আশঙ্কায় কেঁপে উঠল: 'কিন্তু আজ দুপুরে ঘুমের মধ্যে আবার এই একই স্বপ্ন। করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত, আবার দেখলাম। আমার ভয় হচ্ছে, এবার থেকে হয়তো এই দুঃস্বপ্নটা রোজ রাতে আমাকে দেখা দেবে।'

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার ডানহাত আর বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুল পরস্পরের মাথায় ছুঁইয়ে কয়েকমুহূর্ত নীরব রইলেন। আপনমনেই বারকয়েক মাথা নেড়ে বললেন, 'আপনার অনুমান ভুল নয়। আমারও বিশ্বাস এ-দুঃস্বপ্ন রোজ রাতে আপনাকে দেখা দেবে। আপনার স্বপ্ন নিয়ে আমাকে দুটো দিন ভাবার সময় দিন। তারপরই আমি আপনাকে এর রিমেডি জানাব। আজ তা হলে—।'

আমি ইঙ্গিত বুঝতে পেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে গুনে-গুনে চৌষট্টি টাকা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। ডক্টর সমাদ্দার মাথা ঝুঁকিয়ে বিলটা লিখতে-লিখতে বললেন, 'আপনি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় আসুন। আর এর মধ্যে যদি ওই নাইটমেয়ার আবার দেখেন তা হলে আমাকে জানাবেন, কেমন?'

'ইয়েস, ডক্টর।' বিলটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পকেটে ভরলাম। যথাক্রমে দুশমন এবং তার প্রভুর সঙ্গে নজর মিলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। স্প্রিং-এর দরজা আপনাথেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ি নামতে-নামতে মনের আয়নায় ভেসে উঠল শঙ্করদাস গিরির মুখ। এবং পরক্ষণেই যেন দেখতে পেলাম কবরের বাইরে বেরিয়ে থাকা তাঁর সাবান-ধরা ডানহাতটা...।

বৃহস্পতির বিকেল ঠিক পাঁচটায় ডক্টর সমাদ্দারের চেম্বারে হাজির হলাম। আমাকে দেখে পরিচিতের হাসি হেসে তিনি বলতে বললেন। দুশমন যথারীতি তার প্রভুর পাশে বসে। ডক্টর সমাদ্দারকে জানালাম তাঁর অনুমানই ঠিক। এই দু-দিনে সেই স্বপ্ন আমি আরও দুবার দেখেছি।

উত্তরে মনের বক্তব্যকে যেন গুছিয়ে নিলেন ডক্টর সমাদ্দার। মাথার রুপোলি চুলে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, 'মিস্টার রায়, এ দু-দিন আমি আপনার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। তাতে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, তার খানিকটা আমি আগেরদিনই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ, ডক্টর শঙ্করদাস গিরিকে আপনি সত্যি-সত্যি কোথাও-না-কোথাও দেখেছেন।'

আমি বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লাম।

ডক্টর সমাদ্দার বলে চললেন, 'তা ছাড়া আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। মিস্টার রায়, কখনও কি আপনি কোনও হসপিটাল, নার্সিং হোম বা মেন্টাল হোমে ছিলেন?'

আমি স্পষ্টস্বরে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ছিলাম। সামান্য মেন্টাল প্রবলেম হওয়ার জন্যে আমাকে মাসখানেক মাইথনের একটা মেন্টাল হোমে কাটাতে হয়।'

'কবে?'

'গতবছর শীতে।'

'সেই মেন্টাল হোমের নাম আর অ্যাড্রেস আপনার মনে আছে?'

'আছে।' আমি নাম ও ঠিকানা বললাম।

প্যাডের কাগজে সেটা টুকে নিলেন ডক্টর সমাদ্দার। তারপর বললেন, 'এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন: স্বপ্নে দেখা সেই বাড়ির সঙ্গে মাইথনের সেই হোমের কি কোনও মিল আছে? ভালো করে ভেবে জবাব দিন—।'

'অত ভাবার দরকার নেই, ডক্টর—' বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, 'অনেকটাই মিল আছে।'

'তা হলে আমার অনুমানই ঠিক।' ধীরে-ধীরে বললেন অম্বিকা সমাদ্দার, 'কারণ, বাড়িটার এমন বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোনও হসপিটাল বা নার্সিং হোমের। সুতরাং, এখন আপনার উচিত মাইথনের সেই মেন্টাল হোমে যাওয়া, এবং স্বপ্নে দেখা ব্যাপারগুলো মিলিয়ে নেওয়া। যেমন ধরুন, সত্যিই শঙ্করদাস গিরি নামে কোনও ডক্টর সেখানে আছেন কিনা। অথবা সেই জঙ্গল, মাঠ—সত্যিই এসবের কোনও অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে কিনা। তা হলেই আপনার কনশাস আর সাবকনশাস মাইন্ডের গরমিলগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানে গিয়ে আপনার খোঁজখবরের রেজাল্ট আমাকে জানাতে ভুলবেন না, কেমন?'

আলোচনা-শেষের স্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু আমি বসেই রইলাম। ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। অভিব্যক্তিতে একটি নীরব প্রশ্নচিহ্ন ফুটিয়ে অপেক্ষায় রইলেন।

'ডক্টর, আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।' একটু ইতস্তত করে বললাম, 'মাইথনে আমার সঙ্গে আপনাকেও আসতে হবে। ওখানে একা যেতে হলে আমি খুব শেকি ফিল করব। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড—এ জন্যে আপনার ফিজ যা লাগে দেব। প্লিজ, ডক্টর, প্লিজ, আমার সঙ্গে আপনি চলুন। একটা দিনের তো ব্যাপার!'

ডক্টর সমাদ্দার কয়েকমিনিট চুপ করে রইলেন। কী যেন ভাবলেন মনে-মনে। অবশেষে মুখ খুললেন, 'আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি, মিস্টার রয়, কিন্তু আমার পক্ষে

যাওয়া একটু প্রবলেম। আমার চেম্বার রয়েছে, রয়েছে দুশমন, তা ছাড়া—।'

'আপনি করবেন না, ডক্টর।' অনুনয়ের সুরে বললাম, 'প্লিজ, একটা দিন আপনি আমার জন্যে সময় দিন। বললাম তো, আপনার প্রপার ফিজ আমি নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে। প্লিজ।'

'কিন্তু দুশমন?' দুশমনের পিঠে হাত রাখলেন ডক্টর সমাদ্দার, 'আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না। আমি ছাড়া কারও কথা ও শোনে না, কারও হাতে খাবার খায় না।'

মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, 'ওকেও তা হলে সঙ্গে নিন। আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ডক্টর, প্লিজ, ওখানে আমাকে একা যেতে বলবেন না—।'

ডক্টর সমাদ্দার দুশমনের লোমশ কালো পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'আপনার কথাই থাক। দুশমনও আমাদের সঙ্গী হোক।' তারপর দুশমনের পিঠে চাপড় মেরে: 'গেট রেডি দুশমন, কাল আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।'

উত্তরে দুশমনের হিংস্র দাঁতের ফাঁক থেকে একটা চাপা গরগর শব্দ ভেসে এল।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডক্টর।' আবেগে ডক্টর সমাদ্দারের হাত চেপে ধরলাম। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভিজিট-এর চৌষট্টি টাকা তুলে দিলাম তাঁর শীর্ণ হাতে। বললাম, 'তা হলে আগামীকাল দুপুরের ট্রেনে আমরা রওনা হচ্ছি।'

মৃদু হেসে ঘাড় হেলালেন অম্বিকা সমাদ্দার।

ওঁর চেম্বার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম।

মাইথনের সেই মেন্টাল হোমের দরজায় যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধে সাড়ে ছ'টা।

বর্ষার শেষ এবং শরতের শুরু। হয়তো সেই কারণেই বেলাশেষের আলোটুকু পশ্চিমপ্রান্তে অদৃশ্য হওয়ার আগে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিধাগ্রস্ত আমিও। এই নির্জন পরিবেশে দাঁড়িয়ে সেই দুঃস্বপ্ন যেন ফিরে আসছে বারবার।

সদর দরজায় লাগনো নামের ফলকের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম, ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দারের স্বরে চমক ভাঙল, 'মিস্টার রায়, অকারণে সময় নষ্ট করে লাভ কী? চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

অতএব আমরা এবং দুশমন—তিনজনেই পা বাড়ালাম অন্দরমহলের দিকে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় নির্জন ধু-ধু প্রান্তরে দাড়িয়ে থাকা বাড়িটায় আলো জ্বলছে। সারি-সারি জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা আলো যেন মাঝপথেই অন্ধকারের কাছে হার মেনে থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখে এসে পড়ছে শুধুমাত্র তাদের মলিন আকৃতিটুকু।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেই টানা করিডর। তার দু-পাশে কিছুদূর পরপর পরদাঢাকা দরজা। দরজার মাথায় সাইনবোর্ডের মতো বেরিয়ে থাকা কাঠের ফলকে অফিস, এনকোয়ারি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইত্যাদি স্পষ্ট ইংরেজি হরফে লেখা। করিডরে নজরে পড়ছে সাদা-পোশাকে ফিটফাট কর্মীদের আনাগোনা।

করিডর ধরে অফিসরুমে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে অনুসরণ করলেন ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার। সঙ্গে দুশমন।

অফিস বলতে যা বোঝায়, ঘরটা ঠিক তাই। একেবারে নিখুঁত।

খুঁত শুধু টেবিলের ওপারে বসে থাকা ভদ্রলোকের ডানচোখে। চোখটা কালো প্যাচ দিয়ে ঢাকা। হয়তো কোনও দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ল, গত শীতে এঁকে আমি দেখিনি।

আমাদের বসতে অনুরোধ করে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

জবাব দিলেন ডক্টর সমাদ্দার। যদিও প্রশ্নটা করা হয়েছিল আমাকে লক্ষ্য করেই। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমার নাম ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার, সাইকিয়াট্রিস্ট। মিস্টার সুদর্শন রায় আমার পেশেন্ট। গতবছর, শীতের সময়, ইনি আপনাদের কেয়ারে কিছুদিন ছিলেন। এখন এঁর ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আপনাদের একটু কোঅপারেশান দরকার—যেমন, প্রথমে মিস্টার রায়কে নিয়ে এই গোটা বিল্ডিংটা আমি একবার ঘুরে দেখতে চাই। তারপর—।'

ডক্টর সমাদ্দারকে বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'এক্সকিউজ মি, এখানে ডক্টর শঙ্করদাস গিরি নামে কেউ আছেন?'

'শঙ্কর-দাস-গিরি?' নামটা আপনমনেই বারকয়েক বিড়বিড় করলেন ভদ্রলোক। তারপর বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন।

পরক্ষণেই সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন বেয়ারা দরজায় এসে দাঁড়াল। তাকে লক্ষ্য করে একচক্ষু ভদ্রলোক আদেশ করলেন, 'ভাটিয়াসাব কো সেলাম দো—।'

মিনিটকয়েক নীরবতার পর বেঁটেখাটো এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। বারদুয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একচক্ষু ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হোয়াটস দ্য ম্যাটার, মিস্টার মহাজন?'

'আসুন, মিস্টার ভাটিয়া।' ইশারায় তাঁকে চেয়ারে বসতে বললেন মহাজন: 'এঁরা জানতে চাইছেন শঙ্করদাস গিরির কথা। আমি তো এখানে নতুন, তাই ভাবলাম, খবরটা আপনিই ভালো দিতে পারবেন।'

ভাটিয়া চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'দেখুন, ডক্টর শঙ্করদাস গিরির ব্যাপারটা একটু মিস্টিরিয়াস। মাসছয়েক আগে, গত শীতে, হঠাৎই একদিন তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। বহু চেষ্টা করেও তাঁর কোনও খবর আমরা পাইনি।'

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন আচমকা গা-ঝাড়া দিয়ে উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করল। শরীরে রক্তের চাপ হঠাৎ বেড়ে ওঠায় ভাটিয়ার আর কোনও কথা আমার কানে ঢুকল না। শুধু শঙ্করদাস গিরির নিখোঁজ হওয়ার খবরটা আমার মাথার ভেতরে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল।

ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। চাপা গলায় বললেন, 'বি স্টেডি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

নিজেকে সামলে নিয়ে দেখি ভাটিয়া ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। মহাজন আমাদের দিকে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে। ডক্টর সমাদ্দার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে উঠতে ইশারা করলেন। দুশমনও উঠে পড়ল।

ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ডক্টর সমাদ্দার মহাজনকে জানালেন তাঁর খুব বেশি হলে আধঘণ্টা সময় লাগবে।

করিডর ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। এক-এক পা এগোচ্ছি আর আমার বুকের টিপটিপ শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। ডক্টর অম্বিকা সমাদ্দার কিন্তু নির্বিকার। দুশমনও নীরবে তার প্রভুকে অনুসরণ করে চলেছে।

মিনিটতিনেক হাঁটার পর চোখে পড়ল, আর-একটা করিডর আড়াআড়িভাবে প্রথম করিডরকে কেটে এগিয়ে গেছে। সেই চৌরাস্তায় পৌঁছে আমি একবার ডানদিকে এবং বাঁ-দিকে তাকালাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ডানদিকে এগোলাম। ডক্টর সমাদ্দারও আমাকে অনুসরণ করলেন।

কয়েক পা যেতেই বাঁ-দিকে একটা খোলা দরজা আমার নজরে পড়ল। দরজা পেরোতেই একটা বিশাল ঘর। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। আর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সাজানো রয়েছে সারি-সারি স্প্রিং-এর খাট। তাতে শুয়ে আছে বিভিন্ন বয়েসের পুরুষ। তাদের শরীর সাদা চাদরে খানিকটা করে ঢাকা। দেখে তাদের অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছে।

বিশাল ঘরটার ডানকোণে একটা ছোট দরজা দেখে আমি একটুও অবাক হলাম না। কারণ, এখন বুঝতে পারছি, এরপর কোন-কোন দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই ছোট দরজা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। পেছনে অম্বিকা সমাদ্দার ও দুশমন।

ছোট দরজায় দাঁড়িয়ে আমার আর ডক্টর সমাদ্দারের চোখাচোখি হল। কারণ, দরজা পেরিয়েই একটা ছোট ঘর। সেই ঘরের ডানদিকে রয়েছে আর-একটা দরজা, আর দরজার পরে দেওয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে একটা ধবধবে সাদা বেসিন। সেটা জলে টইটম্বুর। কল থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল টপটপ করে বেসিনে পড়ছে। বেসিনের বাঁ-পাশে ছোট তাকে একটা সাবান রয়েছে: তার রং নীল—সাদা নয়।

এবার আমি সম্মোহিতের মতো ডানদিকের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকালাম না। কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম ডক্টর সমাদ্দারের ভারী বুটের শব্দ।

সামনের করিডরে একটা অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেটার শেষ প্রান্তে একটা খাটে দরজা। ধরজাটা ভেজানো ছিল, আমি সেটা খুলে বাইরের অন্ধকার খোলা মাঠে পা রাখলাম।

অন্ধকারের মধ্যেই দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে। আমি অক্লান্ত পায়ে হেঁটে চললাম। গন্তব্যস্থল কোথায় জানি না।

হঠাৎই পায়ের কাছে একটা আলোর বৃত্ত দেখে চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি ডক্টর সমাদ্দার পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে জ্বেলেছেন। এই ঘন অন্ধকারে তাঁর সঙ্গে হেঁটে চলা দুশমনকে স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে না।

আমাকে ফিরে তাকাতে দেখে বলে উঠলেন অম্বিকা সমাদ্দার, 'মিস্টার রায়, একমিনিট। আপনার কি মনে হচ্ছে যে, আপনার স্বপ্নের সঙ্গে এইসব মিলে যাচ্ছে?'

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। শুধু মাথা ঝাঁকালাম।

ডক্টর সমাদ্দার থমকে দাঁড়ালেন। আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম তাঁর মুখোমুখি।

'আমার মনে হয়, আপনার অন্য স্বপ্নগুলের মতো এটাও আপনার কল্পনা। শুধু এই হোমের পটভূমি আপনার কল্পনাকে স্বপ্নে গড়ে তুলতে হেলপ করেছে, তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং, আমার মনে হয়, আর সময় নষ্ট না করে আমাদের ফিরে যাওয়াই ভালো। বাড়ি ফিরে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করুন, ঘুরে বেড়ান, দেখবেন দু-দিনেই ওই নাইটমেয়ার কোথায় মিলিয়ে গেছে। সো, লেটস গো ব্যাক—।'

ডক্টর সমাদ্দার ঘুরে দাঁড়াতেই আমি চাপা গলায় বলে উঠলাম, 'নো ডক্টর, নেভার। আমি এর শেষ দেখতে চাই।'

অন্ধকারে সমাদ্দারের অভিব্যক্তি আমার নজরে পড়ল না। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'শেষ মানে? ও. কে.—অ্যাজ ইউ উইশ। কাম অন, দুশমন—।'

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

আচ্ছন্নের মতো চলতে-চলতে হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, একটা হালকা জঙ্গলে আমি দাঁড়িয়ে আছি। ভিজে হাওয়ার ঝাপটা আমার চোখে-মুখে ঠান্ডা পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। চারপাশে চেয়ে দেখি কয়েকটা বড়-বড় গাছ: কী গাছ জানি না। তারই মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পায়ের কাছে টর্চের আলোর বৃত্তে নজরে পড়ল ঘাসে ছাওয়া মাটি।

আমাকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অম্বিকা সমাদ্দার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুশমনের চাপা হিংস্র গর্জন তাঁকে থামিয়ে দিল। দুশমন আমাদের ছাড়িয়ে চট করে কিছুটা এগিয়ে গেল। ছটফটে পায়ে ফাঁকা জায়গাটাতে পায়চারি করতে লাগল।

আমার বুকের ভেতরে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। একটা অদ্ভুত আশঙ্কা যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে।

দুশমনের গর্জন একটু জোরালো হল। অন্ধকারে ওর আবছায়া শরীরটা ঘাস-ছাওয়া জমিতে নড়াচড়া করছে।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম নড়াচড়া নয়, দুশমন প্রাণপণে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

ডক্টর সমাদ্দারের টর্চ-ধরা হাত কেঁপে উঠল। তারপর গিয়ে স্থির হল দুশমনের কালো বিশাল শরীরের ওপরে। ওর তীক্ষ্ন থাবার আঁচড়ে ওপরের ঘাস ছিঁড়ে নীচের মাটি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে।

মাত্র কয়েকমিনিট। তারপরই যে-দৃশ্য দুশমন দেখাল, তাতে আমি অবাক না হলেও ডক্টর সমাদ্দার চমকে উঠলেন। তাঁর মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। গর্জন করে উঠল দুশমন। আমি নিশ্চুপ, নিথর। ডক্টর সমাদ্দারের টর্চের আলো খাবলানো মাটির ওপরে থরথর করে কাঁপছে। তবুও দেখতে আমাদের কোনও অসুবিধে হল না। স্পষ্ট দেখলাম, সামান্য খোঁড়া মাটি থেকে বেরিয়ে রয়েছে পচে যাওয়া একটা হাত। সে-হাতের কোনও-কোনও জায়গায় সাদা হাড়ের আভাস নজরে পড়ছে। আর সেই বিধ্বস্ত হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে একটা ময়লা সাদা সাবান।

বিড়াল

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঠিক সাতটা বেজে সতেরোমিনিট। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ ঠিক তেরোমিনিট আগে ঘুম থেকে উঠেছেন অতীশ সেন। (অর্থাৎ, গত দু-বছর ধরে তিনি ঠিক সাতটা তিরিশমিনিটে ঘুম থেকে উঠেছেন। এই তেরোমিনিটে তাঁকে কতকগুলো কাজ সারতে হবে—জরুরি কাজ।

এক নম্বর, বালিশের তলা থেকে ০.২২ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করা—এবং তিনি তাই করলেন।

দু-নম্বর, রিভলভারের চেম্বার চেক করা...(এবং করলেন)।

এবার লোডেড রিভলভার ডানহাতে নিয়ে বাঁ-হাতে একটা বালিশ টেনে নিলেন অতীশ। এগিয়ে গেলেন রুবির বিছানার দিকে। প্রায় একইসঙ্গে ঘটে গেল দুটো ঘটনা। প্রথম, বালিশ দিয়ে ঘুমন্ত রুবির মুখ চাপা দেওয়া এবং দ্বিতীয়, তৎক্ষণাৎ বালিশের ওপর গুলি করা। ঘড়ির দিকে তাকালেন অতীশ—সাতটা বাইশ।

এমনভাবে তাঁকে কাজগুলো সারতে হবে, যাতে এক সেকেন্ডেরও হেরফের না হয়। রুবির মৃতদেহটা একপাশে ঠেলে দিয়ে ওর তোশকের নীচে হাত ঢোকালেন অতীশ। হ্যাঁ, ঠিক যা ভেবেছেন তাই—থরে-থরে টাকা সাজানো ওর তোশকের নীচে।

রুবিকে বিয়ে করার পর গত দু-বছর ধরে অতীশ শুধু ভেবেছেন এই টাকাগুলোর কথা। নয়তো এ-কথা কে বিশ্বাস করবে যে, শুধুমাত্র প্রেমতাড়িত হয়ে তিনি (অতীশ সেন সুপুরুষ) একটা মোটকা, পঞ্চাশ বছরের বুড়িকে বিয়ে করেছেন?

রুবি সেন খুবই অদ্ভুতভাবে বিয়ের দিনপনেরো পর থেকেই পক্ষাঘাতে কাহিল হয়ে পড়েছেন এবং নিজের বিছানা ছেড়ে আর নড়তেন না—অন্তত যতক্ষণ অতীশ বাড়িতে থাকতেন। প্রথম-প্রথম অতীশ সন্দেহ করেননি, কিন্তু একদিন লক্ষ করলেন যে, রেফ্রিজারেটরে রাখা ডিমগুলো থেকে দুটো ডিম হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে। এ বিষয়ে রুবিকে প্রশ্ন করামাত্রই ওর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেছিল। তখনই অতীশ সন্দেহ করেছিলেন রুবি পক্ষাঘাতে মোটেই কাবু নয়।

তবে কেন এই অভিনয়?

এর উত্তর একটাই হতে পারে। তা হল, ওই বিছানার নীচেই রয়েছে রুবির সমস্ত টাকা—যে-টাকার খবর অতীশ কানাঘুষোয় শুনেছেন।

রুবি কোনওদিনই অতীশকে জানতে দেননি যে, তাঁর টাকা আছে। এবং অতীশও কোনওদিন তাঁকে জানতে দেননি যে, তাঁর টাকার কথা তিনি জানেন। রুবি সেন অতীশের 'নকল' ভালোবাসার কথা বিয়ের কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সবসময় নিজের টাকাকে আগলে রেখেছেন—যখের মতো।

সাতটা সাতাশ।

আর তিনমিনিট। চট করে বাথরুমে গিয়ে শেভ করার সেফটি রেজার, সাবান, ব্রাশ, টুথব্রাশ নিয়ে এলেন অতীশ। একটা ব্রিফকেসে ভরে ফেললেন। তারপর ব্যাগটা বোঝাই করলেন টাকায়—রুবির টাকায়। একশো, দশ, পাঁচ, একটাকার নোটের মোটা-মোটা বান্ডিলগুলো (উত্তরাধিকার সূত্রে রুবি যার মালিক হয়েছে) দেখে অতীশ সন্তুষ্ট হলেন।

সাতটা উনতিরিশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ড।

রিভলভারটা ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে ব্রিফকেস লক করে দিলেন তিনি। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললেন বারান্দার দিকে। নীচু হয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন—মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। তারই ফাঁকে ঘড়ির দিকে তাকালেন—সাতটা তিরিশমিনিট এক সেকেন্ড। যাক, ঠিকই আছে সময়টা। সময়ের গন্ডগোল হলেই বিপদ।

'এই যে, মিস্টার সেন!' সামনের খোলা বাগান থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

এই ডাকটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন অতীশ। কারণ গত দু-বছর ধরেই সাতটা তিরিশমিনিট পাঁচ সেকেন্ডের সময় তিনি বারান্দায় কাগজ হাতে উপস্থিত থাকেন। এবং পাশের বাড়ির বাগান থেকে মিসেস সরকার তাঁকে ঠিক এইভাবেই ডাকেন।

মিসেস সরকারের দিকে চেয়ে হাসলেন অতীশ। মিসেস সরকার বাগানে জল দিচ্ছিলেন, পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর বছরসাতেকের বাচ্চা ছেলেটা।

'হয় আপনি আজ দু-মিনিট আগে উঠেছেন, নয়তো আমার ঘড়ি দু-মিনিট স্লো আছে।' হাসতে-হাসতে বললেন মিসেস সরকার।

ভীষণভাবে চমকে উঠলেন অতীশ। খবরের কাগজটা আর-একটু হলেই হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। নাঃ, এই সময়ের ব্যাপারটায় আমাকে খুব সাবধান হতে হবে। কিন্তু দু-মিনিট আগে এলাম কেমন করে? তা হলে কি আমার ঘড়ি ভুল?

'না মিসেস সরকার, আপনার ঘড়িই স্লো আছে দু-মিনিট।'

'সে কি আর আমি জানি না!' একগাল হাসলেন তিনি: 'আপনাকে দেখেই তো আমার ঘড়ি মেলাই আমি।'

হঠাৎই সুর পালটে প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা, 'একটু আগে কি আপনার বাড়িতে চেয়ার-টেবিল উলটে পড়েছিল?'

'না তো! কেন?'

'না, কেমন যেন একটা শব্দ শুনলাম। তাই—।'

মাই গড! আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছিল? ইস, বালিশটা যদি রুবির মুখে না চেপে, রিভলভারের নলে চাপতাম—।

'ও, ওটা বাথরুমের দরজার শব্দ। দরজাটা কেমন যেন আটকে গেছিল। তাই জোরে খুলতে গিয়ে—।'

হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়ল অতীশের—সাতটা আটতিরিশ। খবরের কাগজ ভাঁজ করে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। ঘরে ঢোকার সময় শুনলেন মিসেস সরকারের ছেলে বাচ্চু ওর মা-কে বলছে, 'মা, এখন ঠিক সাতটা বেজে আটতিরিশ মিনিট—।'

মনে-মনে খুশি হলেন অতীশ। ঠিক এইভাবেই তাঁকে চলতে হবে সাড়ে আটটা পর্যন্ত।

গত একবছর ধরেই অতীশ সন্দেহ করছেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে (সকাল সাড়ে আটটা থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত) রুবি চলাফেরা করে বেড়াতেন। প্রায়ই দেখতেন, অফিসে যাওয়ার সময় যেটা যেরকম দেখে গেছেন, ফিরে আসার পর ঠিক সেইরকমটি আর নেই। একটু যেন অদলবদল হয়েছে। অথচ রুবি সেই একইভাবে বিছানায় শুয়ে আছেন। বাড়িতে যখন আর কেউ নেই, তা হলে ওগুলো সরাল কে? নিশ্চয়ই রুবি। রুবির চিন্তাকে মগজ থেকে সরিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে গেলেন অতীশ।

সাতটা চল্লিশ।

তিনটে স্যান্ডউইচ বের করলেন ফ্রিজ থেকে। ওঃ, আবার সেই ভুল! মনে-মনে নিজেকে প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন অতীশ সেন। তাঁকে ভীষণ সাবধান হতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা স্যান্ডউইচ ঢুকিয়ে রাখলেন ফ্রিজে। রোজ এই সময় তিনি দুটো স্যান্ডউইচই খান এবং তৃতীয় একটা নেন রুবির জন্য। গত দু-বছর ধরে তাই করেছেন। সুতরাং অভ্যাসবশে তিনটে স্যান্ডউইচ নিয়ে ফেলেছিলেন।

স্যান্ডউইচ দুটো শেষ করে অত্যন্ত সাবধানে ফ্রিজ থেকে নিজের জন্য একটা (দুটো নয়) ডিম বের করলেন। হিটাদের জল চাপিয়ে তার মধ্যে ডিমটা ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, তাড়াতাড়িতে শেভ করতেই ভুলে গেছেন। সর্বনাশ! এরকম উলটোপালটা হলেই মহা বিপদ!

তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে ব্রিফকেসটা ঘর থেকে বের করে আনলেন (রুবির মৃতদেহের দিকে তাকালেন না অতীশ)। ওটা খুলে টাকার বান্ডিলের নীচ থেকে শেভ করার সাজ-সরঞ্জাম বের করে বাথরুমে ছুটলেন।

শেভ করে ব্রিফকেস আবার গুছিয়ে যখন ডাইনিং রুমে ফিরে এলেন, তখন সাতটা সাতান্ন।

চটপট ডিমটা প্রায় গিলে ফেললেন অতীশ। এরকম ভুল করলে কারও খুন করাই উচিত নয়। এক সেকেন্ডেরও গন্ডগোল তিনি হতে দেবেন না। ঠিক আটটায় পুপুকে সদর দরজা খুলে ঢোকাতে হবে বাড়িতে। রোজকার মতো।

আটটা বেজে এক সেকেন্ড।

তাড়াহুড়ো করে সদর দরজা খুললেন অতীশ। ঠিক পায়ের কাছেই দাঁড়িয়ে বেড়ালটা। দরজা খোলা পেয়ে ওটা ঘরে এসে ঢুকল। অতীশের পায়ে গা ঘষতে লাগল। পুপুকে গত দু-বছর ধরেই আটটায় দরজা খুলে ঘরে ঢোকান অতীশ। ধবধবে লোমের পুঁটলি যেন বেড়ালটা। সুন্দর দেখতে। অথচ রুবি এক্কেবারেই দেখতে পারতেন না ওটাকে। পুপু ছিল ওঁর দু-চক্ষের বিষ! এখন আর কোনও ভয় নেই পুপুর। আপনমনেই হাসলেন অতীশ।

আটটা তিন।

বেড়ালটাকে গত রাতের এঁটো খাবারগুলো রোজকার মতোই খেতে দিলেন অতীশ। তারপর ড্রইংরুমের চেয়ারে বসে জামা-প্যান্ট, জুতো চটপট পরে ফেললেন। এবার খবরের কাগজটা খুলে দেখতে লাগলেন।

আটটা বেজে ন'মিনিট।

ক্রিরি—ং—রি—রি—ং। একটুও চমকালেন না অতীশ। তিনি যেন এতক্ষণ ধরে এই ফোনটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আয়েসী পায়ে এগিয়ে গেলেন ক্র্যাডলের কাছে। তুলে নিলেন রিসিভারটা।

'হ্যালো—' গম্ভীর স্বর ভেসে এল ও প্রান্তে থেকে।

'অতীশ সেন স্পিকিং—' খুব ঠান্ডা মাথায় কথা বলতে হবে। ভাবলেন অতীশ।

'আরে, অতীশ...আমি বড়ুয়া বলছি—।'

'কী, বল।'

'কী ঠিক করলি? কোথায় যাবি ছুটিতে?'

'ভাবছি এই দু-সপ্তাহ একটু আশপাশ থেকে ঘুরে আসা যাবে।' অতীশ দু-সপ্তাহ ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে এবং ছুটির মেয়াদ আজ থেকেই শুরু।

'মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে, না একা?' বড়ুয়া হেসে জানতে চাইল।

'তোর তাতে কী দরকার?' ঠাট্টার সুরে বললেন অতীশ।

'আচ্ছা—হ্যাভ আ গুড টাইম—' ফোন রাখার শব্দ শোনা গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অতীশ সেন। তিনি যে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন, তা পাড়াপড়শিরা কেউই জানে না। ফলে আজও তিনি ঠিক সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরোবেন। আশপাশের সবাই তাঁকে দেখে ঘড়ি মেলাবে। গত দু-বছর ধরে তাই হয়ে আসছে। বাসে করে তিনি অফিসের দিকেই প্রথমে যাবেন। তারপর সেখান থেকে বাসে চড়ে সোজা এয়ারপোর্ট। দশটা একুশে বম্বে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। তাতে চেপে সোজা বম্বে। সেখান থেকে পাঁচটা পঁয়তিরিশের প্লেনটা তাকে ধরতে হবে। গন্তব্যস্থল মাদ্রাজ। বম্বে থেকে যখন তিনি প্লেনে উঠবেন, তখন নাম এবং চেহারা তাঁকে পালটাতে হবে। মাদ্রাজে নেমে নিজেকে লোকের ভিড়ে মিশিয়ে ফেলতে তাঁর এতটুকু অসুবিধে হবে না। তখন কাজে লাগবে রুটির টাকাগুলো। আপনমনেই হাসলেন তিনি।

আটটা সতেরোমিনিট ছ' সেকেন্ড।

আর দু-মিনিট চুয়ান্ন সেকেন্ড পর তাকে রোজের মতো রেডিও চালাতে হবে।

ক্রিরি—রি—রিং—।

একটু অবাক হয়ে অতীশ এগিয়ে গেলেন ফোনের দিকে। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েই তিনি যেন একটা শক খেলেন। হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা দিয়ে। না—ফোন নয়!

বাজছে দরজার কলিংবেল!

কে এল এই সময়ে (অথবা অসময়ে!)?

দুরুদুরু বুকে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন অতীশ। দরজা খুললেন।

সামনে দাঁড়িয়ে একজন সুবেশধারী যুবক। পরনে কোট, প্যান্ট, টাই—ফিটফাট।

'কী চাই?' দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন অতীশ। যাই হোক না কেন, দরজা থেকে কিছুতেই সরব না। ভাবলেন তিনি।

‘এটাই তো আটাশ নম্বর বাড়ি?’

‘হ্যাঁ।’

অতীশ হঠাৎ খেয়াল করলেন, যুবকের পায়ের কাছে দাঁড় করানো একটা বড় প্যাকেট।

‘মিস্টার সেন তো আপনিই?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি নাহাটা ডিস্ট্রিবিটার থেকে আসছি। আপনার ওয়াইফ একটা অটোমেটিক প্রেশার কুকারের অর্ডার দিয়েছিলেন, তাই—।’

‘না, না, ওসব কুকার-ফুকার লাগবে না আমাদের।’ দরজা বন্ধ করতে গেলেন অতীশ।

‘মিস্টার সেন, যিনি অর্ডার দিয়েছিলেন, তিনি ক্যান্সেল করলেই আমরা অর্ডারটা ক্যান্সেলড বলে মনে করব, নয়তো নয়। আপনি কাইন্ডলি একবার মিসেস সেনকে খবর পাঠান। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।’

উঃ—যত জ্বালা। এখন কী করবেন অতীশ?

হঠাৎ খেয়াল হতেই দরজা ছেড়ে ভেতরে এসে রেডিওটা অন করে দিলেন তিনি। আবার ফিরে গেলেন দরজায়।

আটটা একুশ।

‘মিসেস সেন এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।’ পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, ‘উঠেছেন—মানে এখন ব্রেকফাস্টে বসেছেন।’

‘আমি একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।’ ঘরের ভেতর পা বাড়াল যুবক।

‘দাঁড়ান মশাই! আপনি ভেতরে ঢুকছেন কার হুকুমে?’ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অতীশ। নাঃ, রাগলে চলবে না। মনে-মনে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। লোকটা সন্দেহ করতে পারে।

‘আমার স্ত্রী কি নিজে আপনাকে অর্ডার দিয়েছিলেন?’ এবার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট মোলায়েম।

‘হ্যাঁ।’

তা হলে অতীশ এতদিন যা সন্দেহ করেছেন তাই। তিনি অফিসে চলে গেলে রুবি হেঁটে বেড়াতেন।...না, আর ঝামেলা করা ঠিক হবে না। অফিস (?) যাওয়ার সময় হয়ে এল। সময়ের এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই তাঁর কল্পনার স্বর্গ ধুলোয় মিশে যাবে।

‘কত হয়েছে আপনার বিল?’

‘দু-শো আট টাকা ষাট পয়সা।’

একমুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না অতীশ। ছুটলেন শোওয়ার ঘরে। ব্রিফকেস খুলে হাতড়ে বের করলেন একশো টাকার বান্ডিলটা। তিনটে নোট টেনে নিয়ে ব্রিফকেস বন্ধ করে দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে নোট তিনটে তুলে দিলেন যুবকটির হাতে।

আটটা বাইশ।

‘আমার কাছে ভাঙানি নেই। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আসুন—ওই মোড়ের দোকানটা থেকে ভাঙিয়ে দিচ্ছি।’

অতীশের কানে কেউ যেন গরম সীসে ঢেলে দিল। এ তো দেখছি মহা ঝামেলায় পড়া গেল। আর মাত্র আটমিনিট বাকি!

'ঠিক আছে, এটা দিন।' একটা নোট ছিনিয়ে নিলেন অতীশ 'আমার কাছে অন্য আরও নোট আছে—' অবাধ্য জিভকে শাসন করে আবার বললেন, 'মানে, দশটাকার নোটও আছে।'

মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলেন অতীশ। শোওয়ার ঘরে গিয়ে আবার ব্রিফকেস খুলে পাগলের মতো নোটের গাদা হাতড়াতে লাগলেন। কোথায় গেল দশটাকার বান্ডিলগুলো? এই তো! একটা নোট টেনে নিয়ে প্রায় দৌড়েই ফিরে এলেন দরজায়।

আটটা তেইশ।

'প্যাকিং আর ডেলিভারি মিলিয়ে পড়ল এক টাকা সাঁইতিরিশ পয়সা। তা হলে মোট হল দু-শো ন'টাকা পচানব্বই পয়সা।' আপনমনেই হিসেব করতে শুরু করল যুবক: 'তা হলে আপনি পাবেন পাঁচ পয়সা।'

'ওটা আপনি রেখেই দিন...আমার দরকার নেই।' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন অতীশ।

আটটা চব্বিশ।

'না, না...এই তো, আমার কাছে একটা পাঁচ পয়সা আছে।' জামা-প্যান্টের পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করল যুবক: 'কোথায় গেল—' একটু আগেই তো ছিল পকেটে।'

'আমার কোনও দরকার নেই। কোনও ভিখিরিকে দিয়ে দেবেন।' দরজা বন্ধ করতে গেলেন অতীশ। রাগে তাঁর চোখ-মুখ লাল।

হাত দিয়ে বাধা দিল যুবক।

আটটা পঁচিশ।

'এই তো—এই যে পেয়েছি। নিন।'

হাত বাড়িয়ে পাঁচ পয়সা নিলেন অতীশ। দরজা বন্ধ করলেন। উঃ!

আবার বেল বেজে উঠল! দরজা খুলতেই চোখে পড়ল সেই যুবকের হাসিমুখ।

আটটা ছাব্বিশ।

'কুকারটা নিতেই আপনি ভুলে গেছেন, মিস্টার সেন।' প্যাকেটটা এগিয়ে দিল যুবক।

'ওঃ—কী ভুলো মন আমার। ধন্যবাদ।'

দরজা বন্ধ করে হাঁফ ছাড়লেন অতীশ। খুব জোর বেঁচে গেছেন! মরে গিয়েও রুবি তাঁকে জ্বালাতে ছাড়ছেন না। এই কুকারের অর্ডার দেওয়ার কী দরকরা ছিল?

আটটা সাতাশ।

ঠক—ঠক—ঠক।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠলেন অতীশ। কে? কে এল আবার?

দরজা খুলে দাঁড়াতেই রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে সেই যুবক। মুখে কান এঁটো করা হাসি।

'বিলটা দেওয়ার কথা ভুলেই গেছিলাম। তাই আবার ফিরে এলাম। এই নিন।'

হাত বাড়িয়ে বিলটা নিলেন তিনি। কষ্টকৃত হাসি হেসে দরজা বন্ধ করলেন। কুকারের প্যাকেটের মধ্যে বিলটা গুঁজে দিলেন। তারপর এক-এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে গেলেন দোতলায়। ব্রিফকেসে চাবি এঁটে ওটাকে হাতে নিলেন। রুবির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেমে এলেন ড্রইংরুমে। একটুর জন্য আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন।

আটটা উনতিরিশ।

আয়নায় চেহারাটা একবার দেখে তৈরি হলেন। ব্রিফকেস নিয়ে যখন তিনি বাইরের লনে পা দিলেন, তখন ঠিক সাড়ে আটটা বাজতে পনেরো সেকেন্ড বাকি (গত দু-বছরের মতোই)।

মিসেস সরকার তখনও বাগানে দাঁড়িয়ে গাছের পরিচর্যা করছিলেন।

'মিস্টার সেন, মিসেস আজ কেমন আছেন?'

মিষ্টি হাসি হাসলেন অতীশ: 'ভালোই আছেন। আজ একটা ওষুধ দিয়েছি ওঁকে—সেই ব্যথাটার জন্যে।'

'ওই ব্যথাটার জন্যেই তো ভীষণ কষ্ট পান আপনার মিসেস।' সহানুভূতির গলয় বললেন মিসেস সরকার।

'আর কখনও কষ্ট পাবেন না উনি।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন: 'আচ্ছা চলি।'

'মা,' বাচ্চু সরকার বলল ওর মা-কে। 'এখন ঠিক সাড়ে আটটা বাজে।'

'বৃথা বিলম্বে কালাতিপাত করিও না।' টাইপের পদক্ষেপে হনহন করে বাস-স্টপের দিকে হাঁটছিলেন অতীশ সেন। আশপাশের পাড়াপড়শিরা তাঁকে দেখে নিজেদের ছেলেমেয়েদের যে সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছেন, তা তিনি রোজকার মতোই (গত দু-বছর ধরে) বুঝতে পারলেন।

সাড়ে ছ'টায় যখন তিনি ফিরবেন না (গত দু-বছরে এই প্রথম ঘটবে) তখন সবাই সেটাকে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করবে।

সাড়ে সাতটা বাজলে সবাই চিন্তিত হয়ে উঠবে।

সাড়ে আটটায় তাঁর বাড়িতে খোঁজ করতে যাবে এবং থানায় ফোন করলে পর সাড়ে ন'টায় পুলিশ এসে পৌঁছবে। ততক্ষণে তিনি হাজার-হাজার মাইল দূরে—পুলিশের নাগালের বাইরে।

এয়ারপোর্টে সিকিওরিটি চেকের জন্য এগোতে যাবেন, এমন সময় পিছন থেকে তাঁর কাঁধে হাত রাখল কেউ। চমকে ফিরে তাকালেন অতীশ।

কঠিন চৌকো চোয়াল। সরু গোঁফ। গালে একটা কাটা দাগ। জোড়া ভুরু। কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

অতীশ আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে বোর্ডিং পাসটি ভদ্রলোকের দিকে সাততাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরলেন।

উত্তরে ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা আইডেন্টিটি কার্ড বের করলেন। লাউঞ্জের আলোয় কার্ডটা ঝলসে উঠল।

'মিস্টার সেন, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে। আপনার স্ত্রীর মিস্টিরিয়াস ডেথের ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করার আছে।'

অতীশ সেনের হঠাৎ মনে হল, তাঁর পা দুটো যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলছিলেন, কিন্তু অতীশের সেসব বোধগম্য হল না। অবশ দেহে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে ফেললেন।

খানিকটা স্বাভাবিক হওয়ার পর অতীশ প্রশ্ন করলেন, 'এত—এত—' তাঁর গলা দিয়ে কাঁসরঘণ্টার ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'এত তাড়াতাড়ি কী করে জানতে পারলেন আপনারা?' আর কোনও কথা খুঁজে পেলেন না তিনি।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর হাসলেন: 'মিস্টার সেন, আপনি এবং আপনার স্ত্রী—আপনারা দুজনেই পাংচুয়ালিটির সিম্বল ছিলেন। ডেইলি রুটিনে কখখনো এক সেকেন্ডেরও হেরফের হত না আপনাদের।'

'আমাদের ডেইলি রুটিনে?' বিড়বিড় করলেন অতীশ, 'রুবির ডেইলি রুটিনে?'

'কেন, আপনি জানেন না?' ভীষণ মজার হাসি হাসলেন অফিসার: 'আপনার ওয়াইফ ঘড়ি মেপে সব কাজ করতেন। আমরা সব জানতে পেরেছি ওই পুপুর জন্যে!'

অতীশ হাঁ করে চেয়ে রইলেন অফিসারের দিকে। ব্যাপারটার কিছুই তখনও তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

অফিসার একটু হেসে আবার বলতে শুরু করলেন, 'মিস্টার সেন, পাড়াপড়শিরা আপনাকে দেখে যে ঘড়ি মেলাত, এ-কথা ঠিক। তবে সেটা শুধুমাত্র সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত। তারপর থেকে তাদের কাছে পাংচুয়ালিটির আইডল ছিলেন রুবি সেন। গত দু-বছর ধরে আপনি যেমন ঠিক আটটায় পুপুকে বাড়িতে ঢোকান তেমনি আপনি বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক দশমিনিট পর—অর্থাৎ, কাঁটায়-কাঁটায় সকাল আটটা চল্লিশমিনিটে মিসেস সেন পুপুকে ছুড়ে দিতেন বাইরের লনে—গত দু-বছর ধরেই।

'এই মজার দৃশ্য দেখে বাচ্চু—মিসেস সরকারের ছেলে—ঠিক আটটা চল্লিশের সময় মজা করে বলে উঠত, মা, দ্য ক্যাট ইজ আউট অফ দ্য ব্যাগ।

'আজ আটটা পঞ্চাশেও যখন বেড়ালটা বাইরে এল না, তখন ও অবাক হয়ে মা-কে এ- বিষয়ে প্রশ্ন করে। মিসেস সরকার খুবই কৌতূহলী মহিলা। তা ছাড়া তিনি জানতেন, রুবি সেন অসুস্থ। তাই সন্দেহের বশে মিসেস সরকার আপনার বাড়িতে খোঁজ করতে যান। তারপর—' হেসে ফেলেন অফিসার: 'মিস্টার সেন, দ্য ক্যাট ইজ নাউ রিয়্যালি আউট অফ দ্য ব্যাগ।'

হতভম্ব অতীশ সেন হাত দুটো এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টরের দিকে।

সমস্যা গুরুতর

নার্সের এগিয়ে দেওয়া পোশাকের গায়ে মনোযোগ দিয়ে আঙুল চালাল বিপুল শর্মা। বুঝল, পোশাকের কাপড়টা রেয়ন। অর্থাৎ, পোশাকটা ওর নিজের নয়।

নার্স, আপনার হয়তো ভুল হয়েছে।—বিরক্ত স্বরে বলল বিপুল, এ-ড্রেস আমার নয়।

ঠিকই ধরেছেন।—সুরেলা গলায় নার্স জবাব দিল, কারণ, আপনার জামাকাপড় ওই অ্যাকসিডেন্টে বিশ্রীভাবে ছিঁড়ে যাওয়ার জন্যে নতুন ড্রেস দিতে হয়েছে। আপাতত এগুলো পরেই আপনাকে কাজ চালাতে হবে।

ও।—বিপুল শর্মার স্বর কিছুটা শান্ত হল: কিন্তু আমার চোখের এই ব্যান্ডেজটা কবে খোলা হবে?

আজ। মেজর দত্ত এলেই। উনি এখুনি এসে পড়বেন।

যাক—বাঁচা গেল।—হাঁপ ছাড়ল বিপুল, বলল, তা হলে ড্রেসগুলো এখন থাক। চোখের ব্যান্ডেজ খোলা হলে পর ওগুলো দেখেশুনে পরে ফেলব, কী বলেন?

সে আপনার খুশি।—নার্স হেসে বলল।

সুতরাং আবার বিছানায় হেলান দিয়ে শরীর এলিয়ে দিল বিপুল।

দুর্ঘটনার ব্যাপারটা ওর এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আজ সকালে, একটু বেলার দিকে ইরাদের বাড়ির পিছনের খোলা মাঠ ধরে সে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটা, কিন্তু অসহ্য গরম, আর একটু আগেই গলায় ঢেলে দেওয়া আট পেগ জিন, এই দুইয়ের ধকল বিপুল শর্মার শরীর সামলে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া ওর স্বাস্থ্যের যা তিন অবস্থা!

মাঠ থেকে বহুদূরে, জঙ্গলের ঠিক শুরুতেই, ছিল একটা পুরোনো কুয়ো। বিপুল কুয়োর দিকেই যাচ্ছিল। বহুদিন ধরে ব্যবহার না হওয়ায় কুয়োটা শুকিয়ে হেজে গেছে। সুতরাং নিরাপদ জায়গা ভেবে ওই কুয়োতেই ও সব টাকা লুকিয়ে রেখেছিল—আজ থেকে প্রায় মাসতিনেক আগে। একটা টিনের বাক্সে টাকাটা ভরে ও রেখে দিয়েছিল কুয়োর নীচে, শুকনো খটখটে আগাছায় ভরা জমিতে। এই গোপন জায়গাটার কথা ও ইরাকে পর্যন্ত বলেনি।

বিপুলের হাতে তখন ছিল একটা তারের হ্যাঙার। সেটাকেই টেনে লম্বা করে ও একটা হুকের মতো করেছিল। তারপর তার একপ্রান্তে দড়ি বেঁধে বাঁকানো মুখটা সরসর করে

নামিয়ে দিয়েছিল কুয়োর ভেতরে। ঠিক যেমন করে লোকে ছিপ ফেলে বঁড়শিতে মাছ গাঁথে।

ওর উদ্দেশ্য ছিল দড়িটা ঠিকমতো দুলিয়ে কুয়োর নীচে পড়ে থাকা টিনের বাক্সের হাতলে হুকটাকে আটকানো। তারপর টেনে তুললেই হুকের সঙ্গে সহজেই উঠে আসত বাক্স—সেইসঙ্গে তিরিশহাজার টাকা।

কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। তার আগেই ঘটে গেছে এই হতচ্ছাড়া দুর্ঘটনা। তাই বিপুল শর্মা এখন নার্সিং হোমে।

কুয়োর পাড়ে পৌঁছনোর পরই বিপুলের মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে গেছে। বোধহয় আট পেগ জিনের পর এই প্রখর রোদে খোলা মাঠে পথ হাঁটাটা ওর দুর্বল শরীর সইতে পারেনি। জ্ঞান হারানোর আগে ওর আবছা-আবছা যেটুকু মনে আছে তা হল কুয়োর বাঁধানো পাড়ে ওর মাথাটা বিশ্রীভাবে ঠুকে গিয়েছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

নার্সিং হোমের দরজার ওপরে টাঙানো সুদৃশ্য দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচবার ঘণ্টা বাজল। পাঁচটা বাজে। অর্থাৎ, এরই মধ্যেও প্রায় ছ'ঘণ্টা সময় নষ্ট করে ফেলেছে। ইরাকে ও বলেছিল, বেলা বারোটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়িটার নীচে অপেক্ষা করতে। ও হয়তো এখনও অধৈর্যভাবে পায়চারি করছে। হয়তো ভাবছে বিপুল প্রেমিকাকে ফাঁকি দিয়ে সমস্ত টাকা একাই নিয়ে কেটে পড়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত ও ভেবে বসে বিপুল ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা হলে ও নির্ঘাত পুলিশে খবর দেবে, ফোন করে বলে দেবে বিপুল কোথায় আছে—ব্যস।

না, এখান থেকে ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরোতে হবে। টাকাটা নিয়েই ও সোজা রওনা দেবে হাওড়া স্টেশনের দিকে। তারপর ইরাকে সঙ্গে নিয়ে...।

কিন্তু ততক্ষণ ইরার ধৈর্য করে থাকবে তো?

নার্সকে উদ্দেশ করে বিপুল বলল, আমি এই নার্সিং হোমে কী করে এলাম বলতে পারেন?

একজন পাখি শিকারি আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দ্যাখে। সে-ই আপনাকে টেনেটুনে গাড়িতে তোলে। ওই করেই তো আপনার জামা-কাপড়গুলো সব ছিঁড়েছে! তারপর গাড়ি করে সে আপনাকে এই নার্সিং হোমে নিয়ে আসে।

ও, লবণ হ্রদে লোকে তা হলে এখনও পাখি শিকার করতে যায়? ভাবল বিপুল। শিকারি বাবাজীবনকে ধন্যবাদ দিতে হয়—একইসঙ্গে সে বিপুল শর্মা এবং তিরিশহাজার টাকাকে বাঁচিয়েছে বলে। আর ভাগ্যিস ওর পকেটে হাজারখানেক টাকা ছিল। ওটা থেকে নিশ্চয়ই নার্সিং হোমের খরচ মেটানো যাবে।

পুরোনো ঘটনা বিপুলের মনের পরদায় ছায়া ফেলে যায়। ও এখন বেশ বুঝতে পারছে, কীভাবে শুরু থেকেই ও মারাত্মক সব ভুল করে চলেছে। অবশ্য সে-ভুল শোধরানোর সময় এখনও আছে। তিরিশহাজার টাকা এখনও অপেক্ষা করছে ওই কুয়োর গর্তে—ওরই জন্য। ওই টাকার খোঁজ বিপুল ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইরার সঙ্গে বিপুল শর্মার পরিচয় একটু অদ্ভুতভাবেই। ভি.আই.পি রোডে একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল বিপুল। তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়—ছোটখাটো দুর্ঘটনা। তখন সেখানে হাজির দর্শকদের গায়ে-পড়া উপদেশ হজম করে ও চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু তখন ইরা ওকে পিছু ডেকেছে। ওর পরনের সাদা শাড়ি জানিয়ে দিচ্ছিল ইরা বিধবা। কিন্তু

তারপরই ইরা যে-প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে বিপুল অবাক না হয়ে পারেনি। ও ওকে প্রথমে ওর বাড়িতে যাওয়ার জন্য—পরে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার প্রস্তাব দিয়েছে।

কথাবার্তায় বিপুল আগেই জানিয়েছিল কলকাতায় ও নতুন। সেইজন্যই ওই পেয়িং গেস্ট হওয়ার প্রস্তাব। কেন জানি না, রাজি হয়ে গেছে বিপুল। তারপর যতই দিন গেছে ততই ও ইরার মতলব টের পেয়েছে।

ক্রমে-ক্রমে একদিন মতলবটা খুলেই বলল ইরা। সব শোনার পর বিপুলের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকেনি। ইরা যে একজন সহকর্মীর আশাতেই সেদিন ওইরকম উপযাচক হয়ে ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সেটা বুঝতে আর বাকি থাকেনি।

ইরার কথা অনুযায়ী জনৈক হোঁদলকুতকুত ব্যবসায়ী প্রতি শনিবার ভোর ছ'টায় এই ভি.আই. পি রোড ধরে অ্যামবাসাডার হাঁকিয়ে যায়। সঙ্গে থাকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা। তার কোম্পানির লেবারদের সাপ্তাহিক মাইনে। এই টাকাটা বরাবর সে নিজেই নিয়ে যায় ফ্যাক্টরিতে। ব্যবসায়ীর নাম দুলিচাঁদ আগরওয়ালা। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোথায় যেন তার লোহালক্কড়ের কারখানা আছে।

সব শুনে কাজটা তেমন কঠিন মনে হয়নি বিপুলের। এই কাজের সাফল্যের পক্ষে কতকগুলো জোরদার পয়েন্ট রয়েছে। প্রথমত দুলিচাঁদের বয়েস প্রায় ষাট। অর্থাৎ, কোনও আক্রমরকারীকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। আর দ্বিতীয়ত, সে অ্যামবাসাডারে একাই যাতায়াত করে—অর্থাৎ, নিজেই গাড়ি চালায়। আর সর্বশেষ পয়েন্ট, ভোর ছ'টা নাগাদ ভি.আই.পি রোড একেবারে নির্জন থাকে—তার ওপর সময়টা শীতকাল।

পরিকল্পনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা পুরোনো বন্দুক বের করে বিপুলের হাতে দিয়েছিল ইরা। বিপুল অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর সামান্য খোঁজখবর করে জেনেছিল ইরার ইতিহাস। ওর স্বামী ছিল এক দাগি আসামি। বছরখানেক আগে সে এনকাউন্টারে মারা গেছে। হয়তো স্বামীর কাছ থেকেই অস্ত্রটা একসময় ইরার হাতে এসেছে।

কিন্তু সব জেনেও বিপুলের কিছু করার ছিল না। কারণ, তখন ইরার সঙ্গে ও মনে-মনে জড়িয়ে গেছে।

কাজের প্ল্যানটা ভাবতে শুরু করেছিল বিপুল। ইরার মত অনুযায়ী এ-কাজে পরিশ্রম খুব সামান্যই। দূর থেকে যখনই সেই অ্যামবাসাডারটাকে বিপুল আসতে দেখবে তখনই ও বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে মড়ার মতো শুয়ে পড়বে। বুড়ো আগরওয়ালা গাড়ি থামাবেই। এবং যেই সে গাড়ি থেকে নেমে বিপুলের কাছে এগিয়ে আসবে তখনই বিপুল বন্দুকটা তার কোমরে চেপে ধরবে। তার পরের কাজ অতি সামান্যই...।

টাকার ব্যাগটা নেওয়া হয়ে গেলে বিপুল সোজা গিয়ে উঠবে ইরার ঝরঝরে অস্টিনটায় (যেটা শতখানেক গজ দূরে আগে থেকে পার্ক করা থাকবে)। সোজা গাড়ি ছোটাবে হাওড়া স্টেশেন লক্ষ্য করে। ইরাও সময়মতো সেখানে গিয়ে বড় ঘড়ির তলায় অপেক্ষা করবে। বিপুল পৌঁছলেই ওরা দুজনে ট্রেনে চেপে চম্পট দেবে।

কিন্তু আসল কাজের সময় হিসেবের বাইরে একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় বিপুলের সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। ওরা জানত না, বুড়ো আগরওয়ালা নিরাপত্তার খাতিরে নিজের সঙ্গে রিভলভার রাখত। সুতরাং সেই বিশেষ মুহূর্তে বিপুল ও দুলিচাঁদ, দুজনেই রিভলভার ব্যবহার করল। ফল দাঁড়াল, দুলিচাঁদ প্রায়-নিহত এবং বিপুল আহত। তাই টাকা নিয়ে বিপুল আর হাওড়া যেতে পারেনি। সোজা ফিরে গেছে ইরার ডেরায়। ইরা ফেরার আগেই টাকাটা সে পরিত্যক্ত কুয়োর ভেতরে লুকিয়ে ফেলেছে।

ও ভেবেছিল, দুলিচাঁদ বোধহয় মরেই গেছে। তাই আঘাতটা পেল অনেক দেরিতে। ইরা আহত বিপুলের সেবায় মগ্ন। হঠাৎই রেডিওতে শোনা গেল বিশেষ ঘোষণা।

হ্যাঁ, দুলিচাঁদ মারা গেছে ঠিকই, তবে বিপুলের চেহারার একটা বিবরণ না দিয়ে নয়। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বেঁটে এবং মোটা লোক। এক কোটি লোকের মধ্যেও সে জলহস্তীর মতো চোখে পড়বে। কারণ, তার চেহারা ঠিক একটা নাদুসনুদুস, গোল বেলুনের মতো। এককথায় জীবন্ত ফুটবল!

বিবরণ শুনে ভীষণ ভয় পেয়েছে বিপুল। কারণ ও জানে, ওর ফুটবলমার্কা চেহারায় যে-কেউই ওকে একপলকে চিনে ফেলবে। তাই ও ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তখন লবণ হ্রদ ছেড়ে শহরতলির কোথাও সরে পড়তে ইরাই পরামর্শ দিয়েছে।

শেষে ওরা ঠিক করেছে, না, শহরতলি নয়, একেবারে দেশান্তরী হবে বিপুল। তারপর দিনের-পর-দিন উপোস করে নিজেকে রোগা করবে। যাতে লোকে ওকে আর চিনতেই না পারে। তাই ইরাকে নিয়ে বর্ধমান চলে গিয়েছিল ও। দীর্ঘ চারমাস ও প্রায় অনশন করে কাটিয়েছে। বাড়ির কোটর ছেড়ে দিনের আলোয় একটিবারের জন্যও বেরোয়নি। অবশেষে যখন ওর দেখা মিলেছে, তখন ওকে চেনে কার সাধ্যি? কে বলবে, এ ফুটবল বিপুল? তার বদলে হাড়জিরজিরে হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো চেহারা। যেন কবর থেকে সদ্য কোনও কঙ্কালকে তুলে আনা হয়েছে।

সেই অবস্থাতেই কলকাতায় ফিরে এসেছে বিপুল শর্মা। ইরাও সঙ্গে এসেছে—তবে ওই স্টেশন পর্যন্তই। বিপুল ওকে বলেছে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে। ও একা গিয়ে ইরার বাড়ির পিছনের সেই মাঠের কুয়ো থেকে টাকাটা তুলে আনবে।

কিন্তু কঙ্কালসার বিপুল কয়েকটা ভুল করেছিল। প্রথমত ওই শীর্ণ শরীরে ঝোঁকের মাথায় আট পেগ জিন টেনে ফেলেছিল। আর দ্বিতীয়ত, দুপুরের রোদ মাথায় করে মাঠ ভেঙে হেঁটে গিয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। মাথা ঘুরে কুয়োর পাড়ে পড়ে গিয়ে ও এক দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসেছে। তারপর জ্ঞান ফিরতেই এই নার্সিং হোম।

খাটের ওপর পাশ ফিরল বিপুল শর্মা। রুগ্ন শরীরে জিন খাওয়া তার উচিত হয়নি। তার ওপর আট পেগ, আর ওদিকে ইরা ওর জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে ও পুলিশেই—।

নার্সকে লক্ষ করে বলল, আচ্ছা, এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় আমাকে কি কোনও কাগজপত্রে সই করতে হবে?

না, তার কোনও দরকার নেই।—নার্স জবাব দিল, আপনার শরীর এখন সুস্থ। আশা করি, আপনার মাথার চোটটাও সেরে গেছে—ও, এই তো মেজর দত্ত এসে গেছেন।

উঠে এসে খাটের কিনারায় বসল বিপুল। পা দুটো ঝুলিয়ে দিল মেঝেতে। একটা আশ্বাসের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে-সঙ্গে ও কাঁধের ওপর অভিভাবকের স্পর্শ অনুভব করল: কেমন আছেন এখন?

বিপুল তখন রেয়নের পোশাকটাকে দু-হাতে নেড়েচেড়ে দেখছে।

ডক্টর, ও বলে উঠল, ড্রেসটা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আর একটু মাপমতো ড্রেস তো দিতে পারতেন—

খুব একটা বেঠিক মাপের হবে বলে তো মনে হয় না।—মেজর দত্ত হেসে জবাব দিলেন।

আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, ডক্টর?—বিপুলের গলা একটু রাগী এবং কঠিন নাকি এই পোশাকটা আপনার পোষা হাতির গা থেকে খুলে এনেছেন?

মানে—ব্যাপারটা কী জানেন, জ্ঞান হারালেও খাওয়া-দাওয়াটা কিন্তু আপনি একটুও কমাননি—।

তার মানে? আমি তো মাত্র আজ সকালেই অজ্ঞান হয়ে—।

বিপুল অনুভব করল মেজর দত্ত ওর চোখ থেকে ব্যান্ডেজ খুলে দিচ্ছেন এবং একইসঙ্গে বলে চলেছেন, এবার আপনি যে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না, সেটা আমার প্রশ্ন করার পালা।—হাসলেন মেজর দত্ত, বললেন, আজ মে মাসের কুড়ি তারিখ। আর আপনাকে এই নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে গত মার্চ মাসে। সেই অ্যাক্সিডেন্টের পর আপনি কোমায় চলে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ আপনাকে দেখতে আসেনি।

নিশ্চয়ই ইরা! ভাবল বিপুল।

সমস্ত ব্যান্ডেজ খোলা হয়ে গেলে মেজর দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। বিপুল শর্মাও ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সামনে চোখ রেখে সাবধানী পায়ে এগিয়ে চলল ঘরের অন্যপ্রান্তে রাখা একটা লম্বা আয়নার দিকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ খুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল নিজের শরীরের দিকে। তাকিয়েই রইল।

ও শুনতে পেল পিছন থেকে মেজর দত্ত বলছেন, আপনি এখন স্বাধীন। যেখানে খুশি যেতে পারেন আপনি। আপনাকে এখুনি ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে।...আপনি শুধু বিলটা সেটল করার ব্যবস্থা করুন।

প্রচণ্ড খোঁজাখুঁজি করেও নিজের গলার স্বর খুঁজে পেল না বিপুল। ওর শরীরের বিপুল মেদভার এক অজানা উত্তেজনায় অথবা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। পাঁচ ফুট ব্যাসের ফুটবলমার্কা জলহস্তী চেহারার চর্বির থাকে ওর জলে ভেজা চোখ দুটো বুঝি হারিয়ে গেল। বিপুলের মনে হল, দুলিচাঁদ আগরওয়ালা যেন বাঁধানো দাঁত বের করে ওর দিকে চেয়ে হাসছে।

ও আয়নার সামনে থেকে কয়েক পা পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিষ্ফল আক্ষেপে ওর হাত-পা কাঁপতে লাগল। নিঃশব্দ চিৎকারে ও বলতে চাইল, না—না—না...।

অত্যন্ত শান্ত মুখে মেজর দত্তের দিকে ফিরে তাকাল বিপুল। বলল, ডক্টর, আমাকে একটু বিষ দিতে পারেন?

যে জন জানে

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পর এই নিয়ে অন্তত বিশবার হাতে ধরা 'নর্তকীয় অপমৃত্যু' বইটার পাতা থেকে চোখ সরিয়ে উলটোদিকে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকাল অসমঞ্জ।

একটু ভুরু কোঁচকাল ও। এভাবে কেউ যদি এত কাছ থেকে কাউকে খুঁটিয়ে নজরবন্দি করে রাখে তা হলে অস্বস্তি হওয়ারই কথা—তার ওপর লোকটার ঠোঁটে লেগে আছে একচিলতে সবজান্তা বিজ্ঞের হাসি। এই জরিপ এবং অদ্ভুত হাসিতে অসমঞ্জের অস্বস্তি আরও দশগুণ বেড়ে গেল। জোর করে লোকটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বইয়ের পাতায় নজরটাকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিতে চাইল। লাস্যময়ী নর্তকী লিজা কীভাবে অন্ধকার বলরুমে রহস্যজনকভাবে ছুরির আঘাতে মারা গেল সেই ধাঁধার মধ্যেই জোর করে ডুবিয়ে দিতে চাইল নিজেকে।

কিন্তু গল্পটা একটু বুদ্ধিজীবীদের ঢঙে লেখা। প্রথম দু-তিনটে পরিচ্ছেদ নানান বিক্ষিপ্ত ঘটনার ঘনঘটায় ভরা। তারপর লেখক ধীরে-ধীরে বিশ্লেষণের এক-একটা ধাপে পা রেখে এগিয়ে গেছেন শেষ পরিচ্ছেদের বৈজ্ঞানিক সমাধানে। পড়তে-পড়তে বেখেয়ালে এড়িয়ে গেছে এমন দু-একটা সূত্র মিলিয়ে নিতে দুবার অসমঞ্জকে ফিরে আসতে হল পিছনদিকের পাতায়। ঠিক তারপরই ও টের পেল, নিহত নর্তকীর কথা মোটেই ও আর ভাবছে না—বরং উলটোদিকে বসে থাকা অদ্ভুত লোকটার অদ্ভুত মুখটাই বারবার ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। বিচিত্র পাবলিক তো, ভাবল ও।

অবশ্য লোকটার চেহারায় আঙুল তুলে দেখানো যায় এমন কোনও বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তার চোখের চাউনিটাই ভয় পাইয়ে দিয়েছে অসমঞ্জকে। এই চাউনি যেন চিৎকার করে বলছে, আমি সবার গোপন খবর জানি। পাতলা ঠোঁটের কোণটা সামান্য বেঁকে গিয়ে শক্তভাবে বন্ধ হয়েছে, তার ওপর লোকটা লুকোনো কোনও রসিকতায় তারিয়ে-তারিয়ে মিটিমিটি হাসছে। রিমলেস চশমার কাচের পিছনে চোখ দুটো জ্বলছে অদ্ভুতভাবে—কিন্তু তা হয়তো জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা আলোর ছটায়।

লোকটার পেশা আন্দাজ করার চেষ্টা করল অসমঞ্জ। পরনে সাধারণ আধময়লা চেক শার্ট আর কালো ঢোলা প্যান্ট। বয়েস হয়তো চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে।

বিনা কারণেই কাশল অসমঞ্জ, সিটে নড়েচড়ে আরাম করে বসল। হাতের রহস্য উপন্যাসটাকে মুখের কাছে আড়াল করে ধরল। কিন্তু এতে লাভ হল না একটুও। অসমঞ্জের মনে হল, লোকটা যেন ওর কায়দাকানুন সবই ধরে ফেলেছে এবং তাতে বেশ মজা পেয়েছে। ও উশখুশ করতে চাইল, কিন্তু তক্ষুনি আবার ভাবল, এতে হয়তো

একরকম লোকটারই জিৎ হবে। সুতরাং নানান ভাবনায় অসমঞ্জ এত বেশি নাজেহাল হয়ে উঠল যে, হাতের বইয়ে মন দেওয়াটা ওর পক্ষে নিছক অসম্ভব হয়ে উঠল।

দিনটা ছুটির দিন। ফলে ট্রেনে এমনিতেই বেশি ভিড় নেই, এবং এই কামরাটার একটা অংশে অসমঞ্জ এবং সেই বিচিত্র ব্যক্তি একা-একা পরস্পরের মুখোমুখি বসে। ইতিমধ্যে গোটাকয়েক স্টেশন পেরিয়ে এলেও তৃতীয় কোনও যাত্রী ওদের সঙ্গে এসে বসেনি। ফলে এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা রাজকীয়ভাবে বজায় থেকেছে। অসমঞ্জ ইচ্ছে করলে এই সিট ছেড়ে উঠে পড়তে পারে, চলে যেতে পারে পাশের খুপরিতে। কিন্তু সেটা হবে নিছক হেরে যাওয়া। অতএব 'নর্তকীর অপমৃত্যু' চোখের কাছ থেকে নামিয়ে লোকটার সঙ্গে নজর-মোলাকাত করল অসমঞ্জ।

'একঘেয়ে লাগছে?' লোকটা জিগ্যেস করল।

'তা একটু লাগছে—' কিছুটা স্বস্তি আর অনিচ্ছা নিয়ে উত্তর দিল অসমঞ্জ। তারপর আরও বলল, 'বই-টই কিছু পড়বেন?'

অ্যাটাচি কেস থেকে 'তৃতীয় ব্যক্তি' বইটা বের করে অনেক আশা নিয়ে সামনে বাড়িয়ে দিল ও।

বইটার নাম একপলক দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল লোকটা। বলল, 'নাঃ, ধন্যবাদ...। আসলে ডিটেকটিভ গল্প আমি একেবারেই পড়ি না। ওগুলো এত খেলো...আপনার কী মনে হয়?'

'হ্যাঁ, মানে, ক্যারেক্টার বিল্ডিং কিংবা ভ্যালুজের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো ওসব বইতে খুব একটা ভালো থাকে না। কিন্তু ট্রেনে সময় কাটাতে হলে...।'

অসমঞ্জকে বাধা দিয়ে লোকটা বলে উঠল, 'না, না, আমি কিন্তু ঠিক তা বলতে চাইনি। ওসব ভ্যালুজ-ট্যালুজের কথা আমি বলছি না। আসলে গল্পের খুনিগুলো এত বোকা যে, ওদের কাণ্ডকারখানা পড়তে গেলে আমার ঘুম পায়।'

'সে বলতে পারি না, তবে সত্যিকারের খুনিদের চেয়ে ওদের বুদ্ধি, হাতযশ, ঢের-ঢের বেশি।' অসমঞ্জ উত্তর দিল।

'সত্যিকারের খুনিদের মধ্যে যারা ধরা পড়ে...। হ্যাঁ, তাদের চেয়ে গল্পের খুনিদের বুদ্ধি বেশি, মানছি—' অসমঞ্জের কথা শুধরে দিয়ে বলল লোকটা।

'তবে অনেক খুনি আবার ধরা পড়ার আগে বেশ চালাকির খেলা দেখিয়েছে।' অসমঞ্জ প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'যেমন রংগা, বিল্লা, রমন রাঘব। তারপর বিদেশিদের মধ্যে ক্রিপেন, ইয়র্কশায়ার রিপার—।'

'হুঃ—ওদের কাজকর্মের ছিরি আর বলবেন না—' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল লোকটা, 'বাচ্চাছেলের মতো অগোছালো খুনের জন্যে হাজারোরকম সাজসরঞ্জাম চাই, গাদা-গাদা মিথ্যে কথা বলা—যতসব ফালতু ব্যাপার।'

'যাঃ—কী যে বলেন। আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন খুন করে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়াটা বাদামের খোসা ছাড়ানোর মতো সোজা!'

মিটিমিটি হাসি কিছুটা প্রশস্ত হল। বলল, 'হতে পারে—কে জানে।'

মন্তব্যের ভাব সম্প্রসারণের অপেক্ষায় রইল অসমঞ্জ, কিন্তু রহস্যময় মানুষটার কাছ থেকে কোনও ব্যাখ্যা ভেসে এল না। সিটে গা এলিয়ে কামরার কাঠের তৈরি ছাদের দিকে

তাকিয়ে কী এক গোপন রসিকতায় খুশি-খুশি হয়ে উঠল সে। মনে হল, এই আলোচনাকে সে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না, এবং এ নিয়ে কথাবার্তা চালানোর আগ্রহ তার ফুরিয়ে গেছে।

অসমঞ্জ হঠাৎই খেয়াল করল, ও লোকটার হাত দুটো খুঁটিয়ে দেখছে। হাতের রং ফরসা, আর আঙুলগুলো অস্বাভাবিকরকম সরু এবং লম্বা। সেগুলো এখন তার হাঁটুর ওপরে হালকা ছন্দে বাজনা বাজাচ্ছে।

অসমঞ্জ অন্যমনস্কভাবে হাতের বইটার পাতা ওলটাল। তারপর আরও একবার বইটা নামিয়ে রেখে বলল, 'ঠিক আছে, এতই যখন সোজা, বলুন, আপনি হলে কীভাবে খুন করতেন?'

'আমি?' প্রতি-প্রশ্ন করল লোকটা। চশমার কাচে আলো পড়ে তার চোখের দৃষ্টি শূন্য মনে হল। কিন্তু গলার স্বরে বোঝা গেল সে যেন মজা পেয়েছে। লোকটা হেসে বলল, 'আমার কথা আলাদা। খুন করতে গেলে আমাকে দুবার ভাবতে হবে না।'

'কেন?'

'কারণ, একটা গোপন কায়দা আমার জানা আছে।'

'তাই নাকি?' অস্ফুটে বললেও অসমঞ্জের স্বরে ব্যঙ্গ চাপা রইল না।

'নিশ্চয়ই। সে আর কঠিন কী!'

'সেটাই যে ঠিক কায়দা তা জানলেন কেমন করে? আপনি নিশ্চয়ই আর যাচাই করে দেখেননি?'

লোকটা থেমে-থেমে জবাব দিল, 'যাচাই করে দেখার দরকার নেই। আমার পদ্ধতির মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোথাও নেই। সেটাই হল সেই কায়দার আসল মজা।'

'বলা অনেক সহজ,' ছোট্ট করে মন্তব্য করল অসমঞ্জ, 'কিন্তু আপনার সেই নিখুঁত পদ্ধতিটা কী, একটু বলবেন?'

'কী করে ভাবলেন মুখের কথা ফেলতে না ফেলতেই সেটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেব?'

ধীরে-ধীরে চোখের নজর অসমঞ্জের ওপর নিয়ে এল লোকটা: 'তা ছাড়া এভাবে শিখিয়ে দেওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে। আপনাকে দেখে অবশ্য নিরীহ বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু বিল্লার চেহারাও নিরীহ ছিল। অন্য লোকদের জীবন-মরণের পাক্কা মালিক হয়ে বসলে তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।'

অবাক হয়ে অসমঞ্জ বলল, 'যাঃ, কী যে বলেন! কাউকে খুন করার কথা আমি ভাবতে যাব কোন দুঃখে?'

'ভাববেন...ঠিক ভাববেন,' লোকটা বলল, 'পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার মতো নিখুঁত অস্ত্র হাতে পেলে যে-কেউই খুন করার কথা ভাববে। খুনকে ঘিরে আমাদের দেশের আইন এত নিয়মকানুনের ফ্যাঁকড়া লাগিয়ে রেখেছে কেন বলতে পারেন? কারণ খুনটা যে-কেউ করতে পারে, এটা দু-বেলা ভাত খাওয়ার মতোই ন্যাচারাল।'

'কিন্তু এ তো আপনার কল্পনা!' প্রতিবাদ করল অসমঞ্জ।

‘আপনার তাই মনে হচ্ছে? অবশ্য বেশিরভাগ লোকই এই কথা বলবে। কিন্তু তা হলেও আমি তাদের বিশ্বাস করি না। অন্তত যেখানে ক্যারাসল নাইট্রেট যে-কোনও ওষুধের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।’

‘কী নাইট্রেট?’ তীক্ষ্নস্বরে জানতে চাইল অসমঞ্জ।

‘হুঁ—। আপনি ভাবছেন আমি বোধহয় বেফাঁস কিছু বলে ফেললাম। উহুঁ, আসলে ওই জিনিসটার সঙ্গে আরও দু-একটা জিনিস মেশাতে হয়—সবগুলোই যেখানে-সেখানে সস্তায় পাওয়া যায়। মাত্র চল্লিশ টাকা খরচ করলে আপনি এ-দেশের গোটা মন্ত্রিসভাকে সাফ করে দিতে পারেন। অবশ্য সবাইকে একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না—সবাই যদি একই দিনে ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা যায় তা হলে লোকে সন্দেহ করতে পারে।’

‘ঘুমের মধ্যে হার্টফেল? কেন?’

‘কারণ ঘটনা এইভাবেই ঘটে। জলের সঙ্গে বিষটা মিশিয়ে দেওয়ার পর সেটা খেয়ে কেউ যদি ঘুমোয় তা হলে সেটাই হবে তার লাস্ট ঘুম। আসলে ঘুমন্ত অবস্থাতেই বিষটা কাজ শুরু করে। এই কেমিক্যাল রিয়্যাকশনটা এত সহজ যে, কোনও পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে না। ফলে ডাক্তাররা ভাবে হার্টফেল।’

অস্বস্তিভরে লোকটাকে দেখল অসমঞ্জ। হাসিটা ওর পছন্দ হল না। কিছুটা উপহার এবং অহঙ্কার মেশানো হাসি।

‘জানেন, এই যে কাগজে প্রায়ই দেখা যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ-না-কেউ হার্টফেল করেছে, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত...’ একটা সিগারেট পকেট থেকে বের করে তাতে আগুন ধরাল লোকটা। খুব ধীরে আয়েস করে টান দিল ‘এইরকম স্বাভাবিক মৃত্যু সবসময়েই আমাদের নজরে পড়ছে। সুতরাং, খুনের পথ হিসেবে এই পদ্ধতিটা বেছে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক—যদি অবশ্য সব ওষুধ ঠিক-ঠিক মতো মিশিয়ে আসল জিনিসটা তৈরি করা যায়। আর সেটা শিখে গেলে তখন লোভহয় বারবার যাচাই করে দেখতে। এ-লোভের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। যদি শুনি যে, এই ওষুধে তৈরির ফরমুলা আপনার জানা আছে, তা হলে আপনার মতো কোনও নিরীহ সাধুপুরুষকেও আমি আর বিশ্বাস করব না।’

লম্বা সরু আঙুলগুলো আবার বাজনা বাজাতে লাগল হাঁটুর ওপরে।

কিছুটা অপমানিত হয়েই শ্লেষের খোঁচা ছুড়ে দিল অসমঞ্জ ‘কিন্তু আপনার বেলা? কাউকেই যদি বিশ্বাস না করবেন তা হলে নিজের বেলায়...।’

‘ঠিকই বলেছেন,’ নির্লজ্জভাবে উত্তর দিল লোকটা, ‘আমি নিজেকেও বিশ্বাস করি না। কিন্তু একবার জেনে যখন ফেলেছি তখন সেটাকে তো আর অজানা করা যায় না! ব্যাপারটা হয়তো ঠিক নয়—কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই। তবে জেনে রাখুন, ঘুমের মধ্যে হার্টফেল আমি করছি না। আরে, বর্ধমান এসে গেছে দেখছি। চলি, নামতে হবে—একটু কাজ আছে।’

চটপট উঠে পড়ে জামাকাপড় ঝেড়ে নিল লোকটা। সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নিভিয়ে দিল। চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমাল বের করে কাচ দুটো মুছে নিল।

ট্রেন ক্রমে গতি কমিয়ে স্টেশনে এসে থামল। চশমা চোখে লাগিয়ে মুচকি হেসে ছোট্ট করে 'চলি—' বলল সে। তারপর নেমে পড়ল ট্রেন থেকে।

বাইরে তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে।

মাথা ঝুঁকিয়ে স্টেশনের চাঞ্চল্য ও কোলাহলকে উপেক্ষা করে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল লোকটা। জানলা দিয়ে যতদূর দেখা যায় লোকটাকে দেখল অসমঞ্জ।

'পাগল, না আর কিছু—' মনে-মনে ভাবল ও, 'যাক, এবার একটু একা-একা জিরিয়ে নেওয়া যাবে...।'

'নর্তকীর অপমৃত্যু'-তে আবার ফিরে এল অসমঞ্জ, কিন্তু বারেবারেই ওর মনোযোগ বিগড়ে যেতে লাগল।

ওই বিষটার কী যেন নাম বলল লোকটা? কীসের নাইট্রেট যেন?

শত চেষ্টা করেও নামটা মনে করতে পারল না ও।

পরদিন বিকেলে খবরটা নজরে পড়ল অসমঞ্জের। সকালে ভালো করে কাগজ পড়ে ওঠার সময় পায়নি। বিকেলের দিকে তিন নম্বর পৃষ্ঠার অপাংক্তেয় খবরটায় হঠাৎই চোখ পড়ে গেল ওর। 'নিদ্রিত অবস্থায়' শব্দ দুটো প্রথমে ও দেখতে পায়। তখনই ছোট হরফের হেডিংটা ওর মনোযোগ টেনে নেয়। নইলে গোটা খবরটাই হয়তো ওর চোখ এড়িয়ে যেত।

নিদ্রিত অবস্থায় ব্যবসায়ীর মৃত্যু

৭ আগস্ট, বর্ধমান: আজ রাতে কমল বিশ্বাস (৫৫) নামে জনৈক ব্যবসায়ী নিদ্রিত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করে। ঘটনাটি অস্বাভাবিক ও বিচিত্র সন্দেহ করে ব্যবসায়ীর স্ত্রী সুলেখাদেবী পুলিশের দ্বারস্থ হন। তাঁর বক্তব্য, স্বামীর কাছ থেকে কোনও যন্ত্রণার শব্দ তিনি শোনেননি বা কোনও অস্থিরতা তাঁর চোখে পড়েনি। এ ছাড়া, আগে ভদ্রলোকের কখনও হৃদরোগের লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু পুলিশি পরীক্ষায় জানা গেছে, এ-মৃত্যু স্বাভাবিক হৃদরোগে মৃত্যু। যদিও এরকম সাধারণত দেখা যায় না। ভদ্রলোকের পরিবারবর্গ ও তাঁদের পারিবারিক ডাক্তার এ-অভিমত মানতে রাজি হননি, তাঁরা...।

'এ তো অদ্ভুত কাকতালীয় দেখছি,' ভাবল অসমঞ্জ, 'বর্ধমানেই ঘটল ঘটনাটা। ট্রেনে আমার সঙ্গী সেই রহস্যময় ভদ্রলোক খবরটা পেলে হয়তো কৌতূহলী হতেন—যদি অবশ্য উনি এখনও বর্ধমানে থেকে থাকেন।'

যদি একবার কোনও বিশেষ জিনিসের দিকে কারও মনোযোগ পড়ে, তা হলে সেটা ধীরে-ধীরে মাথার ভেতরে গেড়ে বসে। তখন রাস্তাঘাটে খবরের কাগজে শুধু ওই জিনিসটাই চোখে পড়ে সবার আগে। অসমঞ্জেরও ঠিক তাই হল। রাতদিন শুধু ওর চোখে পড়তে লাগল 'ঘুমের মধ্যে' হার্টফেল করে মৃত্যুর ঘটনা। ও অবাক হয়ে ভাবল,

‘ভারতবর্ষে এত লোক ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হার্টফেল করে মারা যায়! আশ্চর্য, আগে তো কখনও খেয়াল করিনি!’

সকাল-বিকেল-সন্ধ্যা-রাত্রি এই একটা জিনিস মায়াবী পিশাচের মতো অসমঞ্জকে অনুসরণ করে চলল। ঘটনা পরম্পরা বারবার সেই একই: ‘ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু, মৃতদেহ আবিষ্কার, সন্দেহ, পুলিশি তদন্ত, ময়না তদন্ত এবং ফলাফল, যথারীতি স্বাভাবিক মৃত্যু।’ ডাক্তারি মতে, হার্টফেল করে মৃত্যু। ব্যস, সব শেষ। সুতরাং, ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার যে-অভ্যেস অসমঞ্জের ছিল, সেটা শিগগিরই ছেড়ে দিল ও। আর সেই নাম-ভুলে-যাওয়া জিনিসের নাইট্রেটের নামটা দিন-রাত মনে করার চেষ্টা করতে লাগল।

খবরের কাগজের প্রতিটি পৃষ্ঠা রোজই তন্নতন্ন করে পড়ে অসমঞ্জ—যদি কোনওরকমে একটা সপ্তাহ হার্টফেলের খবর ছাড়াই পার হয়ে যায়। সেরকম হলে একইসঙ্গে ও স্বস্তি পায়, আবার হতাশও হয়।

একদিন ওর নজরে পড়ল, জনৈক প্রৌঢ় বিজ্ঞানী ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা গেছেন। বিজ্ঞানীর স্ত্রী পূর্ণ যুবতী এবং একজন যুবকের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে ছিল। সুতরাং পুলিশ সন্দেহ করতে শুরু করল। কাঠগড়ায় তুলল বউটিকে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আর ডাক্তারি রিপোর্টের জোরে সে ছাড়া পেয়ে গেল। ঘরে বসে-বসে হাত কামড়াতে লাগল অসমঞ্জ। নাইট্রেট। নাইট্রেট। কীসের যেন নাইট্রেট? আপ্রাণ চেষ্টায় ট্রেনের আগন্তুকের বলা নামটা মনে করতে চাইল ও। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না।

এর পরের ঘটনা ঘটল একবারে অসমঞ্জের নিজের পাড়ায়। রামতনু চন্দ্র নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। এ ছাড়া তার বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিলে আধগ্লাস জলও পাওয়া গেল। বাড়িতে বুড়ো ছাড়া তার এক অল্পবয়েসি ভাইপো থাকত। সে-ই ছিল বুড়োর তিনকুলে একমাত্র আত্মীয়। বুড়ো মারা যেতে ছেলেটাই খবর দিল পুলিশকে। তার জেঠু নাকি এভাবে হার্টফেল করে মারা যেতে পারে না। তার হার্ট নাকি রেসের ঘোড়ার মতো তেজি ছিল ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু পুলিশি তদন্তের রিপোর্ট বেরোল সেই একই। আর জানা গেল, বুড়ো মারা যাওয়ায় তার ভাইপো বুড়োর রেখে যাওয়া প্রায় দেড়লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছে।

অসমঞ্জ সবই বুঝল, কিন্তু ওর হাত-পা বাঁধা। কোনও প্রমাণ নেই। ও এও বুঝল, কোন দুঃসাহসে ওই ভাইপো নিজেই পুলিশে খবর দিয়েছিল। কারণ, সে আগে থেকেই জানত, পুলিশ কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তার জেঠুর কপালে ‘হার্টফেল করে স্বাভাবিক মৃত্যু’-ই লেখা আছে।

সেইদিন সন্ধেবেলায় বরাবরের অভ্যেসমতো পায়চারি করতে বেরোল অসমঞ্জ। নিতান্তই কৌতূহল ওকে টেনে নিয়ে গেল রামতনু চন্দ্রের বাড়ির দিকে। বাড়ির বন্ধ জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে ও যখন উঁকিঝুঁকি মারছে, ঠিক তখনই বাগানের দিকের দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। রাস্তার আলোয় তক্ষুনি তাকে চিনে ফেলল অসমঞ্জ।

‘এই যে—’ ডেকে উঠল ও।

‘আরে, কী ব্যাপার, আপনি?’ লোকটা হালকা চালে বলল, ‘অকুস্থল পরীক্ষা করতে এসেছেন? তা কী পেলেন বলুন?’

‘না, না।—ওসব কিছু না,’ বিব্রত হয়ে বলল অসমঞ্জ, ‘রামতনুবাবুকে আমি চিনতাম না। খুব অদ্ভুতভাবে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই না?’

‘হ্যাঁ, যা বলেছেন। আপনি বুঝি কাছেই থাকেন?’

‘হ্যাঁ—’ উত্তর দিল অসমঞ্জ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এ-কথা না বললেই ভালো হত। ও পালটা প্রশ্ন করল, ‘আপনিও কাছাকাছি থাকেন নাকি?’

‘না, না।’ জবাব দিল লোকটা, ‘আমি এখানে একটু নিজের কাজে এসেছিলাম।’

‘আগেরবার যখন আমাদের দেখা হয়েছিল, তখন আপনি কী কাজে যেন বর্ধমান যাচ্ছিলেন।’

ওরা এখন পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে। অসমঞ্জ আনমনাভাবেই নিজের বাড়ির পথ ধরেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমতা-আমতা করে বলল লোকটা, ‘হ্যাঁ। কাজের ব্যাপারে আমাকে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কখন যে কোথায় আমার ডাক পড়বে তা আমি নিজেও জানি না।’

‘আপনি যখন বর্ধমানে ছিলেন তখনই তো ওখানকার এক ব্যবসায়ী ঘুমের ঘোরে হার্টফেল করে মারা গেল, তাই না? অসতর্কভাবে মন্তব্য ছুড়ে দিল অসমঞ্জ।

হ্যাঁ। বড় আশ্চর্য কোইনসিডেন।’ চকচকে কাচের পিছন থেকে আড়চোখে ওর আপাদমস্তক দেখে নিল লোকটা ‘ওই ব্যবসায়ী বউ তো এখন বিরাট বড়লোক। দেখতে শুনতেও ভালো—স্বামীর চেয়ে বয়েস অনেক কম ছিল।’

ওরা অসমঞ্জের বাড়ির দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

‘এই আমার বাড়ি। আসুন, এক কাপ করে চা খাওয়া যাক।’ প্রস্তাবটা দিয়েই অসমঞ্জের আবার মনে হল কাজটা ও ঠিক করল না।

লোকটা কিন্তু ওর প্রস্তাবে সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিল। ওরা দুজনে বাড়িতে ঢুকে বসবার ঘরে গুছিয়ে বসল।

অসমঞ্জ সংসারে একা। সুতরাং চা ও নিজেই তৈরি করে নিয়ে এল। তারপর চিনি নাড়তে-নাড়তে বলল, ‘আজকাল ঘুমের ঘোরে হার্টফেল করাটা খুব কমন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ একটু ইতস্তত করে ও আরও বলল, ‘বিশেষ করে ট্রেনে আপনার সঙ্গে ওই বিষয়ে কথা হওয়ার পর থেকে জিনিসটা আমার আকছারই চোখে পড়ছে—’ সপ্রতিভভাবে একটু হাসল ও: ‘জানেন, আমি ভাবছিলাম...কেউ হয়তো আপনার সেই ওযুধটার নাম জেনে ফেলেছে, তারপর...। কী যেন নাম ওযুধটার?’

লোকটা প্রশ্নটাকে কোনওরকম আমল না দিয়ে সরাসরি এড়িয়ে গেল। বলল, ‘না, না। আমি ছাড়া ওই কেমিক্যালটার কথা আর কেউ জানে না। অন্য কী একটা ওযুধের খোঁজ করতে-করতে নেহাতই ঘটনাচক্রে আমি ওই কেমিক্যালটার খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। দেশের নানান জায়গায় সবাই একসঙ্গে একই ওযুধ আবিষ্কার করে বসে আছে, এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এসব ব্যাপার থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কত সহজে আর নিশ্চিন্তে কাউকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়।’

‘আপনি তা হলে একজন কম্পাউন্ডার?’ লোকটার কথা থেকে পাওয়া কয়েকটা বিশেষ শব্দের ওপর ভরসা করে অনুমানে ঢিল ছুড়ে দিল অসমঞ্জ।

না, কম্পাউন্ডার ঠিক নই—আমি হলাম গিয়ে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা— সব কাজই একটু-আধটু জানি।’ একটু থেমে তারপর: ‘ওঃ, আমার পরিচয়টাই আপনাকে দেওয়া হয়নি।’ হাসল সে: ‘আমার নাম শরণ গুপ্ত—।’

‘আমি অসমঞ্জ দত্ত। দেখছেনই তো—ব্যাচেলার। শিগগিরই যে বিবাহিত হয়ে পড়ব এমন সম্ভাবনা বিশেষ নেই। ছোটখাটো চাকরি করি। আর পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে এই ছোট্ট বাড়িটায় মাথা গুঁজে রয়েছি।’

‘ভালো আছেন মশাই। বিয়ে-থা যখন করেননি তখন ভাগ্যবানই বলতে হবে—’ হাসল শরণ গুপ্ত: ‘নাঃ, আপনার ওই নাইট্রেটের দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। যদি ফাটকা আর মেয়েছেলের রোগ থেকে দূরে থাকতে পারেন, তা হলে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, সারা জীবনে ওই অদ্ভুত দাওয়াই আপনার কখনও দরকার হবে না।’

মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে হাসল সে। আলো পড়ে চকচকে হয়ে উঠল চশমার কাচ। মুখের ভাঁজগুলো যেন আরও স্পষ্ট হল। ট্রেনের কামরার চেয়ে এখন তাকে আরও বেশি বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে।

‘না, সাহায্যের জন্যে আপনার কাছে আমাকে ছুটতে হবে না,’ ঠাট্টার সুরে বলল অসমঞ্জ, ‘তা ছাড়া, আপনাকে দরকার পড়লেই বা খুঁজে পাচ্ছি কোথায়!’

‘আমাকে খুঁজে বের করতে হবে না,’ শরণ গুপ্ত বলল, ‘আমিই আপনাকে খুঁজে নেব। ও আমার অভ্যেস আছে।’ দাঁত দেখিয়ে হাসল সে: ‘আচ্ছা, তা হলে চলি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। আর কখনও আমাদের দেখা হবে বলে মনে হয় না, তবে ভাগ্য আর নিয়তির কথা কে বলতে পারে, বলুন।’

শরণ গুপ্ত বেরিয়ে গেলে চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল অসমঞ্জ। টেবিলে রাখা নিজের আধখাওয়া জলের গ্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে মনটা একবার খচখচ করে উঠল। মনে পড়ল রামতনু চন্দ্রের কথা।

গ্লাসের জলটা অসমঞ্জের জিভে কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকল। জলের রংটাও কি একটু অন্যরকম ঠেকছে? রামতনু চন্দ্রের বাড়িতে কী করছিল শরণ গুপ্ত?

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা রহস্যময়। শরণ গুপ্তের আগমন, তারপর ওই...ওই নাইট্রেটের কথা। ইস, কীসের নাইট্রেট যেন? নামটা জিভের ডগায় এসে আটকে যাচ্ছে।

‘আমাকে খুঁজে বের করতে হবে না। আমিই আপনাকে খুঁজে নেব।’ এ-কথা বলে আসলে কী বলতে চাইছে শরণ গুপ্ত? এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যিই কি মারণ-ভোমরার খবর গুপ্ত জানে? নাঃ, পুরো ব্যাপারটা নেহাতই পাগলামো। নইলে কোন বিশ্বাসে সমস্ত গুপ্তকথা সে অসমঞ্জকে বলে দেয়? অসমঞ্জ যদি এখন পুলিশে গিয়ে সব ফাঁস করে দেয় তা হলেই তো শরণ গুপ্ত ফাঁসিতে চড়বে। অসমঞ্জের বেঁচে থাকাটাই এখন তার পক্ষে বিপজ্জনক।

গ্লাসের জলটা।

যতই ভাবতে লাগল ততই সন্দেহটা জোরদার হতে লাগল অসমঞ্জের মনে। গ্লাসের জলটার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ যেন আর স্বাভাবিক নেই। শরণ গুপ্তের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কি সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অসমঞ্জ? আর সেই সুযোগে...নাঃ, আর কোনও সন্দেহ নেই। হিসেব অনুযায়ী এখন অসমঞ্জের ঘুম পাওয়ার কথা, তারপর ঘুমের ঘোরে হার্ট অ্যাটাকে...উঁহু, এসবই হয়তো অসমঞ্জের কল্পনা। কিন্তু একটা ঘুম-ঘুম ভাব সত্যিই যেন টের পাচ্ছে ও...।

অসমঞ্জের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

মিনিটকুড়ি পরে তেঁতুল আর গরম জল খেয়ে বারচারেক বমি করে অবসন্ন শরীরে বিছানায় গা এলিয়ে দিল অসমঞ্জ। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে ও। নইলে আজকের ঘুমই ওর কালঘুম হত।

শরণ গুপ্তের চিন্তা মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না অসমঞ্জ। সেই সঙ্গে শরীরের কাঁপুনিটাকেও। মনের দিক থেকে ভীষণ ভেঙে পড়েছে ও। এবার থেকে জল খাওয়ার সময় ও খুব সাবধান হবে। ওর ভয় আর অস্বস্তি আরও তীক্ষ্ণ হল।

গ্লাসের বিষাক্ত জলের ঘটনাটা অসমঞ্জকে ভীষণ দুর্বল করে দিল। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় বারবার চারপাশে সতর্ক চোখে তাকায় ও। অচেনা লোক দেখলে দরজা খোলে না। সবসময়ে যেন একটা আতঙ্ক আশঙ্কা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ওকে। এমন সময় ঘটল আর-একটা নতুন ঘটনা।

অসমঞ্জের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের এক এলাকায় একজন শিল্পপতি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। যথারীতি ঘুমের ঘোরে। কিন্তু এবারে সামান্য হেরফের আছে। মাঝরাতে ভদ্রলোকের যন্ত্রণার চিৎকার শুনতে পেয়েছে তার স্ত্রী ও মেয়ে। এবং তাদের মতো ব্যাপারটা রীতিমতো অস্বাভাবিক। যদিও ভদ্রলোকের বড়ছেলের মত অন্যরকম। কেন যে অন্যরকম তা অসমঞ্জ এখন ভালোই আন্দাজ করতে পারছে। সুতরাং ব্যাপারটা আদালতে ওঠার পর শুনানি দেখতে সেখানে গেল ও।

রায় বেরোল, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। তাতে অসমঞ্জ অবাক হল না। কিন্তু কোর্ট ছেড়ে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই একটা দৃশ্য ওকে ভীষণ অবাক করে দিল। আধময়লা চেক শার্ট ও ঢোলা কালো প্যান্ট। খুব চেনা মুখ। শরণ নাইট্রেট গুপ্ত। সে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠতে যাচ্ছে।

পিছন থেকে ছুটে গিয়ে শরণ গুপ্তের ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল অসমঞ্জ।

'মিস্টার গুপ্ত।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল ও। সাংঘাতিক জোরে তার কাঁধ খামচে ধরল।

'কী ব্যাপার, আপনি?' ঘুরে তাকাল গুপ্ত। চোখে-মুখে বিরক্তি: 'কোর্টে গিয়েছিলেন নাকি?' অসমঞ্জের হাতটা কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিল সে। স্বাভাবিক হয়ে হাসল। তারপর বলল, 'বলুন স্যার, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'এসব আপনার কীর্তি, মিস্টার গুপ্ত। সব আপনার কীর্তি।' অসমঞ্জ প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'সেদিন আপনি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন।'

'খুন? বলছেন কী? আপনাকে কেন খুন করতে যাব।'

'আপনাকে ফাঁসি যেতে হবে।' ভয়ংকর স্বরে গর্জে উঠল অসমঞ্জ।

চারিদিকে লোকজনের ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল। এবার একজন পুলিশ অফিসার ভিড় হটিয়ে সামনে এগিয়ে এল। অসমঞ্জকে ঠেলে সামান্য সরিয়ে দিল। বলল, 'কী হয়েছে? ঝঞ্ঝাট কীসের?'

শরণ গুপ্ত নিজের রগে আঙুলের টোকা মেরে অসমঞ্জের দিকে দেখিয়ে ইশারা করল। বলল, 'না, না, কিছু হয়নি। আমি কোর্টে ঢুকেছি বলে এই ভদ্রলোক একটু আপত্তি করেছিলেন। তাতে আমি কার্ড দেখাই। তখন হঠাৎই উনি খেপে গিয়ে আমাকে অ্যাটাক করলেন। দয়া করে ওঁর ওপরে একটু নজর রাখবেন...।'

'ঠিক বলেছেন...' একজন পথচারী বলে উঠল।

'এই লোকটা—এই লোকটা আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে!' অসমঞ্জ বলল।

পুলিশ অফিসার বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক, আছে, আমি দেখছি। কোর্টের ভেতরটা যা গরম তাতে মাথা গরম হওয়াটা তেমন আশ্চর্যের নয়...।'

'এই লোকটাকে ছাড়বেন না।' চিৎকার করে উঠল অসমঞ্জ, 'এই লোকটা—শরণ গুপ্ত —এ জলের গেলাসে বিষ মিশিয়ে বহু লোককে খুন করেছে। আমি ওকে ছাড়ব না।'

পুলিশ অফিসার শরণ গুপ্তের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল। তারপর বলল, 'আপনি যান, আমি দেখছি—' অসমঞ্জের কাছে এসে হাত চেপে ধরল অফিসার: 'শুধু-শুধু কেন মাথা গরম করছেন? ওই ভদ্রলোকের নাম শরণ গুপ্ত নয়। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে—।'

'তাই নাকি?' খানিকটা অবাক হল অসমঞ্জ। বিভ্রান্ত হল। জানতে চাইল, 'আসল কী নাম ভদ্রলোকের?'

'ওসব বাদ দিন।' হাত নেড়ে অফিসার বলল, 'এবারে ঠান্ডা মাথায় চলুন দেখি।'

ততক্ষণে অন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে শরণ গুপ্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চারপাশে তাকিয়ে দর্শকদের কৌতুকভরা উজ্জ্বল মুখগুলো দেখল অসমঞ্জ। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আমারই একটু ভুল হয়েছে। চলুন, থানায় চলুন, সব আপনাকে খুলে বলব...।'

শিথিল পায়ে যখন অসমঞ্জ থানার বাইরে বেরিয়ে গেল, তখন পুলিশ অফিসারটি একজন সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী দাস, কী বুঝলে?'

সার্জেন্ট দাস হাসল, বলল, 'বদ্ধ পাগল। জলের গেলাসে বিষ মিশিয়ে ঘুমের ঘোরে হার্টফেল করিয়ে মারছে। আজব কায়দা বটে!'

'হুম—' বলল অফিসার, 'যাক, লোকটার নাম-ঠিকানা তো রইল—দরকার হলে আরও খোঁজখবর করা যাবে।'

সে-বছর শীতটা খুব জাঁকিয়ে বসল শহরতলির ওপর। নতুন তৈরি হওয়া অভ্যেসমতো আদালতে শুনানি দেখতে গিয়েছিল অসমঞ্জ। শীতের ছুঁচ যেন সরাসরি হাড়ে এসে বিঁধছে। পথের ওপর কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর শান্ত নদীর ওপর কুয়াশার পাহাড় মেঘের মিনারের মতো জমাট বেঁধে স্থির।

কোর্টে তেমন ভিড় হয়নি। পুরোনো আমলের মলিন ঘর। অকালসন্ধ্যার অন্ধকার এড়াতে ঘরের হলদে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। শীতের প্রকোপ রুখতে সকলেই মুড়িসুরি দিয়ে রয়েছে। একটু দূরের লোককে ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না। অসমঞ্জের শরীরটা ঠান্ডায় যেন কাহিল হয়ে পড়েছে। সমস্ত হাড়গুলো কনকন করছে। হয়তো এখুনি জ্বর আসবে।

অতিকষ্টে চোখ মেলে কোর্টরুমের এক কোণে একটা চেনা মুখ নজরে পড়ল অসমঞ্জের। আপনা থেকেই ওর হাত চাদরের নীচে, প্যান্টের পকেটে চলে গেল। মোটা শক্তপোক্ত একটা জিনিসের ওপর চেপে বসল হাতের আঙুল। খানিকটা ভরসা পেল ও। শরণ গুপ্তের সঙ্গে রাস্তায় সেদিন গোলমাল হওয়ার পর থেকেই এই অস্ত্রটা ও সবসময় কাছে-কাছে রাখছে। না, রিভলভার নয়—রিভলভার জোগাড় করা মুশকিল, আর অসমঞ্জ সেসব চালাতেও জানে না। তার চেয়ে এই লোহার পাইপের ছোট্ট টুকরোটা অনেক কাজের। সেটাকে ছদ্মবেশ পরানোর জন্য কাপড়ে জড়িয়ে বেশ একটা জুতসই অস্ত্র তৈরি করেছে ও। এটা এখন ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বরাবরের মতোই অনিবার্য রায় শোনানো হল। দর্শকরা ভিড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল কোর্টের বাইরে। অসমঞ্জ তাড়াহুড়ো করতে চাইল, কারণ, সেই লোকটাকে ভিড়ে হারিয়ে ফেললে চলবে না। তাই কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ও এগোতে লাগল।

দরজার বাইরে বেরিয়েই ও শিকারের প্রায় নাগাল পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটা মোটাসোটা লোক মাঝপথে এসে গিয়ে সব বানচাল করে দিল। অসমঞ্জ মোটা লোকটার কাঁধে ভর করে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে।

চারপাশ থেকে বিরক্তিকর অস্ফুট মন্তব্য ভেসে এল। অসমঞ্জের শিকার ঘুরে তাকাল পিছনে। রিমলেস চশমার কাচ চকচক করে উঠল পড়ন্ত আলোয়। কিন্তু অসমঞ্জকে সে চিনতে পারল না। সামনে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

অসমঞ্জ চুপিসাড়ে লোকটাকে অনুসরণ করল। লোকটা বেশ চটপট পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। একবারের জন্যও পিছনে তাকাচ্ছে না। কুয়াশা আরও ঘন হয়ে উঠেছে। চার-পাঁচ গজ সামনে নজর চলে না।

তৎপর শ্বাপদের মতো তাকে অনুসরণ করে চলল অসমঞ্জ। কোথায় চলেছে লোকটা? বাড়ির পথে? সামনের বড়রাস্তায় বাস ধরবে? কই, না তো। ওই তো সে বাঁক নিচ্ছে ডানদিকের সরু গলিটায়।

কুয়াশায় বলতে গেলে অন্ধ হয়ে গেল অসমঞ্জ। নিছক পায়ের শব্দ শুনে এগিয়ে যেতে লাগল ও। নিস্তব্ধ পথে শুধু দু-জোড়া পায়ের শব্দ কেমন বিচিত্র ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছে। শিকার ও শিকারি। বহু খুনের বোঝা মাথায় নিয়ে ওই লোকটা এখন সমাজের শত্রু। আইন তাকে সাজা দিতে পারবে না। সুতরাং অসমঞ্জের মতো কোনও দায়িত্বশীল নাগরিককেই সেই ভার নিতে হবে। ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

অল্প-অল্প ঠান্ডা বাতাস এসে পরশ বুলিয়ে দিল অসমঞ্জের চোখে-মুখে। ওরা কি তা হলে নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে?

হঠাৎই চারপাশের বাড়ি-ঘর অদৃশ্য হয়ে গিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। কাছেই চোখে পড়ছে বিবর্ণ ঝাপসা একটা রাস্তার আলো। অসমঞ্জের সামনে পায়ের শব্দ থমকাল। নিঃশব্দে এগিয়ে চলা অসমঞ্জ দেখতে পেল লোকটা ঠিক আলোটার

নীচেই থমকে দাঁড়িয়েছে। পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কী যেন খুঁটিয়ে দেখছে।

ঠিক পাঁচ পা এগোতেই লোকটার একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল অসমঞ্জ। পকেট থেকে বের করে নিল কাপড়ে জড়ানো পাইপের টুকরোটা।

লোকটা মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। লোহার পাইপটা সর্বশক্তিতে তার মাথায় বসিয়ে দিয়েছে অসমঞ্জ। একবার। দুবার। তিনবার।

দাঁতে দাঁত চেপে অসমঞ্জ বলল, 'শয়তান, এবার তোকে পেয়েছি।'

অসমঞ্জর আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। সর্দি জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল ও। দিনসাতেক পর যখন শরীরে আবার জোর ফিরে পেল, তখন আবহাওয়ার অনেক উন্নতি হয়েছে। তাজা মিষ্টি বাতাস বসন্তের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসছে। সুতরাং দুর্বলতা পুরোপুরি না কাটলেও সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল অসমঞ্জ। একটা পাক্ষিক পত্রিকা কিনে পায়ে-পায়ে গিয়ে বসল পাড়ার একটা চায়ের দোকানে। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে পত্রিকার পাতায় চোখ বোলাতে লাগল।

হঠাৎই পাশের টেবিলের কথাবার্তার একটা টুকরো কানে এল অসমঞ্জের। ভীষণভাবে চমকে উঠল ও। যে-শব্দটা ওর কানে এসেছে সেটা 'নাইট্রেট...'।

পাশের টেবিলের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। এক তরুণ ও এক প্রৌঢ়। একজনের কাঁধে ক্যামেরা ও কিটব্যাগ। অন্যজনের হাতে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ। তরুণ তখন কথা বলছে।

'...অ্যাকসিডেন্ট, সুইসাইড, মার্ডার, পিকিউলিয়ারভাবে মারা যাওয়ার কেস—এসব মিত্তিরদা যেরকম পারত, আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমার তো দাদা বেশ অসুবিধেই হচ্ছে।'

প্রৌঢ় বলল, 'শোনো, চক্রবর্তী, মন দিয়ে চেষ্টা করো। এত অল্পে হাল ছেড়ে দিলে রিপোর্টারদের চলে না। আরে বিজন মিত্তির ছিল বিজন মিত্তির! ওরকম দুঁদে ক্রাইম রিপোর্টার ভারতবর্ষে খুব কম জন্মেছে—।'

'কী অদ্ভুতভাবেই না মিত্তিরদা মারা গেল। যে-লোকটা ঘুমের ঘোরে হার্টফেল করে সেদিন মারা গিয়েছিল, তার মামলার হিয়ারিং-এর পর মিত্তিরদা যাচ্ছিল লোকটার বিধবা স্ত্রীকে ইনটারভিউ করতে। এমন সময় কেউ পেছন থেকে এসে মিত্তিরদার মাথায় ডান্ডা মারে। হয়তো এ-পাড়ারই কোনও গুন্ডা-টুন্ডা পুরোনো রাগ মিটিয়েছে। পাড়াটা তো বিশেষ ভালো নয়। তা ছাড়া ক্রাইম রিপোর্টিং করতে গিয়ে মিত্তিরদা যেসব রিস্ক নিত—।'

'মিত্তির দারুণ মজার পাবলিক ছিল। একটু আগেই তোমাকে যা বলছিলাম। ওর সেই ক্যারাসল নাইট্রেট নিয়ে নিখুঁত খুনের গপ্পো। একখানা মাস্টারপিস।'

অসমঞ্জের গোটা শরীর কেঁপে উঠল। এই 'ক্যারাসল' শব্দটাই এতদিন ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে। এক অদ্ভুত আচ্ছন্নভাবে ওর চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে এল। মাথাটা যেন ভীষণভাবে দুলে উঠল।

‘...তোমার দিকে গম্ভীর চোখে তাকিয়ে নিট গপ্পোটা ফেঁদে বসবে...’ প্রৌঢ় সাংবাদিক তখনও বলে চলেছে, ‘তোমার মনেও হবে না যে, ক্যারাসল নাইট্রেট নামে আসলে কোনও বিষ নেই। পুরো কেসটাই ঢপের চপ। বেশিরভাগ সময়ে এই গল্পটা ও শোনাত ট্রেনে—ফাঁকা কামরায় কোনও লোককে একা পেলে। তার ওপর, তার হাতে যদি কোনও ক্রাইম নভেল থাকে তা হলে তো তার আর রক্ষে নেই। বিজন মিত্তিরের ক্যারাসল নাইট্রেটের গপ্পো তাকে শুনতেই হবে। আর, আশ্চর্য কী জানো, চক্রবর্তী? অনেকে ওর ওই গল্প বিশ্বাসও করে ফেলত। একবার তো একটা লোক মিত্তিরকে টাকা অফার করেছিল ওই বিষ—।’

হঠাৎই অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠল তরুণ সাংবাদিক। দ্বিতীয়জনও কথা থামিয়ে চমকে ঘুরে তাকাল।

কারণ, পাশের টেবিলে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছে অসমঞ্জ দত্ত।

মনে করি, খুনির নাম এক্স

আসুন, ইন্সপেক্টর—আসুন। এই দুর্ঘটনা-গৃহে আপনাকে স্বাগত জানাই। কী বলছেন? দুর্ঘটনা নয়, খুন? না, না, খুন কেমন করে হবে! খামোকা কেন কাকাকে কেউ খুন করতে যাবে? হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে, আমার কাকা বিনোদন সামন্ত লোক খুব সুবিধের ছিল না। নামের সঙ্গে কাজকর্মের দারুণ মিল ছিল। হোল লাইফ বিনোদন করে গেল কোনওরকম অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স ছাড়াই। কাকিমার দিকে ফিরেও তাকাত না। আর ছেলে, রাকেশ, সে যেন থেকেও নেই। ছেলেটা গতবছর স্টার পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করার পর রেজাল্ট নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল ওর বাবা তখন জলপথের একজন ইয়ারকে নিয়ে মাইফেল করতে রওনা দিচ্ছে। বুঝুন! রাকেশ মার্কশিট দেখাতে চাইলে জবাব দিল, দেখার আবার কী আছে! ওটা বাঁধিয়ে গলায় ঝুলিয়ে চরকি কাট। তা হলেই দেখুন কীরকম বাবা! বাবা তো নয়, একেবারে পিতাশ্রী!

আপনি আবার আমাদের স্টেটমেন্ট নেবেন? কোনও মানে হয়! কী বলছেন? আপনার হাতে কিছু সূত্র এসেছে? পরিভাষায় যাকে বলে ক্লু? বেশ, আবার নিন জবানবন্দি। তবে, বন্দি করবেন না, প্লিজ—অন্তত আমাকে। আমি মশাই আগাপাস্তলা নির্দোষ। যদিও আমি কাকাকে খুব একটা পছন্দ করতাম না।

না, নতুন কী আর বলব!

পরশু সকালে কাকিমা প্রথম চেঁচামেচি শুরু করে। আপনার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, ইন্সপেক্টরবাবু। কাকা আলাদা ঘরে শুত। কাকিমা আর রাকেশ অন্য ঘরে। সকালে কাকার জন্যে চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে কাকিমা দ্যাখে দরজা তখনও বন্ধ। কাকিমা হেভি পতিব্রতা ওয়াইফ। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দরজা ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার। রাকেশ ছুটে এল। একতলার ঘর থেকে আমি ছুটে গেলাম। ছোটকা ছুটে এল। হ্যাঁ, ছোটকা মানে কাকার ছোটভাই—সনাতন সামন্ত। ওরও আবার নামের সঙ্গে কাজকর্মের দারুণ মিল। একেবারে তিলক কাঁটা গৌর-নিতাই। দাদাকে—মানে, আমার কাকাকে—যমের মতো ঘেন্না করত। সুযোগ পেলেই জ্ঞান দিত, বলত, ভগবান তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবে।

তো ভগবান উচিত শিক্ষা দিল।

দরজা ভেঙে দেখি কাকা চন্দ্রবিন্দু।

কাকিমা একেবারে বাংলা সিনেমার মতো কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ছোটকা থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আর রাকেশ চোয়াল শক্ত করে মা-কে সামলানোর চেষ্টা করছিল।

আমার কথা জিগ্যেস করছেন, ইন্সপেক্টর?

আমি বাউন্ডুলে মানুষ। শখের নাটক-ফাটক করি। দু-একটা টিউশানি করি বটে, কিন্তু তাতে আর ক'পয়সা হয়! কাকাই আমাকে টাকাটা পয়সাটা দিত। কাকা চলে গিয়ে আমার বেশ প্রবলেম হয়ে গেল। ছোটকা আমাকে—এই দামড়া বেকার ভাইপোটাকে—খুব একটা লাইক করে না। সে যাই হোক, কাকা চলে যাওয়ায় আমি শক পেয়েছি কিনা জিগ্যেস করছেন? বেশক, বেশক। একে তো আত্মীয়, তার ওপরে লক্ষ্মী-টক্ষি দিত। তবে বেচারি কাকিমাকে উদোম টরচার করত। এখন রাকেশ বড় হয়ে গেছে...আগে তো বিনোদন সামন্তের মেইন বিনোদন ছিল যখন-তখন বউয়ের গায়ে হাত তোলা। আমি তো বহুবার প্রোটেস্ট করেছি, কাকাকে ধরে থামিয়েছি। কিন্তু পেটে জলপানি পড়ল কাকার আর জ্ঞান থাকত না। কী বলব আপনাকে...তখন খেঁদি-পেঁচিকেও নূরজাহান দেখাত। আর নূরজাহানকে খেঁদি-পেঁচি।

কী বলছেন? কাকা কীভাবে মারা গেছে? কেন, হার্টফেল করে! না, না—আপনার খুন বলে মনে হচ্ছে কেন? পোস্ট মর্টেমে সেরকম কিছু কি পাওয়া গেছে? ও, পাওয়া যায়নি! তবে আর সমস্যাটা কোথায়! কাকা পাতি হার্টফেল করে মারা গেছে। কী বলছেন? ইলেকট্রিক শক দিলেও মানুষ হার্টফেল করে মারা যায়? তা আপনি কি সেরকম কোনও ইয়ে, মানে, ক্লু পেয়েছেন?

না, দেখুন, একটা লম্বা ইলেকট্রিকের তার খুঁজে পাওয়াটা কোনও ব্যাপার নয়। আপনি কি বলতে চান এটা কোনও প্রমাণ? কোনও দরকারে কেউ তো তারটা কিনে থাকতেই পারে। কিন্তু তারটা আপনি পেলেন কোথায়? ছোটকার ঘরে! দাঁড়ান, ছোটকাকে ডাকছি। মিছিমিছি কাউকে সন্দেহ করা ঠিক নয়, ইন্সপেক্টর।

এই যে, ছোটকা, তুমি একটা লম্বা ইলেকট্রিকের তার কিনেছিলে? এই পুলিশ অফিসার বলছেন...কী কেনোনি! চমৎকার! দেখলেন তো, অফিসার, ছোটকা তার-টার কিছু কেনেনি। আপনার সন্দেহ-টন্দেহর কোনও মানে হয় না।

কী বলছেন? তারটা অন্য কেউ কিনে ছোটকার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল? যাঃ, এটা কখনও হয়! আর কে তার কিনবে! আমি, কাকিমা, রাকেশ...আমাদের কারও তার দরকার পড়েনি। কাকার পায়ের চেটোয় আপনি পোড়া দাগ পেয়েছেন বলছেন? হতে পারে কাকা হয়তো জ্বলন্ত সিগারেটের ওপরে ভুল করে পা ফেলেছিল। কেন, এটা অসম্ভব বলছেন কেন? পোড়া দাগ দু-পায়ের তলাতেই রয়েছে। হ্যাঁ, এটা একটু অদ্ভুত মানছি। একসঙ্গে দু-দুটো জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা—তা-ও আবার দু-পায়ের তলায়!

আচ্ছা, আপনিই বলুন—কাকাকে খুন করে আমাদের কী লাভ! কাকিমা নিশ্চয়ই নিজে থেকে বিধবা হতে চাইবে না! রাকেশের পক্ষে বাবাকে খুন করা অসম্ভব। ছোটকা ধার্মিক মানুষ। এ ধরনের লোক বিশ্বাস করে, কাউকে শাস্তি-টাস্তি যা দেওয়ার ভগবানই দেবেন। কী বলছেন, আমি? হাসালেন, ইন্সপেক্টর। যে আমাকে রোজ সোনার ডিম পেড়ে দেয় তাকে আমি খুন করতে যাব কেন! না, না, সন্দেহ আপনি করতেই পারেন। কারণ, সন্দেহ করার, জন্যেই আপনি মাইনে পান।

ইন্সপেক্টর, একটা গুপ্তকথা আপনাকে বলি। কাকা ব্যাপক ভিতু ছিল। ভূতের গল্প একটুও সহ্য করতে পারত না। টিভিতে ওরকম ফিলিম-টিলিম কিছু হলে ভয়ে কেঁপে উঠে টিভি অফ করে দিত। রাকেশকে এইসব ছবি দেখা নিয়ে বেশ বাজেভাবে বকাঝকাও

করত। খেয়াল রাখত না যে, ছেলে বড় হচ্ছে। এই তো রাকেশ এসেছে। ওকেই জিগ্যেস করে দেখুন—।

আচ্ছা, ইন্সপেক্টর, আপনাকে দেখে তো বেশ চালাক-চতুর বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই এলিমিনেশান থিয়োরির কথা শুনেছেন। কাকা যদি সত্যি-সত্যিই খুন হয়ে থাকে, তা হলে আপনি মনে-মনে একটা লিস্ট তৈরি করুন—তাতে লিখুন, কারা-কারা কাকাকে খুন করতে পারে। সেই লিস্টে নিশ্চয়ই আমাদের তিনজন কি চারজনের নামই থাকবে। এইবার আপনি যুক্তি দিয়ে, লজিক দিয়ে, অ্যানালিসিস করে একে-একে নাম বাদ দিয়ে লিস্টটাকে ছোট করে আনুন। মানে, মেথড অফ এলিমিনেশান আর কী! তা হলেই দেখবেন, সব নামই একে-একে বাদ হয়ে গেছে। হাতে রইল শূন্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

কী, আপনি ওসব লিস্ট-ফিস্ট বানাতে চান না? ওগুলো গল্পে-টল্পে হয়? আপনার টেকনিক একটু আলাদা? আপনি ভীষণ একবগ্গা টাইপের লোক দেখছি। বলুন তো, বাড়ি সার্চ করে আপনার কী লাভ! এখনও আমাদের অশৌচ কাটেনি, তার মধ্যে আপনার তত্ত্বতালাশের ঝঞ্ঝাট!

ওই দেখুন, আপনার সিপাইরা কী নিয়ে এসেছে। আশ্চর্য! এ তো দেখছি ড্রাকুলার ড্রেস! কালো আর লাল রঙের আলখাল্লা! লম্বা ছুঁচলো দুটো নকল দাঁত! কী বলছেন, কাকাকে এই পোশাক পরে কেউ হয়তো ভয় দেখিয়েছিল?

হ্যাঁ, কাকার হার্ট খুব উইক ছিল, তার ওপর কাকা ছিল রামভিতু—আগেই তো আপনাকে বলেছি। ড্রাকুলার মেকাপ নিয়ে রাতে কাকাকে কেউ ভয় দেখালেই কাজ শেষ। কিন্তু কে ভয় দেখাবে? আচ্ছা, আপনি আলখাল্লার হাইটটা মাপুন তো...হ্যাঁ, প্রায় সাড়ে পাঁচফুট। তা হলে তো কাকিমা আর রাকেশ সরাসরি বাদের খাতায়—ওদের হাইট অনেক কম। বাকি রইলাম আমি আর ছোটকা...আমাদের আপনি মিছিমিছি সন্দেহ করছেন।

কী বলছেন, আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনি? ড্রাকুলার ছদ্মবেশে কেউ কাকাকে ভয় দেখালেও কাজ হয়নি—কাকা তাতে মারা যায়নি! ও...তারপরই খুনি শিওর হওয়ার জন্যে কাকাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে খতম করেছে! ও মাই গড!

ড্রাকুলার ড্রেসটা কোথায় খুঁজে পেল ওরা? কী? আমার ঘরে! সুটকেসের ভেতরে! ইমপসিবল! না, না—খুঁজে পাওয়াটা অসম্ভব বলছি না, বলছি, ড্রেসটা আমার ঘরে থাকাটাই আজগুবি। বলুন তো, ওরকম হতচ্ছাড়া একটা ড্রেস আমি খামোখা কিনতে যাব কেন! না, না, আমার কোনও নাটকে ড্রাকুলার সিন-ফিন নেই। এ তো আচ্ছা মুশকিল! বলছি আমি কিচ্ছু জানি না, তবুও আপনি আমাকে হ্যারাস করছেন! বিশ্বাস করুন, আমি একটুও বানিয়ে বলছি না।

কী, আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে চাইছেন? নিয়ে কীসের সঙ্গে মেলাবেন? ও, ওটা আপনার সিক্রেট ব্যাপার! ভালো। না, না, আমি কিছু জানতে চাই না। আমি বরং জানাতে চাই যে, আপনি ঠিক পথে এগোচ্ছেন না। নিন, নিন, প্রাণভরে ছাপ নিন। এ-এ-এই। এবার ছোটকা, তুমি দাও। হুঁ, এইবার রাকেশ।

কী বললেন? কাকিমারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনার চাই? আপনি কি মানুষ, না কসাই! ঠিক আছে, মশাই ডাকছি। রাকেশ, যা তো, তোর মা-কে ডেকে দে। বল, হবিষ্যি পরে হবে। আগে খুনের তদন্ত। আমাদের রেসপেক্টেড ইন্সপেক্টর এই ফরমান জারি করেছেন।

এই যে, কাকিমা, কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমার ডানহাত আর বাঁ হাতের আঙুলের ডগাগুলো এই প্লেটটার ওপরে চেপে ধরো। ব্যস...কাজ শেষ। থ্যাংক ইউ, কাকিমা।

বলুন, আর কী বাকি রইল, ইন্সপেক্টর? এবার ছাপ মেলানোর কাজ শুরু করুন...।

কী বলছেন? আঙুলের ছাপ মিলিয়েই আপনি আসল খুনির সন্ধান পেয়ে গেছেন? যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন! বলছেন ঠাট্টা নয়! ঠিক আছে, বলুন, শুনি কে সেই মিস্টার এক্স।

ড্রাকুলার ড্রেসটা আমার সুটকেসে কেউ ঢুকিয়ে রেখেছিল...যাতে সন্দেহটা আমার ঘাড়ে পড়ে? আচ্ছা...তারপর? ও, ছোটকার ইলেকট্রিক তারের কেসটাও তাই! বাঃ, চমৎকার। বলুন, বলুন, আমি কান পেতে আছি।

কী, রাকেশ খুনিকে চেনে! ও-ই খুনের একমাত্র আই উইটনেস! খুনি রাকেশের খুব ক্লোজ? কী বলছেন আপনি! কাকিমা কখখনও এ-কাজ করতে পারে না। প্লিজ, আপনি কিন্তু লিমিটের বাইরে চলে যাচ্ছেন, ইন্সপেক্টর! কাকিমা কী টাইপের ওয়াইফ আপনি জানেন না! কাকা যতই ইয়ে হোক, কাকিমা সবসময় কাকাকে ভাবত—স্বামী নয়—স্বামীদেবতা। কাকিমার পক্ষে এ-কাজ অসম্ভব! প্লিজ, স্টপ, ইন্সপেক্টর...ফর গডস সেক শাট ইয়োর মাউথ। কাকিমা...।

কী, আপনার কথা আমি ঠিকমতো বুঝতে পারিনি? কাকিমা নয়, রাকেশ। রাকেশ ওর বাবাকে খুন করেছে! কীসব আনসান বকছেন আপনি! এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। জাস্ট...গেট...আউট!

আচ্ছা, রাকেশ কী করে খুন করবে বলুন তো! ওইটুকু ছেলে! সবে সতেরো ছুঁয়েছে। কাকার খাটে ওর আঙুলের ছাপ পেয়েছেন? সে তো থাকতেই পারে। কী বলছেন? ইলেকট্রিকের তারটার নানান জায়গায় ওরই আঙুলের ছাপ? ওর রাফ খাতায় আরও প্রমাণ পেয়েছেন? কী প্রমাণ? ও ডায়েরি লিখত! জানতাম না তো! কী লিখেছে সেখানে? মায়ের ওপরে বাবার টরচার ও আর সইতে পারছিল না? বাবাকে ও ভয় দেখিয়ে কিংবা শক দিয়ে খতম করবে? হতেই পারে না! ফুলের মতো ওইটুকু ছেলে! দেখি ওর সেই ডায়েরি...।

ও মাই গড! মা-কে এত ভালোবাসে ও! আমি বা ছোটকা যে-কাজ করতে পারিনি তাই করে দেখাল রাকেশ! আমার ছোট ভাইয়ের ওইটুকু বুকে এত সাহস লুকিয়ে ছিল!

এ তুই কী করলি, রাকেশ! এ তুই কী করলি! রাকেশ রে...রাকেশ...! এই দাদাটাকে একবার বললি না তোর মনের কথা? তোর মা-কে তুই এত ভালোবাসিস! আমিও তো তোর মা-কে ভালোবাসি...তোকে ভালোবাসি! মনে-মনে তোর বাবাকে আমি দুশো সাঁইতিরিশবার খুন করেছি। হ্যাঁ, দুশো সাঁইতিরিশবার। মনে-মনে। আর তুই করেছিস মাত্র একবার—তবে মনে-মনে নয়, সত্যি-সত্যি। কী করে পারলি রে তুই? আমাকে তুই ভালোবাসার টানে হারিয়ে দিলি?

ইন্সপেক্টর, প্লিজ, রাকেশকে আপনি ছেড়ে দিন। আপনার দুটি পায় পড়ি। ওর জীবন তো সবে শুরু। কত আলো, কত আকাশ ওর দেখার বাকি আছে। আর আমি? স্রেফ একজন বেকার যুবক, অন্যায় ভালোবাসা বুকের ভেতরে লুকিয়ে চোরের মতো বেঁচে আছি। বিশ্বাস করুন, রাকেশের জেল কিংবা ফাঁসি-টাসি হলে কাকিমা নির্ঘাত সুইসাইড করবে। আর ও সুইসাইড করলে...। তারপর বাকি থাকব শুধু আমি...। কিন্তু যে-দুজনের কথা ভেবে আমার ছন্নছাড়া ছিন্নছেঁড়া জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে করত, তারা

দুজনেই যদি না থাকে তা হলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী! সে বেঁচে থাকার কোনও মানে আছে বলে আপনি মনে করেন, ইন্সপেক্টর?

আচ্ছা, একটা লাস্ট রিকোয়েস্ট করব আপনাকে? একটা কথা রাখবেন আমার? আমাকে ফাঁসি দেবেন? কিংবা যাবজ্জীবন? প্লিজ, আপনার পায়ে ধরছি, ইন্সপেক্টর। হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি কাকাকে। আমিই খুন করেছি। আমি-আমি আমি! এবার অন্তত আমাকে আপনি অ্যারেস্ট করুন। প্লিজ, অ্যারেস্ট করুন আমাকে...।

আসুন, রাকেশের ওই দুরন্ত ভালোবাসার কাছে অন্তত একটিবারের জন্যে আমরা হেরে যাই...।

মরা মানুষের হাত

প্রতিদিন সকালে লক্ষ-লক্ষ মানুষ সুখের আশ্রয় ছেড়ে বাড়ি থেকে ঘুম-চোখ মুছতে-মুছতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর রওনা হয় রেল স্টেশানের দিকে। ট্রেন এলেই লাফিয়ে উঠে পড়ে। গন্তব্য শহরের অফিস। সেই অফিসের ভিড়ে আমিও থাকি। ভোরবেলা ঘুমজড়ানো চোখে ঘরের আরাম ছেড়ে বাইরে বেরোতে ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। ট্রেনে যাওয়া-আসার কষ্টের ব্যাপারে নতুন করে কিছু আর বলার নেই। গরমকালে যেমন গরম, শীতকালে তেমনই ঠান্ডা। অর্থাৎ, ট্রেন-ভ্রমণের আমেজটুকু আর পাওয়া যায় না। তবে একইসঙ্গে কষ্টটাও অভ্যেস হয়ে গেছে।

গত দু-মাস ধরে দেখছি ট্রেনগুলো কোন জাদুমন্ত্রবলে ঠিক-ঠিক সময়ে যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু হঠাৎই, কিছুদিন আগে, শুরু হল রেল ধর্মঘট। সুতরাং কলকাতায় যাতায়াতের ট্রেন উধাও হল।

ট্রেন বন্ধ থাকলে কলকাতা যাওয়ার একমাত্র উপায় হল গাড়ি অথবা ট্যাক্সি। তা হলে অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। শত-শত লোক শত-শত গাড়ি, ট্যাক্সি অথবা টেম্পো ধরে রওনা হয়েছে শহরের দিকে। একইসঙ্গে একে অপরকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এবং রেজাল্ট ট্র্যাফিক জ্যাম। সেসময় মনে রাগ, বিরক্তি ইত্যাদি মিশ্র অনুভূতির যে কী অদ্ভুত খেলা চলে তা এরকম অবস্থায় যে না পড়েছে সে ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। সেই ট্র্যাফিক জ্যামের লম্বা সারিতে আমিও গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। আর তখনই ঘটনার সূত্রপাত।

আমার বউ রুমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। ফলে ড্রাইভারকেও ছুটি দেওয়া আছে। সুতরাং আমি নিরুপায় হয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছি অফিসে। নইলে ট্রেন চললে পর পেট্রলের ক্রমে বেড়ে-ওঠা দামের কথা ভেবে গাড়ি নিয়ে সচরাচর অফিসে যাই না। এখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েও দেখছি বিপত্তি।

প্রথম কয়েকমাইল আমাদের সারিটা ধীরে-ধীরে বেশ এগোতে লাগল, কিন্তু একটা মোড় ঘুরতেই প্রচণ্ড শক্তিতে ব্রেক কষলাম। আর-একটু হলেই সামনে দাঁড়ানো একটা সবুজ অ্যামবাসাডারের পেছনে ধাক্কা মারছিলাম। আমার সামনে পাশাপাশি তিন সার গাড়ি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। যতদূর চোখ যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। মনে-মনে বেশ বুঝলাম, শহরে পৌঁছনো পর্যন্ত ওই সবুজ অ্যামবাসাডারের পশ্চাৎদেশ হয়তো সারাক্ষণই আমাকে দেখতে হবে। তবে সবুজ রং দেখাটা শুনেছি ভালো—চোখ তাজা থাকে।

অফিসে পৌঁছতে ক'ঘণ্টা দেরি হবে সে-ভাবনা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন প্রশ্ন, এই গাড়ির জটলা থেকে মুক্তি পাব তো?

হঠাৎই পাশের এক গাড়ির আরোহী জানালেন, সামনে কোথায় নাকি একটা টেম্পো খারাপ হয়ে গেছে। চমৎকার! এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এগোনো পেছোনো সবই বন্ধ। হয়তো গাড়ির সিটে বডি কাত করে ঘুমিয়েই পড়তাম, কিন্তু মাঝে-মাঝে সবুজ অ্যামবাসাডারটা কয়েক ইঞ্চি করে এগোচ্ছে আর যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় আমি সেই মহার্ঘ ইঞ্চিগুলো দখল করছি।

তখনই খেয়াল পড়ল স্টেশান ওয়াগনটার দিকে। মেরুন রঙের গাড়িটা আমার ডানদিকেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে। আমার ডানহাতের কনুই খোলা জানালার কিনারায় রাখা, আর ঠিক জানলা ঘেঁষেই মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা। এত কাছে যে, ইচ্ছে করলে জামার হাতা দিয়ে ওটার গা পালিশ করে দেওয়া যায়।

আমরা পাশাপাশি রয়েছি। আমি মাঝে-মাঝে এমনিই তাকাচ্ছি গাড়িটার দিকে।

গাড়ি চালাচ্ছেন একজন অতি আধুনিক মহিলা। সাজগোজ উগ্র। ঠোঁটে লিপস্টিকের আগুন, চোখে কালো সানগ্লাস। একটা ছাই রঙের স্টোল শীতকে রুখতে অলস চেষ্টা করছে। মাঝে-মাঝে তিনি মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে দেখছেন, আবার নার্ভাসভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তবে তারপরেও আড়চোখে আমাকে দেখতে চেষ্টা করছেন।

যখন তাঁর নজর আমার দিকে ব্যস্ত তখন তাঁর সামনের গাড়িটা ফুটকয়েক এগিয়ে গেল। পেছনে দাঁড়ানো গাড়ির দল সম্মিলিতভাবে হর্ন দিয়ে উঠতেই তিনি চমকে উঠে এক প্রচণ্ড হ্যাঁচকায় গাড়িটা এগিয়ে নিলেন সামনে এবং সামনের গাড়িটা হঠাৎ থামতেই তিনিও সজোরে ব্রেক কষলেন। ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি দিয়ে স্টেশান ওয়াগনটা থামল।

ওয়াগনটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার ফলে তার পেছনের জানলাটা আমার জানলার পাশে এসে থামল, এবং আমি ওয়াগনের ভেতরটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ভেতরে চাদরে জড়ানো কী একটা যেন রয়েছে। ভদ্রমহিলা সজোরে ব্রেক কষার ফলে চাদরের একটা কোণ সামান্য সরে গেছে। সেই কোণ দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

সেদিকে একপলক তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার ক্লান্ত মস্তিষ্ক আমাকে তখন প্রাণপণে বোঝাতে চাইছেযে, আমার চোখ ভুল দেখেনি। সুতরাং আবার তাকালাম ওয়াগনের ভেতরে। না, প্রথমবারে আমি ভুল দেখিনি।

জিনিসটা একটা হাত—মানুষের হাত যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, ওয়াগনের জানালায় কাচ না থাকলে আমি হয়তো হাত বাড়িয়েই ওই হাতটা ছুঁতে পারতাম। হাতটার মাঝের দু-আঙুলে কালচে লাল কী যেন লেগে আছে—বোধহয় রক্ত। তা ছাড়া পুরোনো চাদরে জড়ানো জিনিসটার আকৃতি দেখে এই শীতে আমি ঘামতে শুরু করলাম। চাদরের নীচে অবশ্যই একটা বডি লুকোনো রয়েছে!

কী করা যায় ভাবতে লাগলাম। আমার গাড়ির চারপাশে গাড়ির সমুদ্র। গাড়ির দরজা খুলব সে-উপায়ও নেই। তা ছাড়া, এই জগাখিচুড়ির মধ্যে গাড়ি ছেড়ে নামাও যাবে না।

হাত নেড়ে স্টেশান ওয়াগনের সানগ্লাস পরা ভদ্রমহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু বৃথাই। তিনি সরাসরি সামনের দিকে তাকিয়ে। এ অবস্থায় মনে পড়ে যায়

রাতে দেখা দুঃস্বপ্নের কথা: যে-স্বপ্নে কেউ আপনাকে তাড়া করে আসছে অথচ আপনি কিছুই করতে পারছেন না। এমনকী দৌড়তেও পারছেন না। আপনার পা দুটো যেন কেউ বেঁধে রেখেছে।

অবশেষে হর্ন বাজাতে শুরু করলাম। এবং একইসঙ্গে আঙুল দিয়ে স্টেশান ওয়াগনের পেছনটা দেখাতে লাগলাম।

আমার সামনের সবুজ অ্যামবাসাডারের ড্রাইভার রাগী দৃষ্টিতে পেছন ফিরে আমাকে দেখল। ভাবলাম, সে হয়তো নেমে আমাকে দুটো কথা শোনাতে ছুটে আসবে। কিন্তু যেভাবে গাড়িগুলো সব গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতে সে দরজা খুলে নামতে পারবে বলে মনে হয় না।

এমন সময় স্টেশান ওয়াগনের লাইনের গাড়িগুলো এগোতে শুরু করল। ওয়াগনটা আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তার চলার ভঙ্গিতে সবসময়েই একটা ব্যস্ত ভাব। ওটার পেছনের গাড়িটা আমাকে আড়াল করার আগেই স্টেশান ওয়াগনের নম্বরটা দেখে নিলাম। পকেট থেকে পেন নিয়ে বাঁ-হাতের তালুতে নম্বরটা লিখে রাখলাম। তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। শরীরে একটা অদ্ভুত ক্ষীণ কাঁপুনি টের পেলাম।

হঠাৎ আমার পেছনের গাড়ির অধৈর্য হর্নের শব্দে খেয়াল হল আমার লাইনের গাড়িগুলো এগোতে শুরু করেছে।

আরও মাইলকয়েক নির্ভাবনায় এগিয়ে গেল গাড়ির সার। আমি ইতিউতি চেয়ে মেরুন স্টেশান ওয়াগনটাকে দেখতে চেষ্টা করছি, আর একইসঙ্গে সবুজ অ্যামবাসাডারের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ কোনওরকমে এড়িয়ে চলেছি।

একসময় রাস্তার কিনারায় দাঁড়ানো একটা লালরঙের দোতলা বাড়ি আমি অন্যমনস্কভাবে পার হয়ে গেলাম। পার হতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল 'থানা' লেখা বোর্ডটা। তক্ষুনি ব্রেক কষে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলাম। পেছনে ছুটে আসা একটা কালো ফিয়াট বিকট আর্তনাদে ডানদিকে গাড়ি কাটিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচাল। ততক্ষণে আমি গাড়ি থেকে নেমে থানায় ঢুকে পড়েছি।

পুলিশের ইউনিফর্ম পরে একজন সার্জেন্ট একটা টেবিলে বসে কীসব লিখছিল, আমাকে ছুটে ঢুকতে দেখে চমকে মুখ তুলে তাকাল।

কী চাই?

আমি একটা খুনের রিপোর্ট লেখাতে চাই।—কথাগুলো বলার সময় নিজেকে কেমন বোকা-বোকা মনে হল।

তাই নাকি?

সে উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়ার থেকে একটা ছাপনো ফর্ম মতো কী যেন বের করে নিল। তারপর কলম বাগিয়ে ধরে বলল, কাউকে আপনি চাপা দিয়েছেন?

না—আমি নয়। মানে, আমার পাশের গাড়িতে ওই হাতটা দেখলাম। একটা স্টেশান ওয়াগন, মেরুন রঙের, একজন ভদ্রমহিলা—।

একমিনিট। আগে স্থির হয়ে বসুন।

একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল সে। তারপর নীচু গলায় প্রশ্ন করল, আপনার শরীর খারাপ হয়নি তো?

এ-প্রশ্নের জন্যে অফিসারটিকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, আমার এলোমেলো কথায় যে-কেউই এ-সন্দেহ করবে। তবুও মুখে বললাম, না, শরীর খারাপ হয়নি।

ঠিক আছে। এবার বলুন। কেউ কি উন্ডেড হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে?

না, তা নয়। মানে, ওই হাতটা হঠাৎ বেরিয়ে—।

ও, বুঝেছি। তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনার নাম দিয়েই শুরু করি। কী নাম আপনার?

অফিসার বাধা দেওয়ায় ধৈর্যচ্যুতি হলেও শান্ত কণ্ঠে নিজের নাম বললাম, সান্যাল—রুদ্রেন্দু সান্যাল।

ঠিকানা?

তাও বললাম।

তখন অফিসারটি লেখার কাজ সেরে মুখ তুলল।

ঠিক আছে, মিস্টার সান্যাল। এবার বলুন কী ব্যাপার। একেবারে প্রথম থেকে ধীরে-ধীরে সব গুছিয়ে বলুন।

অতএব প্রথম থেকে সব গুছিয়ে বললাম।

আমার কথা শেষ হলে সার্জেন্ট থুতনিতে হাত ঘষল। বলল, হুম। আমাদের দেওয়ার মতো সেরকম কোনও তথ্য আপনার হাতে নেই, মিস্টার সান্যাল। ঠিক বলছেন, আপনি একটা হাত দেখেছেন? আপনার ভুল হয়নি তো? মানে, আমি বলছি, ওয়াগানটার পেছনের জানলার কাচটা হয়তো ময়লা ছিল—।

ময়লা থাক আর না-ই থাক, ওটা একটা হাতই ছিল। আমার ভুল হয়নি। আর, হাতটায় রক্তের দাগ আমার স্পষ্ট নজরে পড়েছে।

আমি বোধহয় একটু চেঁচিয়েই উত্তর দিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ, সার্জেন্ট বলল, আস্তে, উত্তেজিত হবেন না।

সার্জেন্টের নাম অনুপম বক্সী। তার বুকে লাগানো প্লাস্টিকের চাকতি থেকেই নামটা জানতে পেরেছি। এখন ভাবতে গিয়ে দেখছি, সে তার নিজের কাজ ঠিকমতোই করেছে। তখন মনে হয়েছিল আমার সঙ্গে সময় নষ্ট না করে স্টেশান ওয়াগনের পেছনে তার দৌড়ানো উচিত ছিল। এবং সে-কথা তাকে বলেওছিলাম।

একবার বাইরে তাকিয়ে দেখুন, মিস্টার সান্যাল।—রাস্তার গাড়ির ভিড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, ধরে নিলাম আপনার ওই মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা এই ভিড়ের মধ্যেই কোথাও আটকে আছে! কিন্তু হলে কী হবে? আমাদের গাড়ি তো আর উড়তে পারে না।

তা হলে যে করে হোক রাস্তাঘাট আটকানোর ব্যবস্থা করুন।

অসম্ভব। এখন রাস্তাঘাট আটকালে সারা শহর গাড়িতে ছেয়ে যাব। দাঁড়ান, একমিনিট দাঁড়ান...।

এই বলে অনুপম বক্সী টেবিলে রাখা ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। তারপর নীচু গলায় কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল।

না, চেক পোস্টে বরং খবর পাঠিয়ে দাও—।

শুধু এই টুকরো খবরটুকুই আমার কানে এল।

মিনিটকুড়ি পরে সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল টাক মাথা এক ভদ্রলোক। শক্তসমর্থ চেহারা, গালে দিনকয়েকের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে সাধারণ চেক শার্ট, কোট ও টেরিলিনের প্যান্ট।

অনুপম বক্সী নীচু স্বরে আমাকে বলল, ডিটেকটিভ অফিসার চৌধুরী। একটা ডাকাতির কেসে হেড কোয়ার্টার থেকে এখানে এসেছেন। কিছুদিন থাকবেন। ওঁকে সব খুলে বলুন। যা জিগ্যেস করেন জবাব দিন।

চৌধুরী ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। আমার দিকে ভুরু উঁচিয়ে বলল, আপনিই বুঝি মিস্টার সান্যাল? বলার হয়তো দরকার নেই তবু বলে রাখছি: আপনি যা বলতে এসেছেন তা সত্যিকারের জরুরি হলেই আপনার পক্ষে মঙ্গল। ডিউটির জন্যে টানা চোদ্দো ঘণ্টা আমি না ঘুমিয়ে আছি। এখন বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি।

কোনওরকমে বলতে শুরু করলাম, আমি একটা হাতের কথা বলতে এসেছি। আমার পাশের একটা স্টেশান ওয়াগনে হাতটা আমি দেখেছি।

হাত?—চৌধুরী অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকল। তাকাল বক্সীর দিকে। বলল, সবরকমের মালই এখানে জোটে, তাই না বক্সী? ঠিক আছে, মিস্টার সান্যাল, বলুন—শুনি আপনার ওই হতচ্ছাড়া হাতের কথা।

সুতরাং আমার কাহিনির পুনরাবৃত্তি করলাম।

গল্পটা বলার সময় ভেবেছিলাম চৌধুরী হয়তো সামান্য হলেও অবাক হবে, উত্তেজিত হবে। কিন্তু সে একঘেয়ে বিরক্তির ভাব নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। যখন তাকে আমার বাঁ হাতে লেখা স্টেশান ওয়াগনের নম্বরটা দেখালাম, সে হাই তুলে একটা নোটবই বের করে নির্বিকারভাবে নম্বরটা টুকে নিল।

আমার কথা শেষ হলে সে বলল, মিস্টার সান্যাল, জনগণের সেবা করাটাই আমাদের কর্তব্য। সবার প্রতি সমান মনোযোগ ও সম্মান দেখানোটাই আমাদের নীতি। কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে, আপনার এই গাঁজাখুরি গপ্পোটা আমি বিশ্বাস করব? হতে পারে আপনি হয়তো আসলে জানলার কাচে কোনও ছায়া দেখেছেন। হয়তো চাদরের তলা থেকে এমন কিছু বেরিয়ে এসেছে যেটা দেখতে অনেকটা হাতের মতো। কিন্তু এটা তো মানবেন, রাস্তার ভিড়ে গাড়ির পেছনে চাদরে মোড়া ডেডবডি নিয়ে কেউ চলাফেরা করে না। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে দেখুন, মিস্টার সান্যাল। এবার চলুন, আমিও বাড়ি যাই, আর আপনিও বাড়ি ফিরে যান। এসব কথা ভুলে যান।

হয়তো তার কথায় রাজি হতাম। কিন্তু অবাক হলাম চৌধুরীর মুখের ভাব দেখে। তার মুখের অভিব্যক্তি চিৎকার করে যত না পারা যায় তার চেয়েও বেশি জোরে আমাকে পাগল কিংবা মিথ্যেবাদী বলছে। সুতরাং রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম, না। বাড়ি যাব না।

এ-রাগের কিছুটা চৌধুরীর ওপর: আমাকে বিশ্বাস করছে না বলে। আর বাকিটা নিজের ওপর: এ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি বলে।

একটা হাত আমি দেখেছি। মরা মানুষের হাত। আপনারা পুলিশের লোক। আপনাদের বললাম। এবার যা হোক কিছু একটা করুন।

চৌধুরী গভীর শ্বাস নিয়ে ধীরে-ধীরে নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, ঠিক আছে, আমি এখুনি লোক লাগাচ্ছি। আপনি বাড়ি যান। যদি কিছু খুঁজে পাই আপনাকে জানাব।

কিন্তু যদি স্টেশান ওয়াগনটা খুঁজে পাই এবং দেখি আপনার কথামতো কোনও ডেডবডি ওতে নেই, তা হলে মিস্টার সান্যাল, থিংস উইল বি ভেরি গ্রেভ ফর ইউ...।

রাগ করছেন কেন, চৌধুরীদা, শান্ত হোন। —বক্সী এগিয়ে এসে চৌধুরীর পিঠে হাত রাখল।

ওদের এ অবস্থায় রেখে আমি বেরিয়ে এলাম থানা থেকে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রওনা হলাম। এবং প্রথম সুযোগেই গাড়ি ঘুরিয়ে উলটোদিকে চলতে শুরু করলাম।

একসময় বাড়িতে এসে পৌঁছলাম।

প্রায় এগারোটা নাগাদ খেয়াল হল অফিসে ফোন করে বলা হয়নি যে, আজ কাজে যাব না। ফোন করলাম। বস মোটেই খুশি হল না। এরকমটাই হবে ভেবেছিলাম।

এরপর ঘণ্টাতিনেক বসে রইলাম টেলিফোনের কাছে। ভাবলাম, এই হয়তো চৌধুরীর ফোন আসবে। কিন্তু এল না।

প্রায় সওয়া দুটোর সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

দরজায় চৌধুরী দাঁড়িয়ে। কাঁধ অলসভাবে ঝুঁকে পড়েছে দু-পাশে, হাত মুঠো পাকানো।

মিস্টার সান্যাল, আপনাকে শুধু বলতে এলাম, ওই গাড়ির নাম্বারটা নিয়ে আমরা খোঁজখবর করেছি।—চৌধুরীর কণ্ঠস্বর মাখনের মতো নরম: ওয়াগনটাকে আমরা খুঁজেও পেয়েছি। ওটার রঙ মেরুন—আপনি যেমনটি বলেছেন। ওয়াগনের মালিক এক মহিলা—মিসেস কণা মিত্র। তার বাড়ি এখান থেকে মাত্র মাইলদুয়েক দূরে!

তাই নাকি? তা হলে তো একেবারে কাছে।—অবাক হয়ে বললাম।

এবং আপনার কথামতো সেই ডেডবডিটাও আমরা খুঁজে পেয়েছি, মিস্টার সান্যাল।

ভদ্রমহিলাকে আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন...।—বলতে-বলতে মাঝপথে থেমে গেলাম। কারণ দেখলাম, চৌধুরী মাথা নাড়ছে।

না, গ্রেপ্তার করিনি। কারণ গ্রেপ্তার করার মতো কোনও অপরাধ তিনি করেননি। কিছুই করেননি। কিন্তু আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে, মিস্টার সান্যাল—আমরা মিসেস মিত্রের বাড়িতে যাব।

কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে আমার আর গিয়ে লাভ কী—?

আপনাকে আসতেই হবে, মিস্টার সান্যাল, কারণ, না এলে আপনাকে আমি টানতে-টানতে নিয়ে যাব, ঢুকিয়ে দেব গাড়ির পেছনের ডিকিতে। গত পাঁচঘণ্টা ধরে আমি কীসের পেছনে ছুটে বেরিয়েছি সেটা আপনাকে দেখাতে চাই। তারপর, মিসেস মিত্রের কাছে আপনি ক্ষমা চাওয়ার পর, যদি কোনও কেসে আপনাকে ফাঁসাতে না পারি তা হলে বাধ্য হয়ে হয়তো আপনাকে ছেড়ে দেব।

চৌধুরীর সঙ্গে যাওয়ার পথে রাস্তার ধারের দোকানপাটের সাইনবোর্ডগুলো পড়তে থাকলাম। এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না। চৌধুরী আমার দিকে একবার মুখ ফেরাল না পর্যন্ত। শুধু তাকিয়ে আছে উইন্ডশিল্ডের দিকে। চোখ তীক্ষ্ন হয়ে এসেছে। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

মিসেস মিত্রের পাড়াটা ব্যবসায়ীদের পাড়া। সুতরাং জমজমাট।

একটা গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে থামল চৌধুরী। ইঞ্জিন বন্ধ করে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওই যে, ওই বাড়িটায় আপনার খুনি থাকে।

বাড়ির দরজাটা আংশিক কাচের। এবং সেই ঘষা কাচের প্যানেলে লাল রং দিয়ে লেখা —মিত্র ডেকরেটার্স।

দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। চৌধুরীই নক করল, আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল দরজা।

গায়ে কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে যে-মহিলা আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে চিনতে আমার কোনও ভুল হল না। ইনিই ছিলেন সেই মেরুন স্টেশান ওয়াগনে।

মহিলার চেহারা শক্তসমর্থ, লম্বায় প্রায় আমারই সমান। হঠাৎ দেখলে অ্যাথলিট বলে ভুল হতে পারে। চোখে এখন সানগ্লাস নেই। সুতরাং, তেজি ঘোড়ার মতো উদ্ধত ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

মিসেস মিত্র, ইনিই মিস্টার সান্যাল।—চৌধুরী ওঁকে বলল।

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বরফ মাখানো এক সুদীর্ঘ দৃষ্টি উপহার পেলাম।

তারপর তিনি ঘুরলেন ইন্সপেক্টর চৌধুরীর দিকে। হাসলেন। প্রশ্ন করলেন, এঁর কথাই কি আপনি আমাকে বলছিলেন? যিনি আমার স্টেশান ওয়াগনটা রাস্তায় দেখেছেন?

হ্যাঁ, ইনিই।—চৌধুরীর স্বর আবেগহীন, শান্ত। সে আরও বলল, আমি ভাবছিলাম, আপনি যদি এঁকে...ইয়ে...ডেডবডিটা একটু দেখতে দেন—।

নিশ্চয়ই দেখাব। দেখলে হয়তো ওঁর দুশ্চিন্তা কমবে। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

ঢুকেই ডানদিকে ভেলভেটের পরদা দেওয়া একটা ঘর। পরদা সরিয়ে সেই ঘরে আমাদের আহ্বান জানালেন মিসেস মিত্র।

ঘরটা বিশাল। দেখলে হঠাৎ করে কোনও কারখানা বলে ভুল হয়। অথবা মনে হতে পারে প্রাচীন কোনও টরচার-চেম্বার। কারণ, ঘরের এখানে সেখানে উলঙ্গ দেহ ও দেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ে আছে। তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ তফাত নেই। চোখে স্থির শূন্য দৃষ্টি। ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের বড় টেবিল। তার ওপর রং, তুলি, হাতুড়ি, পেরেক ইত্যাদি অগোছালোভাবে পড়ে আছে। এক কোণে চোখে পড়ে হাত-পায়ের স্তূপ। আর, একটা টেবিলে সাজানো সারি-সারি মাথা। তার কোনও-কোনওটায় চুল থাকলেও বেশিরভাগই টাকমাথা।

হাত বাড়িয়ে একটা মাথা ছুঁয়ে দেখলাম। রুক্ষ কঠিন। নিঃসন্দেহে প্লাস্টার অফ প্যারিস।

মিসেস মিত্র এগিয়ে গেলেন ঘরের একটা কোণের দিকে। চৌধুরী পকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে রাখল। তারপর লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাল। ভাবলাম ওর কাছ থেকে একটা সিগারেট চাইব, কিন্তু ও যে-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সে-নজর ইস্পাতের ঠান্ডা পাতে পড়লে সহজেই সেটা ফুটো হয়ে যেত।

সুতরাং মিসেস মিত্র ফিরে আসা পর্যন্ত মেঝের দিকেই চেয়ে রইলাম। মিসেস মিত্র খালি হাতে ফেরেননি। কোলে করে নিয়ে এসেছেন একটা প্লাস্টারের ম্যানিকিন। তার রং মাখা মুখে বোকা-বোকা হাসি।

এই হল রুকি, মিস্টার সান্যাল।—মিসেস মিত্র আমাকে বললেন, এখানে তৈরি প্রতিটি মডেলের একটা করে নাম আছে। তাতে কাজের সুবিধে হয়। আজ সকালে আমার গাড়িতে আপনি নির্ঘাত ওকেই দেখেছিলেন। জানেন তো, আমি আর আমার হাজব্যান্ড মিলে নানান দোকানের শো-কেস মডেল দিয়ে সাজাই। বিশেষ করে কাপড়ের দোকান। মডেলগুলো আমরা তৈরি করি। আর দোকান থেকে দেয় মডেলের সব ড্রেস। ব্যস। তারপর আমাদের কাজ হল পোশাক-টোশাক পরিয়ে সেগুলোকে শো-কেসে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া। রুকি হল কলকাতার বিখ্যাত কাপড়ের দোকান যমুনালাল পান্নালাল-এর সম্পত্তি। মাত্র দু-দিন আগে ওকে নতুন করে আবার রং করেছি। আজ সকালে ওকে নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম কলকাতায়।

একটু থেমে আবার বলে চললেন মিসেস মিত্র, ন্যুড অবস্থায় স্টেশান ওয়াগনে করে তো আর ডামিগুলোকে নিয়ে যাওয়া যায় না! তা হলে আপনার মতো আরও অনেকেই হয়তো ভুলভাল ভাববে। তাই প্লাস্টিকের কভার হাতের কাছে না পাওয়ায় একটা চাদর চাপা দিয়েই রুকিকে আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রাস্তায় অতবার থামতে আর চলতে গিয়ে চাদরটা সরে যায়। তখনই ওর একটা হাত বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

মিসেস মিত্র থামতেই আমি বললাম, কিন্তু আপনি তো রুকিকে যমুনালাল পান্নালালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তা হলে এখানে ওটা এল কী করে?

হাসলেন মিসেস মিত্র। বললেন, ও, এই কথা? আসলে কী হয়েছে জানেন, রং করার সময় ওর হাতে খানিকটা লাল রং চলকে পড়ে যায়। সে অবস্থায় ওকে তো আর শো-কেসে সাজানো যায় না। যমুনালালের দোকানে পৌঁছে যখন রুকিকে বের করতে যাই তখনই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে। ওই দেখুন—।

আঙুল তুলে রুকির ডানহাত দেখালেন মিসেস মিত্র। সত্যিই তাই। কনুই থেকে শুরু হয়েছে লাল দাগটা, এবং থেমেছে এসে ডানহাতের মাঝের দু-আঙুলের প্রান্তে।

এই হল আপনার রক্ত, মিস্টার সান্যাল।—ব্যঙ্গভরে বলল চৌধুরী।

চৌধুরীর নজরে নজর মেলানোর চেয়ে হিমালয়ের চূড়া থেকে অতলান্ত সাগরে ঝাঁপ দিতেও আমি রাজি। চৌধুরীর গলা দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত চাপা গর্জন বেরিয়ে এল। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পেলাম।

আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে, মিস্টার ব্যোমকেশ বক্সী?—চৌধুরীর তিক্ত ব্যঙ্গ যেন কেটে বসল আমার শরীরে: এবারে আমরা যাব। তার আগে ওই কোণের একটা প্লাস্টারের মেয়েছেলের সঙ্গে আপনি একটু ফস্টিনস্টি করে নেবেন?

কিছুই বলার নেই আমার। একটা সামান্য ডামির জন্যে একজন ক্লান্ত ডিটেকটিভকে দিয়ে আমি কী অমানুষিক পরিশ্রম করিয়েছি! তা ছাড়া একজন নির্দোষ মহিলাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছি। কেন যেন মনে হল, চৌধুরী আমাকে এত সহজে ছাড়বে না।

চৌধুরী আমার বাড়িতে ফিরে এল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন চালু রেখেই মুখ খুলল। মিসেস মিত্রের সামনে যেসব ভাষা চৌধুরী ব্যবহার করতে পারেনি তারই মহড়া

দিল প্রায় দশমিনিট ধরে। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনলাম। ভাবলাম, আমাকে এসব বলে চৌধুরী অন্তত একটু হালকা হোক।

বাড়িতে ঢুকে কাজের লোককে বললাম কড়া করে এক কাপ কফি দিতে। তারপর শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মনে-মনে নিজেকে হাজাররকম গালাগাল দিলাম। ভাগ্যিস রুমা বাড়িতে নেই। থাকলে ওর কাছে থেকেও একপ্রস্থ শুনতে হত।

সারাদিনের ক্লান্তির জন্যেই হোক, বা এতক্ষণের দুশ্চিন্তার জন্যেই হোক, মিনিটকয়েকের মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার চোখ ও মন থেকে বাইরের পৃথিবী মুছে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই, তবে ঘুম ভেঙে দেখি বাইরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। অনেকে যেমন ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আমি তেমনটা পারি না। ধীরে-ধীরে অচেতন জগৎ থেকে আমি উঠে আসি চেতনার জগতে।

চোখ খুলে প্রথম তাকিয়েছি ঘরের জানলার দিকে। তখনই বুঝেছি সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়েছে। তারপর মনে পড়ল অনুপম বক্সীর কথা, এবং পরক্ষণেই ভেসে উঠল টাক মাথা অফিসার চৌধুরীর রুক্ষ মুখটা।

সমস্ত ব্যাপারটা ভুলতে আবার চোখ বুজলাম। চোখ বুজতেই আমার মন ভেসে গেল সারি-সারি গাড়িতে টইটম্বুর সকালের রাস্তায়। আমি যেন আবার বসে আছি আমার গাড়িতে। সামনে সবুজ অ্যামবাসাডারটা। আর ডানদিকেই মিসেস মিত্রের মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা। আমি তাকিয়ে আছি স্টেশান ওয়াগনের পেছনে রাখা চাদর-ঢাকা অবয়বটার দিকে। হঠাৎই চাদর সরে গিয়ে বেরিয়ে এল হাতটা। কিন্তু না, মানুষের হাত নয়। একটা প্লাস্টারের হাত। মিসেস মিত্রের স্টুডিওর সেই হতচ্ছাড়া ডামি, রুকির হাত। তবে—।

তখনই আমার তন্দ্রার ভাবটুকু নিমেষে মিলিয়ে গেল। স্পষ্ট বুঝলাম, চৌধুরী এবং আমি, দুজনেই বিরাট ভুল করেছি। মিসেস মিত্র চালাকিতে আমাদের টেক্কা দিয়েছেন। সকালের রাস্তার দৃশ্যটা স্পষ্ট আমার মনে ভাসছে। চাদরের নীচে কোনও মৃতদেহের বদলে আমি রুকিকে ভাবতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। কারণ লাল রংটা ছিল রুকির ডানহাতে, আর যে-হাতটা আমি গাড়িতে দেখেছি, সেটা কোনও মানুষের বাঁ-হাতে!

বিছানায় বসে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। চৌধুরীকে ফোন করে সব বলব? সে আমার কথা বিশ্বাস করবে তো? আর করলেও, এখন আমরা কী করব?

কী করব ভাবতে-ভাবতে আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎই বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ কানে এল। অতিথি এসেছে আমার কাছে। যে-ই আসুক, সে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছে। কারণ, কড়া নাড়ার খটখট শব্দটা যে আমার মাথার ভেতর থেকে আসছে না সেটা বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে।

চৌধুরীকে ডাকব কি ডাকব না ভাবতে-ভাবতে দরজার কাছে গেলাম।

দরজা খুললাম।

দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস মিত্র। গায়ে বিকেলের সেই কাশ্মীরি শাল। এবং একটা উলের মাফলার—যেটা তখন দেখিনি। সব মিলিয়ে তাঁর এই সাজ হাস্যকর। তবে তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা জিনিসটা মোটেও হাস্যকর নয়।

জিনিসটা একটা ০.৪৫ অটোমেটিক। তার নলের ফুটোটা সরাসরি আমার পেট লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছে। এবং ফুটোর আকারট আমার কাছে জলের পাইপের মতো বিশাল ঠেকল।

আমার প্রথম কথাগুলো যেমন এলোমেলো তেমনই অর্থহীন, তবে আমার সারাদিনের অবস্থার কথা ভাবলে সে-দোষ ক্ষমা করা যায়।

হাতের হিসেবটা আপনার ভুল হয়ে গেছে, তাই না মিসেস মিত্র?

হ্যাঁ। তাই ভাবছিলাম, এটা খেয়াল হতে আপনার কতটা সময় লাগবে।—কথাটা বলেই বসবার ঘরে ঢুকে এলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। তারপর বললেন, ইন্সপেক্টর চৌধুরী যখন দোকানে গিয়ে আমাকে আপনার কথা বললেন, তখন তাড়াহুড়ো করে ডামিটা আমাকে রেডি করতে হয়। আপনি কী দেখেছেন সেটা মিস্টার চৌধুরী আমাকে বলেছেন, কিন্তু কোন হাতটা যে চাদরের তলা দিয়ে বেরিয়ে ছিল তা বলেননি। সেটা আমারও ঠিক মনে পড়ল না। সুতরাং আন্দাজেই রুকির ডান হাতে রং লাগাতে হল। এবং আমার আন্দাজ ভুল হল। তবে মাত্র একঘণ্টা আগে সে-ভুলটা বুঝতে পারলাম। মনে পড়ল, চাদরের তলা থেকে যে-হাতটা বেরিয়ে ছিল সেটা বাঁ-হাত।

আর আপনি ভাবলেন, আমার হয়তো সেটা খেয়াল পড়বে...।

মিসেস মিত্র হাসলেন। বললেন, রাস্তায় গাড়ির ভিড়ে আপনি আমার এত কাছে ছিলেন যে, এখন হোক পরে হোক এ-ব্যাপারটা আপনার মনে পড়তই। সুতরাং টেলিফোন-বই দেখে আপনার ঠিকানাটা বের করে চলে এলাম।

তা, এখন কী হবে?

আমরা একটু বেরোব, মিস্টার সান্যাল। প্রথমে আমরা আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব। সে একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরের হয়ে কংক্রিট মিক্সার চালায়। আমার কথা সে চোখ বুজে শোনে—অবশ্য ঠিকঠাক দাম দিলে তবেই। তারপর যেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে নীতিনের সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

নীতিন? আজ সকালে চাদরের নীচে বুঝি উনিই ছিলেন?

মিসেস মিত্র সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

হ্যাঁ। নীতিন—আমার হাজব্যান্ড। সে একটা বেহেড মাতাল, লম্পট, কাপুরুষ। —শয়তান-হাসি ফুটে উঠল ওঁর ঠোঁটে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, সে যাক, নীতিন তো আর নেই।

নেই? কোথায় গেছেন?

যেখানে গেলে আর ফেরা যায় না। মানে, নেক্সট ইয়ারে এই সময়ে ওর আত্মা ইহলোকের মায়া থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে, এবং একইসঙ্গে ওর কবরের ওপর গড়ে উঠবে আধুনিক এক লাক্সারি অ্যাপার্টমেট। সামনের সপ্তাহেই তার ফাউন্ডেশান স্টোন বসানো হবে।

টের পেলাম, আমার হাতের তালু দরদর করে ঘামছে। কিন্তু মরে গেলেও এই মহিলার কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে অনুনয়-বিনয় করতে পারব না।

তা হলে আমি ও নীতিনবাবু একইসঙ্গে একই কবরে জায়গা পাচ্ছি?—প্রচণ্ড চেষ্টায় গলার স্বর সমান রাখলাম: কিন্তু হঠাৎ এরকমভাবে আমি উধাও হয়ে গেলে ইন্সপেক্টর চৌধুরী কি সন্দেহ করবেন না? বিশেষ করে আজকের ঘটনার পর?

যত প্রাণ চায় সন্দেহ করুক। চৌধুরী কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তা হলে আমরা রওনা হই, মিস্টার সান্যাল?

রওনা হব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ শোনা গেল। বাইরে যে-ই থাকুক না কেন, আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার ভীষণ জরুরি দরকার।

মিসেস মিত্র কোণঠাসা বেড়ালের মতো চকিতে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলেন। কিছুটা যেন অস্থিরও হয়ে উঠলেন। একবার ভাবলাম, ওঁর হাতের রিভলভারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু আমাদের মধ্যে দূরত্ব অনেক। চঞ্চল চোখে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তিনি রিভলভারটা লুকিয়ে ফেললেন শালের আড়ালে। কিন্তু তখনও ওটা তাক করে রইল আমার দিকে।

কিছুটা ভয়ের গলায় মিসেস মিত্র আমাকে বললেন, যে এসেছে তাকে তাড়াতাড়ি তাড়ান। আর চালাকি করে পালানোর চেষ্টা করবেন না। আমি আপনার ঠিক পেছনেই থাকব। দরকার হলে একগুলিতে দুজনের লাশ ফেলে দেব।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গভীর শ্বাস নিয়ে দরজা খুলে পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করলাম। বাইরে যে দাঁড়িয়েছিল সে-ই বাকি কাজটা শেষ করল। ছিটকে খুলে গেল দরজা, এবং রকেটের গতিতে ঘরে ঢুকল চৌধুরী। এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারল আমাকে। আমি উড়ে গিয়ে পড়লাম ঘরের অন্য প্রান্তে। দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে। মিসেস মিত্র অবাক হয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন, রিভলভারটা তখনও শালের আড়ালে লুকোনো।

শালা, শুয়োরের বাচ্চা!—আমার মুখের কাছে এসে খেঁকিয়ে উঠল চৌধুরী, তোমাকে আজ তুলে নিয়ে গিয়ে যক্ষ্মা-ধোলাই দেব। আজ যখন বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি তখন কী হয়েছে জানো? অপদার্থের মতো কাজ করেছি বলে তিনি আমাকে কথা দিয়ে এক থাপ্পড় মেরেছেন। এখন আমার সব প্রমোশন সিল হয়ে যাবে, সান্যাল। শুধু তোমার জন্যে।

কথা শেষ হতেই সে আমার একটা হাত চেপে ধরল। এক হ্যাঁচকায় আমাকে তুলে নিয়ে প্রায় ছুড়ে দিল অন্য একটা দেওয়ালে। হাত-পা মুড়ে ছিটকে পড়লাম শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে। যন্ত্রণা যত না টের পাচ্ছিলাম তার চেয়ে অবাক হচ্ছিলাম বেশি।

নিরপরাধ নাগরিকদের মিছিমিছি হয়রান করা।—বড়সাহেব এই কথা বলে আমাকে হেভি ঝেড়েছেন। চৌধুরী বলল। তারপর ঘুরে তাকাল মিসেস মিত্রের দিকে। উনিও আমার মতোই হতভম্ব, বিস্মিত।

আমি কিন্তু চৌধুরীর প্রমোশনের জন্যে মোটেও চিন্তিত নই। বরং নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি।

মিসেস মিত্রকে লক্ষ করে চৌধুরী বলল, ভালোই হয়েছে, আপনিও এখানে রয়েছেন, মিসেস মিত্র। নইলে আমাকেই দেখা করতে যেতে হত। আপনি এই লোকটার নামে

মানহানির মামলা করুন। একে পথের ভিখিরি করে ছাড়ুন।

চৌধুরী পায়ে-পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি তখন কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি।

সে চিৎকার করে উঠল, না, শুধু মানহানির মামলায় আমার পেট ভরবে না! তোমাকে সাতজন্মের শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।

পা তুলে সে আমার পিঠে রাখল, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। তিরবেগে দরজা দিয়ে আমি ছিটকে গেলাম শোওয়ার ঘরে। মাথাটা ঠুকে গেল একটা বুক-শেলফ-এর কোণে। এবং অবশেষে বিকট শব্দে আছাড় খেয়ে পড়লাম। ফ্রিজের পাশে।

এবার ভয়ার্ত চোখে তাকালাম চৌধুরীর দিকে। শুধু রাগ হলে এ-ব্যবহারের মানে বুঝতাম, কিন্তু এ তো রাগ নয়, নৃশংস প্রতিশোধের জ্বালা।

কোটের ভেতর থেকে রিভলভার বের করে এনেছে চৌধুরী। এরা দুজন মিলে যদি আমার এগেইনস্টে যায় তা হলে আমার আর বাঁচার আশা নেই।

কিন্তু চৌধুরী শোওয়ার ঘরে ঢুকেই একপাশে আড়ালে সরে গেল। ইশারায় আমাকে বলল নীচু হয়ে লুকিয়ে থাকতে। তারপর মিসেস মিত্রকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বলল, রিভলভারটা ফেলে দিন, মিসেস মিত্র। মিস্টার সান্যালের আর কোনও ভয় নেই। আর আপনারও পালানোর পথ নেই। আই এম ইন চার্জ নাউ।

বিকট এক কানফাটানো শব্দে চৌধুরীর উত্তর এল। মিসেস মিত্রের রিভলভারের গুলি নিমেষে এসে বিঁধল শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে। কিছুটা সিমেন্ট-বালি খসে পড়ল মেঝেতে।

চৌধুরী সতর্ক ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। রিভলভার ধরা হাতের কবজিটা চেপে ধরল অন্য হাতে। তারপর অত্যন্ত যত্নে নিশানা ঠিক করে নিয়ে একবার গুলি ছুড়ল।

বসবার ঘর থেকে এক ভয়ংকর তীক্ষ্ন আর্তচিৎকার ভেসে এল। চৌধুরী লাফিয়ে বেরিয়ে গেল শোওয়ার ঘর থেকে। আমি একটু পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করলাম।

দেখলাম, মিসেস মিত্র মেঝেতে পড়ে আছেন। ওঁর পাশে পড়ে থাকা রিভলভারটা চৌধুরী কুড়িয়ে নিল। মিসেস মিত্রের শালের সামনেটা আঠালো লাল রঙে মাখামাখি। তিনি জীবিত কি মৃত সেটা বোঝার জন্যে ডাক্তারি পরীক্ষার দরকার।

চৌধুরী আমাকে বলল, ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিন। এখনও হয়তো উনি বেঁচে আছেন।

অবশেষে একসময় মিসেস মিত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমাদের আশ্বাস দিলেন যে, ওঁর প্রাণের কোনও আশঙ্কা নেই, এবং শিগগিরই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর মতো সুস্থ হয়ে উঠবেন।

মনে হল প্রায় কয়েকশো সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ—আসলে আট কি দশজন—আমার বাড়ি ছেয়ে ফেলেছে। সব গোলমাল মিটে যাওয়ার পর তাদের যা করণীয় তারা তাই করতে লাগল। তাদের কাজ শেষ হলে আমার বাড়ির যা অবস্থা হল তা আর বলার নয়। যেন বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা। আর চৌধুরী একটানা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমোনোর ফলে ঘরে চলাফেরা করছে জীবন্ত এবং মাতাল মমির মতো।

ঘর ফাঁকা হলেও সে বিড়বিড় করে বলল, আপনার সঙ্গে একটু গায়ের জোর দেখিয়েছি আর গালিগালাজ করেছি বলে কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সান্যাল। কিন্তু এখানে আসতে গিয়ে বাইরে মিসেস মিত্রের মেরুন স্টেশান ওয়াগনটা দেখে আমি চমকে উঠি। তখন উঁকি মারি বসবার ঘরের জানলা দিয়ে। ভেতরের নাটক, মিসেস মিত্রের রিভলভার, সবই আমার চোখে পড়ল। সুতরাং আপনাকে বাঁচাতে যে-বুদ্ধিটা মাথায় এসেছে সেটাই খাটিয়েছি।

না, না, ক্ষমা চাইতে হবে না।—আমি বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আপনি এখানে ফিরে এলেন কেন? বিকেলবেলা তো আমি ভাবলাম, আপনি এ-মামলায় হাত ধুয়ে ইস্তফা দিলেন।

তাই করতাম। শুধু আমার বউয়ের জন্যে।—চৌধুরী জবাব দিল।

আপনার বউ?

হ্যাঁ। বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার ওপর রাগে ঘুম এল না। সুতরাং বসে-বসে গোটা গল্পটা বউকে শোনালাম। আমার কাহিনি শেষ হলে ও শুধুই ঠোঁট ওলটাল। ডিটেকটিভের বউ হওয়ার ফলে ও জানে, এরকম হলে মনের অবস্থাটা কী হয়। কিন্তু হঠাৎই ও রেগে গিয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, তোমার কোটটা আবার দোকানে কাচতে দাও। কোটের হাতায় এসব কী লাগিয়ে এনেছ?

গৃহিণীরা যেরকম বলে থাকে সেরকম সুর ওর গলায়। আমার ক্লান্তির কথা, হতাশার কথা, ওর মনেরও পড়ল না। কোটে দাগ লাগিয়েছি বলে খাপ্পা হয়ে উঠেছে আমার ওপরে।

ঠিক বুঝলাম না।

আমিও বুঝিনি...অন্তত তখন। তারপর কোটের হাতায় তাকিয়ে কী দেখলাম জানেন?

কী?

লাল রং।

তাতে কী?

সুতরাং, তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম। লাল রংটা আমার কোটে একমাত্র যে-জায়গা থেকে লাগতে পারে তা হল রুকির হাত। মানে মিসেস মিত্রের ওই ডামি। আর তা যদি হয়, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই দু-দিন আগে ওটা রং করেননি। অথচ তিনি আমাদের তাই বলেছেন। প্রথমে যখন আমি একা ওঁর বাড়িতে যাই তখন আমাকে ওটা দেখানোর মাত্র মিনিটকয়েক আগে তিনি রুকির ডানহাতে ওই লাল রংটা লাগিয়ে দেন। স্পষ্ট মনে আছে, আমাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি একবার ওই স্টুডিওতে ঢোকেন এবং আমি যাতে রুকির হাতে হাত না দিই সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মনে হয়, ফেরার সময় হয়তো রুকির হাতে আমার কোটের হাতাটা ঘষে গিয়ে থাকবে।

একটু থেমে চৌধুরী আবার বলতে শুরু করল, সে যাই হোক, যদি রুকির হাত থেকেই ওই লাল রংটা এসে থাকে তা হলে এটা বুঝতে হবে মিসেস মিত্র ওই ডামিটা রং করে তৈরি রেখেছেন আমাকে বোকা বানানোর জন্যে—অর্থাৎ, তিনি আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমি গাড়ি নিয়ে ছুটে গেলাম ওঁর বাড়িতে, কিন্তু দেখলাম, তিনি বাড়িতে নেই। তখন ভাবলাম, আপনার কাছেই আসি, একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে যাই

ব্যাপারটা নিয়ে। এসে দেখি বাইরে মিসেস মিত্রের স্টেশন ওয়াগনটা দাঁড়িয়ে। বাকিটা তো আপনি জানেন।

একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল চৌধুরী। যেন এই কথাগুলো বলে তার অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে।

সুতরাং জিগ্যেস করলাম, ওঁর স্বামীর বডি কোথায়? তিনি বলছিলেন, কোথায় একটা বড় বাড়ি তৈরি হবে, সেই জমিতে নাকি পোঁতা আছে?

চৌধুরীর দু-চোখের পাতা যেন দু-দুটো ভারী পাথর। নিছক ইচ্ছেশক্তিতেই সে যেন চোখ খুলে রয়েছে।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন নয়, অনেক প্রশ্ন...।—বিড়বিড় করে বলল চৌধুরী, কে মিসেস মিত্রকে সাহায্য করেছে? কীভাবে ওঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর কাল থেকে খুঁজতে শুরু করব।

কিন্তু ডেডবডিটা খুঁজে পাবেন কী করে?

কোথায়-কোথায় নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেটা আমাদের খোঁজ করতে হবে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে খোঁজ নেব...।

সত্যি, এটা আমার মাথায় আসেনি। চৌধুরীকে মনে-মনে সাবাস দিলাম।

মিউনিসিপ্যালিটিতে খোঁজখবর নেওয়ার পর খুঁজে পাওয়া যাবে সেই বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরকে। তারপর জানতে পারব কে মিসেস মিত্রের বন্ধু যে ওঁর সব কথা চোখ বুজে শোনে এবং সেই কন্ট্রাক্টরের কংক্রিট মিক্সার চালাতে পারে। তারপর—।

চৌধুরীকে সে-কথা বলতে গিয়ে দেখি সে চেয়ারে বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

অতএব, মনে-মনে শুধু ভাবলাম, ভাগ্যিস ট্রেন স্ট্রাইক হয়েছিল!

শেষ লেখা

ঘরটা অস্বাভাবিক চুপচাপ। রাত এখন গভীর, কিন্তু গভীর রাতেও কিছু-কিছু শব্দ থেকে যায়। কুকুরের চিৎকার, ছুটে-যাওয়া কোনও ট্রাকের গর্জন, সিলিং-ফ্যানের শনশন, হাওয়ায় ওড়া দেওয়াল-ক্যালেন্ডারের ঘষটানি।

আমার আঙুল তখন দড়িটার গেঁট নিয়ে ব্যস্ত, আমার চোখ একটু দূরে দাঁড়ানো ত্রস্ত মেয়েটির দিকে। বুক-কেসের সামনে শক্ত কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে। লক্ষ করছে আমার প্রতিটি নড়াচড়া। ওর সুন্দর মিষ্টি মুখটা এখন ফ্যাকাসে, সেখানে প্রাণের কোনও অভিব্যক্তি নেই। ভয় নেই, করুণা নেই, এমনকী ঘৃণাও নেই।

দড়ির ফাঁসটা গলায় পরে নিলাম। তারপর কাঁপা হাতে সেটা টেনে আঁট করে বসালাম। বড্ড বেশি শক্ত হয়ে গেছে। একটু টেনে আলগা করলাম ফাঁসটা। মনের মধ্যে নানান ভাবনার ভিড়—একে অপরকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিতে চাইছে।

কুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললাম, ভয় পেয়ো না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ, বইয়ের থাকের ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি চাই না, সময় হওয়ার আগেই পায়ের নীচে ভরসাটুকু সরে যাক।

কুন্তলাকে আবার বললাম, কী-কী করতে হবে সব মনে আছে তো?

এসব করার কী দরকার, রাজীব?—কুন্তলার স্বর ওর মুখের মতোই ভাবলেশহীন। যেন পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি হয়ে তৈরি হওয়া শব্দ। ওর জটিল মনের অন্দরে কী যে আঁকাবাঁকা চিন্তার খেলা চলে তার হদিস কখনও পেলাম না। কুন্তলা অন্য মেয়েদের মতো চিন্তা করে না। ও আলাদা।

না করে উপায় নেই, কুন্তলা—।

সবসময় তুমি একই কথা বলো—আমার বিশ্বাস হয় না। এসব শুধু আমাকে কষ্ট দেওয়ার ফন্দি।

ছেলেমানুষি কোরো না, কুন্তলা!

একটা আবছা হাসি ওর মুখের আড়ষ্টতা নরম করল। মিষ্টি হাসি? নরম হাসি? মোনালিসা?

হঠাৎই ওর হাসি মিলিয়ে গেল। চমকে বলে উঠল, দাঁড়াও!

কেন?—আমার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে।

কে যেন আসছে।

বাইরে অন্ধকার বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা একটু ইতস্তত করল, তারপর আবার চলতে শুরু করল। আমি শুধু অপলকে ওকে লক্ষ করছি। ও কি সত্যিই হেসেছে? নাকি কল্পনা?

ওরা চলে গেছে।—আমি অস্পষ্ট গলায় বললাম।

কুন্তলা যেন সে-কথা শুনতেই পেল না। নিষ্প্রাণ সুরে বলল, এসব কাণ্ড করে কি সত্যিই কোনও লাভ আছে, রাজীব?

এটা ওর অন্তরের কথা কি না টের পাওয়া ভার।

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। আর-একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক। এক মুহূর্ত!

একরাশ বইয়ের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস পরে একটা অতিরিক্ত মুহূর্ত কোন কাজে লাগে কে জানে!

ঢোঁক গিললাম। বেশ কষ্ট হল। দড়িটা কেমন করে যেন বেশি এঁটে বসেছে। ঘামে-ভেজা হাতের তালু ঘষে নিলাম প্যান্টের খসখসে কাপড়ে। একটু আগেই দড়িটা ঢিলে করে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি টাইট হয়ে গেছে। আমার মাথার ভেতরে একটা অংশ যুতসই শব্দ খুঁজে বেড়াল। তারপর শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তৈরি করতে লাগল কথা।

'...তার মনটা মনটা যেন খাঁচায় বন্দি এক উদভ্রান্ত বুনো পাখি...।'

না, এটা ঠিক লাগসই হল না।

'...তার মন যেন বুনো হাঁসের ডানায় ভর করে...।'

এটা মন্দ নয়। এটাকেই ঘষেমেজে কাল ঠিক করে নেওয়া যাবে। কাল? জীবনের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও একটা মানুষ আগামীকালের কথা ভাবে! সত্যি, স্বপ্ন দেখার কোনও শেষ নেই। এই কথাগুলোও মনে রাখতে হবে। বেশ ভালো। লেখার সময় যেন বাদ না পড়ে।

দড়িটা দেখছি ক্রমশ এঁটে বসছে। ঘামে ভিজে কি দড়ির আঁশগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে? না বোধহয়।

যাক, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই—কাজটা শেষ করে ফেলাই ভালো। কারণ, একটা উপন্যাস আমাকে শেষ করতে হবে।

নাও, আমি তৈরি, কুন্তলা।—আমার কথাগুলো যেন শুকনো কাঠের খটাখট শব্দ।

এক গ্লাস জলের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। তেষ্টা পেল। কিন্তু না, এখন জল চাইলে সময় নষ্ট হবে। কল্পনায় টের পেলাম, আমি এক গ্লাস ঠান্ডা জল ধীরে-ধীরে চুমুক দিয়ে খাচ্ছি।

‘...ঢোঁক গিলল সে। গলায় এঁটে বসা মোটা দড়িটা যেন হাজার ছুঁচ ফোটাচ্ছে। একটা শীতল অনুভূতি গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তার অস্থির পাকস্থলীতে...।’

না, জল চাই না!

দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে আবার চোখ ফেরালাম। একটা দুর্জ্ঞেয় শীতল হাসি ঠোঁটে খেলিয়ে অপেক্ষা করছে। যেন এভাবে অনন্তকাল ও অপেক্ষা করতে পারে।

আমার মন তখন ছুটন্ত ঘোড়া। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ভীষণ স্পষ্ট! কুন্তলার প্রতিটি অভিব্যক্তি, ঘরের প্রতিটি আসবাব, আমার মস্তিষ্কের কোশে-কোশে গেঁথে যাচ্ছে শিলালিপির মতো।

‘...ফ্রেমে বাঁধানো ছবির কাচে মোমবাতির শিখা থরথর করে কাঁপছে। বইয়ের তাকে ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটা যেন একটা অসুস্থ ক্ষত।’

আমার টেবিলে একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যে-উপন্যাস এখন লিখছি তারই পরিশ্রমের চিহ্ন। আমার মনের অন্য অংশ তখনও খুঁজে চলেছে সুন্দর শব্দ, সুন্দরতর বাক্য...।

‘...ঘরের একমাত্র খোলা জানলার বাইরে আকাশ অন্ধকার। সেই আঁধারের বুকে এক চিলতে চাঁদ। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। ডাকছে এমন জগতে, যেখানে অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু অস্তিত্ব আছে...।’

নাঃ, ঠিক হল না। উপমাগুলো বড্ড পুরোনো। এ চলবে না।

আরও বহু শব্দ উথলে উঠছে মনের ভেতরে। জায়গা করে নিতে চাইছে সবার আগে। জটিল স্তব্ধতা, চিত্রার্পিত প্রতীক্ষা, ইঙ্গিতের ভারে অন্তঃসত্ত্বা চতুর হাসি। সব মিলিয়ে কুন্তলা।

মনের জানলা নিশ্চিত হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলাম নিশ্ছিদ্র করে, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল দরজাটা। সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এল স্মৃতির স্রোত। আমার চেতনা অচেতন হল। ওর দিকে তাকালাম। ছোট্ট দেহটা দেওয়ালে মিশিয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই নিশ্চল ভঙ্গিতেও কেমন যেন একটা গতির ইশারা ফুটে বেরোচ্ছে। প্রশান্ত সাগরের অতলে অজানা অচেনা গোপন ঢেউ ফুঁসে উঠছে...।

হ্যাঁ, বরাবরই ওর মধ্যে এই গুণটা আমি লক্ষ করেছি। যখন ওকে প্রথম দেখি, সেই মুহূর্তে বুকের ভেতরে বেজে উঠেছিল কামনার দুন্দুভি। তখনই এই চরিত্র আমি চিনতে পেরেছি। ওর বহিরাবরণ সবসময়ই নির্লিপ্ত। কখনও উচ্ছ্বাস নেই, আবার তেমন বিষণ্ণতাও নেই।। যেন সব কিছুকেই মেনে নেয়। এমনকী ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও এই একই ভাব আমি টের পেয়েছি। মনের গভীরে ও কী ভাবে আমি জানি না। আজ পর্যন্ত কখনও কোনওদিন ও রেগে ওঠেনি, বিরক্ত হয়নি, ঘৃণা করেনি, কোনও আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি।

যখন বাচ্চাটা মারা যায় তখনও নয়।

দুঃখ নিশ্চয়ই ও পেয়েছিল। ওর জ্বলজ্বলে চোখে আকস্মিক আঘাতের ছায়া পড়েছিল কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু আমার সংশয় তবু থেকে গেছে। তারপর থেকে কেমন অদ্ভুতভাবে ও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

প্রথমে ভেবেছি, ও পম্পির মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করে।

আমার শেষ উপন্যাসের প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে সেদিন একেবারে মগ্ন ছিলাম। কুন্তলা কেনাকাটা করতে কোথায় যেন বেরিয়েছিল। যাওয়ার আগে বারবার করে বলে গিয়েছিল, মাঝে-মাঝে যেন উঠে আমি বাচ্চাটার খাটের দিকে নজর দিই। কিন্তু লিখতে বসে একবারও উঠতে পারিনি। যখন লিলি আর অমিতাভর দৃশ্যটা নিয়ে মেতে আছি, তখনই ঘটেছিল সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল। খুব অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে...। কিন্তু একজন প্রকৃত শিল্পী যখন সৃষ্টির নেশায় মগ্ন তখন পার্থিব জগতে কী ঘটল না ঘটল তার জন্যে কি তাঁকে দোষ দেওয়া চলে! আর-কেউ না বুঝলেও কুন্তলা সেটা বুঝেছিল। আর সমালোচকরা আমার উপন্যাসের সেই দৃশ্যটাকে 'মহৎ', 'চিরায়ত' ইত্যাদি বিশেষণে প্রশংসা করেছিলেন।

কয়েকদিন মনমরা হয়ে থাকার পর কুন্তলা চালচলনে স্বাভাবিক হয়েছিল। শুধু স্বাভাবিক নয়, ও যেন আমার আরও কাছাকাছি চলে এসেছিল। চটপট খুশি করতে পারত আমাকে, কোন জিনিসটা আমার কখন দরকার যেন অলৌকিক ক্ষমতায় বুঝে নিত, সৃষ্টির কাজে যখন হতাশ হয়ে পড়তাম তখন আমাকে উৎসাহ দিত সতেজ উদ্যমে। গুণীজনেরা বলেন, প্রতিটি প্রতিভাধর মানুষের পেছনে রয়েছে কোনও রমণীর প্রেরণা, ত্যাগ। আমার জীবনেও তাই। কুন্তলা। আর সাহিত্যিক হিসেবে আমার খ্যাতির পেছনে কুন্তলার কৃতিত্ব অনেকখানি! ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কখনও আমি করিনি। সীমার সঙ্গে যে নিজেকে কিছুদিনের জন্যে জড়িয়ে ফেলেছিলাম তার কারণ পম্পির আকস্মিক মৃত্যু। পরে কুন্তলাকে সীমার ব্যাপারটা খুলে বলেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম আমার হঠাৎ পদস্খলনের কারণ। কুন্তলা সে-নিয়ে কখনও কোনও অভিযোগ করেনি। শুধু বলেছে, 'এইরকমটাই হয়ে থাকে—।'ওর সহ্যশক্তি, মানিয়ে চলার ক্ষমতা আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

তারপর থেকে আমার লেখার কাজ দিব্যি এগিয়ে চলেছে। শুধু থমকে দাঁড়িয়েছে আজ। একটা ভালো শব্দ, একটাও ভালো লাইন মাথায় আসছে না। মস্তিষ্কের ভাবনা-চিন্তার ভাঁড়ার সব শূন্য, নীরস মরুভূমি। কোন অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে যেন সব সাহিত্য-মনস্কতা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঝরে গেছে রুক্ষ মাটিতে। সব চিন্তা জট পাকিয়ে এক ধাঁধা তৈরি করেছে মাথার ভেতরে। পাতার পর পাতা লিখেছি আর ছিঁড়ে ফেলেছি, ছিঁড়ে ফেলেছি আর লিখেছি। কুন্তলা কোনও প্রতিবাদ করেনি, বরং বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন বলেছি, এবারে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে না পড়লে আমার উপায় নেই, একমাত্র তখনই প্রতিবাদ করেছে কুন্তলা।

না, না, রাজীব, সে আমি সইতে পারব না। আমাকে জোর কোরো না!

কুন্তলা এ-কথা বলেছে, কারণ, ও জানে আমি যখন ফাঁসি দেব তখন ওর ভূমিকা কী হবে।

কিন্তু আমি জেদ ছাড়িনি। ফলে ও বইয়ের পর বই সাজিয়ে তৈরি করেছে আমার দাঁড়ানোর জায়গা, আর আমি লিখতে বসেছি আত্মহত্যার স্বীকারোক্তি: আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

কুন্তলা দড়ি জোগাড় করেছে। রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছে ধারালো ছুরি। তারপর বইয়ের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে যখন আমি ফাঁসির গিঁট বেঁধেছি তখন ও আমাকে ধরে রেখেছে সযত্নে, যাতে ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে না যাই...।

আমি ঢোঁক গিললাম। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কুন্তলা আবার বলল, এসব করে সত্যিই কোনও লাভ আছে, রাজীব? এক সেকেন্ডের এদিক-ওদিক হলেই বিপদ হতে পারে।

কথাগুলো শুনে মনে হল যেন বহুবার মহলা দেওয়া কোনও নাটকের সংলাপ। এর যেন কোনও গভীরতর অর্থ রয়েছে।

ওর নির্লিপ্ততার মুখোশ ভেদ করে আবেগের ছোঁওয়া টের পেলাম। অবশেষে এই আবেগ ভাসতে-ভাসতে উঠে আসছে ওপরের স্তরে। আমার মধ্যেও শুরু হয়েছে এক অচেনা আবর্ত, এক শক্তিশালী অনুভূতি। কী লুকোতে চাইছে কুন্তলা? সেটা আমার জানার অধিকার আছে। ইচ্ছে করছে, ওর তন্বী দু-কাঁধে আমার হাতের শক্ত বাঁধন বসিয়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিই, যাতে ওর লুকোনো চিন্তাগুলো রঙিন কাচের গুলির মতো শব্দ করে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। তখন আমি জানতে পারব কোন সর্বনাশা ধূর্ত কুটিল সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে ওর মনের ভেতরে, কেন আমার মনে জেগে উঠেছে অস্বস্তি, অচেনা সংশয়, সূক্ষ্ম সন্দেহ। এইসব অস্পষ্ট অনুভূতিগুলো আমার ভেতরে এক প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে।

কুন্তলা আমার...? জটিল যন্ত্রণায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম লেখার টেবিলের দিকে। একপাশে সাজানো রয়েছে লেখা পৃষ্ঠাগুলো। কুন্তলা...।

উঁহু, এ অসম্ভব। আমার লেখা কুন্তলা কখনও পড়তে চায় না। পাণ্ডুলিপিও নয়, বইও নয়। ও বলে, তোমার লেখার প্রতিটি বিষয় আমার এত চেনা, এত জানা যে, নতুন করে পড়ার কিছুই নেই। সুতরাং আমি কী করে তোমার লেখা সমালোচকের চোখ দিয়ে পড়ব? আমি তো জানি লেখার আইডিয়াগুলো তুমি কোথা থেকে পেয়েছ...

কথাটা সত্যি। ফলে আমার অসমাপ্ত লেখার ওই দৃশ্যটা ও পড়েছে বলে মনে হয় না। ওই জায়গাটাই হবে আমার উপন্যাসের সেরা জায়গা, আমার জীবনের সেরা লেখা। জীবন থেকে নিংড়ে নেওয়া সাহিত্য—নাঃ, এসব এখন ভেবে লাভ কী? হাতের কাজটুকু শেষ হয়ে যাক, তারপর ভাবব। কুন্তলা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে...কীসের জন্যে?

আমার মৃত্যুর জন্যে।

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নোনতা স্বাদ পেলাম। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এরকম ঘটনা আগেও বার-সাতেক ঘটেছে। জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আমি লেখার রসদ জোগাড় করেছি। আমাকে বাধ্য হয়ে সাহায্য করেছে কুন্তলা। বিষধর কাঁকড়াবিছের কামড়। ঘুমের ট্যাবলেট। কবজির ধমনি কেটে দেওয়া। আমার চারনম্বর উপন্যাসের সেই দৃশ্যটা—বাক্সের ভেতরে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু। তারপর পায়ে পাথর বেঁধে জলে ডুবে মৃত্যু—যেখানে কোমরে বাঁধা দড়িটা ধরা রয়েছে তীরে দাঁড়ানো এক যুবতীর হাতে। এই যুবতী ডুবন্ত নায়কের প্রেমে ও ঘৃণায় পাগল...অপূর্ব! সমালোচকরা একসুরে প্রশংসা করেছেন আমার ভয়ানক বাস্তববোধের। আমার বইয়ের প্রতিটি জীবন্ত মরণ-দৃশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কোনও খাদ নেই তাতে। মৃত্যু—এক রহস্যময়ী রূপসী রমণী!

এইরকম প্রতিটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সময় আমি কুন্তলাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। কখনও ভাবিনি, সেই বিপন্ন মুহূর্তে আমি ওর শক্তির কাছে পরাধীন। তা হলে এবারে এত বিচলিত হয়ে পড়ছি কেন?

কুন্তলা! কুন্তলা!—আতঙ্কে আমার স্বর রুদ্ধ বিকৃত হয়ে গেল। শরীরের আকস্মিক আক্ষেপকে সামাল দিতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়লাম। অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গেল বইয়ের পাহাড়। আমার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল, পা-জোড়া ছটফট করতে লাগল, হাত দুটো খুঁজতে লাগল যে-কোনও আশ্রয়। তারপর আপ্রাণ শক্তিতে খুলে ফেলতে চাইল গলায় এঁটে বসা ফাঁসের দড়ি।

আমার যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে ওকে দেখতে পেলাম। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ করছে, আর হাসছে—কুন্তলা হাসছে—এদিকে আমার জীবনীশক্তি ধাপে-ধাপে শেষ হচ্ছে, অথচ ধারালো ছুরিটা ওর নিথর হাতে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ধরা। এবারে ও আমাকে আর বাঁচাবে না। আর খুনের দায়ে দোষীও হবে না ও। আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল ছুটন্ত আলোককণার আলপনা, তারপর একসময় সেটা ঝাপসা হয়ে নেমে এল অন্ধকার—শুধু চোখে নয়, চেতনাতেও।

ভারী চোখের পাতা ধীরে-ধীরে মেলে ধরলাম। কুন্তলা আমার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। আমার অবশ কবজি ঘষে-ঘষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে তুলেছে। আমার যন্ত্রণাময় শরীর তৃষ্ণার্ত পশুর মতো চেটেপুটে নিচ্ছে শুদ্ধ মিষ্টি বাতাস। দড়ির ফাঁস নেই। বইগুলো আবার ফিরে গেছে যথাস্থানে—তাকের ওপরে। কতক্ষণ আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম? পাঁচ মিনিট? দশ মিনিট?

তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে—জমাট বাঁধা স্বরনালী থেকে জড়ানোভাবে লাফিয়ে-লাফিয়ে বেরিয়ে এল অভিযোগের শব্দগুলো।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি।—নিরুত্তাপ নির্লিপ্ত উত্তর।

আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো এখনও নিজেদের গুছিয়ে উঠতে পারেনি। আমি জানি, কুন্তলা সত্যি কথা বলছে। তবু যেন সেই সত্যি কথাটা আমার বোধের সীমারেখাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কী করে ও এত শান্ত আবেগহীন?

কিন্তু কেন, কুন্তলা?

সামনের খাটো টেবিল থেকে এক গ্লাস জল নিল কুন্তলা। মাথাটা সামান্য তুলে কিছুটা ঠান্ডা জল খাইয়ে দিল আমাকে। শরীরে যেন প্রাণ এল। জ্বালাও জুড়োল কিছুটা। আমি এখনও বেঁচে আছি। সত্যি, বেঁচে থাকার স্বাদ এত সুন্দর!

রাজীব, ভেবেছিলাম একদিন-না-একদিন তুমি বুঝতে পারবে আমার কষ্ট। কী যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে রেখেছ তুমি। আমার আশা ছিল, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমার কাছে সে-ভালোবাসার কোনও দাম নেই। তুমি মেতে আছ নিজের লেখা নিয়ে, নিজেকে নিয়ে। এটা বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে। সীমা, সীমার মতো আরও কত মেয়ে, তোমার স্বার্থপরতার শিকার হয়েছে। ওদের নিয়ে তুমি লিখেছ—লোকে তোমার লেখা জীবন্ত বলে প্রশংসা করেছে। তারপর...তারপর নিজের জীবন-মরণকে তুমি ঠেলে দিয়েছ আমার হাতে। ব্যাপারটা তোমার কাছে হয়তো খুব সহজ, কিন্তু আমার কাছে,

রাজীব? যদি কাঁকড়াবিছের বিষ তাড়ানোর ওষুধ ঠিকমতো কাজ না করে? যদি ঘুমের ওষুধের ধক কাটানোর ইনজেকশান সময়মতো দিতে না পারি? কখনও কি তুমি ভেবেছ আমার মনের অবস্থাটা কী হয়? তোমার মৃত্যু-যন্ত্রণা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি, তারপর প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমাকে শোনাই, যাতে তুমি লিখতে পারো তোমার উপন্যাস। এ যে কী কষ্ট তুমি বুঝবে না।

ও রেগে গেছে। হালকা মনেই ভাবলাম।

'...ওর দু-গাল ক্রোধে রক্তিম। চোখে জ্বলছে জোনাকি। ওর সপ্রাণ স্তন উত্তেজনায় উঠছে, নামছে। পোশাকের বাঁধন ছিঁড়ে বিদ্রোহ জানাবে এখুনি...।'

মন্দ নয়। একটু ঘষামাজা করে নিলে নেহাত মন্দ হবে না। জীবন্ত ছবি।

হঠাৎই একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম পেটে। পরক্ষণেই সেটা কমে গেল। গভীর শ্বাস নিয়ে বললাম, তুমি ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে দিয়েছিলে, তাই না, কুন্তলা? তা হলে তুমি নিশ্চয়ই এখনও ভালোবাসো আমাকে, ভালোবাসো না?

সত্যিই কি বাসি?—ওর চোখে শীতল বিদ্যুৎ। কণ্ঠস্বরেও। যদি এই মুহূর্তে ওকে স্পর্শ করি তা হলে শরীরেও পাব শীতল স্পর্শ—আমি জানি।

কুন্তলা আবার বলল, ভালোবাসা! ভালোবাসা কতরকম হয় জানো? কিংবা ঘৃণা? কিংবা দুটোই? মাথার যন্ত্রণা, মনের যন্ত্রণা, শরীরে লক্ষ-লক্ষ বিস্ফোরণ, বুকের ভেতর কান্না সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়—।

আবার সেই যন্ত্রণার ছুরিটা বিদ্ধ হল পেটে। রোমকূপ থেকে কুলকুল করে বেরিয়ে এল শীতল ঘামের ধারা। জিভটা কেমন বিস্বাদ ঠেকছে...হঠাৎ চমকে উঠলাম।

ওই জলের মধ্যে...।

হ্যাঁ, রাজীব, ওই জলের মধ্যে অ্যাকোনাইট মোশানো ছিল।

অ্যাকোনাইট!—হাত বাড়িয়ে কুন্তলার নাগাল পেতে চাইলাম, কিন্তু যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আসা শরীর শক্তি খুঁজে পেল না। অ্যাকোনাইট বিষটা আমার খুব চেনা। শেষ দুটো বইয়ের আগের বইটায় এই বিষটা আমি ব্যবহার করেছি। মরতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। চেতনা কখনও আচ্ছন্ন হয় না। বড় যন্ত্রণাময় মৃত্যু।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুন্তলা হাঁটুগেড়ে বসে আছে। সুডৌল হাত দুটি বুকের কাছে ভাঁজ করা। মুখে রাগ নেই। শুধু আমাকে লক্ষ করছে, ওর সুন্দর সুকুমার মুখে শুধু শূন্যতা।

মৃত্যু—এক রহস্যময়ী রূপসী রমণী।...আমার চোখ জ্বালা করছে। ঠোঁটের কোণে নোনা অশ্রুর স্বাদ। আতঙ্ক, যন্ত্রণা, সবকিছুর মধ্যেও বুঝতে পারছি, সাদা কাগজে আর লেখা হবে না চমৎকার শব্দগুলো : *মৃত্যু—এক রহস্যময়ী রূপসী রমণী*।

আমার জন্যে এই নৃশংস নিয়তি কেন বেছে নিল কুন্তলা? ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে কেন শেষ প্রশ্বাস নিতে দিল না আমাকে?

কুন্তলা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল আমার টেবিলের দিকে। লেখা পৃষ্ঠাগুলো তুলে নিল। ও কি পড়েছে লেখাটা? আমি ভেবেছিলাম পড়েনি। ভুল ভেবেছি...।

অন্যমনস্ক হাতে পাতা উলটে একটা বিশেষ পৃষ্ঠায় এসে থামল কুন্তলা। তারপর আবেগহীন শুকনো গলায় পড়তে শুরু করল। আমার দিকে একটিবারের জন্যেও তাকায়নি ও। পড়তে লাগল। জীবন নিংড়ে লেখা আমার শেষ উপন্যাসের একটা অংশ।

'...কী সহজ, ভাবল অনিকেত। ছায়াময় ঘরে ছোট খাটটার পাশে দাঁড়িয়ে ওর শরীরে ভয়ের কাঁপুনি খেলে গেল পলকে। ও একা, ওর মুখে কথা নেই। কত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল। এখন আর কোনও প্রতিবাদ নেই। বাচ্চাটার ছোট্ট শরীর এখন স্পন্দনহীন। ঘুম নয়, কালঘুম। ওর সন্তান, ওর আদরের মেয়ে—শরীরে সাড়া নেই, কারণ, অনিকেত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি সংকটের মুহূর্তে। ও জানত, কোন বিপদ ওত পেতে রয়েছে মেয়েটার মাথার কাছে। অনিকেতের কৌতূহলই কি এই মৃত্যুর কারণ? জীবনের সবরকম অনুভূতিকে ও তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে চায়—সে-অনুভূতি যত ভয়ংকর হোক, যত নৃশংস হোক—এটা অনিকেতের একটা খেলা। এ সেই পুরনো পাপ—জানার কৌতূহল। আদম আর ইভ থেকে যার শুরু। এখন...এখন ও অন্য সবার থেকে আলাদা। এই বীভৎস অভিজ্ঞতা বুকের ভেতরে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে ওকে। এ-অভিজ্ঞতার কথা কেউ জানবে না, কেউ না। কেউ জানবে না, অনিকেত পাপী। কারণ, চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটা ও ইচ্ছে করলে রুখতে পারত। কিন্তু তা ও করেনি। অজানাকে জানার তীব্র কৌতূহল ওকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল...।'

কুন্তলা আমার অসমাপ্ত শেষ উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলল। ওর গলার স্বর অস্ফুট, নির্লিপ্ত—রুক্ষতা সেখানে নেই। ও বলল, ফাঁসিতে মরলে তোমার শাস্তি অনেক কম হত, রাজীব।

থ্রিলার ডট কম

গল্প

এখানে একটা লাশ আছে

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, রাকেশ।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছি।

তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। ততক্ষণ আমি তোমার ওয়াইফের সঙ্গে একটু কথা বলি।

ঠিক আছে, ডক্টর, আমি বিশ্রাম করছি।

আপনার স্বামী এখন হিপনোটাইজড অবস্থায় রয়েছে, মিসেস শর্মা। আমরা কথাবার্তা বললে ওর কোনও অসুবিধে হবে না।

ঠিক আছে, ডক্টর রাও। বলুন, কী জানতে চান?

আপনার স্বামী যেসব দুঃস্বপ্ন দেখেন, সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন। আপনি বলেছেন, আপনাদের বিয়ের রাত থেকে ওইসব দুঃস্বপ্নের শুরু, তাই তো?

হ্যাঁ, একসপ্তাহ আগে। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর আমরা এখানে আমাদের নতুন বাড়িতে চলে আসি। খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যাই প্রায় মাঝরাতে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে রাকেশ আমার ঘুম ভাঙায়। তখন সবে ভোর হচ্ছে। ও বিছানায় ভীষণ ছটফট করছিল, আর বিড়বিড় করে কীসব বলছিল। ওকে জাগিয়ে দিলাম। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কাঁপতে-কাঁপতে কোনওরকমে ও বলল, ও একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিল।

কিন্তু স্বপ্নের ডিটেইলস কিছুই ওর মনে ছিল না?

না, কিচ্ছু না। ও তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু পরদিন রাতেও সেই একই ব্যাপার—তার পরদিন রাতেও। প্রত্যেক রাতেই এই একই ব্যাপার চলছে।

রোজ একই নাইটমেয়ার। হুঁ। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। রাকেশকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। ওকে আমি ঠিক সারিয়ে তুলব।

সেই আশাতেই তো আছি, ডক্টর।

সম্ভবত অভিরাম আবার ওর মনের মধ্যে জেগে উঠতে চাইছে।

অভিরাম? কে অভিরাম?

রাকেশের মনের সেকেন্ড পার্ট। ওর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব।

কী জানি—কিছু বুঝতে পারছি না।

রাকেশের বয়েস যখন বারোবছর, তখন ও একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে। এতে ও ভীষণ শক পায়। তারপর দেখা দেয় স্কিটসোফ্রিনিয়্যা—যার ফলে ওর মধ্যে তৈরি হয়ে যায় দুটো ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। একজন হল স্বাভাবিক রাকেশ শর্মা। আর দ্বিতীয়জন, চঞ্চল, ধূর্ত, ইভল। রাকেশ তার নাম দিয়েছিল অভিরাম। বলত, সে ওর যমজ ভাই, ওর মনের অনেক ভেতরে বাসা বেঁধে থাকে।

কী অদ্ভুত!

এ ধরনের ঘটনা সাইকিয়াট্রির হিস্ট্রিতে প্রচুর আছে। রাকেশ যখন চিন্তাগ্রস্ত কিংবা টায়ার্ড হয়ে পড়ে, তখন অভিরাম ধীরে-ধীরে ওর ওপর চেপে বসে—ওকে দখল করে, কন্ট্রোল করে। তারপর ওকে দিয়ে ঘুমিয়ে চলা, বিছানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া—এসব ধরনের বাজে কাজ করায়। অভিরাম যখন ওকে চালায়, তখন রাকেশের কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না। কখনও-কখনও তো ওর মনেই পড়ে না, কী হয়েছে। অন্যসময় ভাবে, সবই একটা দুঃস্বপ্ন।

কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো!

তখন রাকেশ আমার ট্রিটমেন্টে ছিল। আমি ভেবেছিলাম, রাকেশ পুরো সেরে গেছে। অভিরামকে আমরা তাড়িয়ে দিতে পেরেছি। কিন্তু এখন দেখছি...ঠিক আছে, রাকেশকে ওর রোজকার এই দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে কোয়েশ্চেন করলেই সব জানা যাবে। ওর স্বপ্নের খুঁটিনাটি জানলেই আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব।...রাকেশ!

বলুন, ডক্টর?

যে-স্বপ্ন তোমাকে রোজ ট্রাবল দেয়, সেটা আমাকে খুলে বলো। তোমার তো ওটা মনে আছে, আছে না?

স্বপ্ন! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে!

উত্তেজিত হোয়ো না। শান্তভাবে ধীরে-ধীরে আমাকে সব খুলে বলো।

আমি শান্ত হব। একেবারে শান্ত।

এই তো, লক্ষ্মীছেলের মতো কথা। এবার বলো, প্রথম কোনদিন তুমি স্বপ্নটা দেখলে —কী দেখলে?

প্রথম? প্রথম—ও, সেটা আমার আর অনিতার বিয়ের রাত ছিল। না, না, ভুল বললাম। ওটা ছিল বিয়ের আগের রাত।

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ। কোর্ট থেকে কয়েকটা দিন ছুটি নেওয়ার জন্যে সারাটা দিন আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সন্ধেবেলা সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে কিনা দেখার জন্যে আমি যোধপুর পার্কের এই নতুন বাড়িতে এলাম। বিকজ আমি চাইনি, অনিতার কোনও অসুবিধে হোক। সেখান থেকে শেয়ালদায় নিজের পুরোনো ফ্ল্যাটে ফিরে গেলাম রাত প্রায় এগারোটায়। একেবারে ডগ টায়ার্ড হয়ে। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘুম এল না। হয়তো ম্যাক্সিমাম টায়ার্ড ছিলাম বলেই। একটা সেকোনাল ট্যাবলেট খেলাম। ঘুম শুরু হয়েছে কি হয়নি, স্বপ্নটা শুরু হল।

কীভাবে শুরু হল, রাকেশ?

স্বপ্নে দেখলাম, টেলিফোন বাজছে। টেলিফোনটা আমার বিছানার পাশের টেবিলেই থাকে। স্বপ্নে আমি উঠে বসলাম, রিসিভার তুলে নিলাম। হঠাৎই মনে হল, এ স্বপ্ন নয়, সত্যি—সত্যিই হয়তো আমি ফোনে কথা বলছি। কিন্তু নেক্সট মোমেন্টেই বুঝলাম, না, আমি স্বপ্ন দেখছি।

কী করে বুঝলে যে, স্বপ্ন দেখছ?

কারণ, ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলছে নিনা। আর ঘুমের মধ্যেও আমার স্পষ্ট মনে আছে, নিনা মারা গেছে।

কবে মারা গেছে, রাকেশ?

একবছর আগে। দার্জিলিঙের পাহাড়ি রাস্তায় ও গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল, একটা বাঁকের মুখে চাকা পিছলে ওর গাড়ি খাদে গিয়ে পড়ে। জ্যান্ত অবস্থায় ও পুড়ে মারা যায়।

ও, তা হলে নিনার গলা শুনেই তুমি বুঝলে যে, তুমি স্বপ্ন দেখছ?

হ্যাঁ। ও বলল, 'রাকেশ, আমি নিনা...রাকেশ, তোমার কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন?'

একমুহূর্ত আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। তারপর স্বপ্নের মধ্যে আমি উত্তর দিলাম, 'না, তুমি নিনা নও। নিনা মারা গেছে।'

'জানি, রাকেশ,' ওর গলায় আমার খুব চেনা ঠাট্টার সুর—বেঁচে থাকতে যেরকম সুরে কথা বলত : 'জানি, আমি মরে গেছি।'

'এ শুধু স্বপ্ন—আমার মনের ভুল।' নিনাকে বললাম, 'এক্ষুনি আমার ঘুম ভেঙে যাবে—স্বপ্নও মিলিয়ে যাবে।'

উত্তরে মিষ্টি করে হাসল নিনা। বলল, 'তাই তো আমি চাই। নইলে আমি যখন তোমার কাছে যাব, তখন তো তুমি ঘুমিয়ে থাকবে। আমি এক্ষুনি তোমার কাছে চলে আসছি। জেগে থেকো, লক্ষ্মীসোনা।'

তারপরই মনে হয় ও ফোন নামিয়ে রাখল, ঠিক জানি না। হঠাৎ স্বপ্ন যেরকম বদলে যায়, সেরকম সব বদলে গেল। দেখলাম, আমি জামা-প্যান্ট পরে বিছানায় বসে আছি, হাতে সিগারেট জ্বলছে, অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি নিনার আসার জন্য। জানি, ও আসবে না। কিন্তু স্বপ্নে যেরকম অসম্ভবকে সম্ভব বলে মেনে নেওয়া হয়, সেরকম মেনে নিয়ে আমি নিনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

দরজার কলিংবেল যখন বেজে উঠল, তখন দুটো সিগারেট শেষ করে ফেলেছি। যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। দরজা খুললাম।

কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে নিনা নয়। অভিরাম।

তোমার যমজ ভাই, অভিরাম?

হ্যাঁ, আমার যমজ ভাই। তবে আমার চেয়ে আরও লম্বা, গায়ে অনেক জোর, আর খুব সুন্দর দেখতে। অভিরাম আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কনফিডেন্ট হাসি, চোখে সেই চেনা ছটফটে ভাব।

'কী ব্যাপার, রাকেশ?' সে প্রশ্ন করল, 'ভেতরে ঢুকতে দেবে না নাকি? পনেরোবছর বাদে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, তবুও?'

'না, অভিরাম!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি ফিরে আসতে পারো না!'

'কিন্তু আমি যে ফিরে এসেছি।' এ-কথা বলে ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল 'বহুদিন ধরেই ভাবছি তোমার সঙ্গে দেখা করব। তাই আজ রাতের প্রোগ্রাম দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।'

'তুমি কী জন্যে এসেছ?' আমি জানতে চাইলাম, 'তুমি মরে গেছ। ডক্টর রাও আর আমি মিলে তোমাকে খুন করেছি।'

'নিনাও মারা গেছে,' অভিরাম বলল, 'কিন্তু আজ রাতে ও ফিরে আসছে। তা হলে আমি কী দোষ করলাম?'

'কী চাও তুমি?'

'শুধু তোমাকে সাহায্যে করতে চাই, রাকেশ। আজ রাতে কেউ একজন তোমার পাশে থাকা দরকার। কারণ, তোমার মরা ওয়াইফের সঙ্গে একা-একা দেখা করতে তুমি রীতিমতো ভয় পাচ্ছ।'

'চলে যাও, অভিরাম। চলে যাও—' আমি ওকে রিকোয়েস্ট করে বললাম।

'দ্যাখো, আবার কে এল।' দরজার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল অভিরাম, 'নিশ্চয়ই নিনা। তুমি ওর সঙ্গে একা কথা বলো। তবে মনে রেখো, আমি পাশের ঘরেই আছি। দরকার হলে ডাকবে।'

ও পাশের ঘরে চলে গেল। কলিংবেল অধৈর্যভাবে দ্বিতীয়বার বেজে উঠল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম।

নিনা দাঁড়িয়ে। গায়ে সাদা শিফনের শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। মারা যাওয়ার সময়ে যে-পোশাক ওর গায়ে ছিল। ওর পোড়া মুখ বীভৎস। আমাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে ও ঘরে ঢুকল। বাতাসের ঝাপটায় ঢেউ খেলে গেল ওর শাড়িতে। খুব ধীরে অলস ভঙ্গিতে ঘরের ছায়া-ছায়া অংশে গিয়ে দাঁড়াল ও। একটা চেয়ারে বসল।

এক দীর্ঘ মুহূর্ত নিনা নীরব রইল। তারপর বলল, 'রাকেশ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছ। যাও, দরজাটা বন্ধ করে দাও। ঠান্ডা হাওয়া আসছে। ঠান্ডা হাওয়া আমার ভালো লাগে না।'

দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতেই কথা ছিটকে বেরোল আমার ঠোঁট চিরে।

'এখানে কী চাই? কেন তুমি ফিরে এসেছ? তুমি মরে গেছ!'

ও হাসিতে ফেটে পড়ল: 'তুমি কি সত্যি সে-কথা বিশ্বাস করো, রাকেশ? আমি মরিনি গো। এই একটা বছর তোমার সঙ্গে একটু মজা করছিলাম।'

'মজা করছিলে?'

আমার প্রশ্নে ওর হাসি আরও বেড়ে চলল। আকাশ-বাতাস কাঁপানো এক খিলখিল হাসি। যেন কোনওদিন থামবে না।

'হ্যাঁ, রাকেশ।' হাসির দমক থামিয়ে চোখের জল মুছে ও বলল, 'বিপদের সময় অল্পেতেই তুমি ঘাবড়ে যাও। তাই ভাবলাম, ভূতের অভিনয় করে তোমাকে একটু ভয় পাইয়ে দিই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নিনা।

'লায়ার! তুমি মিথ্যে কথা বলছ!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি মরে গেছ। আমি তোমাকে—তোমার ডেডবডি—নিজের হাতে পুড়িয়েছি!'

'আস্তে, রাকেশ।' নিনা নির্বিকার। অল্প হেসে ও বলল, 'আশপাশের লোক জেগে উঠবে। ...সত্যি করে বলো তো, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, আমি মরে গেছি?'

ছায়া-ছায়া অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্তে এসে দাঁড়াল ও। ওর ফরসা গালে লালচে আভা, দু-চোখে দুষ্টু হাসি—আমার অনেক চেনা। ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করল ও, 'রাকেশ, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে আমি মারা যাইনি। মারা গিয়েছিল আমার পাশে বসা অন্য একটা মেয়ে। অ্যাক্সিডেন্টের পরে যখন দেখলাম, মেয়েটা মারা গেছে, তখন কী খেয়াল হল, হাতের আংটিটা ওর আঙুলে পরিয়ে দিলাম। হাতব্যাগটা রেখে দিলাম ওর বডির নীচে। তারপর আমি গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিই। সুতরাং যে-ডেডবডি তোমরা শ্মশানে পুড়িয়েছ, সেটা আমার নয়।'

'কিন্তু কেন? কেন ও কাজ তুমি করলে?' কোনওরকমে একটা চেয়ারে বসলাম।

'ইচ্ছে হল একটু মজা করতে, তাই। আমাকে সংসারে দেখে তুমি যতটা বিরক্ত হতে, তোমাকে দেখে আমি তার চেয়ে কম বিরক্ত হতাম না। সেইজন্যেই মনে হল, একটা অন্য পরিচয় নিয়ে নতুন জীবন শুরু করি। তা ছাড়া আমি জানতাম, যেদিন এই খেলার আকর্ষণ আমার কাছে কমে যাবে, সেদিন আমি সহজেই আবার তোমার কাছে ফিরে আসতে পারব। এখন আমার টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে গেছে। তাই ফিরে এসেছি।'

'কিন্তু কাল আমার বিয়ে। অনিতার সঙ্গে।'

'জানি—খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপন দেখেছি, ফেমাস ল'ইয়ার রাকেশ শর্মা নতুন করে বিয়ে করতে চলেছেন। এও জানতাম, আমার আসাটা তোমার পছন্দ হবে না। ঠিক আছে, রাকেশ, আমি চলেই যাব। আরও কিছুদিন "মরে গেছি" এই অভিনয়ই না হয় করব। তুমি তোমার সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্টের মেয়ে অনিতাকে নির্বিবাদে বিয়ে করতে পারো। তবে আমার কিছু টাকার দরকার।'

'না! তোমাকে টাকা আমি দেব না! তুমি মরে গেছ!'

'তা হলে আগামীকালের কাগজের সেনসেশনাল হেডিং আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি। প্রখ্যাত আইনজীবীর মৃতা স্ত্রীর পুনর্জীবন। আপাতদৃষ্টিতে মৃতা স্ত্রীর হঠাৎ আবির্ভাবে আইনজীবীর নতুন বিয়েতে বাধা।'

'না!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'এ-কাজ তোমাকে আমি করতে দেব না!'

'তাই বুঝি? কিন্তু আমারও যে হাজার-দশেক টাকার ভীষণ দরকার। টাকাটা দিলে চুপিচুপি আমরা ডিভোর্স করে নেব। কেউ টেরটি পর্যন্ত পাবে না। তুমিও তোমার এই নতুন বিয়েটাকে আবার নতুন করে রেজিস্ট্রি করে নিয়ো। দেখছ তো, কী সহজ!'

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। আমার মন তখন ঘুরপাক খাচ্ছে। শরীর দুর্বল লাগছে। মনে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। শুধু একটা গভীর বিশ্বাস আমাকে সচেতন রাখল। এসবই একটা দুঃস্বপ্ন।

নিনা উঠে দাঁড়াল: 'আমার অফারটা ভেবে দ্যাখো। আমি মাথাটা একটু আঁচড়ে আসি। তোমাকে পাঁচমিনিট সময় দিলাম—তারপর একটা চেক আশা করাটা কি খুব একটা অন্যায় হবে?'

ও পাশের ঘরে গেল। দ্বিধার যন্ত্রণায় দু-হাতে মুখ ঢাকলাম। মনে-মনে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে চাইলাম। অবশেষে চোখ তুলে যখন তাকালাম, তখন অভিরাম, আমার যমজ ভাই, আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

'এভাবে কি এর কোনও ফয়সালা করা যায়, রাকেশ? ওর ঠাট্টায় ভয় পেয়ে গিয়েই তুমি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছ যে, তুমি হেরে গেছ।'

'কিন্তু ও মরে গেছে!' চিৎকার করে বললাম, 'এসব স্বপ্ন।'

'কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা বাস্তব, কে বলতে পারে। আমার মত হল কোনও রিসক নিয়ো না। যদি ওকে টাকা দাও, তা হলে আবার ও ফিরে আসবে—আরও টাকার লোভে।'

'কিন্তু আর তো কিছু করার নেই।' হতাশায় আমি বললাম।

'নেই কে বলল! আছে। নিনা একবার মারা গেছে। ওকে আর-একবার মরতে হবে।'

'না! আমি তোমার কথা শুনব না!'

'তা হলে দেখছি সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে—ছোটবেলায় যেমন নিতাম।... আমার দিকে তাকাও, রাকেশ।'

'না!' চেষ্টা করলাম চোখ ঘুরিয়ে নিতে, কিন্তু পারলাম না। ওর জ্বলজ্বলে নেশা-ধরানো দৃষ্টি আমাকে হিপনোটাইজ করে দিল।

'আমার চোখে তাকাও, রাকেশ।'

'না! না!'

কিন্তু পারলাম না। বহুবছর আগে, ছোটবেলায়, যেমন হত, সেরকম অবস্থা হল আমার। অভিরামের চোখদুটো ক্রমশ বড় হতে লাগল। যেন দুটো অন্ধকার হ্রদ, আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

'রাকেশ, এবার আমি তোমার শরীর-মন সব দখল করব—ছোটবেলায় যেমন করেছি। আর তোমাকে চলে যেতে হবে এতদিন আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে—আমাদের ব্রেনের একেবারে ডিপে, গভীরে।'

আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলাম। কিন্তু বিশাল কালো হ্রদের মতো ওর দু-চোখ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম সেই হ্রদের গভীরে। তারপর একটা স্নায়ু-ছেঁড়া যন্ত্রণা অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হল অভিরাম।

বুঝলাম, ও জিতে গেছে। এখন ওর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে—আমার শরীরের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ওর হাতে। আমি একেবারে অসহায়। আমি সব দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু অভিরামের কাজের ওপরে কোনও হাত আমার নেই।

নিনা এসে ঘরে ঢুকল। ওর উজ্জ্বল চোখে আত্মবিশ্বাস ঝিলিক মারছে।

'কী হল, রাকেশ, কী করবে ঠিক করেছ?' ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, করেছি।'

অভিরামের কণ্ঠস্বর আমার চেয়েও গভীর, জোরালো, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। নিনাকে দেখে মনে হল, এ পরিবর্তনে ও চমকে গেছে।

কিন্তু তারপরই সামলে নিয়ে ও বলল, ‘চেকটা চটপট লিখে দাও। রাত হয়ে যাচ্ছে। ডিভোর্সটা আমি চুপিচুপি করে নেব। তোমার নামের সঙ্গে কেউ আমার নাম জড়াবে না।’

‘চেক অথবা ডিভোর্সের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।’ অভিরাম ওকে বলল।

‘তা হলে লোক জানাজানি হবে। রগরগে অপ্রীতিকর কেলেঙ্কারির খবরে সবাই মজা পাবে। এতে তোমার ক্ষতিই হবে।’

‘উঁহু, লোকে জানবে না। আর তা ছাড়া, আমি রাকেশ নই, আমি অভিরাম।’

‘অভিরাম?’ নিনার মুখে এই প্রথম অনিশ্চয়তার প্রতিবিম্ব: ‘কীসব আজেবাজে কথা বলছ?’

‘আমি রাকেশের যমজ ভাই। যেসব কাজ রাকেশ নিজে করতে ভয় পায়, সেসব কাজ ওর হয়ে আমিই করে দিই।’

‘এসব আবোলতাবোল কথার কোনও মানে হয় না। আমি চললাম। ওই চেকের ব্যাপারটা ভাবার জন্যে তোমাকে কাল সকাল ন’টা পর্যন্ত টাইম দিলাম।’

‘টাইমের দরকার নেই। তা ছাড়া, তুমি যে কথা দিয়ে কথা রাখবে না, তাও আমি জানি।’

অভিরাম এক পা এগিয়ে গেল।

নিনা ভয় পেল। ও ঘুরে দাঁড়াল। যেন দৌড়ে পালাবে।

অভিরাম ওর হাত চেপে ধরল, এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিল মুখোমুখি। তারপর ওর নরম গলায় দু-হাতের দশ আঙুল বসিয়ে দিল।

না দেখে আমার উপায় ছিল না। কিন্তু আমি অসহায়। দেখলাম, ওর হাত নিনার গলায় ক্রমশ জোরে চেপে বসতে লাগল। নিনার মুখ লালচে হল, চোখদুটো হয়ে উঠল বিশাল, বিস্ফারিত। সেকেন্ড-তিরিশ মতো ও ধস্তাধস্তি করল, হাত-পা ছুড়ল। তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ল। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেল। ওর মুখের রং এখন আরও লাল। ঢিলে ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফেনা। চোখদুটো যেন কোটর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

শান্তভাবে অভিরাম ওর হাতের চাপ বাড়িয়েই চলল। অবশেষে নিনার মৃত্যু সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ রইল না, তখন ও নিনার শরীরটা ছেড়ে দিল।

নিনার মৃতদেহ শব্দ করে এলিয়ে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

‘ও. কে. রাকেশ,’ ও বলল ‘কিছু বলার থাকলে এখন বলতে পারো।’

‘তুমি ওকে খুন করেছ!’

আমার রুমাল দিয়ে অভিরাম ঠোঁট মুছল।

‘চিন্তার কথা। আমি ওকে খুন করেছি, নাকি করিনি? ও কি বেঁচে ছিল, নাকি সত্যিই মারা গিয়েছিল মোটর অ্যাক্সিডেন্টে?’

‘আমার কথা গুলিয়ে যাচ্ছে। নিনা তো মরেই গেছে। এটা শুধু একটা স্বপ্ন। কিন্তু—।’

‘স্বপ্ন হলেও আমরা তো একটা ডেডবডি তোমার ঘরের মধ্যে ফেলে রাখতে পারি না। তার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। এটাকে বরং গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া যাক।’

‘কিন্তু এত রাতে—’ আমি চিন্তিত গলায় বললাম। টের পেলাম, আমার ভয় করছে।

‘ওসব চিন্তা তোমার জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি। তারপর নিনাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যাব সোজা গঙ্গার ধারে। তুমি এখন চুপ করে থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত কোনও কথা বলবে না।’

শান্তভাবে ওর উন্মাদ-পরিকল্পনাকে কাজে লাগাল অভিরাম।

প্রথমে ও আমার একটা কোট আর একজোড়া দস্তানা পরে নিল। একটা হালকা চাদর নিয়ে নিনার বীভৎস মুখের ওপরে জড়িয়ে দিল। ওর মাথার চুল আর শাড়ি হাত দিয়ে ঠিকঠাক করে দিল। তারপর ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল দু-হাতে। যেন একটা ঘুমন্ত শিশু।

ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল অভিরাম। একতলায় পৌঁছে ও দারোয়ানের মুখোমুখি হল।

লোকটা ঝিমোচ্ছিল। অভিরাম এবং ওর কোলে নিনাকে দেখে সোজা হয়ে বসল।

‘দারোয়ানজি, ভদ্রমহিলা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারো?’

অভিরাম এ-কথা বলতে-বলতে নিনার ব্যাগটা ওর কোল থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। দারোয়ানজি সেটা তুলে দিল ওর হাতে। তারপর বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি ডাকতে।

আমি ভেবেছিলাম, এই বোধহয় ধরা পড়ে যাব, পুলিশ আসবে। কিন্তু না। মিনিট-কুড়ির মধ্যেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে দারোয়ান ফিরে এল। অভিরাম নিনাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। তারপর টাকা বের করে দারোয়ানজির হাতে দিল। আমরা রওনা হলাম। অভিরামকে দেখে মনে হল যেন মাঝরাতে কোনও মহিলার ডেডবডি নিয়ে কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়ানোটা ওর কাছে নেহাতই রোজকার স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অভিরাম যতই চালাক হোক না কেন, এ উদ্ভট পরিকল্পনায় একটা না একটা গন্ডগোল হবেই। হলও তাই। কিছুটা পথ গিয়ে পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

‘কোথায় যাবেন?’

‘গঙ্গার ধারে।’ অভিরামের গলা এতটুকু কাঁপল না।

‘গঙ্গার ধারে?’ ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, ‘এত রাতে? কি মজাক করছেন?’

‘না।’ কেউ ওর কথাকে ঠাট্টা ভাবলে অভিরাম বিরক্ত হয়: ‘ভদ্রমহিলা নেশার ঝোঁকে আছেন। তাই এঁকে গঙ্গার হাওয়া খাইয়ে চাঙ্গা করে তুলব।’

‘শুনুন স্যার!’ ড্রাইভার গাড়ি থামাল। ঘুরে তাকাল অভিরামের মুখোমুখি। রাগে তার মুখ লাল: ‘নেশার ঝোঁকে কে আছে? উনি, না আপনি? রাস্তার কল থেকে মাথায় জল দিন, সব নেশা ছুটে যাবে। এবার নামুন গাড়ি থেকে।’

অভিরাম ইতস্তত করল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, তা হলে যোধপুর পার্কেই চলুন।’

ড্রাইভার গজগজ করতে-করতে গাড়ি চালাল।

নির্জন পথে ট্যাক্সি ছুটে চলল। অভিরাম নিনার ডেডবডি কোলে নিয়ে তখন গুনগুন করে গান গাইছে। আর আমি একইসঙ্গে বিস্ময় আর ভয়ের দোলায় দুলছি।

অবশেষে একটা বাড়ির সামনে পৌঁছলাম। যে-বাড়িটা আমি আমার আর অনিতার জন্যে কিনেছি।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে খুব সাবধানে নিনাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল অভিরাম।

অন্ধকার রাত। শীত আর রাতের নির্জনতা। সদর দরজায় নিনার বডিটা নামিয়ে তালা খুলল অভিরাম। কেউ ওকে লক্ষ করল না।

নিনাকে নিয়ে ও বাড়িতে ঢুকল।

বাড়ি অন্ধকার। কিন্তু অভিরাম আলো জ্বালল না। নিনাকে বসবার ঘরে একটা লম্বা সোফায় শুইয়ে দিয়ে ওর মুখোমুখি একটা সিঙ্গল সোফায় বসল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'রাকেশ, এবার বলো, কী বলবার আছে।'

'অভিরাম!' আমি রাগে চিৎকার করে উঠলাম, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? নিনাকে এখানে নিয়ে আসার চেয়ে আমার ফ্ল্যাটে রাখলেই বা কী ক্ষতি ছিল কি? এখন কী করবে এই বডি নিয়ে?'

'সে-কথাই তো ভাবছি;' খিটখিটে সুরে বলে উঠল অভিরাম। পরিকল্পনায় বাধা পড়লে ও খুব অধৈর্য আর রুক্ষ হয়ে পড়ে: 'ড্রাইভারটা গঙ্গায় যেতে রাজি হল না বলেই তো যত ঝামেলা—।'

এমন সময় নিনা উঠে বসল।

জ্বরগ্রস্ত মানুষের মতো টলোমলো ভঙ্গিতে ও উঠে বসল। নিজের গলায় হাত বোলাতে লাগল। তারপর শোনা গেল ওর ভারি কর্কশ কণ্ঠস্বর।

'রাকেশ,' ও বলল, 'তুমি—তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছ?'

নিনাকে দেখার জন্যে অভিরাম ঘুরে তাকাল। অন্ধকারে নিনা শুধু যেন একটা আবছায়া প্রেত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

'ও, কাজটা তা হলে ভালোভাবে শেষ করতে পারিনি দেখছি!' বিরক্তির সুরে মন্তব্য করল অভিরাম।

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছ।' নিনা আবার বলল। যেন ঘটনাটা ও বিশ্বাস করতে পারছে না: 'তোমাকে এর জন্যে জেলে যেতে হবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি।'

'উঁহু, ওসব কিছুই হবে না।' উঠে দাঁড়াল অভিরাম। ওর বিশাল শরীর নিনার ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে: 'শুধু আমাকে একই কাজ আবার প্রথম থেকে করতে হবে।'

নিনা পলকে ওর কাছ থেকে কুঁকড়ে সরে গেল।

'না! না!' ও চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে ক্ষমা করো, রাকেশ। আমি আর কোনওদিন ফিরে আসব না। আমি চলে যাব। চিরকালের মতো চলে যাব। আর কোনওদিন তোমাকে বিরক্ত করব না।'

'আমি অভিরাম, রাকেশ নই।' অভিরামের স্বর গম্ভীর, 'তোমার দেখছি কইমাছের জান, নিনা। দু-দুবার তুমি মারা গেছ, কিন্তু তবুও তুমি মরোনি। হয়তো এই তৃতীয়বারই শেষবার হবে।'

'অভিরাম, থামো!' আমি চিৎকার করে বললাম, 'ওকে ছেড়ে দাও। ও সত্যি কথাই বলছে। ও আর কোনওদিন ফিরে—।'

'নিনার মতো মেয়েদের তোমার চিনতে এখনও দেরি আছে।' অভিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'তা ছাড়া, এ হল ও আর আমার ব্যাপার। তোমাকে এখানে নাক গলাতে হবে না।

তুমি ঘুমোও, রাকেশ...তুমি ঘুমিয়ে পড়ো...ঘুমোও...।'

মনে হল যেন অজ্ঞান হয়ে যাব। অন্ধকার আমাকে গ্রাস করল। ছোটবেলায় যেমনটা হত, স্বপ্নেও তাই হল—আমাকে সম্পূর্ণ উধাও করে দিল অভিরাম। এখন ও যা খুশি তাই করতে পারে।

এরপর যখন চেতনা ফিরে পেলাম, তখন আমি পাজামা পরে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরের মাঝখানে অভিরাম দাঁড়িয়ে—আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'রাকেশ, আর তোমার কোনও ভয় নেই।' ও বলল, 'আমি চললাম। অবশ্য আবার ফিরে আসব। দরকার হলেই।'

'নিনা!' চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'ওকে তুমি কী করেছ?'

অভিরাম হাই তুলল: 'নিনার কথা ভুলে যাও। ও তোমাকে আর কখনও বিরক্ত করবে না। তোমার তরফ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি, রাকেশ।'

'কী করে? কী করেছ তুমি ওকে নিয়ে?'

অভিরাম শুধু হাসল। 'বিদায়, রাকেশ।' ও বলল, 'ও, ভালো কথা—আমি চাই না ভোরবেলা এসব কথা ভেবে তোমার দুশ্চিন্তা হোক। অতএব মনে রেখো, এসবই একটা স্বপ্ন। নিছকই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন—আর কিছু নয়।'

ও চলে গেল। পরমুহূর্তেই চোখ খুলে দেখি, সকাল ন'টা বাজে। ঘড়ির অ্যালার্ম বাজছে।...এই আমার স্বপ্ন, ডক্টর।

এবারে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, রাকেশ। তোমার স্বপ্নের কারণটা তোমাকে এবার বুঝিয়ে দিই, তা হলে এ-স্বপ্ন দ্বিতীয়বার আর তুমি দেখবে না।

বলুন, ডক্টর।

তোমার ফার্স্ট ওয়াইফ, নিনা, মারা যাওয়ার আগেই তুমি ওর মৃত্যু কামনা করেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম, ও মরে যাক।

ঠিক তাই। তারপর যখন ও মারা গেল, তুমি মনে-মনে একটা অপরাধবোধ, মানে, একটা গিল্ট কমপ্লেক্স—মানে, তোমার মনে হত যে, তুমিই ওকে খুন করেছ। তাই অনিতাকে বিয়ে করার ঠিক আগের রাতে সেই অপরাধবোধ একটা দুঃস্বপ্নে বদলে যায় —যে-দুঃস্বপ্নে নিনা আবার বেঁচে উঠেছে। পসিবলি ওই ঘড়ির অ্যালার্মকেই তুমি টেলিফোনের শব্দ ভেবেছ এবং ওইভাবেই শুরু হয়েছে গোটা স্বপ্নটা—নিনা, অভিরাম, সব। এবার বুঝেছ?

হ্যাঁ, বুঝেছি।

এখন তুমি একটু বিশ্রাম নাও। এরপর আমি যখন বলব জেগে উঠতে, তুমি জেগে উঠবে। সব স্বপ্ন তুমি ভুলে যাবে। ওই স্বপ্ন আর কোনওদিন তোমাকে ভয় দেখাবে না। এবার বিশ্রাম করো, রাকেশ।

হ্যাঁ, ডক্টর।

ওহ। ডক্টর রাও—।

বলুন, মিসেস শর্মা?

আপনি ঠিক জানেন, ও আর কোনওদিনও এসব স্বপ্ন দেখবে না?

কোনওদিনও না। ওর মনের সাপ্রেসড অপরাধবোধ ভেন্টিলেটেড হয়ে গেছে। চিরদিনের জন্যে মুক্তি পেয়ে গেছে। এখন ওটার আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

দারুণ, ডক্টর দারুণ! আই ফিল গ্রেট। নইলে রাকেশ যেভাবে দিনের পর দিন ভেঙে পড়ছিল। ওহ্, একমিনিট, দরজায় কে যেন কলিংবেল বাজাচ্ছে।

দেখুন আবার কে এল।

...আমার মা লোক দিয়ে বিছানার চাদর, বেডকাভার সব পাঠিয়ে দিয়েছে। এগুলো বিয়েতে পেয়েছি। মা সবাইকে নিয়ে কাল সকালে আসবে বলেছে। দেখুন, কী সুন্দর, না?

হ্যাঁ, দারুণ দেখতে।

দাঁড়ান, এগুলো জানলার পাশের এই কাঠের পোর্টম্যানটায় রাখি। এটা রাকেশের খুব শখের জিনিস। এটা বন্ধ করলে পোকামাকড়, হাওয়া, কিছুই ভেতরে ঢুকতে পারে না। তাই কাপড়চোপড়ও নষ্ট হওয়ার ভয় নেই।

রাকেশ, তুমি এখন জেগে উঠতে পারো...এই তো, কেমন লাগছে?

ভালো। তবে আমি অভিরাম, রাকেশ নই। ভেবে অবাক লাগছে, কী করে আপনি রাকেশের স্বপ্নটাকে স্বপ্ন বলে বিশ্বাস করলেন! এটা যে রাকেশের একটা ছল, সেটা আপনার অন্তত বোঝা উচিত ছিল, ডক্টর। প্রথম যেদিন ও স্বপ্নটা দ্যাখে, সেদিন সত্যি-সত্যিই একটা ফোন এসেছিল...অনিতা! পোর্টম্যানটা খুলো না! খুলো না বলছি...ঠিক আছে, আমার কথা তো শুনলে না! সেই খুলতে গেলে। তা হলে এখন ওখানে দাঁড়িয়ে চোখ বড়-বড় করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কোনও লাভ আছে? আপনিই বলুন, ডক্টর!

মুদ্রাদোষ বড় দোষ
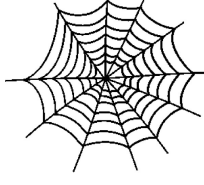
প্রথম দুর্ঘটনা

জাহাজে পা দিতেই কেমন একটা অস্বস্তি আমাকে আঁকড়ে ধরল। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। কুলিটা বেডিং আর সুটকেস তুলে নিয়ে চোখে প্রশ্ন তুলে আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ, কত নম্বর কামরা? পকেট থেকে টিকিটটা বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারপর বললাম, 'ষোলো নম্বর কেবিন।'

লোকটা যান্ত্রিকভাবে বেডিং আর সুটকেস নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করলাম।

জাহাজের ওপরের ডেকে খোলা জায়গাটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু মালপত্র পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে লোকজন ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ নোঙর তুলবে।

বিকেল পার হয়ে সন্ধে নেমেছে। আকাশের গোলাপি পটভূমিতে ছেঁড়া সাদা মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের জল হালকা ঢেউ তুলে জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়েছে।

ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। আরও অনেক যাত্রীই সার বেঁধে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে। কেউ-কেউ হাত নেড়ে প্রিয়জনদের বিদায় জানাচ্ছে। নীচের ডেকে মালপত্রের ফাঁকে-ফাঁকে শুয়ে কয়েকজন নাবিক বিশ্রাম নিচ্ছে। জাহাজের সব ক'টা নৌকোই ধীরে-ধীরে ফিরে আসছে।

একসময় টানা ভোঁ দিয়ে দুলে উঠল 'জলপরী' (জাহাজের নাম)। সমুদ্রের নোনা হাওয়ার অদ্ভুত গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল। জাহাজের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে চলল গোটাকয়েক মাছরাঙা।

হঠাৎ খেয়াল হল, কুলিটা অনেক আগেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। একটু ব্যস্ত হয়ে সাততাড়াতাড়ি এগোতে যাব, ধাক্কা লাগল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। সাধারণভাবে 'সরি' বলে পাশ কাটাতে যাচ্ছি, কানে এল আগন্তুকের পরিষ্কার মিহি গলা, 'দেশলাই আছে?'

পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পকেট হাতড়ে বের করলাম সুদৃশ্য লাইটারটা। সহযাত্রীকে পড়ন্ত বেলায় একবার ভালো করে দেখলাম।

উচ্চতায় ফুট-পাঁচেক হবে কি না সন্দেহ। অত্যন্ত সাধারণ চেহারা। শরীরে মেদের বাড়াবাড়ি। মুখে কৌতুকের হাসি। ঠোঁটের ওপরে চৌকো টুথব্রাশ গোঁফ। দু-কান থেকে ঝাঁটার মতো লোম বেরিয়ে আছে। ছোট্ট ভুরুর নীচে তার চেয়েও ছোট চোখ।

ভদ্রলোকের অদ্ভুত চেহারা দেখে ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে লাইটার জ্বালিয়ে ওঁর সিগারেটে আগুন ধরালাম। লাইটার পকেটে রাখতে গিয়েই পকেটে রাখা ফটোটায় আঙুল ঠেকল। ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। শিউরে উঠে হাত বাইরে বের করে নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর হেলতে-দুলতে করিডরের দিকে পা বাড়ালেন।

মনে-মনে ভীষণ উত্তেজিত হলেও মুখে সে-ভাবটা এক মুহূর্তের জন্যেও প্রকাশ করিনি। কারণ, প্রফেশনাল কিলাররা মনের ভাব কখনও মুখে প্রকাশ করে না। আর বিশেষ করে সুধীর নায়েকের মতো (অর্থাৎ, এই অধম!) একজন এক্সপার্ট পোড়খাওয়া কিলার।

চারপাশে একবার তাকালাম। না, আমাকে কেউই লক্ষ করছে না। অতি সাবধানে পকেট থেকে সেই ফটোটা বের করলাম। ডেকের মৃদু আলোয় দেখতে অসুবিধে হলেও চিনতে অসুবিধে হল না। না, কোনও ভুলই আমার হয়নি। এই একটু আগেই যাকে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম, তিনিই আমার রিভলভারের চাঁদমারি—রণেন বর্মা।

‘অ্যাসাসিন’ নামের এক গুপ্তদলের প্রফেশনাল কিলার অথবা জহ্লাদ হলাম আমি—অর্থাৎ, শ্রীসুধীর নায়েক। এবারের যাত্রায় দলের প্রয়োজনে এবং নির্দেশে আমাকে খুন করতে হবে এই রণেন বর্মাকে। কেন? কী কারণে? রণেন বর্মা কে?—এসব আমার জানার দরকার নেই। শুধু জানি, আদেশ এসেছে, কাজ হাসিল করতে হবে—ব্যস!

কোমরের পটিতে হাত চেপে অনুভব করলাম লুগার ০.৪৫৭-এর ইস্পাত-আশ্বাস। কিন্তু ওই পাঁচফুটিয়া মালটাকে খতম করতে রিভলভারের গুলি খরচ হবে ভেবে মনটা কেমন যেন করে উঠল। অন্যমনস্কভাবেই পা বাড়ালাম করিডরের দিকে।

কয়েক পা এগোনোর পর, করিডরের ঠিক মুখটাতে, হঠাৎ কেন যে মুখ তুলে ওপরদিকে তাকিয়েছিলাম, বলতে পারব না। এবং সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে পাঁচহাত লম্বা এক লাফ দিয়ে ছিটকে পড়েছি কতকগুলো প্যাকিংবাক্সের ওপরে।

ঠিক একইসঙ্গে ঘটে গেল দুটো ব্যাপার।

এক, আমার প্যাকিংবাক্সের ওপরে লাফিয়ে পড়া। দুই, লোহালক্কড়ে বোঝাই বালতিটার ডেকের ওপরে সশব্দে আছড়ে পড়া। একমুহূর্ত আগেই যে-জায়গায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় আছড়ে পড়ল বালতিটা। পুরোনো নাট, বেয়ারিং, বল্টু, রড ইত্যাদি জিনিসগুলো ডেকের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল। বালতি পড়ার ওই প্রচণ্ড শব্দে কয়েকজন নাবিক ছুটে এল।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝাড়তে-ঝাড়তে তাদের জানালাম, ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এ ব্যাপারটা ক্যাপ্টেনকে না জানাতে বারবার করে অনুরোধ করলাম।

বেশ কিছুটা খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে পেলাম আমার দু-দিনের আস্তানা ষোলো নম্বর কেবিন। ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারটা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। সত্যিই কি ওটা দুর্ঘটনা?

নাকি ঠান্ডা রক্তে খুন করার এক অভিনব পরিকল্পনা? অনেক ভেবেচিন্তেও ব্যাপারটার কোনও সমাধানে আসতে পারলাম না। এখন ওই মূর্খ নাবিকগুলো যদি ক্যাপ্টেনকে ঘটনাটা রিপোর্ট করে, তা হলেই সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। খাল কেটে কুমির আনব। অর্থাৎ, জাহাজের সব ক'টা লোকের নজর আমার দিকে পড়বে। যেখানে আমি বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, সেখানে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোটা 'অ্যাসাসিন'-এর চিফ খুব একটা ভালো চোখে দেখবে না। যদিও জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিস্টে আমার নাম সুধীর নায়েক নয়—নোটন আম্বাস্তা। তবু বলা যায় না কখন কী হয়!

কেবিনের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, দরজায় কোনও ছিটকিনি বা শেকল নেই। অর্থাৎ, দরজা থাকা, না থাকা—সমান। বেডিং আর সুটকেসটা কেবিনের এক কোণে রাখা ছিল। এগিয়ে গিয়ে সুটকেসটা নিয়ে এলাম। সেটাকে বন্ধ দরজায় গায়ে ঠেস দিয়ে পকেট থেকে একটা অ্যাডেসিভ টেপের রিল বের করলাম। তারপর ওই অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে সুটকেসটা সেঁটে দিলাম দরজার গায়ে। এতে আর কিছু না হোক, দরজা খোলার সময় অন্তত খানিকটা শব্দ হবে।

এবার কোমরের হোলস্টার থেকে লুগারটা বের করে বেসিনের নীচে অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে আটকে দিলাম। এমনভাবে ওটা লুকিয়ে ফেললাম যে, কারও পক্ষে চট করে আবিষ্কার করা অসম্ভব।

রিভলভারটা সুটকেসে না রাখার একটা কারণ আছে। তা হল, সাধারণত জাহাজের স্টুয়ার্ডরা একটু বেশি কৌতূহলী হয়, এবং সুযোগ-সুবিধে মতো যাত্রীদের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে। সেটা করতে গিয়ে আমার সুটকেস থেকে যদি রিভলভারটা বের করে ফ্যালে, তবে ক্যাপ্টেনের কাছে আমাকে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে। আর রিভলভারের ব্যাপারটা একবার জানাজানি হলে জাহাজে থাকাই দায় হয়ে উঠবে।

সব গোছগাছ সেরে কেবিনের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম নিজেকে।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, পেশিবহুল চেহারা। সরু গোঁফ, পাতলা ঠোঁট। নাকটা একটু থ্যাবড়া। গাল বেয়ে লম্বা জুলপি। অনুসন্ধানী চঞ্চল দু-চোখ। সারা মুখে একটা কাঠিন্য।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওপরের বর্ণনাটা আমার প্রতিবিম্বিত চেহারার বর্ণনা, কিন্তু তার অন্তত পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছদ্মবেশ! যেমন ওই গোঁফ, জুলপি, এলিভেটর স্যু, প্লাস্টিসিনের নাক—সবই ছদ্মবেশ। এত ধৈর্য, পরিশ্রমের কারণ একটাই—সতর্কতা।

হঠাৎই অন্যমনস্কভাবে বাঁ-হাত দিয়ে বাঁ-কানের লতিটা চুলকোতে লাগলাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। আবার! কড়া বকুনি দিলাম নিজেকে। আবার সেই মুদ্রাদোষ! বৎস সুধীর নায়েক, এখন হইতেই সাবধান হও। তুমি তো জানো, তোমার ন্যায় এইরূপ কত হতভাগ্য এই সামান্য মুদ্রাদোষের নিমিত্ত শত্রুপক্ষের কবলিত হইয়াছে!

বাঁ-হাতকে বশে ফিরিয়ে আনলাম। মুদ্রাদোষে! হাসলাম, কিন্তু হাসলে কী হবে, এই মুদ্রাদোষের জন্যে আমাদের দলের তিনজন এক্সিকিউশনার এর আগে শত্রুপক্ষের হাতে মারা গেছে। কুণাল যোশী, সোহনলাল শুক্লা এবং সখারাম বক্সী।

কুণালের একটা বদখত মুদ্রাদোষ ছিল, সবসময় টাইয়ের নট ঠিক করে জামার কলারে হাত বোলানো। ব্যস! ওর সম্বন্ধে প্রতিটি গুপ্তদল যে-'ডোসিয়ার' রাখত, তাতে লেখা

হয়ে গেল, কুণাল যোশী, বয়েস বত্রিশ বছর, চেহারা...এবং একেবারে শেষে—বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত ব্যক্তির এক বিচিত্র মুদ্রাদোষ আছে। তা হল...।

এইভাবে নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় নিজে সই করেছিল কুণাল। এক সুপরিকল্পিত নিখুঁত দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে কুণাল স্বর্গের সিঁড়িতে পা রেখেছিল।

তারপর সোহনলাল শুক্লা। বেচারা সোহনলালের এক অদ্ভুত মুদ্রাদোষ ছিল। সবসমসয়ই দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরত। ও নিজেও সম্ভবত জানতে পারেনি, ওই কালান্তক মুদ্রাদোষের কথা। সুতরাং যেখানে যে ছদ্মবেশেই যাক না কেন, ওকে চিনে নিতে শত্রুপক্ষের কোনও অসুবিধেই হয়নি। তারপর যা ঘটে থাকে, তাই হয়েছে। এক অনির্বচনীয় বিস্ময়কর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল সোহনলাল।

আর সখারাম বক্সী একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল এই বসুন্ধরা থেকে। অপরাধের মধ্যে ওর একটা চোখ—ডানচোখ ছিল পাথরের। তাই ও সবসময় কালো চশমা পরে থাকত আর সেটাকে সর্বক্ষণ হাত দিয়ে অ্যাডজাস্ট করত। তারপর কীভাবে বাকি ঘটনা ঘটেছিল, তা বলতে পারি না। তবে সখারাম এক বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান বিয়োগান্ত চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।

এতসব ভাবনার পর একটু চিন্তিত হলাম। তা হলে কি ওই বালতির পতনজনিত দুর্ঘটনাটা সুপরিকল্পিত? কেউ কি জেনে ফেলেছে আমার আসল পরিচয়? ভাবতে-ভাবতে নিজের অজান্তেই বাঁ-হাত এগিয়ে গেল কানের দিকে।

সুধীর! মাঝপথেই সতর্ক হয়ে হাতকে ফিরিয়ে আনলাম। আবার সেই ভুল! জাহাজে ওঠার পর থেকে এভাবে ক'বার কান চুলকেছি কে জানে। তবে আমার এই মুদ্রাদোষ কুণাল, সখারাম বা সোহনলালের মতো অতটা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু তবুও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

এইরকম ভয়ংকর মুদ্রাদোষসম্পন্ন আর-একজন গুণী ব্যক্তি আছেন। এ লাইনে তাঁকে সবাই গুরুদেব বললেও সাক্ষাৎ পরিচয় প্রায় কারও নেই। তিনি কখন, কোথায়, কী বেশে থাকেন তা না জানলেও তাঁর মুদ্রাদোষ তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দেয়। তাঁর এক অদ্ভুত স্বভাব আছে, সেটা হল—দেশলাইয়ের বাক্সে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে সমান্তরালভাবে তিনি আঁচড় কাটেন। এই মিস্টার এক্সই (এক্সই বলব, কারণ তাঁর সম্বন্ধে কোনও দলের কাছেই কোনও গোপন ফাইল নেই) নাকি কুণাল, সোহনলাল ও সখারামের বিয়োগান্ত নাটকের পরিচালক। এবং 'অপারেশান' নামক গুপ্তসমিতির প্রযোজক। সেই সময়ে (এবং সর্বদাই) ওরা আমাদের এক শত্রুরাষ্ট্রের হয়ে কাজ করছিল।

যা হোক, এই এক্স-এর পেছনে যদি দল আমাকে পাঠাত, তবে আর দেখতে হত না। ছ'-মাসই কাজ সেরে ফেলতাম। দেখিয়ে দিতাম, 'সুধীর নায়েক ইজ সুধীর নায়েক!'

আবার আবিষ্কার করলাম, আমার বাঁ-হাত আমার কান চুলকোচ্ছে। শালা! রাগে, বিরক্তিতে নিজের কান নিজেই বেশ করে মুলে দিলাম। আবার সেই মুদ্রাদোষ! তবে আর ছদ্মবেশের দরকার কী? বুকে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হয়, দেখুন আপনারা, এই অধমই সুধীর নায়েক। 'অ্যাসাসিন' গুপ্তদলের এক্সিকিউশনার! না, এই নাছোড়বান্দা মুদ্রাদোষ আমাকে ছাড়বে না! শত্রুপক্ষের কোনও লোক এই মুদ্রাদোষ লক্ষ করেই হয়তো চিনে ফেলবে নোটন আম্বাস্তার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সুধীর নায়েককে।

হঠাৎ ঘণ্টি বেজে উঠতেই হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে ন'টা। সম্ভবত ডিনারের জন্যেই এই ঘণ্টির সংকেত। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে কেবিনের আলো নিভিয়ে পা

বাড়ালাম খাবার ঘরের দিকে। সেখানে গিয়েই আবার দেখব রণেন বর্মাকে। দেখি, পারলে দু-চারটে কথা বলে একটু বাজিয়ে নেব। মানে, মারার আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি একটু আলাপ করতে চাই।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনা

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ডাইনিং রুমে ঢুকতেই প্রত্যেকটি স্ত্রী-পুরুষ মুখ ফিরিয়ে তাকাল আমার দিকে (সুধীর নায়েক যে হ্যান্ডসাম স্মার্ট যুবক, সে-কথা আপনারা দয়া করে ভুলে যাবেন না, প্লিজ!)। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। আমার বাঁ-দিকে এক মোটকা ভদ্রমহিলা আর ডানদিকে একজন অল্পবয়েসি মেয়ে।

মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলাম, তারপর তাকালাম খাবার প্লেটের দিকে। খাওয়াটা যদিও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তবু ওটা অভিনয়ের অংশ বলে প্লেটের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল জলের গ্লাসে—সেখানে টলটলে স্বচ্ছ জলের ওপর ভাসছে একটা মুখের প্রতিবিম্ব। চমকে চোখ তুলে তাকালাম। বোকা-বোকা চাউনি নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন রণেন বর্মা।

চোখাচোখি হতেই বর্মাসাহেব কান এঁটো করে হাসলেন: 'ভালো আছেন?'

প্রত্যুত্তরে হেসে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ভালোই আছি (অবশ্য বালতির ব্যাপারটা বাদ দিলে)। তা আপনি কদ্দূর যাচ্ছেন? (এ ছাড়া আর কীই-বা ছাই জিগ্যেস করব?)

'কোচিন। আপনি?' প্রশ্নটা করেই রণেন বর্মা অভদ্রের মতো খেতে শুরু করলেন।

'আমিও।'

এই বেঁটেখাটো লোকটাকে খুন করতে হবে ভেবে দুঃখ হল। কিন্তু উপায় কী? চিফ নিজের মুখেই বলেছেন, এই রণেন বর্মা লোকটি নাকি আমাদের 'অ্যাসাসিন' দলের পথে এক বিপজ্জনক কাঁটা। সুতরাং এই কাঁটা তোলার ভার চিফ আমার হাতেই তুলে দিয়েছেন। এবং একটি বিশেষ স্বাভাবিক দুর্ঘটনার সাহায্যে এই রণেন বর্মাকে মাইনাস করতে হবে।

আমি সাধারণত অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সহজ দুর্ঘটনার সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করি। যেমন ট্রেনে হলে, এই রণেন বর্মা ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে (অবশ্য তাঁকে একটা সামান্য ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করতে হত!) মারা যেতেন। এবং এক্ষেত্রে যেহেতু তিনি জাহাজে আছেন, সুতরাং তাঁকে ডেকের রেলিং টপকে সমুদ্রের জলে পড়তেই হবে।

এবার এই উপরোক্ত জলে পড়ার দুর্ঘটনা ঘটানোর তিনটে উপায় আমার হাতে আছে। এক: ভদ্রলোক যখন একা ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন আচমকা এক কারাটের প্যাঁচে তাঁকে রেলিং টপকাতে সাহায্য করা।

দুই: তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, কথা বলতে-বলতে হঠাৎ ধাক্কা দেওয়া।

আর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিন নম্বর উপায় হল, মাঝরাতে রণেন বর্মার ঘরে ঢুকে তাঁকে একটা মরফিয়া ইনজেকশান দেওয়া এবং অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে টেনে এনে জলে ফেলে দেওয়া।

এই তিন নম্বর উপায়টা সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হল একটি মাত্র কারণে। তা হল, রণেন বর্মার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কারও চোখে পড়বে না। আর সেটা যত কম চোখে পড়ে ততই ভালো।

এসব কথা ভাবছি, হঠাৎ পায়ে কীসের ছোঁওয়া পেয়ে আঁতকে লাফিয়ে উঠলাম।

'কী হল—কী হল?' বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়লেন মোটকা মহিলাটি।

কী যে হল, সেটা দেখতে টেবলক্লথটা সরিয়ে টেবিলের নীচে উঁকি মারলাম। ডাইনিং হলের অন্যান্য যাত্রী তখন মাঝপথে খাওয়া থামিয়ে উৎসুক হয়ে আমার ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে আছেন। রণেন বর্মাও তার ব্যতিক্রম নন।

টেবিলের নীচ থেকে একটা মোটাসোটা কালো বেড়াল বেরিয়ে এল। ডাকতে লাগল 'ম্যাঁও-ম্যাঁও' করে। তাই দেখে ঘরের সবাই তো হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল।

আমতা-আমতা করে কাষ্ঠহাসি হাসতে চেষ্টা করছি, একজন বেয়ারা আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কানে-কানে বলল, 'স্যার, ক্যাপ্টেনসাহেব আপনাকে একবার ডাকছেন। যদি একমিনিট সময় করে একটু আসেন—।'

খাওয়ার টেবিল ছেড়ে (খাওয়া তখনও শুরুই করতে পারিনি, এমনই দুর্ভাগ্য!) বেয়ারাটির পেছন-পেছন ডাইনিং হল ছেড়ে বেরোলাম। আন্দাজ করলাম, ক্যাপ্টেনসাহেব হয়তো সেই বালতিজনিত দুর্ঘটনার ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে জানতে চান। দেখা যাক!

ক্যাপ্টেনের ঘরে পৌঁছে দেখি, তিনি পেছনে হাত রেখে গম্ভীরভাবে পায়চারি করছেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মিস্টার আম্বাস্তা?

বেয়ারাটি আমাকে ছেড়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের জবাব দিলাম, 'ইয়েস, আই অ্যাম নোটন আম্বাস্তা। হোয়াটস দ্য ম্যাটার?'

'আসুন—বসুন।' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার নির্দেশ করলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নিজেও একটা চেয়ারে বসলেন।

'মিস্টার আম্বাস্তা, আপনার সেই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা আমি একটু ডিটেইলসে শুনতে চাই।'

'ওহ, ও কিছু নয়।' ক্যাপ্টেনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কারণ, ওই দুর্ঘটনাটা নিয়ে যত কম আলোচনা হয়, ততই ভালো।

'মিস্টার আম্বাস্তা, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে আমারই জাহাজে। সুতরাং ব্যাপারটা আমার জানা দরকার।' ক্যাপ্টেনকে বেশ উত্তেজিত মনে হল।

অতএব আর দ্বিরুক্তি না করে ঘটনাটা তাঁকে আনুপূর্বিক জানালাম।

সব শোনার পর তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। অবশেষে একসময় মুখ খুললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন যে, এই জাহাজে আপনার কোনও শত্রু আছে? এমন কেউ, যে আপনাকে খুন করতে চায়?'

হঠাৎ এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা ভাবতে শুরু করলাম। শত্রু? কিন্তু আমি যে এই জাহাজে করে যাব, সে-কথা তো আমার দল ছাড়া...আচমকা এক কাচের দেওয়ালে

গিয়ে ধাক্কা খেল আমার হৃৎপিণ্ড। তা হলে কি 'অ্যাসাসিন' চাইছে আমাকে সরিয়ে দিতে? কিন্তু ওদের সঙ্গে তো কোনও বিশ্বাসঘাতকতা আমি করিনি!

মনকে বারংবার স্তোক দিয়ে ক্যাপ্টেনকে সবিস্ময়ে এবং সবিনয়ে জানালাম, 'এ আপনি কী বলছেন, মিস্টার ক্যাপ্টেন? না, না,—কে আমাকে খুন করতে চাইবে? আর কেনই-বা চাইবে? ওটা নেহাতই অ্যাক্সিডেন্ট, ক্যাপ্টেন। হয়তো কোনও বালতি ওপরে রাখা ছিল, জাহাজের দোলানিতে হঠাৎ নীচে পড়ে গেছে।'

কিন্তু এত সব বললে কী হবে, ক্যাপ্টেন ছাড়লেন না। আমাকে নিয়ে অকুস্থল পরিদর্শন করলেন। নানান উপদেশ দিলেন। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা পর তাঁর হাত থেকে মুক্তি পেলাম। খিদেয় তখন পেট চোঁ-চোঁ করছে। তাই আর দেরি না করে খাবার ঘরের দিকে এগোলাম।

খাবার ঘরে পা দিয়েই যে-বিচিত্র দৃশ্যের মুখোমুখি হলাম, তাতে ঘরটাকে খাবার ঘর না বলে পাগলাগারদ বলাই বোধহয় ঠিক হবে। কারণ, ঘরের প্রায় প্রতিটি যাত্রী এখন সার বেঁধে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখগুলো বোধ হয় ঠিকরে গিয়ে পড়বে টেবিলের ওপরে। যেখানে সাজানো খাবারের প্লেট এবং সেই কালো বেড়ালটা। হ্যাঁ, সেই কালো বেড়ালটা টান-টান হয়ে টেবিলের ওপরে পড়ে আছে। আর, আমার প্লেটের খাবার কিছুটা টেবিলে ছড়ানো।

'হোয়াটস দ্য ম্যাটার?' দরজার কাছে কাঠপুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বেয়ারাকে প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপার কী?'

এমন সময় হেলতে-দুলতে এগিয়ে এলেন সেই মোটকা মহিলাটি 'মিস্টার আম্বাস্তা, মিস্টার আম্বাস্তা...ওঃ, হরিবল!'

'কী হয়েছে? মনে হচ্ছে, আপনারা যেন ভয় পেয়েছেন?'

মিহি গলায় আমার ডানপাশ থেকে উত্তর ভেসে এল, 'কালো বেড়ালটা মরে গেছে। আপনার প্লেটে মুখ দিয়েই মরে গেছে!'

ঘাড় ফেরাতেই চোখ পড়ল রণেন বর্মার কাঁচুমাচু মুখের ওপর। তিনি ঘনঘন ঢোক গিলছেন আর চোখ পিটপিট করছেন।

'আমার আর কী দোষ, বলুন? বেড়ালটা খাওয়ার জন্যে চেয়ারের ওপর উঠল। আমি ভাবলাম, একটু দিই। দিতে যাচ্ছি, অমনি বেড়ালটা প্লেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে লাফিয়ে পড়ল। আর খাবার মুখে দিয়েই ছটফট করে মরে গেল।'

ভদ্রমহিলার কথা পুরোপুরি আমার কানে গেল না। চোখে যেন ঝাপসা দেখতে লাগলাম। হাঁটুজোড়া বিদ্রোহ করে অবশ হয়ে এল। মাথার ভেতর আছড়ে পড়ছে সন্দেহের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ।

দুর্ঘটনা?

হয়তো তাই। ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিতে হবে যে, তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নয়তো ওই বেড়ালটার জায়গায় পড়ে থাকত এই সুধীর নায়েক।

এদিকে কখন যে ক্যাপ্টেন, জাহাজের ডাক্তার এবং মেট এসে উপস্থিত হয়েছেন, খেয়ালই করিনি। বোধহয় কোনও বেয়ারা গিয়ে তাঁদের খবর দিয়েছে। ডাক্তার তাঁর হাড়জিরজিরে চেহারা নিয়ে আমার প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কিছুক্ষণ শোঁকাশুঁকি

করে, আঙুল জিভে ঠেকিয়ে, ক্যাপ্টেনের কানে-কানে কী যেন বললেন, তারপর তাঁরা তিনজনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় ক্যাপ্টেন আমার পাশে থমকে দাঁড়ালেন 'মিস্টার আম্বাস্তা, প্লিজ, কাম উইথ আস। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

চটপট ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করলাম।

ডেকের ওপর এসে পৌঁছতেই ক্যাপ্টেন আমাকে আগের মতোই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন। কোনওরকমে ভাসা-ভাসা ভাবে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম। শেষে তিনি বললেন, ইঁদুর মারার জন্যে জাহাজের স্টোরে আর্সেনিক রাখা হয়। সেখান থেকেই কীভাবে যেন আমার প্লেটে আর্সেনিক পড়ে গেছে। রাঁধুনি এবং বেয়ারাদের অসাবধানতার জন্যে তিনি তাদের নিশ্চয়ই সতর্ক করে দেবেন। বিশেষ করে আমার মতো একজন সম্ভ্রান্ত যাত্রীর পক্ষে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেন জানি না মনে হল, এই ঘটিত দুর্ঘটনাগুলো যেন বড় বেশি স্বাভাবিক। তা হলে কি...কিন্তু চিফ তো আমাকে বিশ্বাসী বলেই মনে করেন। একই প্রশ্নের বৃত্তে ঘুরতে লাগল আমার মন। অশান্ত মন।

তৃতীয় দুর্ঘটনা

খাওয়াদাওয়া সেরে (ক্যাপ্টেনের অনুরোধে এবং নিজের প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখার জন্যে বেয়ারার এগিয়ে দেওয়া দ্বিতীয় খাবারের প্লেট সানন্দেই গ্রহণ করেছি)। কেবিনে ফিরে এলাম। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার আগের ব্যবস্থা নিলাম। অর্থাৎ, সুটকেসটাকে অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে আটকে দিলাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে বেসিনের তলায় হাত চালালাম। কারণ, দুর্ঘটনা যখন এত ঘনঘন ঘটছে, তখন সাবধান থাকা ভালো।

কিন্তু বেসিনের তলায় হাত ঠেকতেই তড়িৎপৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। এ কী! অ্যাডেসিভ টেপ ঠিকই লাগানো আছে, কিন্তু আমার লুগারটা বেসিনের গায়ে আর লাগানো নেই! জনৈক পরোপকারী ব্যক্তি আমাকে সামান্য কৃপা করেছেন।

কী করব ভেবে না পেয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ক্রমশ আমি যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। আমার নিরাপত্তার প্রাচীর ক্রমেই যেন বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়া মাটির ঢিবির মতো গলে যাচ্ছে। মনে সাহস ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ঠিক করলাম, আমার যা-ই ঘটে ঘটুক, তবু মরার আগে সুধীর নায়েক তার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করে যাবে!

ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। কেবিনের পোর্টহোল দিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দে সামুদ্রিক বাতাস বয়ে আসছে। চাঁদের আলো ঘরের মেঝেতে সৃষ্টি করেছে এক রুপোলি বৃত্ত। গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলাম।

সামান্য তন্দ্রা মতো এসেছে, হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার গায়ের কম্বল এবং গেঞ্জির মাঝে একটা স্তর যেন ধীরে-ধীরে নড়ে বেড়াচ্ছে। আমার কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগছে।

খুব হালকা চালে অজানা জিনিসটা এগিয়ে আসতে লাগল আমার বুকের দিকে। কম্বলটা সেই জায়গাটায় সামান্য উঁচু হয়ে নড়তে লাগল।

ভয়ে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম। বুঝলাম, ভুলক্রমে কম্বলসমেত এক অজানা প্রাণীকে গায়ের ওপর চাপা দিয়ে ফেলছি। কী ওটা? সাপ?

শুয়ে-শুয়ে ঘামতে শুরু করলাম। নিজের স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেললাম। নড়তে সাহস পাচ্ছি না, যদি আচমকা কিছু ঘটে যায়, তা হলে?

হঠাৎ মরিয়া হয়ে এক ঝটকায় লাফিয়ে মেঝেতে নামলাম। কম্বল-টম্বল সব ছিটকে পড়ল মেঝেতে। একছুটে সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে অন করে দিলাম আলোর সুইচ।

দেখি ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে আমার হাতের পাঞ্জার মাপের এক টারান্টুলা মাকড়সা। একপাটি জুতো দিয়ে পিটিয়ে ওটাকে শেষ করলাম। ওটার লোমশ কালো দেহ মাটির সঙ্গে থেঁতলে গেল।

অন্ধ ক্রোধে আমি উন্মাদ হয়ে উঠলাম। প্রথম বালতি, তারপর আর্সেনিক, রিভলভার চুরি, অবশেষে এই মাকড়সা। ওফ, দিস ইজ টু মাচ।

চটপট জামাটা গায়ে চড়িয়ে চটিটা পায়ে গলালাম। তারপর সুটকেস সরিয়ে দরজা খুলে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকেই রাগে ফেটে পড়লাম: 'নাউ লুক, মিস্টার ক্যাপ্টেন, দিস ইজ টু মাচ!'

ক্যাপ্টেন বসে-বসে ঢুলছিলেন। চকিতে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কী—কী হয়েছে, মিস্টার আম্বাস্তা?'

ক্যাপ্টেনকে সংক্ষেপে মাকড়সার ব্যাপারটা জানালাম (রিভলভার প্রসঙ্গের উল্লেখ করব, এমন বোকা আমি নয়)। সব শুনে তিনি দুঃখিতভাবে কয়েকবার মাথা নাড়লেন: 'ব্যাপারটা কী জানেন? আমাদের স্টোরে প্রচুর পাকা কলা রাখা আছে। আর তারই লোভে সব মাকড়সা এসে ভিড় করে। সেখান থেকেই একটা হয়তো কোনওরকমে...।'

'ইউ মিন দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট?' টেবিলের ওপরে সশব্দে এক চাপড় কষিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'সার্টেইনলি।' বিস্ময়ে ভুরু উঁচিয়ে তাকালেন তিনি 'হোয়াই ডোন্ট ইউ থিঙ্ক সো?'

চিৎকার করে একটা বিশ্রী জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সময়মতো নিজেকে সংযত করলাম। ভেবে দেখলাম, টেবিল চাপড়ে বা চিৎকার করে এর কোনও সমাধান হবে না। সুতরাং ঠান্ডা গলায় জবাব দিলাম, 'ইউ আর রাইট, ক্যাপ্টেন। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না।'

ক্যাপ্টেন আমার জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ক্যাবিনেট থেকে হুইস্কির বোতল বের করে আমাকে আহ্বান জানালেন।

কিছু সাধারণ গাল-গল্প এবং দু-পেগ হুইস্কি শেষ করে যখন আমি উঠে দাঁড়ালাম, তখন রাত দেড়টা। জড়ানো গলায় ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরের ডেকে আসতেই এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আমার বুক আনন্দে নেচে উঠল। অন্ধকার ডেকের এককোনায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরণেন বর্মা। মরা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ডেকের ওপর। আর সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা।

ডেক জনশূন্য, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে এগোনো যাবে। ক্যাপ্টেন যখন তিন-তিনটে দুর্ঘটনা দেখেছেন, তখন আরও একটা দুর্ঘটনা তাঁকে আমি দেখাতে চাই।

নিঃশব্দ হিংস্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে পা টিপে-টিপে রণেন বর্মার দিকে এগোলাম। এরকম সুবর্ণসুযোগ আর হয়তো পাব না।

প্রথমে ধীরে ধীরে...তারপর জোরে...আরও জোরে...শেষে উল্কাগতিতে ছুটে চললাম রণেন বর্মাকে লক্ষ্য করে। চটি খুলে ফেলে দিয়েছি ডেকের ওপর—যাতে কোনওরকম শব্দ না হয়।

তাঁর দশ গজের মধ্যে পৌঁছে আরও হিংস্র হল আমার হাসি। পা দুটো ছুটে চলল আরও জোরে...আরও জোরে...অনুভব করলাম, আমি রণেন বর্মাকে লক্ষ্য করে পাগলের মতো দৌড়চ্ছি...দৌড়চ্ছি...।

চরম দুর্ঘটনা

'না, না, আপনার কোনও দোষই নেই। কোনও দোষ আপনাকে আমরা দিচ্ছি না।' কথা বলতে-বলতে একগ্লাস হুইস্কি রণেন বর্মার দিকে এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন 'নিন, এটা খেয়ে নিন। যা মেন্টাল স্ট্রেন গেছে আপনার।'

'থ্যা—থ্যাঙ্ক ইউ।' মিহি গলায় জবাব দিলেন রণেন বর্মা। দু-চার ঢোকেই শেষ করে ফেললেন হুইস্কিটুকু। তারপর চোখ বড়-বড় করে বলতে লাগলেন, 'আমার ঘুম আসছিল না বলে বাইরে ডেকে এককোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। ঠান্ডা হাওয়ায় বেশ একটা ঘুমের আমেজ এসেছিল। হঠাৎ দেখি মিস্টার আম্বাস্তা, তাই তো নাম ছিল ভদ্রলোকের, (ক্যাপ্টেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন) আমার দিকে পাগলের মতো ছুটে আসছেন। হাতদুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই যেন দৌড়ে আসছেন। অন্ধকারে তার সাদা দাঁতের সারি ঝকঝক করছে। সারা মুখে কেমন একটা হিংস্র ভাব। আমি—আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আর—আর- একগ্লাস হুইস্কি...ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড—

ক্যাপ্টেন বিনা বাক্যব্যয়ে হুইস্কি আর জল দিয়ে তাঁর গেলাস ভরতি করে দিলেন।

'ধ—ধন্যবাদ। আমি ভয় পেয়ে একলাফে পাশে সরে গেলাম। আর ভদ্রলোক সোজা ডেকের রেলিঙে ধাক্কা খেয়ে এক ডিগবাজিতে জাহাজের বাইরে চলে গেলেন। ঠিক যেন ভূতে পাওয়া লোকের মতো মিস্টার আম্বাস্তা দৌড়ে আসছিলেন। তিনি বাইরে জলে পড়ে যেতেই আমি চিৎকার করে উঠলাম। তারপর...।'

'হ্যাঁ, তারপর তো আমরা সবই জানি।' গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন, 'অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভদ্রলোককে আর উদ্ধার করা গেল না। এ স্যাড বিজনেস। তবে কী জানেন মিস্টার বর্মা, ভদ্রলোকের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে একটা অ্যালার্জি ছিল। এই চরম অ্যাক্সিডেন্টটার আগে আরও তিনবার তিনি অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে আমাদের কাছে রিপোর্ট করেছিলেন। আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!'

আপনমনেই নিজের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন রণেন বর্মা। তারপর দু-পকেট হাতড়ে সম্ভবত দেশলাই খুঁজলেন। শেষে কাঁচুমাচু মুখ করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন, ‘দে—দেশলাই আছে আপনার কাছে?’

‘হ্যাঁ, এই নিন।’ টেবিলের ওপর খট করে দেশলাইয়ের বাক্সটা ছুড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন:’আপনাকে বড্ড আপসেট দেখাচ্ছে, মিস্টার বর্মা। যান, রাত তো অনেক হল—শুয়ে পড়ুন গিয়ে। আপনার দুঃখ পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সাহায্যের জন্যে চিৎকার ছাড়া আর কী-ই-বা আপনি করতে পারতেন? আর আপনি ডেকেছিলেন বলেই তবু খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব হয়েছে। নয়তো ওটুকুও কি আমরা করতে পারতাম? হয়তো কিছু জানতেই পারতাম না।’ সহানুভূতিতে কোমল হল ক্যাপ্টেনের স্বর।

‘ধ—ধন্যবাদ।’ ফস করে দেশলাই জ্বেলে কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালেন রণেন বর্মা। পোড়া কাঠিটা ফেলে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর দেশলাইয়ের বাক্সে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে সমান্তরালভাবে আঁচড় কাটতে-কাটতে বললেন, ‘জানেন ক্যাপ্টেন, এই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারগুলো আমাকে ভীষণ আপসেট করে। অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনলেই আমার ভীষণ ভয় করে। বিশ্বাস করুন...সত্যি বলছি...।’

নিখুঁত খুনের অ্যানাটমি

অনেক ভেবেচিন্তে নীতিশ দত্ত ঠিক করলেন, তাঁর স্ত্রীকে স্বর্গের সিঁড়ি দেখাবেন। প্রত্যেকেরই একটা সহ্যের সীমা আছে। সে-সীমা অতিক্রম করলে কারও পক্ষেই ধৈর্য ধরা সম্ভব নয়। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে তিনিও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন...।

কামিনীর সঙ্গে নীতিশের বিয়ে হয়েছে পঁচিশবছর। এখন ষাটের কোঠায় পৌঁছে তাঁর মনে হয়েছে, কামিনীর এতদিনকার অবিচারের প্রতিফল হিসেবে ওকে খুনই করা উচিত। বিয়ের পর থেকেই বউয়ের বুড়ো আঙুলের তলায় তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে। একমুহূর্তের জন্যও কোনও কথার প্রতিবাদ করতে পারেননি। কামিনীর কথায় উঠেছেন, বসেছেন। অনেক সময় মন বিদ্রোহ করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। মেরুদণ্ড কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। আসলে স্ত্রীকে তিনি ভীষণ ভয় পান। অন্তত পাড়াপড়শিরা তাই জানে। স্ত্রীর বহু অত্যাচার তিনি মুখ বুজে সহ্য করেছেন। তাই আজ রাতে কামিনীকে এই চরম শাস্তি দিতে চান—।

রোজকার মতো দোকান খুলে কাউন্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন নীতিশ। পাঁচটা বেজে গেছে। বাইরে আলো কমে এসেছে। গত পঁচিশবছর ধরে এ নিয়মের হেরফের হয়নি। সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা। আবার বিকেল পাঁচটা থেকে ঠিক রাত ন'টা। আজ দোকান খুলে থিতু হয়ে বসতেই এসে ঢুকল চুনি মণ্ডল। নীতিশকে দেখে হাসল: দত্তবাবু, আমার এক পাউন্ড রুটি লাগবে...আর মিসেস কোথায় গেলেন?—চোখ নাচাল চুনি।

কামিনী ঘুমোচ্ছে, এক্ষুনি আসবে।—এক পাউন্ড রুটি চুনির দিকে এগিয়ে দিলেন নীতিশ। পয়সা দিয়ে বাইরে পা বাড়াল মণ্ডল। দরজার কাছ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, দত্তদা, হিসেবের খাতায় দামটা টুকে রাখুন। নয়তো বউদি এসে ধমক লাগাবে'খন।—হেসে বেরিয়ে গেল সে।

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল নীতিশের। না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। গত পঁচিশবছর ধরেই এ ধরনের কথা তাঁকে শুনতে হচ্ছে...।

কী হল? ঘুমোচ্ছ নাকি! এত বয়স হল, তবু একটা জ্ঞানগম্যি নেই? বলি, দামটা খাতায় তুলবে কে—হ্যাঁ?—বাজখাঁই গলার চিৎকারে চমকে ফিরে তাকালেন নীতিশ। কামিনী দত্ত এসে দাঁড়িয়েছে দোকানে। মোটাসোটা ফুটবলের মতো চেহারা। দু-চোখে ক্রুর চাউনি।

ওহ—হ্যাঁ। একদম ভুলে গেছি।—তাড়াতাড়ি পেনসিল বাগিয়ে এক পাউন্ড রুটির দাম খাতায় টুকতে লাগলেন।

কামিনী দত্ত আগুনঝরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল গোবেচারি স্বামীর দিকে। গোল-গোল পেঁচার মতো চোখে রিমলেস চশমা। ঝাঁটা গোঁফ। ছোট চেহারা। গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে! ষাট বছরেই যেন যমের ঘরে পা বাড়িয়ে রেখেছেন। কিন্তু কামিনী জানে না মনে-মনে কী কুটিল অভিসন্ধি এঁটেছে তার এই থুত্থুরে বুড়ো স্বামী।

ন'টা বাজতেই সোজা হয়ে বসলেন নীতিশ। ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই ওঁর অভিনয় শুরু হবে। তিনি জানেন স্ত্রী হত্যার প্রথম সন্দেহভাজন ব্যক্তি মৃতার স্বামী। এসব জেনেও তিনি ভয় পাননি। এমনভাবে কাজটা ওঁকে সারতে হবে, যাতে কাকপক্ষীও না সন্দেহ করে। এখনকার কাজগুলোর ওপরেই নির্ভর করবে ওঁর এই অদ্ভুত খুনের সাফল্য।

কামিনী এক কোণে বসে রোজকার বিক্রির হিসেব কষছিল। দোকানের শেষ খদ্দের যখন দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন ব্যস্ততার ভান করলেন নীতিশ। দোকানের টুকিটাকি কাজ নিয়ে পড়লেন। অন্যান্য দিন শেষ খদ্দেরের পিছন-পিছন গিয়ে তিনি সদর দরজা বন্ধ করেন। কিন্তু আজ তা করলে চলবে না। কারণ, আজ তিনি সদর দরজা বন্ধ করবেন না।

যেতে-যেতে থমকে দাঁড়াল শেষ খদ্দের! মিস্টার দত্ত, ন'টা তো বেজে গেল, দোকান বন্ধ করবেন না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—। হাতের কাজটা সেরে নিই, এখুনি বন্ধ করছি।—মনে-মনে ব্যাটাকে প্রাণ খুলে গালাগাল দিলেন। পরের চরকায় কেন তেল দিতে আসছ বাবা। দোকান বন্ধ করি কি না করি তাতে তোমার কী?

খদ্দেরটি বেরিয়ে যেতেই সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন নীতিশ।

কী হল কী? যাওয়ার সময় উনি কী বলে গেলেন শোনোনি? কানে কি গজাল গেঁথে বসে আছ? দরজাটায় খিল লাগিয়ে ছিটকিনি এঁটে তালা-টালা মারো। হোপলেস কোথাকার।—খেঁকিয়ে উঠল কামিনী।

হ্যাঁ—লাগাচ্ছি। আগে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নোংরাগুলো বাইরে ফেলে আসি, তারপর বন্ধ করছি।—চুপচাপ ঝাঁটা দিয়ে কাজ শুরু করলেন নীতিশ। নোংরাগুলো একটা টিনে ভরে (গত পঁচিশবছর ধরে এই একই কাজ করে আসছেন তিনি) দোকানের পিছনদিকের খিড়কি দরজা খুলে বেরোলেন। সামনে একফালি খোলা জায়গা। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

মুহূর্তের মধ্যে নীতিশ তৎপর হয়ে উঠলেন।। কোথায় গেল ষাটবছরের বৃদ্ধের জড়তা! টিনটা ফেলে রেখে অন্ধকার কোণ থেকে একটা শাবল তুলে নিয়ে ছুটে বেরোলেন।

দোকানের পিছনে একটা সরু অন্ধকার গলি। রাত আটটার পরই গলিটা একদম ফাঁকা হয়ে যায়। আর এখন তো রাত ন'টা!

গলিটা নির্জন—খাঁ-খাঁ করছে। ছুটে গেলেন গলির একমাত্র ম্যানহোলটার কাছে। শাবলের চাড় দিয়ে লোহার ঢাকনাটা তুলে একপাশে সরালেন। তারপরই আবার ছুটে চললেন দোকানের দিকে। শাবলটা আগের জায়গায় ঠক করে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে-হাঁপাতে দোকানে গিয়ে ঢুকলেন।

এতক্ষণ ধরে কি ওই নোংরাগুলো গিলছিলে? কখন থেকে...এ এ কী!

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল কামিনী দত্তর দু-চোখ, যেন কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে।

কারণ, নীতিশের হাতের পাঞ্জায় ধরা একটা গাঢ় নীল রঙের অটোমেটিক রিভলভার। তার নলটা তাক করে আছে কামিনীর দু-চোখের ঠিক মাঝখানে। পরক্ষণেই—গুড়ুম—।

কামিনী লুটিয়ে পড়তেই একহাতে ওর শরীরটা ধরে ফেললেন নীতিশ। সাবধানে শুইয়ে দিলেন কাউন্টারের পিছনে। রিভলভারটা পকেটে পুরে ফেললেন। ক্যাশের সমস্ত টাকা একটা ব্রিফকেসে ভরতি করে তালা এঁটে দিয়েছিল কামিনী। এক হ্যাঁচকায় সেটাকে তুলে নিয়ে ছুটে চললেন ম্যানহোলের দিকে।

ঢাকনাটা খোলাই ছিল। রিভলভার এবং টাকার ব্যাগটা ওর ভেতরে ফেলে ঢাকনা বন্ধ করে তিনি আবার দোকানে ফিরে এলেন।

খুব সতর্কভাবে নীতিশকে প্রত্যেকটি কাজ করতে হবে। এইবার শুরু হল কাজের দ্বিতীয় পর্যায়।

সাড়ে তিনবছর আগে নীতিশের দোকানে একবার ডাকাত পড়েছিল। শীতের সময় রাত আটটা নাগাদ ব্যাপারটা হয়েছিল। তখন কামিনী বাধা দেওয়ায় ডাকাতদলের একটা লোক গুলি চালায়। সেই গুলিতে কামিনী বাঁ-হাতে চোট পায়। তারপর থেকেই ওর বাঁ-হাতটা সামান্য বেঁকা।

কামিনী এমনিতে দজ্জাল, ডাকাবুকো। ওর সাহসের কোনও কমতি নেই। ওরা বেজায় বড়লোক। তা ছাড়া ওর রিলেটিভরা এক-একজন কেউকেটা। ফলে ওই ডাকাতির ঘটনার পর কামিনী বেঁকে বসল। বলল, লাইসেন্স করা একটা রিভলভার ওর চাই-ই চাই।

ওর বায়না মিটতে তেমন দেরি হল না। ওর এক মামা ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। তিনিই কীভাবে যেন কলকাঠি নেড়ে আদরের ভাগ্নীকে একটি রিভলভারের লাইসেন্স করিয়ে দিলেন। ০.২২ ক্যালিবারের ছোট্ট বন্দুক। সেটা সবসময় কাউন্টারের নীচে একটা ড্রয়ারে রাখা থাকে—চোর-ডাকাত ঠেকানোর জন্য। এই বন্দুকটাই নীতিশকে আজকের এই প্ল্যান জুগিয়েছে।

চটপট ড্রয়ার খুলে সেই রিভলভারটা বের করলেন নীতিশ। যা করার জলদি করতে হবে। হাতে একদম সময় নেই।

রিভলভারটা ভালো করে মুছে অতি সাবধানে কামিনীর ডেডবডির ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। স্ত্রীর প্রাণহীন নিশ্চল ডানহাতটা টেনে নিয়ে রিভলভারের বাঁটের ওপর চেপে ধরলেন ওর হাতের পাঁচ আঙুল। তারপর রিভলভারটা তুলে নিয়ে নিজের মুঠোয় বাগিয়ে ধরে ছুটলেন। লক্ষ্য পিছনের সরু গলি...।

হুড়মুড় করে গলিতে পৌঁছে (এসবই অভিনয়ের অংশ) খুব নিখুঁতভাবে কাজগুলো করতে হবে নীতিশকে। কারণ, স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকেই প্রথম সন্দেহ করা হয়। সুতরাং একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই গলির অন্ধকার দিকটা লক্ষ্য করে ফায়ার করলেন—একবার-দুবার—রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে ভেসে এল গুলির শব্দ—গুড়ুম-গুড়ুম—।

রিভলভারটা নামিয়ে শ্লথ পায়ে টলতে-টলতে দোকানে ফিরে এলেন নীতিশ। এসে দেখেন যা ভেবেছেন ঠিক তাই। তাঁদের ওপরতলার ভাড়াটে, বৃদ্ধ কুমার চক্রবর্তী, নেমে এসেছেন দোকানে। হতভম্বের মতো চারপাশে তাকাচ্ছেন—।

এই যে, নীতিশ—কী হয়েছে? কীসের একটা আওয়াজ পেলাম মনে হল। তোমার ওয়াইফ কোথায়?

নীতিশ টলতে-টলতে কাউন্টারের পিছনে গেলেন। হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ল। জল ভরা চোখে ঝাঁপিয়ে পড়ল কামিনীর মৃতদেহের ওপরে। চমকে উঠে কাউন্টারের এপাশে এলেন চক্রবর্তী: ও গড—নীতিশ, কী করে এসব হল? শিগগিরই পুলিশে খবর দাও—।

নীতিশ ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের জল মুছে এগিয়ে গেলেন দোকানের টেলিফোনটার দিকে...।

তার মানে আজ আপনি ন'টার সময় দরজা বন্ধ করেননি?—নীতিশের দিকে ক্রুর দৃষ্টি মেলে ধরলেন ইন্সপেক্টর সুনীল ধর: অথচ বছরের পর বছর ঠিক ওই সময়েই আপনি দরজা বন্ধ করে এসেছেন।—ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয়, মিস্টার দত্ত?

না...মানে, একটা কাজে আটকে পড়লাম—তাই তক্ষুনি বন্ধ করা হয়ে ওঠেনি—।

দোকানের বাইরে লোক গিজগিজ করছে। খবর পেয়ে এই রাতবিরেতেও সবাই ছুটে এসেছে।

সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল সেই শেষ খদ্দের। ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল: উনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। আমি যখন বেরিয়ে যাই তখন উনি কৌটোগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন।

তাই বুঝি?—ঝকমক করে উঠল ইন্সপেক্টরের চোখ। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন দত্তর দিকে। তারপর অপেক্ষমাণ কনস্টেবলকে বললেন, এই, সব লোকগুলো হটাও—।

মুহূর্তে দোকান ফাঁকা করে ইন্সপেক্টর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আসুন, মিস্টার দত্ত, এখানটায় বসা যাক—আর-একবার শোনা যাক আপনার গল্পটা।

নীতিশ ইন্সপেক্টরের কাছে এসে বসলেন।

ওদিকে তখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। চষে ফেলছে গোটা দোকানটা।

বলুন, মিস্টার দত্ত—গোড়া থেকে বেশ ধীরেসুস্থে বলুন। যেন কোনও ভুল না হয়।

নীতিশ দত্ত ওঁর গোল-গোল চোখ তুলে তাকালেন ঠিক কীভাবে যে শুরু করব বুঝতে পারছি না।...ওই ভদ্রলোক—মানে, আমার শেষ খদ্দেরটি চলে যাওয়ার পর আমি সদর দরজা ভেজিয়ে দিই। তারপর রোজকার মতো নোংরার টিনটা জায়গামতো রেখে ফিরে আসতেই দেখি একটা লোক রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছে আমার ওয়াইফের দিকে। আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় কাছে যেতে বলল। আমাদের দুজনকে রিভলভারের ডগায় দাঁড় করিয়ে ক্যাশভরতি ব্যাগটা তুলে নিল। ঠিক এময় সময় কামিনী ড্রয়ারে রাখা ওর রিভলভারটা লুকিয়ে বের করতে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ডাকাতটা গুলি করল—ওঃ! কামিনী পড়ে যেতেই লোকটা খিড়কি দরজা দিয়ে ছুটে পালাল। কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর এক হ্যাঁচকায় কামিনীর হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভারটা টেনে নিয়ে ছুটলাম। পেছনের সরু গলিটায় পৌঁছেই লোকটাকে দেখতে পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করলাম—দুবার—। মনে হল লোকটা একটু টলে পড়ল—তারপরই মিলিয়ে গেল—।

দু-হাতে মুখ ঢাকলেন নীতিশ। তিনি জানেন, ওঁর এই হাবাগোবা, ভালোমানুষ চেহারাটাই ইন্সপেক্টরকে ভাবিয়ে তুলেছে সত্যিই তিনি খুন করেছেন কি না।

সুনীল ধরের কথায় ওঁর চমক ভাঙল, ডাকাতটার চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন, মিস্টার দত্ত?

এ প্রশ্নের জন্য নীতিশ তৈরিই ছিলেন, জবাব দিলেন, মোটা গোঁফ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বড় জুলপি। ডান ভুরুর ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। গর্তে বসা ছোট চোখ। থ্যাবড়ানো নাক। তার পাশে একটা আঁচিল—।

চমৎকার, চমৎকার,—পেনসিল আর নোটবই হাতে উঠে দাঁড়ালেন সুনীল: নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু মিস্টার দত্ত, একটা কথা আপনাকে গোড়াতেই জানিয়ে রাখা ভালো: কোনও ম্যারেড মহিলা মারা গেলে, মানে খুন হলে, আমরা তাঁর হাজব্যান্ডকেই প্রথম সন্দেহ করি। আমিও সন্দেহ করব আপনাকেই— যদিও আপনার চেহারা দেখে মনে হয়, একটা মশা মারতেও আপনি দশবার চিন্তা করবেন। কিন্তু কে জানে...! যাকগে, আজ আমি চললাম। কাল আবার দেখা হবে, এই দোকানে। কোনও খুন-টুন হলে আমি তন্নতন্ন করে খুনি খুঁজে বেড়াই। ওটা আমার একটা ম্যানিয়া...।

পরদিন সন্ধেবেলা ইন্সপেক্টর একাই এলেন। নীতিশ দোকান খোলেননি। ঠিক করেছেন স্ত্রী মারা গেছেন বলে দিন-সাতেক বন্ধ রাখবেন।

আসুন, মিস্টার ধর। কোনও খবর পেলেন ওই লোকটার?—আগ্রহ ফেটে পড়ছে নীতিশের গলায়।

স্থির চোখে নীতিশের দিকে চেয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর, বললেন, বোধহয় আপনার ডেসক্রিপশানের কোনও লোকই পৃথিবীতে নেই—।'

চমকে উঠলেন নীতিশ: তার মানে? তার মানে কী, ইন্সপেক্টর?

আজ সারাটা দিন ধরে আমাদের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পঁয়তাল্লিশজন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। না, আপনার বর্ণনা মতো কোনও লোকের ছবিই আমাদের ফাইলে নেই। তা হলে আর বাকি থাকে মাত্র দুটো সম্ভাবনা এক, ডাকাতটা এ-লাইনে নতুন। দুই, ডাকাতের ব্যাপারটা পুরো গাঁজাখুরি। মানে, আপনার বানানো।—মুচকি হেসে থামলেন, সুনীল।

কী—কী বলতে চান আপনি?—রাগে নীতিশের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে।

উত্তেজিত হবেন না, মিস্টার দত্ত। আমি তো আগেই বলেছি, যত অসম্ভব আর অবাস্তব মনে হোক না কেন, আপনাকেই আমি সন্দেহ করি। আর রিভলভারের ছাপ আমরা পরীক্ষা করেছি। তাতে আপনার প্রিন্ট ছাড়াও মিসেস দত্তর পার্শিয়াল প্রিন্ট পাওয়া গেছে। হয়তো আপনার কথাই সত্যি: মিসেস দত্ত গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর আপনি রিভলভারটা নিয়ে ডাকাতটাকে তাড়া করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ডেডবডির হাতে রিভলভারটা চেপে ধরে প্রিন্ট তৈরি করা এমন কিছু অসম্ভব নয়—কী বলেন?...সত্যি, মিস্টার দত্ত, খুনটা যদি আপনিই করে থাকেন তবে আপনাকে সাবাশ দিতে হয়।

আবার ব্যাপার কী জানেন? আপনার কথামতো একটা গুলি পেছনের গলির দেওয়ালের গা থেকে আমরা পেয়েছি। দ্বিতীয়টা পাইনি। হয়তো লোকটার গায়েই ওটা লেগেছে। এখানকার সব ডাক্তার আর হসপিটালকে আমরা অ্যালার্ট করে দিয়েছি। কোনও গুলির চোট খাওয়া লোক যদি তাদের কাছে যায়, তবে তারা যেন সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেয়। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। যদি আপনার কথামতো কোনও ডাকাত ও-কাজটা করে থাকে, তবে আমরা যেভাবে হোক মালকে ভেতরে ঢোকাবই। শুধু একটু খাটতে হবে এই যা। আর সে-লোক যদি আপনি হন, তবে তো হাতের কাছেই আপনাকে পাওয়া যাবে —। দরজার দিকে পা বাড়ালেন ধর হ্যাঁ, একটা কথা—। ইন্সপেক্টর ঘুরে দাঁড়ালেন।

নীতিশের হৃৎপিণ্ড যেন হোঁচট খেল: কী—কী কথা?

সামান্য ব্যাপার। আপনি বলছিলেন না, নোংরার টিনটা রেখে আপনি যখন দোকানে ফিরে আসছিলেন, তখনই ডাকাতটাকে দেখতে পান। কিন্তু খটকাটা কোথায় জানেন? টিনটা আপনি জায়গামতো রাখেননি। মাঝপথেই নামিয়ে রেখে—ভগবান জানেন তারপর কী করেছেন!

ইস—ক্ষুব্ধ হলেন নীতিশ। কী বোকার মতো কাজই না করেছেন! শাবলটা তুলে নেওয়ার সময়ে টিনটা মাঝপথেই নামিয়ে রেখেছিলেন। জায়গামতো রাখার আর সুযোগ পাননি। কী হবে এখন?

ইন্সপেক্টর, দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না—মানে, গত পঁচিশবছর ধরে ওই একই জায়গায় টিনটা রাখি তো—তাই মনে হয়েছিল কালও বোধহয় রেখেছি...। ওহ—হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে।..টিনটা নিয়ে যাওয়ার সময় দোকানের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে টিনটা মাঝপথেই নামিয়ে রেখে ফিরে আসি—।

যা ইচ্ছে বলুন...কোনও সাক্ষী তো আর নেই! আপনি যা বলবেন, তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।—ইন্সপেক্টর হাসলেন: তবে একটা কথা বলে রাখি, সাক্ষী আমি খুঁজে বের করবই। আজই খবরের কাগজে একটা অ্যাড দিচ্ছি—লাস্ট আট তারিখ রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কেউ এই এরিয়ায় কোনও পিকিউলিয়ার ঘটনা দেখেছে কি না। দেখা যাক, কোনও রেসপন্স যদি পাওয়া যায়।—দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সুনীল ধর।

চিন্তিত মুখে দরজা বন্ধ করলেন নীতিশ। কাল সকালে আবার কী সংবাদ শুনবেন, কে জানে!

পরদিন দুপুরে ইন্সপেক্টর আবার এলেন।

দত্ত দোকানেই ছিলেন। ওঁকে লক্ষ করে সুনীল বললেন, 'আপনাকে কতগুলো খবর শোনাব। ভীষণ ইন্টারেস্টিং খবর। প্রথমে দু-চারটে কথা বলে নিই। আপনার পাড়াপড়শির কাছে আমি খোঁজ নিয়েছি। খোঁজ নিয়ে একটু অবাকও হয়েছি। কারণ ওইরকম জাঁদরেল মহিলাকে অনেকদিন আগেই আপনার খুন করা উচিত ছিল। আমার ভেবে অবাক লাগছে, আপনি পঁচিশবছর ওয়েট করলেন কেন?

কী বলছেন আপনি!—প্রতিবাদ করলেন নীতিশ, আপনাকে তো বলেছি, ডাকাতটা কামিনীকে...।

জানি, জানি।—একহাত তুলে বাধা দিলেন ধর তবে ব্যাপারটা কী জানেন, আপনি বড্ড বেশি পারফেক্ট ডেসক্রিপশান দিয়ে ফেলেছেন, মিস্টার দত্ত। আমার মনে হয়, ওইরকম মেন্টাল অবস্থায় যেখানে আপনি লোকটাকে কয়েক মুহূর্তমাত্র দেখেছেন, কারও পক্ষে অত নিখুত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক নয়?

যাকগে, এবার আসল খবরটা শুনুন। গত ৮ তারিখে রাত ন'টা বেজে সাতমিনিটের সময় পেছনের গলিটা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন অশোক রায়। হঠাৎ গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একটা অদ্ভুত জিনিস তিনি লক্ষ করেন। গলির ম্যানহোলের ঢাকনাটা খোলা—একপাশে সরানো। হয়তো কোনও গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে ভেবে তিনি গাড়ি রেখে মিনিট-দশেক পরে পায়ে হেঁটে ম্যানহোলটার কাছে ফিরে আসেন —কিন্তু...।

নীতিশের মুখে সীমাহীন উৎকণ্ঠা।

মুচকি হেসে ইন্সপেক্টর হাতের একটা ভঙ্গি করলেন, বললেন, কিন্তু সেই ঢাকনাটা এবার বন্ধ ছিল। অর্থাৎ, কোনও কারণে কেউ ওই ঢাকনাটা খুলেছিল। কিন্তু কেন? সেটা জানার জন্যে আমরা ওটা তন্নতন্ন করে লোক দিয়ে সার্চ করিয়েছি। তাতে পাওয়া গেছে এই রিভলভারটি।

পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে দেখালেন ধর, বললেন, ব্যালিস্টিক রিপোর্টে জানা গেছে, এটা থেকেই আপনার মিসেসকে গুলি করা হয়েছিল। রিভলভারটা চোরাই —কিন্তু এটা কোথা থেকে বিক্রি করা হয়েছে সেটা একটু খোঁজ করলেই জানা যাবে।

হৃৎপিণ্ডের উত্তালগতি কি কিছুতেই শান্ত হবে না? নীতিশ ভয় পেলেন। যদি পুলিশ বের করে ফ্যালে কার কাছ থেকে তিনি ওই রিভলভারটা কিনেছিলেন! যদি সে নীতিশের কথা বলে দেয়! ওঃ—তিনি আর ভাবতে পারছেন না!

কিন্তু ইন্সপেক্টর, ওই ম্যানহোল থেকে আপনারা আর কিছু পাননি?

ঠিক এই প্রশ্নটাই আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছিলাম। আপনি ঠিক সেই কতাটা ভেবেছেন দেখছি। হ্যাঁ, ক্যাশ ভরতি ব্যাগটাও আমরা ওখানে পাব বলে ভেবেছিলাম—কিন্তু পাইনি। ওটা পাওয়া গেলে বোঝা যেত আসল ব্যাপারটা। ব্যাগটা যদি টাকাভরতি থাকে, তবে ম্যানহোলের ঢাকনা আপনিই সরিয়েছিলেন। গর্তের ভেতরে ফেলে দিয়েছিলেন ব্যাগ আর রিভলভারটা। কিন্তু ব্যাগটা যদি খালি থাকে, তবে বুঝতে হবে ব্যাপারটা ডাকাতটারই কাজ। মানে, বুঝতে পারছেন, আমাদের হাতে দুটো ক্লু। টাকাভরতি ব্যাগ আর রিভলভার। রিভলভারটায় কোনও প্রিন্ট আমরা পাইনি। বোধহয় ড্রেনের জলে নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও...আপনার একসেট প্রিন্ট তো আমাদের কাছে আছে...ওগুলো ম্যাচ করিয়ে...। ইন্সপেক্টর আর কথা শেষ করলেন না।

ইন্সপেক্টর চলে যেতেই তৎপর হয়ে উঠলেন নীতিশ। যদি ওরা সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে, তার কাছে যায়, তা হলেই সর্বনাশ!

আর দেরি না করে শোওয়ার ঘরে গেলেন। তোশকের নীচে রাখা ছিল কয়েকটা ০.২২ বোরের গুলি। কামিনীই কিনে এনেছিল ওর রিভলভারের জন্য। গোটাতিনেক পকেটে পুরলেন। তারপর নীচে এসে খিড়কি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। চুপিসাড়ে নিঃশব্দে... সরু গলিটা ধরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললেন...।

এই যে মিস্টার দত্ত, কী মনে করে? রিভলভারটা কেমন কাজ দিচ্ছে?— উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল রমেশ পাত্র।

ব্যাটা তা হলে ওঁকে চিনতে পেরেছে। ভাগ্যিস সুনীল ধর আগে খবর দিয়েছিলেন!

রমেশ চোরাই রিভলভার বিক্রি করে। পুরোনো মাস্তান। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। সবসময় হাসিখুশি। জোড়া জোড়া ভুরুর নীচে বড়-বড় চোখ।

হ্যাঁ, ভালোই কাজ দিচ্ছে।—রমেশের কাছে এগিয়ে গেলেন দত্ত কিন্তু আর একটা ০.২২ আমার দরকার...।

আসুন, ভেতরে আসুন।—চাপা স্বরে আহ্বান জানাল রমেশ।

ভেতরের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল পাত্র, বলল, বসুন—।

এর পরের ঘটনা ভাবতেই নীতিশের গায়ে কাঁটা দেয়। নিতান্ত মরিয়া না হলে মানুষ এসব কাজ পারে না। আর নীতিশ দত্ত যে মরিয়া সেটা ওঁর চেয়ে ভালো আর কে জানে!

রমেশকে আরও দুটো রিভলভার কেনার কথা বলেছেন নীতিশ। দুটোই সাইলেন্সার সমেত হওয়া চাই। একইসঙ্গে তিরিশহাজার টাকা ক্যাশও গুঁজে দিয়েছেন লোকটার হাতে।

তাতে কাজ হল মন্ত্রের মতো। টাকাটা পকেটে পুরুল রমেশ। ওর চোখ লোভে ঝকঝক করে উঠল।

পরশু মাল পেয়ে যাবেন।—রমেশ বলল, বাকি টাকা ক্যাশে নিয়ে আসবেন।

কোথায়?

বেলেঘাটার মোড়ে...বাসস্টপে...রাত ন'টায়। আমি নিজে থাকব—নীল জামা সাদা প্যান্ট পরে...।

রাজি হয়ে গেলেন নীতিশ।

ঠিক ন'টায় দুজনের দেখা হল। হাতে একটা জুতোর বাক্স ঝুলিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হলেন নীতিশ।

বাসস্টপে দু-চারজন লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নীতিশ লক্ষ করলেন রমেশ পাত্রর হাতে একটা বড় নাইলনের থলে—জামাকাপড়ে ঠাসা।

নীতিশ কাছে যেতেই রমেশ চাপা গলায় বলল, মাল এনেছেন?

এনেছি—। —বলে হাতে ঝোলানো জুতোর বাক্সটার দিকে ইশারা করলেন। তারপর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে বললেন, আপনি?

এনেছি। থলের মধ্যে—জামাকাপড়ের নীচে...।

এখানে লোকজন রয়েছে।—ইশারা করে রাস্তার নির্জন দিকটা দেখালেন নীতিশ: চলুন—ওদিকে একটু এগিয়ে যাই...।

খানিকটা হেঁটে কয়েকটা ঝুপড়ি পেরিয়ে গেল দুজনে। তারপর অন্ধকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো বিশাল ঝুপসি গাছ। তার আড়ালে দাঁড়িয়ে থলেতে হাত ঢোকাল রমেশ। সাইলেন্সার লাগানো একটা রিভলভার বের করল।

টাকা?

কোনও উত্তর না দিয়ে জুতোর বাক্সটা রমেশের দিকে এগিয়ে দিলেন নীতিশ। রিভলভারটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। সেফটি ক্যাচ খুলে চেম্বারটা চেক করতে-করতে পকেটে হাত ঢোকালেন। আঙুলে তিনটে গুলির ছোঁয়া টের পেলেন।

রমেশ তখন জুতোর বাক্সের একটা কোনা ছিঁড়ে টাকার বান্ডিলগুলো ছুঁয়ে দেখছে। ওর ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি।

তিনটে গুলি বের করে চেম্বারে ভরে নিলেন নীতিশ। তারপর রমেশের বুকে সাইলেন্সারের নল ঠেকিয়ে গুলি করলেন। পরপর দুবার।

চাপা দুটো ভোঁতা শব্দ হল। রমেশ খসে পড়ে গেল মাটিতে। জুতোর বাক্স আর থলে—দুটোই ওর হাত থেকে পড়ে গেল।

রিভলভারটা ভালো করে জামায় মুছে ওটা প্যান্টের পকেটে ঢোকালেন নীতিশ। পরে সুযোগ-সুবিধে মতো ওটা খালের জলে ফেল দেবেন। সূনীল ধরের বাবার সাধ্যি নেই ওটার আর খোঁজ পায়। এইসঙ্গে চোরাই রিভলভারের গল্পও শেষ।

তিনদিন পর ইন্সপেক্টর এলেন। একদিন ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে। তাই দোকান ছেড়ে নীতিশ কোথাও যাননি।

সুনীল ধরের মুখে শুধু হতাশা। দেখে খুশি হলেন নীতিশ। নিজের গালে দুবার হাত বুলিয়ে নীতিশের চোখে চোখ রাখলেন সুনীল ধর, বললেন, আপনার ভাগ্য ভালো, মিস্টার দত্ত। আমাদের হাতে আর কোনও ক্লু আসেনি। টাকার ব্যাগটা আমরা খুঁজে পাইনি—বোধহয় বৃষ্টিতে ভেসে নদীতে গিয়ে পড়েছে। আর রিভলভার যার কাছ থেকে কেনা হয়েছে সে-লোকটি মারা গেছে।

কিন্তু ভেবে দেখুন তো, মিস্টার দত্ত, যদি ওই লোকটা—মানে, রমেশ পাত্র—মারা না যেত? হয়তো রিভলভারটার খদ্দেরকে আমরা খুঁজে পেতাম, তাই না? না মশাই, আপনি বুড়ো হলে কী হবে, আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে। আমার মতো লোককে আপনি বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যদি খুন দুটো আপনি ধরে থাকেন। সরি, মিস্টার দত্ত, আপনার ওয়াইফের মার্ডারারকে আমি ধরতে পারলাম না। আমাদের হাতে আর কোনও ক্লু নেই—সুতরাং, দিস কেস রিমেইনস আনসলভড—সো লঙ—। ইন্সপেক্টর চলে গেলেন।

নীতিশ দত্তর মুখে ফুটে উঠল ক্রুর, বাঁকা হাসি...।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন ইন্সপেক্টর, বললেন, মিস্টার দত্ত, আমার রুমালটা কি ফেলে গেছি...ওঃ—এই তো!...থ্যাংকু ইউ।

ও, ভালো কথা। একটা ছোট্ট কথা আপনাকে জিগ্যেস করব। আপনি বলেছিলেন, কামিনী দেবীই ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা বের করেছিলেন। তাই তো?

হ্যাঁ—।

আপনি ওই ড্রয়ারটা খোলেননি?

না, না। কতবার বলব। কামিনী ছাড়া কেউ ওই ড্রয়ারে হাতই দিত না।—নীতিশের স্নায়ুতন্ত্রী যেন ছিঁড়ে পড়বে।

০.২২ রিভলভারটা আপনার স্ত্রী-ই বের করেছিলেন, আপনি নয়—এই তো?

ওহ্—ইন্সপেক্টর, প্লিজ বিলিভ মি।—উত্তেজনায় নীতিশের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল।

তা যদি হয়, তবে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।—হাসলেন ধর। ড্রয়ারটায় মাত্র একসেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। সেটা আমরা মিলিয়েও দেখেছি। ব্যাপারটার মাত্র দুটো সমাধান আমাদের সামনে আছে। এক, ওই ড্রয়ারে আপনি ঘটনার দিন হাত দিয়েছিলেন। হয়তো ০.২২টা বেরও করেছিলেন। যা আপনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। আর দু-নম্বর সমাধানটা একটু পিকিউলিয়ার আর ইয়ে....কষ্টকল্পিত। তবে একেবারে অসম্ভব নয়। আপনাকে বলেছিলাম, আই লিভ নো স্টোন আনটার্নড অ্যাবাউট আ মার্ডার...। তাই হঠাৎই এই আশ্চর্য ব্যাপারটা আমার নজরে এল...।

কী—কী?—প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন নীতিশ।

দু-নম্বর সমাধানটা হল, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর আঙুলের ছাপ একেবারে সেম। নয়তো বলুন না, ড্রয়ারের গা থেকে পাওয়া ছাপের সঙ্গে আপনার আঙুলের ছাপ মিলল কেমন করে? অথচ আপনি বারবার বলেছেন, ড্রয়ারে আপনি হাতও দেননি। মিসেস দত্তর সঙ্গে আপনার ছাপ আমি মিলিয়ে পর্যন্ত দেখেছি। দুটোর মধ্যে কোনও মিলই নেই—। সুতরাং কাইন্ডলি আর-একবার ভাবুন না, মিস্টার দত্ত, ড্রয়ারটায় আপনি হাত দিয়েছিলেন কিনা—।—হোলস্টার থেকে ০.৩৮ পুলিশ স্পেশালটা বের করে উঁচিয়ে ধরলেন সুনীল ধর।

যদি খুন বলেন

লোকটাকে আবার একই ভঙ্গিতে দেখা গেল।

রোজ সকালের মতো আজও বেরিয়ে এক বিশাল প্রাসাদের মতো বাড়িটা থেকে। তারপর দরজা বন্ধ করেই রোজকার অভ্যেসে ঘুরে দাঁড়াল, দরজার নবটাকে মোচড় দিয়ে ঠেলে দেখল দরজা ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে কি না।

লোকটার দিকে সরাসরি না তাকিয়েও নরোত্তম বসাক তার প্রতিটি নড়াচড়া অনুভব করতে পারছিলেন। টেলিভিশনের পরদায় কোনও একক অভিনয় খুঁটিয়ে লক্ষ করার মতো সজাগ ছিল ওঁর চোখ।

প্রতিদিন ভোরবেলা নরোত্তম পায়চারি করতে বেরোন। নিতান্ত দুর্যোগ, ঝড়, বৃষ্টি না হলে ওঁর এই দৈনিক অভ্যাসের কোনও হেরফের হয় না। আজও তিনি বেরিয়েছেন সকালের সজীব বাতাসে বুকভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য।

লোকটা এবার সিঁড়ির ধাপ ভেঙে ঝটপট নেমে এল। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা কালো অ্যামবাসাডার। খাকি রঙের উর্দি পরা ড্রাইভার গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। লোকটা উঠে বসতেই সেলাম ঠুকল অনায়াস তৎপরতায়।

কে এই ভদ্রলোক? নরোত্তম বসাক ভাবলেন। তাঁর জমিদারি ঢঙের বাড়ি, কেতাদুরস্ত বেশবাস, গাড়ি, উদ্ধত চলন-আচরণ ইত্যাদি দেখে মনে হয় ভদ্রলোক বেশ ক্ষমতাশালী, কোনও উঁচু পদে আছেন। কখনও-কখনও নরোত্তম ফুটপাথের ওপরে চলার গতি কমিয়ে দেন—নইলে ওই ভদ্রলোক যখন ঝটিতি সিঁড়ি ভেঙে গাড়ির দিকে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যান তখন তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নরোত্তম হয়তো পড়ে যাবেন। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা হবে।

প্রতিদিন ভোরে চলার পথে অন্য যেসব মানুষ নরোত্তম দেখেন তারা প্রত্যেকেই সামান্য হেসে অথবা মাথা নেড়ে ওঁর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে। রোজ দেখা হতে-হতে পরস্পরের মুখগুলো চেনা হয়ে গেছে পরস্পরের কাছে। এই ঠাটবাটওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গেও তেমনি। কিন্তু একমাত্র উনিই কোনওরকম সৌজন্য দেওয়া-নেওয়া করেন না নরোত্তমের সঙ্গে। না, তাতে নরোত্তমের দুঃখ অথবা অভিমান নেই। তিনি ভেবেছেন, ভদ্রলোকের অহংকারই হয়তো এই উপেক্ষার কারণ। অবশ্য তাঁর সঙ্গে ঠিকঠাক আলাপ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, নরোত্তম কানে একেবারেই শুনতে পান না।

সেদিন সকালে নরোত্তম রোজকার পথের সামান্য অদল-বদল করলেন। প্রথমত সকালটার মধ্যে এক অপরূপ মুগ্ধতা ছিল। তার ওপরে আনচান করা বাতাস আর পুবের আকাশে সিঁদুর রঙের সদ্য-ওঠা সূর্য। খুশি ও উৎফুল্লতায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন

নরোত্তম। ফুটপাথ ছেড়ে কাঁচা পথে নেমে পড়লেন। সবুজ ঘাস, ঝোপ ইত্যাদি পেরিয়ে আনমনা হেঁটে চললেন। লুকিয়ে কোথাও শিস দিচ্ছিল একটা বাগিচা বুলবুল। বসাকের বৃদ্ধ পা দুটো ওঁকে যেদিকে খুশি নিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে বহু রাস্তার কাটাকুটি পেরিয়ে, মাঠঘাটের সৌন্দর্যের তারিফ করতে-করতে নরোত্তম কখন যে গাছ-গাছালির জঙ্গলে ঢুকে পড়েছেন সেটা খেয়ালই করেননি।

শরতের এই সকাল মনে ক্রমাগত খুশি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। শাল, দেবদারুর পাতায় ঠিকরে পড়ছে সকালের পবিত্র রশ্মি। এ ছাড়াও নানান ফুল-ফলের গাছ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। একটা গাছে ফলন্ত পেয়ারা দেখতে পেলেন বসাক। দেখে খিদে পেল। সবুজ কচি পেয়ারাপাতাগুলো রোদে ঝলমল করছে। অদ্ভুত আকর্ষণে গাছটার কাছে এগিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে একটা পেয়ারা ছিঁড়ে নিয়ে কামড় বসালেন। সজীব ফলের স্বাদ খিদে আরও বাড়িয়ে দিল। উপোসি মানুষের মতো পেয়ারাটি শেষ করে ফেললেন। বাড়ি থেকে যে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়েছেন সে-কথা যেন ভুলেই গেলেন। একইসঙ্গে ওঁর বয়েস কমে যেতে লাগল দ্রুতগতিতে।

নরোত্তমের মনে হল পলকে বিশ বছরের ছোকরা হয়ে তিনি এক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন। অথচ আসলে তিনি বাহাত্তুরে বুড়ো, রোজকার মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে আনন্দে পথ ভুলে প্রকৃতির কোলে হারিয়ে গেছেন। নরোত্তম থমকে দাঁড়ালেন। না, ক্লান্তিতে নয়, বিস্ময় ও খুশিতে। চারপাশে তাকিয়ে সকালের রোদে গাছগাছালির চকচকে রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। মনে-মনে শরৎ ও বসন্তকালের মধ্যে তুলনাও করতে শুরু করলেন। ওঁর পায়ের তলায় একটা শুকনো ডাল শব্দ করে ভেঙে গেল। নানান পাখির কিচিরমিচির, কাঠবেড়ালির চপল ছুটোছুটি, গাছের পাতায় ছমছম শব্দ, সব কিছুই ঘটে যাচ্ছিল চারপাশে, কিন্তু নরোত্তম কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না। বয়েস বেড়ে চলার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর শ্রবণ ক্ষমতা কমে এসেছে ধীর অথচ অনিবার্য গতিতে। অবশেষে গত বছরে ওঁর কান পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছে। ফলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলো—চোখ, ত্বক, নাক ইত্যাদি ক্রমে-ক্রমে অনেক বেশি বিচক্ষণ ও ধারালো হয়ে উঠেছে। এখন সেই অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলোই সৌন্দর্যের অমৃত ওঁর হৃদয়ের গভীরে একটু-একটু করে পৌঁছে দিচ্ছিল।

নরোত্তম ভাবছিলেন, তিনি লোকালয় থেকে বহু দূরে চলে এসেছেন, জন-মানুষও নেই কাছাকাছি। কিন্তু আর-কয়েক পা এগোতেই অবাক হয়ে গেলেন। কিছুটা দূরে এক বিশাল পাঁচিল, এবং পাঁচিলের মাথায় দু-ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। অর্থাৎ, ঠাট্টা-রসিকতার ব্যাপার নয়, সত্যি-সত্যিই কেউ তার এলাকাটাকে নিরাপদে রাখতে চাইছে। না, এত সর্তকতার পর 'প্রবেশ নিষেধ' সাইনবোর্ডটা লাগানোর দরকার পড়ে না, এবং সেটা লাগানোও নেই পাঁচিলের কোথাও। নরোত্তম বসাক পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, বর্ষা অথবা গ্রীষ্মের সময় পাঁচিলটা এখান থেকে নজরে পড়ার কথা নয়। কারণ, পাঁচিলের যে-অংশটুকু দেখা যাচ্ছে গাছ-গাছালির পাতা-ডালপালার ঝাঁক তা নিশ্চয়ই পরিপাটি করে ঢেকে দেবে।

চোখের নজর সামান্য উঁচু করতেই পাঁচিল পেরিয়ে একটা বিশাল অট্টালিকার পিছনদিক দেখা গেল। বাড়িটা এমন নির্জন পাঁচিল ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে, জানলা-দরজায় পরদা টাঙানোর প্রয়োজন বোধ করেননি বাড়ি মালিক। সূর্যের সতেজ আলো ঠিকরে পড়ছে বাড়িটার গা থেকে। এবং সে-আলো ঢুকে পড়েছে প্রতিটি ঘরে। বিশেষ করে দোতলার তিনটে জানলা তো হলদে আলোয় একেবারে ঝলমল করছে। ফলে মাঝের জানলায় দাঁড়ানো পুরুষ ও মহিলাটিকে নরোত্তমের বেশ স্পষ্টই নজরে পড়েছে।

মানুষ দুজন নরোত্তম বসাককে দেখতে পায়নি। ওরা যেন কোনও নির্বাক চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী, আর তার একমাত্র মুগ্ধ দর্শক নরোত্তম। না, নরোত্তম বসাক এ দুজন মানব-মানবীর গোপনতায় নির্লজ্জভাবে হানা দিতে চাননি। বরং তিনি কিছুটা ভয় পেলেন। কারণ, জানলার ফ্রেমে বাঁধানো দৃশ্যটা অপ্রত্যাশিত।

পুরুষটি মহিলাকে খুন করছে। তার সবল হাত দুটো ধাপে-ধাপে শক্তিশালী হয়ে মহিলার নরম গলায় চেপে বসছে।

নরোত্তম বসাক ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ে মারলেন বাড়িটার দিকে। কিন্তু সেটা জানলা তো দূরের কথা, বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছল না। তখন উত্তেজিত হয়ে পাঁচিলের কাছে ছুটে গেলেন। বৃদ্ধ শরীরে চেষ্টা করলেন পাঁচিল বেয়ে উঠতে। কিন্তু পাঁচিলের রুক্ষ গায়ে আঁচড়ানোই সার হল। হাত ছড়েও গেল কয়েক জায়গায়।

কোথায়—পাঁচিলের গায়ে দরজাটা কোথায়?

এবারে সেটার খোঁজে পাঁচিল বরাবর ছুটতে শুরু করলেন নরোত্তম। কিন্তু পাঁচিলটা যেন আর শেষ হতে চায় না। ক্রমে নরোত্তম হাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন, ওঁকে ঘিরে জঙ্গল গাঢ় হতে লাগল। বাড়িটা যেন হারিয়ে যেতে লাগল দূর থেকে দূরে। ক্লান্ত শ্রান্ত নরোত্তম পথহারা হয়ে গেলেন। ছোটবেলায় অচেনা পথে ঘুরে পথ হারিয়ে ফেললে যেরকম ভয় পেতেন এখনও সেরকম একটা ভয় ওঁকে গ্রাস করতে লাগল।

ঝোপঝাড় ঠেলে পথ করে নিয়ে নরোত্তম এগোতে লাগলেন। ওঁর পাঞ্জাবি-পাজামা ডালপালার খোঁচা খেয়ে ছিঁড়ে গেল। উদভ্রান্ত অবস্থায় ওঁর চোখদুটো শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে পথের ইশারা। বাঁ-পকেটে হাত দিয়ে সর্বক্ষণের সঙ্গী নোটবই ও একজোড়া পেনসিল অনুভব করলেন। যদি কোনও মানুষজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা হলে তারা হয়তো ওঁর বাড়ি ফেরার পথের হদিস লিখে দিতে পারবে।

পথ হারানোর আতঙ্কে তিনি ভুলেই গেলেন একটু আগে কোন দৃশ্য ওঁর চোখে ধরা পড়েছে। একইসঙ্গে উজ্জ্বল প্রকৃতির রূপসজ্জা ওঁর নজর আর অনুভূতির আড়ালে চলে গেছে। শুধু পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাটাই যেন শরীর-মন ছেয়ে আছে।

ইস, যদি নরোত্তম শুনতে পেতেন তা হলে এই গাছপালার জঙ্গল ভেদ করে ওঁর কানে হয়তো পৌঁছে যেত হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলা গাড়ির গর্জন। কিংবা হয়তো কানে আসত কোনও দেহাতি মানুষ বা কাঠুরের কণ্ঠস্বর। যখন শোনার ক্ষমতা ছিল তখন কখনও ভাবেননি কান এতই দামি।

নিজেকে ধীরে-ধীরে সুস্থির করলেন। ভয়টা অল্প-অল্প করে কমতে লাগল। সূর্যের দিকে নজর রেখে দিকনির্ণয় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে বহু পরিশ্রমের পর এসে পৌঁছলেন বড় রাস্তায়। ট্রাক, লরি, প্রাইভেট কার শোঁ-শোঁ শব্দে ছুটে যাচ্ছে। দু-একটা ছুটন্ত গাড়ি হাতের ইশারায় থামাতে চাইলেন। কিন্তু এক বৃদ্ধের প্রত্যাশাকে অপমান করে গাড়িগুলো একটুও গতি না কমিয়ে ছুটে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটা বাস দেখা গেল। বসাক হাত তুলে ইশারা করতে স্টপেজ না হওয়া সত্ত্বেও থামল বাসটা। প্রায় ছুটে গিয়ে বাসে উঠলেন। পকেট থেকে পয়সা বের করে কন্ডাক্টরকে ভাড়া দেওয়ার সময় লক্ষ করলেন ওঁর শীর্ণ হাতের আরও শীর্ণ আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। একটু আগে শরতের রমণীয় সকালে যে-ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছেন এ হয়তো তারই ফলাফল।

নিজের সঙ্গে ওঁর বিতর্ক শুরু হল। সত্যিই কি তিনি একটা খুন হতে দেখেছেন? ক্ষণিকের সংশয় ও দ্বিধা ঠেলে সরিয়ে নরোত্তম সিদ্ধান্তে এলেন, হ্যাঁ, খুনের দৃশ্যই দেখেছেন তিনি। লোকটা যে মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে গলা টিপে খুন করছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মানুষের দেহই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্যালে। কথার চেয়েও শরীরের আচরণ অনেক বেশি করে গোপন মতলবের কথা ঘোষণা করে। অর্থাৎ, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। কানে কালা হওয়ার পর থেকেই এই তথ্যটি নরোত্তম আবিষ্কার করেছেন। যতদিন কানে শোনার ক্ষমতা ছিল ততদিন তিনি শুধু মানুষজনের মুখের কথাই শুনেছেন—তাদের শরীরের নড়াচড়া হাবভাব তেমন খুঁটিয়ে লক্ষ করেননি। শ্রবণক্ষমতা হঠাৎ কমে যাওয়ার পরদিন থেকেই তিনি পর্যবেক্ষণে মন দিয়েছেন। তারপর যত দিন গেছে শ্রবণক্ষমতা আরও কমেছে, তবে একই হারে ধারালো হয়েছে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। নরোত্তম এখন জানেন, ঢিলেঢালা শরীর আর মাথা একপাশে ফেরানো থাকলে সেই মানুষ যতই আগ্রহ নিয়ে কথা বলুক না কেন, আসলে তার কোনও মনোযোগ নেই। মাথা যদি সামনে ঈষৎ ঝুঁকে থাকে, দেহ যদি সামান্য হেলে থাকে, তা হলে তার অর্থ আগ্রহ এবং কৌতূহল। আর আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণের অর্থ নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না!

উচ্চারণ করা শব্দ অনেক সময় মিথ্যে কথা বলতে পারে, কিন্তু শরীর সবসময় সত্যি কথা বলে। হাতের আঙুল থাবার নখের মতো রাগে বেঁকে যায়। নরম ভঙ্গিতে একটা খোলা হাত যখন এগিয়ে আসে তখন সে ভালোবাসা বিনিময় করে। ঝুঁকে পড়া কাঁধ, ঝোঁকানো মাথার অর্থ ব্যর্থতা, হতাশা। শরীর হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যা কোনও মানুষের সত্যিকারের মনোভাব উদ্দেশ্য ইত্যাদি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—তা সে মুখে যা-ই বলুক না কেন।

কান দুটো পুরোপুরি অকেজো হয়ে না পড়লে এসব খুঁটিনাটি লক্ষ করতেন না নরোত্তম। কানের ক্ষমতা নেই বলে এবং মানুষের কথাবার্তায় কোনও প্রতিক্রিয়া আর হয় না। সুতরাং নিতান্ত বাধ্য হয়েই পর্যবেক্ষণ চর্চায় মন দিয়েছেন। ওঁর এই নতুন গুণের খবর অনেকেই জানেন না—জানতে পারেননি। এইসব তথ্যের কথা হয়তো কোনওদিনই জানতে পারতেন না। হয়তো সারা জীবনটাই ওঁর এভাবে কেটে যেত—কিন্তু যায়নি। কানে কালা হওয়ার বিনিময়ে কে-ইবা এই নতুন বিদ্যা অর্জন করতে চায়! নিছক নিয়তি নরোত্তম বসাককে এই জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিয়েছে।

বাড়ি ফিরে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। সকালে বেরোনোর পর থেকে একের পর এক অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। ঘরের মধ্যে ছটফটেভাবে পায়চারি করতে শুরু করলেন। এই নিরিবিলি বাগানবাড়িতে তিনি একা থাকেন—সঙ্গী শুধু একটা কাজের লোক। প্রতি বছর শহর ছেড়ে এখানে বসবাস করার জন্য চলে আসেন নরোত্তম। থাকেন প্রায় চার-পাঁচ মাস। ছেলেমেয়েকে নিখুঁত সংসারী করে দিয়ে বিপত্নীক নরোত্তম বলতে গেলে একরকম বানপ্রস্থ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু এই নিরুত্তাপ শান্তিময় জীবনে হঠাৎ এক উপদ্রব এসে হাজির হল আজ।

কী করা যায় সেটাই ভাবতে লাগলেন। মেয়েটির খবর কি এর মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে? আগামীকালের কাগজ খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মরণাপন্ন মেয়েটিকে কোনওরকম সাহায্য করতে না পারায় মনে-মনে ভীষণ মুষড়ে পড়লেন নরোত্তম। ওঁর চোখের সামনে ঘটে গেল ঘটনাটা, অথচ তিনি নিরুপায় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন শুধু!

তখুনি তাঁর পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঘটনাটা যে-বাড়িতে ঘটেছে তার হদিস যে ওঁর অজানা। পুলিশকে সেখানে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়া নরোত্তমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেশ ক'বছর ধরে এখানে এসে থাকছেন বটে, কিন্তু এই অঞ্চলের পথঘাট সবই ওঁর প্রায় অচেনা। নিত্যনৈমিত্তিক ছক বাঁধা পথটুকু ছাড়া আর কিছুই তেমন করে চেনা নেই।

সুতরাং, তখুনি পুলিশের কাছে না গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই হয়েছে। ওরা ওঁকে ভীমরতিগ্রস্ত এক বুড়ো ঠাউরে বসত। এ অঞ্চলের সব ক'টা বাগান-বাড়ির দরজায়-দরজায় ঘুরে তো আর লাশের সন্ধান করতে পারে না পুলিশ! বলতে পারে না, আপনার বাড়ির দোতলার পিছনদিকের একটা ঘরে আজ ভোরবেলায় হয়তো একটা খুন হয়েছে। আমরা সে-বিষয়ে খোঁজখবর করতে এসেছি।

তার চেয়ে অপেক্ষা করাই ভালো। কাল সকালে খবরের কাগজ দেখে তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

সে-রাতে নরোত্তমের চোখে ঘুম এল না।

পরদিন একটু বেলার দিকে বাজারে রওনা হলেন তিনি। খবরের কাগজ সেখানেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া কখনও খবরের কাগজ দেখেন না নরোত্তম। এখানে অবসর কাটাতে এসে দুনিয়ার খবরে ওঁর কোনও প্রয়োজন বা আগ্রহ নেই। কিন্তু আজকের কথা আলাদা।

কাগজওয়ালার কাছে সবরকম দৈনিক কাগজ সাজানো। ন'টা দশের ট্রেনে সব কাগজ পৌঁছয় এখানে। ঝুঁকে পড়ে নিজের প্রিয় কাগজটা তুলে নিলেন। কাগজওয়ালা কিছুটা বিরক্ত হচ্ছিল। নরোত্তম তার নিয়মিত খদ্দের নন। হয়তো বিনিপয়সায় চট করে কাগজের হেডলাইনগুলো পড়ে নিতে চাইছেন। অনেকেই এরকম করে। কিন্তু সে আপত্তি বা প্রতিবাদ করার আগেই মাঝারি মাপের হেডিংটি নজরে পড়ে গেছে নরোত্তমের মহিলা খুন।

নরোত্তম তা হলে সত্যিই নিজের চোখে খুনের দৃশ্যটা দেখেছিলেন।

পকেট থেকে পয়সা বের করে কাগজের দাম মিটিয়ে দিলেন তিনি। কাগজওয়ালা একটু অবাক হয়েই দামটা নিল। নরোত্তম সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। কাগজটা ভাঁজ করে বগলদাবা করে দ্রুতপায়ে হাঁটা দিলেন বাড়ির দিকে। খুনের খবরটা খুঁটিয়ে পড়ার জন্য যেন আর তর সইছে না। চলতে-চলতেই ওঁর চোখ এপাশ-ওপাশ খুঁজতে লাগল। যদি কোনও যুতসই জায়গা পাওয়া যায়, তা হলে বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হয় না। খবরটা আগেভাগেই পড়ে ফেলা যায়। এমনি করেই ওঁর অনুসন্ধানী নজরে একটা চায়ের দোকান ধরা পড়ল। সুতরাং আর একমুহূর্তও দেরি নয়। নরোত্তম সটান গিয়ে ঢুকে পড়লেন দোকানে। চাটাইয়ের দেওয়াল ঘেঁষে একটা ময়লা বেঞ্চি বেছে নিয়ে বসলেন। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজটা অতি সন্তর্পণে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

বত্রিশ বছর বয়েসি শ্রীমতী অলকানন্দা রায়কে গতকাল ওঁর শোওয়ার ঘরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি মৃতদেহ আবিষ্কার করে। শোওয়ার ঘরের অবস্থা ছত্রখান ছিল বটে তবে কিছু খোয়া গেছে বলে এ পর্যন্ত জানা যায়নি। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি। মৃতার স্বামী প্রখ্যাত ব্যাবসায়ী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়কে ওঁর অফিসে দুঃসংবাদটি জানানো হয়। খবরটা শোনামাত্রই তিনি

শোকে ভেঙে পড়েন। বাড়িতে শ্রীমতী রায় একাই ছিলেন। সকাল সাড়ে ছ'টায় তাঁর স্বামী কাজে বেরিয়ে যান। তারপর লেখা রয়েছে শ্রীমতী রায়ের পরিকল্পনায় তৈরি বিভিন্ন সমিতির কথা, তাঁর দান-ধ্যানের কথা। বোঝা গেল, শ্রীমতী রায় এ-অঞ্চলে বেশ সুখ্যাত মহিলা ছিলেন।

নরোত্তম ভাবতে লাগলেন, এখন কী করা যায়। বয় চা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা টেবিলের ওপরে জুড়িয়ে যাচ্ছিল। ওঁর সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না। শুধু শূন্য দৃষ্টিতে হাতের খবরের কাগজের দিকে তাকিয়েছিলেন।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত ঘটনাগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার ভাবতে লাগলেন নরোত্তম। যেন একই ফিলম বারবার দেখছেন। অবশেষে ওঁর মনে হল, এই মুহূর্তে ওঁর পুলিশে যাওয়া উচিত। উচিত পুলিশকে সব খুলে বলা, যাতে তারা অনুসন্ধান করে মিসেস রায়ের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারে।

মনকে বেশি বোঝাতে হল না। নরোত্তম বসাক সঙ্গে-সঙ্গেই রওনা হলেন থানার দিকে। সামনে যে-সেপাইটিকে পেলেন তাকে বললেন, যে, মিসেস রায়ের খুনের ব্যাপারে তিনি একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে চান। আরও জানালেন যে, তিনি কানে শুনতে পান না, এবং একইসঙ্গে প্যাড ও পেনসিল এগিয়ে দিলেন লোকটির দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেপাইটির কথা বলা বন্ধ করা গেল না। তার ঠোঁট সমানে নড়তে লাগল, এবং নরোত্তম তার কথা একটিও বুঝতে পারলেন না বটে, কিন্তু লোকটির অঙ্গভঙ্গি নড়াচড়া সব বলে দিল। সেপাইটি হাত উঁচিয়ে তালু দেখাল নরোত্তমকে—অর্থাৎ, ওঁকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সে উঠে ভেতরে গেল। মিনিটটাক পরে একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। নতুন ভদ্রলোকের ইশারা খুব সহজেই বোধগম্য হল নরোত্তমের—ওঁকে পাশের একটি ঘরে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন অফিসার।

নতুন ভদ্রলোক মনোযোগের সঙ্গে নরোত্তম বসাকের সব কথা শুনলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে কতকগুলো টুকরো কাগজে দ্রুত হাতে কীসব লিখতে লাগলেন। লেখা হয়ে গেলে কাগজগুলো তিনি এগিয়ে দিলেন নরোত্তম বসাকের দিকে। নরোত্তম সেগুলোতে একটার-পর-একটা নজর বোলাতে লাগলেন—যেন পরীক্ষার খাতা দেখছেন। আসলে কাগজগুলো প্রশ্নমালা।

'সেই লোকটিকে যখন আপনি মহিলাটির ওপরে ঝুঁকে থাকতে দেখেন তখন ক'টা বাজে মনে আছে?'

'না, মনে নেই। আমার হাতের ঘড়ি ছিল না। তা ছাড়া পথ হারিয়ে কতক্ষণ যে এদিক-ওদিক ঘুরেছি বলতে পারি না।'

'লোকটাকে মুখ দেখতে পেয়েছিলেন আপনি?'

'না।' নরোত্তম জবাব দিলেন, 'তার পিঠটা ফেরানো ছিল আমার দিকে।'

'লোকটার আবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নরোত্তম বসাক। তারপর মৃদু গলায় বলতে লাগলেন, 'লোকটার ভঙ্গিটাই শুধু আমার মনে আছে। ঠিক কাউকে খুন করার ভঙ্গি—কোন খুনির ভঙ্গি। নৃশংস। ভয়ানক। তার মাথায় কয়েকটা পাকা চুলও ছিল। সেগুলো সূর্যের আলোয়

রূপোর তারের মতো চিকচিক করছিল। গায়ে ছিল একটা সাদা জামা—ফুলশার্ট। আর ডানহাতে ছিল একটা সোনার আংটি। সেটা আলো পড়ে ঝিলিক মারছিল।'

পুলিশ অফিসার হতাশা ও ব্যর্থতায় এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। নাঃ, নরোত্তম দরকারি কোনও সূত্র দিতে পারেননি।

নরোত্তম বললেন, 'লোকটার ভঙ্গি দেখেই আমি সব বুঝে গেছি। কানে শোনার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি শুধু সবার নড়াচড়া অঙ্গভঙ্গি খুঁটিয়ে দেখি। ওগুলো দেখে আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। লোকটার শরীর যেভাবে ঝুঁকে ছিল, তাতে সে-ই যে মিসেস রায়ের মার্ডারার এ আমি হলফ করে বলতে পারি।'

অফিসার আবার মাথা নাড়লেন। তারপর কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে একটা কাগজে লিখে নরোত্তমকে ধন্যবাদ জানালেন, নাম ও পুরো ঠিকানা রেখে যেতে অনুরোধ করলেন, প্রয়োজনে পুলিশ যে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে এ-কথাও জানালেন।

নরোত্তম ওঠার আগে অফিসারের নাম জানতে চাইলেন। তখন অফিসার একটু আগে লেখা একটা কাগজ টেনে নিয়ে তারই এক কোনায় লিখে দিলেন: গোবিন্দ সমাজপতি।

নরোত্তম বসাক আপন মনেই বারকয়েক মাথা নেড়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। নিজেকে এখন বেশ হালকা লাগছিল।

পরপর কয়েকদিন নিয়ম করে খবরের কাগজ কিনলেন নরোত্তম। না, মিসেস রায়ের খুনের বিষয়ে আর কোনও নতুন খবর বেরোয়নি। তা হলে এই খুনটাও পুলিশ-দপ্তরে 'আনসলভড' ফাইলে জায়গা নেবে! নরোত্তম মনে-মনে ভীষণ আপশোস করছিলেন। ওঁর চোখের সামনে গোটা দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না। এমনকী পুলিশকে যেসব খবর তিনি দিলেন তা থেকেও কোনও সূত্র পেল না ওরা। খবরের কাগজে যখন পুলিশি তদন্তের উল্লেখ নেই তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, পুলিশ আশা জাগানোর মতো কোনও সূত্র পায়নি।

রোজই ভোরবেলা ছক বাঁধা পথে পায়চারি করতে-করতে নরোত্তম জানলার ফ্রেমে আঁটা দৃশ্যটার কথা ভাবেন। আর ভাবেন আজই হয়তো গোবিন্দ সমাজপতি নতুন কোনও সূত্র খোঁজার আশায় ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু কার্যত যখন তা ঘটে না, তখন ভাবেন সমাজপতি হয়তো ওঁর কথাগুলোকে ভীমরতি ধরা বাহাত্তুরে বুড়োর কচকচি ভেবে উড়িয়ে দিয়েছে। কিংবা রোজই হয়তো থানায় এ জাতীয় কিছু উলটোপালটা সাক্ষী গিয়ে হাজির হয়। সুতরাং, গোবিন্দ সমাজপতিকে দোষ দেওয়া যায় না। দরকার পড়লে তিনি নিশ্চয়ই নরোত্তম বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

কেমন যেন অদ্ভুতভাবেই মিসেস রায়কে খুব আপনার জন বলে ভাবতে শুরু করলেন নরোত্তম। একইসঙ্গে ওঁর মনে হতে লাগল, অলকানন্দা রায়ের অকালমৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। ইস, খুনটা তিনি রুখতে পারলেন না। ওঁর জায়গায় জোয়ান কোনও সুস্থ মানুষ হলে নিশ্চয়ই সেটা আটকাতে পারত। মিসেস রায়কে চেনেন না নরোত্তম, কোনওদিন দেখেনওনি। কিন্তু যখন দেখলেন, তখন ওঁর অন্তিম মুহূর্ত। শ্বাসরোধ করে ওঁর জীবনীশক্তিকে তখন তিলে-তিলে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। মিসেস রায়ের আত্মীয়স্বজনের

সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে কিছুটা শান্তি পেতেন নরোত্তম। কিন্তু কার কথাই বা উনি জানেন, একমাত্র ওঁর স্বামী জিতেন্দ্রনাথ রায় ছাড়া। কাগজেই ওঁর স্বামীর নামটা নরোত্তম পড়েছেন। তা ছাড়া এ-অঞ্চলে ওঁর প্রতিপত্তির কথাও শুনেছেন লোকমুখে। সুতরাং জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য নরোত্তম বসাকের মনটা আকুল হয়ে উঠল।

ঠিক দশদিন পরে জিতেন্দ্রনাথ রায়ের আধুনিক ঢঙে তৈরি ঝকঝকে অফিসে নরোত্তম বসাককে দেখা গেল।

পুরু কার্পেটে গোড়ালি ডুবে যাচ্ছে, এয়ার কন্ডিশনারের মিহি গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। মনেই হয় না কোনও আধা-শহরের অফিসবাড়ি। একটা টেবিলের ওপরে সুদৃশ্য টবে সাজানো রজনীগন্ধা ও গোলাপগুচ্ছ। টেবিলের ওপিঠে বসে আছে এক সুন্দরী যুবতী। তার রংচঙে প্রসাধন দেখে মনে হয় কোনও নাটক কিংবা সিনেমায় অভিনয় করার জন্য সে এক পায়ে খাড়া।

নরোত্তম বসাক মেয়েটিকে নিজের নাম বললেন। তারপর জানালেন তিনি জিতেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

উত্তরে মেয়েটি কী যেন বলল। তখন নরোত্তম বাধ্য হয়ে বললেন যে, তিনি কানে শুনতে পান না। কথাগুলো যদি ও কাগজে লিখে ওঁকে জানায় তা হলে ভালো হয়। মেয়েটি নরোত্তমের সাদা প্যাডের দিকে হাত না বাড়িয়ে নিজের ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কাগজ বের করল। তারপর লিখল 'মিস্টার রায় কারও সঙ্গে দেখা করছেন না।'

'কিন্তু আমাকে যে দেখা করতেই হবে। ভীষণ জরুরি!' নরোত্তম একান্ত আগ্রহের ঢঙে বললেন।

'কেন?' মেয়েটি লিখল।

প্রশ্নটা ছোটই। তবে সেটা লেখা হয়েছে খবরের কাগজের হেডিংয়ের হরফে, আর তাতে দু-দুবার গাঢ় দাগ টেনে আন্ডারলাইন করা হয়েছে।

'দয়া করে ওঁকে বলুন আমি ওঁর স্ত্রীর খুনের ব্যাপারে কয়েকটা জরুরি কথা জানাতে চাই। খুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস করুন।'

'তা হলে পুলিশে যান,' মেয়েটি আবার লিখল, 'মিস্টার রায় স্ত্রীর শোকে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। কারও সঙ্গেই দেখা করছেন না।'

নরোত্তম বসাক বললেন, 'ওনাকে একবার আমার কথা বলুন। উনি নিশ্চয়ই দেখা করবেন।'

'মিস্টার রায় এখন অফিসে নেই,' অধৈর্য ঢঙে মেয়েটি লিখল। কিন্তু লেখা কাগজটা সে এমনভাবে বসাকের দিকে এগিয়ে ধরল যে, তাতে ওর অধৈর্য ভাবটা পাঁচগুণ বেশি প্রকাশ পেল।

'ঠিক আছে। আমি তা হলে ওঁর জন্যে অপেক্ষাই করছি।' কথাটা বলে নরোত্তম কাঠের প্যানেল দেওয়া দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। কালো চামড়ায় মোড়া একটা নরম সোফায় গা ঢেলে দিলেন। সোফায় বসতেই ওঁর শরীরটা যেন ডুবে যেতে লাগল। নরোত্তম লক্ষ করলেন, মেয়েটি ওঁর দিকে কঠিন চোখে চেয়ে আছে। পরক্ষণেই সে হাতের ইশারায়

অফিসের সদর দরজাটা দেখাতে লাগল অর্থাৎ; আপনি চলে যান। কিন্তু নরোত্তম সে-ইশারা স্রেফ না দেখার ভান করে নির্বিকারভাবে বসে রইলেন। মেয়েটি তীক্ষ্ন রুক্ষ চোখে অনেকক্ষণ ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু বসাক সে দৃষ্টি গ্রাহ্যই করলেন না—অন্তত গ্রাহ্য না করার ভান করলেন। অবশেষে মেয়েটি বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে সামনে রাখা টাইপমেশিনে মনোযোগ দিল।

বসে-বসে উথালপাথাল ভাবতে লাগলেন নরোত্তম। সত্যি-সত্যি তিনি কি দেখা করতে চেয়েছিলেন জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে? কোনও সুস্থ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ওঁর পক্ষে রীতিমতো অস্বস্তিকর। অন্তত ওঁর পক্ষে না হলেও সুস্থ মানুষটির পক্ষে তো বটেই কারণ, নরোত্তম বসাকের কথা তাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয় এবং উত্তর দেওয়ার সময় তাদের কষ্ট করে লিখে জানাতে হয় কথাগুলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওঁর হঠাৎই মনে হল, মিস্টার রায় হয়তো ভালো করেই জানেন ওঁর স্ত্রীকে কে হত্যা করেছে। স্বামী অফিসে বেরোনোর পর থেকে সারাটা দিন মিসেস রায় একাই কাটাতেন। হয়তো সেই ফাঁকে ওঁর কোনও ভালোবাসার মানুষ জুটে গিয়েছিল। প্রায়ই সে হয়তো মিসেস রায়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসত। দিনে-দিনে সে হয়তো জিতেন্দ্রনাথের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ছিল। অলকানন্দাকে সে আর কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাইছিল না। পরিণতিতে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে ঘটে গেছে ক্রোধ ও উত্তেজনার বিস্ফোরণ। মিসেস রায় নিহত হয়েছেন। সুতরাং নরোত্তম এখন ভালোমন্দ যা-ই বলুন না কেন, তাতে মিস্টার রায়ের দুঃখ শুধু বেড়েই যাবে—কমবে না। পুলিশি তদন্তে শুধু কলঙ্ক-কথা প্রকাশিত হবে।

অতএব জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসার কোনও মানেই হয় না, নরোত্তম মনে-মনে ভাবলেন। এখুনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

নরোত্তম উঠে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, মেয়েটিকে কি বলা উচিত যে, তিনি মিস্টার রায়ের সঙ্গে আর দেখা করতে চান না? নাঃ, বরং চুপচাপ অফিস ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো—হয়তো মেয়েটির নজরই পড়বে না এদিকে।

কিন্তু নরোত্তম ইতস্তত করে দরজার দিকে পা বাড়াতেই জনৈক বিশাল চেহারার পুরুষ দরজায় হাজির হলেন। বলিষ্ঠ দ্রুত পা ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন রিসেপশনিস্ট যুবতীর দিকে। মেয়েটি একগোছা চিঠিপত্র ওঁর হাতে দিল। তারপর ভদ্রলোক একইরকম ব্যস্ততায় একটা পালিশ করা কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে চললেন। দরজার ওপরে পেতলের ফলকে লেখা জিতেন্দ্রনাথ রায়।

মেয়েটি হঠাৎ একটুকরো কাগজ হাতে তড়িঘড়ি এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। কাগজটায় একপলক নজর বুলিয়েই দুজনে চোখ ফিরিয়ে তাকাল বিব্রত নরোত্তম বসাকের দিকে। নরোত্তমের পায়ের নীচে নরম কার্পেট যেন তলিয়ে যেতে লাগল, বেরোনোর দরজাটা যেন মুহূর্তে সরে গেল বহু-বহু দূরে। তবুও বেশ কষ্ট করে নরোত্তম মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুললেন, পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললেন দরজার দিকে। তারপর একসময় দরজার বাইরে।

রাস্তায় পা দিয়ে নরোত্তমের হঠাৎই খেয়াল হল একটু আগে দেখা পুরুষটির মাথায় কয়েকটা রুপোলি চুল চিকচিক করছিল, আর তার ডানহাতের আঙুলে একটা বড় সোনার আংটি।

ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন নরোত্তম। আবহাওয়া আজ ভীষণ সুন্দর, কিন্তু সেসব ওঁর নজরেই পড়ল না। ভীষণ পরিশ্রান্ত ক্লান্ত লাগছিল। চলার পথে একটা ছোট

পার্কে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। ভাবতে লাগলেন নিজের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা। কী দরকার ছিল মিস্টার রায়ের অফিসে যাওয়ার! কী দরকার ছিল জঙ্গলে পথ হারিয়ে খুনের দৃশ্যটা দেখে ফেলার? নিজের ওপরে ধিক্কার ও বিরক্তি এল নরোত্তমের।

নিজের বোকামির কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ির কাছে পৌঁছলেন এবং পৌঁছেই অবাক হলেন।

একটা কালো অ্যামবাসাডার ওঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

নরোত্তম যে-জায়গায় বাস করেন সেটা এ-অঞ্চলের খুব বিলাসী এলাকা নয়। এদিকটায় তেমন একটা গাড়ি চোখে পড়ে না। সুতরাং, এই মুহূর্তে, ওঁর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকাটা নিতান্ত অবাক করে দেওয়া ঘটনা।

পরমুহূর্তেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে যে-লোকটি প্রায় ছুটে এল নরোত্তম বসাকের দিকে তাকে দেখে আরও শতগুণ অবাক হলেন নরোত্তম।

অঙ্গভঙ্গিশাস্ত্রে নরোত্তমের পারদর্শিতা ওঁকে জানিয়ে দিল, আগন্তুক এত উত্তেজিত যে হয়তো ওঁকে আক্রমণ করে বসতে পারে। লোকটা চিৎকার করে কথা বলছে—কারণ, তার ঠোঁট নড়ছে সেই ভঙ্গিতে, একইসঙ্গে সে ক্ষিপ্তভাবে হাত-পা ছুড়ছে।

বসাক লোকটিকে চেনেন।

প্রতিদিন সকালে পায়চারি করতে বেরিয়ে এই লোকটিকেই তিনি ব্যস্তভাবে দরজায় তালা দিয়ে কালো অ্যামবাসাডারে উঠে বসতে দেখেন।

আমি আপনাকে চিনি। রোজই দেখি। কিন্তু কোনওদিন ভাবিনি আপনি আমার বাড়িতে আসবেন। মনে-মনে এই কথাগুলো বলতে চাইলেন নরোত্তম।

মুখে একটাও শব্দও উচ্চারণ করেননি নরোত্তম। শুধু নিজেকে সতর্ক করলেন, এখন না বোকার মতো কোনও কথা বলে বসেন। বিভ্রান্তের মতো এলোমেলোভাবে পকেট হাতড়ে প্যাড ও পেনসিল বের করলেন। সে-দুটো বাড়িয়ে ধরলেন আগন্তুকের দিকে।

আমতা-আমতা করে সংকোচের সুরে বললেন নরোত্তম, 'ইয়ে...মানে আমি কানে শুনতে পাই না। আপনি কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার নাম নরোত্তম বসাক। আপনি কি আমাকেই খুঁজছেন? মানে, মনে হচ্ছে কিছু একটা বিপদে পড়েছেন...। কী ব্যাপার? আমি কি কোনওরকম হেলপ করতে পারি?'

লোকটা প্যাড-পেনসিল একরকম ছিনিয়েই নিল নরোত্তমের হাত থেকে। গাড়ির বনেটের ওপরে ভর রেখে কী যেন লিখতে গেল, কিন্তু তখুনি প্যাডটা ফসকে পড়ে গেল ফুটপাথে। সেটা ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলতে হল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে নরোত্তম শান্ত গলায় বললেন, 'আসুন, আমার ঘরে আসুন। বসে ধীরে সুস্থে কথা বলা যাবে।'

লোকটা তাড়াহুড়ো করে কী যেন একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বসাককে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল।

ছোট একটা টেবিলকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলেন। একটা জানলা দিয়ে বিকেলের মরা রোদ ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আগন্তুক ক্ষিপ্র হাতে প্যাডের কাগজে পেনসিল চালাতে লাগলেন। মনে হল তার সমস্ত ক্রোধ এবং উত্তেজনা হাত বেয়ে এসে উপচে পড়ছে প্যাডের ওপর। লেখা অক্ষরগুলো মাপে এত বড় যে,

একটা পাতায় সাত-আটটা শব্দের বেশি ধরছে না। লেখার শেষে প্রথম পাতাটা ভদ্রলোক গুঁজে দিলেন নরোত্তমের নাকের ডগায়। শব্দগুলো পাঠ করে নরোত্তম একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

'বেহায়ার মতো পরের ব্যাপারে নাক গলানোটা বন্ধ করবেন।'

প্রথম পাতা পড়ার আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে উঠতে না উঠতে দ্বিতীয় পাতাটা ঝটিতি এসে গেল নরোত্তম বসাকের চোখের সামনে।

'জিতেন অলকাকে ভালোবাসত। ওর মৃত্যুতে জিতেন ভীষণ...।'

আর-একটা পাতা এগিয়ে এল।

'শক পেয়েছে। গত পরশু ও আত্মহত্যা...।'

আবার একটা নতুন পাতা।

'করার চেষ্টা করেছিল।'

স্লিপের পর স্লিপ আসতে লাগল। ভদ্রলোকের বক্তব্য যেন আর শেষই হতে চায় না।

নরোত্তম এক-একটা পাতা পড়ে ওঠার আগেই নতুন-নতুন পাতা এসে হাজির হতে লাগল। তবে প্রতিটি শব্দেই যে তীব্র ঘৃণা, অভিযোগ, সাফাই, আর শাসানি লুকিয়ে রয়েছে সেটা বুঝতে নরোত্তমের কোনও অসুবিধে হল না।

'আপনার আজগুবি গপপো পুলিশ আমাদের বলেছে। জিতেন আর অলকার ভালোবাসায় কোনও খাদ ছিল না। অলকার বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত জিতেনের নামে পাগল। আমি সম্পর্কে অলকার একরকম মামা হই। তা ছাড়া জিতেন আমার ক্লায়েন্ট। ওদের পরিবারের মুখে কেউ কাদা ছোড়ার চেষ্টা করলে আমাকে তার মোকাবিলা করতেই হবে। আপনার কি মশাই ভীমরতি ধরেছে? আপনি সেদিন যা দেখেছেন তা হল জিতেন অলকাকে আদর করছিল। অফিসে বেরোনোর আগে রোজই তাই করত। সেদিন হঠাৎ আপনি দেখে ফেলেছেন। আপনি এতই নোংরা চরিত্রের লোক যে, এটা নিয়ে জিতেনকে আজ ব্ল্যাকমেল করতে গিয়েছিলেন? রিসেপশনিস্ট মিস সরকার সাক্ষী আছেন। আপনি যদি এ নিয়ে বেশি প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করেন তা হলে সোজা ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব বলে রাখছি। মানহানি—ব্ল্যাকমেল—মিথ্যে সাক্ষী—সবকিছু নিয়ে একেবারে ফাঁসিয়ে দেব।'

প্রতিটি শব্দ যেন এক-একটা গুলির মতো। নরোত্তম বসাক আকস্মিক আঘাতে-আঘাতে রীতিমতো বেসামাল হয়ে পড়লেন। তবু অতি কষ্টে চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলেন। আগন্তুক তখন তার লেখা থামিয়েছে, কিন্তু রাগে চোখ-মুখ ফেটে পড়ছে।

'আপনার নামটা জানতে পারি?' নরোত্তম প্রশ্ন করলেন ক্ষীণ কণ্ঠে।

লোকটি ঝটপট পেনসিলের আঁচড় টেনে একটি স্লিপ বাড়িয়ে দিল ওঁর দিকে।

পথিক চট্টোপাধ্যায়।

আশ্চর্য হলেন নরোত্তম। কারণ, নামটা ওঁর বেশ জানা। এবং শুধু ওঁর নয়, এ-অঞ্চলের প্রায় সকলেই পথিক চট্টোপাধ্যায়ের নাম জানে। ভদ্রলোক একজন প্রাক্তন এম.এল.এ.। গত ইলেকশানে হেরে গেছেন। তবে বেশ প্রভাবশালী এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি।

পথিক চট্টোপাধ্যায়কে দেখে ওঁর সম্পর্কে যেসব মতামত বা অভিমত নরোত্তম খাড়া করেছিলেন সেগুলো সবই প্রায় মিলে গেছে। এই মিলে যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ তৃপ্তি দিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় কেমন একটা আহত অহংকারবোধ ছায়া ফেলেছে। এর কারণ হয়তো এককালে তিনি বহু আলোচিত পুরুষ ছিলেন, এখন গ্রিনরুমই হল ওঁর আবাসস্থল। মঞ্চে ওঁর কোনও ভূমিকা নেই।

নরোত্তম কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'যদি একটু ধৈর্য ধরে শোনেন তা হলে আপনাকে সব খুলে বলতে পারি মিসেস রায়ের খুনের ব্যাপারে মিছিমিছি সাধ করে আমি নাক গলাইনি—।'

না, পথিক ওঁকে ধমক দিয়ে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন না। বরং সব শুনতে লাগলেন। আর একটানা বলে যেতে লাগলেন নরোত্তম।

কথাগুলো পথিক শুনছিলেন: তবে তেমন একটা মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। কিন্তু যে-মুহূর্তে নরোত্তম খুনের ভাবভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে কথা শুরু করলেন তক্ষুনি কাগজ-পেনসিল টেনে নিয়ে পথিক খসখস করে লিখেলেন 'খুনের ভঙ্গি! হুঁঃ! যতসব গাঁজাখুরি তাপ্পি!'

একজন প্রাক্তন এম.এল.এ-র শব্দচয়নের পছন্দ দেখে নরোত্তম বেশ অবাক এবং আহত হলেন। কিন্তু পথিক তখনও টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লিখে চলেছেন: 'আপনাকে এই শেষবারের মতো বলছি, যদি বাকি জীবনটা ঘানি ঘোরাতে না চান তা হলে জিতেনের ব্যাপারে আর নাক গলাবেন না।'

ব্যস, তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে কোনওরকম সৌজন্যসূচক বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন পথিক চট্টোপাধ্যায়। একটু পরেই বাইরে গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

তখন সন্ধের আঁচল ধীরে-ধীরে বিছিয়ে পড়ছে পৃথিবীর ওপরে।

সন্ধে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে একসময় আঁধার নেমে এল। স্থবিরের মতো একইভাবে চেয়ারে বসে রইলেন নরোত্তম। এক বিচিত্র লজ্জা ওঁকে পরতে-পরতে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

পথিকের এত রাগারাগি ওঁর পছন্দ হয়নি—কিন্তু বারবার ওর মনে হতে লাগল সেজন্য তিনি নিজেই দায়ী। নিজের চোখে তিনি একটা খুন হতে দেখেছেন, এ-কথাটা কি একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়নি! যদি এই খুন নিয়ে কোনও মামলা হয়, তা হলে সে মামলায় ওঁর সাক্ষ্য যে ধোপে টিকবে না তাতে নরোত্তমের কোনও সন্দেহ নেই। ভীমরতি ধরা সত্তর বছরের এক বুড়োর কথার কে কানাকড়ি দাম দেবে! তা ছাড়া, একজন পুরুষ একজন মহিলার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে এটা একঝলক দেখেই কি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পুরুষটি মহিলাটিকে খুন করছিল? কানে কালা হলেই কি কোনও মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবভঙ্গি বা অভিব্যক্তি জলের মতন ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারে? নরোত্তম এই মুহূর্তে নিজেই নিজের বিপক্ষে রায় দিলেন। সত্যি, কী বোকার মতোই না তিনি ভেবেছেন, কানে কালা হয়ে ওঁর মধ্যে নতুন এক ক্ষমতা জন্ম নিয়েছে।

ভাবতে-ভাবতে সময় যতই কাটতে লাগল নরোত্তম বসাক ততই নিশ্চিত হতে লাগলেন যে, ওঁর সমস্ত অনুমানই আজগুবি, উদ্ভট কল্পনা—যে-লোকটিকে তিনি ভেবেছেন হতাশায় ঝুঁকে আছে সে হয়তো আসলে ঝুঁকে পড়ে পেট চেপে হাসিতে ফেটে পড়ছে। যে-লোকটি ছটফটে উড়ু-উড়ু পা ফেলে হেঁটে চলেছে, নরোত্তম ভাবলেন সে কোনও খুশির খবর দিতে অথবা নিতে চলেছে কারও কাছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না,

লোকটা হয়তো নিজের হতাশা ও দুঃখ ঢেকে ওইরকম লোকদেখানো চালে হেঁটে চলেছে। চলার পথে নরোত্তম যখন কোনও বালককে হাসি মুখে হাতে হাত ঘষতে দেখেন তখন ভাবেন সে বোধহয় নিজের খুশির জগতে আপনমনেই বাহবা কুড়োচ্ছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ছেলেটি হয়তো প্রতিবেশীর পোষা কুকুরটিকে লাঠিপেটা করতে পেরে বেজায় খুশি হয়েছে।

নাঃ, নরোত্তমের শব্দহীন দুনিয়ার যে-যে নিয়ম কানুনগুলো ধীরে-ধীরে তিলে-তিলে গড়ে উঠেছিল সেগুলো আজ পথিকের তিরস্কারে কাচের মিনারের মতো ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়েছে।

চারিদিক কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকল নরোত্তম বসাকের কাছে। একবার মনে হল, তিনি শহরের বাড়িতেই ফিরে যাবেন—ঢের হয়েছে, এখানে আর নয়। অথচ এখানে যে-সুখ ও প্রশান্তি তিনি পেয়ে থাকেন তার তুলনা কোথায়! শুধু একবারই যা—।

হঠাৎই খুশি হয়ে উঠলেন নরোত্তম। পথিক ওঁর অন্তত একটা বিরাট উপকার করেছেন। একটা কাল্পনিক পথ থেকে সরিয়ে এনে ওঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বাস্তবের সঠিক পথে। মানুষের আচার-আচরণ কিংবা ভাবভঙ্গি সবসময়েই বিভ্রান্তিকর। না, এখন আর কোনও সন্দেহ নেই নরোত্তমের মনে।

গোবিন্দ সমাজপতি হয়তো ঠিক এই কারণেই আর কোনও খবর দেননি নরোত্তমকে। তদন্ত করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছেন সমাজপতি। প্রথম ধাক্কা হয়তো জিতেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় ধাক্কা পথিক, এবং তৃতীয় ধাক্কা নরোত্তমের বৃদ্ধ বয়েস। ছিঃ, ভালোবাসার আলিঙ্গনকে তিনি ভেবেছেন খুনির সর্বনাশা আক্রমণ! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

নরোত্তম জোর করে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন অন্য কোনও প্রসঙ্গে। অলকানন্দা রায়ের খুনের ঘটনা ওঁকে আমূল ভুলে যেতে হবে। বরং তার চেয়ে ভাবা যাক চড়ুইপাখি বছরে ক'বার ডিম পাড়ে, কীভাবে লালনপালন করে তার বাচ্চাদের।

আবহাওয়া সেই খুনের দিন থেকেই সেজেগুজে সুন্দর হতে শুরু করেছে। আজকের দিনটা দেখে মনে হয় তার সাজগোজ এখনও শেষ হয়নি। নিয়মিতভাবেই ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েন নরোত্তম। তবে ভুল করেও রায়বাংলোর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন না। যে-ভুল একবার হয়ে গেছে তা জেনেশুনে দ্বিতীয়বার করার কোনও মানে হয় না।

মাস-ছয়েক এইভাবেই কেটে গেল। তারপর একটা ঘটনা ঘটল।

জিতেন্দ্রনাথ বিয়ে করলেন দ্বিতীয়বার। একটা মাঝারি মাপের উৎসবও হল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন হাজির হলেন উৎসব-বাড়িতে। খুশি হয়তো সকলেই হয়েছেন, তবে নিমন্ত্রিতদের কয়েকজন মন্তব্য করলেন, অলকার মৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি জিতেন্দ্রনাথ বিয়ে না করলেই পারতেন। কিন্তু পথিক চট্টোপাধ্যায় বা অলকানন্দার বাড়ির তরফ থেকে কোনওরকম অনিচ্ছার বা অসন্তুষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। বরং এই দ্রুত বিবাহের এরকম একটা ব্যাখ্যাও শোনা গেল যে, অলকানন্দাকে জিতেন্দ্রনাথ এত ভালোবাসতেন যে, ওঁর জায়গা একেবারে শূন্য রাখতে তিনি অসহ্য কষ্ট পাচ্ছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারটা জিতেন্দ্রনাথ ও অলকানন্দার গভীর ভালোবাসাকেই সমর্থন করল।

টুকরো-টুকরো খবর নরোত্তমের কানে আসতে লাগল। সেগুলো জোড়া দিয়ে ঘটনা প্রবাহের কাঠামো তৈরি করতে লাগলেন তিনি।

এরপরে জানা গেল জিতেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহটি প্রেমঘটিত। কথাটা কানে আসামাত্র অবাক হলেন নরোত্তম। এমনিতে সারাটা দিন ওঁর অলসভাবেই কাটে। সুতরাং ইচ্ছে না থাকলেও সংগ্রহ করা খবরগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার কাজটা অজান্তেই ঘটে যায়। নরোত্তম বসাককে আরও যে খবরটা অবাক করল সেটা হল জিতেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী দিল্লির বাসিন্দা। হাজার-দেড়হাজার মাইল দূরের একটা মেয়ের সঙ্গে কী করে জিতেন্দ্রনাথের প্রণয় ঘটল সেটা ভেবে বেশ অবাক হলেন নরোত্তম। অবশ্য এটা ঠিক যে, ব্যাবসার কাজে জিতেন্দ্রনাথকে দিল্লিতে প্রায়ই যেতে হত। কিন্তু মাত্র দু-মাসের মধ্যে পরিচয় প্রণয় বিবাহ...নাঃ, এসব উলটোপালটা ভাবা ঠিক হচ্ছে না। নিজেকে প্রায় ধমকই লাগালেন নরোত্তম। কারও ক্ষেত্রে দু-মাস লাগে, কারও বা দু-দশ বছর। এ জাতীয় জিনিসের আবার নির্দিষ্ট সময় বাঁধা আছে নাকি!

ব্যাবসার কাজে দিল্লি গেলে জিতেন্দ্রনাথ বরাবরই প্রচুর টাকা খরচ করে আসতেন। এ-খবরটা জানতেন একমাত্র জিতেন্দ্রনাথের পারসোনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই বেহিসেবি খরচের ফলে ওঁর ব্যবসা কিছুটা টলোমলো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন আর কোনও ভয় নেই। অলকানন্দার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রচুর সম্পত্তি জিতেন্দ্রনাথের টালমাটাল ব্যাবসাকে সুস্থির করবে। তা ছাড়া দিল্লিতে ব্যাবসার কাজ গুটিয়ে নেওয়ায় এখন জিতেন্দ্রনাথকে সেখানে আর ট্যুরে যেতে হয় না ফলে ওদিকটায় অর্থের অপচয় একেবারেই কমে গেছে।

এই খরচগুলো আর কেউ যেমন জানে না, তেমনি নরোত্তমও জানতেন না। জানলে পরে আবার কিছুটা অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। দুশ্চিন্তা উড়ে এসে জুড়ে বসত মাথায়।

নরোত্তমের নিয়মিত জীবনযাত্রা আবার সুশৃঙ্খল হয়ে পড়ল।

অলকানন্দা রায়ের খুনের ঘটনা একরকম ভুলেই গেছেন নরোত্তম। এখন তিনি গোবিন্দ সমাজপতি, জিতেন্দ্রনাথ রায়, পথিক চট্টোপাধ্যায়—সবাইকেই ভুলে যেতে চান। বিশেষ করে পথিকের ভয়ে তিনি সর্বদা বিব্রত থাকেন। কোনদিন হুট করে না ওঁকে শাসাতে চলে আসেন!

প্রথমটায় নরোত্তম ঠিক করেছিলেন ভোরবেলা চলার পথে পথিক চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির রাস্তাটা এড়িয়ে চলবেন। কিন্তু পথটার সৌন্দর্য এত অপরূপ যে, সে-দৃশ্যকে হারাতে মন চায় না। সুতরাং, নরোত্তম শেষ পর্যন্ত একটা উপায় খুঁজে বের করলেন। তিনি ঠিক করলেন, অনেক বেলার দিকে ওই পথে হাজির হবেন তিনি। তা হল পথিকের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

এইভাবে রোজকার নিয়মের ছক সামান্য অদলবদল করে নিলেন নরোত্তম।

হঠাৎই একদিন চলার পথে পথিক চট্টোপাধ্যায়কে দেখতে পেলেন। তবে শুধু পথিক নয়, সঙ্গে রয়েছেন জিতেন্দ্রনাথ।

নরোত্তম থমকে দাঁড়ালেন। বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। একেবারে জোড়া বাঘের মুখোমুখি। এখুনি কী উলটোদিকে হাঁটা দেবেন। নাকি রাস্তা পেরিয়ে চলে যাবেন অপর ফুটপাথে?

দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নরোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে ব্যস্ত ছিলেন, তবে ওঁর চোখ সামনের খুঁটিনাটি দৃশ্যগুলো অভ্যাসবশে জরিপ করে নিচ্ছিল।

পথিক চট্টোপাধ্যায়ের হাত-পা নাড়া এবং কথাবার্তা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গের হাসিও খেলে যাচ্ছে পথিকের ঠোঁটে। যেন জিতেন্দ্রনাথকে বেশ বাগে পেয়েছেন তিনি। ওদিকে জিতেন্দ্রনাথ চোখ ছোট করে ঠোঁট কামড়ে রয়েছেন। পথিকের কোনও কথাই ওঁর কানে ঢুকছে না। যেন অন্য কোনও মতলব ভাঁজছেন।

হঠাৎই নরোত্তম খেয়াল করলেন, তিনি আবার সেই পুরোনো তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে আকাশকুসুম কল্পনা করতে শুরু করেছেন। ভাবভঙ্গি আচার আচরণ ইত্যাদির নীরব ভাষা আঁচ করতে চেষ্টা করছেন। নাঃ, এসব উদ্ভট কল্পনার কোনও মানেও হয় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উলটোদিকের পথ ধরলেন নরোত্তম। ভুল, ভুল, সব ভুল! যে-মানুষ কানে শুনতে পায় সে হয়তো বলবে পথিক আর জিতেন্দ্রনাথ কোনও ব্যাবসায়িক আলোচনা করছেন।

বাড়ি ফেরার পথে ক্লান্তভাবে হাঁটছিলেন নরোত্তম। ভাবছিলেন, এবারে ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যাবেন কিনা। কিন্তু সেখানেও কী সুখ কিংবা স্বস্তি আছে!

সুখ-শান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে ভাবতে-ভাবতে নরোত্তম বাড়ি পৌঁছে গেলেন। এবং ঠিক করলেন, পরদিন থেকে তিনি পথিকের উলটোদিকের ফুটপাথ ধরে নির্বিঘ্নে চলে যাবেন। ওই পথের আকর্ষণ কিছুতেই ওঁর মতো সৌন্দর্যলোভী বৃদ্ধকে মুক্তি দিচ্ছে না।

নরোত্তমের নতুন পরিকল্পনাতেও খুঁত থেকে গিয়েছিল।

পথিক ও জিতেন্দ্রনাথকে দেখার ঠিক পাঁচদিন পর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন নরোত্তম। যথারীতি উলটোদিকের ফুটপাথ ধরে ধীরেসুস্থে এগোচ্ছিলেন। পথিক চট্টোপাধ্যায়ের প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকাটি পেরিয়ে যাওয়ার সময় নিছকই কৌতূহলে বাড়িটার দিকে ঘাড় ফেরালেন তিনি। এবং তখনই দৃশ্যটা ওঁর নজরে পড়ল।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে পথিক পাগলের মতো হাত নেড়ে নরোত্তম বসাককে ডাকছেন।

না, ঠিক হাত নেড়ে ডাকছেন তা বোধহয় বলা যায় না। পথিক যে কী করছেন তা বলা মুশকিল। না, ভাবভঙ্গি দেখে মানুষের মনের কথা আঁচ করার অপচেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন নরোত্তম।

পথিক নিশ্চয়ই হাত নেড়ে ডাকছেন। হ্যাঁ, কোনও সন্দেহ নেই।

নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বারবার অবাক হলেন নরোত্তম। তারপর চোখ ছোট করে আরও তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখলেন। কী বলতে চাইছেন পথিক? মাসকয়েক আগে হলেও নরোত্তম বলতেন ভদ্রলোক সাহায্যের আশায় চিৎকার করছেন, আকুল কণ্ঠে ওঁকে ডাকছেন, ওঁর ভঙ্গিটা যেন জলে ডুবে যাওয়া অসহায় মানুষের মতো, যেন খড়কুটো পেলেই আঁকড়ে ধরবেন।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, নরোত্তমের পক্ষে বলা সম্ভব নয় পথিক আসলে ঠিক কী বলতে চাইছেন।

পরক্ষণেই পথিকের মুখ বিকৃত হল। উনি কী কোনও বাচ্চাকাচ্চার সঙ্গে মুখভঙ্গি করে ছেলেখেলা করছেন? নিশ্চয়ই তা-ই হবে। কোনও ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে মুখ বেঁকিয়ে হাসানোর চেষ্টা করছেন পথিক। বাঃ, বেশ আমুদে লোক তো! নরোত্তম মজা পেলেন।

পথিক এবার ডানহাত বাড়িয়ে জানলার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরেছেন। ঘরের ভেতরে ঝুঁকে পড়েছেন সামান্য। হয়তো ওঁর হাত থেকে কিছু একটা পড়ে গেছে—সেটাই ঝুঁকে পড়ে তুলছেন তিনি।

পলকের জন্য হঠাৎই নরোত্তমের মনে হল পথিক চট্টোপাধ্যায় বিপদে পড়েছেন। একবার ভাবলেন, ছুটে গিয়ে ওঁকে সাহায্য করেন, কিন্তু পথিকের বাড়িতে নিশ্চয়ই লোকজন চাকরবাকর আছে। সেখানে নরোত্তম হুট করে গিয়ে হাজির হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো পথিকের কাছেই ধাতানি খেতে হবে। একে তো অলকানন্দা রায়ের খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে খুব একচোট নাকাল হতে হয়েছে নরোত্তমকে, তারপর...।

তবু নরোত্তমের মনটা খচখচ করতে লাগল। এ-পথে আর কেউ এলে তিনি তাঁকে বলবেন ব্যাপারটা একটু খোঁজখবর করে দেখতে।

নরোত্তম অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু কেউ এল না। তখন আবার তাকালেন জানলার দিকে।

জানলায় কেউ নেই! জানলার ফ্রেম থেকে পথিক অদৃশ্য হয়ে গেছেন। জানলা এখন শূন্য, হা-হা করছে। সবকিছু আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

নরোত্তম বসাকের বেড়ানো একসময় শেষ হল। এরপর সাতদিন তিনি বাড়ি থেকে বেরোলেন না। শরতের একটানা অকালবৃষ্টি ওঁকে ঘরকুনো করে রাখল। কাজের লোকটি প্রয়োজনে বেরিয়ে দোকানপাট সেরে দিল। সুতরাং, স্থানীয় খবরগুলো নরোত্তম পাননি। খবরের কাগজও দেখা হয়নি ওঁর।

সুতরাং, তিনি জানতে পারলেন না পথিক চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন। স্ত্রীকে নিয়ে কন্টিনেন্ট ট্যুরে বেরোবেন বলে ঠিক করেছিলেন পথিক। সেই কারণে কিছুদিন ধরে প্র্যাকটিসে বেরোনোও বন্ধ রেখেছিলেন। ঘটনার, অথবা দুর্ঘটনার, দিন বাড়িতে তিনি একা ছিলেন। স্ত্রী বেরিয়েছিলেন বিশ্বভ্রমণ উপলক্ষ্যে শেষ মুহূর্তে কিছু কেনাকাটা সারতে। পথিক জানতেন যে, ওঁর হার্টের অবস্থা ভালো নয়, কিন্তু দুনিয়া চষে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দে তিনি একটা ভারী ট্রাঙ্ক টেনে সরাতে গিয়েছিলেন।

অত্যাধিক পরিশ্রমে পথিক হার্টফেল করে মারা যান। অথচ যে-ট্যাবলেট খেলে ওঁর প্রাণ বাঁচত সেটা প্রায় হাতের নাগালেই ছিল।

এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করে মিসেস চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন প্রখ্যাত ব্যাবসায়ী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

ছকের বাইরে
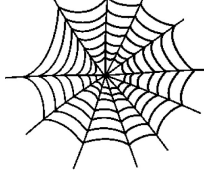
প্রাকবিবাহকালে ইলার প্রেমিকের সংখ্যা কত ছিল বিয়ের পর সে নিয়ে আমি একেবারেই মাথা ঘামাইনি। অবশ্য ইলাও যে আমার ভূতপূর্ব প্রেমিকার সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করছে, এমন নয়। অথচ এই ব্ল্যাকমেল সংক্রান্ত ব্যাপারটা যে আমাদের অতীত জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকাকে জড়িয়েই, তা বুঝতে আমার অসুবিধে হল না। তবুও বোকা-বোকা, ন্যাকা-ন্যাকা চোখ মেলে সামনে বসে থাকা শকুনটার দিকে তাকিয়ে আধো-আধো স্বরে বললাম, কই, আমি তো কিছু জানি না।

লোকটা একটু অপমানিত বোধ করল। রুমাল জড়িয়ে খড়গ নাকটাকে পাকড়ে ধরে সশব্দে নাক ঝাড়ল। তারপর কাচের মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ধরল আমার দিকে, তাই বুঝি?

এবার অপমানিত হওয়ার পালা আমার। কারণ, কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাড়জিরজিরে হাতটা বাড়িয়ে আমার থুতনিটা ঈষৎ তুলে ধরেছে লোকটা।

একঝটকায় ওর হাত ছাড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কী, কী চান আপনি?

ট-এ আকার, ক-এ আকার—টাকা।—নিঃশব্দে হাসল লোকটা। বাইরে চুপ করে থাকলেও মনে-মনে পরিস্থিতির গুরুত্ব ওজন করলাম। একদিকে আমার সুনাম, সামাজিক মর্যাদা, আর অন্যদিকে টাকা, হয়তো বিশাল অঙ্কের টাকা। আর যদি এই অর্থপিশাচের কথার প্রতিবাদ করি তা হলে অনিবার্যভাবেই ও সব ফাঁস করে দেবে। রাস্তার লোকে আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে বেড়াবে, ওই যে বৎসগণ, যে-ব্যক্তিটি তোমাদের চর্মচক্ষুর সম্মুখ দিয়া ছন্দোময় পদবিক্ষেপে উত্তরদিক অভিমুখে চলিয়াছেন, তিনি একজন নিরীহ নাগরিকের বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিয়া উক্ত নাগরিককে বাধিত এবং দেশের জনসাধারণকে আহ্লাদিত করিয়াছেন। অতএব বৎসগণ...।

নাঃ, আর ভাবতে পারছি না। শেষে কি প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীঅমিত সান্যাল মুখে চুনকালি মেখে সং-এর নাচ নাচবেন? অসম্ভব।

আপনার নামটা জানতে পারি?—শকুনমুখো লোকটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

অবশ্যই। আমারই নাম প্রাণকান্ত সমাদ্দার।

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। জলে ভেসে থাকা নৌকোর মতো দুলে উঠল গোটা ঘরটা। কোনওরকমে উচ্চারণ করলাম, আপ—আপনিই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—সলজ্জ নম্র স্বরে উত্তর দিল প্রাণকান্ত সমাদ্দার, আমিই সেই হতভাগ্য, আপনার স্ত্রীর ভূতপূর্ব স্বামী। ইলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আইনত ছেদ হয়েছে বলে আমার তো মনে পড়ে না।

বিয়ের পর ইলার অতীত ভুলে গিয়ে (সেইসঙ্গে আমার অতীতটাও ভুলেছিল ইলা) আমি ওকে মেনে নিয়েছিলাম। আরও প্রাঞ্জল করে বলতে গেলে আমরা পরস্পরকে গ্রহণ করেছিলাম দূর অস্ত সুখের প্রাসাদের পাসপোর্ট হিসেবে। তখন বুঝিনি ইলা প্রেম, ভালোবাসা ছাড়াও বিবাহজাতীয় একটা বিরক্তিকর জিনিস আগেভাগেই সেরে বসে আছে। জানলে কি আর ওই ভুল করি!

ইলাকে ভালোবাসার পর আমার জীবনে এসেছে সাফল্যের ঝাপটা। যে আমি রোজ নতুন জুতো কিনে পাবলিশারদের বাড়ি-বাড়ি ধরনা দিতাম, সেই আমাকেই চাকরি দিল বিখ্যাত বাংলা দৈনিক 'চলাচল'। তাও আবার সাতশো টাকা মাইনের। সুতরাং ইলা সমাদ্দার আমার কাছে হয়ে দাঁড়াল জীবন্ত পরশপাথর। তার পরেই আমার কোন এক দূরসম্পর্কের কাকা না জ্যাঠা পরলোকগমন করে আমাকে করে দিয়ে গেল লাখপতি। জানি না ভদ্রলোক সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলেন কি না। নইলে আপনারজন ছেড়ে একেবারে পরেরজন এই অধমকে কেনই-বা সব বিষয়সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া!

আমার সেই স্বর্ণযুগের সময়েই ইলা হঠাৎ বলে বসেছিল, অমিত, আমাকে বিয়ে না করলে তোমার সঙ্গে আমার এই বোধহয় শেষ দেখা।

কারণ জিগ্যেস করায় বিষণ্ণ হাসি হেসে ইলা বলেছে, তোমার যা-যা পাওয়ার তা তো তুমি পেয়েই গেছ, আমাকে আর কী দরকার? কিন্তু সেটা তো আমি মুখ ফুটে বলতে পারি না। তুমি যাতে আমাকে একেবারে ছেড়ে দাও, সেইজন্যে ওই বিয়ের কথা বললাম।

ইলার কথার প্রতিটি শব্দ মিছরির ছুরির মতো আমার পুরুষত্বের ওপরে কেটে বসেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে অট্টহাসি হেসে ইলাকে বুকে টেনে নিয়েছি। এতদিনকার মিথ্যে আশ্বাসকে সত্যে পরিণত করে ওকে বিয়ে করেছি। অর্থাৎ, জীবনযুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞা দুই নরনারীর মিলন সংঘটিত হয়েছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এ বিয়েতে আমাদের দুজনেরই কোনও আপশোস ছিল না।

বিয়ের পর আমাদের পাঁচ বছর কেটে গেছে। খ্যাতি আর সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখন প্রশমিত। আজ অমিত সান্যাল নামটা প্রায় প্রতিটি পাঠকের পরিচিত। আমার ছবি ছাড়া কোনও সংস্কৃতি-সংবাদ প্রকাশিত হয় না। যে-কোনও পুরস্কার বিবেচনার আগে সবার মনে পড়ে আমার নামটার কথা। 'চলাচল' পত্রিকা ও অমিত সান্যাল আজ এক ও অভিন্ন।

উপরোক্ত ইত্যাদি-ইত্যাদির ফলস্বরূপ ভবানীপুরে দেড়লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি এই ফ্ল্যাট। যে-ফ্ল্যাটে বসে এখন আমাকে কথা বলতে হচ্ছে এক ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে।

কারণ, পাঁচবছর নির্বিঘ্ন দাম্পত্যজীবনের পর গতকাল রাত বারোটার সময় হঠাৎ একটা ফোন এল।

ওয়াল ক্লকের রাত বারোটার সংকেত ঘরের চারদেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে ঘরের টেলিফোন। ইলা অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে বিছানায়। সুতরাং ওর যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সেইজন্যে তাড়াতাড়ি লেখার টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো, অমিত সান্যাল স্পিকিং।

অধম আপনাকে একটা সামান্য সংবাদ দিতে চায়।—ও-প্রান্ত থেকে নরম, মিঠে স্বর ভেসে এল।

কীসের সংবাদ?—রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করলাম। লোকটা খবর শোনানোর আর সময় পেল না।

আপনার স্ত্রী বিগ্যামির অপরাধে অপরাধিনী। সে আপনার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে একজন ব্যক্তির সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ব্যাটা দেখি সাধু ভাষায় কথা বলে! একটা খিস্তি দিয়ে বলে উঠলাম, কে আপনি?

শান্ত স্বরে উত্তর এল, আপনার স্ত্রী ইলা সমাদ্দারের প্রথম স্বামীর নাম শ্রীপ্রাণকান্ত সমাদ্দার। আইনত সেই ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীমতী ইলার সম্পর্ক আজও অটুট। যদি অনুমতি দেন তবে আমি আগামীকাল সন্ধে সাতটায় আপনার বাড়িতে উপস্থিত হতে চাই। মনে হয় আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এবং স্বভাবতই সে-আলোচনার সময় আপনার স্ত্রী অনুপস্থিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর লোকটার কথায় রাজি হলাম, ঠিক আছে। আগামীকাল সন্ধে সাতটায়।

ভারাক্রান্ত মনে রিসিভার নামিয়ে আবার লিখতে বসলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টার পর আলো নিভিয়ে ইলার পাশে এসে শুয়ে পড়লাম।

অতএব গতকাল রাতের এই টেলিফোনের পরিণতি হিসেবে আজ সন্ধে সাতটায় এই কালান্তক সাক্ষাৎকার।

ছ'টা নাগাদ ইলাকে বলে-কয়ে প্রায় জোর করেই শপিং-এ পাঠিয়েছি। কেন জানি না, যে-ইলা কোনওদিন আমার কথার অবাধ্য হয়নি, সে-ই হঠাৎ কেমন বেঁকে বসেছে। ওর নাকি শরীর খারাপ। মন ভালো নেই। তা ছাড়া কেনাকাটার কীই-বা আছে! এইসব নানান কথা বলেছে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। যতরকম উপায় সম্ভব, সবক'টাই প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত ওকে বাড়িছাড়া করেছি।

সাধারণত ইলার কাছে আমি কোনও কথাই গোপন করি না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ ব্যাপারটা ভালো করে তলিয়ে না দেখে ওকে কিছু বলে বসা ঠিক হবে না। তাই সেই অচেনা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করেছি।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে সাতটা বাজতেই দরজায় কারও নক করার শব্দ হল, ঠকঠক—।

উৎকণ্ঠার চরম সীমায় পৌঁছে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তাই চার-পাঁচ লাফে সোফা ও দরজার দূরত্বটুকু পার হয়ে ঝটিতি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছি। সামনেই হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো একটা লোক। ফরসা রং সূর্যদেবের অনুগ্রহে তামাটে হয়ে গেছে। তোবড়ানো গালে বয়েসের ভাঁজ। সম্ভবত অকালবার্ধক্য। ছোট-ছোট ভুরুর নীচে ক'টা চোখ দুটো দু-টুকরো ফসফরাসের মতো জ্বলছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে সে-চোখে ভেসে উঠছে এক প্রশান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। মাথার চুল পরিপাটি করে পাতা কেটে আঁচড়নো। পাতলা ঠোঁটের ওপর ঝাঁটা গোঁফটার মতো খড়গ নাকটিও ভীষণভাবে বেমানান।

লোকটির পরনে ঢোলা হাওয়াই শার্ট ও একটি সুতির প্যান্ট। দুটোরই রং আকাশ-নীল। কিন্তু যত্নের অভাবে অনেক জায়গায় রং জ্বলে গেছে।

সব মিলিয়ে একটা ডানাকাটা শকুন যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা সরু-সরু কাঠির মতো হাত দুটো এক করে নমস্কার করল, নমস্কার, আমিই কাল রাত বারোটায় আপনাকে ফোন করেছিলাম।—একটু থেমে লোকটি আবার বলল, অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে, ইলা বাড়িতে নেই তো।

ভেতরে আসুন। একটা অজানা ভয়ে হাত-পা সিঁটিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন উত্তাল হয়ে উঠল।

লোকটা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ইশারায় সোফায় বসতে বললাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে বসলাম শকুনটার মুখোমুখি। বললাম, আমিই অমিত সান্যাল।

আজকাল আমার নিজের নামটা উচ্চারণ করতে বেশ ভালো লাগে। যেন সকলকে ডেকে বলছি, আমিই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

লোকটি কিন্তু এতে একটুও প্রভাবিত হল না। শুকনো স্বরে জবাব দিল, নামটা আমি জানি বলেই তো মনে হচ্ছে।

রাগ হলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করলাম না। লোকটা কতটা জানে, সেটা আগে আমার জানা দরকার।

ইলার ব্যাপারটা আমি আপনার কাছ থেকে খোলাখুলিভাবে জানতে চাই।

সেটা বলব বলেই তো এসেছি।—একটু থেমে আবার বলল সে, ইলা আপনাকে বিয়ে করার সময় অলরেডি বিবাহিতা ছিল।

তা হলে সে-কথা আপনি আমাকে পাঁচবছর আগে জানাননি কেন?—উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলাম, এখন কেন এসেছেন এ-কথা বলতে?

চেঁচাবেন না, স্যার।—হাত তুলে শকুনপাখি বাধা দিল আমাকে, আপনার তো আবার হার্টের রোগ আছে।

আপনি—আপনি সেটা জানলেন কেমন করে?

আমাদের জানতে হয়।—শান্ত স্বরে শকুন উত্তর দিল, যাকগে, আপনি জিগ্যেস করছিলেন আমি পাঁচবছর কেন অপেক্ষা করলাম, তাই তো? তার কারণ কুমারী গাই কখনও দুধ দেয় না। পাঁচটি বছর ধৈর্য ধরে আমি অপেক্ষা করেছি আপনার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। তারপর আজ যখন আপনার গর্ভবতী, উন্নতির চরম ধাপে, তখনই আমি আমার দোহনপর্ব শুরু করতে চাইছি। পাঁচ বছর আমার নষ্ট হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু এখন কাজটা আমার পক্ষে অনেক সোজা হয়ে গেছে।

আমার অসহায়তা লোকটি পরিষ্কার বুঝতে পারল, তাই মুচকি হেসে বলে চলল, জানি না, ইলা কেন ব্যাপারটা আপনার কাছে চেপে গেছে, তবে এটা সত্যি যে, ওর ভূতপূর্ব স্বামী এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে। তার নাম প্রাণকান্ত সমাদ্দার...সে তো কালই আপনাকে ফোনে জানিয়েছি।

ইলার মতো কোনও বুদ্ধিমতী মেয়ে যে কখনও এরকম বোকার মতো কাজ করে বসতে পারে, তা আমি কল্পনাও করিনি। আমিও তো অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রাকবিবাহজীবনে অনেক লটরপটর করেছি, কিন্তু কই, এত বড় ভুল তো করিনি!

এবার লোকটিকে বোকার মতো বলেছি, কই, আমি তো কিছু জানি না!

তারপর যখনই লোকটি বলেছে, সে-ই ইলার প্রথম স্বামী, তখন অবাক হয়ে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি।

পরিস্থিতির ঝটকা সামলে নিয়ে বললাম, কত টাকা চান আপনি?

আপাতত হাজার-দুয়েক।—কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটা প্যান্টের পকেট হাতড়ে কিছু কাগজপত্র বের করল, টাকা দেওয়ার আগে আমার কথা সত্যি কি না পরখ করে নিন। এই যে আমাদের বিয়ের পর তোলা ফটো। আর এটা হল ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট।

প্রাণকান্তর কথা যে আমি অবিশ্বাস করেছি, তা নয়। তবু একবার ক্ষীণ আশা নিয়ে আমার চোখের নজর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাগজগুলোর ওপরে, এবং আমার বিশ্বাস আরও মজবুত হয়েছে।

সুতরাং অকারণে সময় নষ্ট না করে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে চেকবই নিয়ে এলাম। প্রাণকান্তর সামনেই পেন বাগিয়ে ধরে লিখতে শুরু করলাম।

স্যার!

লেখা বন্ধ করে মাঝপথে মুখ তুলে তাকালাম।

স্যার, আমি ইংরেজি পড়তে জানি না, তবে মা-বাবার অনুগ্রহে এক-দুইটা জানি। তাই বলছিলাম, চেকের বদলে ক্যাশটাকা দিলে আমার পক্ষে নিতেও সুবিধে, পরখ করতেও সুবিধে।

প্রাণকান্তর মিছরিমাখা স্বরে টের পেলাম ধরা পড়ে গেছি। নাঃ, লোকটা নেহাত বোকা নয়। নগদনারায়ণের কারবারে যে কোনও দুশ্চিন্তা নেই, সেটা ও ভালোই জানে।

সুতরাং চেকটা ছিঁড়ে ফেলে পেন বুকপকেটে গুঁজে ফেললাম, বললাম, তা হলে আমার পক্ষে এখন ক্যাশটাকা দেওয়া সম্ভব নয়। দিনকয়েক সময় চাই।

প্রাণকান্ত কিছুক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল, ছোটবেলায় সময়ানুবর্তিতা রচনায় আমি ক্লাসে হায়েস্ট নম্বর পেয়েছিলাম। তাই ওই সময়-টময়ের ব্যাপারগুলো আমি নিখুঁতভাবে মেনটেন করি! আগামী শুক্রবার রাত ন'টার সময় আসব। দেখবেন স্যার, টাকাটা যেন পাই।

একটু হেঁ-হেঁ করে হাত কচলে উঠে দাঁড়াল সমাদ্দার। এগিয়ে চলল দরজার দিকে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে ধরলাম। এবং খেয়াল করলাম, আমার সাহিত্যজীবনে এই প্রথম এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি এক নিখুঁত খুনের প্লট চিন্তা করে চলেছি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅমিত সান্যাল জীবনে সর্বপ্রথম এক যুগান্তকারী গোয়েন্দা উপন্যাস লেখায় হাত দেবেন।

কিন্তু দরজা ছেড়ে বেরোনোর সময়ও প্রাণকান্ত আমার মনের পরোপকারী চিন্তাধারার কথা টের পেল না। কারণ, আমার মুখের অমায়িক হাসিটা ওকে ভাববার সুযোগ দিচ্ছিল, আমি ভয় পেয়েছি।

ইলার ফিরতে যে খুব বেশি দেরি হবে না, তা জানতাম। তাই ওর স্নায়ুর ওপর যাতে হঠাৎ চাপ সৃষ্টি করা যায়, সেইজন্যে দৃশ্যসজ্জায় চটপট মনোযোগ দিলাম। ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খুলে রাখলাম। নিভিয়ে দিলাম ঘরের সব ক'টা আলো। তারপর বসবার ঘর

ছেড়ে শোওয়ার ঘরে গেলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসলাম—দরজার ঠিক মুখোমুখি। তারপর আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকা শেড দেওয়া টেবল-ল্যাম্পটাকে জ্বেলে দিলাম। অর্থাৎ, দরজার সামনে থেকে দেখলে আমার শরীরের সিলুয়েট ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না। আর দেখা যাবে শুধু জ্বলন্ত সিগারেটের অগ্রভাগটুকু।

প্রতীক্ষা শুরু করার মিনিট-দশেকের মধ্যেই সদর দরজার কাছ থেকে কানে এল একটা অস্ফুট চাপা আর্তনাদ। তারপরেই ইলার কাঁপা স্বর, অমিত, অমিত।

আমি নীরব।

অমিত, তুমি কোথায়?

আমি তবুও নীরব। সিগারেটের ধোঁয়ার কালো ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের দেওয়ালে।

এবার ওর হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে, যে-ঘরে আমি বসে আছি।

দরজার কাছে আসামাত্রই আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং একইসঙ্গে ঘটে গেল তিনটে ঘটনা।

এক, কিনে আনা জিনিসপত্রের বাক্সগুলো ইলার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে গেল।

দুই, ওর ভোক্যাল কর্ড ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। ওর গলাফাটানো চিৎকারে গমগম করে উঠল গোটা ঘরটা।

আর শেষ ঘটনাটা যেমন চমকপ্রদ তেমনি আকস্মিক। ইলা ঘুরে দাঁড়িয়েই উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করল।

আমিও আর দেরি না করে ক্ষিপ্রগতিতে ওকে অনুসরণ করলাম। সিগারেটের টুকরোটা বসবার ঘরের টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলাম। তারপরই ফ্ল্যাটের খোলা দরজা লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করলাম।

বাইরে বেরোতেই করিডরের অলোয় কিছুক্ষণের জন্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হল না, ইলা সিঁড়ি ধরে দৌড়চ্ছে। সুতরাং আমিও সিঁড়ি ভেঙে দুদ্দাড় করে ছুটলাম।

তিনতলার সিঁড়ির কাছাকাছি এসেই ইলাকে ধরে ফেললাম। এবং ও চিৎকার করবে বুঝতে পেরেই বাঁ-হাতের তালু দিয়ে ওর মুখটা চেপে ধরলাম। ও বোবা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি পেছন থেকে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, ভয় নেই, ইলা। আমি—আমি অমিত।

ইলা ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল আমার বুকে। ওকে ধরে ধীরে-ধীরে ওপরে নিয়ে চললাম। আমার এই সাজানো পরিবেশ যে ওর মনে এতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করবে, তা ভাবতেই পারিনি। ইলার এই আকস্মিক ভয় পাওয়ার কারণ আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। তা হলে কি...?

ওনারশিপ ফ্ল্যাটগুলোর একটা সুবিধে আছে। এরা কেউই কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। এমনকী কারও সঙ্গে কারও আলাপ-পরিচয়ও তেমন নেই। তা ছাড়া বহু ফ্ল্যাটে এখনও লোক আসেনি। তাই এত গন্ডগোল সত্ত্বেও কেউ যে দরজা খুলে বেরিয়ে এল না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার উলটোদিকের ফ্ল্যাটে যে-পাঞ্জাবি ভদ্রলোক

থাকেন, তিনি যখন প্রত্যেকদিন রাত বারোটা-একটার সময় টলটলায়মান অবস্থায় ফিরে এসে একাদিক্রমে তার ফ্ল্যাটের দরজা এবং তার দজ্জাল গৃহিণীর সঙ্গে পানিপথের চতুর্থ এবং পঞ্চম যুদ্ধ বেশ উৎসাহ সহকারে শুরু করেন, তখন আমি আর ইলা বন্ধ দরজার পেছন থেকেই সে-যুদ্ধের ধারাবিবরণী শুনি। ভুলেও দেখতে যাই না যুদ্ধের ফলাফল।

সুতরাং বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে ইলাকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম। আন্দাজে হাত বাড়াতেই হাতে ঠেকল আলোর সুইচ। আলো জ্বেলে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ইলার ফোঁপানি বন্ধ হয়ে গেলেও ওর দেহটা এখনও ফুলে-ফুলে উঠছে। ওকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিলাম, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ইলা একবার মুখ তুলে আমাকে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে বসে পড়ল সোফায়।

আমি ছড়িয়ে পড়া জিনিসপত্রের বাক্সগুলো গুছিয়ে রেখে ইলার মুখোমুখি এসে বসলাম। ওর জলে ভেজা মুখটা কি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে পাঁচ বছর আগে দেখা ইলাকে। ফরসা মুখে টানা-টানা গভীর জীবন্ত কালো চোখ। হাতছানি দেওয়া স্বপ্নিল ঠোঁটের নীচে সৌন্দর্যের পরিপূরক ছোট্ট তিলটা যেন শিল্পীর হাতের নিখুঁত পরশ।

ইলা একটা সামান্য ব্যাপার তুমি আমাকে জানাতে বোধহয় ভুলে গিয়েছিলে। তাই প্রাণকান্ত সমাদ্দার এসে সেই কথাটা আজ আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

ইলা কাপড়ের খুঁট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, আমার কথা শোনামাত্রই দু-হাতে আঁকড়ে ধরল সোফার হাতল। ভাবলেশহীন কঠিন মুখে আমার দিকে তাকাল। গভীর কালো চোখে ফুটে উঠল অনুচ্চারিত বিস্ময়, আতঙ্ক।

সমাদ্দার আমাকে সবই বলেছেন, ইলা। কোনওকিছুই জানতে আমার আর বাকি নেই। সুতরাং ব্যাপারটা সত্যি কি না সেটা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।

ইলা প্রথম ভয়টাকে এতক্ষণে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। ও নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, বলল, হ্যাঁ অমিত, সত্যি।

এবার তা হলে সমস্যাপূর্ণ আসল চ্যাপ্টারটা তোমাকে আমি খুলে বলতে চাই। প্রাণকান্ত আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে। সামনের শুক্রবার রাত ন'টায় ও আসবে প্রথম কিস্তির দু-হাজার টাকা নিতে। মনে রেখো, প্রথম কিস্তি। তারপর ব্যাপারটা চলবে—চলতেই থাকবে। একদিকে আমার সম্মান, সামাজিক মর্যাদা, আর অন্যদিকে টাকা, শুধু টাকা। জানি না, এভাবে কতদিন ওর মুখ আমি বন্ধ রাখতে পারব। আর এইরকম চলতে-চলতে আমরা হব রাস্তার ভিখিরি। শুধু আমার বইয়ের রয়্যালটির টাকায় কোনওরকমে দিন চলবে। কারণ 'চলাচল'-এর চাকরি বজায় রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না—শুধু ওই প্রাণকান্তর জন্যে।

ওকে খুন করলে কেমন হয়?

এবার চমকানোর পালা আমার। বোবা বিস্ময়ে ইলার নিটোল নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও বলে কী! তা হলে আমাদের মানসিক বোঝাপড়া কি এতই নিখুঁত? প্রাণকান্তকে খুন করার কথা মনে-মনে চিন্তা করলেও, সে সর্বনাশা-চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস বা শক্তি কোনওটাই আমার নেই। কিন্তু এখন ইলার প্রস্তাব পেয়ে উল্লাসের শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরের শিরা-উপশিরায়। কিন্তু মনের ভাব মনেই লুকিয়ে রেখে মুখে বললাম, খুন? মানে, সেটা কি ঠিক হবে?

কেন হবে না?—ইলার সপ্রতিভ স্বর ঝাঁঝিয়ে উঠল, ওই লোকটা আমার লাইফের সব আনন্দ, সুখ কেড়ে নিয়েছিল। আজ থেকে সাত বছর আগে একটা ইমোশনাল ঝোঁকে বাড়ির সকলের কথা না শুনে আমি ওকে বিয়ে করি। কিন্তু প্রাণকান্তর অবস্থা ছিল ভীষণ গরিব। তাই বেশিদিন আমরা সুখে থাকতে পারিনি। তার ওপর ওর স্বভাব-চরিত্র ক্রমশই গড়িয়ে চলেছিল নীচের দিকে। বিয়ের ক'মাস পরেই আমাকে ছেড়ে ও বেপাত্তা হয়ে যায়। তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। তারপর...তারপর একদিন বহু পুরুষের পর এলে তুমি। কেন জানি না, এবারের পরিচয়টাকে আমি হালকাভাবে নিতে পারিনি। পরের ঘটনা তো তুমি সব জানো। আজ এতদিন পর প্রাণকান্ত আমার অবস্থার সুযোগ নিতে এসেছে। তাই বলছি অমিত, ওই লোকটাকে খুন করার মধ্যে কোনও পাপ নেই, কোনও অন্যায় নেই।

ইলার শেষ কথাগুলোর রেশ আমার কানের পরদায় ঘুরে-ফিরে বাজতে লাগল: কোনও পাপ নেই, কোনও অন্যায় নেই।

ইলা, তা হলে একটা প্রশ্নের আমি সোজাসুজি উত্তর চাই।—নিষ্পলকে ইলার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলাম, আমাদের এই বিবাহিত জীবনে তুমি কী অসুখী?

এই আচমকা প্রশ্নে ইলা বেশ অবাক হয়ে গেল। আমার কথার জবাব না দিয়ে ও পালটা প্রশ্ন করল, কেন, হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছ কেন?

কারণ আছে, ইলা। আমি জানতে চাই তোমার কাছে কার দাম বেশি? আমার, না প্রাণকান্তর?

প্রাণকান্তকে আমি ঘৃণা করি।—দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে কুটিল স্বরে জবাব দিল ইলা।

আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ইলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলাম ওর কোমল গালে। মৃদু স্বরে কানে-কানে বললাম, প্রাণকান্ত সমাদ্দারকে আমিও ঘৃণা করি।

প্রাণকান্তর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম। ইলার হাবভাবে কোনও পরিবর্তন দেখতে পাই না, কিন্তু জানি, ও চুপচাপ বসে নেই। প্রাণকান্তকে খতম করার ব্যাপারটা নিয়ে ইলাও যথাসাধ্য ভাবছে।

আমি কী অফিসে, কী বাড়িতে, সবসময়েই বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই নিয়ে পড়ে থাকি। ভাবতে থাকি প্রাণকান্তকে খুন করার সহজ অথচ নিখুঁত উপায়। সবার আগে আমাকে ঠিক করতে হবে সমাদ্দারের মৃত্যুটাকে পুলিশের কাছে কীভাবে উপস্থিত করব। অ্যাক্সিডেন্ট? সুইসাইড? না স্বাভাবিক মৃত্যু? বেশ কিছুক্ষণ চিন্তার পর শেষ সম্ভাবনাটা মন থেকে মুছে ফেললাম। কারণ, এ পৃথিবীর কোনও লোকই পরের ফ্ল্যাটে এসে স্বাভাবিক উপায়ে মারা যায় না। সুতরাং হাতে রইল দুই। অর্থাৎ, হয় অ্যাক্সিডেন্ট না হয় সুইসাইড। আপনারা হয়তো হাসছেন দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার কথা ভেবে। তা হাসারই কথা। এমন কোনও সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ কি আছে, যে পরের ফ্ল্যাটে এসে আত্মহত্যা করে? অতএব, শেষ সম্ভাবনাটা মনে আঁকড়ে প্রস্তুতিপর্বের কথা ভাবতে শুরু করলাম।

হঠাৎই মনে পড়ল একটা বিদেশি ছবির কথা। জানি না ছবিটা আপনারা দেখেছেন কি না, তবে আমি আর ইলা দুজনেই দেখেছি। সেটা আলফ্রেড হিচককের বিখ্যাত ছবি

'ডায়াল এম ফর মার্ডার'। তাতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঘরে একটি অপরিচিত লোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেই মৃত লোকটির পকেটে পুলিশ একটি মারাত্মক সূত্র পায়: একটা চাবি। যে-ঘরে লোকটি মারা যায় সেই ঘরের চাবি। তখন পুলিশ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গৃহস্বামীকে গ্রেপ্তার করে। কারণ, ওই চাবিটি ছিল ওঁরই। তিনিই ওটা মৃত লোকটিকে দিয়েছিলেন ঘরে ঢোকার জন্যে।

ওই ছবির গল্পটাকে কাজে লাগালে কেমন হয়? অবশ্য গল্পের শেষটা হবে একটু অন্যরকম। মৃত প্রাণকান্ত সমাদ্দারের পকেটে যে-চাবিটা পাওয়া যাবে, তা আমাদের ফ্ল্যাটের হলেও আমার বা ইলার চাবি নয়। সেটা হবে সম্পূর্ণ নতুন একটা তৃতীয় নকল চাবি—চাবিওয়ালার হাতে তৈরি।

পরিকল্পনাটা যতই ভাবতে লাগলাম, ততই ওটা স্পষ্ট চেহারা নিতে লাগল। তাই বৃহস্পতিবার রাতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর পাশে শুয়ে থাকা তন্দ্রাচ্ছন্ন ইলাকে ডাকলাম, ইলা, ইলা?

উঁঃ।—পাশ না ফিরেই ও অস্ফুটে জবাব দিল।

সমাদ্দারের ব্যাপারটা আমার ভাবা হয়ে গেছে।

এবারে ইলা পাশ ফিরল। মাথার কাছে জানলা দিয়ে ঠিকরে আসা মরা চাঁদের আবছা আলোয় ওর চোখদুটো দেখতে পেলাম। সে-চোখে নীরব প্রশ্ন।

দ্যাখো, ব্যাপারটা হবে ঠিক এইরকম।—হাত নেড়ে ইলাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আগামীকাল প্রাণকান্ত এলে ওকে ওর পাওনা দু-হাজার টাকা আমি দিয়ে দেব। তারপর ও স্বাভাবিকভাবেই আরও টাকা চাইবে। তখন ওকে বলব আগামী সপ্তাহে বুধবার আসতে। বুধবার আসতে বলার একটা কারণ আছে। তা হল, ওই দিন থেকে অফিসে আমার রুমে যে অন্য আর-একটা ছোকরা কাজ করে, সে সোমবার পর্যন্ত ছুটি নিচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা খুলে বললেই সব বুঝতে পারবে। যা হোক, প্রাণকান্ত কাল টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি আমার কাজ শুরু করব। প্রথমে বাথরুম থেকে সাবানটা নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা থেকে চাবির ফুটোর ছাপ নেব। তারপর সেই সাবান নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অচেনা এক চাবিওয়ালার কাছ থেকে দরজার একটা নকল চাবি তৈরি করব। চাবি তৈরি হয়ে গেলে সোমবার সকালে থানায় গিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে বলে একটা ডায়েরি করব। আর ইতিমধ্যে তোমার কাজ হবে, সেই ছাপ নেওয়া সাবানটাকে বাথটাবে রেখে জলে পুরোপুরি গলিয়ে ফেলা এবং ওটার হাত থেকে নিখুঁতভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া। তারপর ঘরের গোটাকয়েক ড্রয়ার-টয়ার খুলে রেখে আর কাগজপত্র কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে মঞ্চসজ্জার কাজ সম্পূর্ণ করে রাখবে। পুলিশ তদন্তে এলে ভালোই হবে। ওদের এক্সপার্টরা যখন দেখবে দরজা ফোর্স করা হয়নি, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওদের নজর পড়বে চাবির ফুটোর দিকে। ওরাই আমাদের জানাবে, চোর এসেছিল নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে। আমরা সবাই যেন সাবধানে থাকি—কিছু হলেই যেন ওদের খবর দিই ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ নকল চাবির ব্যাপারটা পুলিশের মনে আমরা গেঁথে দেব।

ইলা বোধহয় এতক্ষণে আমার এই প্রাথমিক পরিকল্পনার তাৎপর্য বুঝতে পারল। ও চোখ গোল-গোল করে শুনতে লাগল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল। এইবার শুরু হবে প্রাণকান্ত-সংহার পালার দ্বিতীয় অধ্যায়।

বুধবার বিকেল পাঁচটা একুশের ট্রেনে আমরা দুজনে বাইরে যাচ্ছি।

কেন?—বাধা দিয়ে জানতে চাইল ইলা।

দরকার আছে, তাই। যাকগে, শোনো। সেইদিন ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় প্রাণকান্তর সঙ্গে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব। ওকে প্রচুর টাকার লোভ দেখাব, তা হলে ও ঠিক সময়মতোই আসবে। এদিকে অফিস থেকে পাঁচটা বাজতে পঁচিশের সময় আমি বেরিয়ে পড়ছি। কিন্তু আমার সহকর্মী সমর জানবে আমি বেরুলাম ঠিক পাঁচটায়—পাঁচটা বাজতে পঁচিশে নয়। কারণ, বুধবার আমার রুমের দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা সমরকে লুকিয়ে আমি পঁচিশ মিনিট এগিয়ে দেব। এগিয়ে দেব আমার হাতঘড়ির কাঁটাও। এবং সমরের হাতঘড়ির কাঁটাও যে করে হোক আমাকে সরাতে হবে। মোটমাট পাঁচটা বাজতে পঁচিশ মিনিটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে আমি সোজা বাড়িতে আসছি।

এখন ভালো করে শোনো তোমাকে কী করতে হবে। ঠিক পাঁচটা বাজতে পঁচিশের সময় তুমি রেডি হয়ে বাইরে বেরোবে—অবশ্য বেরোনোর আগে তোমার ঘড়ির কাঁটা পঁচিশ মিনিট এগিয়ে নেবে। যাতে সময় তখন পাঁচটা বলে মনে হয়। ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়েই তুমি অরোরাদের (আমাদের উলটোদিকের ফ্ল্যাটের সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোকদের কথা বলছি) ফ্ল্যাটের দরজায় আস্তে নক করবে। নক করেই চট করে এসে ঝুঁকে দাঁড়াবে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়। বেশ 'খটাং-খটাং' করে চাবি ঘোরাবে। তবে দরজার পাল্লায় সামান্য ফাঁক রেখে দেবে যাতে ঘরের ভেতরের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যায়। এদিকে তোমার পেছনে অরোরাদের ফ্ল্যাটের দরজা ততক্ষণে খুলে গেছে। আর সেই দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস অরোরা বেশ কৌতূহলে তোমাকে লক্ষ করছেন (যেহেতু মিস্টার অরোরা রাত বারোটার আগে কোনওদিনই বাড়ি ফেরেন না)। তখন তোমার কাজ হবে ওর সঙ্গে কথা বলা। নকল চাবি দিয়ে যে আমাদের ফ্ল্যাটে গত রবিবার চোর ঢুকেছিল, সে-কথা ওঁকে চটাপট জানিয়ে দেবে। তুমি যে আমার সঙ্গে পাঁচটা একুশের ট্রেনে বাইরে যাচ্ছ সে-কথাও বলবে এবং রোববার পর্যন্ত, অর্থাৎ, যে-ক'দিন আমরা থাকব না, ওঁকে আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে একটু নজর রাখতে রিকোয়েস্ট করবে। বলা তো যায় না, সেই চোরটা কখন আবার এসে নকল চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে? মিসেস অরোরা নজর রাখতে পারুন আর না-ই পারুন, একগাল হেসে নজর রাখবেন বলে তোমাকে আশ্বাস দেবেন এবং আমিও সেটাই চাই। কারণ, পরে প্রাণকান্তর ডেডবডি পাওয়ার পর মিসেস অরোরা ওঁর নজর রাখার কাজে গাফিলতি করেছেন বলে নিজেই আপশোস করবেন। ইস, কেন তিনি ভালো করে নজর রাখলেন না! নয়তো ওই চোরটি কি কখনও ঢুকতে পারত?—যাক, আশা করি ব্যাপারটা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, এইবার কথার ফাঁকে তোমার ঘড়িতে যে পাঁচটা বাজে (অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে সময় তখন পাঁচটা বাজতে পঁচিশ মিনিট) সেটাও বেশ কায়দা করে জানিয়ে দেবে ওঁকে। আর ঠিক সেইসময় তুমি কাঁটা এগিয়ে দেওয়ার ফলে আমাদের দেওয়াল-ঘড়িতেও ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজবে। সুতরাং ভবিষ্যতে মিসেস অরোরা যদি কোনওদিন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পড়েন, তখন তিনি শপথ করেই বলবেন যে, ঠিক পাঁচটার সময় তুমি ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে গেছ। ব্যস, তারপর মিসেস অরোরার চোখের সামনে দিয়েই চাবি ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে তুমি লিফটে চড়ে নামতে শুরু করবে।

এইবারই শুরু হচ্ছে পরিকল্পনার সবচেয়ে জটিল এবং কুটিল অংশ। লিফট চলতে শুরু করামাত্রই তুমি চোখে একটা গগলস লাগিয়ে নেবে, চুলের কায়দা সামান্য পালটে নেবে। এবং আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক নীচের তলাতেই লিফট থামিয়ে লিফট থেকে নেমে পড়বে। তুমি লিফটের বোতাম এমনভাবে টিপবে যাতে তুমি নেমে পড়ার পর খালি লিফট চলে

যায় একতলায়। কারণ, ঠিক সেইসময়ে আমি একতলায় সানগ্লাস পরে লিফট নামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

লিফট নেমে যাওয়ামাত্রই তুমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করবে। লক্ষ রাখবে, যেন কেউ তোমাকে দেখতে না পায়। তুমি ফিরে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে আবার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়বে। নিঃশব্দে বন্ধ করে দেবে ফ্ল্যাটের দরজা। তারপর তোমার হাতঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসবে। দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটার ব্যাপারটা আমিই ভাবব, তোমাকে ভাবতে হবে না। এবার তুমি সোফায় বসে আমার জন্যে ওয়েট করবে।

পৌনে পাঁচটার মধ্যেই (অফিস থেকে বাড়িতে আসতে আমার মিনিট-দশেকের বেশি লাগবে না। কারণ, অফিস আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়) আমি ফ্ল্যাটে চলে আসছি। তারপর আমরা দুজনে মিলে প্রাণকান্তর জন্যে ওয়েট করব। আমাদের ফ্ল্যাটে আসার সময় প্রাণকান্তকে যদি কেউ দেখতে পায়, তবে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ, পরে সেই ব্যক্তিই আমাদের ফ্ল্যাটে মৃত প্রাণকান্তকে সনাক্ত করে বলবে, ও সেই আগন্তক। অর্থাৎ, নকলচাবি নিয়ে হানা দেওয়া রাতের চোর।

আমি থামতেই ইলা আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরল ওয়ান্ডারফুল, অমিত, ওয়ান্ডারফুল! —ফিসফিস করে ও বলল, আমাদের কেউ ধরতে পারবে না। প্রাণকান্তর হাত থেকে খুব সহজেই আমরা ফ্রি হয়ে যাব।

কিন্তু এখনও কিছুটা বাকি আছে, ইলা।

অন্ধকারেই ইলা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

পরের কাজগুলোর কথা তোমাকে বলা হয়নি।

কী কাজ?

প্রাণকান্ত পৌনে পাঁচটায় আসার পর আমরা ওকে খুন করব। ওর প্যান্টের পকেটে গুঁজে দেব আমার বানানো সেই নকল চাবিটা (পুলিশ সেই চাবিওলাকে কোনওদিন খুঁজে পাবে না বলেই আমার ধারণা)। ততক্ষণে দেওয়াল-ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা কুড়ি হবে (অর্থাৎ, আসলে ঠিক পাঁচটা)। তখন আমি দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা ফিরিয়ে নিয়ে যাব ঠিক কুড়ি মিনিট পেছনে। এবং দেওয়াল-ঘড়ির নিয়ম অনুযায়ী, ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার ঢং একই থাকবে। অর্থাৎ, সাড়ে পাঁচটার সময় আবার একটা ঘণ্টাই বাজবে—তার বেশি নয়। এবার তুমি আর আমি ফ্ল্যাটের দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ব পাঁচটা একুশের ট্রেন ধরার জন্যে।

বুধবার রওনা হয়ে আমরা ফিরে আসব রবিবার। এবং ডেডবডি আবিষ্কার করার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে। স্টেশন থেকে বাড়িতে ফেরার পথে আমি অফিস হয়ে আসব। জানিয়ে আসব আমি কলকাতায় ফিরেছি। আর সেই সুযোগে আমার চেম্বারে গিয়ে দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে সময় শুধরে দেব। তোমাকে আগেই বলেছি, সমর বুধবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ছুটি নিচ্ছে। তাই ও কাজে লাগার আগেই ঘড়ির ব্যাপারটা আমি ঠিক করে ফেলতে চাই।

কিন্তু সময়ের ঘড়িটার কী করবে?

সেটা আমি ভেবে রেখেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।—ইলাকে আশ্বাস দিয়ে বলে চললাম, আমাদের শেষ কাজটা হবে প্রাণকান্তর বডি আবিষ্কার করে পুলিশে খবর দেওয়া। পুলিশ তদন্ত করে জানবে ঠিক পাঁচটার সময় বেরিয়ে পাঁচটা একুশের ট্রেনে আমরা বাইরে গেছি

(দরকার পড়লে ট্রেনের পাঞ্চ করা টিকিটগুলোও ওদের দেখাব)। আর আমাদের কথা সাপোর্ট করবে যথাক্রমে সমর এবং মিসেস অরোরা। অর্থাৎ, আমরা দুজনেই হব নিটোল অ্যালিবাইয়ের মালিক। তখন সেই রহস্যময় চোরের ভূমিকা মরা প্রাণকান্তের ঘাড়ে গিয়েই পড়বে। পুলিশ প্রাণকান্তর পকেটে পাবে সেই নকল চাবি, যা সাবানের ছাপ তুলে কেউ তৈরি করিয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। তখন চাবি পরীক্ষা করে তাতে শুধু প্রাণকান্তরই আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে (পাওয়া যাতে যায়, সে বিষয়ে আমি বিশেষ যত্ন নেব)। অর্থাৎ, 'ডায়াল এম ফর মার্ডার'-এর নায়কের মতো আমি আর চাবির প্যাঁচে পা দিচ্ছি না। সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশের কাছে সহজ-সরল বলে মনে হবে। প্রাণকান্তর হাত থেকে আমরা চিরদিনের জন্যে মুক্তি পাব।

কিন্তু—কিন্তু প্রাণকান্তকে আমরা খুন করব কেমন করে?—অস্ফুট স্বরে জানতে চাইল ইলা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলাম, কী করে খুন করব জানি না। তবে ওর মৃত্যুটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে মনে হওয়াটা খুব দরকার। সেই স্টাইলটা জানতে পারলেই আমার কাজ শেষ হবে।

ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।—ইলা বলল, তুমি যখন এত বুদ্ধি করে সমস্ত কিছু সলভ করতে পেরেছে, তখন ওই খুনের ব্যাপারটা আমিই বুদ্ধি করে বের করতে পারব। আমাকে এত বোকা ভাববেন না, মশাই।

প্রাণকান্তকে কীভাবে খুন করা যায় শুধু সেইটুকু ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোনোর আগে ব্যাপারটা যতই ভাবতে লাগলাম, ততই একটা কনফিডেন্স টের পেতে লাগলাম। মনে হল, পুলিশকে আমি বোকা বানাতে পারবই।

ইলাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সে-রাতের মতো নিশ্চিন্তে আর কোনওদিন ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

শুক্রবার দিন ঠিক করা সময়ের কিছু আগেই প্রাণকান্ত এসে হাজির হল। দরজা বন্ধ করে আগের দিনের মতোই সোফায় ওর মুখোমুখি বসলাম। কথাবার্তা শুরু করার আগে প্রাণকান্ত একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর শোওয়ার ঘরে বন্ধ দরজার দিকে ইশারা করল, ইলা নেই তো?

না—নেই।—নির্জলা মিথ্যে বেশ মোলায়েম করে ওকে শুনিয়ে দিলাম। কারণ, শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজার ওপিঠেই কান পেতে অপেক্ষা করছে ইলা। ওর কাছে যখন কিছুই আর অজানা নেই, তখন ওর এই ছেলেমানুষি প্রস্তাবে আর 'না' বলিনি।

তা স্যার, আমার টাকাটা—।

এই যে।—পকেট হাতড়ে দুটো দশটাকার নোটের বান্ডিল বের করে ওর হাতে দিলাম।

থ্যাঙ্কস।—হাড়জিরজিরে পাঁচ আঙুলে বান্ডিল দুটো খামচে ধরল প্রাণকান্ত। একবার যেন ওজন করে দেখল টাকাটা। এবং পরমুহূর্তেই বান্ডিল দুটো চালান করে দিল আকাশ-নীল প্যান্টের পকেটে।

মিস্টার সমাদ্দার, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে, ইতস্তত করে বলেই ফেললাম কথাটা, মানে, ভবিষ্যতে আপনার আবার টাকার দরকার হবে কি না সেটা জানা থাকলে—।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—হায়েনা হাসির সঙ্গে-সঙ্গে ওঠ-বোস করল প্রাণকান্তর প্রকট কণ্ঠা, লাগবে বইকী!

কত?—স্থির চোখে শকুন সমাদ্দারের দিকে চেয়ে জানতে চাইলাম।

ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে, মিস্টার সান্যাল? প্রয়োজন অনুসারে আমার দাবির পরিমাণও ফ্লাকচয়েট করবে।

ওসব বাজে কথা রেখে কাজের কথায় আসুন।—রুক্ষ স্বরে বললাম, আমি আপনাকে একসঙ্গে একটা মোটা টাকা দিয়ে আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। বিশ হাজার টাকায় কি আপনার আপত্তি আছে?

সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণকান্তর উসুখুস ভাবটা উবে গেল। ঝুঁকে পড়া শিরদাঁড়াটা টান-টান করে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। চেষ্টা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্যে ওর মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমি কি ভুল শুনছি?

না, ঠিকই শুনছেন। আমি সোজাসুজি উত্তর চাই। হ্যাঁ কি না?

অবশ্যই হ্যাঁ। কিন্তু টাকাটা পাচ্ছি কবে?—প্রাণকান্তর স্বর এবার অর্থলালসায় উৎসুক।

আগামী বুধবার বিকেল পৌনে পাঁচটার সময়! তবে মনে রাখবেন, ঠিক পৌনে পাঁচটায়। কারণ আপনার ওই সময়ানুবর্তিতা রচনায় আমিও একবার হায়েস্ট নম্বর পেয়েছিলাম, হেঁ, হেঁ, হেঁ।—প্রাণকান্তকে ব্যঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালাম।

বিদায় দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত। সোফা ছেড়ে চটপট দরজার দিকে পা বাড়াল সমাদ্দার।

দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই শোওয়ার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ইলা। ওর চোখে-মুখে ঘৃণা উপচে পড়ছে।

কী, প্রথম স্বামীদেবতার মধুর কণ্ঠস্বর শোনার সাধ মিটেছে?

লোকটা...লোকটা একটা পিশাচ!—ঘৃণাভরা স্বরে জবাব দিল ইলা।

নিঃসন্দেহে পিশাচ। কিন্তু মনে রেখো, ইলা, ওকে খুন করার প্ল্যানটা আমরা এখনও ঠিক করতে পারিনি।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ইলা জবাব দিল, কে বলল পারিনি? প্রাণকান্ত সমাদ্দার মারকিউরিক ক্লোরাইডের সলিউশান খেয়ে মারা যাবে।

তার মানে?—স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম ইলার দিকে।

হ্যাঁ। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, অমিত, আমরা যে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করি সেটা মারকিউরিক ক্লোরাইড। বাথরুমে বাদামি রঙের বোতলে যে-কাচের দানার মতো বস্তুটা রয়েছে, আমি ওটার কথাই বলছি। সেই মারকিউরিক ক্লোরাইড জলে মিশিয়ে আমরা প্রাণকান্তকে খাওয়াব। ব্যস আর দেখতে হবে না—প্রাণকান্ত চিরকালের জন্যে একেবারে কাত হয়ে যাবে।

কিন্তু সেটা তো আর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে না, ইলা।—চিন্তান্বিত স্বরে জবাব দিলাম, অথচ...।

তুমি আমার কথা ঠিক পুরোপুরি বুঝতে পারোনি, অমিত। তুমি বোধহয় জানো না, মারকিউরিক ক্লোরাইড ইদুর মারার কাজেও ব্যবহার করা যায়। সুতরাং, বাইরে যাওয়ার আগে ইঁদুর মারার জন্যে আমরা এই টেবিলের (ইশারায় টেবিলটা দেখাল ইলা) ওপর এক গ্লাস জল খোলা রেখে যাব। আর টেবিলের ওপর থাকবে তোমার পুরোনো, নতুন, গোছা-গোছা পাণ্ডুলিপি। আর পাণ্ডুলিপির পাহারায় রেখে যাচ্ছি ওই এক গ্লাস জল। শুনতে ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকছে, তাই না, অমিত? কিন্তু ভেবে দ্যাখো তো, প্রাণকান্ত খুন হওয়ার পর এই ঘরের দৃশ্য ঠিক কীরকম হয়ে উঠবে? পুলিশ এসে দেখবে, তোমার পাণ্ডুলিপির বেশ কিছুটা জলে ভেজা। টেবিলের কাছে মরে পড়ে আছে প্রাণকান্তর বিকৃত মৃতদেহ। আর তার পাশেই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে একটা কাচের গ্লাস, তার গায়ে শুধুমাত্র প্রাণকান্তরই হাতের ছাপ। তখন জলটা আমরা কী জন্যে রেখে গিয়েছিলাম, সে প্রশ্নটা পুলিশের কাছে আর তেমন জরুরি বলে মনে হবে না, তাই না?

ইলার যুক্তি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আনন্দে ওর হাত চেপে ধরলাম: ইলা, আমরা দুজনে মিলে এই শতাব্দীর মোস্ট পারফেক্ট মার্ডার কমিট করব। অতএব এরপর থেকে সব চলবে প্ল্যানমাফিক। ডান।

ডান, সম্মতি জানিয়ে আমার কাঁধে মাথা রাখল ইলা।

বুধবার অফিসে যাওয়ার আগে গত ক'দিনের ঘটনাগুলো আরও একবার যাচাই করে দেখলাম, আমি ভুল করিনি। সাবানের ছাপ, নকল চাবি থেকে আরম্ভ করে পুলিশে ডায়েরি করা পর্যন্ত সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। পুলিশ এবং আমার বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসই হয়েছে যে, আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল এক অদৃশ্য চোর। কিন্তু আমার ধারণা মতো পুলিশ সরেজমিনে তদন্ত করতে একবারের জন্যেও আসেনি। অর্থাৎ, এত কষ্ট করে সাবানের ছাপ তুলেছি, সেটা ওরা আর দেখল না। অবশ্য এতে চিন্তার কারণ খুব একটা নেই। কারণ, আগামী রবিবার প্রাণকান্তর ডেডবডি আমার ফ্ল্যাটে পাওয়া গেলে, পুলিশ দরজার চাবির ফুটো থেকে শুরু করে প্রাণকান্তর পকেটে পাওয়া নকল চাবি, সবই পরীক্ষা করে দেখবে। তখন প্রমাণগুলো জোরদার হবে।

কিন্তু ইলার ইঁদুর মারার ব্যাপারটা কেমন হালকা ঠেকছে না! পুলিশ কি ওতে ভুলবে? তার চেয়ে পুলিশের কাছে অন্য একটা ব্যাখ্যা দিলে কেমন হয়? যদি বলি, ওই মারকিউরিক ক্লোরাইড মোশানো জল ব্যবহার করব বলে ইলা তৈরি করেছিল, কিন্তু পরে ভুলে যাওয়ায় ওই এক গ্লাস বিষাক্ত জল টেবিলেই থেকে গেছে।...যাকগে, ও নিয়ে পরে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত এখনকার কাজ নিয়ে ভাবি।

অফিসের দেওয়াল-ঘড়িতে সোয়া চারটে বাজতেই সোজা হয়ে বসলাম। তাকিয়ে দেখি সমর চৌধুরী সকাল থেকে সেই একইভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে কী যেন লিখছে। না, আর দেরি নয় এখনই কাজ শুরু না করলে বিপদে পড়তে হবে। সুতরাং চট করে কাজের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। বড়-বড় পা ফেলে এগোলাম অ্যাটাচড বাথরুমের দিকে। কাঁটা ঘুরিয়ে আমার হাতঘড়িটা খুলে রাখলাম বেসিন স্ট্যান্ডে। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে ফিরে এলাম কাজের জায়গায়। রুমাল বের করে হাত মুছতে-মুছতে সমরকে লক্ষ করে বললাম, সমর, আমি আজ বিকেল পাঁচটা একুশের ট্রেনে বাইরে যাচ্ছি।

কোথায় অমিতদা?—লেখা থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল সমর।

লিলুয়া—সঙ্গে মিসেসও যাচ্ছেন। শুনলাম তুমিও নাকি আজ থেকে কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিচ্ছ?

হ্যাঁ, সোমবার পর্যন্ত। মায়ের শরীরটা ভালো নয়, তাই।

ভূমিকা ছেড়ে এইবার আসল কথায় এলাম।

কী লিখছ সেই সকাল থেকে, দেখি?—হাতটা বাড়িয়ে দিলাম সমরের দিকে। ওর হাত থেকে লেখাটা নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ যেন খুব দেরি করে ফেলেছি এমনি ভাব দেখিয়ে বলে উঠলাম, নাঃ, আর দেরি করলে বোধহয় ট্রেন ধরতে পারব না। —বলে ক্যাসুয়ালি একবার আমার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম: আরে, কোথায় গেল ঘড়িটা? নীচে ফেলে আসিনি তো। সমর, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, প্লিজ, একবার দেখো না, ঘড়িটা আমি সুকান্তর কাছে ফেলে এসেছি কি না?

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।—প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল সমর। বেচারা অনেক উন্নতির আশা রাখে, তাই বসকে অখুশি করতে চায় না।

সমর বেরিয়ে যেতেই আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। একলাফে হাজির হলাম দেওয়াল-ঘড়ির সামনে। দেওয়াল-ঘড়িতে তখন চারটে বেজে একুশ মিনিট। সুতরাং কাঁটা ঘুরিয়ে সাড়ে চারটের জায়গায় নিয়ে গেলাম। ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজতেই মিনিটের কাঁটাটা এগিয়ে দিলাম। ৪-৪৬ মিনিটের জায়গায়। বাথরুমে আমার হাতঘড়ি ফেলে আসার সময় ঘড়ির কাঁটা পচিশ মিনিট এগিয়ে দিয়েছিলাম। অতএব এখন বাকি শুধু সমরের ঘড়িটা।

এবার বাথরুমে গিয়ে ঘড়িটা হাতে পরে বেরিয়ে এলাম। অফিস রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে সমরের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট-পাঁচেক পরে দোতলায় সারা অফিস চষে ও ফিরে আসতেই বললাম, তোমাকে শুধু-শুধু বিরক্ত করলাম। ঘড়িটা ভুল করে বাথরুমেই ফেলে এসেছিলাম।—আমি দরজা আগলে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যাতে সমর ভেতরে ঢুকে দেওয়াল-ঘড়ির সময় না দেখে ফেলে।

ঘড়ির কথা ওঠায় একটা কথা মনে পড়ে গেল, সমর।

সমর জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আমার দিকে।

আমাকে একটা ঘড়ি কিনতে হবে, এক রিলেটিভের জন্যে। এই ধরো একশো-সোয়াশোর মধ্যে (সমর আগে একদিন বলেছিল, ওর ঘড়িটার দাম একশো তিরিশ টাকা। ভাগ্যিস কথাটা মনে ছিল)। এখন কী ঘড়ি দিই ভাবছি।

কেন, অ্যাংলো সুইস দিন না।

আচ্ছা দেখি, তোমার হাতটা দেখি। —বলতে-বলতে সমরের ঘড়িসুদ্ধ বাঁ-হাত টেনে নিলাম আমার বুকের কাছে। আমার বুড়ো আঙুলের ডগা এমন নিখুঁতভাবে ওর হাতঘড়ির ডায়াল ঢেকে রইল যে, সমরের পক্ষে তখন সময় দেখা সম্ভব হল না।

তোমার ঘড়িটা কী ঘড়ি?—এবং এবার কথা শেষ হতে-না-হতেই সমরের হাতঘড়ি আমি খুলে নিয়েছি, নিয়ে ডায়ালটা আমার দিকে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করেছি।

অ্যাংলো সুইস।—আমার ব্যবহারে একটু অবাক হলেও সমর নির্বিকার।

তা হলে এইরকম একটা ঘড়িই কিনে দেওয়া যেতে পারে।—ঘড়িটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বললাম, কত দাম তোমার ঘড়িটার? দেড়শোর বেশি হলে আমার পক্ষে...।

না, না, ওটার দাম মাত্র একশো তিরিশ টাকা।

সমরের কথা শেষ হতে না হতেই ওর হাতঘড়িটা আমার আঙুলের আওতা ছাড়িয়ে (অথচ আমি জানি, কতখানি কুশলী হলে সমরের চোখের সামনে ওইরকম কায়দা করে ঘড়িটাকে মেঝেতে ফেলা যায়!) মেঝেতে ছিটকে পড়ল, এবং অনিবার্যভাবেই ঘড়ির ডায়ালের কাচ তখন ভেঙে গেছে।

সমর অস্বস্তিভরে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সমর, এক্সট্রিমলি সরি। রোববার দিন আমি ফিরছি। কথা দিচ্ছি, তোমার ঘড়িটা মেরামত করিয়ে সোমবার দিনই তোমাকে দিয়ে দেব। —বলে অচল ঘড়িটা নির্বিবাদে পকেটে ভরে ফেললাম।

না, না, অমিতদা, তার কোনও দরকার নেই...। আমিই ওটা সারিয়ে নেব'খন। সমর ইতস্তত করে বলে উঠল।

কিন্তু ও কী করে জানবে আমার মনের কথা। সুতরাং ওর সদিচ্ছায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে বললাম, আমি যদি ঘড়িটা সারিয়ে দিই, তবে কি তোমার আপত্তি আছে, সমর? আফটার অল দোষটা যখন আমারই।

সমর নিশ্চুপ। বস বলে কথা!

যাও, লেখাটা শেষ করে ফ্যালো গিয়ে—বেশ জমেছে। আমি এখন হাতের কাজটা সেরে নিই। ওদিকে তোমার বউদির সঙ্গে একেবারে স্টেশনে গিয়ে দেখা করতে হবে। টিকিট অবশ্য আগেই কাটা আছে।—বলতে-বলতে সমরের লেখাটা ফেরত দিলাম। তারপর ধীরেসুস্থে আমার টেবিলে গিয়ে বসলাম।

যাক, ঘড়ির ব্যাপারটা অনেক কষ্টে কায়দা করা গেছে। ওদিকে ইলা কী করছে কে জানে। ওকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে সময় চুরির পরিকল্পনাটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। এরপর ও যদি ঠিকমতো মিসেস অরোরাকে বোকা বানাতে না পারে, তো সমস্ত কিছুই ওলটপালট হয়ে যাবে।

লেখা নিয়ে ব্যস্ত সমরের দিকে একপলক চোখ বুলিয়ে আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে যেন ইলার গতিবিধি আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

আসল সময় অনুযায়ী ঠিক পাঁচটা বাজতে চব্বিশ মিনিটের সময় ইলা সান্যাল ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে এল। কিন্তু ওর হাতঘড়ি, এবং ঘরের দেওয়াল-ঘড়ি দুটোতেই পাঁচটা বাজতে এক মিনিট। অর্থাৎ ওর স্বামীর কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছে ইলা। বাইরে বেরিয়ে ও দরজা ভেজিয়ে দিল, কিন্তু সামান্য ফাঁক রেখে দিল। চারপাশে একবার তাকাল। তারপর টুক করে করিডরের কার্পেট মোড়া প্রস্থটুকু নিঃশব্দে পার হয়ে অরোরাদের দরজায় আস্তে নক করেই নিজের জায়গায় আবার ফিরে এল, ঝুঁকে পড়ল

দরজার কাছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি চাবি বের করে লকের ভেতর গলিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে খটাং-খটাং শব্দ করতে লাগল।

ঠিক এইসময় ইলার পিছনে অরোরাদের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল, ভেসে এল ভরাট গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ, আপনি কি দরজায় নক করেছিলেন?

ভীষণভাবে চমকে উঠল ইলা। মিসেস অরোরার গলা তো এত গম্ভীর নয়! দরজায় চাবি ঘুরিয়ে চাবি ভ্যানিটি ব্যাগে ভরল ইলা।

ততক্ষণে আরও একবার 'আপনিই কি একটু আগে নক করছিলেন?' জিগ্যেস করা হয়ে গেছে।

এবার দুরুদুরু বুকে ঘুরে দাঁড়াল ইলা: কই, ন-না, না তো!

তা হলে আমারই বোধহয় শুনতে ভুল হয়েছে।—মিস্টার অরোরা দরজা বন্ধ করতে যেতেই বেপরোয়া হয়ে ইলা বলে উঠল, শু-শুনছেন!

(ইস, এভাবে যে হুমদো বুড়োটা বেরিয়ে আসবে কে জানত! অমিত বলেছিল, মিস্টার অরোরা রাত বারোটার আগে ফেরেন না। কিন্তু...।)

কী?—অরোরার ভুরু ঊর্ধ্বমুখী হল।

মিসেস অরোরা আছেন? ওঁর সঙ্গে একটু কথা ছিল।—ইতস্তত করে বলল ইলা।

কী দরকার আমাকেই বলুন না।—আলাপের আগ্রহের সুরে বললেন অরোরা। এমনিতে মহিলাদের সঙ্গে আলাপে ওঁর কোনও আপত্তি নেই, বরং ভালোই লাগে। আর এখন ইলাকে দেখে ওঁর মনে হচ্ছে, আ বিউটি ইন ডিসট্রেস। মরিয়া হয়ে ইলা মিসেস-এর পরিবর্তে মিস্টারের সঙ্গেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ছক বাঁধা কথা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

আপনি বোধহয় শুনেছেন, লাস্ট সানডে আমাদের ফ্ল্যাটে চোর এসেছিল?

হ্যাঁ, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

হ্যাঁ। বলছিলাম, আজ পাঁচটা একুশের ট্রেনে আমি আর উনি বাইরে যাচ্ছি। এ ক'টা দিন সুযোগ-সুবিধে মতো যদি আমাদের ফ্ল্যাটের দিকে একটু নজর রাখেন, তা হলে বড় উপকার হয়।

কেন, দরজায় তালা দেননি বুঝি?—অরোরার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

(এই রে! গবেটটা লক্ষই করেনি কত কায়দা করে আমি দরজায় তালা দিলাম। নাকি ব্যাটা নকল চাবির কথা জানে না?)

হ্যাঁ, দরজায় চাবি দিয়েছি। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, চোর নকল চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকেছিল, তাই।

তা হলে এক কাজ করুন না, আমি কড়া আর শেকল দিয়ে দিচ্ছি—ছুতোরমিস্তিরি ডাকিয়ে শেকলটা লাগিয়ে নিন, আর তাতে একটা তালা লাগিয়ে দিন।—অরোরা ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোতে গেল। সম্ভবত শেকল আর কড়া আনার জন্যে। আর ঠিক তখনই ইলা দেখতে পেল অরোরার হাতে কোনও ঘড়ি নেই।

ও নিশ্চিন্ত হয়ে অরোরাকে বাধা দিল, না-না, আপনার কষ্ট করার দরকার নেই। বাইরের ঘরে আমরা তেমন কিছু রেখে যাইনি। তা ছাড়া এখন তো আর সময়ও নেই।

পাঁচটা বাজে—। বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল ইলা। আর একইসঙ্গে বন্ধ দরজার ওপিঠ থেকে ওদের দেওয়াল ঘড়ির চাপা ঢং-ঢং শব্দ ভেসে এল।

অনেকটা স্বস্তি পেল ইলা। বলল, ওই পাঁচটা বাজল। আর দেরি হলে ট্রেন ফেল করব। তা ছাড়া উনি স্টেশানে ওয়েট করছেন।

তা হলে এক কাজ করুন। আমাদের যে-বাচ্চা চাকরটা আছে, ওটাকে বলে দিই, এ ক'টা দিন আপনাদের ফ্ল্যাটেই ও রাত কাটাক। চোর-টোরের ভয় তা হলে আর থাকবে না।

(ড্যাম ইউ) না, না, শুধু-শুধু একটা বাচ্চাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? আপনি একটু নজর রাখলেই হবে। থ্যাংক ইউ।

অরোরার দিকে চেয়ে একটুকরো মিষ্টি হাসি জুড়ে দিল ইলা। তারপর হনহন করে এগিয়ে গিয়ে লিফটে উঠল।

ইলার পিছনটা জরিপ করতে-করতে 'ফ্যান্টাবুলাস!' বলে শিস দিয়ে উঠলেন অরোরা। তারপর দরজা বন্ধ করে, নিজের দজ্জাল বউকে বিয়ে করে যে কী ভুল করেছেন সে-কথা ভাবতে-ভাবতে ডিক্যান্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সকলের চোখ এড়িয়ে নিজের ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন পাঁচটা বেজে ন' মিনিট (অর্থাৎ, আসল সময় পাঁচটা বাজতে চোদ্দো মিনিট)। দরজা ঠেলতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দেখি ঘরের সোফায় ইলা বসে রয়েছে। আমাকে দেখেই ও ঘাড় হেলিয়ে জানাল সবকিছুই ঠিক আছে। তার মানে, পরিকল্পনার কোথাও কোনও চেঞ্জ হয়নি।

মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো জলের গ্লাসটা কোথায়?—চাপা গলায় ওকে প্রশ্ন করলাম।

রান্নাঘরে।—আস্তে জবাব দিল ইলা।

ঠিক এইসময় দরজায় সামান্য শব্দ হতেই আমি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। 'ম্যাজিক আই' দিয়ে তাকিয়ে দেখি, বাইরে নির্বিকার ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রাণকান্ত সমাদ্দার। অতএব সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে ওকে ভেতরে টেনে নিলাম। তারপর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। প্রাণকান্ত সোফায় এসে বসতেই আমি তিরিশটা দশটাকার বান্ডিল টেবিলের ওপর অবহেলা ভরে ছুড়ে দিলাম। প্রাণকান্ত স্থির লোভাতুর চোখ মেলে নোটের বান্ডিলগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

আমি এইবার আসল কথাটা উচ্চারণ করলাম, মিস্টার সমাদ্দার, মোট তিরিশহাজার আছে, দশহাজার টাকা বোনাস। আমাদের আপনি মুক্তি দিন।

প্রাণকান্ত কাঠ হয়ে বসেই রইল। লম্বা জিভটা বের করে শুকনো ঠোঁটে একবার বুলিয়ে নিল।

ইলা, মিস্টার সমাদ্দারের বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে।

ইলা বুঝল আমার ইঙ্গিত। ও চট করে রান্নাঘরে চলে গেল।

একটু পরে ও যখন জলভরা গ্লাসটা এনে সমাদ্দারের সামনে ধরল, সমাদ্দার স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো যান্ত্রিকভাবে গ্লাসটা নিয়ে পুরো জলটাই খেয়ে নিল। ওর স্বচ্ছ দৃষ্টি তখনও ওই টাকার স্তূপের দিকে।

বিপর্যয় ঘটল কয়েকসেকেন্ড পরেই।

প্রাণকান্ত মেঝেতে উলটে পড়ল। তারপর শুরু হল ওর ছটফটানি। দু-হাতে গলা খামচে ধরে সমাদ্দারের দেহটা ওলটপালট খেতে লাগল।

সেই মুহূর্তে শুরু হল আমার আর ইলার কাজ।

এক : দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটা ঠিক করলাম।

দুই : নোটের বান্ডলগুলো আবার সিন্দুকে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তিন : ইলা রান্নাঘর থেকে আরও কিছুটা মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো জল নিয়ে এসে টেবিলে রাখা আমার কয়েকটা পাণ্ডুলিপির ওপর সেই জল ছিটিয়ে দিয়ে বাকি জল টেবিলে ঢেলে দিল।

চার : প্রাণকান্তর জল খাওয়া গ্লাসটা রুমালে ধরে টেবিল থেকে তুলে মেঝেয় ফেলে দিলাম। গ্লাসট সশব্দে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

প্রাণকান্তর অবস্থা তখন ভয়ংকর। দু-হাতে ও হাওয়া আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। দেহটা ক্ষণে-ক্ষণেই খিঁচুনি মেরে কেঁপে উঠছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সাদা গ্যাঁজলা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বিষাক্ত প্রাণকান্তকে রেখে আমি আর ইলা চটপট ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম (তার আগেই নকল চাবিটা প্রাণকান্তর পকেটে গুঁজে দিয়েছি)। দরজায় চাবি দিয়ে সকলের চোখ এড়িয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সিঁড়ির দিকে।

আমার উত্তেজিত হৃৎপিণ্ড তখন আতঙ্কে ধুকপুক করছে। উত্তেজনা কমানোর জন্যে পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে মুখে পুরে দিলাম। নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। বেশি বয়েসে এত ঝক্কি পোয়ানো বোধহয় ঠিক হয়নি। সামনের রোববারের কথা ভেবে নাড়িভুঁড়ি যেন উলটে এল। নাঃ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণকান্তর বরফশীল বিকৃত মৃতদেহটা আমাদেরই আবিষ্কার করতে হবে।

ইলার দিকে একবার তাকালাম। ও কী ভাবছে, কে জানে! কিন্তু ওর মুখে আতঙ্কের লেশমাত্র ছায়াও কাঁপতে দেখলাম না।

রবিবার দিন অফিসের দেওয়াল-ঘড়ির সময় শুধরে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছলাম, হাতঘড়িতে (এখন ঘড়ি ঠিক সময় দেখাচ্ছে) তখন রাত আটটা। অফিসে গিয়ে সমর ফেরেনি দেখে আরও নিশ্চিন্ত হয়েছি। কারণ, আমার চেম্বারের দুটো চাবির একটা থাকে আমার কাছে, আর অন্যটি থাকে সমরের কাছে। সুতরাং ঘড়ির কারসাজি যে কেউ ধরে ফেলেছে এমন সম্ভাবনা নেই।

লিফটে উঠতে-উঠতে পাশে দাঁড়ানো ইলার দিকে তাকালাম। কী আশ্চর্য! ওর এতটুকু ভয়ডর নেই? সুখের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে ওর চোখে-মুখে।

ইলা, দরজা কি আমিই খুলব—?—ওকে জিগ্যেস করলাম। মনে ক্ষীণ আশা, যদি ও দরজা খুলতে রাজি হয়।

কেন, তোমার কি ভয় করছে?—ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল ইলা।

এ কোন নতুন ইলা? একটু অবাক হলাম।

যতই লিফট উঠছে দুদ্দাড় করে বেতালা ছুটে চলেছে হৃৎপিণ্ড। কখনও কি থামবে না এর অশান্ত গতি? নাকি ট্যাবলেট খেয়ে নেব একটা?

লিফট থামতে দুজনে করিডরে পা রাখলাম। পকেট হাতড়ে ফ্ল্যাটের চাবি বের করে বাগিয়ে ধরলাম। করিডরের আলো সোজা গিয়ে পড়েছে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়।

চাবি ঢোকাতে গিয়ে অবাধ্য ডানহাত বারকয়েক কেঁপে গেল। আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ইলা। দরজায় ওর ছায়া এসে পড়েছে।

কী হল, খোলো?—পেছন থেকে ইলার অধৈর্য স্বর ভেসে এল। কোনওরকমে চাবি ঘোরালাম। খট করে লকটা সরে গেল।

হাতের চাপে ধীরে-ধীরে খুলতে শুরু করল সেগুন কাঠের বার্নিশ করা দরজা।

ভেতরটা কালো অন্ধকার।

দরজা যতই খুলছে, করিডরের আলোর ফলা ততই চওড়া হচ্ছে ঘরের ভেতরে।

দরজা পুরোটা খুলতেই যে-দৃশ্য দেখলাম তাতে...।

অন্ধকার ঘরের আলোছায়ায় পড়ে রয়েছে প্রাণকান্ত। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে ওর দেহটা। দু-চোখ বিস্ফারিত। ধীরে-ধীরে ও উঠে দাঁড়াল। দু-হাতের দশ আঙুল শকুনের নখের মতো বাঁকিয়ে ঘৃণাভরে কুটিল চোখ নিয়ে টলতে-টলতে ও এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। নিষ্ফল আক্রোশে হাওয়া আঁকড়ে ধরছে ওর হাত। জীবন্ত শীতল মৃতদেহের মতো অনিশ্চিত পদক্ষেপে ও এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে রক্তপিপাসায়। কাছে—আরও কাছে...।

বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডটা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। লাফিয়ে উঠল গলা দিয়ে। মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছেয় শেষবারের মতো উন্মাদ হয়ে এসে আঘাত করল টাকরয়।

সেই মুহূর্তে পেছন থেকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল কেউ। হুমড়ি খেয়ে ছিটকে গেলাম প্রাণকান্তর আওতায়। ওর বাঁকানো নখসুদ্ধ দশ আঙুল আঁকড়ে ধরল আমার গলা...।

পুরো ব্যাপারটার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ভেবে ওঠার আগেই আমার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে ছিটকে পড়ল। তারপর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে।

অন্ধকার ঘরের ভেতর অমিত সান্যালের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়তেই ইলা ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিল। তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রাণকান্তর প্রসারিত হাতের বাঁধনে ধরা দিল: বিজন—বিজন!

ইলার মাথায় হাত বুলিয়ে বিজন বলল, ভয় পেয়ো না, ইলু সোনা। আমরা দুজনে মিলে এইমাত্র এই শতাব্দীর নিখুঁততম খুন এক্সিকিউট করেছি। ডাক্তার অমিত সান্যালকে হার্ট ফেলিয়োর কেস বলেই রায় দেবে, তাই না?

ইলা বিজনের বুক থেকে মুখ তুলল: তুমি এখন চলে যাও, নয়তো বিপদে পড়বে। আমি এদিকে ডাক্তার ডেকে ব্যাপারটার একটা শেষ ফয়সালা করে ফেলি।

হ্যাঁ, যাচ্ছি।—বলে বিজন সোফায় বসল: এই তিনদিন একটা বন্ধ ফ্ল্যাটে কাটাতে আমার ভীষণ বোর লেগেছে। অবশ্য তুমি যে রান্নাঘরে খাবারের স্টক রেখে যাবে, সেটা জানতাম।

ইলা হাসল: জানো, যখন তুমি শুধু জল খেয়ে পড়ে গিয়ে অভিনয় করতে শুরু করলে, তখন অমিত ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তা তো পাবেই। তবে আমি একটু ওভারঅ্যাকটিং করে ফেলেছি।

বিজন সেন এবার ওর পকেট থেকে একটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট বার করে ইলার দিকে এগিয়ে দিল: এই নাও, তোমার হতভাগা প্রথম স্বামীর কাগজখানা ফেরত নাও। কে জানত ছ'বছর আগে যে প্রাণকান্ত সমাদ্দার মারা গেছে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ের কাগজখানা এতদিন পরে হঠাৎ কাজে লাগবে! তবে ইলা, আমাদের একসঙ্গে তোলা এই ফটোখানা কিন্তু আমি ফেরত দিচ্ছি না।—বলে বিজন সেটা ইলাকে দেখাল।

রেখে দাও, কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু ওই ফটোটাকে প্রাণকান্ত আর আমার বলে চালাতে কে শিখিয়ে দিয়েছিল, স্যার?

হেসে ইলাকে কাছে টেনে নিল বিজন। ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, অমিত সান্যাল একটি গর্দভ। তোমার নতুন প্রেমিকের খোঁজ ও রাখেনি।

তূণের তির ফিরে আসে

সদর দরজার হাতলে খুব সাবধানে হাত রাখলাম। ধীরে-ধীরে হাতল ঘুরিয়ে চাপ দিলাম। সামান্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে দরজা খুলতে শুরু করল। সেইসঙ্গে চোখে পড়ল অন্ধকারের হাতছানি। রুণা সবসময় বাড়িটাকে কেন যে অন্ধকার করে রাখে আজও বুঝিনি। সেই বিয়ের পর থেকে এই তিনবছর ধরে রোজই দেখছি। প্রতিদিন রাত এগারোটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরি, তখনই আমাকে অভ্যর্থনা জানায় অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার-ঠাসা বাড়িতে রুণার রাজত্ব চলে। কোনও নিশাচর প্রাণীর মতোই ও অন্ধকারে দেখতে পায়। আশ্চর্য!

ভেতরে ঢুকে সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে থেকে ছিটকে আসা আলোর টুকরো বাইরেই থেকে গেল। সামনে ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ। আর সিঁড়ির মাথায় টিকটিক করে বেজে চলেছে বিশাল এক গ্র্যান্ডফাদার ক্লক।

পা টিপে-টিপে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। আলো জ্বালতে সাহস পেলাম না। মাঝামাঝি উঠেছি, হঠাৎ কানে এল রুণার চাবুকের মতো তীক্ষ্ন ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, ‘অয়ন!’

থমকে দাঁড়ালাম। পা দুটো কেউ যেন গেঁথে দিল সিঁড়ির ধাপে। তা হলে আজও রুণা আমাকে দেখতে পেয়েছে। এত সতর্কতা, এত সাবধানতায় কোনও কাজই হয়নি। আমার নার্ভের ওপর ও যেন জেঁকে বসছে। আর ওকে সহ্য করতে পারছি না।

‘অয়ন, ফিরতে এত রাত হল কেন?’

রুণার আবছা শরীরটা কি দেওয়াল-ঘড়ির ডায়ালের সাদা পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে? রোজ ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই একই প্রশ্ন ও দিনের-পর-দিন (প্রকৃতপক্ষে রাতের-পর-রাত) করে এসেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই আমিও দিতে পারিনি কোনও জুতসই উত্তর। আমার এই নেশাগ্রস্ত টলমল অবস্থায় রাত করে বাড়ি ফেরার যে একটাই মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, তা কি রুণা বুঝতে পারে না? ওর সঙ্গে থাকাটা আমার কাছে দিনকেদিন যে অসহ্য হয়ে উঠছে সেটা কি ওর মাথায় ঢোকে না? ও বোঝে না, এই বিবাহিত জীবন আমার কাছে দুর্বিষহ?

সব বুঝেও অবুঝের মতো এই অর্থহীন প্রশ্ন করে যাবে রুণা? একটুও রেহাই দেবে না আমাকে?

অন্ধকার সিঁড়ির আওতা পার হয়ে রুণার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। ওকে স্পষ্ট করে দেখতে না পেলেও ওকে বেশ টের পাচ্ছি। কাপড়ে খসখস শব্দ তুলে ও বলে উঠল,

'অয়ন, যদি এই মুহূর্তে তোমাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই তা হলে তোমার অবস্থাটা কী হবে জানো? তোমাকে জাস্ট না খেতে পেয়ে মরতে হবে।

ইচ্ছে হল, দু-হাতে রুণার নরম গলাটা চেপে ধরি। শেষ করে দিই ওর টাকার গুমোর।

কপর্দকহীনের প্রেম-ভালোবাসা মানায় না। একমাত্র রুণার প্ররোচনায় ও উৎসাহে কপর্দকহীন হলেও ওকে বিয়ে করেছিলাম। ওর বারবার বলেছিল, ওর টাকায় আমার নাকি সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আর আমিও এমন মহামূর্খ, সে-কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম।

রুণার সঙ্গে যেভাবেই হোক আমার একদিন আলাপ হয়েছিল এবং তারই পরিণতি এই বিয়ে। রুণার তুলনায় আমি সত্যিই পথের ভিখিরি। এই বিশাল জবচার্ণকী প্রাসাদ ছাড়াও রুণার প্রায় দশলাখ টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে পচছে। আত্মীয়স্বজনের ঝামেলা আমার নেই। তবে রুণার কোন এক বুড়ি পিসি নাকি এখনও যমরাজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। অবশ্য এখানে নয়, শিলিগুড়িতে। তাঁর সঙ্গে রুণার কখনও-সখনও ফোনাফুনি বা চিঠি চালাচালি হয়।

বিয়ের পর থেকেই কীভাবে যেন আমাদের প্রেম-ভালোবাসা শুকিয়ে গেছে। তারপর কোন এক অজানা কারণে শুরু হয়ে গেছে টাকার খোঁটা। উঠতে, বসতে, খেতে—সবসময় খালি ওই একই কথা। আমি যে নিষ্কর্মার ঢেঁকি, অপোগণ্ড, অপদার্থ—ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ও রোজই আমাকে বিশদভাবে বোঝায়। তাই মধুচন্দ্রিমার মধু খুব বেশিদিন আর মিষ্টি থাকেনি। আমি সোজা পথ থেকে ক্রমেই পিছলে গেছি। আর রুণা ধীরে-ধীরে অন্ধকারকে ভালোবেসে ফেলেছে। আমাদের দুজনের মাঝের ফাঁকটা ভীষণ চওড়া হয়ে গেছে।

'কী হল আমার কথার জবাব দিলে না যে? বউয়ের টাকায় খাও-পরো, এতটুকু লজ্জা করে না? যাও, যেখানে এতক্ষণ ছিলে সেখানেই ফিরে—।'

রুণা হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু বলতে পারল না। কারণ অন্ধকারেই ওর গলার অবস্থান আন্দাজ করে বাড়িয়ে দিয়েছি আমার পেশিবহুল দুটো হাত। নির্ভুলভাবে আমার দু-হাতের দশ আঙুল কেটে বসেছে ওর গলার কোমল মাংসে। অন্ধ আক্রোশে আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। হাতের আঙুলের চাপ বাড়াতে লাগলাম। জোরে। আরও জোরে...।

রুণার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল। ক্রমশ অবশ হয়ে ও লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। সেইসঙ্গে ওর গলা আঁকড়ে আমিও ওর ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

একসময় গলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাতে আঠালো অনুভূতি। রুণার মুখ দিয়ে কি রক্ত বেরিয়েছে? চারপাশের নিস্তব্ধতার পরতে কেটে বসছে দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দের ছুরি। এতটুকু ক্লান্তি নেই।

রুণার খুনের জন্যে নিজেকে মোটেই অপরাধী মনে হল না। কারণ, আমার চোখে ও বহুদিন ধরেই মৃত। সম্ভবত সেইজন্যেই আমার মনে কোনও দাগ পড়ল না। বেশ ঠান্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করলাম: এখন কী করব? কোন পবিত্র জায়গায় লুকোলে রুণার ডেডবডি কেউ খুঁজে পাবে না?

আশ্চর্য ব্যাপার, ওই অন্ধকারে রুণার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার এতটুকুও অস্বস্তি হল না। এমনকী সিঁড়ির আলোটা পর্যন্ত জ্বালার চেষ্টা করলাম না।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল এডগার অ্যালান পো-র লেখা দুটো গল্পের কথা। একটাতে ছিল কীভাবে একজন লোক তার স্ত্রীকে দেওয়ালের পেছনে সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে ফেলেছিল। আর দ্বিতীয় গল্পটাও অনেকটা সেইরকম। তবে দুটোই গল্পেই অপরাধী ধরা পড়েছে তার নির্বুদ্ধিতায়, মানসিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে।

এই গল্প দুটোর কথা মনে পড়ার কারণ, আমার প্ল্যানের সঙ্গে এই গল্প দুটোর সাংঘাতিক মিল আছে। রুণা বাড়ির নীচের তলাটা সারানোর জন্যে অনেক সিমেন্ট আর বালি এনে রেখেছিল। এখন সেগুলোকেই আমি কাজে লাগাব।

সুতরাং, আর দেরি না করে রুণার দেহটা কাঁধে তুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। পেছন থেকে ভেসে আসতে লাগল দেওয়াল-ঘড়ির টিক-টিক : যেন আমাকে ব্যঙ্গ করছে।

আমি আর রুণা দুজনে দোতলাতেই থাকতাম। যার ফলে নীচতলার ঘরগুলো ব্যবহারই করা হত না। তাই একতলায় বসবার ঘরে রুণাকে রেখে গাঁইতি আর কোদাল আনতে ছুটলাম।

বসবার ঘরের মেঝেটা সারানো হবে বলে ভাঙাই ছিল। খুব সাবধানে গাঁইতির চাড় দিয়ে সিমেন্ট বালি খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরি করতে লাগলাম। মৃত রুণা শূন্য ফ্যাকাসে দৃষ্টি মেলে ওর স্বামীদেবতার ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। জানলা দিয়ে সূর্যের আলো সরাসরি মুখে এসে পড়তেই চোখ খুললাম। তাড়াতাড়ি উঠে হাতঘড়িতে নজর দিলাম: সাড়ে ন'টা। রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল বসিয়ে ভাবতে শুরু করলাম, এরপর কী করব? পাড়াপড়শিরা জানতে চাইবে রুণা কোথায় গেছে। কী বলব ওদের? তার ওপর রয়েছে সেই হতচ্ছাড়া বুড়ি পিসি!

বাড়িতে এসে কেউ যদি একতলার বসার ঘরের মেঝেটা দ্যাখে, তবে কিছু বুঝতে পারবে এমন সম্ভাবনা কম। আর, যদিও বা কিছু সন্দেহ করে, তা হলেও ভয়ের কোনও কারণ নেই! কেউ তো আর খুঁড়ে দেখতে যাচ্ছে না, রুণার বডি ওর নীচে রয়েছে কি না?

রুণার বেড়াতে যাওয়ার কোনও জায়গা ছিল না। দিনরাত শুধু বাড়িতেই পড়ে থাকত। অতএব রুণা বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছে এ-কথা বলাটা ঠিক হবে না। বরং রুণার অসুখ করেছে বললে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি এই কাল্পনিক অসুখেই ও মারা যাবে। তারপর ওর মৃতদেহ (মানে, ডামি) রাতবিরেতে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলার ভান করা যাবে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ঠিক করলাম রুণার অসুখের কথাটা আজই একটু-আধটু রটিয়ে দেব।

জামাকাপড় পরে যখন অফিসে বেরোচ্ছি, দেখা হয়ে গেল পাশের বাড়ির রত্নাকর সেনের সঙ্গে।

'কোথায় চললেন? অফিসে বুঝি?' একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ। না গিয়ে আর উপায় কী! যাওয়ার তো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বড়সাহেবের অর্ডার, এখন কাজের চাপ—বেশি কামাই চলবে না।'

‘কেন, যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না কেন?’ উৎসুক হলেন রত্নাকর সেন।

যা ভেবেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই কাজ হচ্ছে। নিজের অভিনয়ের প্রশংসায় মনে-মনে পঞ্চমুখ হয়ে বললাম, ‘না,—এই...রুণার শরীরটা আজ খুব ভালো নেই।’

‘কেন, কী হয়েছে আপনার ওয়াইফের?’

‘না, সেইরকম কিছু নয়...শুধু গা ম্যাজম্যাজ—মাথাধরা—এই আর কী!’

আমার বিষণ্ণ স্বরে ভদ্রলোক মুখে একটা বিষণ্ণভাব ফুটিয়ে তুললেন। তারপর সহানুভূতির সুরে বললেন, ‘এইসব জ্বর-জারি আজকাল লেগেই আছে। বলেন তো আমার ওয়াইফ গিয়ে একটু—।’

‘না, না, তার কোনও দরকার নেই। রুণা এখন একা বিশ্রাম করছে। কেউ ওর বিশ্রামে ডিস্টার্ব করুক, ও চায় না। দরকার হলে ও নিজেই ডাকবে আপনাদের। আচ্ছা চলি—।’

হনহন করে হেঁটে এগিয়ে চললাম। আমার যেটুকু দরকার ছিল সেটুকু কাজ হয়ে গেছে। এখন এই রত্নাকর সেনের মুখ থেকেই সারা পাড়া জেনে যাবে রুণা অসুস্থ। তারপর এক-একটাদিন পেরোবে, রুণার অসুখ আরও কঠিন হবে। অবশেষে...ধীরে-ধীরে...মৃত্যু!

সন্ধেবেলা (রুণা তো আর নেই! সুতরাং, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে ক্ষতি কী?) বাড়ির ফেরার পথে রুণার পিসিকে ফোন করে বললাম, রুণার সামান্য জ্বর মতন হয়েছে—সঙ্গে প্রবল মাথা ঘোরা। তবে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই—দু-একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। আপনি ভালো আছেন তো? রুণা সেরে উঠেই আপনাকে চিঠি লিখবে, ফোন করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাড়িতে ফিরে একা সময় কাটাতে আমার মোটেই খারাপ লাগছে না। কয়েকটা ম্যাগাজিন উলটেপালটে সময় কাটিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

রোজকার মতো আমি যেন রাত বারোটায় বাড়ি ফিরেছি। তারপর বসবার ঘরের মেঝেটা কেমন আছে দেখার জন্যে গিয়ে দেখি, মেঝের সারানো জায়গাটা ফেটে চৌচির। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে রুণার ফ্যাকাসে মুখ। ও সেই একইভাবে শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে। আমাকে দেখেই ওর ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল। ও যেন বলে উঠল, ‘অয়ন, ফিরতে এত রাত হল কেন?’

চমকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। আতঙ্কে সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। মাথাটা যেন লোহার মতো ভারী। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে অন্ধকার সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করলাম। বসবার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। মেঝের বাঁধানো জায়গাটা সেই একইরকম আছে। এতটুকু বদলায়নি। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ফিরে গেলাম শোওয়ার ঘরে। সকাল সাতটার আগে আর ঘুম ভাঙল না।

এইভাবে দিন যায়। আর সেইসঙ্গে রুণার অবস্থাও খারাপের দিকে যেতে থাকে। পাড়ার প্রতিবেশীদের বলেছি, ডাক্তারের নির্দেশ, রুণার বিশ্রাম প্রয়োজন। এই কথা বলে অতি কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি।

একদিন বাড়ি থেকে বেরোতেই পাশের বাড়ির দরজা থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকল, ‘এই যে অয়নবাবু, শুনছেন?’

ইন্দিরা সেন। রত্নাকর সেনের স্ত্রী।

‘আমায় কিছু বলছেন?’ যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম।

‘হ্যাঁ, বলছিলাম, দু-সপ্তাহ হয়ে গেল রুণাকে দেখছি না। কী ব্যাপার?’ ভদ্রমহিলার গলায় সন্দেহের সুরটা চাপা নেই। আর আশ্চর্য, মাত্র আটদিন হতে না হতেই বলে দু-সপ্তাহ। তা হলে তো আর ক’দিন পরেই বলে বসবে, ‘আপনি রুণাকে খুন করেছেন।’

‘না, ওর শরীরটা খুব একটা ভালো নেই কিনা, তাই—।’

ইন্দিরা সেনের মুখে সহানুভূতির ছায়া পড়ল।

যত্ত সব! আমার বউয়ের জন্যে তোমার দরদ দেখছি উথলে উঠছে। সবার ব্যাপারে খালি নাকগলানোর স্বভাব! এর পরেই হয়তো জানতে চাইবে...।

‘আপনি তো বেরিয়ে যাচ্ছেন। বলেন তো, আমি রুণার কাছে গিয়ে বসি—?’

সর্বনাশ করেছে! এ কী গায়ে পড়া আদিখ্যেতা!

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ‘না, না—তার কোনও দরকার নেই।’

‘ওর কি খুব শরীর খারাপ?’

‘ঠিকমতো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।’

‘ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?’

মেয়েটা হয়তো ভাবছে, অয়ন রায় ওর স্ত্রীকে মারধোর করে বিছানায় ফেলে রেখেছে, তাই ডাক্তার ডাকতে ভয় পাচ্ছে। আশ্চর্য মানুষের মন!

‘হ্যাঁ দেখিয়েছিলাম। তিনি বলছেন, রুণার হান্ড্রেড পারসেন্ট বিশ্রাম প্রয়োজন। চুপচাপ শুধু আরাম করবে—আর কিছু নয়।’

‘আমি বরং একটু পরে একবার রুণার কাছে যাব। যদি ওর কোনও ওষুধ-টষুধের দরকার পড়ে।’

‘না, না, না—আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন—?’ আপত্তিটা একটু বেশি জোরালো হয়ে গেল না?’ ওঃ, কী যে হল আমার! একটু ঠান্ডা মাথায় জবাব দিতে পারছি না কেন?

‘আপনার ব্যস্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি রুণাকে দেখাশোনা করছি। ওকে ওষুধ খাইয়েই আমি অফিসে যাচ্ছি। ও এখন শুধু ঘুমোবে। অপেক্ষাকৃত ভদ্রস্বরে ইন্দিরা সেনকে নিরাশ করলাম।

‘কিন্তু আপনি অফিসে চলে যাচ্ছেন। ও একা অত বড় বাড়িটায় থাকবে...তাই—।’

‘না, ভাবছি একজন নার্স রাখব।’ ঝটিতি বলে উঠলাম। কিন্তু না বলেও তো কোনও উপায় ছিল না!

এইবার একগাল হাসি হাসলেন ইন্দিরা সেন। সন্দেহের হাসি নয়, কোনও প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গ হাসি। কারণ, সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কথাটাই আমি ওঁকে বলেছি: একজন নার্স রাখব। বলে যখন ফেলেছি, একজন নার্স আমাকে রাখতেই হবে। না হলে কোনদিন দেখব ইন্দিরা সেন আমার বাড়িতে ঢুকে রুণাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ভেবে দেখলাম, একজন নার্স রাখলে মন্দ হয় না। তাকে বলে দেব রুণার ঘরে যেন কক্ষনও না ঢোকে, ডাক্তারের বারণ—তা হলেই হবে। আর, নার্স রাখার পর রুণার

ব্যাপারটা নিয়ে একটু ধীরেসুস্থে চিন্তা করতে পারব।

বহু চিন্তা-ভাবনার পর কাগজে নার্স চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলাম। সেইসঙ্গে বাড়ির কাজকর্ম, রান্নাবান্না এসবও যে করতে হবে, তাও লিখলাম।

পরদিনই সন্ধেবেলা একটি মেয়ে দেখা করতে এল। তার একহাতে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগ, অন্যহাতে ভাঁজ করা একটি খবরের কাগজ। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল, 'এই বিজ্ঞাপনটা কি আপনিই দিয়েছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম সীতা দাশগুপ্ত। এই চাকরিটার জন্যেই আমি দেখা করতে এসেছি।'

এইবার মেয়েটিকে ভালো করে দেখলাম: যুবতী, অবিবাহিতা এবং সুন্দরী। দেখে বেশ পছন্দই হল। তা ছাড়া, কথাবার্তাও বেশ স্মার্ট এবং মার্জিত।

একটা মোটামুটি ইন্টারভিউ নিয়ে মেয়েটিকে ভালো মাইনেতে চাকরিতে বহাল করলাম।

সীতা রোজ রান্না করে। আর আমি খাবার সাজানো থালা দুটো নিয়ে রুণার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। একা-একাই কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাই। যাতে সীতা মনে করে ঘরে আমি ছাড়াও রুণা রয়েছে। অবশেষে দুটো থালা চেটেপুটে শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসি। এঁটো থালা দুটো নিয়ে যাই রান্নাঘরে।

সীতাকে বলে দিয়েছি, কখনও যেন ও রুণার ঘরে না ঢোকে। কারণ, তাতে রুণা বিরক্ত হয়। আমার কথাগুলো ও বেশ সরল মনে মেনে নিল। কারণ, ঠিকঠাক মাইনে পেলে বসের কথার অবাধ্য কেউ হয় না।

রুণার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল (?)। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলল। বেশ বুঝলাম, এ ক'দিনে সীতাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এবং আমার প্রতি সীতার ব্যবহারও যেন স্নেহ-মমতা মাখানো। প্রথম-প্রথম ও আমাকে করুণার চোখে দেখত। অসহায় নিঃসঙ্গ স্বামী বলে আমাকে মাঝে-মাঝে সমবেদনা জানাত।

একদিন ঝোঁকের মাথায় ওকে বলেই ফেললাম, 'সীতা, আজ আমরা একটা সিনেমা দেখতে গেলে কেমন হয়?'

খুব রূঢ় একটা জবাব আশা করেছিলাম, কিন্তু ওর উত্তর আমাকে অবাক করল, 'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মিসেস রায় একলা থাকবেন—।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি পাশের বাড়ির মিসেস সেনকে বলে দেব, তিনি রুণার কাছে থাকবেন।' মনের আনন্দ গোপন করার চেষ্টা করলাম না। সীতাও উৎফুল্ল মনে রাজি হল।

সেই যে 'মিসেস সেন' রুণাকে 'দেখাশোনা' করতে লাগলেন তার জের আজও চলছে।

একদিন সীতা হঠাৎ বলেই ফেলল, 'অয়ন, তোমার ওয়াইফ আজ কেমন আছে?'

'সেই একই। জাস্ট বেঁচে বিছানায় পড়ে আছে। কবে মরবে কে জানে?'

আমাদের বিরক্তি বেড়েই চলল। কিন্তু সীতাকে সব খুলে বলতে সাহস পেলাম না। এখনও সেই দু-থালা খাবার নিয়ে দু-বেলা রুণার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসি। খাওয়া শেষ

হলে দুটোই থালাই দিয়ে আসি রান্নাঘরে। সীতা রোজ বলে, ‘আমি আর ওয়েট করতে পারছি না, সোনা। যা হোক কিছু একটা তাড়াতাড়ি করো।’

পরদিন সকালে বন্ধ ঘরে বসে দু-থালা খাবার শেষ করছি আর ভাবছি সত্যিই তো, আর কতদিন পুরো ব্যাপারটাকে এভাবে ঝুলিয়ে রাখা যায়! যা হোক কিছু একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

যদি সীতাকে নিয়ে এখান থেকে পালাই, তা হলে কেমন হয়? রুণার ডেডবডি কারও পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। তিরিশ কী পঞ্চাশ বছর পর এই বাড়ি ভেঙে কেউ যদি নতুন বাড়ি তৈরি করতে যায়, তবেই একমাত্র রুণার মৃতদেহ—কিংবা ওর কঙ্কাল—বেরিয়ে পড়তে পারে। নয়তো নয়।

এতে হয়তো রুণার খুনের দায় থেকে রেহাই পাব, কিন্তু পেছনে ফেলে যেতে হবে এই বাড়ি আর ব্যাঙ্কের দশ লক্ষ টাকা। কারণ রুণা যে মারা গেছে, সে-কথা প্রমাণ না হলে, আমি কিছুই পাব না। এতগুলো টাকা ছেড়ে দেব?

রুণাকে মৃত প্রমাণ করতে গেলেও ঝামেলা আছে। আগে ভেবেছিলাম ‘ডামি’ দিয়ে কাজ চালাব। কিন্তু তা হলে ‘ডেথ সার্টিফিকেট’ পাব কোত্থেকে? এইসব নানান কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা মতলব আমার মাথায় এল। যদি রুণার বদলে সীতাকে শ্মশানে নিয়ে যাই, তা হলে? কোনও সৎকার সমিতিকে দিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করাব। আর অচেনা এক ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে সীতাকে দেখিয়ে ‘রুণা রায়’ নামে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেব। তা হলে কেউ জানতেই পারবে না রুণার বদলে সীতাকে সৎকার করা হয়েছে। তখন ওই বাড়ি, দশ লাখ টাকা, সব হবে আমার—শুধু আমার।

এখন তা হলে আসল কাজ হল সীতাকে খুন করা। এঁটো থালা দুটো রান্নাঘরে গিয়ে ফেরত দেওয়ার পর আচমকা ওর গলা টিপে ধরলেই হবে। রান্নাঘরের শব্দ বাড়ির বাইরে একেবারেই শোনা যাবে না। এইসব ভাবতে-ভাবতে খাওয়া শেষ করে থালা নিয়ে বাইরে এলাম।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি সীতা অপেক্ষা করছে। আমি যেতেই কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ও বলল, ‘মিসেস রায় ঠিকমতো খেয়েছেন?’

কোনওদিন তো সীতা এ-প্রশ্ন করে না! আজ হঠাৎ?

‘হ্যাঁ। এই দ্যাখো—’ খালি থালা দুটো ওর মুখের সামনে নামিয়ে হেসে উঠলাম।

‘অয়ন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?’

একটু অবাক হলাম: ‘হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন, সীতা। তুমি তো জানো আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। এই তো, খেতে-খেতেই তোমার কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, তোমার আর আমার ফিউচারের কথা।’

‘রুণা মারা গেলে, তুমি কি এখনকার মতোই আমাকে ভালোবাসবে?’

‘তার চেয়েও বেশি ভালোবাসব।’

'তা হলে, সেসময় আসতে আর বেশি দেরি নেই, সোনা।' সীতা আমার কাছে ঘন হয়ে এল।

'তার মানে? চমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

সীতা একবার খালি থালা দুটোর দিকে দেখল। তারপর আমার চোখে চোখ রাখল: আজ রুণার খাবারে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। ওকে আর বেশিক্ষণ কষ্ট পেতে হবে না।' কথা শেষ করে হাতঘড়ি দেখল সীতা।

হঠাৎ এক প্রবল ঝাঁকুনিতে আমার সারা শরীর খিঁচিয়ে উঠল। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠতে লাগল। গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসছে। মুখের ভেতরটা বড় বিস্বাদ ঠেকছে। জিব জড়িয়ে এলেও কোনওরকমে উচ্চারণ করলাম, 'সীতা—সীতা—!' তারপরই যেন হাঁটুর জোড় খুলে গিয়ে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়লাম। বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! ওঃ...।

নষ্ট চাঁদ, কষ্ট চাঁদ

গল্পের নামটা ভালো হল না—তাই না রে? আসলে কবিতা-কবিতা করতে চেয়েছিলাম—কেমন যেন গদ্যের আঁশটে গন্ধ ঢুকে পড়ল। যাকগে। আসলে এটা তো আর গল্প নয়—তোকে লেখা শেষ চিঠি। কিন্তু তুই কি আর চিঠিটা পড়বি—মানে, পড়তে পারবি?

মনে পড়ে, সেটা ছিল শ্রাবণ মাস। তোর ভালোবাসার দোকানে আমি কী করে যেন ঢুকে পড়েছিলাম। হ্যাঁ—দোকানই তো! যেখানে সবসময় তোর ভালোবাসা চাওয়ার এত ভিড়। সুজাতা, বন্যা, তিতি, অনিতা—আরও কারা-কারা যে তোর সঙ্গে ঘুরতে চাইত, থাকতে চাইত কে জানে!

না, আমি চাইনি। কারণটা তো তুই জানিস। আমার গায়ের রং কালো, রূপও কালো। কখনও কেউ ঘুরে তাকাবে না—এমন মেয়ে আমি। তুই যেমন এটা জানিস আমিও তো জানি। জানব না আর! রোজ হতচ্ছাড়া আয়নাটা যে আমাকে জানিয়ে দেয়!

যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম, যখন বড় হব—আরও বড় হব—তখন এই আজেবাজে চেহারাটা একটু-একটু বদলে গিয়ে কমবাজে হয়ে যাবে। সেই 'আগলি ডাকলিং'-এর মতো। তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই তাকাবে। আমার বাপি, মামণি আর কাকিমা-জেঠিমারা আমার বিয়ে হবে-কি-হবে না সেই নিয়ে কী চিন্তাই না করত! অবশ্য আমার সামনে কিছু বলত না। কিন্তু আড়াল থেকে আমি শুনতাম। আর আমার কান্না পেত। ওঃ, একটা মেয়ের জীবনে পুরুষ এত জরুরি! কেন, কেন?

পড়াশোনায় খারাপ ছিলাম না—ভালোই ছিলাম। নইলে তোর সঙ্গে সায়েন্স কলেজে দেখা হল কী করে! তুই লেখাপড়ায় আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো। আর দেখতে? তুই যে কেন সিনেমায় কিংবা টিভি সিরিয়ালে গেলি না কে জানে! সুজাতা, বন্যারা তোকে বারবার সে-কথা বলত। অবশ্য তুই আমাকে পরে বলেছিলি ওগুলো তোকে খুশি করার জন্যে।

বাইরে আমাকে দেখতে যা-ই হোক আসলে ভেতরে-ভেতরে আমি তো একটা মেয়ে। তখন রোজ ভাবতাম, 'বিউটি ইজ ওনলি স্কিন ডিপ।' চামড়া ডিঙোলেই সৌন্দর্য শেষ। তা হলে কেন? কেন এরকম হবে? তোরা—মানে, পুরুষরা—শুধু বাইরেটাই দেখবি? ভেতরের সুন্দরকে দেখবি না! তুই তো তখন জানতি না ভেতরে-ভেতরে আমি কী আশ্চর্য রূপসী।

আমি মনে-মনে ভাবতাম, বরফে ঢাকা পাহাড়চূড়ায় ভোরের আলো এসে পড়লে যেমন অপরূপ দেখায়, আমি সেইরকম। শীতের পর বসন্ত এলে মরাগাছের ডালে যখন ঝকঝকে সবুজ নতুন পাতা ফোটে—ওদের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি ওদের মতন। কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ যেমন ডালে-ডালে ফুলের আগুন জ্বালিয়ে রূপসজ্জায় সবাইকে মাতিয়ে দেয়, আমি সেইরকম।

তো এইসব ভাবতাম আর বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে শব্দ না করে কাঁদতাম। নইলে পাশের ঘরে শুয়ে থাকা বাপি আর মামণি শুনতে পাবে যে!

আমার কল্পনা আমার ছিল। আমার স্বপ্ন আমার। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! একটা কাগজের গোল বল সব তালগোল পাকিয়ে দিল।

মনে আছে নিশ্চয়ই তোর, সেদিন আমরা সবাই মিলে টিএসপি-র ক্লাস করছিলাম। উনি জের্যান্টোলজির মেন্টাল এজিং নিয়ে কীসব বকবক করছিলেন। আমি মন দিয়ে শুনতে পারছিলাম না। কারণ, গতকাল ক্যান্টিনে বন্যা একটা কমেন্ট করেছিল। হয়তো ঠাট্টা করেই—কিন্তু সেটা আমাকে খুব বিঁধেছিল।

আমি তখন গৌরদার ক্যান্টিনে সেকেন্ড দরজা দিয়ে ঢুকছি। তোরা লম্বা বেঞ্চটায় বসে কী দিয়ে যেন হাসাহাসি ঢলাঢলি করছিলি। আমাকে দেখেই বন্যা হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, অ্যাই, আলো জ্বলে দে—মিস ডার্কনেস এসে গেছে!

তখন ঘোর দুপুর। আলো জ্বালার কোনও প্রশ্নই নেই। সুতরাং, বুঝতেই পারছিস—আমি এসেছি বলে কেন আলো জ্বালতে হবে।

তাই ক্লাসে বেশ অন্যমনস্ক ছিলাম। তাকিয়েছিলাম টিএসপি-র দিকে, কিন্তু শুনছিলাম না কিছুই। হঠাৎই কী একটা যেন গায়ে এসে লাগল। মাথা ঘুরিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা কাগজের বল। ক্লাসে যেমন ছোড়াছুড়ি হয় আর কী! কিন্তু আমার গায়ে কেউ কখনও ছোড়েনি।

'অপরাধী'র খোঁজে তাকাতেই তোকে দেখলাম। তুই একটু-একটু হাসছিলি। আমি ভাবলাম, ব্যাপারটা তোর কাজ। কিন্তু তুই হঠাৎ আমার গায়ে কেন কাগজের বল ছুড়বি এর উত্তরটা কোনও যুক্তিতেই মাথায় আসছিল না। কিন্তু তুই হাসছিলি। আর আমি তোর দিকে তাকাতেই চোখের ইশারায় বললি, পরে কথা হবে।

চাপতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুকের ভেতরে পাগল-করা একটা ঢেউ উঠল। আমাকে ভিজিয়ে দিল, ভাসিয়ে দিল। মনে হল, একটা অলৌকিক স্বপ্ন যেন কোন ম্যাজিকে জ্যান্ত হয়ে হঠাৎ করে ক্লাসরুমে নেমে এসেছে।

পরে তোর সঙ্গে কথা হল। প্রথমে ক্যান্টিনে—তারপর রাস্তায়। ক্যান্টিনে আরও অনেকে ছিল...কিন্তু রাস্তায় আর-কেউ ছিল না। শুধু তুই, আর আমি। আমাদের পাড়ার কোন একটা দোকানের ঠিকানা খোঁজ করার ছুতোয় তুই আমার হেলপ চেয়েছিলি। এই ছুতোটা হয়তো শুধু আমার জন্যে নয়—বন্যা, তিতি, সুজাতাদের জন্যেও। বেশ মনে আছে, ওরা বেশ অবাক চোখে তোর দিকে তাকিয়েছিল।

রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে তুই যে কত কথা বলেছিলি! খইয়ের বস্তার মুখ আচমকা ছিঁড়ে হাট হয়ে গেলে যেভাবে খই ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেভাবে তোর কথাগুলো শব্দের বন্যা হয়ে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

মনে আছে, অনেক কথার মাঝে তুই আমাকে ফস করে বলেছিলি, তুই সবসময় পাঁচিল দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখিস কেন? কারও সঙ্গে কথা বলিস না—সরে-সরে থাকিস...।

কী মারাত্মক কথা! তুই কী করে এটা বুঝলি কে জানে! সত্যিই তো, আমি সবসময় নিজেকে আড়াল করে রাখি। ছেলেদের সঙ্গে মিশি না। অথচ মিশতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওরা যদি আমার এই হতচ্ছাড়া চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করে! ঠাট্টার খোঁচা কখনও দিয়ে ফ্যালে আমায়! অথচ দ্যাখ, বাইরের চেহারার ওপর কারও কি কোনও হাত থাকে? ওটা তো 'আকাশ' থেকে আসে। তাই আমি যে কত যত্ন নিয়ে আমার ভেতরটা সাজিয়েছি—রোজ সাজাই—তার খবর কে রাখে!

তুই আবার বললি, অনেক চেষ্টা করে তারপর তোর ভেতরটা আমি দেখতে পেয়েছি। তোর ভেতরে-ভেতরে এত!

কী সর্বনেশে কথা! আমি আর কোনও কথা বলতে পারিনি।

প্রথমদিনের পর তোর আর আমার দেখা হওয়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। এতে আশপাশে যে 'ফিসফাস' হচ্ছে সেটা টের পাইনি এমন বোকা আমি নই। একদিন বন্যা যে চাপা গলায় অনিতাকে বলেছিল, শালা ব্যাপক কম্বিনেশান!—সেটাও আমার কানে এসেছিল। কিন্তু আমি তখন অন্ধ। 'নিঃশব্দ চরণে' যে এসেছে তাকে আমি পাগলের মতো আঁকড়ে ধরেছিলাম। মনে-মনে বলেছিলাম, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না।

কবিতা লেখার অসুখ ছিল আমার। কিন্তু লুকিয়ে-লুকিয়ে। ভাবতাম কালো কুৎসিত মেয়ের আবার কবিতা! একটা কাল্পনিক লজ্জা, একটা কাল্পনিক অপমানের ভয়, একটা কাল্পনিক সংকোচ আমাকে সেই বালিকা বয়েস থেকেই শামুকের মতো গুটিয়ে দিয়েছিল। একদিন, দু-দিন, তিনদিনে তুই সেই খোলসটাকে চুরমার করে দিলি। লুকোনো কবিতা সামনে এসে গেল। তোর সামনে।

অবিশ্বাস্য হলেও তোর সঙ্গে আমার কী করে যেন কী হয়ে গেল। অনেকটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মতন।

শ্রাবণ গড়িয়ে ভাদ্র এল। আমি তোর নেশায় পাগল। আমার ছন্নছাড়া ছিন্নছেঁড়া জীবনটা তখন যেন একটু-একটু করে মানে খুঁজে পাচ্ছে। তুই আসা-যাওয়া করছিস আমাদের বাড়িতে। বাড়ির আবহাওয়াটা বদলাচ্ছে। মামণি আর বাপির চোখেমুখে চাপা স্বস্তির ভাব টের পাচ্ছি। হাহুতাশ আঁধারের মধ্যে ওরা যেন একটু আলো দেখতে পেয়েছে।

তোর নিশ্চয়ই সেদিনটার কথা মনে আছে? মানে, সেই রাতটার কথা। বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। আমাদের ফাটল-ধরা ছাদে দুজনে বসেছিলাম। তুই হঠাৎ বললি, চাঁদের আলোয় তোকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

কী করে আমাকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছিল জানি না। চাঁদের আলো কি অন্তর পর্যন্ত যায়? তাতে কি ভেতরের সৌন্দর্যটা ধরা পড়ে? তবে সেদিনটা বোধহয় নষ্টচন্দ্রের রাত ছিল। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থীর রাত। শুনেছি এই চাঁদ দেখলে কলঙ্ক হয়। হলও। যে-কলঙ্কের আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীর আর মন বহুবছর ধরে অপেক্ষা করেছে তুই আমার সেই আশ মেটালি।

প্রথমে হাতে হাত। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট। আর সবশেষে শরীরে শরীরে। সে রাতে আমি পূর্ণ হলাম। তৃপ্তি আর বিস্ময়ে সারাটা রাত ঘুমোতে পারিনি। পরদিন সায়েন্স কলেজে, সুযোগ পেতেই, তোর হাতে একটা আবছা নীল কাগজ ধরিয়ে দিলাম। তাতে একটা কবিতা লেখা ছিল। শুধু তোর জন্যে। তোকে লেখা আমার প্রথম 'চিঠি'। তার চারটে লাইন এই মুহূর্তেও আমার মনে পড়ছে:

ওষ্ঠাধরে কোমল নিপীড়ন,

সয়েছিলাম মধুর যন্ত্রণাতে—

স্পর্শকাতর আমার স্পষ্ট হাত,

রেখেছিলাম তোমার নষ্ট হাতে।

তুই আমাকে বলেছিলি, তোর নৌকোয় কোনও মাঝি ছিল না। অথচ ভাসতে-ভাসতে সেই দিশাহীন নৌকোটা কী করে যেন হঠাৎ তীর খুঁজে পেল। সত্যিই জীবন বড় আশ্চর্য!

তোর কথাটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। এ যেন আমারই মনের কথা—তোর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বিশ্বাস কর, আমি তখন মনে-মনে তোর সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলাম।

কিন্তু একদিন...।

জানি, এইখান থেকে চিঠিটা লিখতে আমার বেশ কষ্ট হবে। কিন্তু লিখতে তো আমাকে হবেই।

সেদিন জেসিএম-এর পিরিয়ডটা অফ ছিল। তো আমি লাইব্রেরিতে একটা বই চেঞ্জ করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে ক্লাসে ঢুকতে যাব—হঠাৎ শুনি তোর গলায় আমার নাম। ক্লাসের বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুই কী বলছিস আমার নামে? কাকেই-বা বলছিস? আমাদের দুজনের যা একান্ত গোপন কথা, যা শুধু আমরা দুজনই জানি—সেসব বলবি না তো?

শুনলাম তুই আমার নাম করে বলছিস, জানিস, ওকে সেদিন নামিয়ে দিয়েছি।

কে একজন জিগ্যেস করল, বস, নামিয়ে দিয়েছ মানে?

সালা ন্যাকা! কিছু বোঝে না!—তুই বললি, নামিয়ে দিয়েছি মানে ওর কেস কমপ্লিট। ছাদে চাঁদের আলোয় বোল্ড করে দিয়েছি।

তা হলে তো তুমি বস 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' প্রাইজ পাবে। ওরকম বিশখোবড়া থোবড়া তুমি ট্যাকল করলে কী করে?

তোর হাসির শব্দ পেলাম। তারপর তুই বললি, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিয়েছিলাম।

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল। ক্লাসরুমের কাছ থেকে ছুটে চলে যেতে চাইলাম। কিন্তু দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে মাথাটা সাংঘাতিক টলে উঠল। কোনওরকমে রেলিং ধরে সামলে নিলাম। বসে পড়লাম সিঁড়ির ধাপে।

ও মিথ্যে কথা বলছে! আমার মুখে ও মোটেই রুমাল চাপা দেয়নি। বরং আকাঙ্ক্ষার চরম মুহূর্তে ও আমার দিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু কে এখন বিশ্বাস করবে এ-কথা! কেউ না!

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সেই মুহূর্তেই মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু...কিন্তু তখন যদি আমি সুইসাইড করতাম তা হলে তোর মিথ্যেটাই যে চিরস্থায়ী হয়ে যেত! সে আমি হতে দিই কেমন করে!

সেদিনটা কাটল কোনওরকমে। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তুই আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে লাগলি। কিছুটা আমিও। পরপর কয়েকটা দিন চোখ-কান খোলা রেখে আরও কিছু খবর পেলাম। জানলাম যে, চারপাশে আড়াল তোলা কুৎসিত এই

মেয়েটাকে বোল্ড আউট করবি বলে তুই জয়জিতের সঙ্গে বিরিয়ানি বাজি রেখেছিলি। না, এই খবরটা নতুন করে কোনও ব্যথা দেয়নি আমাকে। এমনকী খবরটা সত্যি না মিথ্যে সেটা জানার জন্যেও কোনও আগ্রহ জাগেনি। শুধু ওই রুমালের মিথ্যেটা বুকের ভেতরে নিষ্ঠুর অপমানের ছুরি চালিয়েছিল।

তুই ভালো করেই জানতিস, নিজের ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স আড়াল করার জন্যে আমি সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেক্সের পাঁচিল তুলে দিয়েছিলাম আমার চারপাশে। আকাঙ্ক্ষায় কাতর এই অরূপ মেয়েটাকে সবাই ভাবত পুরুষবিদ্বেষী, অহঙ্কারী। আজ আর ভালো করে ঠাহর করতে পারি না, আমি তোর প্রেম স্টোর্সে ঢুকে পড়েছিলাম, নাকি তুই আমার পাঁচিলটাকে তোড়ফোড় করে আমার অন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিলি। স্রেফ একপ্লেট বিরিয়ানি খাওয়ার জন্যে।

এই মুহূর্তে সব আমার গুলিয়ে গেছে। শুধু ওই নৃশংস মিথ্যেটুকু সত্যি হয়ে আমার কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসছে। ক'দিন ধরেই শুনছি এই হাসিটা। আর হৃৎপিণ্ডের গা থেকে নখ দিয়ে খুঁটে ক্রমাগত নুনছাল তুলছে কেউ। জ্বালা—অসহ্য জ্বালা!

তাই আর সইতে না পেরে টেলিফোনে কান্নাকাটি করে তোকে একবারের জন্যে ডেকেছিলাম। বলেছিলাম, শেষবারের জন্যে। আর কোনওদিনও তোকে আসতে বলব না। এই একটিবার অন্তত আয়। ফর ওল্ড টাইমস সেক।

তুই এলি। সঙ্গে তোর রূপ, অহংকার আর মেয়েভোলানো আত্মবিশ্বাস।

সবকিছুই ছিল ঠিক সেদিনের মতো।

আকাশে নির্লজ্জ শুক্লচতুর্থীর চাঁদ। চারপাশে বৃষ্টিভেজা বাতাস। আর নির্জন ছাদের রহস্যময় অন্ধকার।

তুই সেদিনের মতো আবার বললি, চাঁদের আলোয় তোকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, জানি।

তারপর তুই আমায় জাপটে ধরলি। এবার কপালে বিরিয়ানি জুটুক-না-জুটুক, পড়ে পাওয়া চোদ্দোআনা হাতছাড়া করার কোনও মানে হয় না। তাই আবার তুই আমার 'কেস কমপ্লিট' করলি। ছাদে চাঁদের আলোয় আমাকে দ্বিতীয়বার বোল্ড আউট করলি তুই।

তারপর?

তারপর আমার পালা।

মাংসাকাটার ছুরিটা কোথায় লুকোনো ছিল তুই দেখতে পাসনি। কী করেই বা দেখবি! ওটার রং তো আমার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তা ছাড়া ওই রহস্যময় অন্ধকার।

তোর গলার নলি ফাঁক হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল আমার শরীর। তুই ছাদের ফাটল-ধরা রুক্ষ মেঝেতে ছটফট করতে লাগেলি। শেষবারের মতো চিৎকার করতে চেয়েছিলি বোধহয়—কিন্তু চিৎকারের কঙ্কালটা ঘড়ঘড় শব্দে গলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল।

আমি এবারে চাদরের নীচে লুকোনো ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম।

শোনা গেল তোর গাঢ় গলা : চাঁদের আলোয় তোকে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।

তোর বলা কথাগুলো মণিমুক্তো হয়ে ধরা রইল চিরকালের জন্যে। এই সত্যিটা এবার চিরস্থায়ী হল।

কিন্তু এখনও যে আমার আর-একটা কাজ বাকি!

তাই তোর স্থির-হয়ে-আসা শরীরের পোশাক হাতড়ে তোর রুমালটা বের করলাম। তুই তখন হাঁ করে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে। চাঁদও ভ্যাবাচ্যাকা মুখে তোকে দেখছে।

তোর মুখটা রুমালে ঢেকে দিলাম আমি। সুন্দর যেমন কুৎসিতকে ঘৃণা করে, কুৎসিতও তেমন ঘৃণা করতে পারে সুন্দরকে। এই যেমনি আমি এখন তোকে।

এইবার...এইবার আমার দ্বিতীয় সত্যিটা চিরস্থায়ী হল। কেউ আর একে পালটাতে পারবে না। তুইও না। তোর খোঁজে সবাই যখন আসবে, তখন দেখবে—আমার নয়, তোর মুখই রুমালে ঢাকা। আর তোর শরীরের পাশে রাখা টেপরেকর্ডারে শুনবে তোর শেষকথা। তোর শেষ সত্যি কথাটা।

এখন নীচের ঘরে এসে এই চিঠি লিখছি। খারাপ লাগছে চিঠিটা তুই পড়তে পারবি না বলে। কিন্তু এখন তোর আর কিছু করার নেই!

এবার আমি ছাদে যাব আবার। অন্ধকারে তোর পাশে শুয়ে পড়ব। তারপর রক্তাক্ত ছুরিটা আরও একটা গলার নলি ফাঁক করবে। বেশ হবে, তাই না? আমি আর তুই পাশাপাশি শুয়ে থাকব। আর আমি অপলকে নষ্ট চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকব...তাকিয়ে থাকব...।

দধীচি সংবাদ

আমার হাতে ধরা কিম্ভূতকিমাকার বস্তুটার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিম্ভূতকিমাকার লোকটা। গলার কণ্ঠাকে অতিকষ্টে কয়েকবার ওঠানামা করিয়ে প্রশ্ন করল, 'ওটা কী?'

'ঘূর্ণিকা।' শান্ত স্বরে জবাব দিলাম।

'ঘূ-ঘূ-উ-উর্ণিকা? হতভম্ভ সুরে সে বলে উঠল। তার কপালের কাটা দাগটা বারকয়েক কেঁপে উঠল।

বললাম, 'বিলিতি ভাষায় যাকে বলে রিভলভার—।'

'ও—' সে যেন এবার আশ্বস্ত হল 'আমি ভেবেছিলাম কী না কী।'

এবার অবাক হলাম আমি। বাংলা শব্দে ভয় পেয়ে তার ইংরেজি অনুবাদে আশ্বস্ত হয় এরকম লোক আমি অন্তত প্রথম দেখলাম। আমার রিভলভারটা সাধারণত কাপড়ের সরু প্যাড দিয়ে সর্বদা জড়ানো থাকে। তাতে শব্দও কম হয়, এবং আঙুলের ছাপটাপের বালাই থাকে না। সেইজন্যেই হয়তো লোকটা মালটাকে প্রথমে চিনতে পারেনি। এখন পারছে।

রিভলভারটা তাক করে ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, বলুন তো, এমন কোনও কারণ কি আপনার জানা আছে, যার জন্যে আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেই এখান থেকে চলে যাব?'

'আছে—আমি বাঁচতে চাই।' ঢোক গিলে সে বলল।

হাসলাম 'মানছি। কিন্তু আমিও যে বাঁচতে চাই—পুলিশের হাত থেকে। সুতরাং, আমার জন্যে আপনাকে প্রাণ দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। জানেন, দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে দধীচি মুনিও—।'

'আ—আমার নামও দধীচি—তালুকদার!' ভয়ে-ভয়ে তড়িঘড়ি বলে উঠল লোকটা।

'শুনে বড়ই প্রীত হলাম। কারণ, "দধীচির তনুত্যাগ" কবিতাটাও আমারই লেখা। আমার নাম কবি শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—' এবং গুলি করলাম।

তারপর ঝুঁকে পড়ে তুলে নিলাম টাকার থলেটা।

বাইরে আসতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে ছায়ার মতো বেরিয়ে এল ওরা চারজন। অবনী, নয়ন, পরাশর এবং রোশনলাল। আমি রিভলভার পকেটস্থ করে টাকার থলেটাকে হাতস্থ করে দোকানের দরজা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের প্রতীক্ষায় রইলাম। ওরা সর্তক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে, আমার কাছে এগিয়ে এল। চাপা গলায় প্রশ্ন করল রোশন, 'হেমদা, (আমার নাম সত্যিই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন) কোনও গোলমাল হয়নি তো?'

'না। গাড়ি কোথায়?'

'পাশের গলিতে।'

'চলো।' বলে আমি পা চালালাম। আমাকে অনুসরণ করল ওরা চারজন। যেতে-যেতে আড়চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, নয়ন আর পরাশর একটু যেন বিহ্বল দৃষ্টিতেই 'তালুকদার স্টোর্স' দোকানটার দিকে চেয়ে আছে।

কালো অস্টিনটার কাছে পৌঁছে বহুদিনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দরজা এক হ্যাঁচকায় খুলে সিটে বসলাম। রোশন বসল গিয়ে ড্রাইভারের আসনে—আমার পাশে। পেছনের সিটে গাদাগাদি করে (কারণ, অবনীর অবনী-প্রমাণ শরীর) অবনী, নয়ন আর পরাশর।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই একবার তাকালাম হাতঘড়ির দিকে। সাড়ে ন'টা। বলা বাহুল্য 'রাত' সাড়ে ন'টা।

গ্রে স্ট্রিট ধরে কিছুটা এগোনোর পর মুখ খুলল নয়ন, 'হেম, আশা করি এতক্ষণে তালুকদার স্টোর্সের ভেতরের কেস জানার অধিকার আমরা পেয়েছি?'

এখানে বলা প্রয়োজন নয়ন আমার চেয়ে বয়েসে বড় না হলেও ছোট নয়। আমাকে ও নাম ধরেই ডাকে। লেখাপড়া এককালে করেছিল—করেছিল প্রেম এবং বিয়েও। তার পরিণতি সন্তান এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় ছোটবেলা থেকে। একই পাড়ায়—দাসপাড়ায়—আমরা মানুষ। নয়ন খারাপ লাইনে এলেও নীতিবাগীশ চরিত্রের দশ পার্সেন্ট এখনও ছাড়তে পারেনি। নিজেকে এখনও ও সমাজের স্বাভবিক একজন মানুষ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নয়নের কথায় ঘুরে ওর দিকে তাকালাম। টাকার থলেটা ছুড়ে দিলাম ওর কোলে। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। অন্যান্য অবয়ব অস্পষ্ট।

বললাম, 'এটাই হল কেস।'

তারপর পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তুলে ধরে বললাম, 'আর এটা হল শুট-কেস। মানে, গুড়ুম-গুড়ুম।'

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ রোশনলালের হাত কেঁপে উঠল। একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে এল পেছনের সিট থেকে।

নয়ন চুপ।

আমি মনে-মনে হাসলাম।

শোভাবাজার এলাকায় আজ রাতে আমরা তিনটে কাজ করেছি। প্রথম দুটো বড় কাজ —বড় দোকানে। শেষেরটা, অর্থাৎ 'তালুকদার স্টোর্স'-এর কাজটা, বলতে গেলে হঠাৎই ঘটে গেছে। কারণ, মদনমোহনতলার চিলড্রেন পার্কের পাশ দিয়ে আমরা যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে পড়ছিলাম, তখনই আমার নজরে পড়েছে টিমটিমে আলো জ্বালা দোকানটা।

গাড়ি থামাতে বলে আমি নেমে পড়েছি। ওরা চারজন তখন নীরব অসম্মতি নিয়ে চুপচাপ বসেছিল। তারপর নেহাতই নিয়তির লিখনে দধীচি তালুকদারের তনুত্যাগ এবং কেস ও শুট-কেস-এর জন্ম।

'এই থলেটায় মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা রয়েছে।' জানলার কাছে হাত নিয়ে রাস্তার আলোয় গণনা-পর্যায় শেষ করে নয়ন বলল। ভর্ৎসনা আর ব্যঙ্গের ছোঁওয়া ওর গলায়।

আমার চোখ সামনের নির্জন-অন্ধকার ট্রাম রাস্তায়। জবাব দিলাম, 'কে যেন বলে গিয়েছেন, "ক্ষুদ্র বলিয়া করিয়ো না অবহেলা"—আগের দুটো আমদানির তুলনায় তালুকদারের তালুক ক্ষুদ্রই বটে—কিন্তু তা বলে—!'

'হেমদা—!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল পরাশর। হয়তো কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিলাম 'পরাশর, আর একটা কথা মুখ দিয়ে বেরোলে জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব!'

সবাই আবার চুপ।

কারণ, আমাকে ওরা চেনে। ওরা জানে, কারও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টেনে ছিঁড়তে আমি বড় ভালোবাসি!

মুরারিপুকুরের ডেরায় পৌঁছে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল আমাদের। রাস্তার বাকি অংশটা আমরা নীরবে অতিক্রম করে এসেছি। অস্টিনটা গ্যারেজের দিকে চালিয়ে নিয়ে চলল রোশনলাল। কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি একটা চালাঘর—বর্তমানে গ্যারেজের ভূমিকায় অভিনয় করছে।

গাড়ি থেকে সবাই নেমে দাঁড়ালাম। রোশন গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে কাঠের দরজা টেনে দিল। তারপর আমরা একসঙ্গে এগোলাম শ'খানেক মিটার দূরে টলোমলো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের টিন-কাঠ দিয়ে তৈরি ডেরার দিকে। যাওয়ার পথে নীরবে টাকার থলেটা আমার হাতে তুলে দিল নয়ন। আমি একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে থলেটা নিলাম। অন্য টাকার ব্যাগ দুটো তখন অবনীর হাতে। গাড়ির পেছনের সিট থেকে ও-ই হাতে করে নিয়ে এসেছে।

জং ধরা তালায় জং ধরা চাবি লাগিয়ে একটু কসরত করতেই তালা খুলল। দরজার অবাধ্য ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দকে অগ্রাহ্য করে ভেতরে ঢুকলাম। আমাকে অনুসরণ করল অবনী, নয়ন, পরাশর আর রোশনলাল। পকেট থেকে লাইটার বের করে সশব্দে জ্বালালাম। অভ্যন্তরীণ জমাট অন্ধকার পিছু হটল। এগিয়ে গিয়ে বাঁ-দিকের ভাঙা টেবিলে দাঁড় করানো মোমবাতিতে আগুন ধরালাম। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলাম লাইটারের আলো।

লাইটার পকেটে রেখে হাতের ইশারা করতেই অবনী এগিয়ে এল আমার কাছে। টাকার থলেটা আমার হাত থেকে বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল দর্মার বেড়ায় ঢাকা দেওয়ালের ওপিঠে লুকিয়ে থাকা একটা খুপরি-ঘরের দিকে।

আমাদের আস্তানাটা নড়বড়ে হলেও আকারে ছোট নয়। বেড়া-কাঠের দেওয়ালে একটা মা-কালীর ফটো, একটা ক্যালেন্ডার, আর আছে সিনেমার পুষি-নায়িকাদের গোটাতিনেক চৌম্বকধর্মী ছবি—আঠা দিয়ে দেওয়ালে সাঁটা। আসবাবপত্র বলতে বাঁ-দিকে দাঁড়ানো খোঁড়া টেবিলটা। একটা কাঠের বেঞ্চ। একটা প্রাগৈতিহাসিক বেতের মোড়া। দুটো কালি পড়া হ্যারিকেন। কয়েকটা পুরোনো খবরের কাগজ। একটা ট্রানজিস্টর—এখনও তা থেকে শব্দ-টব্দ বেরোয়। আর একটা জল ভরা কুঁজো—মুখে গেলাস চাপা দেওয়া।

এসব গেল বাইরের ঘরের কথা। এবার আসি খুপরি-ঘরের কথায়। বড় ঘরটার পেছনের অংশে একটা দর্মার আড়াল দেওয়া। তার ডান পাশে এক পাল্লার একটা দরজা মতন। সেটা পেরোলেই একটা ছোট ঘর। সেখানে দুটো তক্তাপোশে দুটো তেলচিটে বিছানা। একপাশে কাঠের শেলফে গোটাকয়েক মালের বোতল, অ্যাসিডের বোতলও রয়েছে দুটো—মাঝে-মাঝে তালা-টালা ভাঙতে-টাঙতে কাজে-টাজে লাগে। তক্তাপোশের নীচে আছে একটা পুরোনো জং ধরা ট্রাঙ্ক। তাতে কিছু যন্ত্রপাতি এবং হড়কানো অর্থ-সম্পত্তি রাখা হয়। এখন অবনী ঢুকেছে পেছনের সেই খুপরি ঘরে। টাকার থলে তিনটে রাখতে।

ফেরার সময় নিজের বুদ্ধিতেই মালের দুটো বোতল নিয়ে এল অবনী। সঙ্গে দুটো চিঁড়েভাজার প্যাকেট—কখন কিনেছে কে জানে। ততক্ষণে ভাঙা টেবিলের ভাঙা মোমবাতির আলোয় আমরা মোড়া, বেঞ্চ ইত্যাদি দখল করে বসেছি। অবনী এসে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতেই। বোতল দুটো বাড়িয়ে ধরল যথাক্রমে আমার এবং রোশনলালের দিকে। নয়ন নেশায় অভ্যস্ত নয়। ওর নীতিবাগীশ ক্যারেকটারের দশ পার্সেন্টের এক পার্সেন্টের উদাহরণ।

কিছুক্ষণ গলা ভেজানোর পর টলোমলো পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অবনী। একটু জড়ানো এবং রূঢ় স্বরে বলল, 'হেমদা, তালুকদার স্টোর্সের লোকটাকে খুন করে তুমি ভালো করোনি।

পরাশর মৃদু স্বরে বলল, 'একটা মানুষের জীবনের দাম মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা?'

'লোকটাকে জানে মেরে ফেলার খুব একটা জরুরত ছিল কি?' রোশনলালের দ্বিধাগ্রস্ত মনের প্রশ্ন ভেসে এল।

আমি এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পেছনের ঘরের দিকে এগোতে, এগোতে বললাম, 'নয়ন, এদের অমৃতবাণীগুলো টুকে নিয়ে কাগজে ছেপে দিস।'

নয়ন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি বাড়ি চললাম, কাল দেখা হবে।'

তক্তপোশে শরীর এলিয়ে দিয়ে তখনও শুনতে পাচ্ছি ওরা তিনজন জড়ানো গলায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছে। শোনা যাচ্ছে প্রায়-খালি বোতলের ঠুং-ঠাং শব্দ।

অন্ধকারে জেগে রইলাম। একটা কথা স্পষ্ট বুঝলাম, আজকের খুনটাকে ওরা চারজন সহজ মনে নিতে পারছে না। তা হলে কি আমার সাবধান হওয়া উচিত? কিন্তু রিভলভার একমাত্র আমি ছাড়া আর কারও কাছে নেই। অবশ্য একটা জোগাড় করাও তেমন কঠিন কিছু নয়। মনে হয়, এই দধীচি তালুকদার মারা গিয়ে আমার চার 'বন্ধুকে' আজ 'শত্রু' করে দিয়ে গেছে।

অবশেষে বুঝলাম, আমি—হেম বাঁড়ুয্যে—ভয় পেয়েছি।

প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটল পরদিন সকালেই।

আমার মানসিক অঙ্কে এত অল্প সময়ের তফাতে এটা আশা করিনি।

সকালে ঘুম ভাঙতেই গত রাতের দধীচি তালুকদার এবং পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা আমার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করেছে। সুতরাং সেই আড়ষ্ট আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাতে বিছানায়

উঠে বসে হাত বাড়িয়েছি শেলফের দিকে। আধখালি একটা বাংলার বোতল টেনে নিয়েছি। আলগা করে গলায় ঢালতে যাব, নজরে পড়ল খুপরি-ঘরের দরজা ঠেলে কেউ ঢুকছে।

স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হল। চোখের কোণ দিয়ে দরজার ওপর নজর রেখে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিয়েছি, চমকে উঠলাম রোশনলালের স্বরে—।

'ওস্তাদ!'

এবং বিপর্যয়টা তখনই ঘটল আর সেইসঙ্গে বাঁচাল আমার প্রাণ।

কারণ ততক্ষণে বোতলের তরল, আমার চমকানোর সুযোগে, চলকে পড়েছে আমার বুকে গলায়, গায়ে। আর তক্ষুনি অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, বোতলের যে-তরল আমি গলায় ঢালতে যাচ্ছিলাম, সেটা মদ নয়, ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড।

বেশ মনে আছে, এক বীভৎস চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে বিছানায় আমি লুটিয়ে পড়েছি, আর মুণ্ডহীন ধড়ের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠেছে আমার অ্যাসিডে জ্বলে যাওয়া শরীর। রোশনকে যেন এগিয়ে আসতে দেখেছিলাম বিছানার কাছে...তারপর আর কিছু মনে নেই...।

সজ্ঞান যখন হলাম তখনও আমি বিছানায় শুয়ে। বুকে-গলায় অপটু হাতের পটি—রোশনলালের প্রাথমিক চিকিৎসার স্বাক্ষর। চেতনা ফিরতেই শোয়া অবস্থা থেকে এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসলাম। তীক্ষ্ন যন্ত্রণা গ্রাহ্য করলাম না। বাঁ-হাতে বালিশের নীচ থেকে প্যাড জড়ানো রিভলভারটা বের করে নিলাম। টলোমলো পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোশনলালের চোখে ভয়ের ছায়া কেঁপে উঠল।

আমি অমায়িক স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'রোশন, তুমি আমার ঘরে কেন ঢুকেছ?'

এতক্ষণ যেটা খেয়াল করিনি, এবার সেই খবরের কাগজটাই আমার চোখের সামনে তুলে ধরল রোশন। তিননম্বর পৃষ্ঠার এক কোণে দধীচি তালুকদারের অপমৃত্যু-সংবাদ। ও বলল, 'এই খবরটাই তোমাকে দেখাতে আসছিলাম—।

মৃদুস্বরে বললাম, 'ওরা দেখেছে?'

'হ্যাঁ, দেখেছে।'

লম্বা পা ফেলে দর্মার দরজা সরিয়ে বাইরের ঘরে এলাম।

অবনী আর পরাশর ভাঁড়ে চা আনিয়ে খাচ্ছিল। আচমকা আমাকে মারমুখী ঢঙে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। রোশনলাল চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে লক্ষ্য করে বললাম, 'রোশন, কী হয়েছে ওদের খুলে বলো।'

'ওরা জানে। তোমার চিৎকার শুনে ওরা ঘরে গিয়েছিল।' মৃদুস্বরে রোশন উত্তর দিল।

আমি একপলক তাকালাম আমার গায়ে লাগানো কাপড়ের পটির দিকে। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইলাম, 'মালের বোতল আর অ্যাসিডের বোতলের জায়গা পালটির কাজটা কে করেছে?'

ওরা চুপ।

চকিতে অবনীর দিকে এক পা এগিয়ে গেলাম। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার রিভলভার ধরা বাঁ-হাতের উলটোপিঠ আছড়ে পড়ল ওর ফোলা-ফোলা গালে। ওর মুখটা অবাধ্যভাবে ডানপাশে কয়েক ডিগ্রি ঘুরে স্থির হয়ে রইল। ফরসা গাল ফেটে বেরিয়ে এল রক্তের রেখা। অবনীর দৃষ্টি নিষ্পলক।

'কে করেছে, অবনী?'

'আমি নয়।' বিড়বিড় করে ও জবাব দিল।

'পরাশর?' ঘুরে তাকালাম পরাশরের দিকে।

'আমি জানি না।'

আমি হাসলাম। রোশন, অবনী, পরাশর মেঝের দিকে তাকিয়ে। হাসতে-হাসতেই বললাম, 'অতএব তোমরা যখন মিথ্যে কথা বলছ না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, আজ সকালে হঠাৎ মাথাখারাপ হয়ে গিয়ে আমি দশ বছরের পুরোনো কালীমার্কার নেশা ছেড়ে নাইট্রিক অ্যাসিডের নেশা শুরু করতে গেছি—আর তাতেই এই কেলো...'

আমি জোরে হেসে উঠলাম।

ওদের তিনজনের শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। ওরা ভয়ের চোখে আমার দিকে তাকাল। কারণ, আমার হাসির শব্দ ছাপিয়ে রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খোলার শব্দ ওদের কানে গেছে।

সাজানো দুর্ঘটনা আমি একেবারে পছন্দ করি না। কারণ সাজানো দুর্ঘটনা কাপুরুষের হাতিয়ার। আর, পুরুষের অবলম্বন...।

রিভলভারটা তুলে ধরতেই সদর দরজা সশব্দে খুলে গেল। বিস্মিত নয়নের প্রবেশ এবং প্রশ্ন, 'কী ব্যাপার, হেম, কী হচ্ছে এসব?'

হঠাৎ আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। ক্ষিপ্র চিন্তায় সিদ্ধান্তে পৌঁছে রিভলভার নামিয়ে নিলাম। বললাম, 'নয়ন, জল ঢেলে পা ধুয়ে আয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোর মেহেরবানি কবুল করে এই তিনটে কুত্তা অন্তত কিছুক্ষণ তোর পা চাটুক।'

আর দাঁড়ালাম না। স্থবির হয়ে দাঁড়ানো রোশনের হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে ঢুকে পড়লাম খুপরি ঘরে।

আসন্ন দ্বিতীয় দুর্ঘটনার জন্যে মনকে ধীরে-ধীরে তৈরি করতে লাগলাম।

আমার তালিকায় অ-সন্দেহভাজনের সংখ্যা চিরকালই শূন্য। সুতরাং খবরের কাগজের খবরটা প্রথমে মনোযোগ দিয়ে পড়লাম :

গতকাল শোভাবাজার মদনমোহনতলা এলাকায় জনৈক দোকানদার কোনও এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়। সেইসঙ্গে দোকানের ক্যাশ বাক্সের টাকা অদৃশ্য হয়। পুলিশের সন্দেহ গতরাতের অন্যে দুটো ডাকাতির সঙ্গে এ-খুনের সম্পর্ক রয়েছে। তদন্ত চলছে।

অতঃপর শুরু হল আমার বিশ্লেষণ। প্রথমে নয়ন সেনের পালা।

ভেবে দেখলাম, গতকাল রাতে ও খুপরি-ঘরে ঢোকেনি। আজ সকালেও এসেছে দেরিতে। সুতরাং মদের বোতল এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতলের জায়গা বদলের কাজটা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব বাকি রইল অবনী, পরাশর আর রোশনলাল। এদের তিনজনেরই ছিল সমান সুযোগ। তা ছাড়া গত রাতে অবনী আমার সামনেই ও-ঘরে ঢুকে মদের দুটো বোতল বের করে এনেছিল। হয়তো সেই সময়েই...।

চিন্তা করতে গিয়ে দেখলাম, পরাশর আর রোশনলালের পারসোনাল লাইফ সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না।

অবনীর বাবা গাড়ি কেনা-বেচার দালালি করত। অবনীই আমাকে জুটিয়ে দিয়েছিল এই ঝরঝরে অস্টিনটা। অবনী বিয়ে করেনি। সংসার ছেড়ে ও আমার সঙ্গে আছে আজ চারবছর। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ একটা মালের দোকানে।

পরাশর বারতিনেক জেল খাটার পর কেমন করে যেন আমার সঙ্গে ভিড়ে গেল।

সেও প্রায় বছর তিনেকের কথা। পরাশরের বয়েস অল্প। চোখে-মুখে কেমন একটা একরোখা ভাব রয়েছে। সম্ভবত ওয়াগন-ব্রেকার হিসেবে পুলিশের সঙ্গে ঘন-ঘন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ওর চেহারায় এই অদ্ভুত কাঠিন্য এনে দিয়েছে।

রোশনলাল বয়েসে মাঝামাঝি। এই দু-নম্বরি পথে ও আছে অনেকদিন। কিন্তু ওর নার্ভাস-প্রকৃতিটা এখনও ওর সঙ্গ ছাড়েনি। গুণের মধ্যে, রোশন ভালো গাড়ি চালায়।

নয়ন বাড়ি ছেড়ে বিয়ে-থা করেছে আজ দশবছর। অনেকদিন টানাপোড়েনের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে ও হাত পেতেছিল আমার কাছে। ক্রমে-ক্রমে একরকম নিরুপায় হয়েই ও আমার সঙ্গে মিশে গেছে। মাঝে-মাঝে তাই দুঃখ করে বলে, 'আমি মারা গেলে আমার না-খেতে পাওয়া ছেলেমেয়েগুলোকে আর আমার বউটাকে দেখিস।'

নয়নের ধারণা ওর বউ চরিত্র বিক্রি করেছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। কারণ ললিতাকে আমি বিয়ের আগেও চিনতাম।

এতদিন একসঙ্গে কাটানোর পর আমাকে চিনতে ওদের আর বাকি নেই। বড়লোক বাবা-মায়ের কোল ছেড়ে কীসের নেশায় যে এ-পথে পা বাড়িয়েছি সে-কথা আজ আর স্পষ্টভাবে মনে পড়ে না। মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া আমার পেশা নয়, নেশা। আমার এ-নেশার কথা ওরা চারজনও জানে। তা হলে দধীচি তালুকদারকে খুন করার জন্যে ওরা কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে?

ভেবে দেখলাম, এই চারজনের মধ্যে কোনও একজন প্রতিহিংসা মেটাতে চায়। কারণ? কারণ, হয়তো পঁয়ষট্টি টাকার বিনিময়ে প্রাণহানির ব্যাপারটা সে ঠিক সরল মনে হজম করতে পারছে না, তাই প্রতিবাদে মুখর হয়েছে।

সেই বিশেষ একজনের মুখোশ খোলার নিটোল পরিকল্পনা মনে-মনে ছকে নিয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরের ঘরে এলাম।

ওরা চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে।

পরাশর মাথা নীচু করে হাতের নখ খুঁটছে। নয়নের চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। অবনী মুখ নেড়ে কী যেন চিবোচ্ছে—সম্ভবত চানাচুর। রোশন একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেওয়ালে

সাঁটা জনপ্রিয় নায়িকার জনপ্রিয় বুকের দিকে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ওরা চারজন চোখ ফেরাল আমার দিকে। এবং আশ্বস্ত হল। কারণ, আমার হাতে রিভলভার নেই।

একপাশে পড়ে থাকা মোড়াটা টেনে নিয়ে বসলাম। নয়নের দিকে চেয়ে বললাম, 'নয়ন, তোদের চারজনের একজন আমাকে খুন করতে চাইছে।'

'সেটা তোর ধারণা—' ও তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল।

'ধারণা, কিন্তু কারেক্ট।' শীতল স্বরে জবাব দিলাম, 'যাক সে কথা।...সেই একজনকে আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। তারপর আর কোনও প্রশ্ন কাউকে করব না। হেম বাড়ুয্যেকে তোমরা চেনো। তোমাদের মতো ভেড়ুয়াদের শায়েস্তা করে সে মাথার চুল পাকিয়েছে। সুতরাং সেই একজনকে এই পৃথিবীতে জন্মেছিল বলে রীতিমতো দুঃখ করতে হবে।

কথা শেষ করে ঘর ছেড়ে বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। ঘুরে তাকিয়ে বললাম, 'নয়ন, তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু। ললিতাও আমাকে অনেক দিন ধরে চেনে...জানে। ওকে বিধবা করতে হলে আমি নিজেই ভীষণ কষ্ট পাব। বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি।'

ডেরা ছেড়ে পা বাড়ালাম রাস্তার দিকে। ডাক্তারখানায় যাব। কারণ, রোশনের অপটু হাতের ব্যান্ডেজ বুকে বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে। মোটামুটি একটা চিকিৎসা করানো দরকার।

যাওয়ার পথে মুচিবাজার পার হতে গিয়ে মনে পড়ল, রথের দিন আমি আর নয়ন বছরের-পর-বছর ধরে ফুটপাথে পাঁপড় ভাঁজা কিনে খেয়েছি। স্কুলেও একসঙ্গে গিয়েছি বেশ কিছুদিন। তারপর...।

কৈশোরের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ল বলতে ইচ্ছে করে: কৈশোর তোমার মতো গদ্দারি এই দুনিয়ার আর কেউ আমার সঙ্গে করেনি!

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পর—বেলা বারোটা নাগাদ—টলতে-টলতে ডেরায় ফিরলাম। নয়ন বেঞ্চে বসে খবরের কাগজটা পড়ছিল, আমার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। কাগজটা ফেলে রেখে ছুটে এল আমার কাছে। আমার অনিশ্চিত ভারসাম্যে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটাকে জাপটে ধরল! উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করল, 'কী রে, হেম? কী হয়েছে তোর?'

আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। নয়নের কাঁধে ডানহাতটা রাখলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে বলতে চাইলাম, 'আমাকে বাঁচা, নয়ন। ওরা আমাকে খুন করতে চাইছে।' নয়ন নীরবে আমাকে নিয়ে চলল খুপরি-ঘরের দিকে।

বিছানায় শুয়ে করমচা-লাল চোখে চোখ রাখলাম নয়নের চোখে। কাঁপা হাতে ওর ডানহাতটা চেপে ধরলাম। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলাম, 'ওরা কোথায়?'

নয়ন অবাক চোখে আমার মুখের, শরীরের ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়েছিল, বলল, 'খেতে গেছে—হোটেলে। কিন্তু হেম, কী হয়েছে তোর? মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।'

'হ্যাঁ, নয়ন। আজ সকালের কেস তো তুই জানিস। রোশনের বেঁধে দেওয়া ব্যান্ডেজ নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ডাক্তার পালের কাছে, আরিফ রোডে। সেই ব্যান্ডেজ কেটে নতুন

ব্যান্ডেজ করতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে গেছেন। অবাক হয়েছি আমিও। কারণ, ব্যান্ডেজ বাঁধার আগে কেউ—হয়তো রোশনই—আমার কাটা জায়গায় ধুলো আর লোহার মরচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। ডাক্তার পাল শুধু বললেন, 'হেমবাবু আর ঘণ্টা পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করলেই পারতেন, ডাক্তার খরচটুকু বেঁচে যেত। টিটেনাসের সঙ্গে শ্মশানের যা রিলেশান, তাতে শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ঠিকমতো ফেলার আর টাইম পেতেন না।" টিটেনাস টক্সয়েড নিয়ে, নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে, ফিরে আসতে-আসতে শুধু একটা কথাই আমার মাথায় ঘুরছিল—অবনী, পরাশর, রোশন—ওদের তিনজনের একজন আমাকে খুন করতে চায়। কে বল তো?'

আমার আগ্রহে ফেটে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে নয়ন বিহ্বলভাবে মাথা নাড়ল 'জানি না। তবে এখনও আমার মনে হচ্ছে তুই কোথায় একটা ভুল করছিস।'

'না, নয়ন।' চাপা হিংস্র স্বরে গর্জে উঠলাম, 'ভুল আমার হয়নি। শুধু তোকেই বলে রাখছি, আসল লোককে বের করার তুরুপের তাস আমার হাতের মুঠোয়। যে-কোনও মোমেন্টে আমি তার মুখোশ খুলে দিতে পারি! কিন্তু আজকের দিনটা আমি ওয়েট করব। তারপর...।'

'এখন একটু বিশ্রাম কর।'

দু-হাতে নয়নের হাত চেপে ধরলাম।

'নয়ন, আমার যে ঘুমোতেও ভয় করছে। বুকভরা ভয় নিয়ে কেউ কখনও গদ্দারদের সঙ্গে একই ছাদের নীচে ঘুমোতে পারে?'

নয়ন উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে আচমকাই নেমে এল কঠিন ছায়া। ও বলল, 'খুব পারে। ললিতার সঙ্গে একই ছাদের নীচে আমি ঘুমোচ্ছি আজ দশবছর।' নয়ন পা বাড়াল বাইরের ঘরের দিকে। যেতে-যেতে বলে গেল, 'ভয় পাস না। নয়ন সেন এখনও তোর বন্ধুই আছে। তা ছাড়া ওরা তিনজন ফিরুক। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।'

বিকেল পাঁচটায় ঘুম ভাঙলে টের পেলাম, শরীরে অসহ্য ব্যথা। এবং তার সঙ্গে তেজি খিদে। অতি কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। মাথাটা আচমকা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হল, কেউ যেন লোহার সাঁড়াশি দিয়ে রগের পাশ দুটো চেপে ধরেছে।

শুরুর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলে উঠে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে শেলফ থেকে মালের বোতল তুলে নিলাম। অতি সন্তর্পণে বোতলের তরল পদার্থ পরনের জামার এক কোণে সামান্য ঢাললাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোনও অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ল না, তখন ধীরে ধীরে গলায় উপুড় করে দিলাম বোতলটা। শুকনো জিভের তেতো আস্বাদটা কালী মার্কার কৃপায় কেটে গেল। বোতলটা তাকে ফিরিয়ে রাখতে যেতেই আমার অবসাদে ক্লান্ত হাত কেঁপে উঠল। মেঝেতে ঠিকরে পড়ল বোতলটা। ভেঙে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। 'বাংলা'র তীব্র গন্ধে খুপরি-ঘরটা ভরে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে উঁকি মারল নয়ন। বলল, 'ও—তুই উঠেছিস। দাঁড়া আসছি—' বলেই পলকের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত শরীরের ভারসাম্য রাখতে বিছানার ওপরে বসে পড়লাম।

একটু পরে একটা ঠোঙায় করে মুড়ি, পেঁয়াজ, আর গোটাকয়েক তেলেভাজা নিয়ে এল নয়ন। বলল, 'নে—খেয়ে নে। রাসুকে চা আনতে বলেছি।'

আমি ওর দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে মুড়ির ঠোঙায় হাত চালাতে শুরু করলাম।

খেতে-খেতে হঠাৎই লক্ষ করলাম, নয়নের জ্বলজ্বলে চোখজোড়া আমার মুখে সেঁটে আছে। আমাকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে ও বলল, 'নাঃ, তুই দেখছি এখনও আমাকে খুব বিশ্বাস করিস, হেম!'

'কেন?'

'কারণ, আমার দেওয়া খাবার তুই সন্দেহ করিসনি।'

আমি কোনও জবাব দিলাম না।

নয়ন নিজের মনেই বলে চলল, 'আমি দুপুরে ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু তোকে সরানোর চেষ্টার ব্যাপারটা ওরা তিনজনেই সমানে ডিনাই করছে। কী জানি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ওরা কোথায়?' খেতে-খেতেই প্রশ্ন করলাম।

'বাইরের ঘরে শুধু অবনী রয়েছে। রোশন আর পরাশর বেরিয়েছে।'

'অবনীকে ডাক।'

নয়ন গলার স্বর উঁচু পরদায় তুলে ওকে ডাকল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অবনী এবং রাসুর চায়ের দোকানের নুলো ছেলেটা এক ভাঁড় চা নিয়ে খুপরি-ঘরে এসে ঢুকল। অবনীর হাতে খবরের কাগজটা।

অবনী চুপচাপ সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আমি ছোঁড়াটার হাতে পনেরোটা পয়সা দিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। তারপর অবনীর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে জানতে চাইলাম, 'অবনী, আজ সকালে রোশন যখন আমার বুকে ব্যান্ডেজ করে দেয় তখন এ-ঘরে আর কে-কে ছিল?'

'আমি আর পরাশর।'

'কেউই ঘর ছেড়ে যায়নি?'

'পরাশর একবার বাইরে গিয়েছিল ব্যান্ডেজের কাপড় আনতে। ওর দেরি হচ্ছিল বলে আমি রোশনকে তোমার কাছে থাকতে বলে বাইরের ঘরে একবার বিড়ি ধরাতে গিয়েছিলাম। তখনই দেখি পরাশর ফিরে আসছে।'

আমি ঘুরে তাকালাম নয়নের দিকে।

'ব্যান্ডেজের কেসটা ওদের বলেছিস?'

'হ্যাঁ, বলেছি—কিন্তু...।'

'কিন্তু ওরা সবাই সে-কথা ডিনাই করেছে, তাইতো?' আমি ব্যঙ্গভরে হাসলাম।

অবনী রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, 'আর কিছু জানতে চাও, হেমদা?'

আমি নিঃশব্দে ডানহাত ঢুকিয়ে দিলাম বালিশের তলায়। রিভলভারটা পরখ করতে-করতে চাপা স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, জানতে চাই। জানতে চাই তোমাদের মধ্যে কার আয়ু আগামীকাল শেষ হতে চলেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় বড় অল্প, তাই না অবনী?' এবার

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। নয়নের নীরব অনুনয়ের দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। শান্ত স্বরে বললাম, 'অবনী, তুই আর ওই কুত্তার বাচ্চাদুটো কাল সকালে এখানে হাজির থাকিস। তখনই দেখবি হেম বাঁড়ুয্যের দাবার শেষ চাল! তালুকদার স্টোর্সের ওই বুড়োর জন্য সাগরের ঢেউ তোদের বুকে আছাড় মারছে, তাই না? এবার ফোট।'

একইসঙ্গে আমরা অভিব্যক্তির ইশারা পেয়ে বেরিয়ে গেল অবনী।

আমি ফিরে এসে বসলাম বিছানায়। নয়নকে বললাম, 'ওরা ফিরলে আমাকে খবর দিস। আর শোন, অবনীর কাছ থেকে খবরের কাগজটা আমাকে দিয়ে যাস।'

'আচ্ছা।' উঠে দাঁড়াল নয়ন: 'তবে আমি বেশি রাত করব না, হেম। ছোট ছেলেটার একটু জ্বর-জ্বর মতো হয়েছে। মানুষের মরার চেয়ে বেঁচে থাকাতেই বেশি কষ্ট।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল নয়ন।

একটু পরে নয়নের দিয়ে যাওয়া খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে সেই বিশেষ খবরটা আমি আবার পড়তে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমার মারকাটারি প্ল্যানের কথা।

তৃতীয় দুর্ঘটনাটা একেবারে চরমে পৌঁছল।

রাত তখন সাড়ে এগারোটা। খাওয়াদাওয়া সেরে বেশ কিছুক্ষণ হল ঘুমিয়েছি। ঘুমোনোর আগে ওদের তিনজনকে ডেকে আগামীকাল সকালই যে গদ্দারের লুকিয়ে থাকার টাইম লিমিট সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি। যথারীতি নিজেদের সাফাই দিয়েছে ওরা তিনজনেই। তারপর বাইরের ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে।

এমনিতে ঘুম আমার গভীরে। কিন্তু আজ, বিশেষ করে বুকের জ্বালা আর মনের অন্ধ আক্রোশ, এই দুয়ের জন্যে অন্যান্য রাতের মতো সহজে ঘুম আসেনি। অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে ভেবেছি তিনজনের মধ্যে কে? অবনী? পরাশর? রোশনলাল? নাকি যাকে রেখেছি সব সন্দেহের সীমার বাইরে, সেই নয়ন সেনই এ দুর্ঘটনাগুলোর পরিচালক এবং প্রযোজক।

এই জটিল চিন্তাভাবনার মধ্যেই একটা চাপা খসখস শব্দ আমার কানে এল। কানে এল দর্মার দরজা সরানোর শব্দ।

বুঝলাম, কেউ খুপরি-ঘরে ঢুকছে।

স্বাভাবিক সতর্কতায় বাঁ-হাত চলে গেল বালিশের নীচে। আঁকড়ে ধরলাম প্যাড জড়ানো রিভলভারের বাঁট। জমাট অন্ধকার ভেদ করে দরজার দিকে নজর ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফালতু চেষ্টা। তাই সাবধানে বিছানা ছেড়ে নেমে এলাম মেঝেতে। গড়িয়ে গড়িয়ে সবেমাত্র ঠান্ডা মেঝে ছুঁয়েছি, দর্মার দরজা পুরোটা খুলে গেল। দরজায় ভেসে উঠল একটা ছায়াশরীর।

নাকে মদের হালকা গন্ধ, হাতে রিভলভার, মনে ঝঞ্ঝা—এই তিনকে সঙ্গী করে আমি অপেক্ষায় রইলাম। বুকের ভেতরে একপাল সৈন্য নিখুঁত তালে মার্চ করে চলেছে—ধুপ... ধুপ...ধুপ...ধুপ...।

অন্ধকারের পটভূমিতে জমাট অন্ধকার শরীরটাকে আমার বিছানার দিকে আরও খানিকটা এগোতে দেখে আমি রিভলভারটা ডানহাতে নিয়ে উঁচিয়ে ধরলাম। আর ঠিক তখনই যন্ত্রণায় 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলাম। না, আমার বুকের ব্যথা নয়, বিকেলে ভেঙে যাওয়া বোতলটার একটুকরো কাচ—যা পরিষ্কার করার সময় পরাশরের নজরে পড়েনি। সেই কাচে কনুই লাগতেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অস্ফুট আর্তনাদ।

সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারের বুক চিরে দেখা গেল নীল আলো। আগন্তুকের রিভলভারে গুলি ছুটে এসেছে আমার বিছানা লক্ষ্য করে। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। আক্রোশ ফেটে পড়ল আমার রিভলভারের নল। পাগলের মতো দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে চললাম। কারও ছুটে পালানোর দুদ্দাড় শব্দ পেলাম। তারপরই একটা গুঞ্জন ভেসে এল পাশের ঘর থেকে। শোনা গেল পরাশর, অবনী আর রোশনের গলা, 'কী হল, হেমদা?'

আমি মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগেই ওরা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমার ঘরে। আমি রিভলভারটা শক্ত মুঠোয় চেপে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর বসে পড়লাম বিছানায়। অন্ধ ক্রোধে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোচ্ছে না।

ওদের প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে শুধু বললাম, 'নয়নকে ওর বাড়ি থেকে কেউ ডেকে নিয়ে এসো—এখুনি।'

নীরবে ঘর ছাড়ল রোশনলাল। আমি বিছানা ছেড়ে পা বাড়ালাম বাইরের ঘরের দিকে।

বাইরের ঘরে আসবাবপত্র কম থাকায় একটু খোঁজাখুজি করতেই পাওয়া গেল রিভলভারটা। সদর দরজা হাট করে খোলা। যেন আমাকে বোঝানোর চেষ্টা, এই অপকীর্তি বাইরের কোনও লোকের। রিভলভারের ম্যাগাজিন খুলে দেখি তাতে কোনও গুলি নেই।

রিভলভারটা বাঁ-হাতে পকেটে পুরে হ্যারিকেনের আলোটা জোর করে দিলাম। ওদের ডেকে বললাম মোমবাতিটা এ-ঘরে নিয়ে আসতে এবং অন্য হ্যারিকেনটাও জ্বেলে দিতে।

ওরা নীরবে আদেশ পালন করলে কাঠের বেঞ্চটা আঙুল দিয়ে দেখালাম: 'অবনী, পরাশর, তোমরা ওই বেঞ্চটায় বোসো।'

আমি গিয়ে বসলাম মোড়াটায়। তারপর চলল চুপচাপ অপেক্ষা।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফিরে এল রোশনলাল, সঙ্গে নয়ন। নয়নের চোখে-মুখে ঘুমের ছাপ। দেখে বোঝা যাচ্ছে, কোনওরকমে তালিমারা পাঞ্জাবি আর চটিটা গায়ে-পায়ে গলিয়ে ও চলে এসেছে।

আজ নয়ন আর প্রশ্ন করল না, 'কী ব্যাপার, হেম? এত রাতে হঠাৎ তলব?' কারণ, ও বোধহয় ঘরের থমথমে পরিবেশ এবং আমার মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল।

নয়নের দিকে চেয়ে হেসে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'নয়ন, তুই কষ্ট করে টেবিলটায় বোস। রোশন, তোমার জন্যে অবনীর পাশে জায়গা খালি রয়েছে—যাও, বোসো।'

সকলে বসার পর সংক্ষেপে নয়নকে নতুন ঘটনার কথা জানালাম। তারপর পকেট থেকে বের করে নিলাম অচেনা রিভলভারটা। প্রশ্ন করলাম, 'এটা কার?'

সবাই চুপ।

‘ঘড়ির কাঁটায় আমার দেওয়া আটচল্লিশ ঘণ্টা শেষ না হলেও আমার হিসেবে সে-আটচল্লিশ ঘণ্টা আজ, একটু আগেই, শেষ হয়ে গেছে। এ-কথা এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট যে, অবনী, রোশন, অথবা পরাশর—তোমরা তিনজনের একজন আমাকে খুন করতে চাও।’

‘বাজে কথা!’ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অবনী।

‘অবনী, বোসো। আর একটু পরেই যখন এ-ঘরে একটা বডি পড়ে থাকবে তখনই বোঝা যাবে কার কথা কতটুকু ঠিক।’

অবনী বসল। ওদের মুখে একটা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের ছাপ।

‘ঘটনার শুরু কাল রাতে—’ আমি দাঁড়িয়ে থেকেই বলতে শুরু করলাম, ‘যখন তালুকদার স্টোর্সের লোকটা আমার হাতে খুন হয়। আমার মনে হয়েছিল, সেই খুনটাকে তোমরা কেউই ভালো চোখে দ্যাখোনি—এমনকী নয়নও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তোমরা আমাকে মার্ডার করতে চাইবে। অথচ তাই ঘটছে। তিন-তিনবার আমাকে—হেম বাঁড়ুয্যেকে—মার্ডার করার চেষ্টা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাপার আমি বিন্দুমাত্রও লাইক করি না। সুতরাং—’ ফিরে তাকালাম নয়নের দিকে ‘নয়ন, ও-ঘর থেকে কালকের কাগজটা নিয়ে আয়।’

নয়ন কাগজটা নিয়ে এসে দিল আমার হাতে। তারপর আবার গিয়ে বসল ভাঙা টেবিলে—ওর জায়গায়।’

কাগজটা ভাঁজ করা অবস্থায় রেখেই বলে উঠলাম, ‘রোশন, তালুকদার স্টোর্সের লোকটাকে তুমি চিনতে? খবরের কাগজে লোকটার নাম দিয়েছে, কিন্তু ঠিকানা দেয়নি।’

‘না, চিনি না—।’ জবাব দিল রোশনলাল।

‘অবনী?

‘আমি কী করে জানব—।’

‘পরাশর?’

পরাশর নীরব।

আমি হাসলাম। রিভলভার হাতে নাচাতে-নাচাতে বলে চললাম, ‘লোকটা হেভি সহজ-সরল। প্রথমে আমার হাতে এটা দেখে বুঝতেই পারেনি এটা রিভলভার। অবশ্য কপালে গুলি বেঁধার পর এই কিম্ভূতকিমাকার মালটা যে কী, সেটা বুঝতে লোকটার এতটুকুও অসুবিধে হয়নি—।’

‘হেমদা!’ গর্জে উঠল অবনী, ‘তালুকদার স্টোর্সের লোকটাকে খুন করতে তোমার লজ্জা করল না?’

আমি হিংস্রভাবে হাসলাম, ‘কেন, তোমার তাতে কী প্রবলেম হয়েছে?’

‘ক্ষতি-অক্ষতির কোশ্চেন না। তবুও বেহুদা মার্ডার করবে?’

‘তোমার দেখছি বিবেক জেগে উঠেছে! কিন্তু বিবেক শুধু তোমারই রয়েছে—নয়ন, রোশন, পরাশরের নেই?’

‘নেই কে বলল? আছে।’ উঠে দাঁড়াল নয়ন: ‘হেমকে আমি আগেও সে-কথা বলেছি।’

‘ওস্তাদ—’ এবারে রোশন মুখ খুলল, ‘পঁয়ষট্টি টাকা কখনও একটা জানের দাম হতে পারে না।’

‘পারে, খুব পারে। ওরকম একটা ভিতু কুত্তার জানের দাম ওর চেয়ে বেশি কোনওদিন ছিল না।’

‘হেমদা।’ উঠে দাঁড়াল পরাশর: ‘দধীচি তালুকদার তোমার কী ক্ষতি করেছিল যে, তুমি তাকে সামান্য ক’টা টাকার জন্যে খুন করলে?’

আমার মাথার ভেতরে যেন বজ্রপাত হল! মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। রিভলভারের বাঁটে আমার পাঁচ আঙুল ইস্পাত হয়ে চেপে বসল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। শত চেষ্টাতেও গলার স্বর অবাধ্য ভঙ্গিতে কেঁপে উঠল: ‘পরাশর, দধীচি তালুকদারের নাম তুমি কী করে জানলে?’

বেঞ্চ ছেড়ে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। অবনী। বিস্ফোরণের আভাস পেয়ে চাবুকের মতো তৎপর হয়ে দাঁড়াল নয়ন। হতভম্ব রোশনলাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা তিনজনেই বিড়বিড় করতে লাগল, ‘দধীচি তালুকদার—দধীচি তালুকদার।’

পরাশর আমার প্রশ্নের জবাবে বলে উঠল, ‘খবরের কাগজ পড়ে জেনেছি।’

নিষ্পাপ অভিব্যক্তিতে কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ও উন্মাদের মতো পাতা হাতড়ে খবরটা বের করল। বারকয়েক মনে-মনে সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে যখন মুখ তুলে তাকাল তখন ওর মুখের চামড়ায় ধূসর প্রলেপ। কিন্তু আর তো ফেরার পথ নেই! আমার ফাঁদে ও পা দিয়ে ফেলেছে।

কয়েক মুহূর্ত নিটোল নিস্তব্ধতা।

তারপর মুখ খুললাম, ‘পরাশর, দধীচি তালুকদার তোমার কে হয়?’

পরাশর বেপরোয়া হয়েই জবাব দিল, ‘আমার বাবা!’

শব্দ দুটো যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে গোটা ঘরটায় ফিরতে লাগল: আমার বাবা। আমার বাবা। আমার বাবা। আমার...।

এখন বুঝলাম, রক্তের সম্পর্ক মানুষকে কী করে বেপরোয়া করে তোলে। আমার মনে পড়ল অ্যাসিড ভরতি বোতলের কথা, বুকে বাঁধা ব্যান্ডেজের কথা, সবশেষে রিভলভারের গুলিটার কথা।

ঠান্ডা গলায় বললাম, ‘পরাশর, এ পর্যন্ত আমি একবারও দধীচির নাম তোমাদের সামনে বলিনি। খবরের কাগজেও এ নিয়ে কিছু লেখেনি। তাই আজ সকালেই আমি প্ল্যান করেছিলাম, তোমাদের যার মুখ দিয়ে ও-নাম বের করাতে পারব, বুঝব গত তিনটে অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে সে-ই দায়ী। অতএব, ঈশ্বর দধীচি তালুকদারের পুত্র ঈশ্বর পরাশর তালুকদার, তোমার স্বর্গজীবন সুখের হোক—।’

রিভলভারের চাপা শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গুলির ধাক্কায় রোশনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল পরাশর। ওর মুখে পলকের জন্যে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ছায়া। তারপর ওর শরীরটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। কপাল থেকে সরু রক্তের ধারা গড়িয়ে এল বাইরে।

রোশন নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। জানতে চাইল, ‘ওস্তাদ, দধীচি তালুকদারের কপালে কি কোনও কাটা দাগ ছিল?’

‘হ্যাঁ, ছিল। কেন?’

রোশন চুপ।

অবনী বড়-বড় পা ফেলে তড়িতে এগিয়ে গেল ভাঙা টেবিলটার কাছে। ওর বলিষ্ঠ দু-হাতে টেবিলটাকে মাথার ওপর তুলে মেঝেতে এক আছাড় মারল। প্রচণ্ড শব্দে গোটা ডেরাটা থরথর করে কেঁপে উঠল। আমরা নির্বাকভাবে দেখলাম, অবনী এক হ্যাঁচকায় ভেঙে নিল টেবিলটার একটা ভারী পায়া। ফিরে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভঙ্গিতে পা ফাঁক করে দাঁড়াল আমার কাছ থেকে হাত-ছয়েক দূরে।

নয়ন আর রোশন গিয়ে দাঁড়াল অবনীর পাশে। ওরা তিনজনে মিলে আমাকে কেন্দ্র করে ছ'-হাত ব্যাসার্ধের এক বৃত্তচাপের জন্ম দিল।

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নয়ন বলল, ‘হেম, দধীচির নামটা আমি এই মুহূর্তেই প্রথম শুনলাম।’

‘আমিও।’ একইসঙ্গে জবাব দিল অবনী আর রোশনলাল।

‘পরাশর জানত, তালুকদার স্টোর্স দোকানটা ওর বাবার—’ নয়ন বলল, ‘কিন্তু আমি জানতাম না যে—।’

‘তার মালিক দধীচি তালুকদার।’ বক্তা অবনী ও রোশন।

‘হেম, দধীচিকে খুন করে আমার বোনকে তুই বিধবা করেছিস।’ ফিসফিসে ভেজা স্বরে বলল নয়ন, ‘আমার ছোট বোন সুনন্দাকে আমি বড় ভালোবাসি।’

‘হেমদা, আমার নাম অবনী তালুকদার। দধীচি আমার দাদা। বাড়ি ছেড়েছি বহুদিন—কিন্তু তবুও সে আমার বড়ভাই। ছোট একটা দোকান চালায় বলে শুনেছি...।’ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল অবনী।

‘ওস্তাদ, এই দধীচি তালুকদার একদিন নিজের জান কবুল করে আমার জান বাঁচিয়েছিল।’ থেমে-থেমে রোশন বলল।

আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা লোপ পেল। সব কিছু যেন জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগল। পরাশর, অবনী, নয়ন, রোশন—ওদের চেহারাগুলো যেন দ্রুতগতিতে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বুঝলাম, আমি শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দধীচির তনুত্যাগে যার সূত্রপাত করেছি, বৃত্র-সংহারেই তার শেষ। সেই রক্তের ঋণ শোধ করতেই ওরা এতটা কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে।

‘আমাকে ক্ষমা করিস, হেম।’ নয়নের চাপা স্বর কানে এল।

আচ্ছন্ন দৃষ্টি কাটিয়ে দেখি রোশনের হাতে ঝকঝকে স্টিলেটো। অবনীর হাতে ভারী কাঠের পায়াটা। আর নয়ন, ওর রক্তাভ দু-চোখ জলে চিকচিক করে জ্বলছে।

আমাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ওদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগল। পরাশরের শূন্য দৃষ্টি এই শেষ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল। ওদের শরীরের ছায়া একসময় আমার গায়ে এসে পড়তেই কেমন যেন শীত-শীত করে উঠল।

আমি হেম বাঁড়ুয্যে, জীবনে এই প্রথম শিউরে উঠলাম।

এবং জানি, এই শেষবার!

শকুনির ছক

আনন্দ সান্যাল একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বসেছিলেন। নিজের সিগারেট-লাইটারটা দশ আঙুলে নাড়াচাড়া করছিলেন। আচমকা মুখ তুলে তাকালেন আশিস চৌধুরীর দিকে—অধৈর্যভাবে বললেন, 'আশিস, কিছু একটা বল।'

উত্তরে হাসলেন আশিস চৌধুরী: 'এতটা অধৈর্য হোস না, আনন্দ। আমি বোধহয় কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

আশিস চৌধুরীর কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল নন্দন, নন্দন দেবনাথ।

সাদরে আহ্বান জানালেন আশিস চৌধুরী, 'এই যে নন্দন, এসো—। আনন্দ আজ একটা নতুন ধাঁধা এনেছে আমাদের জন্যে।'

'খুবই আনন্দের কথা আনন্দবাবু।' পরিহাস তরল কণ্ঠে বলল দেবনাথ, 'সাংঘাতিক কঠিন কিছু নিশ্চয়ই নয়?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল দেবনাথ।

'আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন,' গম্ভীর গলায় জানালেন আনন্দ সান্যাল, 'এখন —।'

'আশিসদা ভরসা।' বললেন দেবনাথ, 'কিন্তু আশিসদা, আগে এককাপ করে চা হয়ে যাক।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল মোতি চৌধুরী।

'মোতি, আর-এককাপ,' বললেন আশিস চৌধুরী, 'আমাদের মিথ্যান্বেষীর জন্যে।'

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সবাই তৈরি হয়ে বসেছেন। মোতি চৌধুরীও একপাশে বসেছেন নতুন ধাঁধা শোনার জন্য।

'আবার কেঁচে গণ্ডূষ কর, আনন্দ—শ্রোতা আরও দুজন বেড়ে গেল।' এ-কথা বলে পাইপ ধরালেন আশিস চৌধুরী।

আনন্দ সান্যাল গুছিয়ে বসলেন। পুরো ব্যাপারটা মনে-মনে সাজানোর চেষ্টা করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে শুরু করলেন, 'আশিস, আমি পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলছি...।

'করঞ্জাক্ষ বোস গত মাসের ১৭ তারিখে মারা যান। আপাতদৃষ্টিতে হার্ট ফেলিয়োর কেস বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ওঁর ভাই, ডক্টর নলিনাক্ষ বোস সন্দেহ করায় ডেডবডি পোস্টমর্টেম করা হয়। তাতে জানা যায় যে, ওঁর মৃত্যুর কারণ মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড।

এই পদার্থটি যদি একগ্রেন পরিমাণ কারও পেটে যায়, তবে তার যমালয়ে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। করঞ্জাক্ষ বোসের বডি পোস্টমর্টেম করে প্রায় দু-গ্রেন মরফিন পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ মিস্টার বোসের একমাত্র মেয়ে অমিতা বোসকে অ্যারেস্ট করে। ওঁর এগেইনস্টে যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলো নাকি মারাত্মক।

'করঞ্জাক্ষ বোসের স্ত্রী, শ্রীমতী অণিমা বোস, খুবই ভেঙে পড়েছেন। করঞ্জাক্ষ বোসের বাড়িতে ওঁর স্ত্রী ও মেয়ে ছাড়া আর থাকেন ওঁর ভাই নলিনাক্ষ বোস আর এক ভাগ্নে সুকর্ণ রায়। ওর মা-বাবা নেই। আমি তদন্তে নেমে যেসব তথ্য আর প্রমাণ জোগাড় করেছি তা থেকে অমিতা বোসের ফেবারে কিছুই পাওয়া যায়নি।

'করঞ্জাক্ষ বোস পয়সাওয়ালা। মাঝবয়েসি। কলকাতায় তার বসতবাড়ি ছাড়া আরও দু-তিনটে বাড়ি আছে। নিজের বসতবাড়িটিকে তিনি মন-প্রাণ ঢেলে সাজিয়েছেন। বাড়িতে ঢুকতেই গেটের কাছে বাঁ-দিকে একটি সুন্দর গোপাল গাছ লতিয়ে উঠেছে। এ ছাড়া বাড়ির ভেতরে কম্পাউন্ডে একটা বাগান মতো আছে। সেটা নানান সিজন ফ্লাওয়ার সাজানো। কিন্তু সৌন্দর্যের পূজারি হওয়া সত্ত্বেও করঞ্জাক্ষ বোস চরিত্রহীন, মাতাল ছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি ওয়াইফের ওপরে অকথ্য টরচার করেছেন।

'এমনকী বাধা দিতে এলে মেয়ে অমিতাকেও আঘাত করতে ছাড়েননি। এহেন ব্যক্তির মৃত্যুতে একমাত্র অণিমা দেবী ছাড়া কেউই ঠিক দুঃখিত নন। তবু সকলেই জানতে চান যে, করুণার পাত্র এই করঞ্জাক্ষ বোসকে খুন করল কে?

'নলিনাক্ষ বোস ডাক্তার, বিয়ে করেননি, কোনওদিন কারো সাতে-পাঁচে নাক গলাননি। ভাইকে একদম পছন্দ না করলেও মুখ ফুটে সেকথা প্রকাশ করতেন না। কারণ, হাজার হলেও ভাইয়ের বাড়িতেই আছেন। সুকর্ণ রায় সত্যি-সত্যিই একজন "গুড বয়"। মেডিকেল কলেজে পড়ে। ক্লাসে বরাবর স্ট্যান্ড করে। স্বভাব-চরিত্র ধোয়া তুলসীপাতা। মামার থেকে মামিকে বোধহয় একটু বেশি পছন্দ করে। অত্যন্ত আদর্শবাদী যুবক।

'অমিতা বোস একটু যে অদ্ভুত ধরনের মেয়ে তাতে সন্দেহ নেই। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আর পড়াশোনা করেননি। বাড়ির কাজকর্ম করে সময় কাটান। রীতিমতো সুন্দরী। গত মাসের ২২ তারিখে, অর্থাৎ খুনের পাঁচদিন পরে, ওঁকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার নিজের সাফাইয়ে একটা কথাও তিনি এ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু আমার ইনট্যুইশন বলছে যে, অমিতা দেবী নির্দোষ, তিনি খুন করেননি।'

এইখানে আনন্দ সান্যালকে বাধা দিলেন আশিস চৌধুরী, বললেন, 'তার মানে, তুই বলতে চাইছিস যে, অমিতা বোস কাউকে শিল্ড করছেন?'

'এক্স্যাক্টলি তাই—' বললেন আনন্দ সান্যাল, 'নয়তো সে আমাদের একটা কথারও অন্তত প্রতিবাদ করত। আমরা তাকে যা-যা বলেছি, সবই সে মেনে নিয়েছে কী কারণে? হোয়াই?'

'ঠিক আছে, তারপর থেকে বলে যা—।'

'হ্যাঁ বলছি,' আবার শুরু করলেন আনন্দ সান্যাল, '১৭ তারিখ বিকেলে খাবার টেবিলে হাজির ছিলেন করঞ্জাক্ষ বোস, অমিতা বোস, সুকর্ণ রায় আর নলিনাক্ষ বোস। অণিমা বোস সেইসময় ঠাকুরঘরে ছিলেন। অমিতা দেবী সকলের জন্যে স্যান্ডউইচ তৈরি করে রান্নাঘরে রেখে মা-কে ডাকতে ঠাকুরঘরে যান। অণিমা বোস মেয়েকে বলেন যে, ওঁর যেতে একটু দেরি হবে। ওখান থেকে মিস বোস গাছে জল দিতে বাগানে যান। প্রায় মিনিটকুড়ি পর তিনি রান্নাঘরে ফিরে যান। গিয়ে দেখেন রান্নাঘরে স্যান্ডউইচের কাছে

দাঁড়িয়ে নলিনাক্ষ বোস সন্ধানী দৃষ্টিতে এপাশ ওপাশ চাইছেন। সম্ভবত মিস বোসকে খুঁজছিলেন। অমিতা দেবীকে দেখেই তিনি বললেন, ‘কীরে, অমি, তুই কোথায় গিয়েছিলি? আমরা সব টেবিলে বসে থেকে-থেকে হয়রান হয়ে গেলাম। তারপর দাদা তোকে ডাকতে পাঠাল।” মিস বোস জবাব দিলেন, ”ছোটকা, তুমি খাবার ঘরে বোসো গিয়ে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।” ‘

‘নলিনাক্ষ বোস চলে গেলেন। তখন মিস বোস স্যান্ডউইচগুলো নিয়ে খাবার ঘরে যান। প্রত্যেককে স্যান্ডউইচ পরিবেশন করে নিজেও একটা নেন। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। করঞ্জাক্ষ বোস চিকেন স্যান্ডউইচ ছাড়া খেতেন না। তাই আর সকলে ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ খেলেও ওঁর জন্যে চিকেন স্যান্ডউইচের ব্যবস্থা করা হত।

‘খাওয়াদাওয়ার পর মিস বোস চা তৈরি করেন দুজনের জন্যে। দুজন মানে, নলিনাক্ষ বোস আর করঞ্জাক্ষ বোস। এ ছাড়া বাড়ির আর কারও চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। এরপর এঁটো বাসনপত্র নিয়ে মিস বোস রান্নাঘরে যান। প্রায় একইসঙ্গে সুকর্ণ রায় খাবার টেবিল ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যান। একটু পরেই নলিনাক্ষ বোস, ‘শরীরটা উইক লাগছে” বলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে খাবার ঘর ছেড়ে চলে যান।

‘প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর অণিমা বোস ঠাকুরঘর ছেড়ে নীচে এসে ডক্টর বোসের ঘরে যান। সেখান থেকে খাবার ঘরে গিয়ে দেখেন টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন করঞ্জাক্ষ বোস। মাথাটা টেবিলে রাখা খবরের কাগজের ওপর কাত করে শোয়ানো। বাঁ-হাতটা ঝুলে আছে টেবিলের বাইরে। ডানহাতটা টেবিলে ভাঁজ করে রাখা । খবরের কাগজের একটা পৃষ্ঠা টেবিলের নীচে পড়ে আছে। মিসেস বোসের চিৎকারে সবাই ওই ঘরে এসে হাজির হয়। এবং দেখা যায় যে করঞ্জাক্ষ বোস মারা গেছেন।

‘সকলের জবানবন্দি নিয়ে জানতে পেরেছি, স্যান্ডউইচে বিষ মেশানোর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনজন। অমিতা বোস, অণিমা বোস ও নলিনাক্ষ বোস। যে-ই বিষ দিয়ে থাকুক না কেন, সে এটা জানত যে, চিকেন স্যান্ডউইচটা শুধুমাত্র করঞ্জাক্ষ বোসের জন্যে। আমরা পরে ঘরের কোনায় একটা ছেঁড়া লেবেল কুড়িয়ে পাই। তাতে লেখা ছিল, ‘morphin hyd’ এবং তার নীচে লেখা ছিল, “grains 1/2”। তবে তাতে কোনও ছাপ-টাপ পাওয়া যায়নি।

‘মোটিভের ব্যাপারে আমরা অণিমা বোস, নলিনাক্ষ বোস ও সুকর্ণ রায়কে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, করঞ্জাক্ষ উইলে ওঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মিস অমিতা বোসকে। এ ছাড়া মদ্যপ, চরিত্রহীন পিতা, যে নিজের স্ত্রীর ওপর দিনরাত অকথ্য অত্যাচার করত, তার জন্যে মিস বোসের মনে নিশ্চয়ই এতটুকুও দয়া, মমতা বা ভালোবাসা ছিল না। তাই অমিতা বোসের এই চাপা রাগের বিস্ফোরণ ঘটেছে এই খুনের মধ্যে দিয়ে।

‘একমাত্র নিরুপায় হয়ে আমরা এ ধরনের মোটিভের কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেনছ যে, মেয়ে হয়ে বাবাকে খুন করা প্রায় অসম্ভব। অথচ কোনও প্রমাণ কিংবা আশার আলো আমি দেখতে পাচ্ছি না।’

আনন্দ সান্যাল একটু থেমে দম নিলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, ‘ঘটনার দিন বিকেল চারটের কিছু আগে প্রতিদিনের মতোই নলিনাক্ষ বোস বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ফেরার সময় বাড়ির দরজায় যে-গোলাপ গাছ আছে তার কাঁটায় হাত লেগে ডক্টর বোসের বাঁ-হাত খুব সামান্য ছড়ে গিয়ে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মিসেস

বোস পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের সময় ঠাকুরঘর থেকে নীচে নেমে আসেন। প্রথমে তিনি দেওরের ঘরে যান কয়েকটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের জন্যে। কারণ ওঁর মাথা ধরার হ্যাবিট ছিল। ট্যাবলেট নেওয়ার সময় অসাবধানতায় ডক্টর বোসের বাঁ-হাতের সঙ্গে ওঁর হাতের ধাক্কা লাগে। তখনই নলিনাক্ষ বোস জানান যে, ওঁর হাত সামান্য কেটে গেছে, তাই তিনি একটু ব্যথা পেয়েছেন। অ্যাসপিরিন নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় মিসেস বোসের টিফিন খাওয়ার কথা মনে পড়ে। খাওয়ার ঘরে ঢুকেই স্বামীকে শোওয়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেই চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন—।

'তোকে তো সবই খুলে বললাম—এখন কিছু একটা ব্যবস্থা কর।' আনন্দ সান্যাল কথা শেষ করে উদগ্রীব হয়ে তাকালেন আশিস চৌধুরীর দিকে।

'কী ব্যবস্থা? অমিতা দেবীকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা?' জানতে চাইলেন আশিস।

'তা ছাড়া আর কী?'

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আশিস মুখ খুললেন, 'তোর মনে হচ্ছে যে, অমিতা বোস সেন্ট পার্সেন্ট নির্দোষ। ও কাউকে শিল্ড করার জন্যে দোষ স্বীকার করছে?' একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

'হ্যাঁ—' এবারও একইভাবে আত্মবিশ্বাসী সুরে জবাব দিলেন আনন্দ সান্যাল।

'ঠিক আছে, আমি কাল করঞ্জাক্ষ বোসের বাড়িতে যাব—কিছু দেখাশোনা আর এনকোয়ারির জন্যে। নন্দনও আমার সঙ্গে যাবে। আমি একটা মোটামুটি স্কিম ঠিক করেছি। দেখি কাল কী হয়—।'

আনন্দ সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় নেওয়ার আগে বলে গেলেন, 'আশিস, অমিতার ফেবারে কিছু প্রমাণ তোকে জোগাড় করতেই হবে। মার্ডারার ধরা না পড়ে না পড়ুক—কিন্তু একজন নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়—।'

আনন্দ সান্যাল চলে যাওয়ার পর আশিস চৌধুরী একটু হেসে মোতি চৌধুরীর দিকে ফিরলেন, বললেন, 'মোতি, আনন্দ মজেছে—।'

'কী?' কথাটা ঠিকমতো খেয়াল না করায় প্রশ্ন করল দেবনাথ।

'কিছুই না—। শুধু একটা নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্যে তৈরি থাকো বৎস,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন আশিস চৌধুরী।

পরদিন দুজনকে করঞ্জাক্ষ বোসের বাড়ির সমানে দেখা গেল। আশিস চৌধুরীর দৃষ্টি বাধা পেল বাঁ-পাশের গোলাপ গাছটায়। নীচু গলায় বললেন তিনি, 'আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য—!'

'কী হল, আশিসদা?' আশিস চৌধুরীর কথার মানে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল দেবনাথ।

'তেমন কিছু নয়। আচ্ছা, নন্দন, তুমি জানো, কী নাম এই গাছটার?'

'উহুঁ—' মাথা নাড়ল দেবনাথ।

'হুঁ—এই গাছটার নাম হল জেফিরিন ড্রাউহিন (zephyrine drouhin)। এ ধরনের গোলাপে খুব সুন্দর মিষ্টি গন্ধ হয়, আর রং হয় অনেকটা গোলাপি। এই গাছগুলো

মাধবীলতার মতো লতিয়ে বেয়ে ওঠে। এটাকে মোটামুটিভাবে এক ধরনের লতানে গোলাপগাছ বলতে পারো।'

'কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো কী হল, আশিসদা?'

'সত্যিই তাই, নন্দন, আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই হত না, যদি না এই গোলাপ গাছটার নাম জেফিরিন ড্রাউহিন হত।' নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন আশিস চৌধুরী, 'যাকগে, চলো, এখন বাড়ির ভেতর যাওয়া যাক।'

দুজনে পায়ে-পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। টুকরো বাগানটাকে পাশে ফেলে বসার ঘরে গেলেন। দেখলেন, আনন্দ সান্যাল আগেই সেখানে হাজির হয়েছেন। তিনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভবত তিনি সুকর্ণ রায়। ওদের ঢুকতে দেখে আনন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সুকর্ণ রায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'মিস্টার রায়, এঁরা হলেন আশিস চৌধুরী আর নন্দন দেবনাথ। আমাদের লাইনে খুব নাম।'

নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পালা শেষ হলে আশিস চৌধুরী বললেন, 'আনন্দ, আমি একবার মিসেস বোসের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি বাড়িতে আছেন?'

এ-কথার জবাব আনন্দ সান্যাল দিলেন না, দিলেন সুকর্ণ রায়, 'মামিমা বোধহয় ওপরে পুজোয় ব্যস্ত। আপনারা একটু বসুন, আমি এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি।' সুকর্ণ রায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

'ছেলেটিকে কেমন বুঝলি?' আনন্দ সান্যাল প্রশ্ন করলেন। তাঁর চোখে কৌতুকের হাসি।

'অতিমাত্রায় স্মার্ট,' বলল দেবনাথ।

'এবং বুদ্ধিমান,' জানালেন আশিস চৌধুরী।

এমন সময় প্রবেশ করলেন অণিমা বোস। ধীরপায়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। চটপট চেয়ার ছেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। আনন্দ সান্যাল 'আপনি বসুন, মিসেস বোস' বলে ওঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

শান্ত স্বরে অণিমা বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা বসুন।'

সবাই আবার বসলেন।

আশিস চৌধুরী মিসেস বোসকে লক্ষ করছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বয়সকালে যে সুন্দরী ছিলেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিধবার সাজে বেমানান লাগছে। কী করে এই মহিলার ওপর অত্যাচার করতেন করঞ্জাক্ষ বোস? নিতান্ত পশু না হলে এই প্রতিমার ওপরে হাত তোলা যায় না। যেন শান্ত স্থির কোনও নীল সায়রের মুখোমুখি বসেছেন আশিস চৌধুরী।

'বলুন আপনাদের কী জানার আছে?' মিসেস বোসের গলার স্বরে চমক ভাঙল আশিস চৌধুরীর। আনন্দ সান্যালকে ইশারা করতে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এবার নিজেকে তৈরি করে আশিস চৌধুরী প্রথম প্রশ্ন ছুড়লেন, 'আচ্ছা, মিসেস বোস, আপনার স্বামীকে আপনি ভালোবাসতেন?' একটু থেমে আবার বললেন, 'জানি প্রশ্নটা ভীষণ বাজে ধরনের। নিতান্ত অমানুষ না হলে কেউ এ অবস্থায় এরকম প্রশ্ন করে না। কিন্তু এই সিচুয়েশানে আমার কাছে আর কোনও অপশন নেই...।'

'ভালোবাসা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা হয়তো আমার মনে ছিল না। কিন্তু ওঁর মৃত্যুকামনাও করতাম না। বরং ওঁর ওপর আমার করুণা হত।' থেমে-থেমে জবাব দিলেন

তিনি।

‘এবারে মিসহ্যাপের দিন বিকেলের কথা কিছু বলুন। কী করছিলেন আপনি?’

‘মোটামুটি যতটা মনে আছে বলার চেষ্টা করছি, আমি সাড়ে চারটের সময় পুজো করতে তিনতলায় যাই। চারটে চল্লিশ নাগাদ, মানে মিনিট-দশেক পর, অমিতা আমাকে ডাকতে যায়। আমি তখন বলি যে, একটু পরে যাচ্ছি। তারপর পুজো সেরে, দু-একটা টুকিটাকি কাজ করে নীচে নামতে আমার বেশ দেরি হয়ে যায়। মাথাটা ধরেছিল, তাই তখন আমি ঠাকুরপোর ঘরে যাই অ্যাসপিরিন আনতে। ট্যাবলেটের শিশিটা যখন ওর হাত থেকে নিই, তখন আমার হাতের বালাটা ঠাকুরপোর বাঁ-হাতে লাগতেই ও ”উঃ” করে ওঠে। আমি জিগ্যেস করি, ”কী হল?” ও বলল, ”ও কিছু নয়।” আমি চেপে ধরতে তখন ঠাকুরপো বলল, ”গেটের গোলাপ গাছটায় হাত লেগে সামান্য কেটে গেছে।” আমি দেখলাম, বাঁ-হাতের কবজির কাছে। একফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। একটু ফুলে আছে চারপাশটা। বললাম, ”ওসব বাজে কথা বাদ দিয়ে চটপট ওষুধ লাগাও।” আমি ঘর থেকে বেরোতেই আমার খাওয়ার কথা মনে পড়ল। তখন খাওয়ার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই যা দেখলাম তাতে পাথর হয়ে গেলাম।’ মিসেস বোসের গলা বুজে গেল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আশিস চৌধুরী সেটা লক্ষ করলেন, বললেন, ‘ঠিক আছে, মিসেস বোস, আর কিছু আমি জানতে চাই না।’

‘আপনারা কি কিছু খাবেন? চা—টা—?’ ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন অণিমা দেবী।

‘নাঃ, তার কোনও দরকার নেই,’ হেসে বলল দেবনাথ, ‘আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আচ্ছা আশিসদা, এবার ওঠা যাক।’

তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন।

মিষ্টি হেসে নমস্কার করে বিদায় জানালেন অণিমা বোস।

বাড়ির বাইরে এসে আশিস চৌধুরী বললেন, ‘আনন্দ, আজ বিকেলে আমি নলিনাক্ষ বোসের সঙ্গে দেখা করব। তুই এখানে প্রেজেন্ট থাকিস।’

‘ঠিক আছে। চারটে সাড়ে-চারটের মধ্যেই আমি এখানে চলে আসব। এখন চলি।’

দুজন সেপাই কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দ এগোতেই ওরাও ‘স্যার’-এর পিছু নিল।

আশিস চৌধুরী একবার তাকালেন হাতঘড়ির দিকে। বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

বিকেলে ডক্টর নলিনাক্ষ বোসের সঙ্গে মাঝরাস্তাতেই দেখা হল। বোধহয় রোজকার ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। সামনে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন আশিস চৌধুরী, ‘আমার নাম আশিস চৌধুরী, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে আপনিই বোধহয় ডক্টর বোস?’

‘হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু—’ ভদ্রলোকের কপালের ভাঁজ বেড়ে গেল।

‘আপনি আমাকে চিনবেন না। ইন্সপেক্টর আনন্দ সান্যালের বন্ধু আমি। আপনার দাদার মার্ডারের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েছে, তাই আপনার সঙ্গে সামান্য একটু আলোচনা

করতে চাই—ওই খুনের ব্যাপারটা নিয়েই—।'

'চলুন, তা হলে বাড়িতে গিয়ে বসা যাক—রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো আর কথা হতে পারে না।।'

'তাই চলুন।'

ওঁরা দুজনে এগিয়ে চললেন 'বোস ভিলা'র দিকে। বসবার ঘরে গিয়ে মুখোমুখি বসলেন। একজন কাজের লোককে ডেকে দু-কাপ চা, জলখাবারের কথা বললেন ডক্টর বোস। তারপর আশিস চৌধুরীর দিকে ফিরে বললেন, 'বলুন, মিস্টার চৌধুরী—কী জানতে চান আপনি?'

আশিস চৌধুরী স্থির দৃষ্টিতে নলিনাক্ষ বোসকে লক্ষ করেছিলেন। বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। রগের কাছে চুল পুরোপুরি সাদা। ভাবলেশহীন ছাঁচে ঢালা মুখ। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেশ মানিয়েছে।

এমন সময় চা-জলখাবার হাতে ঘরে ঢুকলেন অণিমা বোস।

'এ কী, বউদি, তুমি কেন?' আশ্চর্য হয়ে বললেন ডক্টর বোস, 'সুরেনের কী হল? তোমাকে বারণ করলেও তুমি শুনবে না, বলে আর কী হবে!' একটু রেগেই কথা শেষ করলেন তিনি।

'ঠাকুরপো, এতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি। তা ছাড়া একটু-আধটু কাজ করলে কী আছে—' হাসিমুখে তরল কণ্ঠে জবাব দিলেন মিসেস বোস। তারপর আশিস চৌধুরীকে লক্ষ করে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, কদ্দুর কী হল?' অর্থপূর্ণভাবে থামলেন তিনি।

'চেষ্টা তো করছি,' মৃদুস্বরে বললেন আশিস চৌধুরী। কিন্তু তিনি ভাবছিলেন অণিমা বোসের মানসিক দৃঢ়তার কথা। এতবড় আঘাতে মনে-মনে ভেঙে পড়লেও বাইরে তা এতটুকুও প্রকাশ করছেন না। আশ্চর্য!

'দেখুন কী করতে পারেন,' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মিসেস বোস।

আশিস চৌধুরী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করার জন্য তৈরি হলেন। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলেন আনন্দ সান্যাল, সঙ্গে দুজন পুলিশ কনস্টেবল।

ওঁকে দেখেই ডক্টর বোস উঠতে যাচ্ছিলেন, সম্ভবত আর-এককাপ চায়ের কথা বলতে, ওঁকে বাধা দিলেন আনন্দ সান্যাল: 'না, মিস্টার বোস, আমি চায়ের ব্যাপারটা সেরে এসেছি। ডোন্ট মাইন্ড—। যাকগে, আশিস, আর দেরি কেন? শুরু কর।' বলে বসলেন আনন্দ সান্যাল।

'আচ্ছা, ডক্টর বোস, আপনি কি বাড়িতেই ওষুধপত্তর রাখেন?' প্রশ্ন করলেন আশিস চৌধুরী।

'হ্যাঁ।'

'তার মধ্যে মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'ঘটনার দিন, অথবা তার আগে, কি আপনার কোনও ওষুধের ফাইল চুরি গিয়েছিল?'

‘আপনি যা হিন্টস দিচ্ছেন, তা সত্যি,’ ইতস্তত করে জবাব দিলেন নলিনাক্ষ বোস, ‘গতমাসের ১৬ তারিখে, রাতে, আমি লক্ষ করি যে, আমার স্টক থেকে একটা মরফিনের ফাইল হারিয়ে গেছে।’

‘হারিয়ে গেছে বলছেন কেন?’

‘প্রথমে ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি হারিয়ে নয়—চুরিই গিয়েছিল ওটা।’

‘এবং চুরি যাওয়াটা স্বাভাবিক।’ বললেন আশিস চৌধুরী। একটু থেমে আবার বললেন, ‘আপনি এ নিয়ে কোনও হইচই করেননি?’

‘হ্যাঁ, বউদিকে দাদাকে জিগ্যেস করেছিলাম। তা ছাড়া অনেক খোঁজাখুজিও করেছিলাম। কিন্তু কোথাও পাইনি। পরে ভেবেছি যে, আমার নিজের হয়তো হিসেবে ভুল হয়েছে। তাই ও নিয়ে আর চিন্তা করিনি।’

‘আপনি সুকর্ণবাবুকে প্রশ্ন করতে পারতেন। তিনি হয়তো তার কোনও দরকারে নিয়ে থাকতে পারেন…।’

‘ও নরমালি আমার কাছ থেকে কোনওদিন ওষুধ নেয় না। আর নিয়ে থাকলে ও আমাদের খোঁজাখুঁজি করতে দেখে আমাকে জানাত। তা ছাড়া নেওয়ার সময় আমাকে বলেই নিত সুকর্ণ।’

ভদ্রলোকের যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে বেশ অবাক হলেন আশিস চৌধুরী। একটু থেমে বললেন, ‘ডক্টর বোস, এবার আপনাকে যে-প্রশ্নটা করব সেটার উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং এ বিষয়ে আপনার মতামত ভীষণ ইমপরট্যান্ট।’

‘বলুন—।’

‘আপনার দাদার ক্যারেক্টার কী টাইপের ছিল? এ সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?’

‘বলাটা কী উচিত হবে না,’ ইতস্তত করে বললেন ডক্টর বোস, ‘তবু এটুকু আমি বলব যে, দাদা মানুষ ছিলেন না।’ তার মুখ কুঁচকে গেল। সম্ভবত ঘেন্নায়।

‘আপনার মতামতের জন্যে ধন্যবাদ।’

‘কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, দেখবেন, এ-কথা যেন বউদি না জানতে পারে।’

‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন,’ আশ্বাস দিলেন আশিস চৌধুরী, ‘আচ্ছা, এবার ঘটনার দিন বিকেলে যা-যা, যেভাবে ঘটেছিল, বা আপনি যেভাবে ঘটতে দেখেছিলেন তা খুলে বলুন।

‘তার মানে আমার হোয়্যার অ্যাবাউটস? সে তো পুলিশকে একবার বলেছি—’ আনন্দ সান্যালের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বিরক্ত স্বরে জবাব দিলেন তিনি।

‘আমি আপনার মুখ থেকেই আবার শুনতে চাই।’ দৃঢ়স্বরে বললেন আশিস চৌধুরী।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মুখ খুললেন ডক্টর নলিনাক্ষ বোস, ‘ঠিকমতো মনে নেই, তবু যতটা পারি গুছিয়ে বলছি। সেটা ছিল ১৭ তারিখ। বিকেল প্রায় সাড়ে চারটের সময় আমি প্রতিদিনের মতো ইভনিংওয়াক সেরে বাড়ি ফিরি—।’

এইসময় বাধা দিলেন আশিস চৌধুরী, বললেন, ‘তখন আপনার বাঁ-হাতে গোলাপের কাঁটা ফুটে যায়—।’

‘হ্যাঁ,’ স্বীকার করলেন ডক্টর বোস, ‘ওটা খুবই সামান্য ব্যাপার, অথচ সেটা নিয়ে বউদি হইহই কাণ্ড শুরু করে দিয়েছিল—’ আনমনেই হাসলেন তিনি। তারপর আবার শুরু করলেন, ‘বাড়ি ফিরে খাওয়ার টেবিলেই দেখা হল দাদা আর সুকর্ণর সঙ্গে। আমিও গিয়ে বসলাম ওদের পাশে। এমন সময় অমিতা এসে ঘরে ঢুকল, বলল, ”তোমাদের খাবারটা দিই এখন?” দাদা বললেন, ”হ্যাঁ দে—।” অমিতা চলে গেল। সুকর্ণর সঙ্গে আমার টুকটাক কিছুক্ষণ কথা হল। হঠাৎ দাদা বললেন, ”নলিন, দ্যাখ তো, অমিতা রান্নাঘরে এতক্ষণ ধরে কী করছে?” আমি মিনিটখানেক পরেই উঠলাম—।’

‘তখন ক’টা বেজেছিল বলতে পারেন?’ জানতে চাইলেন আশিস চৌধুরী।

‘চারটে বেজে মিনিট-পঁয়তাল্লিশ হবে—একজ্যাক্টলি মনে নেই। যা হোক, রান্নাঘরে গিয়ে দেখি অমি সেখানে নেই। এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছি, এমন সময় ও এসে ঢুকল। আমি বললাম, ”কী রে অমি, তুই কোথায় গিয়েছিলি? আমরা সব টেবিলে বসে থেকে-থেকে হয়রান হয়ে গেলাম। তারপর দাদা তোকে ডাকতে পাঠাল।” ও জবাব দিল, ”ছোটকা, তুমি খাওয়ার ঘরে বোসো গিয়ে—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।” তখন আমি আবার ডাইনিং রুমে ফিরে আসি। দাদা তখন টেবিলে রাখা খবরের কাগজটা পড়ছিল, আর সুকর্ণ চুপচাপ বসেছিল।

‘খাওয়াদাওয়ার পর অমিতা আমার আর দাদার জন্যে চা তৈরি করে। বাড়ির আর কেউ চা খায় না। আমি টি-পট থেকে চা ঢেলে দাদাকে দিই, নিজেও নিই। চা খাওয়ার পর অমিতা এঁটো কাপ-টাপগুলো নিয়ে যায় রান্নাঘরে। সুকর্ণ উঠে চলে যায় নীচে। আমার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করাতে আমিও আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

‘প্রায় পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের সময় বউদি এল অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট নিতে। ট্যাবলেট দেওয়ার সময় বউদির বালায় আমার বাঁ-হাতের কবিজতে ঠোকা লাগে। আমি যন্ত্রণায় ”উঃ” করে উঠি। বউদির পীড়াপীড়িতে আমি কীভাবে হাতে কেটে গেছে সেটা বলি। তখন বউদি আমাকে ওষুধ লাগাতে বলে চলে যায়। তার মিনিটখানেক পরেই বউদির চিৎকার আমার কানে আসে—।’ নলিনাক্ষ বোস থামলেন।

‘ডক্টর বোস, আপনার কাটা জায়গাটা দেখাবেন?’

‘এখন আর কিছুই বুঝতে পারবেন না। তবে দেখতে চান দেখুন—’ নিস্পৃহ গলায় এ-কথা বলে নলিনাক্ষ বোস বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আশিস চৌধুরীর দিকে। খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন আশিস চৌধুরী। এতদিন পর ক্ষতের কোনও চিহ্নই আর নেই।

‘আচ্ছা, ডক্টর বোস,’ হাত তুলে নমস্কার জানালেন আশিস চৌধুরী, ‘আজ আমরা উঠি, রাত হয়ে গেল।’

‘আচ্ছা, নমস্কার—।’

বাইরে বেরিয়ে আশিস চৌধুরী বললেন, ‘আনন্দ, স্যান্ডউইচে মরফিন মেশানোর সুযোগ ডক্টর বোস পেয়েছিলেন।’

‘কখন?’

‘যখন তিনি অমিতা বোসকে ডাকতে রান্নাঘরে যান।’

‘কিন্তু আশিস, তা যদি হত তবে অমিতা বোস একটু অন্যরকম জবানবন্দি দিতেন।’

‘তার মানে?’ উৎসুক হলেন আশিস।

'মিস বোস যদি কাকাকে শিল্ড করতে চাইতেন তবে বলতেন যে, তিনি গাছে জল দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার পর ডক্টর বোস ওঁকে খুঁজতে রান্নাঘরে আসেন, তাই না?'

'হুঁ,' চিন্তিতভাবে বললেন আশিস চৌধুরী, 'ব্যাপার ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

পরদিন সকালে আশিস চৌধুরী একাই 'বোস ভিলা'র দিকে রওনা দিলেন। আজ তিনি সুকর্ণ রায়ের সঙ্গে কথা বলবেন। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এই করঞ্জাক্ষ বোস। যতই দিন গেছে মৃত্যু ততই নিশ্চিতভাবে ওঁর দিকে এগিয়ে এসেছে। তিনি কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে, ওঁর প্রিয় চিকেন স্যান্ডউইচই ওঁর মৃত্যু ডেকে আনবে?

পায়ে-পায়ে 'বোস ভিলা'র সামনে এসে হাজির হলেন আশিস চৌধুরী। দরজার সামনেই সুকর্ণ রায়ের সঙ্গে দেখা হল। বোধহয় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন। আশিস চৌধুরীকে দেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। উত্তরে হাসলেন আশিস চৌধুরী: 'আপনাকেই দরকার, কিছু কথা ছিল—।'

'আসুন—ভেতরে আসুন।' আশিস চৌধুরীকে ভেতরে নিয়ে চললেন সুকর্ণ রায়। সুকর্ণর বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। মুখমণ্ডলে বুদ্ধির ছাপ। অতল চোখে সপ্রতিভ দৃষ্টি। সরু গোঁফ, তীক্ষ্ন নাক, পরনে সাহেবি পোশাক।

ড্রইংরুমে গিয়ে বসলেন দুজনে। কোনওরকম ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন আশিস চৌধুরী, 'মিস্টার রায়, আপনি এখানে মামার কাছে আছেন তাই না?'

'হ্যাঁ,—' মাথা নীচু করে জবাব দিলেন সুকর্ণ রায়।

'কিছু মনে করবেন না। আমাদের সব ব্যাপারেই নির্লজ্জ হতে হয়। সেজন্যে আমাদের কেউ পছন্দ করে না।' চেষ্টা করে হাসলেন আশিস চৌধুরী।

'ছি—ছি, মিস্টার চৌধুরী, এ আপনি কী বলছেন? আমি কিছুই মনে করিনি। আপনি বলুন, আর কী জানতে চান?'

'আপনি জানতেন যে, একটা মরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের ফাইল গত মাসের ১৬ তারিখে, মানে, আপনার বড়মামা মারা যাওয়ার আগের দিন রাতে, ডক্টর বোসের স্টক থেকে চুরি গেছে?'

'হ্যাঁ, ছোটমামাই আমাকে বলেছিলেন সে-কথা। আমি শুনে খুবই অবাক হয়েছিলাম। কারণ আজ পর্যন্ত ছোটমামার স্টক থেকে কোনওদিনই কিছু চুরি যায়নি।'

চুরি যায়নি বলতে কি আপনি হারায়নি বলতে চাইছেন?' জিগ্যেস করলেন আশিস চৌধুরী।

'হ্যাঁ। কিন্তু পরদিন মরফিন পয়জনিং-এ বড়মামা মারা যাওয়ায় এখন মনে হচ্ছে ওটা চুরিই গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, আপনার বড়মামার ব্যবহার কেমন ছিল?'

'আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করতেন।' 'আমার সঙ্গে' কথাটার ওপরে জোর দিলেন সুকর্ণ।

‘তার মানে আর সবায়ের সঙ্গে ওঁর ব্যবহার ভালো ছিল না?’

‘দেখুন, ব্যাপারটা ডেলিকেট। সেটা কি বলা ঠিক হবে!’ ইতস্তত করতে লাগলেন সুকর্ণ রায়।

‘আপনি যা বলবেন তা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।’ সুকর্ণকে আশ্বাস দিলেন আশিস চৌধুরী।

‘ব্যাপারটা কী জানেন? মামা একজন ড্রাংকার্ড ছিলেন। হয়তো সেইজন্যেই মামার ব্যবহার একটু রুক্ষ ছিল। মামিমার ওপর তিনি যা টরচার করতেন সেটা আর কেউ হলে হয়তো সহ্য করত না।’ আবেগের গলায় বললেন সুকর্ণ।

‘আর কেউ বলছেন কেন? আপনার মামিমাও হয়তো সহ্য করেননি... তাই...’ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে সুকর্ণর দিকে তাকালেন আশিস চৌধুরী।

‘অসম্ভব!’ উত্তেজিত হয়ে বললেন সুকর্ণ।

‘কেন? অসম্ভব কেন?’

‘কারণ মামিমা সেখানে, মানে, স্পটে ছিলেন না।’

‘স্যান্ডউইচে মরফিন মেশানোর জন্যে স্পটে থাকার দরকার হয় না, মিস্টার রায়। যাকগে, বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ১৭ তারিখ বিকেলের ঘটনাগুলো আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।’

‘মিস্টার চৌধুরী, এতদিন পরে স্মৃতি কিছুটা ঝাপসা হলেও হতে পারে। তবে আপনার বুঝতে বোধহয় অসুবিধে হবে না। চারটে কুড়ি নাগাদ আমি খাওয়ার টেবিলে যাই। ওখানে বড়মামা একাই ছিলেন। একটু পরে ছোটমামা আসেন। অমিতা এসে জিগ্যেস করল খাবার দেবে কিনা। বড়মামা বললেন, ”হ্যাঁ, দে—।” ও চলে যাওয়ার পর ছোটমামার সঙ্গে ওয়েদার নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। অমিতার দেরি হচ্ছে দেখে বড়মামা হঠাৎ ছোটমামাকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। ছোটমামা চলে গেলেন। বড়মামা আমাকে জিগ্যেস করলেন, ”সুকর্ণ, পড়াশোনা কেমন চলছে?” ”হচ্ছে একরকম।” বললাম আমি। এরপর বড়মামা চুপচাপ খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে থাকেন।

‘একটুপরে ছোটমামা এলেন। অমিতা এসে আমাদের খাবার পরিবেশন করল। তারপর ছোটমামা আর বড়মামা চা খেলেন। চা খাওয়ার শেষে শরীরটা ভালো লাগছে না বলে ছোটমামা উঠে চলে গেলেন। আমিও প্রায় একই সঙ্গে খাওয়ার ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যাই। অনেকক্ষণ পর মামিমার চিৎকারে ওপরে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি বড়মামা টেবিলে পড়ে আছেন।’ থামলেন সুকর্ণ রায়।

‘আপনি তো ডাক্তারি পড়েন—মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড সম্বন্ধে আপনার মত কী?’ প্রশ্ন করলেন আশিস চৌধুরী।

‘আমার চেয়ে ছোটমামাই হয়তো ভালো বলতে পারবেন।’

‘আমি আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাই।’

‘এক গ্রেন মরফিন একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।’ জানালেন সুকর্ণ। এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সুকর্ণ একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। ওঁর মুখে এবার সেই বিরক্তির ছাপ দেখা গেল: ‘আপনি কী চান বলুন তো?’

‘আপনার বড়মামার আসল মার্ডারারকে খুঁজে বের করতে—।’

‘অমিতাকে আপনি নির্দোষ মনে করেন?’

কিছুক্ষণ চিন্তা করে আশিস চৌধুরী বললেন, ‘যদি বলি তাই?’

‘কিন্তু অমিতা নিজে কনফেস করেছে।’

‘সেটা আর কাউকে বাঁচানোর জন্যে।’ আশিস চৌধুরীর কথাগুলো বজ্রপাতের মতো গিয়ে বাজল সুকর্ণ রায়ের কানে। হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন তিনি। নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন: ‘আর-কাউকে বাঁচানোর—?’

সুকর্ণ রায়কে বিহ্বল অবস্থায় রেখে নিঃশব্দে ‘বোস ভিলা’র বাইরে পা দিলেন আশিস চৌধুরী। একটা জিনিস তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সুকর্ণ রায়কে বাঁচানোর জন্য অমিতা বোস মিথ্যে কথা বলছেন না।

‘আশিসদা, তার মানে একটা সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছতে পারছি—সেটা হল অমিতা বোস যাকে শিল্ড করতে চাইছেন, তিনি অণিমা বোস ছাড়া আর কেউ নন।’ আশিস চৌধুরীর মুখ থেকে সব শোনার পর বলল দেবনাথ।

‘ঠিক তাই,’ বললেন আশিস চৌধুরী, ‘কিন্তু কেন? মিসেস বোসের অ্যালিবাইতে কি কোনও ফাঁক আছে?’

‘থাকতেই হবে। এমন ফাঁক, যাতে অমিতা বোস মনে করেছেন যে, ওঁর মা ওই সময়টা স্যান্ডউইচে মরফিন মেশানোর কাজে খরচ করেছেন। তাই পুলিশের কোনও কথারই প্রতিবাদ করছেন না।’

‘হতে পারে। কিন্তু আজই আমাকে অমিতা বোসের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেখি আনন্দকে একবার ফোন করে—।’ বলে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন আশিস চৌধুরী। ডায়াল করলেন।

‘হ্যালো, ইন্সপেক্টর সান্যাল আছেন?’

‘কথা বলছি। আশিস নাকি?’

‘হুঁ—।’

‘আরে কী ব্যাপার? কিছু সূত্র-টুত্র পেলি নাকি? যাতে অমিতা বোসকে ছাড়ানো যায়, আর...।’

‘আসল মার্ডারার কে, সেটা তোর জানার ইচ্ছে নেই?’

‘জেনে কী হবে?’

‘দারুণ জবাব দিলি। সাবাশ। এই তো চাই। ভালোবাসার জন্যে প্রমোশনের মোহ ক’জন ইন্সপেক্টর ছাড়তে পারে!’

‘ইয়ার্কি ছেড়ে আসল কথা বল—।’

‘আজ আমি তোমার ওই ইয়ের সঙ্গে থানার দেখা করতে যাব। কিছু কথাবার্তা আছে।’

‘অমিতার সামনে আমার প্রেস্টিজ ডোবাস না মাইরি!’

‘কোনও ভয় নেই, বৎস। শুধু গুরুর বচন ফলো করে যা। আমি বিকেলে যাচ্ছি—তুই থাকিস।’

‘আচ্ছা—।’

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আশিস চৌধুরী। তারপর মোতি চৌধুরীর দিকে ফিরে বললেন, ‘ভালো দেখে একটা শাড়ি কিনে রেখো।’

মোতি চৌধুরীর চোখে অর্থহীন দৃষ্টি দেখে আবার বললেন, ‘কাল-পরশুই আমি এ ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব। আর আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তবে তারপরই’, ভুরু নাচিয়ে হাসলেন আশিস চৌধুরী: ‘সানাই বাজবে।’

আশিস চৌধুরীর মুখোমুখি বসে ছিলেন শ্রীমতী অমিতা বোস। দুজনের মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা আয়তাকার কাঠের টেবিল। আশিস চৌধুরীর ডানপাশে একটা চেয়ার দখল করে বসেছিলেন আনন্দ সান্যাল। এক অদ্ভুত মনোযোগে তাকিয়ে ছিলেন অমিতা বোসের বিষাদ মধুর মুখের দিকে।

‘মিস বোস,’ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন আশিস চৌধুরী, ‘গত ১৭ তারিখের ব্যাপারগুলো আমাকে একটু খুলে বলুন। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেবেন না।’

অমিতা বোসের মুখে বিরক্তির ছায়া খেলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুললেন তিনি, ‘দেখুন মিস্টার...।’

‘চৌধুরী। আশিস চৌধুরী।’

‘দেখুন, মিস্টার চৌধুরী, আমার ঠিকমতো সবকিছু মনে নেই। তবু যা-যা মনে আছে বলছি...।’

‘ঘটনর দিন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ আমি খাওয়ার ঘরে যাই। তখন সেখানে ছিলেন ছোটকাকা, সুকর্ণদা আর বাবা। আমি জিগ্যেস করি যে, খাবার আনব কি না। তখন বাবা বললেন, ”হ্যাঁ, দে—।” আমি স্যান্ডউইচগুলো আনতে রান্নাঘরে যাই। তারপর মায়ের কথা মনে পড়তে স্যান্ডউইচগুলো রেডি করে মা-কে ডাকতে তিনতলায় ঠাকুরঘরে গেলাম। মা পুজো করছিল। আমি ডাকতে বলল, ”যাচ্ছি, যা—।” সেখান থেকে আমি গাছে জল দেওয়ার জন্যে বাগানে যাই।

‘গাছে জল দিয়ে রান্নাঘরে ফেরার পথে মা-কে আর-একবার তাড়া দিয়ে গেলাম। ফিরে গিয়ে দেখি ছোটকাকা রান্নাঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখছেন। আমাকে দেখে বললেন যে, বাবা নাকি দেরি হচ্ছে দেখে আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। ট্রে-র ওপর স্যান্ডউইচগুলো সাজানোই ছিল। ছোটকাকা চলে যাওয়ার পর আমি সেগুলো খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেলাম—।’

এইখানে বাধা দিলেন আশিস চৌধুরী। বললেন, ‘আচ্ছা, একমিনিট। রান্নাঘরে স্যান্ডউইচগুলো যেভাবে রেখে আপনি মিসেস বোসকে ডাকতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেও কি দেখেন যে, সেগুলো একইভাবে রয়েছে?’

‘না, মানে—আমার ঠিক মনে নেই। বোধহয় ঠিকই ছিল। আর ওগুলোতে কেই-বা হাত দেবে?’

‘হুঁ, সত্যিই তো! আর কেই বা হাত দেবে? খুনি ছাড়া আর কারও তো হাত দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না!’

‘কী বলতে চাইছেন আপনি? তার মানে ছোটকা—।’

‘—এবং অণিমা বোস এবং সুকর্ণ রায় এবং অমিতা বোস।’ আশিস চৌধুরীর কণ্ঠস্বর যেন মিছরি মাখা ছুরি।

আনন্দ সান্যাল চেয়ারের তলা দিয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়ে আশিস চৌধুরীকে ছোট্ট চিমটি কাটলেন। চাপা গলায় বললেন, ‘আশিস, কী হচ্ছে এসব?’

আশিস চৌধুরী বন্ধুকে আশ্বস্ত করার জন্য প্রসঙ্গ পালটালেন: ‘যাকগে—ওসব ছেড়ে দিন, মিস বোস, আপনি বরং তার পর থেকে বলুন...।’

অমিতা বোস ধীর স্বরে আবার শুরু করলেন, ‘কিছুক্ষণ পর আমি খাবার নিয়ে গেলাম। সবার খাওয়ার পর বাবা আর ছোটকাকার জন্যে চা তৈরি করলাম। খাওয়ার পাট চুকে গেলে আমি এঁটো কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে রান্নাঘরে যাই। ওগুলো ধুয়ে, মেজে, পরিষ্কার করে, গুছিয়ে রাখার সময় হঠাৎ মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে খাওয়ার ঘরে যাই। গিয়ে দেখি বাবা টেবিলে লুটিয়ে পড়ে আছেন। বুঝলাম, বাবা আর নেই।’ দু-হাতে মুখ ঢাকলেন অমিতা বোস।

‘মিস বোস,’ আশ্বাস ও সান্ত্বনার স্বরে বললেন আনন্দ সান্যাল, ‘দয়া করে ধৈর্য হারাবেন না। আপনার বাবার জঘন্য খুনের জন্যে যে দায়ী তাকে আমরা কোর্টে তুলবই।’

‘আমিই দায়ী, আমিই দায়ী। আমাকে ফাঁসি দিন আপনারা—।’ কান্নায় ভেঙে পড়লেন অমিতা বোস।

আশিস চৌধুরী আনন্দ সান্যালের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন। তারপর অমিতা বোসের দিকে চেয়ে বললেন, ‘মিস বোস, আপনার মা খুন করেননি। শি ইজ ক্লিন—।’

অমিতা বোস মাথা নীচু করে বসেছিলেন। এ-কথায় যেন মন্ত্রের মতো কাজ হল। চমকে মুখ তুলে তাকালেন। জল ভরা টানা চোখে বিহ্বল চাউনি। যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিস্ময়ে ওঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘মা নির্দোষ?’

‘হ্যাঁ, মিস বোস, আপনার মা পুরোপুরি ইনোসেন্ট।’

হঠাৎই নিজের অবস্থার কথা অমিতা বোসের খেয়াল হল। চোখের জল মুছে আশিস চৌধুরীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললেন, ‘আপনি হঠাৎ এ-কথা বললেন কেন, মিস্টার চৌধুরী?’

‘কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনি অণিমা দেবীকে বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিচ্ছেন। আপনার জবাববন্দিতে একটু আগেই আপনি বলেছেন, ”ফেরার পথে মা-কে আর-একবার তাড়া দিয়ে গেলাম।” অথচ আপনার মা বলেছেন যে, আপনি ওঁকে মাত্র একবারই ডেকেছেন—আপনার কথা মতো দুবার নয়। তার মানে, দ্বিতীয়বার আপনার মা ঠাকুরঘরে ছিলেন না। রান্নাঘরে ফেরার সময় আপনি হয়তো ওঁকে রান্নাঘর থেকে বেরোতে দেখেন। আপনার মা হয়তো অন্য কোনও তুচ্ছ কারণে ওখানে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু আপনি ভাবলেন, যদি পুলিশ এই কথা জানতে পারে তবে অণিমা বোস রেহাই পাবেন না। আপনি একরকম ধরেই নিয়েছিলেন যে, আপনার মা এই খারাপ কাজটা করেছেন। তাই ওঁকে বাঁচানোর জন্যে এ-কথাটা চেপে গেলেন। অণিমা দেবী ওঁর

জবানবন্দিতে এ-কথাটা সামান্য বলেই উল্লেখ করেননি। কিন্তু, মিস বোস, আপনার কোনও ভয় নেই। অণিমা দেবী কালপ্রিট নন।' থামলেন আশিস চৌধুরী।

'মিস্টার চৌধুরী, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না—' আনন্দে অমিতা বোসের গলা বুজে গেল। ওঁর চোখে সজীব প্রাণবন্ত ভাব আবার ফিরে এল।

আশিস চৌধুরী বললেন, 'মিস বোস, এবার জানা গেল যে, স্যান্ডউইচে বিষ আপনি মেশাননি—।'

'—মা-ও মেশাননি।' ধরিয়ে দিলেন অমিতা বোস।

'সম্ভবত। আপনার মা যদি হত্যাকারী না হন, তবে আমিই বোধহয় সবচেয়ে খুশি হব।'

'তা হলে কি...' সন্দেহ-কুটিল ছায়া কেঁপে উঠল অমিতা বোসের চোখের পাতায়, 'তা হলে কি...?'

'ঠিকই ধরেছেন। আপনি যে নির্দোষ, সেটা আপনার মুখ থেকে আমার শোনা দরকার ছিল।'

আনন্দ সান্যাল পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মিস বোস, আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। আপনার মা, মানে, অণিমা বোসের স্বপক্ষে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। খুনি হয় সুকর্ণ বোস, নয় ডক্টর নলিনাক্ষ বোস।'

আনন্দ সান্যালের আশ্বাস কিছুটা কাজ হয়তো হল। কারণ অমিতা আর কোনওরকম অস্থির ভাব দেখালেন না। মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

'আচ্ছা মিস বোস,' আবার শুরু করলেন আশিস চৌধুরী, 'আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

'কী করে বলব—?' দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন অমিতা।

'আপনার বাবা কি সুইসাইড করতে পারেন বলে মনে হয়?'

'কক্ষনো নয়—' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন অমিতা বোস, 'বাবা এই দুনিয়াটাকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করে যেতে চেয়েছিলেন। দু-হাতে পয়সা ছড়িয়েছেন। তাঁর আরও বহুদিন বাঁচার ইচ্ছে ছিল। তাঁর মৃত্যু কখনওই সুইসাইড হতে পারে না।'

'করঞ্জাক্ষ বোস অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন।' আপনমনেই বললেন আশিস চৌধুরী, 'যাক, মিস বোস, আমার আর কিছু জানার নেই।' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। যাওয়ার আগে আনন্দ সান্যালকে বললেন। 'আনন্দ, মিস বোসকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করিস।'

'আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি,' চটপট জবাব দিলেন আনন্দ সান্যাল।

হঠাৎ কী মনে পড়তেই যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন আশিস চৌধুরী, বললেন, 'ওহ, ভুলেই গিয়েছিলাম। আনন্দ, মরফিনের ছেঁড়া লেবেলটা আমাকে দে এক্ষুনি—।'

'দিচ্ছি। পাঁচমিনিট অপেক্ষা কর', ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আনন্দ সান্যাল।

কিছুক্ষণ অখণ্ড নীরবতার পর আশিস চৌধুরী বললেন, 'আপনার এই রিলিজের জন্যে আনন্দকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ও দিনরাত ঘোরাঘুরি করে, আমার কাছে গিয়ে, নানাভাবে আমাকে কনভিন্স করিয়েছে যে, আপনি নির্দোষ। তখনই আমি কেসটা টেকআপ করেছি।'

অমিতা বোস কোনও কথা বললেন না।

আনন্দর সপক্ষে কিছু বলতে পেরে একটু হালকা হলেন আশিস চৌধুরী।

এমন সময় একটা সাদা খাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন আনন্দ সান্যাল: 'এই নে তোর মরফিনের লেবেল।'

হাত বাড়িয়ে খামটা নিলেন আশিস চৌধুরী। 'লেবেলটা হাতে ধরছি কিন্তু,' বলে ওটাকে বের করলেন খামের ভেতর থেকে। কিন্তু বের করেই চমকে উঠলেন। এ কী? মুখে বললেন, 'আনন্দ, লেবেলটার ব্যাপারে আমি যা ভাবছি, তা যদি সত্যি হয় তা হলে মার্ডারার কে তা আমি বোধহয় ধরে ফেলেছি। আশ্চর্য...! আচ্ছা, আনন্দ—আগামীকাল বিকেলে সবাইকে আসতে বলিস আমার বাড়িতে। আর তুই মার্ডারারকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আসিস। আমি তোর জন্যে ওয়েট করব।' দ্রুতপদে থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন আশিস চৌধুরী।

নাটকের শেষ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য আশিস চৌধুরীর বাড়ির ড্রইংরুমে। একনজর দেখলেই বোঝা যায় মঞ্চসজ্জার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন তিনি। ন'টা চেয়ার গোল করে সাজানো। মাঝের খালি জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলেন আশিস চৌধুরী। পাইপ জ্বালিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। ওঁর চোখের নজর সবার মুখের ওপর দিয়ে পিছলে গেল। মোতি চৌধুরী, নন্দন দেবনাথ, আনন্দ সান্যাল, অমিতা বোস, অণিমা বোস, নলিনাক্ষ বোস, সুকর্ণ রায় ও আরও দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক। সকলেই দু-চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন আশিস চৌধুরীর দিকে। উৎকণ্ঠার সুতোয় ঝুলছেন যেন প্রত্যেকে!

'এই দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বোধহয় আপনাদের আলাপ নেই,' অপরিচিত দুজনকে দেখিয়ে আশিস চৌধুরী শুরু করলেন, 'ইনি হলেন, মিস্টার অমিতাভ ভট্টাচার্য, ডক্টরেট ইন কেমিস্ট্রি—এবং ইনি হলেন মিস্টার সোমনাথ ঘোষ, করঞ্জাক্ষ বোসের অ্যাটর্নি। আজ এখন যে সমাধান আমি আপনাদের সামনে পেশ করব তাতে এঁদের অবদান কম নয়।

'করঞ্জাক্ষ বোস নিজেই নিজের মৃত্যুবীজ পুঁতেছিলেন। ওঁর মৃত্যু-রহস্য এতই অদ্ভুত যে, শুনলে অবাক হতে হয়। হত্যাকারী তার পরিকল্পনায় বিদ্যে-বুদ্ধির চমৎকার মিলন ঘটিয়েছে। আপনারা জানেন, করঞ্জাক্ষ বোস মারা গেছেন মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড পয়জনিং-এ। সেই অনুযায়ী মরফিনের একটা ছেঁড়া লেবেলও আমরা ঘটনাস্থলে পেয়েছি। এই সেই লেবেল—' পকেট থেকে ছেঁড়া লেবেলটা বের করে সবাইকে দেখালেন আশিস চৌধুরী: 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এটা মরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের লেবেল। আনন্দর মুখে শুনে আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু লেবেলটি দেখামাত্রই আমার সন্দেহ হয়। লেবেলে মরফিন শব্দের "এম" অক্ষরটি ছোটহাতের। কিন্তু কেন? আমি সন্দেহ যাচাই করতে একজন কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট-এর দোকানে গেলাম। লেবেলটা দেখিয়ে জানতে চাইলাম সেটা মরফিনেরই লেবেল কিনা। ভদ্রলোক সেটিকে একনজর দেখেই বললেন যে, না, ছেঁড়া লেবেলটি মরফিনের হলে "এম" অক্ষরটি বড়হাতের হত। আমার ধারণা যে ঠিক সেটা প্রমাণ হল।

'কিন্তু তাই যদি হয়, তবে কীসের লেবেল এটি? ভদ্রলোককে আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি বলতে পারেন, এটা কীসের লেবেল?" '

'তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ কেন পারব না?"

'কীসের—?'

' "অ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের লেবেল।"

' "এটা দেখে আর কিছু কি বলা সম্ভব?"

' "হ্যাঁ। ছেঁড়া লেবেলের নীচের অংশে যে grains 1/2 লেখাটা দেখা যাচ্ছে, তা আসলে 1/20 হবে। লেবেলটি ছেঁড়া হওয়ায় 2-এর পর '0'-টি বাদ গেছে।"

'এ-কথা শুনে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই। তা হলে কি করঞ্জাক্ষ বোস মরফিন হাইড্রোক্লোরাইডে মারা যাননি? কিন্তু তা কী করে হয়? কারণ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নির্ভুলভাবেই বলছে যে, করঞ্জাক্ষ বোসের মৃত্যুর জন্যে দায়ী শুধুমাত্র মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড—অন্য কিছু নয়। তবে এই অ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের ছেঁড়া লেবেলটা অকুস্থলে কে রাখল? যিনি রেখেছেন তিনিই হত্যাকারী।

'আচ্ছা, ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি কি দয়া করে বলবেন এই অ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের প্রপার্টি কী এবং কীভাবে এটা তৈরি হয়?' বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অমিতাভর দিকে তাকালেন আশিস চৌধুরী।

চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অমিতাভ। বললেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনাকে আমি আগেও একবার বলছি, এখনও বলছি—মরফিনকে ডায়লুট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সিলড টিউবে গরম করে স্যাপনিফাই করলে অ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইড তৈরি হয়।'

'কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, আপনি এই অ্যাপোমরফিনের পেছনে এতক্ষণ ধরে লেগে রয়েছেন কেন?' অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন সুকর্ণ রায়।

'কারণ, এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মিস্টার রায়, এই যে ওষুধটার কথা আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এটাই হত্যাকারীর সবচেয়ে ইনটেলিজেন্ট স্টেপ। এবং সেটা হয় আপনি, নয় ডক্টর নলিনাক্ষ বোস।'

'আমি?' নিজের বুকে ডানহাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন সুকর্ণ রায়।

'হ্যাঁ, আপনিও সন্দেহের পাত্র ছিলেন। কিন্তু এখন সমস্ত সন্দেহ, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় ইতি টেনে আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, মার্ডারার আমাদের খুব চেনা—এই রহস্যযজ্ঞের হোতা ডক্টর নলিনাক্ষ বোস!'

সব চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিমেষে গিয়ে পড়ল ডক্টর বোসের মুখে। সেটা লক্ষ করে রাগে উঠে দাঁড়ালেন নলিনাক্ষ বোস। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ টকিং ননসেন্স, মিস্টার ডিটেকটিভ। ইউ আর আ লায়ার—ড্যাম লায়ার।'

'আপনিও কিন্তু মিথ্যে কথা বলায় কম যান না, ডক্টর বোস,' ব্যঙ্গের হাসি হেসে আশিস চৌধুরী বললেন, 'নইলে এ-কথাটা একবার ভাবেননি কেন যে, "বোসভিলা"র গোলাপ গাছটার নাম জেফিরিন ড্রাউহিন?'

'তার মানে?' নলিনাক্ষ বোস চেঁচিয়ে উঠলেন—সম্ভবত মনের জোর ফিরে পাওয়ার জন্য। কিন্তু ধপ করে আবার বসে পড়লেন চেয়ারে।

‘তার মানে অতি সরল,’ শান্তস্বরে বললেন আশিস চৌধুরী, ‘আপনার হাতে কোনওদিন ওই গোলাপ গাছ থেকে কাঁটা ফোটেনি, ফুটবে না—ফুটতে পারে না।’ সকলের হতবাক দৃষ্টি তখন আশিস চৌধুরীর দিকে।

‘ইউ নো, ডক্টর বোস,’ আশিস চৌধুরী বলে চললেন, ‘ওই গাছ থেকে কাঁটার আঘাত পাওয়া?—আই অ্যাম হেল্পলেস টু সে দ্যাট ইট ইজ কোয়াইট ইমপসিবল। কারণ, ওই গোপাল গাছটায় কোনও কাঁটা নেই। জেফিরিন ড্রাউহিন গোলাপ গাছে কোনওদিন কাঁটা হয় না।’

ঘরের মধ্যে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

‘রিয়্যালি?’ সুকর্ণ রায়ের কণ্ঠ সরব হল।

নলিনাক্ষ বোস হায়েনার হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর পা দুটো বেঁকে গেল। হাতের আঙুলগুলো গুটিয়ে ধীরে-ধীরে যেন নেকড়ের থাবার চেহারা নিল। মুখ রাগে কুঁচকে গেল। চোখ লালচে হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে, তিনি শয়তানের প্রতিমূর্তির মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন আশিস চৌধুরীর দিকে। ওঁর কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল: ‘ইউ ডার্টি ডগ—আই উইল কিল ইউ...।’

আনন্দ সান্যাল আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন। নিজের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটা দখল করে বললেন, ‘আশিস, বাকিটা—।’

ঘরে নলিনাক্ষ বোস ছাড়া সকলেই উপস্থিত । ডক্টর বোসের শূন্য চেয়ারটা দখল করলেন আশিস চৌধুরী, এবং বলতে শুরু করলেন, ‘আমি যখন ”বোসভিলা”য় প্রথম যাই, তখনই আমার চোখে পড়ে গোলাপ গাছটা। দেখে অবাক হয়ে যাই। নন্দনকে আমি সে-কথা বলি। অবশ্য অবাক হওয়ার কারণ হল ওই জাতের গোপাল গাছে কাঁটা হয় না। তা হলে নলিনাক্ষ বোস জবানবন্দিতে আনন্দ সান্যালের কাছে মিথ্যে কথা বললেন কেন? এই সামান্য মিথ্যে কথাটার কি প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ, প্রয়োজন ছিল। সব শুনলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং এই সামান্য মিথ্যে কথাটা বলার জন্যেই নলিনাক্ষ বোসের ওপর আমার নজর পড়ে।

‘করঞ্জাক্ষ বোসের মার্ডারের ইনভেস্টিগেশানের সময় সকলের লক্ষ ছিল স্যান্ডউইচের দিকে। কিন্তু চায়ের কথা কেউ ভেবেও দেখেননি। প্রথমে আমিও এটা ভাবিনি। বরং আমি মিসেস বোসকেই সন্দেহ করতে শুরু করি। কারণ ওঁর জোরালো মোটিভ। কিন্তু আনন্দের কাছ থেকে ছেঁড়া লেবেলটা পাওয়ার পর সেটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েই আসল রহস্যটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়।

‘ঘটনার দিন চা খেয়েছিলেন দুজন—নলিনাক্ষ বোস আর করঞ্জাক্ষ বোস। যদি মরফিন হাইড্রোক্লোরাইড ওই চায়েই মেশানো হয়ে থাকে, তা হলে একটা কথা ভেবে দেখুন, মারা যাওয়ার আগে করঞ্জাক্ষ বোস খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এটা কেউই উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। আমার ধারণা এটা ওঁর অভ্যেস ছিল। ডক্টর বোস এই সুযোগটাই নিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ”আমি চা ঢেলে দাদাকে দিই আর নিজেও নিই।” করঞ্জাক্ষ বোস তখন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অমিতা বোস চা দিয়ে যাওয়ার পর ডক্টর বোস তাতে মরফিন মেশান। তারপর সেই চা দুজনে খেলেন। এটা করার কারণ ছিল একটাই।

তা হল, সকলের যেন ধারণা হয় মরফিন মিস্টার বোসের পেটে গেছে স্যান্ডউইচের মাধ্যমে, চায়ের মাধ্যমে নয়। অবশ্য চায়ে মরফিন মেশানোর জন্যে ডক্টর বোস একটা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য প্রায় সফল হতে চলেছিল। কারণ, পোস্টমর্টেম করে বিষ প্রয়োগের মাধ্যম বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু একই চা খেয়ে ডক্টর বোসের কিছুই হয়নি, তাই সবাই ধরে নিলেন, মরফিন মেশানো হয়েছে স্যান্ডউইচে, চায়ে নয়!

'মরফিন খাওয়ার পর তার অ্যাকশান শুরু হতে কিছুটা সময় লাগে। চা খাওয়ার পর ডক্টর বোস টেবিল ছেড়ে নিজের ঘরে যান। সেখানে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাঁ-হাতের কবজিতে অ্যাপোমরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের একটা ইঞ্জেকশান নেন। এটা নেওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই কাজ শুরু হয়। ডক্টর বোসের পাকস্থলীর সব খাবারই বমি হয়ে যায়। এর ফলে ওঁর আর মারা যাওয়ার ভয় রইল না। বমি করার পর ওঁর শরীর স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তিনি নিজের ঘরেই বিশ্রাম করতে থাকেন। এরপর অ্যাসপিরিন নিতে এসে অণিমা দেবী ডক্টর বোসের বাঁ-হাতে ইঞ্জেকশান নেওয়ার জায়গায় একফোঁটা রক্ত দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। ডক্টর বোস পড়লেন বিপদে। তিনি বুঝলেন, বউদি এ নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করবে। তাই তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ত দিয়ে বোঝালেন যে, বাইরের গোলাপ গাছটার কাঁটায় খোঁচা লেগে গেছে। তাড়াতাড়িতে এই ব্যাখ্যাতেই ওঁর মনে এসেছিল। কিন্তু তিনি এটা জানতেন না বা খেয়াল করেননি যে, ওই গোলাপ গাছটার কোনও কাঁটা নেই। এ ছাড়াও চা খাওয়ার আগে কেউই ডক্টর বোসের হাতের ক্ষতটা দেখেননি, কারণ ডক্টর বোস ইঞ্জেকশান নিয়েছিলেন চা খাওয়ার পর। তাই কারও পক্ষে চা খাওয়ার আগে ক্ষতটা দেখা সম্ভব ছিল না।

'ডক্টর বোস ঘটনার আগের দিন রাতে রটিয়ে দিলেন যে, ওঁর স্টক থেকে মরফিনের একটা ফাইল চুরি গেছে। এতে সন্দেহটা সবার ওপরেই পড়ার সুযোগ পেল। আসলে ওঁর স্টক থেকে কোনও কিছু চুরি যায়নি। অ্যাপোমরফিনের ছেঁড়া লেবেলটা ঘটনাস্থলে কী করে পাওয়া গিয়েছিল তা এখনও আমি জানি না। হতে পারে, ডক্টর বোস ইচ্ছে করেই ওটা ওখানে ফেলে রেখেছিলেন, যাতে ওটাকে মরফিনের লেবেল মনে করে আমরা ধাঁধায় পড়ি। আবার এও হতে পারে যে, ওটা সম্পূর্ণ অজান্তেই ওখানে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু যেভাবেই পাওয়া গিয়ে থাক না কেন, ওই লেবেলটা আর একটা গোলাপ গাছই ডক্টর বোসের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে।

'সবকিছু জানার পরেও আমি ডক্টর বোসের মোটিভ খুঁজে পাইনি। এ বিষয়ে সোমনাথবাবু আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাস্তবের সঙ্গে অনুমানকে যোগ করে মোটিভ সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্তে আমি আসতে পেরেছি তার দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, মিসেস বোসকে নলিনাক্ষ বোস ভালোবাসতেন। যার জন্যে তিনি দাদাকে খুন করেছেন। আমার কাছে তিনি মিস্টার বোস সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন যে, "দাদা, মানুষ ছিলেন না।" এ থেকে আভাস পাওয়া যায় তিনি বউদিকে হয়তো ভালোবাসতেন। দ্বিতীয় যে ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায় তা হল করঞ্জাক্ষ বোসের উইল। মিস্টার ঘোষ আমাকে জানান যে, করঞ্জাক্ষ বোস মৃত্যুর দিন-পনেরো আগে উইল পালটেছিলেন। প্রথম উইলে ওঁর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ ছিলেন ডক্টর নলিনাক্ষ বোস। আর দ্বিতীয় উইলে ওঁর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ করেন অমিতা বোসকে। আমরা ভেবেছিলাম যে, খুনটা করেছেন অমিতা বোস, মোটিভ—করঞ্জাক্ষ বোসের উইল। কিন্তু এমনও তো হয়ে থাকতে পারে যে, নলিনাক্ষ বোস উইল পালটানোর কথা না জেনেই খুনটা করেছেন? এ সম্ভাবনাটার কথা আমরা প্রথমে ভেবে দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল ঠিক তাই। নলিনাক্ষ বোস উইল পালটানোর

কথাটা জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন যে, ওয়ারিশ তিনিই আছেন। তাই এক ঢিলে দু-পাখি মারার জন্যে তিনি খুনের ঝুঁকি নিলেন।' আশিস চৌধুরী থামলেন।

ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকেই একমনে শুনছিলেন। আশিস চৌধুরী থামতেই আনন্দ সান্যাল বললেন, 'আশিস, রিয়্যালি ব্রিলিয়ান্ট...।'

অণিমা বোসের বুক ভেদ করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কয়েকদিন পরের কথা। আশিস চৌধুরী বাড়িতে বসে আছেন। কাছেই একটা মোড়ায় বসে একমনে সেলাই করছেন মোতি চৌধুরী। এমন সময় এসে হাজির হলেন আনন্দ সান্যাল আর অমিতা বোস।

'কী রে, ব্যাপার কী?' চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন আশিস চৌধুরী।

'এই—এলাম আর কী?' জবাব দিলেন আনন্দ সান্যাল।

'বোস। অমিতা, আপনিও বসুন—।' একটু থেমে আবার বললেন, 'মিস বোস, আনন্দ দেখছি আসল অপরাধীকে পাকড়াও করেছে!'

কোনও জবাব দিলেন না অমিতা বোস। লজ্জায় চোখ নামালেন।

'তুই না, একটা ইয়ে...।' আনন্দ সান্যাল হন্তদন্ত হয়ে বলে উঠলেন।

'তা আর হবে না। ভোটে জিতে ভোটারকে আর কে-ই বা মনে রাখে?' কপট ক্রোধে বললেন আশিস চৌধুরী, 'মিস বোস তোর মতো একটা আস্ত গাধার মধ্যে কী যে পেল ছাই বুঝি না—।'

এবার চাপা কণ্ঠে প্রতিবাদ করে অমিতা বোস বললেন, 'আশিসদা, আপনি না ভীষণ বাজে!'

সিলিং-এর দিকে চেয়ে উদাসভাবে কড়িকাঠ গুনতে-গুনতে আড়চোখে মোতির দিকে চেয়ে জবাব দিলেন আশিস চৌধুরী, 'কেউ-কেউ তা বলে বটে—।'

এ-কথা বলে উচ্চরোলে হাসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মোতির চোখের দিকে চোখ পড়তেই হাসির দমকটাকে গোটাকয়েক ঢোক গিলে চটপট সামলে নিলেন।

আশিসের মুখের অবস্থা দেখে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন আনন্দ সান্যাল আর অমিতা বোস।

না ভেবে খুন কোরো না...

অনাদি সামন্ত আগে কখনও খুন করেনি। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই 'শুভ উদ্বোধন' বলে একটা কথা আছে, সুতরাং অনাদি সামন্তর জীবনেও সেই 'শুভ উদ্বোধন' এল। শুভ ১লা বৈশাখের পুণ্য লগ্নে সে তার জটিলা এবং কুটিলা স্ত্রী নিরুপমা সামন্তকে খুন করল।

খুনটা সে করেছিল নেহাতই গলা টিপে। নিরুপমার দেহটা যখন অসাড় হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল তখন রাত ন'টা।

অনাদির বাড়ি বউবাজার অঞ্চলে। ফ্ল্যাট ভাড়া করে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে থাকত। খুন করার আগে অতশত সে ভাবেনি। তাকে যদি কেউ প্রশ্ন করত, বউয়ের এই পঁয়ষট্টি কেজি লাশ তুমি গায়েব করবে কী করে, সে সোজা উত্তর দিত, অতশত এখনও ভেবে দেখেনি। সুতরাং, নিরুপমা মৃতসমা হওয়ার পরই সে একটু চিন্তায় পড়ল। লাশটা নিয়ে কী করা যায়?

প্রথমে ভাবল ঘরের ভেতরেই ওটা জ্বালিয়ে দেবে কি না। পরে চিন্তা করে দেখল, তাতে পাড়াপড়শি ও বাড়িওয়ালার দুর্গন্ধে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় কোনও পন্থা ভেবে বের করার আগে সে রহস্য-রোমাঞ্চ বইয়ে পড়া লাশ গায়েবের উপায়গুলো স্মৃতির পাতা হাতড়ে খতিয়ে দেখতে শুরু করল।

নিরুপমাকে টুকরো-টুকরো করে আচার দিয়ে খেয়ে ফেলবে? নাকি খণ্ড-খণ্ড করে মৃতদেহের অংশগুলো কাগজে মুড়ে কলকাতার জনবহুল রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেবে? আবার ট্রাঙ্কে ভরে ট্রেনে তুলে দেওয়ার কায়দাটাও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তার চিন্তাধারা অব্যাহত গতিতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বয়ে চলল।

নিরুপমা যখন শক্ত-পোক্ত (রাইগ্যর মর্টিস) হল তখন অনাদির সামন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছল। এতক্ষণ সে ঘরের আলো জ্বেলে নিরুপমার মাথার কাছে বাবু হয়ে বসেছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল কাটারি আনতে। কাটারি নিয়ে এসে তার চেষ্টাচরিত্র শুরু হল।

প্রথম কোপটা পড়ল নিরুপমার গলায়। যে-নিরুপমা বেঁচে থাকলে তীব্র প্রতিবাদে ছটফট করে উঠত, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠত, সে এখন চুপটি করে রইল। অনাদির অস্বামীসুলভ আক্রমণ নিরুপমার শরীরে অব্যাহত রইল সারাটি রাত। মাঝখানে শুধু একবার হাত-পা ধুয়ে সে খেতে গেল। সামান্য একটু আঁশটে গন্ধ ছাড়া খাওয়াদাওয়া করতে তার কোনও অসুবিধে হয়নি।

সুপ্রভাত হল। ক্লান্ত-শ্রান্ত অনাদি ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা নিরুপমার কাছেই শুয়ে। কাটারিটাও অনাদি সামন্তর অদূরে ঘুমিয়ে আছে। কাকের ডাক ও নিরুপমার গন্ধে অনাদির ঘুম ভাঙল। সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্যাকিং-পর্ব শুরু হল। বারোটা প্যাকেটে গুছিয়ে ফেলা হল পঁয়ষট্টি কেজির নিরুপমাকে।

অনাদি সামন্ত সেকেন্ডারি বোর্ডের অফিসে কাজ করে। সুতরাং পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলটার রাতের নির্জন চরিত্র তার ভালোই জানা। গোটা দিনটা সে অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে রইল। নিরুপমা পর্যায়ক্রমে কাঠিন্য, নম্রতা ও গন্ধ বদল করে চলল। অবশেষে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ নিরুপমার মাথার প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে অনাদি সামন্ত রাস্তায় পা দিল। রওনা হল পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

রাস্তায় বেরোনোর আগে নিরুপমার সুগন্ধির শিশি নিজের গায়ে উজার করে দিল অনাদি। হাড়কাটার মোড় থেকে বেলফুলের মালা কিনে হাতে জড়াল। এইভাবে বেলফুল ও সুগন্ধির পরিচিত রাবার স্ট্যাম্প মেরে নিজেকে খারাপ পাড়ার খদ্দের সাজিয়ে ফেলল।

ট্যাক্সি পাওয়া এখন আর সৌভাগ্য নয়। কিন্তু তবুও পাওয়া গেল না। সুতরাং, নিরুপমার মাথা সঙ্গে নিয়ে ট্রামে চড়ে বসল অনাদি। এই প্রথম নিরুপমা আংশকিভাবে ট্রামে চড়ল।

ওয়েলিংটনে নেমে ট্রাম বদল করল। ট্রাম এখন খালি। নিরুপমাকে ট্রামে ফেলে রেখে নেমে পড়লে কেমন হয়? যথা ভাবনা তথা কাজ। ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলের সামনে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অনাদি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ফার্স্ট ক্লাসের গদিমোড়া সিটে মাথা রেখে শুতে নিরুপমার কোনও অসুবিধে হবে না।

কিন্তু তাকে অবাক করে চলন্ত ট্রামটা কয়েক পা এগিয়ে আবার থামল। কন্ডাক্টর গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল অনাদিকে। কষ্টকৃত অন্যমনস্কভাব দেখিয়েও কোনও লাভ হল না। আশেপাশে বিশেষ কোনও লোকজন নেই যে, অনাদি না বোঝার ভান করে ন্যাকামো করবে। সুতরাং ফিরতে হল। কন্ডাক্টরের হাত থেকে নিরুপমাকে ফেরত নিতে হল।

আবার হাঁটতে শুরু করল অনাদি। আস্তে-আস্তে বলল, 'নিরু, এখনও আমায় ছাড়বি না?'

নিরুপমা জবাব দিল না।

পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছে খুশি হল অনাদি সামন্ত। নির্জনতা, জনশূন্যতা ইত্যাদি একসঙ্গে পরিবেশে হাজির। ডানদিকে ঘুরে রাস্তা পার হয়ে অ্যালেন গার্ডেনে ঢুকল সে। একটা ঝোপের পাশে ঘাসের ওপরে বসল। এবং পরমুহূর্তেই নিরুপমাকে রেখে উঠে পড়ল।

ডাকটা এল পিছন থেকেই। কেউ তাকে ডাকছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হল অনাদি। একটি লাল শাড়ি পরা চটকদার সাজগোজ করা দেহাতি মহিলা ঘাসের ওপরে ফেলে যাওয়া প্যাকেটে মোড়া নিরুপমার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখন প্যাকেটটা তুলে না নিলে এই মেয়েটিই পরে অনাদি সামন্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলায় সাক্ষি দেবে। অতএব ট্রামের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

এরপর ক্যামাক স্ট্রিট। একটা ডাস্টবিনের কাছে প্যাকেটটা প্রায় ফেলেই দিয়েছিল অনাদি, থমকাল জনৈক রিকশাওয়ালাকে দেখে।

এইভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতেই লাগল। কখনও নির্জনতা খোঁজা প্রেমিক-প্রেমিকা, কখনও মেয়েছেলের দালাল, কখনও-বা প্রহরারত পুলিশ। ভূমিকা তাদের একই। অনাদি সামন্তর কাছ থেকে নিরুপমা সামন্তর মাথাকে অবিচ্ছিন্ন রাখা।

রাত যখন সাড়ে বারোটা হল, তখনও নিরুপমাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে অনাদি। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন। কাউকে খুন করে দেহের টুকরোগুলো সবার অলক্ষ্যে কলকাতা শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়াটা মোটেই সহজ কাজ নয়। অন্তত গল্পের বইয়ের মতো।

অনাদি সামন্ত এবার অন্ধকার রাস্তার ধারে বসে পড়ল। প্যাকেটে ভরা নিরুপমাকে দু-হাতে ধরে মুখের খুব কাছে এনে ফিসফিস করে ওর সঙ্গে অনেক কথা বলল। তারপর হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে আবার শুরু করল পথ চলা।

একজন রোগা ছাপোষা লোককে একটা প্যাকেট নিয়ে রাত একটা নাগাদ থানায় ঢুকতে দেখে সদর দরজার সেপাই অবাক হল।

অনাদি সামন্ত সটান ঢুকে গেল অফিসারের ঘরে। তাঁর টেবিলে প্যাকেটটা নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, 'ইন্সপেক্টর-সাহেব, একজন লোক বিরক্ত হয়ে তার বউকে হঠাৎই একদিন খুন করে ফ্যালে। গল্পের বইয়ে পড়া বিদ্যে থেকে সে ঠিক করে বউকে টুকরো-টুকরো করে লুকিয়ে কলকাতা শহরে ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে পারল না। দেখল, কলকাতায় কোনও নির্জন জায়গা নেই। এখানে সবজায়গাতেই সাক্ষী হাজির। আজ নয় কাল পুলিশের হাতে ধরা সে পড়বেই। সুতরাং রাস্তার ধারে বসে সে তার বউয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল। তারপর সে চলে এল পার্ক স্ট্রিট থানায়। অফিসার-ইন-চার্জের সামনে সব ঘটনা খুলে বলে হালকা হল...।'

কথা বলতে-বলতে টেবিলে ঝুঁকে পড়ল অনাদি সামন্ত। অতি যত্নে প্যাকেটটা খুলতে লাগল। একটু পরে হতভম্ব অফিসারের সামনে কোমল স্ফীত নিরুপমা প্রকাশিত হল।

অনাদি সামন্ত নিরুপমার চুল সরিয়ে দিল কপাল থেকে। নিরুপমা সামনে তাকিয়ে। অনাদি একবার হাসল, তারপর বলল, 'নিরু, এবার তুই খুশি তো?'

নিরুপমা কোনও জবাব দিল না। অনাদি অফিসারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, '...সেই লোকটাকে ফাঁসি দিন, স্যার, সেই লোকটাকে ফাঁসি দিন...।'

উনিশ বিষ

ইমেইলটার হেডিং দেখেই ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল পীতাম্বরের। এরকম খেলা কখনও আবার হয় নাকি! কী অদ্ভুত নাম: আলট্রানিউ পয়জন গেম!

পীতাম্বরের ই-মেইল আইডি-তে প্রচুর আজব মেইল আসে। যেমন, নামিবিয়ার কোনও ব্যাঙ্কে বেওয়ারিশ দেড় মিলিয়ান ডলার পড়ে আছে। সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পীতাম্বরকে মেইল করে জানাচ্ছেন, টাকাটা তিনি পীতাম্বরের নামে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করে দেবেন। এর জন্য কাগজপত্র যা-যা দরকার সবই তিনি তৈরি করবেন। পীতাম্বরকে শুধু বাড়ির ঠিকানা আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস জানাতে হবে। তারপর, টাকাটা দেশের বাইরে নিশ্চিন্তে পাঠিয়ে দেওয়ার পর, তিনি ইন্ডিয়াতে এসে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকাটা ভাগাভাগি করে নেবেন।

আবার এমন মেইল-ও আসে যাতে এক সুন্দরী বিদেশিনীর ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য তথ্য রয়েছে। তিনি ভারতীয় পাত্র খুঁজছেন। পাত্রের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে হলেও আপত্তি নেই। আর বিপত্নীক কিংবা ডিভোর্সি হলেও চলবে।

পীতাম্বরের চেহারা ছোটখাটো। মাথায় বড়সড় টাক। বয়েস বাহান্ন পেরিয়েছে। কিন্তু হলে হবে কী। মেয়েটির ছবি বেশ লোভ জাগায়। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা। পদ্মাবতী...। পদ্মাবতীর ব্যাপারটা আগে ভাবতে হবে।

আজব বিয়ের প্রস্তাব ছাড়া সাংঘাতিক ডিসকাউন্টে নানান সফটওয়্যার কেনার প্রস্তাবও আসে ই-মেইল-এ। আবার পুরুষত্বকে তেজি করে তোলার বিচিত্র সব পদ্ধতির খোঁজখবরও পাঠায় নানান কোম্পানি।

সাধারণত এসব মেইল পীতাম্বর খোলেন না। তাই এগুলো ইনবক্স-এ না এসে বালক-এ জমা হয়। যদি বালক-এর কোনও মেইল-এর টাইটল পীতাম্বরের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয় তবেই তিনি সেই মেইলটা খোলেন।

যেমন এই 'আলট্রানিউ পয়জন গেম'।

আজ পর্যন্ত এ ধরনের কোনও মেইল-এ সাড়া দেননি পীতাম্বর। কিন্তু এই পয়জন গেম-এর মেইলটা দেখে মনে হল, এটা খুলে একটু নেড়েচেড়ে দেখলে হয়।

কিন্তু ঠিক তখনই পদ্মাবতীর ডাক এল।

এ-ডাক নিশির ডাক। অথবা তার চেয়েও বেশি।

সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে ইয়াহু থেকে 'সাইন আউট' করলেন পীতাম্বর। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতেই চেঁচিয়ে বললেন, 'যাই—।'

বয়েস পঞ্চাশ পেরোলেও পীতাম্বরের সব ইন্দ্রিয় এখনও দিব্যি টগবগে। ফলে যে-ক্ষিপ্রতায় তিনি পদ্মাবতীর ডাক লক্ষ্য করে শব্দভেদী বাণের মতো ছুটে গেলেন সেটা অবাক করার মতো।

পদ্মাবতী বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওর গায়ে গোলাপি নাইটি জাতীয় যে-বস্তুটি চাপানো রয়েছে সেটা বোধহয় কাচের তৈরি। অথবা, গোলাপি রং-টা পদ্মাবতীর গায়ের রং-ও হতে পারে।

বউকে অচেনা পুরুষের চোখ দিয়ে দেখতে চাইলেন পীতাম্বর। সত্যি, ওর সারা শরীরে শুধুই মারকাটারি বক্ররেখা। ওর দিকে তাকানোমাত্রই দুটো জিনিসের কথা মনে পড়ে: সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' কবিতা, আর 'আবার খাব' সন্দেশের কথা।

কিন্তু পীতাম্বর তো আর 'অচেনা' পুরুষ নন! তিনবছর আগে তাই ছিলেন। সুতরাং এখন পদ্মাবতীর দিকে তাকালে ও-দুটো জিনিসের কথা ওঁর আর মনে পড়ে না। বরং মনে পড়ে কবিতায় পড়া 'ডাকিনী যোগিনী এল কত নাগিনী...' লাইনটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদ্মাবতীর নেশার টান এড়াতে পারেন না পীতাম্বর। কী করে যেন তিরিশের এই মেয়েটা বাহান্নর পীতাম্বরকে এখনও বশ করে রাখতে পারছে। শুধু মাঝে-মাঝে ভেতরে-ভেতরে উথলে ওঠা প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চান পীতাম্বর—কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোন এক ম্যাজিকে এই মায়াবী মেয়েটা ওঁকে সামলে নেয়—যেমন, এখন।

স্বামীকে কাছে ডেকে পদ্মাবতী যেভাবে হামলে পড়ে তাঁকে আদর করতে শুরু করল তাতে মেনকাও লজ্জা পাবে। পীতাম্বর অবাক হয়ে কাঠ-কাঠ অবস্থায় আদর খাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন কতক্ষণ ব্যালান্স রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন।

পদ্মাবতীর আদরের কোনও সীমানা নেই। তা ছাড়া কতরকম কলাকৌশল যে ও জানে! ওর পাল্লায় পড়লে চিতায় ওঠা পুরুষও জেগে উঠবে। পীতাম্বরের মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা ঠিক স্বামী-স্ত্রীর আদর নয়, পদ্মাবতী কোনও ব্লু-ফিল্ম-এর শুটিং-এ শট দিচ্ছে।

সে যা দেয় দিক—মনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পীতাম্বরের শরীর অনেকক্ষণ আগেই জেগে উঠেছিল। পদ্মাবতী তাকে মেঝেতে পেড়ে ফেলল। তারপর প্রবল ঝটাপটি করে ডাকিনী-যোগিনীর মতো পীতাম্বরকে কাবু করে বলতে গেলে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিল।

একটু পরে পদ্মাবতী উঠে দাঁড়ালেও পীতাম্বর তুলোঠাসা পুতুলের মতো এলোমেলো হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে রইলেন। বড়-বড় শ্বাস নিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। তৃপ্তিতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু এখনই অফিসে বেরোতে হবে—কামাই করা যাবে না। তাই জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে পদ্মাবতীর ঘোর কাটালেন পীতাম্বর। শরীরটা আধপাক গড়িয়ে খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে হাতে-পায়ে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

পদ্মাবতীর দিকে তাকালেন পীতাম্বর। সত্যি, এসব ব্যাপারে ওর ক্যালির কোনও জবাব নেই। তখন পীতাম্বরের ওকে দারুণ লাগে। কিন্তু বাকি সময়টা অসহ্য।

পীতাম্বর একটু সঞ্চয়ী মনের মানুষ। ফলে আয় করেন দু-হাতে, কিন্তু ব্যয় করেন কড়ে আঙুলে। আর পদ্মাবতী যেন সেই 'সঞ্চয় প্রকল্প'-এর পদ্ম বনে মত্ত হাতি। দু-হাতে খরচ করাটাই ওর প্রথম কথা এবং শেষ কথা। ব্যাপারটা অপছন্দ হলেও পীতাম্বরের কিছু

করার নেই। কারণ, পদ্মার নেশায় পড়ে ওকে বিয়ে করার সময় সব সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা ওর নামে লিখে দিয়েছেন।

'কী হল? কী ভাবছ?'

পীতাম্বর চমকে উঠে বললেন, 'কই, কিছু না তো?'

পদ্মাবতী জলতরঙ্গের শব্দ করে হাসল। পীতাম্বরের সামনেই ড্রেস বদলাতে শুরু করল। নতুন পোশাক পরতে-পরতে বলল, 'শোনো, দুপুর দুটো নাগাদ জিমি আসবে। তারপর আমরা একটু বেরোব...ফিরতে রাত হবে...। তুমি ডিনার করে শুয়ে পোড়ো...।'

পীতাম্বরের গা জ্বালা করে উঠল। এই জিমিটার জন্যই পদ্মাবতীকে আরও অসহ্য লাগে। ছেলেটার যেমন কুকুরের মতো নাম তেমনই কুকুরের মতো স্বভাব। সবসময় পদ্মাবতীকে ঘিরে ছোঁকছোঁক করছে। জিভ বের করে লালা ঝরাচ্ছে।

পীতাম্বর ভালো করেই জানেন, পদ্মাবতী ডিভোর্স চায় না—জিমিকে বিয়ে করতেও চায় না। কারণ, পীতাম্বরের টাকাপয়সা, এসি ফ্ল্যাটের আরাম, প্রিমিয়াম গাড়ির নরম গদি সবই পদ্মার দারুণ পছন্দ। তার পাশাপাশি ওর দরকার একটা পোষা তেজি যুবক—যে সবসময় মুখবুজে ওর ফরমাশ খাটবে আর ওর প্রবল আহ্লাদের চাপে কখনও কাহিল হয়ে পড়বে না। ফলে পদ্মাবতী যে উৎফুল্ল থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পীতাম্বর? সবসময় অসহ্য এক টানাপোড়েনের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন—নাকি মরে রয়েছেন! চোখের সামনে রোজ জিমির হ্যাংলাপনা পীতাম্বরের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু পদ্মার মুখের ওপর কিছু বলতে পারেন না—শুধু ভেতরে-ভেতরে ছটফট করেন।

যদি পদ্মাবতীকে কোনওভাবে সরিয়ে দেওয়া যেত? তা হলে জিমির সমস্যাটাও আর থাকত না। পীতাম্বরের গলায় এঁটে বসা ফাঁসটা খুলে যেত তখন।

সেই দিনটার কথা ভেবে পীতাম্বরের মন ভালো হয়ে যায় পলকে। ইস, যদি...।

পদ্মাবতী চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ার পরেও পীতাম্বর ঘোর লাগা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আসলে তখন ভাবছিলেন, কী রহস্য লুকিয়ে রয়েছে 'আলট্রানিউ পয়জন গেম' মেইলটার মধ্যে।

বিষ মেশানো খাবার একই টেবিলে বসে খাবে ছ'জন। কিন্তু মারা যাবে চারজন। দুজন দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে। এটা কীভাবে সম্ভব?

আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?

বিষ মেশানো খাবার একইসঙ্গে বসে সমানভাবে ভাগ করে খাবে তিনজন। কিন্তু মারা যাবে দুজন। তৃতীয়জন বেঁচে থাকবে।

কেমন করে বলতে পারেন?

বিষ মেশানো খাবার খেল তিনজন। একজন মারা গেল। বেঁচে রইল দুজন।

বলুন, কোন ম্যাজিকে এটা সম্ভব?

ই-মেইলটায় এইরকম অদ্ভুত তীব্র সব প্রশ্ন। আর তার সঙ্গে কার্টুন ছবির ঢঙে আঁকা অ্যানিমেশান। খাবার টেবিলে বসে সবাই খাবার ভাগ করে নিচ্ছে। তাতে নীলরঙের বিষ

মেশানো হচ্ছে। তারপর সবাই তৃপ্তি করে খাচ্ছে। এবং কয়েকজন টেবিলেই ঢলে পড়ছে—বাকি কয়েকজন দিব্যি বেঁচে থাকছে।

সিনেমার মতো বারবার একই ঘটনা দেখাচ্ছে কার্টুন অ্যানিমেশান। তার নীচে বিজ্ঞাপনের কায়দায় নানান স্লোগান লেখা। আর সবশেষে একটা মোবাইল নম্বর। নম্বরটার পাশে লাল রঙের হরফে লেখা: রয়েছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে দ্য পয়জন গেম কনট্যাক্ট ইমিডিয়েটলি।

পীতাম্বর ই-মেইলটা বারবার পড়লেন। তারপর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন। কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে মোবাইলের বোতাম টিপে নম্বরটা স্টোর করে নিলেন।

পদ্মাবতী এখন বাড়িতে নেই। নিশ্চয়ই কুকুরটাকে বগলদাবা করে কোথাও ঘুরতে গেছে। অথবা দুজনে কোনও জলপান স্টোর্সে পাশাপাশি গ্লাস হাতে বসে চাপা গলায় বুড়বুড়ি কাটছে।

তবুও কী ভেবে কম্পিউটার-টেবিল ছেড়ে ঘরের বাইরে এলেন পীতাম্বর। ফ্ল্যাটের এ-ঘর ও-ঘর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলেন যে, পদ্মাবতী সত্যিই ফ্ল্যাটে নেই।

তারপর 'আলট্রানিউ পয়জন গেম'-এর ফোন নম্বরে ফোন করলেন।

'গুড মর্নিং। আলট্রানিউ পয়জন গেম। মে আই হেলপ ইউ?' মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে কথা বলল।

পীতাম্বর মাথা চুলকোলেন দুবার। তারপর খসখসে গলায় বললেন, 'আপনাদের এই নতুন পয়জন গেমটার ব্যাপারে একটু ডিটেইলসে জানতে চাই...।'

কথাবার্তা চালাতে কোনও অসুবিধে হল না। ওদের ঠিকানা লিখে নিলেন পীতাম্বর। বললেন, যে, আগামীকাল তিনি ওদের অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করবেন।

মেয়েটি একগাল হেসে বলল, 'আই ওয়েলকাম ইউ টু আওয়ার গেমল্যান্ড, স্যার..।'

পীতাম্বরের বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ হচ্ছিল। বারবার ভাবছিলেন, ব্যাপারটা কি শুধু গেম, নাকি তার চেয়েও কিছু বেশি?

এই কথা ভাবতে-ভাবতেই পরদিন পয়জন গেমের ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন পীতাম্বর। এবং ওদের দোকান—কিংবা অফিস—দেখে রীতিমতো হতাশ হলেন।

থুখুড়ে একটা তিনতলা বাড়ি কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাইরের পলেস্তারা-খসা নোনা-ধরা চেহারাটা এমন যেন আগমার্কা ভূতুড়ে বাড়ি। দেখে পীতাম্বরের মনে হল, জোরে ঝড়ঝাপটা এলেই কাঠামোটা হুড়মুড় করে খসে পড়বে।

বাড়ির একতলায় একটা ছোট দরজা। তার মাথাতেই একটা বড় সাইনবোর্ড। বোর্ডের লেখা যথেষ্ট রং-চটা হলেও পড়া যাচ্ছে: রানিবালা চিকিৎসালয়। তার নীচে লেখা: অব্যর্থ কবিরাজি ঔষধে বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়া দোকানের ঠিকানাটা শেষ লাইনে লেখা। কাঁচা হাতে নতুন রং বুলিয়ে ঠিকানাটাকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

ঢুকব-কি-ঢুকব-না করেও দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়লেন পীতাম্বর। বাড়িটার বাইরের চেহারা যেমন ভেতরটাও তাই। সামনে তেলচিটে ধরা কাঠের শো-কেস কাম কাউন্টার। তার কাচগুলো সব ময়লা হলদেটে। কোনও-কোনও ফাটা কাচ আঠা দিয়ে কাগজ জুড়ে মেরামত করা হয়েছে।

ঘরের পিছনের দেওয়ালে দুটো বড়-বড় কাঠের আলমারি। আলমারির পাল্লায় কাচ বসানো। তবে কয়েকটা খোপে কাচ নেই। আর কয়েকটা ফাটা কাচ কাগজ সেঁটে সামাল দেওয়া হয়েছে। কাচগুলো ময়লা হলেও তার ভেতর দিয়ে তাকে রাখা প্রচুর শিশি-বোতল বেশ নজরে পড়ছে। ডানদিকের আলমারির পাশ ঘেঁষে একটা সরু পথ। পথের মুখ কালো পরদায় ঢাকা।

পীতাম্বর ঘরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘরের ফাঁকা দেওয়ালের বেশিরভাগ অংশই নানান ঠাকুর-দেবতার ক্যালেন্ডারে ঢাকা। সিলিং-এ ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে একটা বেঢপ মাপের পাখা ঘুরছে। তার হাওয়ায় ক্যালেন্ডারগুলো ছটফটে পাখির মতো উড়ছে।

ঘরে কাউকে দেখতে পেলেন না পীতাম্বর। ভুরু কুঁচকে গেল। তা হলে কি চলে যাবেন? কিন্তু ঠিকানাটা তো ঠিক-ঠিক মিলেছে!

শেষ পর্যন্ত কাউন্টারে ঠকঠক করে শব্দ করলেন, আর একইসঙ্গে ডেকে উঠলেন, 'কেউ আছেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে 'আছি—আছি—' বলতে-বলতে একগাল স্মিত হাসি নিয়ে একজন বেঁটেখাটো চেহারার বৃদ্ধ কালো পরদা সরিয়ে কাউন্টারের কাছে চলে এলেন। রং ফরসা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মাথার চুল সাদা ধপধপে হলেও গোঁফে সাদা-কালোর মিশেল রয়েছে।

বৃদ্ধের গায়ে একটা ময়লা ঘিয়ে রঙের ফুলহাতা শার্ট। পায়ে একইরকম ময়লা একটা খাকি প্যান্ট।

পীতাম্বর লক্ষ করলেন, বৃদ্ধ একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছেন।

'বলুন—' বলে ছোট্ট করে কাশলেন। ডানদিকের গালটা একবার চুলকে নিলেন।

'আমার ই-মেইল-এ আপনাদের একটা গেম—মানে, আলট্রানিউ পয়জন গেম—তার একটা অ্যাড দেখেছি...।' পীতাম্বর ইতস্তত করে একটু থামলেন।

বৃদ্ধের উজ্জ্বল চোখ সরাসরি ভেদ করল পীতাম্বরকে। একটু হেসে যেন অভয় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন...।'

'মানে, ওই পয়জন গেমটা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে এসেছি। ওটার অ্যানিমেশান দেখে এত ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে...।'

'তাই?' পীতাম্বরকে জরিপ করলেন বৃদ্ধ। একটুকরো শব্দ করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'আসুন—ভেতরে আসুন—।'

কাউন্টারের একপাশের ডলা তুলে বৃদ্ধ পীতাম্বরকে ভেতরে আসতে ইশারা করলেন।

বৃদ্ধের পোশাক থেকে আতর টাইপের একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল। কাউন্টার ডিঙিয়ে ওপাশে ঢুকতেই গন্ধটা আরও উগ্র হল।

পীতাম্বরের কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল।

আধুনিক পদ্ধতিতে ই-মেইল-এ বিজ্ঞাপন। মোবাইল নম্বরে ফোন করে শোনা গেল আধুনিক তরুণীর মিষ্টি গলা। অথচ আসল জায়গায় এসে এ কী উলটো ছবি! যেমন সেকেলে জরাজীর্ণ দোকানঘর তেমনই নড়বড়ে দোকানদার! ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠাট্টা নয়তো?

পরদা সরিয়ে ভেতরের ঘরটায় ঢুকলেন বৃদ্ধ। পিছন-পিছন পীতাম্বরও।

ঢুকতেই পীতাম্বরের নাকে বিচিত্র গন্ধের একটা ঝাপটা এসে ধাক্কা মারল। ওঁর মনে হল, একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে এসে পড়েছেন। কারণ, ঘরটা শিশি-বোতলে ছয়লাপ। তার কোনওটায় সাদা পাউডার, কোনওটায় রঙিন তরল, আবার কোনওটায় ছোট কিংবা বড় ট্যাবলেট। এ ছাড়া শুকনো গাছগাছড়া শেকড়বাকড়ও কিছু কম নেই।

ঘরের এককোণে একটা ছোট টেবিল। তার দু-দিকে মোট তিনটে চেয়ার। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, খাতা, তিনটে বলপয়েন্ট পেন, আর একটা পুরোনো মডেলের টেলিফোন।

বৃদ্ধ একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। একটু হাঁপ ছেড়ে টেবিলের উলটোদিকের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

পীতাম্বর চারপাশে নজর বোলাতে-বোলাতে বসে পড়লেন।

'এবারে বলুন স্যার, আপনার কী উপকার করতে পারি...।'

'ওই যে বললাম...ওই পয়জন গেম-এর ব্যাপারটা...।'

পীতাম্বরকে খুঁটিয়ে দেখলেন বৃদ্ধ। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'আসলে ওই গেমের একটা অ্যানিমেশান সিডি আমরা বিক্রি করি। দাম দুশো তিরিশ টাকা। কম্পিউটারে গেমটা লোড করে আপনি খেলতে পারেন। মানে, টাইম পাস করার জন্যে। ওতে অনেক অপশন আছে, অনেক পাজল আছে পয়েন্ট আছে—আপনি ভালোই এনজয় করতে পারবেন...।'

পীতাম্বরের মুখে বিরক্তি আর হতাশা ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ করে খুকখুক করে হাসলেন বৃদ্ধ। ভুরু উঁচিয়ে সরাসরি তাকালেন পীতাম্বরের চোখে। বললেন, 'বুঝতে পারছি, আপনি খুশি হননি...।'

কেমিক্যালের শিশি-বোতলগুলোর দিকে ইশারা করে দেখালেন পীতাম্বর: 'এগুলো তা হলে কী? ওই গেমের জন্যে? নাকি...।'

'ঠিক ধরেছেন।' ওপর-নীচে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ: 'এগুলো আসল পয়জন গেমের জন্যে।' হঠাৎই শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'বলুন, কে আপনাকে ট্রাবল দিচ্ছে? কাকে আপনি মাইনাস করতে চান?'

পীতাম্বর এ ধরনের সরাসরি প্রশ্নে একটু বিব্রত হলেন। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'সিক্রেসি আমার গুডউইল। আমি ক্লায়েন্টদের চাহিদা মেটাই— বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিই, ব্যস।'

কেমিক্যালের গন্ধে পীতাম্বরের দম আটকে যাচ্ছিল। মাথার ওপরে ছোট একটা পাখা ঘুরলেও পীতাম্বর বেশ ঘামছিলেন।

'আমি...মানে...।'

'আপনি কি আপনার ওয়াইফকে সরাতে চান?'

বৃদ্ধের প্রশ্নে যেন ইলেকট্রিক শখ খেলেন পীতাম্বর। ওঁর শরীর কেঁপে গেল। মনের কথা পড়তে পারে নাকি এই বুড়োটা!

দোকানদার সবজান্তা-হাসি হাসলেন: 'অবাক হওয়ার কিচ্ছু নেই। আমার কাছে হাজব্যান্ড-ওয়াইফ-এর কেসই বেশি আসে। হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফকে সরাতে চায়, নয় ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে। আপনি...।'

বৃদ্ধকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে পীতাম্বর বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওয়াইফকে।'

জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে একটা দুঃখের শব্দ করলেন বৃদ্ধ। নরম গলায় বললেন, 'একটা সময়ের পর সব বিয়ে কেমন তেতো হয়ে যায়। তখন মনটা মুক্তি চায়। কিন্তু "মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি..." ' হাসলেন বৃদ্ধ: 'আর সেইজন্যেই আপনাদের মতো নিপীড়িত ক্লায়েন্টদের আমি সার্ভিস দিই...।'

'এবারে আসল কথায় আসি—' হাতে হাত ঘষে পীতাম্বরের দিকে ঝুঁকে এলেন বৃদ্ধ: 'যে আলট্রানিউ পয়জনটার কথা আপনাকে এখন বলব সেটা আমার বাবার আবিষ্কার। আমার বাবা নেপালপদ সরকার এককালের বিখ্যাত কোবরেজ ছিলেন। খাবার তৈরি মোদক একবার খেলে মানুষ নেশার ফাঁদে পড়ে যেত। বাবা সবসময়েই হাজাররকম গাছগাছড়ার নির্যাস আর কেমিক্যাল নিয়ে হাজাররকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তো ওইসব করতে-করতেই একদিন—আজ থেকে প্রায় বাহাত্তর বছর আগে—এক মারকাটারি বিষ আবিষ্কার করলেন। তার কেমিক্যাল ফরমুলা এখন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

পীতাম্বর অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'মারকাটারি বিষ মানে?'

এ-প্রশ্নে বৃদ্ধ বেশ মজা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'মারকাটারি মানে একেবারে স্পেশাল টাইপের অব্যর্থ বিষ। এই ধরুন খাবারের মধ্যে এই বিষ মাপা পরিমাণে মিশিয়ে আপনি আর আপনার ওয়াইফ একসঙ্গে খেয়ে নিলেন। আপনার ওয়াইফ যে মারা যাবেন তার একেবারে ফুল গ্যারান্টি। কিন্তু আপনি, বিষাক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেও বেঁচে যাবেন। মানে, দু-চারদিন নার্সিংহোমে কাটাতে হলেও প্রাণে বেঁচে যাবেন। তখন পুলিশ আপনাকে মোটেই সন্দেহ করবে না—যেহেতু একই বিষ মেশানো খাবার আপনিও খেয়েছেন, অথচ লাকিলি আপনি বেঁচে গেছেন।

'ব্যস, তখন মুক্তি—এবং মনের মতো করে নবজীবন শুরু। এককথায় আনন্দের আর সীমা নেই? কী বলেন?'

পীতাম্বর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃদ্ধের কথা শুনছিলেন। এসব কি রূপকথা, নাকি বাস্তব? ওঁর বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটাচ্ছিল কেউ, আর অঝোরে লোভের লালা ঝরছিল।

কিন্তু ভদ্রলোকের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে না! বিষ মেশানো খাবার খেলেন দুজন—কিন্তু একজন বেঁচে যাবে কেমন করে? তার রহস্যটা বৃদ্ধ এখনও ফাঁস করেননি।

সে-কথা জিগ্যেস করতেই টেবিলে চাপড় মেরে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, 'ওটাই তো আসল মিস্ট্রি। ওটার জন্যেই তো আমার এত পসার।

'এবার মনোযোগ দিয়ে কৌশলটা শুনুন...' বৃদ্ধ বড় করে একটা হাই তুললেন। হাঁ করে মুখের সামনে দু-আঙুলে কয়েকবার তুড়ি বাজালেন। তারপর: 'ওই বিষটার একটা

অ্যান্টিডোট—মানে, প্রতিষেধক—বাবা তৈরি করতে পেরেছিলেন। আসলে সেটাও একরকমের হালকা বিষ।

'বিষ মেশানো খাবার খাওয়ার আগে...ঠিক তিনঘণ্টা আগে...ওই অ্যান্টিডোটটা খেয়ে নিতে হবে। তা হলেই আপনি হয়ে গেলেন পুরোপুরি সুরক্ষিত। তখন মনের আনন্দে বিষ মেশানো খাবার খান—নো প্রবলেম। তবে হ্যাঁ...' মাথা চুলকোলেন বৃদ্ধ। চোয়ালে হাত বোলালেন। বললেন, 'তবে হ্যাঁ...একটু কষ্ট তো হবেই। আপনি বিষ মেশানো খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, নার্সিংহোমে যাবেন, জীবন নিয়ে একটু টানাটানি হবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যমরাজ জিতবে না...আপনিই জিতবেন। আর...বুঝতেই পারছেন, আপনাকে সন্দেহ করার কোনও প্রশ্নই উঠবে না...।'

টেবিলে চাপড় মেরে বক্তৃতা শেষ করলেন বৃদ্ধ। মুখে তৃপ্তির হাসি। কারণ, ব্যাপারটা তিনি ক্লায়েন্টকে ঠিকমতো বোঝাতে পেরেছেন।

পীতাম্বরও মনে-মনে খুশি হয়েছিলেন। সত্যিই এই প্ল্যানটায় হিসেবের কোনও ফাঁক নেই। তবে একটা ছোট্ট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে: বিষটায় কোনও গন্ধ নেই তো! খাবারে মেশানোর পর যদি উৎকট কোনও গন্ধ পাওয়া যায়...?

সেই প্রশ্ন করতেই বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'নো প্রবলেম। মাংসের ঝোল।'

'মাংসের ঝোল মানে?'

'আপনার ওয়াইফ মাংস খেতে পছন্দ করেন তো?'

'পছন্দ মানে! ও পুরোপুরি মাংসাশী প্রাণী। কষা মাংস ওর হট ফেবারিট।'

'চমৎকার। বেশ করে মশলাপাতি দিয়ে কষে মাংস রান্না করার বন্দোবস্ত করবেন। মানে, দুজনের জন্যে। তাতে আমি যে-শিশিটা দেব ওটার লিকুইডটা পুরোটা ঢেলে দেবেন। ব্যস—কাজ শেষ।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন পীতাম্বর। কোথাও কোনও রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা সেটাই খতিয়ে দেখছিলেন। পদ্মাবতীর মুখটা মনে পড়ল ওঁর। কল্পনায় দেখলেন, সেই সুন্দর মুখটা চোখের পলকে নীল হয়ে গেল।

মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তাই বৃদ্ধের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কত?'

'বিশহাজার।'

'বিশহাজার?' আলট্রানিউ পয়জনের দাম শুনে আঁতকে উঠলেন পীতাম্বর।

'হ্যাঁ, স্যার—বিশহাজার।' হাসলেন বৃদ্ধ: 'দামটা বেশি মনে হলে আপনি বরং ছুরি দিয়ে কাজ সেরে নিন—বিশটাকায় হয়ে যাবে। আর যদি ঘরোয়া কোনও ব্লান্ট ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করেন তা হলে পুরো বিনিপয়সায় হয়ে যাবে...।' একটু কেশে নিয়ে আরও যোগ করলেন, 'আপনার যা সমস্যা তাতে বিশহাজার তো জলের দর!'

পীতাম্বর টাকা খরচ করার চেয়ে জমাতেই বেশি ভালোবাসেন। পদ্মাবতীর উচ্ছৃংখল খরচের লাটসাহেবিয়ানা পীতাম্বরকে ভেতরে-ভেতরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। তাই বৃদ্ধের মুখে বিষের দাম শুনে তিনি রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু...।

এ ছাড়া উপায়ও তো নেই।

তবে একটাই সান্ত্বনা, এই বিশহাজার টাকা খরচ করার পর তিনি পদ্মাবতীর বেপরোয়া খরচের জ্বালাপোড়া থেকে মুক্তি পাবেন—চিরকালের জন্যে।

পীতাম্বর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'ও. কে., এগ্রিড। বিশহাজার।'

'আপনি বুদ্ধিমান। থ্যাংক ইউ—' হেসে বললেন বৃদ্ধ, 'এবারে আপনার কাজ হল পাঁচহাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া। তারপর পরশুদিন সন্ধেবেলা এসে বাকি পনেরো দিয়ে...ইয়ে...মানে ওষুধের শিশিদুটো নিয়ে যাওয়া...।'

পরশু পনেরোহাজার টাকা দিয়ে দেওয়ার পর যদি বাই চান্স ওষুধে কাজ না হয়, তখন?

পীতাম্বর বেশ দোটানায় পড়ে গেলেন। কেস জন্ডিস হয়ে গেলে পীতাম্বর কার নামে অভিযোগ করবেন? আর কার কাছেই-বা করবেন? এই বুড়োটা যদি ডাহা ঠকায়, তখন? আচ্ছা, পরশুদিন পাঁচহাজার দিলে হয় না—তার পরে, কাজ ঠিকমতো চুকে গেলে বাকি দশ?

সে-কথাই বৃদ্ধকে বললেন পীতাম্বর।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'হতে পারে—তবে একটা কন্ডিশান আছে। পরশুদিন আপনাকে আইডেন্টিটি প্রুফ আর অ্যাড্রেস প্রুফ নিয়ে আসতে হবে—মানে, ভোটার কার্ড আর লেটেস্ট ইলেকট্রিক বিল কিংবা টেলিফোন বিল নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে, আলট্রানিউ পয়জনের কাজ মিটে গেলে যদি আপনি আর টাকা না দেন? তখন আমি কার পেছনে টাকার জন্যে ঘুরব?...যদি রাজি থাকেন তা হলে পাঁচহাজার টাকা দিন—।'

অ্যাড্রেস প্রুফের কথা বলতেই পীতাম্বরের মুখে ফুটে ওঠা অস্বস্তির ভাব বৃদ্ধের নজর এড়ায়নি। তিনি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'বেকার দুশ্চিন্তা করবেন না। আগেই তো বলেছি, সিক্রেসি আমাদের গুডউইল। ক্লায়েন্টদের ট্রাস্ট যদি একবার চলে যায় তা হলে আমার ব্যবসা দু-দিনেই লাটে উঠবে। সুতরাং—' একবার কানের লতি চুলকে নিলেন: 'সুতরাং পরশু সন্ধেবেলা সাতটা নাগাদ নিশ্চিন্তে চলে আসুন আইডেন্টিটি প্রুফ আর অ্যাড্রেস প্রুফ নিয়ে...সঙ্গে ক্যাশ পাঁচহাজার টাকা।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন: 'এখন তা হলে পাঁচহাজার দিন...।'

পীতাম্বর নীরবে শর্ত পালন করলেন।

বৃদ্ধ একটা খাতা খুলে ছোট-ছোট হরফে কীসব লিখে নিলেন। তারপর খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'তা হলে এই কথা রইল। পরশু সন্ধে সাতটা।'

নীল লেবেল লাগানো ছোট্ট শিশিটার দিকে তাকালেন পীতাম্বর।

কবিরাজ নেপালপদ সরকারের আশ্চর্য আবিষ্কার। হালকা বিষ। অ্যান্টিডোট। প্রতিষেধক। আসল বিষের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র দাওয়াই।

এটা খাওয়ার পর তিনঘণ্টা কাটবে। রাত দশটা নাগাদ তিনি আর পদ্মা খেতে বসবেন। তেল ঝাল মশলা দিয়ে রান্না করা কষা মাংস আর পরোটা—সঙ্গে বাদশাহী স্যালাড। মাংসের মধ্যে মেশানো থাকবে লাল লেবেল লাগানো শিশির মারাত্মক বিষ। তার একফোঁটা গন্ধও টের পাবে না পদ্মাবতী। কারণ, রানিবালা চিকিৎসালয়ের বৃদ্ধ দোকানদার

বলেছেন, বিষটা কষা মাংসে মিশিয়ে দিলে তার কোনও স্বাদ-গন্ধ পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া বেশিরভাগ রাতেই পদ্মা অল্পবিস্তর নেশা করে ফেরে।

সুতরাং কষা মাংস এবং পরোটা ইত্যাদি খাওয়ার পরেই পদ্মার গল্প শেষ। নতুন গল্প শুরু।

এইসব কথা চিন্তা করতে-করতে নীল লেবেল লাগনো শিশিটার ছিপি খুললেন পীতাম্বর। মাথা পিছনে হেলিয়ে বড় মাপের হাঁ করে শিশির স্বচ্ছ তরলটুকু নিশ্চিন্তে গলায় ঢেলে দিলেন।

পীতাম্বরের গলা জ্বলতে শুরু করেছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে তিনি খাওয়ার টেবিলে রাখা জলের বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন। কিন্তু ঠিকমতো বোতলটা ধরতে পারলেন না। ওঁর হাতের ধাক্কায় বোতলটা টেবিলে কাত হয়ে পড়ে গেল। জলে ভেসে গেল টেবিল।

পীতাম্বরের হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। দম নিতে অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল।

ওঁর শরীরটা হঠাৎই টলে পড়ে গেল মেঝেতে। সেই অবস্থাতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল ফোনটা বের করার চেষ্টা করলেন—পারলেন না।

ওঁর গল্প শেষ হয়ে গেল।

মারা যাওয়ার আগে পীতাম্বরের শেষ চিন্তা ছিল, দুটো শিশির লাল আর নীল রঙের লেবেল ভুল করে উলটে যায়নি তো!

পদ্মাবতী রাতে ফিরে পীতাম্বরের মৃতদেহটা দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে ও মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে একটা নম্বর ডায়াল করল।

'হ্যালো, রানিবালা চিকিৎসালয়?'

'হ্যাঁ—বলুন।'

'আমি পীতাম্বর বিশ্বাসের ওয়াইফ বলছি। কাজটা হয়ে গেছে...।'

'আপনি খুশি তো, ম্যাডাম?'

'অফ কোর্স।'

'ক্লায়েন্টদের স্যাটিসফ্যাকশনই আমাদের মটো। এবার তা হলে...ইয়ে...আমাদের সার্ভিস চার্জের বাকি বিশহাজার টাকাটা কাউকে দিয়ে কাইন্ডলি একটু পাঠিয়ে দেবেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি, টোটাল তিরিশ হাজারের দশহাজার টাকা আপনার হাজব্যান্ড দিয়ে গিয়েছিলেন...।'

'কোনও চিন্তা করবেন না—কালই টাকাটা পাঠিয়ে দেব।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যাডাম।'

ফোনে কথা শেষ করে বৃদ্ধ ভাবছিলেন। কী অদ্ভুত পেশায় তিনি জড়িয়ে আছেন! যারা খুন হতে চায় তারা নিজের ইচ্ছেয় তাঁর দোকানে আসে। খুন হওয়ার জন্য আগাম দেয়...

অবশ্য কেউ-কেউ পুরো পেমেন্টও করে দেয়। তারপর নিজেই নিজেকে খুন করে। আর পুলিশের খাতায় সুইসাইডের সংখ্যা একটা বেড়ে যায়।

ইস, খুন হয়ে যাওয়া লোকগুলো যদি জানত আসল ক্লায়েন্টরা কখনও তাঁর দোকানে আসে না—তারা ফোনেই কাজ সারে—আর নিজের কবর খোঁড়ার জন্য শিকারকেই পাঠিয়ে দেয় তাঁর দোকানে!

দৃশ্য-শেষ

যেন দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের চিৎকার কমলেশের কানে এল। আর ঠিক তার পনেরো সেকেন্ড পরেই শোনা গেল দূরাগত কোনও এরোপ্লেনের গুঞ্জন। সেই গুঞ্জন ক্রমে পরিণত হল গর্জনে। কানফাটানো বিকট শব্দ তুলে প্লেনটা বাড়িটার ঠিক ওপর দিয়ে চলে গেল।

ঘরে একটা অল্প পাওয়ারের বালব জ্বলছে। তারই আলোয় কমলেশ ঘড়ি দেখল। রাত দুটো বেজে বত্রিশ মিনিট পনেরো সেকেন্ড।

এবার ও খাটের ওপর উঠে বসল। চোখ বুলিয়ে ঘরটাকে আর-একবার দেখতে লাগল, চোদ্দো ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া বড় সাইজের ঘর। ঘরে জানলার কোনও বালাই নেই। একটামাত্র দরজা: পুরু শাল কাঠের তৈরি। ঘরের চার দেওয়াল নিরেট কংক্রিটের। সেটা ডিঙিয়ে যখন আওয়াজ আসছে তা হলে কুকুরটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে চিৎকার করছিল। কিন্তু এই পুরু দেওয়ালের জন্য মনে হয়েছে চিৎকারটা দূর থেকে ভেসে আসছে। কমলেশের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। সে বন্দি! এই ছোট্ট ঘরটায় অসহায় পাখির মতোই ডানা ঝাপটে তাকে শেষ হয়ে যেতে হবে। কেউ খোঁজও পাবে না...।

কিন্তু কতক্ষণ ধরে ও এখানে রয়েছে? একদিন? দু-দিন? উহুঁ, মাত্র আট ঘণ্টা। কিন্তু একা-একা এতক্ষণ কাটানোর ফলে মনে হচ্ছে, হয়তো আট ঘণ্টা নয়—আটদিন।

ঘটনার আবর্ত শুরু হয়েছে এখন থেকে আট ঘণ্টা আগে। সেই সন্ধে ছ'টা থেকে। ভগবান জানেন, এর শেষ কোথায়।

কমলেশ সন্ধের মুখে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। গ্যারেজে গাড়িটা রেখে সুরকিঢালা পথ ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুই ছায়ামূর্তি: দুজনের মুখেই কালো মুখোশ এবং হাতে অটোমেটিক কোল্ট।

ভীষণভাবে চমকে উঠেছে কমলেশ। কিন্তু ভয় পেলেও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি। তাই সঙ্গে-সঙ্গেই মাথার ওপর দু-হাত তুলে ধরেছে এবং বলে উঠেছে, 'টাকাটা নেওয়া হয়ে গেলে ব্যাগটা আবার ফেরত দিয়ো।' কারণ, ওর পকেটে ক্যাশ টাকা ছাড়াও ছিল গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স, আইডেনটিটি কার্ড, তা ছাড়া কিছু দরকারি কাগজপত্র। কিন্তু ওদের কেউই পকেটের ব্যাগের দিকে হাত বাড়ায়নি। অর্থাৎ, ব্যাগের ওই সামান্য টাকার লোভে ওরা আসেনি। লম্বা, দোহারা চেহারার লোকটি রিভলভার নাচিয়ে কমলেশকে এগোতে নির্দেশ করেছে, এবং কমলেশ বুদ্ধিমানের মতো সেই নির্দেশ অমান্য করেনি।

বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াতেই কোথা থেকে 'হুউস' করে এগিয়ে এসেছিল একটা কালো ডেমলার গাড়ি। হাত-পা, চোখ বেঁধে, কমলেশকে পিছনের সিটে ফেলে ওরা গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথম-প্রথম কমলেশ মনে-মনে হিসেব রেখেছে, গাড়িটা কখন কোনদিকে মোড় নিচ্ছে — কিন্তু একটু পরেই সেটা অনর্থক বুঝে ও আর চেষ্টা করেনি।

ঘণ্টাখানেক একটানা চলার পর গাড়ি থেমেছে। গাড়ি থামামাত্রই কমলেশের হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর কমলেশের কানে এসেছে একটা দরজা খোলার শব্দ। তারপর দরজা পেরিয়ে, ওই চোখ বাঁধা অবস্থাতেই, ওকে উঠতে হয়েছে গোটা-বিশেক সিঁড়ির ধাপ—অবশেষে ও এই কংক্রিটের ঘরে এসে পৌঁছেছে।

চোখের বাঁধন খুলে দিতেই কমলেশের চোখে পড়েছে ঘরের এককোনায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা খাটের দিকে। এ ছাড়া কাছেই, কাঠের বিপরীতদিকে, রাখা হয়েছে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। ভালো করে তাকাতেই কমলেশ লক্ষ করল, টেবিলের ওপর কিছু কাগজ এবং একটা কলমও রয়েছে। তা হলে কি....?'

ঠিক তাই! কমলেশের উপলব্ধির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিশাল চেহারার লোকটি কর্কশ স্বরে আদেশ করেছে, 'বসুন। আপনাকে একটা চিঠি লিখতে হবে, আপনার ওয়াইফের কাছে। দু-লাখ টাকা আমাদের চাই।'

কমলেশ এর উত্তরে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেছে মুখোশধারী লোকটার দিকে: আপনমনেই বিড়বিড় করেছে, 'দু-লাখ টাকা!'

লোকটির কালো মুখোশের আড়ালে যেন ভেসে উঠেছে একটুকরো বাঁকা হাসি: ঠিক ধরেছেন স্যার, দু-লাখ টাকা। আশা করি এবারে বুঝেছেন, আপনাকে কেন আমরা তুলে এনেছি?'

কমলেশ জিভটাকে শুকনো ঠোঁটজোড়ার ওপরে বুলিয়ে উত্তর দিয়েছে, 'হ্যাঁ—বুঝেছি। আমার ওয়াইফের কাছ থেকে আপনারা টাকাটা আদায় করতে চান। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, লাস্ট উইকে আমার বউ ওর মা-কে নিয়ে দিল্লি রওনা হয়ে গেছে—।'

এই অভাবনীয় উত্তরে মুখোশধারী লোক দুজন একে অপরের দিকে চেয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছে। ওদের একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়েছে কমলেশের। অবশেষে বিশাল চেহারার লোকটি তার অটোমেটিক কোল্ট উঁচিয়ে ধরেছে, বলেছে, 'বুঝেছ চাঁদ, দু-লাখ টাকা আমাদের চাই-ই চাই। কোনওরকম কায়দায় আমরা ভুলছি না। তুমি কীভাবে টাকার জোগাড় করবে সে আমাদের জানার দরকার নেই। আমাদের শুধু মালটা পেলেই হল।'

লোকটির নির্দেশে কমলেশ সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল, 'অমিতাভ রায় আমার লইয়ার। সে-ই আমার সবকিছু দেখাশোনা করে। একমাত্র ওকে লেখা ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না—।'

লোকটির হাতের বন্দুক আরও একবার নেচে উঠেছে, এবং সেইসঙ্গে শোনা গেছে তার আদেশ, 'তা হলে তাই লেখো। পেন নিয়ে রেডি হও।'

এরপর কমলেশের শ্রুতলিপি লেখা যখন শেষ হয়েছে তখন দোহারা চেহারার লোকটি সেটা ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়েছে—

প্রিয় অমিতাভ,

যে করে হোক দু-লাখ টাকা আমার চাই। দেখিস, পঞ্চাশটাকার নোটের চেয়ে বড় নোট যেন না থাকে। টাকাটা জোগাড় করার পর কী করতে হবে সেটা পরে জানাব। পুলিশে যোগাযোগ করার কোনও চেষ্টা করিস না। তা যদি করিস, তবে আমাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবি না।

ইতি—কমলেশ (সেন)

পুনশ্চ—ভীষণ বিপদে পড়ে তোকে এ চিঠি লিখলাম। তোর ওপর আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।—ক

চিঠিটা পড়ার পর সন্তুষ্ট হয়ে দুজনেই ঘাড় নেড়েছে। তারপর কমলেশকে ঘরে একা রেখে ওরা চলে গেছে। যাওয়ার আগে ঘরের একমাত্র দরজায় তালা দিয়ে গেছে।

কমলেশ আবার খাটে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল নিজের জটিল অবস্থার কথা।

টাকাটা পেয়ে গেলে ওরা কি কমলেশকে খুন করবে? কিন্তু তাই যদি ওদের ইচ্ছে হয় তা হলে মুখোশ-টুখোস পরে পরিচয় গোপনের এত চেষ্টা কেন? হঠাৎ নিষ্ঠুর বাস্তবের মতোই কমলেশ বুঝতে পারল, যতক্ষণ ওরা মুখোশ পরে থাকবে, ততক্ষণই কোনও ভয় নেই। কমলেশ পরে ওদের আর চিনতে পারবে না।

হঠাৎ দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দে কমলেশ চমকে খাটের ওপর উঠে বসল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সকাল আটটা পঁচিশ। তার মানে শেষদিকে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল? রুদ্ধশ্বাসে ও খুলে যাওয়া দরজাটাকে লক্ষ করতে লাগল—নতুন কোনও বিপদের অপেক্ষা করতে লাগল।

পরক্ষণেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল প্রকাণ্ড চেহারার লোকটি। আশার কথা বলতে হবে, তার মুখে এখনও মুখোশটা রয়েছে। তার হাতে একটা খাবারের ট্রে। সেটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে সে বলল, 'তোমার ব্রেকফাস্ট।'

কমলেশের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত লোকটি অপেক্ষা করল। তারপর পকেট থেকে একটা চওড়া মোটা কাপড়ের টুকরো বের করে কমলেশের চোখ বাঁধতে শুরু করল 'তুমি এখন তোমার অফিসে ফোন করবে। ফোন করে তোমার সেক্রেটারিকে বলবে যে, একটা উইক তুমি অফিসে যাচ্ছ না...ওই ক'দিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ...।'

কথা শেষ করে লোকটি কমলেশকে ঠেলে নিয়ে চলল। কমলেশ আন্দাজে বুঝল, ওর কয়েদখানায় দরজার ঠিক বাইরে কোনও এক জায়গায় ওরা এসে দাঁড়িয়েছে।

'তোমার ফোন নম্বর কত?' লোকটি প্রশ্ন করল।

কমলেশ ফোন নম্বর বলার পর টেলিফোনের ডায়াল ঘোরানোর শব্দ পেল। একটু পরেই টেলিফোনের রিসিভারটা ওর হাতে কেউ জোর করে ধরিয়ে দিল।

ও-প্রান্ত থেকে ওর সেক্রেটারি মলিনা চৌধুরীর গলা ভেসে এল, 'হ্যালো?'

সাততাড়াতাড়ি জবাব দিল কমলেশ, 'কে, মলিনা? আমি কমলেশ বলছি। শোনো, এই উইকটা আমি বোধহয় অফিসে যেতে পারব না। ভাবছি, এ ক'দিন ছুটি নিয়ে একটু

বেড়িয়ে আসব।’

‘কিন্তু স্যার, যদি খুব দরকার পড়ে, তবে কোথায় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব?’

‘সেসব ঝামেলা করার কোনও দরকার নেই, মলিনা। আমার সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করে দাও। আর, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সমস্ত চিঠিপত্র আমার ড্রয়ারে রেখে দিয়ো, কেমন?’

‘ঠিক আছে, স্যার।’

অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটি কমলেশের হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে নামিয়ে রাখল। তারপর কমলেশকে লক্ষ করে বলল, ‘তোমার আর কাউকে ফোন করার থাকলে করতে পারো। ভালো করে ভেবে দ্যাখো। নয়তো কেউ যদি তোমার ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্ট নিয়ে পুলিশে খবর দেয়, তবে তোমাকে খালাস করে দেব।’ লোকটা নৃশংসভাবে টেনে-টেনে হাসল।

একমিনিট ভেবেই মনস্থির করল কমলেশ, বলল, ‘আমার বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার।’ ও ফোন নম্বর বলার সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা মুখোশধারী লোকটি ডায়াল করতে শুরু করল। একটু পরেই সে রিসিভারটা তুলে দিল কমলেশের হাতে।

কমলেশের কানে এল ওর শ্যালক অবিনাশ দত্তর গলা, ‘হ্যালো—।’

‘অবিনাশ নাকি—?’

‘কে, কমলেশদা? কী ব্যাপার? কাল রাত থেকে—।’

‘শোনো অবিনাশ, আমার ফিরতে হয়তো দিনসাতেক দেরি হবে।’

‘তার মানে? আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন, কমলেশদা? আজ সকালেও যখন আপনি ফিরলেন না, তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে দাশুকে খোঁজ করতে পাঠালাম। খোঁজাখুঁজি সেরে ও ফিরে এসে বলল, গাড়িটা নাকি গ্যারেজেই রয়েছে। মানে, কাল আপনি বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু তারপর আবার যে কখন বেরোলেন সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।’

‘হ্যাঁ, আজ খুব সকালে আমি আবার বেরিয়ে পড়েছি। আমার এক বন্ধু ওর গাড়ি করে আমার বাড়ির কাছ থেকে আমাকে তুলে নেয়। তাই তাড়াতাড়িতে বলে যেতে পারিনি।’ কমলেশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কে জানে, অবিনাশের সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হবে কি না।

‘এই সাতদিন কী করবেন? কোনও জরুরি কাজ, না অন্য—?’

‘না, কোনও কাজ-টাজ নয়। এই একটু বেড়াব-টেরাব ঠিক করেছি।’

‘কিন্তু কাল সন্ধের সময় দিল্লি থেকে দিদির একটা চিঠি এসেছে। আপনি বোধহয় চিঠিটা পাননি?’

‘না, পাইনি। তুমি বরং চিঠিটা রেখে দিয়ো, আমি ফিরে এসে দেখব’খন?’

‘তার কী দরকার? যাওয়ার আগে বাড়িতে নেমে চিঠিটা নিয়ে গেলেই তো পারেন—?’

‘না, তা সম্ভব নয়।’

ও-প্রান্তে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার অবিনাশের গলা ভেসে এল, ‘তা হলে আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন, আমি চিঠিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

'উহুঁ, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব। তা ছাড়া পজিটিভ কোনও অ্যাড্রেস দেওয়া অসম্ভব। আমি দিনসাতেক পর ফিরলে চিঠিটা দিয়ো। কেউ যদি আমার কথা জিগ্যেস করে তা হলে বোলো, আমি ছুটি নিয়ে সপ্তাহখানেকের জন্য বেড়াতে গেছি।'

ফোন করা শেষ হলে লম্বা লোকটি কমলেশকে আবার সেই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তারপর ওর চোখ থেকে কাপড়ের পটিটা খুলে নিল। কমলেশ আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে-দুলতে খাটে গিয়ে বসল। এখন ওর শেষ ভরসা অমিতাভ রায়।

রাত প্রায় দশটার সময় লম্বা লোকটির সঙ্গী বেঁটেটা কমলেশের খাবার নিয়ে এল। সম্ভবত রাত্তিরে এই লোকটাই দরজার বাইরে পাহারা দেবে।

খেতে-খেতে কমলেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'অমিতাভ রায়ের কাছ থেকে কোনও খবর পেয়েছেন?'

বেঁটে লোকটা মাথা নাড়ল। অধৈর্যভাবে কমলেশের খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। কমলেশ লক্ষ করল, লোকটা অন্যমনস্কভাবে ডানহাত দিয়ে ওঁর বাঁ-হাতের নখ খুঁটছে। মুদ্রাদোষ? আপনমনেই হাসল কমলেশ।

পরদিন সকালে মুখোশপরা লম্বা লোকটা আবার কমলেশের ঘরে এল। হাতের ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'খেয়ে নাও।'

কমলেশ একটুকরো পাঁউরুটি নিয়ে দাঁত বসাল। নাঃ, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে লোকদুটো খুব একটা অভদ্র নয় দেখছি। খেতে-খেতে হঠাৎই ওর মনে পড়ল অমিতাভর কথা। সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে ও জিগ্যেস করল, 'অমিতাভ কি টাকার ব্যবস্থা করেছে?'

'উঁহু,' জবাব দিল লম্বা মুখোশধারী, 'তোমার ওই হারামজাদা উকিল এখনও গাঁইগুঁই করছে। আজ তুমি ওকে ফোন করবে। যদি পরিষ্কার করে ওই দু-লাখ টাকার ব্যাপারটা বোঝাতে পারো তো ভালো, নয়তো বউকে চিঠি লিখে খাটিয়া কেনার ব্যবস্থা করতে বলো।'

কমলেশ এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল। না, না—যে করে হোক অমিতাভকে ও রাজি করাবেই।

খাওয়া শেষ হতে লোকটি পকেট থেকে কাপড়ের পটি বের করে কমলেশের চোখ বেঁধে দিল। তারপর আগের দিনের মতোই ওকে নিয়ে চলল টেলিফোনের কাছে।

কমলেশ অমিতাভর ফোন নম্বর বলার পর লোকটা ডায়াল করে কমলেশের হাতে রিসিভার তুলে দিল, 'নাও, এবার তোমার পেয়ারের দোস্তকে ভালো করে বোঝাও।'

রিসিভারটা সজোরে আঁকড়ে ধরে কানে চেপে ধরল কমলেশ। উত্তেজিত চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, 'কে?'

'কমলেশ নাকি? আমি রায় বলছি। কী, ব্যাপার কী তোর?'

‘আমার চিঠি পেয়েছিস?’ ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল কমলেশ।

‘হ্যাঁ, কিন্তু অত টাকা এই ক’দিনে কী করে যে জোগাড় করব বুঝে উঠতে পারছি না।’

‘দরকার হলে আমার সমস্ত প্রপার্টি বেচে দে। দিয়ে যে করে হোক দু-লাখ টাকা আমার চাই। যদি দিন-দুয়েকের মধ্যে জোগাড় করতে পারিস তো ভালো। আর সেটা না পারলে তোকে আর টাকা জোগাড় করতে হবে না। আমার শ্রাদ্ধে টাকাটা খরচা করিস।’ অমিতাভকে জবাব দেওয়ার কোনও সময় না দিয়েই ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কমলেশ। ওর কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

লম্বা লোকটি ওকে আবার ঘরে ফিরিয়ে এনে চোখের বাঁধন খুলে দিল। যাওয়ার আগে বলে গেল, ‘আর মাত্র তিনদিন আমরা ওয়েট করব।’

সেদিন রাতে কমলেশের ঘুম এল না। হাজার চিন্তা যেন ওর মাথায় ছুঁচের মতো বিঁধছে। হঠাৎ ওর কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা কোনও কুকুরের চিৎকার। আর ঠিক তার পনেরো সেকেন্ড পরেই ও শুনতে পেল এরোপ্লেনের গর্জন।

গত কয়েকদিন ধরেই ২-৩২ মিনিটের সময় একটা কুকুরের চিৎকার আর তার পনেরো সেকেন্ড পরেই একটা প্লেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কমলেশ। বাইরের জগৎ থেকে ওকে যে এভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছে তা কি কেউ জানে? এখন অমিতাভ যদি টাকাটা জোগাড় না করতে পারে—।

ভাবতে-ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল কমলেশ।

কারও ধাক্কায় কমলেশের ঘুম ভাঙল। ধড়মড়িয়ে খাটে উঠে বসল ও। দেখল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে দুই মুখোশধারী।

কমলেশ হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল। তা হলে কি ওর জীবনের লাস্ট চ্যাপ্টার কাছে এসে গেছে?

লম্বা লোকটি পকেট থেকে অটোমেটিক কোল্টটা বের করে কমলেশের কপালে ঠেকাল।

কমলেশ চোখ বুজল। ওর কান যে-কোনও মুহূর্তে আশা করতে লাগল একটা বিরাট গর্জন। ওর মস্তিষ্ক এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রইল।

কিন্তু না, সেরকম কিছুই ঘটল না। তার বদলে কর্কশস্বরে কথা বলে উঠল লোকটা, ‘এই যে, এখন আমরা অমিতাভ রায়কে ফোন লাগাচ্ছি—আর ওয়েট করতে পারছি না। তুমি এখানে বসে-বসে এক-দুই গুনতে থাকো। আমরা ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরব।’

কমলেশ যখন চোখ খুলল তখন ওরা দুজনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। কমলেশের শুধু মনে হতে লাগল, একঘণ্টা—একঘণ্টা—আর মাত্র একঘণ্টা—!

কতক্ষণ যে ওইরকম আচ্ছন্নভাবে ও বসেছিল, মনে নেই। দরজা খোলার শব্দে ওর চমক ভাঙল। লম্বু এবং বেঁটে ঘরে ঢুকল।

ঈশ্বরকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল কমলেশ, কারণ, ওরা এখনও মুখোশ পরে রয়েছে।

'অমিতাভ কি টাকাটা জোগাড় করতে পেরেছে?' কৌতূহলে জানতে চাইল কমলেশ।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর লম্বা লোকটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, জোগাড় তো করেছে বলছে। কিন্তু সত্যি কি মিথ্যে সেটা জানতে পারব রাত আটটায়। সন্ধে সাতটায় ফোন করে টাকাটা নিয়ে কোথায় দেখা করবে তার আইডিয়া রায়সাহেবকে দেব। তারপর আটটার সময় টাকাটা পেয়ে গেলেই ভালো। আর যদি দেখি লোকটা পুলিশে খবর দিয়েছে, অথবা প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করছে, তবে তোমাকে প্যাক করে পার্সেল করে দিল্লিতে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

বেঁটে লোকটা অন্যমনস্কভাবে ডানহাত দিয়ে ওর বাঁ-হাতের নখ খুঁটছিল, হঠাৎ বলে উঠল, 'টাকা পেয়ে গেলে তোমাকে রাত দশটায় ছেড়ে দেওয়া হবে।'

রাতে ঠিক দশটায় ওর ঘরের দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পেল কমলেশ। সঙ্গে-সঙ্গে ও থরথর করে কেঁপে উঠল। এই কি তা হলে কৃতান্তের নিমন্ত্রণ?

দরজা খুলে ঢুকল ওরা দুজন। মুখোশের আড়ালে কি চোখে পড়ছে একটুকরো বাঁকা হাসি? কে জানে।

'অমিতাভ—অমিতাভ—' কমলেশের গলা বন্ধ হয়ে এল। লম্বা লোকটা পকেটে হাত ঢোকাল। মুহূর্তের মধ্যে কমলেশের মনে পড়ল ওর সুন্দরী স্ত্রীর কথা—অমিতাভর কথা—এই সবুজ পৃথিবীর কথা—।

লোকটা পকেট থেকে কাপড়ের পটিটা বের করল। তা হলে অমিতাভ টাকা দিয়েছে! আনন্দে কমলেশের কাঁদতে ইচ্ছে করল।

ওর চোখ বাঁধা হয়ে গেলে লম্বা লোকটা বলল, 'তোমার কপাল ভালো। তোমার দোস্ত টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। কোনও ছকবাজির চেষ্টা করেনি। তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার পর তুমি আবার পুলিশের দালালি কোরো না যেন—।'

তারপর আবার সেই চলন্ত কালো ডেমলার। গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় ভাবতে লাগল কমলেশ। ওরা কি সত্যিই ছেড়ে দেবে ওকে? নাকি—।

যখন একটা ফাঁকা অন্ধকার মাঠে ওরা কমলেশকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে ফেলে দিল, তখন ও নড়ার চেষ্টা করেনি। মড়ার মতো নিশ্চল হয়ে একটা বুলেটের অপেক্ষা করেছে।

কিন্তু ওরা কিছু না করে স্রেফ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

অন্ধকারে বেশ কষ্ট করে হাতঘড়ি দেখল কমলেশ। রাত বারোটা।

টলতে-টলতে ও উঠে দাঁড়াল। চোখে পড়ল, বহু দূরে কয়েকটা আলোর বিন্দু। ক্লান্ত পায়ে ও সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। অমিতাভকে ফোন করে খবর দিতে হবে। তারপর চলবে পুলিশের কাছে জবাবদিহির পালা।

রাত দুটোর সময় পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রেহাই পেল কমলেশ।

থানা থেকে বেরোতেই দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে অমিতাভ। ওকে দেখেই হাসল, 'তোকে তা হলে ছাড়ল। ওঃ, আমাকেও কি কম হ্যারাস করেছে। এখন বাড়ি যাবি তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আর চলতে পারছি না, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।' অবসন্ন স্বরে জবাব দিল কমলেশ।

'তা হলে আমার বাড়িতেই চল। ওখান থেকে তোর বাড়িতে একটা ফোন করে দিবি যে, তুই কাল সকালে বাড়ি ফিরবি, তা হলেই হবে।'

অমিতাভর কথায় রাজি হয়ে ওর গাড়িতে গিয়ে উঠল কমলেশ।

কিছুক্ষণ পরেই অমিতাভর বাড়ির দরজায় ওদের গাড়ি এসে থামল। কমলেশ গাড়িতে বসে ঝিমোচ্ছিল, অমিতাভর ধাক্কায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে গাড়ি থেকে নামল।

বসবার ঘরে দুজনে আরাম করে সোফায় বসে কথা বলছিল। হঠাৎই অমিতাভ বলল, 'কীরে, একটু "ইয়ে" চলবে নাকি? তা হলে এই ম্যাজম্যাজে ভাবটা কেটে যেত।'

কমলেশ আপত্তি করল না।

অমিতাভ পাশের ঘরে গেল গেলাস আনতে। কমলেশ এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। চোদ্দো ফুট বাই বারো ফুট বসবার ঘর। প্রচুর টাকা খরচ করে এটাকে মনের মতো করে সাজিয়েছে অমিতাভ। একা মানুষ, বেশ সুখেই আছে।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল কমলেশ। দেওয়াল-ঘড়ির ঢং-ঢং শব্দে ওর চমক ভাঙল। রাত আড়াইটা বাজে। ঠিক তখুনি দুটো ভরতি গেলাস নিয়ে ফিরে এল অমিতাভ। সোফায় বসে সামনের টেবিলের ওপরে গেলাস দুটো নামিয়ে রাখল: 'নে, শুরু কর।'

একটা গেলাস হাত বাড়িয়ে তুলে নিল কমলেশ।

অমিতাভ ওর গেলাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটা টেবিলে রাখল, বলল, 'তোর কী মনে হয়? পুলিশ কি ওই লোকদুটোর কোনও হদিস পাবে?'

কমলেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল। অমিতাভর কথায় ওর দিকে ফিরে তাকাল। বেঁটেখাটো অমিতাভ রায় তখন ডানহাত দিয়ে নিজের বাঁ-হাতের নখ খুঁটছে।

কমলেশ অবাক হল। এক-দু-সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর হাসল 'তুই কি সত্যি জানতে চাস?'

'তার মানে?' অবাক হল অমিতাভ।

এমন সময় কমলেশের কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা কোনও কুকুরের চিৎকার। যে-চিৎকার ও বন্দি অবস্থায় প্রতিদিন রাত দুটো বত্রিশে শুনে এসেছে।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল কমলেশ। ঠিক ২-৩২ মিনিট।

'তুই কি সত্যি-সত্যি জানতে চাস?' আবার একই প্রশ্ন করল কমলেশ।

‘হ্যাঁ, চাই।’ অমিতাভ অবাক হয়ে জবাব দিল।

‘তা হলে তোকে আর মাত্র পনেরো সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে।’ বলতে-বলতে হুইস্কির গেলাস হাতে উঠে দাঁড়াল কমলেশ। একদৃষ্টে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে এরোপ্লেনের শব্দটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ওর হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরে চলল। কমলেশ দেখতে লাগল—একসেকেন্ড—দু-সেকেন্ড—তিনসেকেন্ড—চারসেকেন্ড—পাঁচসেকেন্ড—ছ’-সেকেন্ড—টিক—টিক—টিক—টিক—টিক—।

হত্যাকাণ্ড

‘আপনি আপনার ওয়াইফকে খুন করতে চান?’ কাউন্টারে বসে থাকা কালো চেহারার লোকটি জিগ্যেস করল।

‘হ্যাঁ। না...মানে ঠিক খুন...।’

‘নাম?’

‘ওর—না আমার?’

‘আপনার।’

‘দেবতোষ রায়।’

‘ঠিকানা?’

‘পাঁচের এক বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। কলকাতা।’

যান্ত্রিকভাবে লিখে চলল লোকটির হাত। যেন এরকম নাম ও ঠিকানা সে আগে অসংখ্যবার লিখেছে।

‘আপনার ওয়াইফের নাম?’

‘মালবিকা।’

‘বয়েস?’

‘একত্রিশ।’

তারপরই শুরু হল একের পর এক ধারাবাহিক ও গতানুগতিক প্রশ্নোত্তরের পালা। মালবিকার গায়ের রং, মুখের গড়ন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, ওজন, নাক-মুখ-চোখের বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি কত কী!

‘আপনার কাছে মিসেস রায়ের হলোগ্রাফিক ফটোগ্রাফ আছে? ওঁর ভয়েস রেকর্ড করা আছে?’

‘হ্যাঁ, আছে। এই নিন।’ পকেট থেকে দুটো জিনিসই বের করে দিলাম।

ভালো করে জিনিস দুটো উলটেপালটে দেখল লোকটি। তারপর বলল, ‘আচ্ছা—এবারে শুনুন...।’

দেখতে-দেখতে একটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল। টের পেলাম, আমি ঘামতে শুরু করেছি।

'ব্যস, সব শুনলেন তো? এবার ভেবে দেখুন, শেষ পর্যন্ত আপনার মনের জোর থাকবে তো?' লোকটি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। প্রচণ্ড একঘেয়েমি ও বিরক্তির অভিব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে তুলল। তার প্রমাণ হিসেবে একইসঙ্গে একটা হাই উঠল।

আমি সবিনয়ে জানালাম যে, আমার মনের জোর থাকবে।

'তা হলে এখানে সই করুন।' একটা ফর্ম এগিয়ে দিল লোকটা।

সই করলাম।

'আপনি জানেন এ-কাজটা বেআইনি?'

'জানি।'

'এ-কাজের জন্যে যদি আপনি বিপদে পড়েন তা হলে আমরা কিন্তু একটুও দায়ী হব না!'

এবার বিরক্ত আমিও হলাম। বললাম, 'ঢের হয়েছে, এবার কাজের কথায় আসুন।'

লোকটি হালকাভাবে হাসল। আমার এই ধৈর্য্যচ্যুতিও ওর বহুদিনের চেনা। তারপর বলল, 'আপনার ওয়াইফের রিয়েল ইমেজ তৈরি করতে আমাদের ন'ঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণ আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন, আরাম পাবেন। ডানদিকের তিন নম্বর মিরার-রুমটা খালি আছে। আপনি ওটায় চলে যান।'

আমি শান্ত পায়ে এগিয়ে চললাম তিন-নম্বর আয়নাঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে নীল রঙের ভেলভেটের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বিছানায় শরীরের চাপ পড়তেই মাথার ওপরে লাগানো আয়নার সিলিংটা দুরন্ত গতিতে ঘুরতে শুরু করল। আর একটা নরম কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলে বলতে শুরু করল, 'ঘুমোও...ঘুমোও...ঘুমিয়ে পড়ো...।'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে মালবিকার নাম উচ্চারণ করে চললাম।

মালবিকা, আমি এখানে আসতে চাইনি। তুমিই আমাকে বাধ্য করলে। তুমিই আমাকে দিয়ে এ অন্যায় কাজ করালে। ওঃ ভগবান! কেন যে আমি এখানে এলাম! যদি এই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারতাম! ওঃ...আমি তোমাকে খুন করতে চাই না।

ঘুরন্ত আয়নার জটিল আলোর ঝিলিকের কম্পাঙ্ক ক্রমে বেড়ে চলেছে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

স্বপ্নে দেখলাম আমি ফিরে গেছি সেই চল্লিশ বছর বয়েসে। খোলা সবুজ মাঠের ওপর উচ্ছল কিশোর-কিশোরীর মতো ছুটে বেড়াচ্ছি আমি আর মালবিকা। রঙিন তোয়ালের ওপরে পড়ে আছে টিফিন ক্যারিয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিয়ো, কোল্ড ড্রিংকস-এর বোতল। একটু দূরেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রিমিয়ার পদ্মিনী। তার ঝকঝকে সবুজ রং ঘাসের সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

মালবিকা হাসছে। ওর একরাশ কালো চুল মুখের ওপরে ঝিলিমিলি হয়ে নাচছে। আমার নাম ধরে ডাকছে ও, 'দেবতোষ...দেবতোষ...।'

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। হাতে হাত। ঠোঁটে ঠোঁট। যৌবনে যৌবন। উত্তাপে উত্তাপ। পশ্চিমের আকাশ তখন লাল কালিতে কবিতার পাণ্ডুলিপি শেষ করে সূর্য-বিদায়ের নাটক শুরু করেছে।

দৃশ্য পালটে যায়। কাশ্মীর, নৈনিতাল, দার্জিলিং। আমরা যেন অপ্রাকৃত গতিতে উড়ে চলেছি দেশ থেকে দেশান্তরে। ১৯৯৭ সালের চিরসতেজ বসন্ত।

আর তারপর—যন্ত্রণাময় দুঃস্বপ্ন। মালবিকা ও কিংশুক। স্বপ্নের মধ্যেই এক অজানা অচেনা আবেগ আমার শরীরটাকে আমূল কাঁপিয়ে দিল। কী করে সব জলছবি ওলটপালট হয়ে গেল? কোথা থেকে এসে হাজির হল কিংশুক? কেন এল ও আমার আর মালবিকার ভালোবাসার মৃত্যু পরোয়ানা হাতে নিয়ে? জীবন কেন এত জটিল, কেন এত দুঃখময়? এ কি শুধু বয়েসের তফাত? উত্তাপের পার্থক্য? আমি, পঞ্চাশ ছোঁয়া প্রৌঢ়, আর মালবিকা যুবতী, এত ভয়ংকর যুবতী। কেন, কেন, কেন এমন হল?

নির্ভুল খুঁটিনাটি সমেত চোখধাঁধানো হয়ে দৃশ্যটা ফুটে উঠল। কিংশুক আর মালবিকা বসে রয়েছে এক রামধনু-রং ফুলের বাগানে। ওদের চুম্বনে ব্যস্ত ঠোঁট অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে আমার অনুপ্রবেশ।

সেই থেকে প্রচণ্ড রাগ। নিজের সঙ্গে এক দুরন্ত যুদ্ধ। কিংশুককে খুন করার চেষ্টা।

আরও দিন যায়। সংখ্যায় ও বিষয়বস্তুতে দুঃস্বপ্ন আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

অবশেষে মালবিকা—।

ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার চোখ জ্বালা করছে। আমার স্বপ্নের কান্না মোটেই স্বপ্ন নয়।

‘উঠুন মিস্টার রায়, আমরা তৈরি।’

অগোছালোভাবে উঠে বসলাম। ওপরের নিঃস্পন্দ শীতল আয়নায় নিজের অপ্রতিভ ছায়া দেখলাম। পঞ্চাশটি ক্লান্তিকর বছরের প্রত্যেকটি যেন আমার অসহায় মুখে স্বতন্ত্র শিলালিপি খোদাই করেছে। ভয়ংকর ভুল করেছি আমি। বহু পুরুষই যুবতী স্ত্রী বেছে নিয়েছে, তারপর জলে আক্রান্ত চিনির দানার মতো তারা উদ্ধত যৌবনের হাতের মুঠোয় অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বহীন হয়ে গেছে। নিজেকে পরখ করলাম আমি। খুঁতখুঁতে এই জরিপে সূচ্যগ্র মেদিনীর পার্থক্যও ধরা পড়ে। পেটে এখন চর্বির থাক—যারা কখনও রুগ্ন হওয়ার আশ্বাস দেয় না। তেমনই চিবুক। মাথার চুল উদ্বাস্তু হয়ে রওনা হয়েছে কোন দূর অঞ্চলের দিকে। শরীরের প্রতিটি কোষে এক অনিবার্য দুর্বলতার ছায়া।

কালো লোকটি আমাকে অন্য কোনও ঘরের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

গন্তব্যে পৌঁছে চমকে উঠলাম আমি: ‘এ তো মালবিকার ঘর!’

‘আমাদের কাজে কোনও খুঁত পাবেন না, মিস্টার রায়।’

‘সত্যিই তাই! এতটুকু তফাত নেই!’

পকেট থেকে দশহাজার টাকার একটা বান্ডিল বের করে লোকটির হাতে দিলাম। সে সামান্য হেসে বিদায় নিল। সেই হাসির অর্থ: আপনার টাকা খরচ সার্থক হবে।

ঘরটা নিস্তব্ধ এবং উষ্ণ। এ কি মালবিকার উষ্ণতা?

একটা সোফায় বসে পকেটে হাত দিলাম। রিভলভারের শীতল স্পর্শ অনুভবে সাড়া দিল। দশহাজার টাকা। কিন্তু এই মানসিক হত্যাকাণ্ড আমাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি

দেবে। একটা বাস্তব হত্যাকাণ্ডকে এড়াতে গেলে এই খরচের প্রয়োজন আছে। নৃশংস, অথচ নৃশংস নয়। মৃত্যু, অথচ মৃত্যু নয়। হত্যা, অথচ হত্যা নয়।

আমার মনটা হালকা হল, শান্ত হল। লক্ষ করতে লাগলাম ঘরের দরজার দিকে। গত ছ'মাস ধরে দিন-রাত আমি মালবিকাকে খুন করার স্বপ্ন দেখেছি। এখন সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হবে। যে-কোনও মুহূর্তে ঘরে এসে হাজির হবে মালবিকার বাস্তব প্রতিবিম্ব—একটি রোবট যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, অথচ...।

'দেবু—।'

'মালবিকা!'

চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম: 'মালা—।'

শ্বাস নিতেও যেন আমার কষ্ট হচ্ছে।

ও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পালকের মতো কোমল কচি-কলাপাতা রং শাড়ি। পায়ে সুদৃশ্য সোনালি চটি। চুলের ঢাল এক অদ্ভুত মেঘলা পটভূমি। চোখ আয়ত। এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ভালোবাসাময় দৃষ্টি।

বহুক্ষণ নীরব রইলাম। শুধু ওকে দেখছি। অবশেষে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে অবাক সুরে বলে উঠলাম, 'তুমি কী সুন্দর, মালা—।'

'সুন্দর কখনও সুন্দর না হয়ে পারে?' ও হেসে জবাব দিল।

'দাঁড়াও, তোমাকে দেখি,' আমার অস্ফুট স্বর কেমন অলৌকিক শোনাল।

ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মতো দুটো আচ্ছন্ন হাত সামনে বাড়িয়ে দিলাম। বুকের ভেতরে অবাধ্য দামামা। গভীর জলের তলায় দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলার মতো অনিশ্চিত টলোমলো পায়ে ওকে ঘিরে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। মাঝে-মাঝে ওকে স্পর্শ করেও দেখছি।

'এত বছরেও আমাকে ভালো করে দেখোনি?'

'এ দেখা কখনও ফুরোয় না।' আমার চোখে জল।

'আমাকে ডেকেছ কেন?'

'প্লিজ, একটু সময় দাও, মালা, একটু সময় দাও আমাকে।' ওর পাশে শরীর এলিয়ে বসে পড়লাম। কাঁপা হাত দুটো বুকের ওপর রাখলাম উত্তাপের খোঁজে। আমার অবিশ্বাসী চোখ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

'এ অসম্ভব। নির্ঘাৎ দুঃস্বপ্ন। কী করে ওরা তোমাকে তৈরি করল?'

'সে-কথা আলোচনা করার অনুমতি নেই। তাতে ঘোর কেটে যায়।'

'এ কি ম্যাজিক?'

'না, বিজ্ঞান।'

ওর স্পর্শে উষ্ণতা। নখের পালিশ ও বাঁক নিখুঁত। কোনও জায়গায় কোনও গরমিল নেই। বাস্তব সদবিম্ব। ভালো করে ওকে দেখলাম। মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কবিতা —যখন প্রতিদিন সূর্য উঠত, অথচ অস্ত যেত না।

'...সময়ের পায়ে একজোড়া ঘুঙুর থাকলে

অবিকল তার রং হত সবুজ

অনায়াসলব্ধ ঘাসেদের মতন

বেড়ে ওঠা দুরন্ত হিজলের মতো তোমার বুকের সবুজও তখন

ধরা থাকতো না শাড়ির ছোট্ট আঁচলে...'

'দেবু?' ওর চোখ কাঁচের মতো। বুকজোড়া কি ধরা থাকবে না শাড়ির ছোট্ট আঁচলে?

'কী?' ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।

'...তুমি গীতোক্ত পুরুষের মতো

উদাসীন হলে আমি লজ্জা পাই...'

'দেবু।'

একটা আগ্রাসী গুঞ্জন শুরু হল কোথাও। ঘরটা যেন বনবন করে ঘুরছে।

'একমিনিট, একমিনিট।' এ গুঞ্জন কি আমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে?

'...তুমি হলুদ সবুজ সাদা প্রজাপতি দেখ

আমি ফড়িং-এর কাঁচপোকা পাখা

তন্ময় তুমি নির্মম হাতে নির্মোক ভাঙো

আমি নির্ঝর

চূর্ণিত শিলা যেন...'

'কী করে ওরা তোমাকে তৈরি করল?' আমি অবিশ্বাসে ডুবে যেতে-যেতে চিৎকার করে উঠলাম। এত অল্প সময়ে! মাত্র ন'ঘণ্টায়? যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম তখন কি ওরা সোনা গলিয়ে ঢালাই করেছে মালবিকাকে? তারপর হিরে-চুনি-পান্না, তরল রুপো আর মেঘের সুতো ব্যবহার করেছে প্রয়োজন মতো? হলদে আগুনকে ছাঁচে ফেলে জমাট বাঁধিয়ে কি তৈরি হয়েছে মালবিকার বরতনু?

'তুমি এসব কথা জিগ্যেস করলে আমি কিন্তু চলে যাব!' ও বলল।

'না, না!'

'তা হলে কাজের কথায় এসো। তুমি কি কিংশুকের বিষয়ে আমাকে জিগ্যেস করতে চাও?' মালবিকার স্বর হঠাৎই শীতল হয়ে গেছে। এ-কণ্ঠস্বরও কি গলিত ধাতুর তৈরি?

'একটু সময় দাও, মালা, বলছি।'

'না, এক্ষুনি।'

আমার সমস্ত ক্রোধ দ্রবীভূত হয়ে গেছে। মালবিকার উপস্থিতি কাজ করছে সর্বদ্রাবী দ্রাবকের মতো।

‘তুমি আমাকে কেন ডেকেছ? কিংশুকের বিষয়ে কথা বলতে, তাই তো? তুমি তো জানো আমি ওকে ভালোবাসি। তোমার চেয়ে বেশি বা কম ভালোবাসার কোনও ব্যাপার নয়। কারণ, একমাত্র ওকেই আমি ভালোবাসি।’ ওর কণ্ঠস্বর বিষাক্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

‘ওঃ—থামো, থামো!’ দু-হাতে কান চেপে ধরলাম আমি।

কিন্তু ও থামল না: ‘এখন তো সবসময় কিংশুকের সঙ্গেই আমি ঘুরে বেড়াই। তুমি আর আমি আগে যেখানে-যেখানে যেতাম, এখন সেখানে কিংশুক আমার সঙ্গী। এই তো গত মাসে ওর সঙ্গে মধুপুরে তিনদিন ঘুরে এলাম। ওঃ, দারুণ! আর কিংশুক যা দুরন্ত কী বলব!’

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গিয়ে মালবিকার হাত ধরলাম একান্ত অনুনয়ে। বললাম, ‘এসব তো তোমার দোষ নয়! তুমি নিষ্পাপ। তুমি পবিত্র। তুমি সেই মালবিকা নও। তুমি আলাদা!’

‘ঠিক তার উলটো,’ রোবট যুবতী বলে উঠল, ‘আমার সঙ্গে মালবিকার কোনও তফাত নেই। আমিই মালবিকা। ও যা-যা করে আমাকেও তাই-তাই করতে হয়। আমরা দুজন সবদিক থেকেই এক।’

‘কিন্তু ও যা পাপ করেছে তুমি তো তা করোনি!’

‘করেছি। সব পাপই করেছি। কিংশুককে আমি চুমু খেয়েছি। ওর সঙ্গে রাতে...।’

‘হতেই পারে না, মালা। কারণ একটু আগেই তোমার জন্ম হয়েছে। তুমি এখনও কোনও পাপ করার সময় পাওনি।’

‘তোমার হৃদয় এবং মালবিকার অতীত থেকে আমার জন্ম।’

আমি ওর দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম: ‘শোনো, মালা—নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও পথ আছে। আমি দরকার হলে আরও—টাকা দিতে পারি। তোমাকে কিনে নিতে পারি। তারপর আমরা দূরে কোথাও চলে যাব। কেউ জানবে না। শুধু আমরা দুজনে—।’

ও হাসল: ‘তা হয় না। আমরা শুধু ভাড়া দেওয়ার জন্যে। বিক্রির জন্যে নয়।’

‘কিন্তু যে-কোনও অঙ্কের টাকা দিতে আমি রাজি আছি।’

‘এ-চেষ্টা যে আগে হয়নি তা নয়! তার পরিণাম মাথার গোলমাল। বললাম তো, এ সম্ভব নয়। এমনকী এটুকুও বেআইনি, সে তো আপনি ভালো করে জানেন। সরকারকে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাদের এসব কাজ করতে হয়।’

হঠাৎ ‘আপনি’ করে কথা বলছে কেন মালবিকা?

‘আমি তোমাকে নিয়ে থাকতে চাই, মালা!’

‘তা হয় না, কারণ আমি সত্যিই মালা, মালবিকা। আমাদের প্রতিটি কণা এক। তা ছাড়া অফিসের বাইরে বেরিয়ে আমরা প্রতিযোগিতায় নামতে চাই না। শরীর কাটা-ছেঁড়া করলে আমাদের সব রহস্যই ফাঁস হয়ে যাবে।...যাক, ঢের হয়েছে, আপনাকে আমি বারবার সাবধান করেছি যে, এ-বিষয়ে আলোচনা করবেন না। তা হলে শুধু-শুধু স্বপ্নের

ঘোর কেটে যাবে। আর আপনার টাকা নষ্ট হবে। তার চেয়ে যা করতে এসেছেন তাই করুন। চটপট।'

'তোমাকে আমি খুন করতে চাই না।'

'আপনার একটা সত্তা চায়। সেটাকে আপনি চেপে রেখেছেন। এক্সপোজ করতে চাইছেন না।'

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিলাম।

'আমার সত্যিই ভীমরতি ধরেছে। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। তুমি এত সুন্দর!'

'আজ রাতে আমি কিংশুকের কাছে যাচ্ছি।'

'কথা বোলো না, প্লিজ।'

'রাতে ওখানে থাকব।'

'আমার কথা কানে যায়নি তোমার!'

মিষ্টি করে হাসল ও। আমার চিবুকটা নেড়ে দিল: 'আহা রে, আমার মোটকু সোনা! রাতে বিছানায় একা-একা শুয়ে খুব ছটফট করবে। তার চেয়ে বরং একটা কোলবালিশ নিয়ে নিয়ো।'

আমার অভ্যন্তরে একটা অজ্ঞাত আলোড়ন শুরু হল। আমার মুখ কি বিবর্ণ হয়ে গেছে? অনিবার্য কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বন্দি ক্রোধ, ঘৃণা আর বিরক্তি চিন্তায় ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে। এবং ওর মস্তিষ্কের টেলিপ্যাথিক নেটওয়ার্ক এই মৃত্যু-স্পন্দন অনুভব করতে পারছে। রোবট। টেলিপ্যাথি। মার্ডার।

'ভাবতে অবাক লাগে, দেবু, কী করে তোমাকে একদিন ভালোবেসেছিলাম।' ও হাসল —তাচ্ছিল্যের হাসি।

'থামো, মালা, থামো।'

'আমি সবে তিরিশ পেরিয়েছি আর তুমি হয়ে উঠেছ পরিপূর্ণ বৃদ্ধ। তোমার তরল আগুন শুকিয়ে গেছে বয়েসের বাতাসে। কী বোকা তুমি, দেবু? দিনের পর দিন টাকা রোজগার করেছ, অক্লান্ত খেটেছ, আর আমাকে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়বার সুযোগ দিয়েছ। আচ্ছা, তোমার কি কিংশুককে পছন্দ হয় না?'

অন্ধভাবে রিভলভার উঁচিয়ে ধরলাম আমি।

'মালা!'

'ওর মন পবিত্রতম সোনায় তৈরি—' ও ফিসফিস করে বলল।

'মালা, এখনও বলছি, চুপ করো!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'ওর চুলের গুচ্ছ ঘন মেঘের মখমলকেও হার মানায়। ওর হাত শুভ্র নিষ্কলঙ্ক গজদন্তের মতো সুঠাম!'

কী করে এসব কথা ও বলছে? এ তো আমার মনের ছায়া, নিছক কল্পনা। তা হলে কেমন করে ওর ঠোঁট উচ্চারণ করছে এইসব অশ্লীলতম শব্দের মিছিল?

'মালা, ডোন্ট মেক মি শুট ইউ।' আমার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র কেঁপে ওঠে।

‘কিংশুকের গালে অস্তাচলের সূর্য রক্তিম ছায়া ফেলে রাখে সর্বক্ষণ—’ ওর চোখ বুজে আসে, অস্ফুটে বেরিয়ে আসে কথাগুলো, এবং ও হালকা পায়ে ভেসে বেড়ায় ঘরের সর্বত্র।

‘...ওর পা দুটো যেন তাজমহলের পাথর দিয়ে তৈরি একজোড়া স্মৃতিসৌধ, যেখানে অর্চনা অঞ্জলি কখনও শেষ হয় না। ওর চোখের পাতায় রামধনু রং খেলা করে...।’

‘মালবিকা।’ ভয়ংকর স্বরে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

‘ওর ঠোঁট সত্যিই ফুলের মতো...।’

প্রথম গুলি ছুটে গেল।

‘...ও আমার জন্মান্তরের প্রেমিক...।’

দ্বিতীয় গুলি।

ও পড়ে গেল।

‘মালবিকা! মালা—মালবিকা!’

আরও চারবার ওর শরীর লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুড়লাম।

ওর পড়ে থাকা দেহ কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ওর চেতনাহীন ঠোঁট অভ্যন্তরীণ কোন এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নড়ে উঠছে বারবার। বলছে, ‘...জন্মান্তরের প্রেমিক, জন্মান্তরের প্রেমিক, জন্মান্তরের প্রেমিক...।’

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। কোন এক অস্পৃশ্য নেশা শুষে-নিচ্ছে আমার চেতনা—।

ঘুম ভাঙতেই ভুরুর ওপর ভিজে কাপড়ের ছোঁয়া অনুভব করলাম ভুরুর ওপর।

‘সব শেষ।’ কালো লোকটি বলল।

‘শেষ?’ আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম।

নীরবে সম্মতি জানাল লোকটি।

ক্লান্তভাবে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকালাম। দু-হাতে যথেষ্ট রক্তের দাগ ছিল। আবছাভাবে মনে আছে, জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে আমি পড়ে গিয়েছিলাম মেঝেতে। এবং সত্যিকারের রক্তের এক ফোয়ারা অবিশ্রান্তভাবে মাথা কুটে মরেছে আমার দু-হাতে।

কিন্তু এখন রক্তাক্ত হাতদুটো অপরাধহীন নিষ্পাপ। কেউ সযত্নে ধুয়ে দিয়েছে।

‘আমাকে এখুনি যেতে হবে।’ অস্পষ্ট গলায় বললাম।

‘পারবেন তো?’

‘হ্যাঁ পারব?’ আমি উঠে বসলাম: ‘মালবিকার সঙ্গে এখন আর কোনও যোগাযোগ রাখতে পারব না?’

‘মালবিকা মারা গেছে।’

‘হ্যাঁ। আমিই ওকে খুন করেছি। ওঃ, রক্তটা একেবারে সত্যিকারের ছিল।’

‘এ জন্যেই তো আমাদের কোম্পানির এত সুনাম।’

ওদের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। আমার শুধু হাঁটতে ইচ্ছে করছে। ক্রোধ ও প্রতিশোধের দুরন্ত জ্বালা এখন আর নেই। ওই কাল্পনিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে-সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সে-স্মৃতি এত ভয়ংকর যে, দ্বিতীয়বার খুন করার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই। যদি বাস্তবের মালবিকাও আমার সামনে এসে এখন দাঁড়ায় তা হলে আমি শুধু অচেতন হয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। মালবিকা মরে গেছে। আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। আমি অন্যায় করেছি, তবে কেউ তা জানতে পারবে না।

মুখের ওপর ছুটে আসা বৃষ্টির ফোঁটা যেন ঠান্ডা বরফের কুচি। এখুনি আমাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে একটু আগে ঘটে যাওয়া নাটকের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদি পুরোনো সুতো ধরেই আবার জীবনের মালা গাঁথব তা হলে দশহাজার টাকার বিনিময়ে ওই নাটকীয় অনুভূতি কেনার কী প্রয়োজন ছিল? সত্যিকারের হত্যাকাণ্ডকে রোধ করতেই কালো লোকটির এতো আয়োজন। মনের মধ্যে খুন করার বা কাউকে যন্ত্রণা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকলে কোনও রোবটের ওপর সেই নৃশংস ভয়াবহ প্রতিজ্ঞা চরিতার্থ হয়।

এখন ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। সেখানে মালবিকা হয়তো বসে আছে। ওকে আমি আর দেখতে চাই না। আমার কাছে ও মৃত।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখছি চলমান যানবাহন। জীবন গতিময়। বিশুদ্ধ বাতাসে গভীর শ্বাস নিলাম। মন যেন আরও হালকা লাগছে।

‘মিস্টার রায়?’ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল।

আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

পেশাদার ক্ষিপ্রতায় একটা হাতকড়া আমার ডানহাতের কবজির ওপর এঁটে বসল।

‘আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল, মিস্টার রায়।’

‘কিন্তু—।’

গম্ভীর স্বরটি নির্বিকার ভঙ্গিতে পাশের লোকটিকে বলল, ‘এসো চক্রবর্তী, ওপরের লোকগুলোকে এবার অ্যারেস্ট করা যাক।’

‘শুধু-শুধু আমাকে আপনারা—।’

আমাকে বাধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠস্বর বলে উঠল, ‘শুধু-শুধু নয়, মিস্টার রায়, মার্ডারের জন্যে আমরা কাউকে রেহাই দিই না।’

কালো আকাশে কোথাও বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বাজ পড়ল সগর্জনে।

রাত প্রায় ন’টা। গত দশদিন ধরে টানা বৃষ্টি পড়ছে। জেলের পাথুরে দেওয়াল বেয়েও গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। হাত পাতলেই বৃষ্টির ফোঁটা জমা হয়ে ছোট্ট হ্রদ তৈরি করে ফেলছে। আমার হাত কাঁপছে।

দরজার ধাতব শব্দ শোনা গেল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে জলে হাত ভিজিয়ে চলেছি। আমার উকিল দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আর কোনও আশা নেই। আজ রাতেই আপনাকে নিউক্লিয়ার ফার্নেসে যেতে হবে!'

আমি তখনও বৃষ্টির রিমঝিম শুনে চলেছি।

'ও বাস্তব ছিল না। স্বপ্ন ছিল। আমি ওকে সত্যি-সত্যি খুন করিনি।'

'কিন্তু আইন তো আর পালটানো যাবে না! জানেন তো, অন্য সবারও কপালে নিউক্লিয়ার ফার্নেস জুটেছে। রাত ঠিক বারোটায় ওই রোবট কোম্পানির চেয়ারম্যানের মৃত্যু হবে নিউক্লিয়ার ফার্নেসে। তিনজন কর্মচারী মরবে রাত একটায়। আর আপনি দেড়টার সময়।'

আমি উত্তাপহীন সহানুভূতির গলায় বললাম, 'সত্যি, আপনি অনেক করেছেন। আসলে সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, স্বপ্নে হোক বা বাস্তবে হোক, ব্যাপারটা সরকারের চোখে খুন ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, এখানে খুনের ইচ্ছে রয়েছে, রয়েছে মোটিভ। ঠান্ডা মাথার প্ল্যান রয়েছে। সবই আছে। একমাত্র আসল মালবিকা ছাড়া।'

'ব্যাপারটা কী জানেন, মিস্টার রায়? আপনার কপাল খারাপ যে, এই সময়টাতে আপনি ধরা পড়লেন। দশবছর আগে হলে আপনাকে এ জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। দশবছর পরে হলেও না। এই কয়েকটা বছরে কাল্পনিক খুনের ব্যাপারটা হঠাৎ করে এমন বেড়ে উঠেছে যে, গভর্নমেন্ট একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলে আসল খুনের সংখ্যা কমে যাওয়ার বদলে বরং আশ্চর্যভাবে বেড়ে উঠছে। সুতরাং কড়া শাস্তির ব্যবস্থা না করলে রোবট কোম্পানিও থামবে না, আর আপনার মতো ক্লায়েন্টরাও না। আসলে আপনার হয়তো সত্যিকারের খুন করার বুদ্ধি বা সাহস নেই। কিন্তু দেখা গেছে, এই নকল খুন বারকয়েক করলেই আপনার হাত পেকে উঠছে। বেড়ে উঠছে সাহস, কনফিডেন্স, বুদ্ধি। ফলে আপনারই হাতে ঘটে যাচ্ছে সত্যিকারের খুন। তা ছাড়া, এ জাতীয় রোবটদের সরকারি আইনে ঠিক নিষ্প্রাণ জড়বস্তু বলে ধরা হয় না। কারণ, এরা চিন্তা করতে পারে, যুক্তি দিয়ে ভাবতে পারে। আড়াই মাস আগে "জীবন্ত রোবট" নামে একটা আইন পাশ করা হয়েছে। আপনি সেই আইনের আওয়তায় ধরা পড়েছেন। নেহাতই কপাল, মিস্টার রায়, নেহাতই কপাল।'

আমি ক্লান্ত স্বরে মন্তব্য করলাম, 'এখন বুঝতে পারছি, বিচারে গভর্নমেন্ট কোনও ভুল করেনি।'

'যাক, আপনি যে আইনের যুক্তিটা বুঝতে পেরেছেন, এতেই আমি খুশি। তবে আমিও চেষ্টা নেহাত কম করিনি।'

'ঠিকই বলেছেন। "খুন"-কে কখনও মেনে নেওয়া যায় না—হোক সে রোবট, যন্ত্র, কল্পনা। আমি অন্যায় করেছি, তাই শাস্তি পেতে হচ্ছে। আমি সত্যিই খুন করেছি। কারণ, সেই খুনের পর থেকে আমি নিজের কাছে কেমন যেন অপরাধী হয়ে পড়েছি। চেয়েছি আমার শাস্তি হোক। ব্যাপারটা অদ্ভুত—নয়? সমাজ তো এভাবেই সকলকে সাজা দেয়। আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে যে, আপনি অপরাধী—যদিও তার কোনও জোরালো কারণ থাকে না...।'

'আমি তা হলে চলি, মিস্টার রায়। আপনার আর কোনও দরকার থাকে তো বলুন।'

'না। থ্যাংকু ইউ।'

‘গুড বাই, মিস্টার রায়।’

দরজা বন্ধ হল।

গরাদের বাইরে বাড়িয়ে দেওয়া দু-হাত ভিজে জড়সড়। তবুও এ প্রকৃতির অকৃত্রিম স্পর্শ। হঠাৎই দেওয়ালে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। মাইক্রোফোনে ভেসে এল যান্ত্রিক স্বর: ‘মিস্টার রায়, আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।’

আমি জানলার গরাদ আঁকড়ে ধরলাম সজোরে।

ও মরে গেছে। ওর কোনও অস্তিত্ব নেই।

‘মিস্টার রায়?’ উত্তরের প্রত্যাশায় যান্ত্রিক স্বর প্রশ্ন করল।

‘ও মারা গেছে। আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি।’

‘আপনার স্ত্রী পাশের ঘরে আপনার জন্যে ওয়েট করছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?’

‘আমি ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছি। ও লুটিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত অবস্থায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি!’

‘মিস্টার রায়, আপনি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি—।’

আমি পাগলের মতো দেওয়ালে ঘুসি মারতে লাগলাম। চিৎকার করে উঠলাম, ‘ও মরে গেছে, ও মরে গেছে, আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি। আমি ওর কাছে শুধু স্বস্তি চাই, একটু একা থাকতে চাই আমি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব না। ও মরে গেছে, আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি!’

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আবার যান্ত্রিক গুঞ্জন, ‘ঠিক আছে, মিস্টার রায়।’

লাল আলোটা নিভে গেল।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ঠান্ডা গরাদের গায়ে চেপে ধরলাম আমার উত্তপ্ত গাল। অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি পড়ছে। অপেক্ষা করছি।

অনেকক্ষণ পর রাস্তার দিকের একটা দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বর্ষাতি পরা দুটো শরীর আমার চোখে পড়ল। একতলার অফিস থেকে বেরিয়ে পা দিয়েছে রাস্তায়। একটা ভেপার ল্যাম্পের নীচে ওরা থমকে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

মালবিকা। আর ওর পাশে দাঁড়িয়ে কিংশুক।

‘মালা!’

ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিংশুক ওর হাত ধরল। তারপর দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হয়ে দুজনে উঠে বসল একটা কালো গাড়িতে।

‘মালবিকা!’ আমি গরাদের রড ধরে ঝাঁকুনি দিতে চাইলাম। চিৎকার করে চললাম। ঘুসি মারতে লাগলাম পাথরের দেওয়ালে। জানলাটাকে সর্বশক্তিতে উপড়ে নিতে চাইলাম।

‘গার্ড! গার্ড! ও বেঁচে আছে! এইমাত্র আমি ওকে দেখেছি। ও মরেনি, আমি ওকে খুন করিনি, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও! আমি কাউকে খুন করিনি। সব অভিনয়, স্বপ্ন, কল্পনা। আমি ওকে এইমাত্র দেখলাম, ও বেঁচে আছে! মালা, ফিরে এসো, মালা! ওদের

বলো, তুমি বেঁচে আছ! বলো, আমি তোমাকে খুন করিনি! ওরা আমাকে ভুল করে ধরে রেখেছে। মালবিকা, প্লিজ...।'

প্রহরীরা ছুটে এল ঘরে।

'তোমরা আমাকে আর শাস্তি দিতে পারবে না! আমি কোনও অন্যায় করিনি! মালবিকা বেঁচে আছে—আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'আমরাও দেখেছি, স্যার।'

'তা হলে আর আমাকে আটকে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও!' আমার গলা বুজে এল। প্রচণ্ড কাশির দমকে শরীর বারবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল বারবার।

'ট্রায়ালের সময় তো এসব অনেকবার বলেছেন, স্যার—।'

'না, না, এ ভীষণ অন্যায়! একজন ইনোসেন্ট লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া! ছি-ছি—' আমি জানলায় মুখ উঁচিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। হিংস্র থাবা দেওয়ালে বসাতে চাইছি ক্ষণে-ক্ষণে।

কালো গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ভেতরে রয়েছে মালবিকা আর কিংশুক। ওরা কাশ্মীর, নৈনিতাল, দার্জিলিং, মধুপুর, সব ঘুরে বেড়াবে। ওদের কাছে সারা বছরই বসন্তকাল। প্রেমের কাল। ভালোবাসার কাল। আর আমার কাছে তা কালবসন্ত।

'মালা, ফিরে এসো মালা। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি! এভাবে আমাকে নিরাশ্রয় করে যেয়ো না, মালা!'

ঠান্ডা বৃষ্টির ফোঁটায় গাড়ির লাল রঙের টেল-লাইট জোড়া হারিয়ে গেল। প্রহরীরা হঠাৎই পেছন থেকে এসে আমাকে সজোরে জাপটে ধরল। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমি বিকৃতকণ্ঠে চিৎকার করে চলেছি। *

** কাহিনির কবিতার অংশ অসিত সরকারের 'আমরা দুজনে একা' কবিতা থেকে সংকলিত।*

থ্রিলার ডট কম

নভেলেট

টাইম-কিলার

লেখার শুরুতেই শ্রীহার্বার্ট জর্জ ওয়েলস-কে আমার প্রণাম জানাই। যাকে আপনারা সবাই এইচ. জি. ওয়েলস নামে বেশি চেনেন। ডি. এসসি., ডি. লিট. ইত্যাদি ডিগ্রিওয়ালা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখে প্রচুর নাম-টাম করেছিলেন। আজও ওঁর লেখার জবাব নেই।

কিন্তু আমি ওঁকে 'গুরু' বলে মানি ওঁর 'দ্য টাইম মেশিন' গল্পটার জন্যে। কারণ, ওই গল্পের আইডিয়া থেকেই এনার্জি পেয়ে আমি শুধু একটা টাইম মেশিন তৈরি করার জন্যে তেরোবছর ধরে লড়ে গেছি।

শেষ পর্যন্ত সেটা তৈরি করতে পেরেছি। তবে ওয়েলস-এর মেশিনের চেয়ে আমার মেশিনটা একটু অন্যরকম। আর যে-কাজে আমার মেশিনটাকে লাগাতে চলেছি সেটাও ওয়েলস-এর 'টাইম ট্রাভেলার'-এর চেয়ে অন্যরকম।

মানে, আমার টাইম মেশিনটা কাজে লাগিয়ে আমি একটা খুন করতে চলেছি। নিখুঁত খুন। পারফেক্ট মার্ডার। তবে সে-কথায় পরে আসছি।

এই দুনিয়ায় টাকার দরকার কার নেই! আমারও আছে। আর সেই দরকারটা চাগিয়ে উঠেছে গত পনেরোবছর ধরে হাজারোরকমের যন্ত্রপাতি তৈরি করার নেশায় পাগলের মতো খরচ করার জন্যে। তাই আমার টাইম মেশিন তৈরির পেছনে একনম্বর মোটিভেশান ছিল টাকা। দু-নম্বরে যশ, খ্যাতি এটসেটরা। তারপর...।

মোটের ওপর আর যা-ই থাক, মার্ডারটা আমার প্ল্যানে ছিল না। সেটা আচমকা মাথায় ঢুকে পড়েছিল। তা ছাড়া যখন আপনি জানেন যে, খুন করলেও পুলিশ আপনার চুলের ডগাও স্পর্শ করতে পারবে না—আপনি সৎ-সাচ্চা নাগরিকের মতো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, তখন তো সাহস বাড়বেই!

মেশিনটা আবিষ্কার করার পর ওটা নিয়ে ছোটখাটো কয়েকটা টেস্ট করলাম। যখন দেখলাম, ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকঠাক আছে, তখন আনন্দে এক অদ্ভুত চিৎকার করে লাফিয়ে উঠেছিলাম। তাতে গ্যারাজের নীচু সিলিং-এ মাথা ঠুকে গিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই প্রথম আনন্দের ঝলকটা ছিল নিখাদ আবিষ্কারের উল্লাস—জেনুইন বিজ্ঞানীদের যেমনটা হয়ে থাকে। তখন কিন্তু টাকা, বড়লোক—এসব ব্যাপার মাথায় ছিল না।

প্রায় দু-দিন এই 'মহান' আবিষ্কারের ব্যাপারটা চেপে রাখলাম। বন্ধুবান্ধব, রিলেটিভ কাউকে বললাম না। এমনকী জিনিয়ার কাছেও ভাঙলাম না। কিন্তু দু-দিন পেরোনোর পর এই খুশির খবরটা চেপে রাখতে গিয়ে আমার দম প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

শেষ পর্যন্ত, তিনদিনের দিন, সাড়ে আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে চা খেতে-খেতে জিনিয়াকে বললাম, 'একটা দারুণ খবর দেব—।'

ও টিভিতে কী একটা নাচের প্রোগ্রাম দেখছিল। তেরছাচোখে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'কী খবর? এইমাত্র নিউজপেপারে পড়লে?'

'না, না, আমার একটা নতুন ইনভেনশান। একটা ইউনিক মেশিন। টাইম মেশিন। সারা পৃথিবী একেবারে চমকে যাবে। আমাদের...।'

'চা-টা একবার সিপ করে দ্যাখো তো, চিনি ঠিক আছে কি না।' খবর পড়ার ঢঙে নিষ্প্রাণ গলায় জিনিয়া বলল।

না, ওর কোনও দোষ নেই। আমাদের বিয়ের পর দশবছর ধরে আমার নানান আবিষ্কারের এক্সক্লুসিভ খবর শুনে-শুনে ও ক্লান্ত।

প্রথম-প্রথম ও এইসব খবর শুনে খুশি হত। তারপর একসময় লক্ষ করলাম, ও বিরক্ত হয়। ওর রিঅ্যাকশানগুলো কেমন তিরিক্ষে, ব্যঙ্গের খোঁচায় খচিত। আর ইদানিং ওর প্রতিক্রিয়া নির্লিপ্ত, তিব্বতী ইয়াকের মতো।

আমি ওকে বললাম যে, চায়ে চিনি ঠিক আছে এবং আমি একটা অভিনব আবিষ্কার করেছি।

ও আবেগহীন গলায় বলল যে, আবিষ্কারটা অবশ্যই অভিনব, সবাইকে চমকে দেওয়ার মতো, এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সম্ভাবনায় প্রেগন্যান্ট। এটার জন্যে ও আমাকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কথাগুলো বলেই ও চায়ের কাপ হাতে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। একটা সোফায় গা এলিয়ে টিভির নাচে এবং চায়ে মনোযোগ দিল।

আমি ওর মুখের দিকে একবার তাকালাম। তারপর সামনের খোলা বারান্দায় চোখ রাখলাম। সকালের রোদ, বাইরের গাছপালার সবুজ, নীলচে আকাশ— সব সত্যি। আমার টাইমে মেশিনও। কিন্তু জিনিয়া শেষের সত্যিটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না। সব তাবড়-তাবড় বিজ্ঞানীর কপালেই এইরকম হেনস্থা জুটেছে।

এমনিতে জিনিয়া খুব ভালো মেয়ে। দেখতে ভালো। ফিগার চমৎকার। সর্বাঙ্গে প্রচুর হাতছানি। তা ছাড়া গুণও আছে। একসময় নাচের চর্চা করত। এখন প্রায়ই ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল করায়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর নজরুল-জয়ন্তীতে সেগুলো প্রদর্শিত হয়। প্রশংসাও পায় প্রচুর। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এসব ব্যাপারে ও সত্যিই মাহির।

শুধু ইনভেন্টর স্বামীর ব্যাপারে ও একটু বেশি টায়ার্ড।

নিজের পাগলামোয় টায়ার্ড আমিও ছিলাম। কারণ, গত পনেরোবছরে বেশ কয়েকটা ছোটখাটো আবিষ্কার করতে পারলেও আমার অসমাপ্ত কিংবা ব্যর্থ আবিষ্কারের তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু তিনদিন আগে টাইম মেশিনটা আবিষ্কারের পর আমি আবার টগবগিয়ে উঠেছি। এটাই পৃথিবীর প্রথম সফল বাস্তবের টাইম মেশিন। এটা কল্পবিজ্ঞান নয় —বিজ্ঞান। এর আবিষ্কারের নাম দেবদত্ত রায়চৌধুরী। আমি।

এবারে মেশিনটার কথা একটু বলা যাক।

ব্যাপারটা ব্যাপক কমপ্লিকেটেড হলেও আমি সিম্পল টার্মস-এ বোঝানোর চেষ্টা করছি।

মেশিনটার মাপ একটা ছোট টিভির মতো। তার সঙ্গে লাগানো একটা একফুট বাই একফুট মেটাল প্ল্যাটফর্ম। টাইম ট্রাভেল করতে হলে এই প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়াতে হয়, বা কোনও জিনিস রাখতে হয়। তারপর ডায়াল সেট করে, কিবোর্ডে একগাদা বোতাম ঠুকে, নব ঘুরিয়ে, 'এন্টার' বাটন টিপে মেশিনটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হয়।

মেটাল প্ল্যাটফর্মটা ভাঁজ করা যায়। ওটা সমেত মেশিনটার ওজন সাড়ে চার কেজি। সুন্দর নীল রঙের একটা চৌকোনা ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢোকানো। বাইরে থেকে শুধু কয়েকটা ডায়াল, এলসিডি প্যানেল, একটা কিবোর্ড, আর চারটে নব ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। একটা রিচার্জেবল ব্যাটারি মেশিনটার শক্তি জোগায়। মোবাইল ফোনের মতো। চারঘণ্টা চার্জ দিয়ে নিলে মেশিনটা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক অ্যাক্টিভ থাকে।

টাইম স্কেলে আমার মেশিনটা সরাসরি পেছনদিকে যেতে পারে না। মানে, অতীতে যাওয়ার ব্যাপারে ওটার কিছু রেসট্রিকশান আছে। যেমন, ধরা যাক, আমি পাস্ট-এ যেতে চাই। যদি আমি পাঁচবছর আগের একটা সময়ে কোনও পারটিকুলার লোকেশানে হাজির হতে চাই, তা হলে সেই সময়ে আমি সেখানে ঠিক যে-অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় তৈরি হয়ে মেশিনটা অপারেট করলে তবেই মেশিনটা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। মানে, আমার সবকিছুই সেই পাঁচবছর আগেকার মতো হুবহু এক হতে হবে—এমনকী পোশাক-আশাকও। যাকে বলে জেরক্স কপি। তা না হলে মেশিনটা এলসিডি প্যানেলে 'মিসম্যাচ ফেলিয়োর' এরার মেসেজ দেখিয়ে দেবে।

সোজা কথায়, একমাত্র বয়েসটাকে মেশিনটা মিসম্যাচ এরার বলে ধরে না। বাকিগুলোকে ধরে।

এই সমস্যাটির কারণ হল স্পেস-টাইম। অর্থাৎ, অতীতকে কখনও কেউ পালটাতে পারে না। একই বস্তু একই সময়ে দু-জায়গায় থাকতে পারে না।

'আ সিঙ্গল অবজেক্ট ক্যান নট ফিজিক্যালি একজিস্ট অ্যাট টু ডিফারেন্ট প্লেসেস অ্যাট দ্য সেম টাইম। দ্য অবজেক্ট, ইফ সাবজেক্টেড টু টাইম ট্রাভেল ইন দ্য পাস্ট, উইল অলওয়েজ রিপ্লে ইটস রোল—অফ কোর্স ইগনোরিং দ্য এজিং ফ্যাক্টর—ফ্ললেসলি। আদারওয়াইজ ইট উইল অলওয়েজ কাম আপ উইথ দ্য এরার মেসেজ "মিসম্যাচ ফেলিয়োর"।'

মেশিনটা তৈরি এবং আবিষ্কারের ধাপগুলো নিয়ে আমি যেবিশাল থিসিস তৈরি করেছি, তারই একটা অংশ আপনাদের মুখস্থ শোনালাম। আমি এর নাম দিয়েছি টাইম মেশিনের 'একজিস্টেন্স প্যারাডক্স'।

মেশিনটা নিয়ে আমার কয়েকটা 'স্পেশাল' কাজ সারা হয়ে গেলেই আমি এই আবিষ্কারটার কথা রীতিমতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সারা পৃথিবীকে জানাব। তখন আমার থিসিসটাও পাবলিশ করে সারা পৃথিবীর সায়েন্টিস্টদের চমকে দেব। এবং ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করব।

'অতীত' নিয়ে মেশিনটার এই প্রবলেম থাকলেও 'ভবিষ্যৎ' বেশ উজ্জ্বল। যদি মেশিনটার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি নিজে ভবিষ্যতে চলে যাই তা হলে 'বর্তমান' থেকে আমি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাব এবং আমার ডায়াল সেট করা জায়গায় আমার 'আবির্ভাব' ঘটবে। সেখানে যতক্ষণ খুশি আমি থাকতে পারি—কিন্তু সেই সময়টুকু মেশিনটার কাছে

আমাকে দেখা যাবে না। আবার যখন আমি ফিরে আসব তখন আমাকে মেশিনটার প্ল্যাটফর্মের ওপরে হঠাৎ করে 'আবির্ভূত' হতে দেখা যাবে।

সোজা কথায়, সময়ের একমুখী গতিকে কিছুতেই থামানো যাবে না, বদলানো যাবে না।

এই 'একজিস্টেন্স প্যারাডক্স' নিয়ে আগের বিজ্ঞানীরা ভাবেননি।

ভাগ্যিস ভাবেননি! ভাবলে আমার কপালে এই কৃতিত্ব আর জুটত না।

জিনিয়ার কাছ থেকে বরফের মতো 'উষ্ণ' অভ্যর্থনা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেই দমে গেলাম না। বরং একটা জেদ চেপে গেল মনে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে চলে গেলাম একতলার গ্যারাজে—মানে, আমার ল্যাবরেটরিতে। আমার 'মহান' আবিষ্কারের দিকে তাকিয়ে আমার আবেগ এবং ইগো একেবারে উথলে উঠল।

ওই তো নীল রঙের বাক্সটা! আমার বিলাভেড ইনভেনশান! ওর কেরামতি দেখিয়ে আমি কি জিনিয়াকে চমকে দিতে পারি না? ওর তাচ্ছিল্য আর উপেক্ষার মুখের মতো জবাব দিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি।

একটা আওয়ারা বেড়াল প্রায় বছরতিনেক ধরে আমাদের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে। জিনিয়া সবসময় ওকে খেতে-টেতে দেয়, লালনপালন করে। আমিও ওকে মাঝে-মাঝে আদর-টাদর করি। তার কারণ, আমার ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্টের ও-ই হচ্ছে একমাত্র অ্যাভেইলেবল 'গিনিপিগ'। তাই ওকে আমি 'গিনিপিগ' বলেই ডাকি। জিনিয়ার মতে ব্যাপারটা 'বৈজ্ঞানিক আহ্লাদ' ছাড়া আর কিছুই নয়। জিনিয়া ওকে আদুরে নাম দিয়েছে 'মিন্টি'।

এদিক-ওদিক সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই গিনিপিগকে পেয়ে গেলাম। পাঁউরুটির টুকরো দেখিয়ে 'আ-আ-তু-তু' করে ওকে গ্যারাজে নিয়ে এলাম। তারপর টাইম মেশিনের প্ল্যাটফর্মটা ভাঁজ খুলে পেতে দিলাম। গিনিপিগকে তার ওপরে দাঁড় করিয়ে মেশিনের সুইচ অন করে দিলাম। গিনিপিগ 'মিঁউ-মিঁউ' করতে লাগল।

আমি ডায়াল সেট করলাম, কিবোর্ডে ঠকাঠক বোতাম ঠুকলাম, নব ঘোরালাম, এবং ঠকাস করে 'এন্টার' বাটন টিপে দিলাম।

চোখের পলকে—বিশ্বাস করুন—চোখের পলকে গিনিপিগ উধাও হয়ে গেল। ওর 'মিঁউ-মিঁউ'-র সুইচ কেউ যেন আচমকা অফ করে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে দোতলা থেকে জিনিয়ার চিৎকার শুনতে পেলাম। গিনিপিগকে হঠাৎ শূন্য থেকে হাজির হতে দেখে ও ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে।

আমি দুদ্দাড় করে দোতলায় ছুটলাম।

ড্রইং-ডাইনিং-এ ঢুকে দেখি জিনিয়ার টিভি দেখা মাথায় উঠেছে। ও সোফা ছেড়ে উঠে ঝুঁকে পড়েছে আহ্লাদী গিনিপগের ওপরে। অবাক হয়ে কাতর গলায় বলছে, 'ও মা, মিন্টিসোনা! তুই এখানে কী করে এলি?'

আমি বেশ গর্বের সঙ্গে বললাম, 'আমি পাঠিয়েছি—।'

'কী? এইটুকু বেড়ালকে তুমি একতলা থেকে দোতলায় ছুড়ে দিলে!'

আমি তাড়াতাড়ি হাত-পা নেড়ে ওকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠলাম, 'না, না—ছুড়িনি, ছুড়িনি। আমার টাইম মেশিন ওকে এখানে পাঠিয়েছে। এক্ষুনি ও আবার চলেও যাবে—নীচের গ্যারাজে...।'

'তুমি ওকে...তুমি ওকে...।' জিনিয়া রেগে-টেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই গিনিপিগ ভ্যানিশ হয়ে গেল। আমি ওকে দু-মিনিটের জন্যে ফিউচারে পাঠিয়েছিলাম।

জিনিয়াকে হতবাক অবস্থায় ফেলে রেখে আমি আবার একতলায় ছুট লাগালাম। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছিল। জিনিয়াকে সকাল-সকাল আচ্ছা টাইট দেওয়া গেছে। আমার এই জয়টাকে স্ত্রীর উপেক্ষায় জর্জরিত বিজ্ঞানীদের উৎসর্গ করলাম।

চাঁদনি চকে আমার ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস-এর একটা দোকান আছে। দোকানের নাম 'সুপার ইলেকট্রনিক্স'। দোকানটা মাপে ছোট হলেও বেশ চালু দোকান। আমি আর দুজন ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে দোকান সামলাতে বেশ হিমসিম খাই। দোকানের রোজকার সেল সাত থেকে দশ হাজার টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্টদের মধ্যে একজনের নাম তারক, অন্যজনের নাম সতু। তারক রোগা-পাতলা। একটা চোখ সামান্য লক্ষ্মীট্যারা। সবসময় পানমশলা চিবোচ্ছে, চোয়াল নড়ছে, আর ঘনঘন পিক ফেলছে।

সতুর চেহারা বেশ ভারী। চালচলন গুরুগম্ভীর। খদ্দেরদের সঙ্গে খেঁকিয়ে কথা বলাটা বেশি পছন্দ করে। ওকে সবসময় 'আঃ, সতু...কেয়ারফুল।' বলে ডাক দিতে হয়। এ ছাড়া ওর এফ. এম. চ্যানেল শোনার প্রবল বাতিক। ওর জন্যেই আমাকে দোকানে সবসময় রেডিয়ো চালিয়ে রাখতে হয়।

ওদের দোষ যতই থাকুক, একটা গুণ বেশ তারিফ করার মতো। ওরা দুজনেই খুব অনেস্ট। দরকার হলে চেয়ে নেবে, কিন্তু লুকিয়ে ক্যাশবাক্সে হাত ঢোকাবে না।

পরের টেস্টটার জন্যে আমি 'সুপার ইলেকট্রনিক্স'-কে বেছে নিলাম।

কিন্তু তার আগে থিয়োরিটা শেষবারের মতো খতিয়ে দেখার জন্যে আমি একজন সরল পণ্ডিত মানুষের খোঁজ করে চললাম। কারণ, একটা আউটডোর এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার আগে ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু এক্সপার্ট কমেন্টস দরকার। আর সেই এক্সপার্টকে হতে হবে সরল—যাতে আমার কথায় তিনি সন্দেহ না করে বসেন। এবং পণ্ডিত—যাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামতে কোনও ভেজাল না থাকে।

অনেক খোঁজখবর করে আমার পাড়ার বন্ধু সুবীরের এক জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হল। ভদ্রলোকের নাম মণিমোহন সরখেল। ফিজিক্সের রিটায়ার্ড প্রফেসর। প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন। পরে সেখানেই অধ্যাপক। তারপর আমেরিকায় চলে যান। বহুবছর ক্যালটেক-এ ছিলেন, আর তিনবছর স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। মানে, সিভি যাকে বলে ব্যাপক ঘ্যাম।

একদিন বিকেলে সুবীর আমাকে প্রফেসর সরখেলের কাছে নিয়ে গেল। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'জেঠু আমার ছোটবেলাকার বন্ধু, দেবু—দেবদত্ত রায়চৌধুরী। ও খুব নামকরা ইয়ে...' মাঝপথে আটকে গিয়ে সুবীর আমার দিকে তাকাল: 'কী বলে যেন তুই নিজের পরিচয় দিস?'

আমি লজ্জা পেয়ে গিয়ে চোখ নামিয়ে বললাম, 'ওই ইনভেন্টর...মানে, বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় মজা করে বলি আর কী!'

প্রফেসর সরখেল ভুরু কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে গোরিলার ঢঙে আমার দিকে তাকালেন, 'ইনভেন্টর? অ। তা কী নিয়ে পড়াশোনা করেছ?'

ব্যস, শুরু হল তাঁর হামানছেঁচা জেরা। একেবারে সি. বি. আই.-এর বাবা। আমি কোত্থেকে পাশ করেছি। কতদূর লেখাপড়া করেছি। কী নিয়ে গবেষণা করেছি। কোন-কোন জার্নালে রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছি। ফরেনে গেছি কিনা। এবং, সবশেষে, এ পর্যন্ত আমি কী-কী ইনভেন্ট করেছি।

ওঁর প্রশ্নের ধাক্কায় আমি ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। নির্বিঘ্নে আমার সব প্রশ্নের উত্তর এই মানুষটার কাছ থেকে বের করতে পারব তো? নাকি এই বৃদ্ধই আমার পেট থেকে সব মতলব টেনে বের করে চারদিকে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দেবেন?

আমি বৃদ্ধ বাঘা বিজ্ঞানীটিকে হাঁ করে দেখছিলাম।

ফরসা মোটাসোটা গাবলু চেহারা। মাথায় টাক, তাকে ঘিরে বাউন্ডারি ওয়ালের ঢঙে ধবধবে সাদা চুল। গালে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। চশমার কাচের ওপরে সাদা ভুরুর ঝালর উঁকি মারছে। দু-দিকের গাল বার্ধক্যের ভারে ঝুলে পড়েছে। গায়ে সাদা ফতুয়া, পায়ে পাজামা।

প্রফেসর সরখেল একটা মোটা বাঁধানো বইয়ের পৃষ্ঠা খুলে হাতে ধরে ছিলেন। আমাকে জেরা করার কাজ শেষ হতে বইটা শব্দ করে সামনের টেবিলে রাখলেন। একটা 'হুম' শব্দ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সরাসরি আমার দিকে তাকালেন: 'বলো, কী বলবে?'

আমি কয়েকবার ঢোক গিলে বললাম, 'লাস্ট দু-চারবছর ধরে আমি একটা টাইম মেশিন ইনভেন্ট করার কথা ভাবছি। আমার কনসেপ্টগুলো...।'

ধীরে-ধীরে আমার আইডিয়ার নিরীহ অংশগুলো ওঁকে বললাম।

সুবীর একফাঁকে অন্দরে চলে গিয়েছিল। বোধহয় চা-বিস্কুটের বন্দোবস্ত করতে। কারণ, ও ফিরে আসার একটু পরেই এটি অল্পবয়েসি মেয়ে আমাদের তিনজনের জন্যে চা ইত্যাদি টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

আমার সব কথা মন দিয়ে শোনার পর প্রফেসর সরখেল কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তারপর চোখ খুলে চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন। চায়ের কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তোমার ব্যাপারটা আসলে টেলিট্রান্সপোর্টেশান অফ ম্যাটার। মানে, আই মিন, কোনও একটা জিনিসকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পাঠানো। মানে, ম্যাটারকে যেভাবেই হোক এনার্জিতে কনভার্ট করতে হবে। তারপর সেই এনার্জিকে লাইটের ভেলোসিটিতে আর-এক জায়গায় পাঠাতে হবে। সেখানে পৌঁছনোর পর সেই এনার্জিকে, আই মিন, রিকনভার্ট করতে হবে ম্যাটারে। আর পুরো ট্রান্সপোর্টেশানটাই তোমার হবে গিয়ে হাইপারস্পেস দিয়ে...।'

সুবীর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'জিনিসটা ভ্যানিশ হয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে?'

মণিমোহন গম্ভীরভাবে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আসবে। তোমার তাতে আপত্তি থাকতেই পারে। তুমি তো আর্টস-এর ছাত্র ছিলে—।'

সুবীর আর্টস-এর ছাত্র ছিল ঠিকই তবে এখন 'সিটিজেন ফিনান্স' নামে একটা ঘ্যাম কোম্পানির একজিকিউটিভ ডায়রেক্টর। কিন্তু হলে কী হবে, বিজ্ঞানী জেঠুর কাছে ওর ওজন তিলতুল্য। তাই ও কাঁচুমাচু হয়ে মুখে কুলুপ আঁটার শপথ নিল বলে মনে হল।

প্রফেসর সরখেল আমার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন, 'মানে, আইনস্টাইনের ইকুয়েশান। ম্যাটার টু এনার্জি, এনার্জি টু ম্যাটার। রিভারসিবল প্রসেস। সবটাই হবে ফোর্থ ডায়মেনশান—আই মিন, ওই যে বললাম—হাইপারস্পেস দিয়ে...। শুধু কনভারশনটা হবে একটা লোকেশানের। আর রিকনভারশন হবে অন্য আর-একটা লোকেশানে। তবে লোকেশানের ডেটাগুলো ঠিকঠাক হওয়া দরকার...।'

'যদি ম্যাটার পাঠানোর সময় মেশিনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়? তার জন্যে কোনও প্রোটেকশান সাজেস্ট করতে পারেন?' আমি এবারে আমার সমস্যার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। 'সুপার ইলেকট্রনিক্স'-নিয়ে পরীক্ষায় নামার আগে নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখা দরকার।

'দ্যাখো, যদি এরকম কোনও মেশিন কখনও তৈরি করা যায় তা হলে তাতে টেলি-ট্রান্সপোর্টেশান-এর ব্যাপারটা ঘটবে আলোর গতিতে। বলতে গলে একপলকে। ধরো, লাইটের ভেলোসিটি সেকেন্ডে প্রায় তিনলক্ষ কিলোমিটার। আর আমাদের পৃথিবী পরিধি হল চল্লিশহাজার কিলোমিটার। মানে, একসেকেন্ডে আলো পৃথিবীকে সাড়ে সাতবার পাক মেরে আসবে। সুতরাং, তুমি সেফলি বলতে পারো, ট্রান্সপোর্টেশান-এর ওই পারটিকুলার মোমেন্টে তোমার মেশিনটা খারাপ হওয়ার চান্স প্র্যাকটিক্যালি জিরো। নাঃ, থিয়োরিটিক্যালি আমি তো কোনও প্রবেলম দেখছি না।' মাথা নেড়ে শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

'ধরুন, কোনও অবজেক্টকে অন্য জায়গায় পাঠালাম। তারপর যদি মেশিন ব্রেকডাউন হয়?'

'এর আনসার খুব সিম্পল—' দু-হাত ঘুরিয়ে নাড়ু পাওয়ার ভঙ্গি করলেন মণিমোহন: 'জিনিসটা ওখানেই থেকে যাবে—মেশিন ঠিক না হওয়া পর্যন্ত। মেশিন ঠিক হলেই সেটা ফেরত আনা যাবে। আই মিন, থিয়োরিটিক্যালি এটাই লজিক্যাল...।'

মেশিন যদি আর কোনওদিন ঠিক না হয়? কেউ যদি হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ওটাকে চিরকালের জন্যে বিকল করে দেয়? কিংবা ওটার সুইচ অফ করে শাট ডাউন করে দেয়?

সে-কথা আর সুবীরের জেঠুকে জিগ্যেস করলাম না। তবে একটা ছোট্ট ভয় আমার মনে দানা বাঁধল।

মণিমোহন জিগ্যেস করলেন, 'যন্ত্রটা নিয়ে তুমি কদ্দূর এগিয়েছ?'

'এগোইনি। থিয়োরিটিক্যাল কনসেপ্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।'

'বেশ, বেশ। তোমার ব্যাপারটায় আমার ইন্টারেস্ট রইল।' চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়ালেন: 'কিছু মাইন্ড কোরো না। একটু প্রেশার আসছে—টয়লেটে যেতে হবে।'

আমি আর দেরি করলাম না। সুবীরকে 'মেনি-মেনি থ্যাংকস' জানিয়ে বিদায় নিলাম।

বাড়িতে এসে মেশিন নিয়ে প্রবল প্র্যাকটিস শুরু করলেন। জিনিয়া যখন বাড়িতে থাকে না তখন সদর দরজা বন্ধ করে নিজে মেশিনের পাটাতনে দাঁড়িয়ে মেশিন চালু করে নিজেকে যেখানে-সেখানে পাঠাতে লাগলাম। কখনও দোতলায় হুস করে হাজির হলাম,

কখনও ছাদে গেলাম, কখনও মাস্টার বেডরুমে গেলাম—রান্নাঘর, বাথরুম কিছুই বাদ রাখলাম না।

প্রতিক্ষেত্রেই আমি একমিনিট বা দু-মিনিট টাইম সেট করে 'রওনা' হয়েছিলাম। ফলে একবার ছাড়া প্রত্যেকবার গ্যারাজের ভেতরেই ফিরে এলাম। শুধু লোকেশান সেট করার সময় জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান আর ফিগারেটিভ ডেটায় কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশান থাকায় একেবারে সঠিক জায়গায় হাজির হচ্ছিলাম না। একটু-আধটু এদিক-সেদিক হয়ে যাচ্ছিল। আর ফিউচারে অন্য লোকেশানে পৌঁছে যদি আমি সেখানে হাঁটাহাঁটি করে পজিশান শিফট করি তা হলে টাইম মেশিনের প্ল্যাটফর্মে ফিরে না এসে দু-দশহাত দূরে অন্য জায়গায় ফিরে আসছিলাম। একবার তো গ্যারাজের বাইরে করিডরে এসে ল্যান্ড করলাম!

তখনই ঠিক করলাম, ফিউচারে অন্য লোকেশানে পৌঁছে আমি পজিশান সম্পর্কে সবসময় অ্যালার্ট থাকব।

সাতদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় টাইম মেশিনের টার্গেট ডেস্টিনেশানের পজিশান বা কো-অর্ডিনেট এরারকে মিনিমাইজ করে ফেললাম। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এইবার 'সুপার ইলেকট্রনিক্স'-এর পরীক্ষায় নামা যায়।

পরীক্ষাটা খুবই সামান্য, তবে আমার দ্রুত বড়লোক হওয়ার প্রজেক্টের এটাই প্রথম মেজর স্টেপ।

এক শনিবার 'জরুরি কাজ আছে' বলে সতু আর তারককে দোকানে রেখে আমি বেরিয়ে গেলাম। ওদের বললাম, বিক্রিবাটার টাকা ঠিকমতো গুনে-গেঁথে ওরা যেন ক্যাশবাক্সেই রেখে দেয়। তারপর দোকান বন্ধ করে চাবির গোছা যেন আমার বাড়িতে 'বউদি'-র কাছে পৌঁছে দেয়। আমি পরে যা ব্যবস্থা করার করব।

ব্যাপারটা মালিকের নির্দোষ নির্দেশ বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। ওদের চাকরিজীবনে ওরা কখনও এরকম নির্দেশ আগে পায়নি। আমি জানতাম, ওরা আমার কথামতো কাজ করবে। তাই গভীর রাতে নিশ্চিন্তে আমার টাইম মেশিনে চড়ে বসলাম। তারপর ডায়াল, কিবোর্ড, নব—হুউস।

প্রথম চেষ্টায় আমি হাজির হলাম আমার দোকানের বাইরের রাস্তায়। আমি টাইম সেট করেছিলাম একমিনিট। যদি দোকানের ভেতরে ঠিকমতো হাজির হতে পারতাম তা হলে ক্যাশবাক্স খুলে ক্যাশ নিয়ে আমার গ্যারাজে ফিরে আসার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট। কিন্তু নির্জন রাস্তায় হঠাৎ গজিয়ে উঠে একমিনিট ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে সময়টা যথেষ্টর চেয়েও একশোগুণ বেশি। তা ছাড়া এতে বিপদও অনেক।

তো সেই বিপদে পড়লাম।

আমাকে ম্যাডান স্ট্রিটের মাঝখানে হঠাৎই শূন্য থেকে গজিয়ে উঠতে দেখে ফুটপাতে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে থাকা একটা মাতাল আনন্দে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমি কিছু করে ওঠার আগেই ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। হাঁউমাঁউ করে বলতে লাগল, 'এতদিনে দর্শন দিলে, ভোলেবাবা! কিছু মালকড়ি দাও, প্রভু। তোমার নির্দেশমতো রোজ মাল-টাল খাই। ওই মাল টানার জন্যেই কিছু মালপানি দাও, বস। জয় ভোলেনাথ!'

আমার পজিশান চেঞ্জ করলে যদি টাইম মেশিনে আবার ফিরে যেতে না পারি! শুধু এই ভয়ে আমি মাতালটার কাছ থেকে ছুটে পালাতে পারছিলাম না।

শুনশান রাস্তায় সে এক কেলেঙ্কারি! ফুটপাতে এখানে-ওখানে আর যারা সব শুয়ে আছে তারা না জেগে ওঠে!

এদিক-ওদিক তাকালাম।

দূরে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে গেল। রাস্তার লাইটগুলো নীরব সাক্ষী হয়ে জেগে বসে আছে। মাঝে-মাঝে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। রাত দুটোয় রাস্তাঘাটের অবস্থা যেমন হয়।

মাতালটা কেঁদে-কঁকিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একমিনিট পূর্ণ হল। ওর ঝাপসা চোখের সামনে আমি ভ্যানিশ হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমি সাকসেসফুল হলাম। 'এন্টার' বোতাম টেপার পরই দেখলাম, আমি আমার দোকানের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েই আছি।

অন্ধকার যে থাকবেই সেটা আগে থেকেই আমার মাথায় ছিল। তাই চট করে পকেট থেকে ছোট একটা টর্চলাইট বের করে নিলাম। ক্যাশবাক্সের চাবি সঙ্গে ছিল। বাক্স খুলে ক্যাশের টাকা গুছিয়ে নিতে পনেরো সেকেন্ডের বেশি লাগল না। তারপর একমিনিট পুরো হতেই...হুউস। দোকান থেকে আমি ভ্যানিশ হয়ে গেলাম। পলকে চলে এলাম আমার ল্যাবরেটরিতে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি টাকার গোছা ঠিকমতোই রয়েছে।

এই পরীক্ষাটা সাকসেসফুল হতেই আমার কনফিডেন্স লেভেল বেড়ে গেল। এবং আমি বড়লোক হওয়ার কাজে নামলাম।

প্রথমেই বলে রাখি, ব্যাংক-ট্যাংক-কে আমি আমার টার্গেট লিস্টের মধ্যে রাখিনি। কারণ, ব্যাংকে সব কিছু ভল্ট বা সিন্দুকে নিরাপদে রাখা থাকে। ওগুলোর তালা ভাঙা আমার এলেমের বাইরে। আবার ব্যাংকিং আওয়ার্স-এ যখন নোটের বান্ডিল ছড়ানো-ছেটানো থাকে তখন গাদাগুচ্ছের লোকজনও তার সামনে দারোয়ান হয়ে হাজির থাকে।

সুতরাং, আমার টার্গেট হল ছোটখাটো দোকান। যাদের ক্যাশবাক্স খোলা থাকে এবং হাঁটকালে অল্পবিস্তর টাকা পাওয়া যায়।

আমি জানতাম যে, আমার সামনে অঢেল সময়—কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সপ্তাহে দুটো কি তিনটে অপারেশান করলেই চলবে। তা ছাড়া ক্যাশ সরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে দোকানদাররা যাতে থানা-পুলিশ বা হইচই না করে সেজন্যে আমি খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে চললাম। অর্থাৎ, এক-একটা দোকান থেকে মাত্র দুশো-পাঁচশো কি হাজার টাকা সরাতে লাগলাম। এতে বেশিরভাগ মালিকই ভাববে, ব্যাপারটা তাদের গোনার ভুল।

নির্বিঘ্নে কাজ চালাতে লাগলাম। মাসে আট-দশহাজার টাকা বাড়তি ইনকাম হতে লাগল। আমি জানি, অতি লোভ না করে ধৈর্য ধরে কাজ করে গেলে আরও সুযোগ আসবে—আয়ও অনেক বাড়বে।

সুতরাং, ধৈর্য—শুধু ধৈর্য।

এইসব অপারেশান করার আগে আমাকে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করতে হত। দোকানের লোকেশান, ক্যাশ কোথায় রাখে, ক'টায় দোকান খোলে, ক'টায় বন্ধ হয়, দোকানের ভেতরে কেউ রাতে শুয়ে থাকে কিনা, সম্ভব হলে মালিক কোথায় থাকে—এসব তথ্য জোগাড় করে আমাকে রীতিমতো স্টাডি করতে হত।

এইভাবে কাজ করতে-করতে আমার সামনে একটা বড় সুযোগ এসে গেল। একটা প্রিমিয়াম কাপড়ের দোকান থেকে সাড়ে এগারো লাখ টাকা সরানোর সুযোগ পেলাম। চোখের সামনে অতগুলো টাকা দেখে আমার নিয়ত খারাপ হয়ে গেল। সূক্ষ্ম ব্যাপার-ট্যাপার সব ভুলে গিয়ে পুরো টাকাটাই লোপাট করে দিলাম। মনে-মনে ঠিক করলাম, যদি এই মিস্টিরিয়াস চুরি নিয়ে খুব হইচই হয় তা হলে আমি থামব। এক-দু-বছর চুপচাপ থাকব। তারপর সব থিতিয়ে গেলে আবার আমি বড়লোক হওয়ার প্রজেক্টে হাত দেব।

তাই করলাম। এবং একটা ছোট্ট গন্ডগোল হওয়ায় আমাকে থামতেই হল।

টাকাটা পরিমাণে বেশি ছিল বলে আমার গায়ের জামা খুলে নোটগুলো পুঁটলি বাঁধতে হয়েছিল। তখনই কীভাবে যেন আমার পকেটের রুমালটা স্পটে পড়ে যায়। আর জামার একটা বোতাম খসে পড়ে। সেগুলো নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হল। পুলিশ-কুকুর লাগানো হয়। খবরের কাগজে লেখালেখি হয়। আমি ভয়ে জামাটা পুড়িয়ে ফেলি।

কিন্তু একটা ঘটনা থেকে আর-একটা ঘটনা যে কীভাবে গড়ায় সেটা কেউ জানে না।

একদিন রাতে যখন শার্টটা পোড়াচ্ছি তখন জিনিয়া সেই পোড়া গন্ধ পেল। ও ছুটে এল ড্রইং-ডাইনিং-এর টয়লেটের কাছে।

'এই মাঝরাতে কী করছ?' ভুরু কুঁচকে ও জানতে চাইল।

'এই...ইয়ে...শার্টটা পোড়াচ্ছি...।' আমতা-আমতা করে বললাম।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পোড়াচ্ছ কেন?'

'আমার...আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট-এ লাগবে।' চট করে যা মাথায় এল বলে দিলাম।

'এক্সপেরিমেন্ট? নাকি লিপস্টিকের দাগ লেগেছিল?'

'লিপস্টিক? লিপস্টিক কোথা থেকে আসবে?' দু-চোখ কপালে তুললাম আমি।

জিনিয়া ওর গালের পাশ থেকে চুল সরিয়ে বেশ খোঁচা দেওয়া গলায় বলল, 'কোথা থেকে আবার আসবে? যেখান থেকে আসে—কোনও দুশ্চরিত্র ছেনাল মেয়ের ঠোঁট থেকে...।'

এ-মন্তব্য আমি কল্পনাও করিনি। এতটাই অবাক হয়ে গেলাম যে, আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

জিনিয়া আমাকে এখনও সন্দেহ করে? আশ্চর্য! দ্রৌপদীর ব্যাপারটা তা হলে ও ভোলেনি!

বিয়ের বছর-পাঁচেক পর একবার একটা গায়েপড়া মেয়ের সঙ্গে আমার সামান্য ইয়ে হয়েছিল। ওর নাম ছিল দ্রৌপদী। ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট কিনতে প্রায়ই আমার দোকানে আসত। তারপর কথাবার্তায় বুঝতে পারে যে, এ-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা আছে। তখন দোকানে ওর আসা-যাওয়া বাড়ে। দরকার পড়লেই আমাকে মোবাইলে ফোন করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ও দরকার ছাড়াই ফোন করা শুরু করে।

এরপর একদিন দ্রৌপদীকে একটা সার্কিটের অপারেশান দেখানোর জন্যে আমি বাড়িতে নিয়ে আসি। জিনিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। জিনিয়া ওকে বন্ধুর মতো মেনে নেয়।

দিন যায়। দ্রৌপদীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা আমার বাড়তে থাকে। না, ওটা কখনও প্রেম-টেম-এর দিকে টার্ন নেয়নি। কিন্তু জিনিয়ার কয়েকটা খোঁচা দেওয়া কথায় একদিন বুঝলাম ব্যাপারটা ওর ভালো লাগছে না। ও একটা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স-এ ভুগছে। তার ওপর বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি বলে কমপ্লেক্সটা হাইপারবোলিক এক্সপ্যানশান হয়ে বীভৎস চেহারা নিয়েছে।

আমি ব্যাপারটা বুঝতাম। তাই কখনও পালটা আঘাত না দিয়ে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

একদিন জিনিয়া আমাকে আর দ্রৌপদীকে সাউথ সিটি মল থেকে বেরোতে দ্যাখে। ব্যাপারটা একেবারেই নির্দোষ ছিল। দ্রৌপদী একটা হ্যান্ডব্যাগ কেনার জন্যে ওখানে যাচ্ছিল। আর আমার দুটো জিনস কেনার ছিল। তাই চাঁদনি থেকে দুজনে সাউথ সিটি মল-এ গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু এই কাকতালীয় ব্যাপারটা বাড়িতে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। সে-বিস্ফোরণ নাইন/ইলেভেন-এর বিস্ফোরণের চেয়েও মারাত্মক।

আমাকে ক'দিন তুলোধোনা করার পর দ্রৌপদীকেও টেলিফোনে জঘন্য অপমান করেছিল জিনিয়া। সেসময়ে ওকে দেখে আমার মনে হয়নি ওর মধ্যে কোনও শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা রুচি-সভ্যতার ছাপ আছে।

তখন আমার মনে একটা বাজে ইচ্ছা চেপেছিল। কিন্তু নানান অসুবিধের কথা ভেবে ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করে দিই। কারণ, তখনও তো আমার টাইম মেশিন তৈরি হয়নি।

এরপর থেকে আমি বরাবর জিনিয়ার অকারণ সন্দেহের আওতায় থেকে গেছি। প্রায় বছরখানেক জিনিয়া নর্মাল ছিল। নাচের রিহার্সাল, নাচের প্রোগ্রাম—এসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাতে আমি ভেবেছিলাম, সন্দেহবাতিকটা অবশেষে গেছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, ব্যাপারটা সহজে যাওয়ার নয়।

আমি কাতরভাবে বললাম, 'জিনিয়া, প্লিজ, তুমি ভুল ভাবছ। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। আমি...।'

'তুমি যদি ক্লিন হও তা হলে আমাকেই শার্টটা পোড়ানোর দায়িত্ব দিতে পারতে। একা-একা মাঝরাত্তিরে চুপিচুপি...ছিঃ!'

জিনিয়া প্রবল চিৎকার করে কথা বলছিল। এখুনি আশেপাশের বাড়ির লোক না জেগে ওঠে!

'জিনি, প্লিজ—আস্তে...আস্তে। পাড়ার লোকজন এবার জেগে উঠবে। প্লিজ।' ওর কাছে এগিয়ে গেলাম আমি: 'শোনো। তোমাকে সবটা খুলে বলছি। আমার এই নতুন এক্সপেরিমেন্টটা হল, কোনও জিনিসকে পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই থেকে জিনিসটাকে আবার তৈরি করা। রিকনস্ট্রাকশন। বুঝলে? তারই ফার্স্ট স্টেপ হিসেবে এই শার্ট...মানে...।'

সে-রাতে ওকে ঠান্ডা করতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। ওকে বলেছিলাম, যেহেতু ও আমার বিজ্ঞান-টিজ্ঞান করার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করে না তাই ওকে লুকিয়ে মাঝরাতে শার্টটা পোড়াচ্ছিলাম।

অনেক ইনিয়েবিনিয়ে ঘ্যানঘেনিয়ে ওকে শান্ত করলাম। একেবারে শেষে কান্নাভাঙা গলায় বলেছি, 'আমার জীবনে শুধু বিজ্ঞান আর তুমি—এ ছাড়া আর কী আছে বলো? রোজ-রোজ দোকানে যেতে আমার একটুও ভালো লাগে না...।'

যাই হোক, অনেক কষ্টে জিনিয়ার রোষ থেকে বাঁচলাম। কিন্তু পুরোনো বাজে ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দিল। এখন তো আর কোনও প্রবলেম নেই! আমার হাতে টাইম মেশিন আছে।

কিন্তু মনকে বোঝালাম। তোমার হাতে ক্ষমতা থাকলে তাকে সামলে রেখে ব্যবহার করতে হয়। সামান্য টাকাপয়সা হাতিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে—তার চেয়ে বেশি আর এগিয়ো না। নিজের ওপরে কাবু রাখো। ক্ষমতার অপব্যবহার কোরো না। লাগাম—লাগাম! লাগামের কথা কখনও ভুলবে না।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এসব কথা ভেবেছিলাম। মনে-মনে অনেক ভালো-ভালো শপথ নিয়েছিলাম।

কিন্তু সেগুলো যে সাতদিন পরেই চটকে চচ্চড়ি হয়ে যাবে সেটা তখন বুঝতে পারিনি।

কী করেই-বা বুঝব? তখন তো সোনির সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি!

আলাপটা করিয়ে দিয়েছিল সুবীর। ফলে এক অর্থে বলা যেতে পারে আমার অপকর্মের জন্যে সুবীরই দায়ী। ওই যে বলেছি, একটা ঘটনা থেকে আর-একটা ঘটনা যে কীভাবে গড়ায় সেটা কেউ জানে না। ফলে আমার মেন্টাল কন্ডিশান, সুবীরের সঙ্গে দেখা হওয়া, ওর অফিসের পার্টিতে আমার যাওয়া সোনির সঙ্গে পরিচয়, তারপর...।

নাঃ, ব্যাপারটা শুরু থেকেই বলি।

একদিন রাতে খুব 'মুড অফ' অবস্থায় সুবীরের সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম।

হঠাৎই ও বলল, 'তোর কী হয়েছে বল তো?'

'কিছু হয়নি। নিজেকে জাস্ট ফালতু লাগছে...।'

সুবীর সিগারেট খাচ্ছিল। সেটাতে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'বস, বলো তো, কেসটা কী?'

আমি মুখ খুলতে না চাইলেও সুবীর ভীষণ চাপাচাপি করতে লাগল।

ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ পেরে উঠলাম না। শেষ পর্যন্ত জিনিয়ার কথা একটু-আধটু রেখে-ঢেকে ওকে বললাম।

'জানিস, জিনিয়া সবসময় আমাকে সন্দেহ করে। সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমাকে কোনও পাত্তাই দেয় না।'

সুবীর গম্ভীরভাবে সিগারেট টান দিয়ে বলল, 'দেবু, আমি সায়েন্সের কিছু বুঝি না, কিন্তু তোর কেরিয়ার তো আমি জানি! তা ছাড়া সেদিন তোর আর জেঠুর কথাবার্তা শুনেছি। আমার জেঠু ভীষণ স্নব টাইপের—বিজ্ঞান নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। হাইফাই সায়েন্টিস্ট হলে যা হয় আর কী! কিন্তু তোর সঙ্গে জেঠু যেভাবে কথা বলেছে তাতে আমি এটুকু বুঝেছি যে, তোর মধ্যে সামথিং হ্যাজ। আমি বিশ্বাস করি, তুই একদিন দুনিয়াকে চমকে দিবি...।'

সুবীরের কথাগুলো আমার কানে সান্ত্বনার মতো শোনাচ্ছিল, কিন্তু একইসঙ্গে এও বুঝতে পারছিলাম, ওর কথাগুলো খুব জেনুইন। ও আমার খুব কাছের বন্ধু।

হঠাৎ আমাকে ছোট্ট একটা ধাক্কা মারল সুবীর। রকের খিস্তি দিয়ে বলল, 'ওসব ফালতু চিন্তা ছাড় তো! নে একটা সিগারেট ধরা—' ও জোর করে একটা সিগারেট গুঁজে দিল আমার হাতে।

আমি এমনিতে স্মোক করি না। হয়তো ছ'মাসে ন'মাসে মুড খারাপ হলে একটা সিগারেটে টান দিই। যেমন এখন।

সুবীর আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কাল দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ব্যাক কর। কাল আমাদের অফিসে একটা গ্র্যান্ড পার্টি আছে—কোম্পানির দুর্ধর্ষ বিজনেসের জন্যে। তুই আমার সঙ্গে যাবি—আমার গেস্ট হয়ে।'

আমার কিছু ভালো লাগছিল না। টাইম মেশিন নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার আপাতত শেষ। তার ওপর জিনিয়ার ম্যানিয়া—সঙ্গে ফাউ হিসেবে উপেক্ষা তো আছেই। অঅর সবশেষ আমার নতুন আবিষ্কারটার কথা সবাইকে জানাতে না পারার অসহ্য যন্ত্রণা।

আমার প্রতিবাদ করতে ভালো লাগছিল না বলেই সুবীরের কথায় রাজি হলাম।

পরদিন ওর সঙ্গে পার্টিতে গেলাম। এবং মরলাম।

সেখানে রঙিন বেলুন, হুইস্কি, মিউজিক, নাচ— কী নেই! প্রথম কুড়িমিনিট কোম্পানির সাফল্য নিয়ে প্যানপ্যানানির পর পার্টির হুল্লোড় শুরু হল। এইসব পার্টিতে যে নিয়মকানুনের খুব একটা বালাই থাকে না, সেটা বুঝতে পারলাম।

আমি বোকার মতো ড্রিংক-এর গ্লাস হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, চারপাশে উদ্দাম নাচ চলছে। মনে হল, দুর, এখানে আমি কেন যে এলাম! মাথা উঁচু করে ভিড়ের মধ্যে সুবীরকে খুঁজতে লাগলাম।

হঠাৎই এক ধাক্কায় আমার হাতের গ্লাসটা ছিটকে পড়ল।

চমকে তাকিয়ে দেখি একটি ছিপছিপে লম্বা মেয়ে কোমরে মোচড় দিয়ে পেছনদিকে ঘুরে আমার চোখে তাকিয়ে আছে।

আমার মনে এই দৃশ্যটা এখনও ফ্রিজ হয়ে আছে।

'স—রি,' লম্বা করে টেনে মেয়েটি বলল।

মোমবাতির আলোয় যে-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি মানানসই এ-মেয়েটি সেরকম সুন্দর। ওর মোলায়েম মুখ, সরু চোখ, ধনুকের মতো ভুরু, ছোট অথচ পুরু ঠোঁট, কপালের ওপরে নেমে আসা চুলের ঝালর—সব মিলিয়ে এক প্রশান্ত সৌন্দর্য। যেন সন্ধে নেমে আসা ছায়া-মাখা আলোয় দেখা দিঘির জল। যার কাছে সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্ছলতা হেরে যায়।

একজন বেয়ারা আমার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে কাচের টুকরোগুলো একটা ট্রে-তে তুলে নিচ্ছিল। আশপাশের দু-একজন ছোট-ছোট কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যে সুবীর কোথা থেকে যেন ছুটে এসে আমার কাছে হাজির হয়ে গেছে।

ব্যাপারগুলো আমার চোখে পড়ছিল কিন্তু মাথার ভেতরে ঢুকছিল না। কারণ, মাথার ভেতরটা চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকা মুখটাকে ঘিরেই ব্যস্ত ছিল।

সাদা টপ। সাদা প্যান্ট। কোমরে মেটালের বেল্ট। গলায় টকটকে লাল ঝকঝকে পাথরের মালা। কানে ছোট-ছোট লাল পাথর।

স্টানিং বিউটি ওকে বলা যায় কি না জানি না, কিন্তু আমি স্টানড হয়ে গেলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও আমার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াল। আবার টেনে-টেনে বলল, 'বাবা বললাম তো—স—রি...।'

এবারে সুবীর পরিস্থিতির দায়িত্ব নিল। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আমি তখন জামা-প্যান্টে চলকে পড়া তরল রুমাল দিয়ে মুছে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

ওর নাম সোনি। সুবীরের কোম্পানির ভিপি-র মেয়ে। ফিন্যান্স নিয়ে এম. বি. এ. করলেও সায়েন্সে প্রচুর ইন্টারেস্ট।

আমার কাঁধে হাত রেখে সুবীর বলল, 'সোনি, আই প্রেজেন্ট টু ইউ মাই হার্ট-টু-হার্ট ফ্রেন্ড—দ্য গ্রেট ইনভেন্টর—দেবদত্ত রায়চৌধুরী।'

'হোয়াট আ ইউনিক নেম। কমপোজড অফ ফোর সারনেমস! এরকম আমি কখনও শুনিনি—চার-চারটে পদবি দিয়ে তৈরি একটা নাম: দেব, দত্ত, রায়, চৌধুরী। তার ওপর আবার ইনভেন্টর! গ্রেট। বলুন, কী-কী ইনভেন্ট করেছেন আপনি?'

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। কোনও জবাব দিতে পারলাম না।

মিউজিক বাজছিল। কিন্তু সোনি অনেকক্ষণ নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর কী যে হল! হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমরা দুজনে হলঘরের এককোণে একটা লম্বা সোফায় বসে আড্ডা মারছি। আমার নাকে ওর পারফিউমের গন্ধ আসছে।

'বলুন, আপনি কী-কী ইনভেন্ট করেছেন?' পুরোনো প্রশ্নটা আবার করল সোনি, 'সুবীরদা বলল, আপনি নাকি একজন গ্রেট ইনভেন্টর।'

আমি এখন অনেকটা নরমাল হয়েছি। তাই হেসে বললাম, 'আমার লেটেস্ট ইনভেনশানটা দারুণ।'

'কী?' ওর চোখে আগ্রহ।

'আপনি। অবশ্য ব্যাকরণ মানতে গেলে "ডিসকাভারি" বলা উচিত।'

এ-কথায় সোনি হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাসি থামলে বলল, 'ব্যাকরণ আপনি মানেন নাকি?'

'আগে মানতাম—এখন আর মানি না।'

'আমিও তাই—।'

'জানেন, ভীষণ মনখারাপ লাগছিল বলে সুবীর আমাকে জোর করে এই পার্টিতে নিয়ে এসেছে। এখন দেখছি এসে ভালোই হয়েছে—মনখারাপটা আর নেই।'

'দ্যাটস গুড। এবারে আপনার সত্যিকারের ইনভেনশানের কথা বলুন। ইনভেনশান ব্যাপারটাই খুব ইন্টারেস্টিং।'

আমি ওর আগ্রহ দেখে খুশি হলাম। ওকে আমার কয়েকটা ইমপরট্যান্ট আবিষ্কারের কথা বললাম। যেমন, রুমাল কেচে শুকিয়ে ভাঁজ করার যন্ত্র, ট্রান্সপারেন্ট শিট দিয়ে তৈরি ফ্রিজ, আলট্রাসনিক শোনার স্পেশাল অডিয়ো কনভার্টার, খুব সংক্ষেপে কোনও ছোট মাপের জিনিসের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বের করার মেশিন—এইরকম অনেক কিছু। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই টাইম মেশিনের কথা বললাম না।

'আচ্ছা, সোনি, আপনি কি জানেন সারা জীবনে টমাস আলভা এডিসন মোট ক'টা আবিষ্কার করেছিলেন?'

'না—ক'টা?'

উনি তেরোশো পেটেন্ট নিয়েছিলেন। এডিসন মেনলো পার্কে থাকতেন। সবাই ওঁকে বলত "উইজার্ড অফ মেনলো পার্ক"...।'

'আপনি ক'টা পেটেন্ট নিয়েছেন?'

'ধুস—'তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'বলুন না—প্লিজ!'

'একুশটা।' কথাটা বলে মনে হল এ-প্রশ্ন জিনিয়া কখনও আমাকে করেনি। ওর ধারণা, বিজ্ঞান করাটা আমার ভান। আবিষ্কারের কথা বলাটা আমার হিডন ডিজায়ার সংক্রান্ত একটা ম্যানিয়া।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন সোনির সঙ্গে গল্পে আমি একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের দুজনের চিন্তাভাবনা একই ফ্রিকোয়েন্সিতে বাঁধা।

সোনির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে সুবীরকে বারবার কৃতজ্ঞতা জানালাম। এবং একটা বিচিত্র ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে এলাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে ছাদে চলে গেলাম। অন্ধকার রাত, বাঁকা চাঁদ, এবং তারা আমাকে স্বাগত জানাল। একইসঙ্গে বাতাসের ঝাপটা আমাকে ছুঁয়ে গেল।

সোনিকে ফোন করলাম।

ওর সঙ্গে আলাপ গভীর হওয়ার সেটাই শুরু।

মিথ্যে কথা বলব না, সোনির প্রতি আমার একটা টান তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। সোনি যে রূপসি সেটা এই টানের মেজর কারণ নয়। আসল কারণটা হল, আমার কাজকে ও ভীষণ রেসপেক্ট দিচ্ছিল। একজন ইনভেন্টর হিসেবে এরকম আন্তরিক অ্যাপ্রিসিয়েশান আর রেসপেক্ট আমি কখনও পাইনি। আমার নানান আবিষ্কার নিয়ে ওর কত যে কৌতূহল আর প্রশ্ন!

সোনি আমাকে ফোন করত। আমিও করতাম। প্রথম-প্রথম সময়ে—তারপর অসময়ে। প্রায় মাসখানেক ধরে এরকম চলল। ও আমার ল্যাব দেখার জন্যে প্রায় রোজই বলত, কিন্তু আমি নতুন সমস্যা তৈরির ভয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতাম। ফোনেই টেকনোলজি আর ইনভেনশান নিয়ে প্রচুর কথা বললাম।

এই অতিরিক্ত ফোনের ব্যাপারটা জিনিয়ার নজর এড়ায়নি। কিন্তু ওর সরু চোখে সন্দেহের কাজল যে ধীরে-ধীরে আঁকা হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল।

আমি মোবাইল হাতে কখনও ছাদে গেলে একটু পরে জিনিয়াও টবের গাছগুলো দেখাশোনার ছুতোয় সেখানে চলে আসে। কিংবা আমার ল্যাবে—যেখানে ও বলতে গেলে

কখনও পদার্পণ করে না—সেখানেও কোনও-না-কোনও অজুহাতে চলে আসে। কখনও ওর কোলে আদরের মিন্টি, আবার কখনও-বা একা।

ব্যাপারটা প্রায় গোয়েন্দাগিরির লেভেলে গিয়ে দাঁড়াল। যেন কোনও ডিটেকটিভ মরিয়া হয়ে একটা কংক্রিট এভিডেন্সের খোঁজ করে চলেছে। সেটা হাতে পেলেই...!

বেশ বুঝতে পারছিলাম, জিনিয়ার মধ্যে দ্রৌপদী সিনড্রোম আবার মাথাচাড়া দিয়েছে।

জানি, কমবেশি সন্দেহবাতিকে ভোগা স্ত্রী-ধর্ম, কিন্তু জিনিয়ার বাতিকটা এবার বোধহয় অসুখের দিকে টার্ন নিচ্ছিল। আর তাতে আমার পড়াশোনা, নতুন-নতুন চিন্তা, আর যন্ত্রপাতি নিয়ে রোজকার কাজকর্ম ভীষণ ডিসটার্বড হতে লাগল।

সবমিলিয়ে সে এক অসহ্য পরিস্থিতি। আমার গবেষণা আর ইনভেনশান প্রায় লাটে ওঠার জোগাড়।

এরকম একটা অবস্থায় একদিন হঠাৎ মনে হল, সোনিকে বাড়িতে ডেকে জিনিয়ার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করিয়ে দিলে কেমন হয়! এতে জিনিয়া হয়তো খানিকটা নরমাল হতে পারবে। আর সোনিও আমার ল্যাব দেখার সুযোগ পাবে। ল্যাব দেখে যে ও কী খুশি হবে সেটা কল্পনা করে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল।

আর দেরি করলাম না। সোনিকে একদিন বাড়িতে আসতে বললাম।

সোনির ব্যাপারে জিনিয়াকে আগেই সব বলে রেখেছিলাম। মিথ্যে করে বলেছিলাম, ও আমার বন্ধু সুবীরের কাজিন। এবং সুবীরকেও সোনির সঙ্গে আসার জন্যে বারবার করে বলেছিলাম।

'তুই যদি আমার সুইসাইড ঠেকাতে চাস তা হলে সোনির সঙ্গে অবশ্যই আসবি। প্লিজ! আর মনে রাখবি সোনি তোর কাজিন—।'

উত্তরে সুবীর একটা নোংরা ঠাট্টা করে কথা দিয়েছিল, আসবে।

ওরা হল। জিনিয়ার সঙ্গে ওদের আলাপ-পরিচয় হল। জিনিয়া বেশ হাসিমুখে ওদের আপ্যায়ন করল।

খানিকক্ষণ আড্ডার পর ওদের ল্যাব দেখাতে নিয়ে গেলাম। জিনিয়া আসতে চাইছিল না, কিন্তু আমি জোরাজুরি করে ওকেও ডেকে নিলাম। গিনিপিগও ওর পেছন-পেছন গ্যারাজে চলে এল। 'গিনিপিগ' নামে বেড়ালটার পরিচয় করিয়ে দিতেই সোনি আর সুবীরের কী হাসি!

সুবীর বলল, 'ইনভেনশানের ইতিহাসে গিনিপিগ অমর হয়ে গেল।'

সোনি বলল, ' "গিনিপিগ"—কী কিউট নেম!'

জিনিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওর কথা ছাড়ুন তো! এই মেনিটার আমি নাম দিয়েছি "মিন্টি"।' তারপর বেড়ালটাকে 'মিন্টি! মিন্টি!' বলে আদুরে গলায় ডেকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে হতভাগা বেড়ালটা মেঝে থেকে একলাফে জিনিয়ার কোলে চড়ে বসল। 'মিঁউ-মিঁউ' করতে লাগল।

নেহাত আমার এক্সপেরিমেন্টে প্রায়ই মালটাকে কাজে লাগে তাই। নইলে এটাকে আমি লাথি মেরে বাড়িছাড়া করতাম। যখন তখন বাড়ির যেখানে সেখানে নোংরা করে!

গ্যারাজের এককোণে রয়েছে একসেট টেবিল-চেয়ার আর একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। এ ছাড়া বাকি স্পেসটা একেবারে ছন্নছাড়া। ছুরি, হাতুড়ি, স্ক্রু ড্রাইভার, সলডারিং আয়রন আর হাজাররকম যন্ত্রপাতি এখানে সেখানে ছড়ানো। সোনি আমার যন্ত্রগুলো দেখে 'গৌরী বালিকা' হয়ে গেল। ওর সেকী আনন্দ, সেকী খুশি!

ও প্রশ্নে-প্রশ্নে আমাকে পাগল করে তুলল। জিনিয়া সামনে থাকায় আমি মনের উচ্ছ্বল আবেগ চেপে বিজ্ঞানীর গাম্ভীর্য বজায় রেখে ছোট-ছোট জবাব দিতে লাগলাম। কোথা দিয়ে সময় গড়িয়ে গেল টেরই পেলাম না।

সুবীর আর সোনি যখন চলে গেল তখন রাত দশটা। সন্ধেটা কী দারুণ কাটল ভেবে আমি তৃপ্তির নেশায় ডুবে গেলাম। অনেক রাতে সোনিকে ফোন করলাম।

আমার ফোন চলতে লাগল। সোনির আসা-যাওয়াও। আমার আবিষ্কার নিয়ে ওর এনথুর দেখলাম শেষ নেই। ওর কাছে আমার গ্যাজেটগুলোর মেকানিজম এক্সপ্লেইন করতে-করতে আমি ক্লান্ত হতাম না। কোথা থেকে যেন অফুরান এনার্জি আমার শরীর আর মনে ঢুকে পড়ত।

সোনি আমার ল্যাবের সব যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে-দেখতে প্রায়ই বলত, 'ইনভেন্টর, ইউ আর আ জিনিয়াস!'

ওর 'ইনভেন্টর' সম্বোধনে আমি খুশি হতাম। জিনিয়াস বলাতেও। কিন্তু 'জিনিয়াস'-এর মধ্যে 'জিনিয়া' অংশটুকু আমার মনে কাঁটার মতো খচখচ করত।

সোনি আর সুবীরকে আমার সব মেশিন দেখালেও টাইম মেশিনটা দেখাইনি। আর বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন সাকার হয়ে গেলে তারপর হয়তো দেখাব। আর মেশিনটা দেখিয়ে জিনিয়াকে বহু আগেই বলে দিয়েছি, এই উদ্ভট বেআক্কেলে যন্ত্রটা চিরকালের জন্যে অকেজো হয়ে গেছে।

সোনির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ধরনটা জিনিয়া ঠিক বুঝতে পারেনি। আমার বিজ্ঞান নিয়ে ওর অ্যাপ্যাথি যেমন অবিচল, তেমনই সোনির ব্যাপারটা ও সবসময় দ্রৌপদী সিনড্রোমের আলোকে বিশ্লেষণ করতে লাগল। ওর নৃত্যকলা আর নৃত্যনাট্য চর্চার ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে ও হুল ফুটিয়েই চলল।

এক-একসময় ব্যাপারটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠত। তখন সেই পুরোনো বাজে চিন্তাটা মাথায় ধাক্কা মারত।

একদিন ঝোঁকের মাথায় ঠিক করেই ফেললাম, একটা খুন করব। এটা হবে আমার মার্ডার সিরিজের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট।

আমি বেচারা সতুকে বেছে নিলাম। না, খুন করার জন্যে নয়। মানে, ওর বাড়িতে টার্গেট করলাম।

এর প্রথম কারণ, ওর সোদপুরের বাড়িতে আমি দু-চারবার গেছি।। ওর বোনের বিয়েতেও গিয়েছিলাম। সুতরাং বাড়িটার জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান আমার জানা।

আর দ্বিতীয় কারণ, ও একটা টিয়াপাখি পোষে। ওই পাখিটাই হবে আমার প্রথম টার্গেট। ভিকটিম নাম্বার ওয়ান। কিন্তু পাখিটাকে খুন করতে পারব তো? উঁহু, কিন্তু-কিন্তু করলে চলবে না। আমাকে পারতেই হবে।

আমার ইদানিংকার অ্যাক্টিভিটি সতু আর তারকের চোখে খুব একটা যে ভালো ঠেকছিল না সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম। দোকানে ঠিকমতো যাই না। মালপত্র পারচেজের ব্যাপারে গাফিলতি। এমনকী পাওনা টাকা তাগাদার ব্যাপারেও আগের মতো উৎসাহ দেখাই না।

কিন্তু আমি ওদের অবাক চোখকে আমল দিইনি।

আমি সতুর সঙ্গে দু-দিন ধরে গল্প জুড়ে দিলাম। দোকানে বসে তেলেভাজা-মুড়ি বা অন্য কিছু আনিয়ে আমি, সতু আর তারক সান্ধ্য টিফিন সারি আর গল্প করি। কখনও-কখনও মাটন রোল-টোলও আনাই।

গল্প করে-করে সতুর বাড়ির টোপোলজিটা ভালো করে ঝালিয়ে নিলাম। জেনে নিলাম, টিয়াপাখিটা কখন একা থাকে, রাতে খাঁচাটা কোথায় রাখা হয়, বেড়ালের ভয় আছে কি না, সদর দরজা রাতে কীভাবে বন্ধ করা থাকে, ভেতর থেকে তালা দেওয়া থাকে কি না ইত্যাদি।

এইরকম খোঁজখবর করে টিয়াপাখির ইনফরমেশান ফাইল কমপ্লিট হওয়ার পর কাজে নামলাম।

একটা ছোট তোয়ালে আর টর্চলাইট সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন রাতে দশমিনিটের জন্যে ভবিষ্যতে উধাও হলাম। সোজা গিয়ে হাজির হলাম সতুর বাড়ির উঠোনে।

খাঁচাটা উঁচুতে একটা হুকে ঝুলছিল। তার ওপরে একটা পুরোনো শাড়ি ঢাকা দেওয়া। আমি শাড়িটা সাবধানে সরালাম। তারপর বাঁ-হাতে টর্চ জ্বেলে তোয়ালেসমেত ডানহাতটা খাঁচার ভেতরে ঢোকালাম।

হঠাৎ আলোয় টিয়াপাখিটার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। আমি ওটাকে তোয়ালেসমেত সাপটে বাইরে বের করলাম।

পাখিটা একবার চাপা চিৎকার করে উঠল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কেউ যদি জেগে ওঠে!

একটা টিয়াপাখি খুন করতে এসে যে এত ভয় করতে পারে সেটা আগে বুঝিনি। আমার হাত কাঁপতে লাগল, বুকের ভেতরে ধড়াস-ধড়াস শব্দ, কান ভোঁ-ভোঁ করছে। সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। যা করার জলদি করতে হবে। দশমিনিট শেষ হতে এখনও অনেক দেরি।

আমি আর দাঁড়ালাম না। সদর দরজার খিল-ছিটকিনি খুলে চট করে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। তোয়ালের ওপর দিয়েই পাখিটার গলা টিপে ধরলাম। কয়েক সেকেন্ডেই ওটার ছটফটানি শেষ। তোয়ালেসমেত পাখিটা রাস্তায় ফেলে দিলাম।

আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে এতটা হিংস্রতা লুকিয়ে ছিল আগে বুঝিনি। নিরীহ অবোলা জীবটাকে কী সহজেই না আমি নিকেশ করে দিলাম!

পথের একটা নেড়ি কুকুর আমাকে দেখতে পেয়ে ঘেউঘেউ করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার দশমিনিটের কোটাও শেষ হল। হুউস।

গ্যারাজের বদলে আমি বাড়ির ছাদে এসে ল্যান্ড করলাম।

সর্বনাশ করেছে! ছাদের দরজা তো বাড়ির ভেতর থেকে বন্ধ করা থাকে! তা ছাড়া বাড়তি সুরক্ষার জন্যে যে-কোলাপসিবল গেট আছে সেটাতেও তালা।

অগত্যা ছাদেই শুয়ে পড়লাম। সকালে জিনিয়ার সঙ্গে একপ্রস্থ লড়াইয়ের জন্যে মনে-মনে তৈরি হলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! লড়াইটাকে এমনভাবে এড়িয়ে যেতে পারলাম যে, আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।

সকালে ধাক্কাধাক্কি করে বাড়ি মাথায় করতেই জিনিয়া ঘুম-চোখে এসে দরজা খুলল। ওকে বললাম যে, রাতে টাইম মেশিন দিয়ে উলটোপালটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েই আমার এই দুর্দশা। মেশিনটা সবসময় গন্ডগোল করছে।

ও ঠান্ডা গলায় বলল, 'মেশিনের আর দোষ কী! যেমন ইনভেন্টর, তেমনই ইনভেনশান।'

আমার সামনে অনেক বড় প্ল্যান। তাই খোঁচটা হজম করে গজগজ করে আপনমনেই মন্তব্য করলাম, 'যদি আর একমাসের মধ্যে একে ঠিকঠাক করে তৈরি করতে না পারি তা হলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মডেলটাকে ডেসট্রয় করে ফেলব।'

'বাঁচা যাবে।' বলে জিনিয়া সিঁড়ি নামতে শুরু করল।

আমি তখন প্রথম খুনের সাফল্যে ভেতরে-ভেতরে টগবগ করে ফুটছি।

সতু পরদিন আমাকে টিয়াপাখি হত্যার করুণ কাহিনি শোনাল। বলল, বাড়ির কোনও জিনিস চুরি যায়নি—শুধু পাখিটাকে গলা টিপে মেরে বাইরের রাস্তায় কে যেন ফেলে দিয়ে গেছে। পাখিটার পাশে একটা বাদামি রঙের নতুন তোয়ালে পাওয়া গেছে।

'খুনি' কী করে বাড়িতে ঢুকল সেটা কারও মাথায় ঢুকছে না। আর কেনই-বা বেচারি পাখিটাকে গলা টিপে মারল সেটাও এক রহস্য।

আমি সতুর কাহিনি শুনছিলাম আর মনে-মনে ফুলছিলাম। ইগো বুস্ট বোধহয় একেই বলে! ক্ষমতায় নিজেকে ভগবানের কাছাকাছি মনে হচ্ছিল। আমার প্রথম মার্ডার সাকসেসফুল।

ঠিক করলাম, সিরিজের দ্বিতীয় খুনটা দিন-সাতেক পরে করব। তবে এবারে আর পাখি-টাখি নয়— বরং চারপেয়ে কিছু। আসলে একটু-একটু করে এগোনো দরকার। তারপর...।

সোনি আমাকে এক রবিবার সন্ধেবেলা ফোন করল।

'হাই, ইনভেন্টর! কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'ফাইন। এখন কী করছেন?'

আমি বেডরুমে বিছানায় বসে খবরের কাগজের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পাতাটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ছিলাম। আমার আবিষ্কারগুলোর কথা যেদিন সবাইকে অফিশিয়ালি জানাব সেদিন এই পৃষ্ঠাতেই আমার ফটোগ্রাফ থাকবে, নিউজ থাকবে। টিভির নানান চ্যানেলে আমার ইন্টারভিউর লাইভ টেলিকাস্ট হবে।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সোনি প্রশ্নটা আবার করতেই ঘোর কাটল। বললাম যে, আমি খবরের কাগজ পড়ছি।

‘বলুন না, নতুন কী ইনভেন্ট করছেন—মানে, কী নিয়ে এখন রিসার্চ করছেন।’

‘একটা ইনসেক্ট রোবট তৈরি করার চেষ্টা করছি—যেটা সাইজে সাবান-টাবানের মতো হবে, আর টুকিটাকি জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে। যেমন, বোতলের ছিপি, খুচরো পয়সা, পেনের ক্যাপ বা কাগজের টুকরো—মেঝেতে পড়ে এসব জিনিস উড়ে গেলে বা ছিটকে গেলে মেশিনটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। মানে, মেঝেতে জিনিসটা প্রথম যেখানে পড়ছে সেই ইমপ্যাক্ট পয়েন্টে জিনিসটাকে পৌঁছে দেবে।’

‘ওঃ, গ্রেট! খুশিতে ফেটে পড়ল সোনি: ‘এই রোবটটা দারুণ কাজের জিনিস হবে।’

‘আপনি এখন কী করছেন?’

‘কী আর করব, ফিস্ক্যাল পলিসি নিয়ে স্টাডি করছি। এত বোরিং টপিক—ভাবা যায় না।’

‘বোর হয়ে গেলে অন্য কোনও বই পড়ুন—ল্যাপটপ খুলুন, নয়তো টিভি দেখুন—।’

‘দুর! ওসব ভাল্লাগে না। আপনাকে আমার হিংসে হয়।’

‘কেন?’

‘আপনার কাজটা কী ইন্টারেস্টিং। আমাকে আপনার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিন না।’

সোনি হালকাভাবে কথাটা বললেও আমার বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল। জিনিয়া।

তখনই মনে পড়ে গেল, পাশের ঘরে—মানে ড্রইং-ডাইনিং-এ—জিনিয়ার রিহার্সাল চলছে। চারটে ছেলেমেয়ে এসেছে। সামনের মাসে কী একটা যেন জয়ন্তী টাইপের আছে। তার জন্যে প্রবল প্র্যাকটিস চলছে।

‘এসব কথা মুখেও আনবেন না, সোনি। আপনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হলে আমার বাড়িতে আগুন জ্বলে যাবে। আপনাকে তো আগেই বলেছি—জিনিয়া-ম্যানিয়া…।’

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সোনি। তারপর বেশ সিরিয়াস গলায় বলে উঠল, ‘আগুনে একটা হাত-টাত দিতে শিখুন। আপনি তো আর ছোট নেই।’

তারপরই ‘রাখছি’ বলে ফোন কেটে দিল।

এটা কী কথা বলল সোনি?

‘আগুনে একটু হাত-টাত দিতে শিখুন। আপনি তো আর ছোট নেই।’

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এভাবে কখনও আমি ভাবিনি। সোনি আমার খুব ভালো বন্ধু। আমার আবিষ্কারের জেনুইন অ্যাডমায়ারার। ওর সঙ্গে কথা বলে আমি কাজে নতুন উৎসাহ পাই। ও যেভাবে বলে ‘দেখবেন, আপনি একদিন ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাবেন—’ সেটা সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। তার সঙ্গে সোনি অবশ্য এও বলে, ‘সেদিন আমাকে ভুলে যাবেন না তো?’

তাই তো ওকে টাইম মেশিনটার কথা এখনও বলিনি! শুনলে ওর একেবারে তাক লেগে যাবে। দুনিয়ার লোককে বলে বেড়াবে।

হঠাৎ জিনিয়া এসে ঘরে ঢুকল। বোধহয় কংক্রিট এভিডেন্সের খোঁজে।

‘কী ব্যাপার? আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই ফোন কেটে দিলে?’

আমি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। মাথাটা কেমন ফাঁকা লাগছিল। জিনিয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

‘চমৎকার অভিনয় করতে পারো তো!’ জিনিয়া নাচের বিভঙ্গে একটা হাতের ভর কোমরের নীচে রাখল: ‘আমি ও-ঘরে রিহার্সাল করছি আর তুমিও বেডরুমে বসে রিহার্সাল চালিয়ে যাচ্ছ…?’

আমি জিনিয়ার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়েই রইলাম। পাশের ঘর থেকে টেপরেকর্ডারের মিউজিক ভেসে আসছিল। আর সেই তালে-তালে আমি তিননম্বর মার্ডারটার কথা ভেবে চললাম। কবে, কখন, কী কায়দায় ফাইনাল মার্ডারটা এক্সিকিউট করব সেসবের মেজর পয়েন্টস হাতড়ে চললাম।

সোনি ঠিকই বলেছে। এবারে আগুনে সত্যি-সত্যি হাত দেব। আমি আর ছোট নেই।

‘…আর রিহার্সাল দিয়ে কী হবে? বহুদিন তো রিহার্সাল হল—এবার আসল কাজে নেমে পড়ো। তুমি তো জানো না…।’

জিনিয়া কথা বলেই যাচ্ছিল—তবে গলার স্বর তোলেনি। চাপা, হিসহিসে। কারণ, পাশের ঘরে ওর নৃত্য-ছাত্ররা রয়েছে।

আমি উদাসীন সাধুর চোখে ওকে দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য! কী সহজেই না ও নিজের শেষ সুনিশ্চিত করছে!

যখন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন আমার মনে আর কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

নেক্সট স্টেপ, মার্ডার নাম্বার টু। সেকেন্ড রিহার্সাল। তারপর ফাইনাল স্টেপ, মার্ডার থ্রি। পারফেক্ট মার্ডার। ব্যস। নৃত্যনাট্যের যবনিকা।

দ্বিতীয় মার্ডারের ভিকটিম হিসেবে আমি একটা লোমওয়ালা পোষা কুকুরকে বেছে নিলাম। প্রথমে পাখি। তারপর কুকুর। তারপর…।

আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা তিনতলা বড় বাড়ি আছে। বাড়ির নীচে একটা বড় মাপের ওষুধের দোকান। দোকানটার নাম ‘মেডিকো’। বাড়ি এবং দোকানের মালিক একই লোক। ভদ্রলোকের চেহারা বেশ ফুলবাবুর মতো। মাথায় বাবরি চুল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, শৌখিন গোঁফ, কানে আতর মাখানো তুলো গোঁজা, পরনে সবসময় ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি।

এই বাবুটির একটি শখের কুকুর আছে। গায়ে বড়-বড় সাদা লোম, ঝিরকুটে চেহারা। সবসময়েই এদিক ওদিক চঞ্চলভাবে ঘুরঘুর করছে আর গন্ধ শুঁকছে।

আমি বাড়িটার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলাম। শুনলাম, রাতে কুকুরটা ছাড়া থাকে। ডবল তালা দেওয়া কোলাপসিবল গেটের ওপিঠের চৌকো চাতালে ওটা সারারাত পায়চারি করে।

প্ল্যান ছকে নিতে কোনও অসুবিধে হল না।

বড়বাজারে গিয়ে একটা ছ’ইঞ্চি ফলার ছুরি কিনলাম। তারপর দোকান থেকে শিককাবাব কিনে তাতে র‍্যাটকিলার আর ঘুমের ওষুধ গুঁড়ো করে বেশ ভালো করে মাখিয়ে দিলাম। এবং রাত ঠিক একটার সময়ে টাইম মেশিনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রওনা হলাম।

আমি ভবিষ্যতে পাড়ি দিলাম মাত্র কুড়ি সেকেন্ডের জন্যে। আর সেফটি ফ্যাক্টর বাড়ানোর জন্যে হালকা ছদ্মবেশ নিলাম। একটা পাওয়ার ছাড়া রেডিমেড চশমা কিনে এনেছিলাম। সেটা চোখে দিলাম। আর মাথায় পাগড়ির ধাঁচে একটা লাল গামছা জড়িয়ে নিলাম।

ছোট মাপের কুকুরগুলো লোক দেখলেই কেঁউকেঁউ করে চেঁচায়। তাই কুড়ি সেকেন্ডের বেশি সময় আমি কুকুরটার সামনে থাকতে চাইনি।

আমি অন্ধকারে চাতালে আচমকা হাজির হতেই কুকুরটা হকচকিয়ে গেল। তারপরই একটা ছোট্ট চিৎকার করল। সঙ্গে-সঙ্গে শিককাবাবের টুকরোগুলো সাদা প্রাণীটার সামনে ছড়িয়ে দিলাম। ওটা গন্ধ শুঁকতে মুখ নীচু করল। একটুকরো মাংস কপ করে মুখে তুলে চিমোতে শুরু করল।

আর দেরি করলাম না। আমার মধ্যে একটা কসাই জেগে উঠল। চোখের পলকে কুকুরটার গলায় ছুরি ঢুকিয়ে দিলাম। বাঁ-হাতে ওটার নরম শরীর চেপে ধরলাম মেঝেতে। ছুরিটা টেনে বের করে বসিয়ে দিলাম আবার। আর-একবার।

ছোট্ট একটা আর্তনাদ। রক্ত। সব শেষ।

বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা আলো জ্বলে উঠল।

ততক্ষণে আমার কুড়ি সেকেন্ডও শেষ। হুউস।

গ্যারাজে ফিরে দেখলাম আমার মাথায় গামছাটা নেই। কখন যেন খসে পড়ে গেছে। আর আমার জামা-প্যান্টে বেশ খানিকটা রক্তের ছিটে।

আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম, হাঁপাচ্ছিলাম।

চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেললাম। একতলার গেস্ট রুমে ঢুকে রক্তের ছিটে লাগা জামা-প্যান্ট ছেড়ে ফেললাম। তারপর বাথরুমে স্নান করতে ঢুকলাম। কালো চশমা আর জামা-প্যান্ট দুটোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে। আগের বারের শার্ট পোড়ানোর মতো বোকামি আর আমি করছি না।

ফেলে আসা গামছাটা নিয়ে আমার একটু দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম।

দ্বিতীয় 'খুন'টার পর বেশ টের পেলাম আমার ইগো আর কনফিডেন্স, দুটোই অনেক বেড়ে গেছে। আমি যেন এক নতুন 'আমি'। কী সহজেই না আমি টিয়াপাখিটাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি! তুলতুলে কুকুরটার গলায় নৃশংসভাবে ছুরি বসানোর সময়েও আমি কী অদ্ভুতভাবে মাথা ঠান্ডা রেখেছিলাম। তা হলে কি আমার ভেতরে একটা ঠান্ডা খুনি ঘুম থেকে ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে?

নতুন করে আবার মনে হল, আমি ভগবানের কাছাকাছি। এবং সেই হাই লেভেল থেকে আমি রোজ জিনিয়াকে লক্ষ করে চললাম। ওর হাঁটা-চলা, কথা বলা, নাচের রিহার্সাল, বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে আসার ভঙ্গি—সবই এক অদ্ভুত তৃষ্ণা নিয়ে দেখতে লাগলাম। যেন এই শেষবারের মতো দেখছি।

সত্যিই তো তাই! ক'দিন পরই তো এগুলো আর দেখতে পাব না!

সোনিকে নিয়েও আমি নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে টাইম মেশিনটার কথা বলি। এও ইচ্ছে হচ্ছিল, মাঝরাতে মেশিনে চড়ে ওর বেডরুমে হাজির হয়ে ওকে চমকে দিই। তারপর...।

নাঃ, ওসব বাজে চিন্তা থাক—কাজের চিন্তা করি। মার্ডার নাম্বার থ্রি। দ্য পারফেক্ট মার্ডার।

তিনদিন চিন্তার পর দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললাম। সুবীরকে বললাম, আমি একটা পার্টি থ্রো করতে চাই। কিন্তু আমি যে পার্টি দিচ্ছি সেটা জিনিয়ার কাছে সিক্রেট রাখতে হবে—কারণ, ও এসব পছন্দ করে না।

পার্টি দেওয়ার কারণ একটা দেখাতে হয়। তাই সুবীরকে বললাম যে, লাস্ট দু-মাসে আমার ব্যবসায় যাচ্ছেতাইরকমের 'মেগা' প্রফিট হয়েছে। আর সোনির সঙ্গে পার্টিতে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়াটা একটা দারুণ ব্যাপার।

উত্তরে সুবীর আমাকে চোখ মারল, ভেংচে বলল, 'হুঁ—দারুণ ব্যাপার!'

আমি ওর ঠাট্টাটা গায়ে মাখলাম না।

আমারই প্ল্যানমতো সুবীর আমাদের পাড়া থেকে বহুদূরে—সন্তোষপুরে—ওর এক বড়লোক কোলিগের ফ্ল্যাট সাজেস্ট করল। বলল, 'শেয়ারে রিসক নিয়ে শালা প্রচুর টাকা করেছে। প্রায় তিনহাজার স্কোয়ার ফুটের নতুন এই ফ্ল্যাটটা রিসেন্টলি কিনেছে। তুই ওখানে ফুটবল খেলতে পারবি...।'

সুবীরের সেই কোলিগের নাম তনুময়—ডাকনাম টনি। তো আমি, সুবীর আর টনি মিলে পার্টির সব ব্যবস্থা করতে লাগলাম। জনাপঁচিশ লোককে নেমন্তন্ন করলাম। তার মধ্যে সোনি অবশ্যই ছিল। ওর বাবা-মা-কেও আসতে বললাম। সুবীর আর টনিও ওদের ক্লোজ সার্কেলের ইমপরট্যান্ট বন্ধুদের নেমন্তন্ন করল।

পার্টির চার-পাঁচদিন আগে থেকেই আমি জিনিয়ার সঙ্গে প্রেমিকের মতো ব্যবহার শুরু করলাম। যাতে কেউ বুঝতে না পারে আমাদের সম্পর্কটা আর ঠিকঠাক নেই। কোথাও একটা চোরা ফাটল ধরেছে।

জিনিয়া মাঝে-মাঝে ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখত। কয়েকবার বলেও ফেলেছে, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো? সকাল-বিকেল এত মিষ্টি কথা! নিশ্চয় এর পেছনে কোনও মতলব রয়েছে।'

আমি হেসে বলেছি, 'মতলব আছে। তোমাকে বদলে দেওয়ার মতলব। পুরোনো দিনগুলো আবার ফিরে পেতে চাই আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে ও: 'সে কি কখনও হয়! দিন বদলায়, মানুষ বদলায়। সেটাই নিয়ম।'

ওরে বাবা! এ যে একেবারে ফিলজফারের ডায়ালগ! যাকগে, হাতে তো আর মাত্র ক'টা দিন!

মার্ডার নাম্বার থ্রি-র পারফেকশানের কথা ভেবে আমি আরও একটা কাজ করেছিলাম। হুবহু একইরকম দেখতে দুটো জামা আর দুটো প্যান্ট কিনেছিলাম। দু-সেটই আমার জন্যে— তবে একটা সেটের সাইজ একটু ছোট, আর-একটা একটু বড়।

ঘটনার দিন জিনিয়াকে বললাম যে, আমার একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন আছে—অনেক দূরে, এক্সট্রিম সাউথে। সুবীরের এক বন্ধুর বাড়িতে। ফিরতে রাত হবে।

জিনিয়ার চোখে সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠবে জানতাম। তাই উঠল।

আমি হেসে বললাম, 'যখন খুশি আমাকে ফোন কোরো। যতবার খুশি। আমিও তোমাকে ফোন করব।'

জিনিয়া অবাক হল। খুশিও হল।

ও তো আর জানে না, এই ফোন করার ব্যাপারটাও আমার অ্যালিবাই এস্টাবলিশ করার একটা প্ল্যান!

জিনিয়াকে খুন করার জন্যে আমি এমন একটা দিন বেছে নিয়েছিলাম যেদিন ওর কোনও নাচের রিহার্সাল থাকে না। কারণটা খুবই সহজ। আমি খুনের কোনও সাক্ষী চাই না। খুনের যদি কোনও আই উইটনেস থাকে তা হলে টাইম মেশিনের বাবাও আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

আসল দিনটা দেখতে-দেখতে এসে গেল।

সকালবেলা আমি জিনিয়ার চোখ এড়িয়ে একটা হাতুড়ি আমাদের মাস্টার বেডরুমে তোশকের নীচে লুকিয়ে রাখলাম।

বিকেল হতে-না-হতেই টাইম মেশিনটাকে বাক্সে ঢুকিয়ে ভালো করে প্যাক করলাম। তারপর নতুন কেনা ডবল জামা-প্যান্ট পরে প্যাক করা মেশিনটা নিয়ে ট্যাক্সি করে রওনা দিলাম।

টনির বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ফোনে সুবীরকে ধরলাম। শুনলাম, ও আর টনি খানাপিনার আয়োজন অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে।

টনির ফ্ল্যাট তিনতলায়। মেশিনটা সঙ্গে করে লিফটে তিনতলায় উঠলাম। তারপর ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আমার সামনেই টনি আর সুবীর।

প্যাক করা বাক্সটা দেখে ওরা খুব অবাক হল। একগাল হেসে বললাম যে, এর ভেতরে একটা হাই পাওয়ার জেনারেটার আছে। আমার লেটেস্ট ইনভেনশান। আজকের পার্টিতে এই যন্ত্রটার আবিষ্কার আমি অ্যানাউন্স করব।

টনির অনুমতি নিয়ে যন্ত্রটা আমি টয়লেটের কাছাকাছি একটা কোণে রাখলাম। বললাম, যন্ত্রটা এখানে থাক। ওটাকে মাঝে-মাঝে জল ঢালার দরকার হয়—ব্যাটারির মতো। সেরকম কেস হলে ওটা নিয়ে টয়লেটে ঢুকে পড়তে আমার সুবিধে হবে।

ওঃ, কত মিথ্যেই না বলতে হচ্ছে! একটা পারফেক্ট মার্ডারের ঝক্কি কি কম! লাস্ট দশদিন ধরে শুধু মনে-মনে হাজার একটা প্ল্যান ভেঁজে চলেছি। চলেছি আর চলেছি। অবশেষে...।

সুবীর হঠাৎ বলল, 'অ্যাই, তোর সেই টাইম মেশিনের খবর কী? কদ্দূর এগোলি?'

পলকে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। সামনে আয়না থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম মুখের সব রক্ত উধাও হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেন্ড মরিয়া চেষ্টার পর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল।

‘ওটা থিয়োরিতেই বস আটকে গেছি। মালটা এখনও তৈরি করতে পারিনি। তোর জেঠুর কাছে আমাকে আবার যেতে হবে।’

আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। একে খাপছাড়া বর্ষার গুমোট, তার ওপর ডবল জামা ডবল প্যান্ট। আমার হাঁটতে-চলতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছে।

দমবন্ধ করে আমি সময় কাটাতে লাগলাম। কখন সাতটা-আটটা বাজবে তার অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্যান্য গেস্ট তখন এসে পড়বে। বোতলের ছিপি খোলা হবে। পার্টির হইহই তখন তুঙ্গে উঠবে। আমার দিকে ততটা কেউ আর খেয়াল করবে না। সেই সুযোগে আমি...।

সময় গড়িয়ে সন্ধে হল। সন্ধে আরও গভীর হল। অতিথির ভিড়ে টনির ফ্ল্যাট একেবারে হাটবাজার হয়ে উঠল। সোনিও ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে এসে পড়েছে। সুবীর আমাকে ওদের কাছে নিয়ে গেল, পরিচয় করিয়ে দিল ‘গ্রেট ইনভেন্টর’ বলে। আর সোনি আমার নামে ওর বাবা-মায়ের কাছে এত প্রশংসা করতে লাগল যে, আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

সোনিকে দেখে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, যে-পথে আমি পা বাড়িয়েছি সেই পথটাই একমাত্র সঠিক পথ।

এর মধ্যে জিনিয়া আমাকে তিনবার ফোন করেছে। দু-পাঁচমিনিট করে কথা বলেছে। আমিও ওকে পালটা দুবার রিং করেছি। সুবীরের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছি। পার্টির নেশা ধরানো মিউজিক নিশ্চয় জিনিয়ার কানে গেছে। ও বুঝেছে, আমি ওকে পার্টির ব্যাপারটা মোটেই ব্লাফ দিইনি।

রাত ন’টার সময় জিনিয়াকে ওর মোবাইলে আবার ফোন করলাম।

‘কী করছ?’

‘হঠাৎ জানতে চাইছ?’

‘এমনি জানতে ইচ্ছে হল।’

‘শুয়ে আছি। ম্যাগাজিন পড়ছি।’

আমি জানি, জিনিয়া অনেক সময় বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নানান পত্রপত্রিকা পড়ে। তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা একসঙ্গে খেতে বসি।

আমি বললাম, ‘তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তুমি কোথায় সল্টলেকে নিজের বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে আয়েস করছ, আর আমি সন্তোষপুরে তনুময় বোসের ফ্ল্যাটে পার্টি করছি। বিলিভ মি, ভীষণ বোর লাগছে। এক্ষুনি তোমার কাছে চলে যেতে পারলে হত।’

হাসল জিনিয়া: ‘চলে এসো। অভিনয় যখন করছ ভালো করেই করো।’

‘অভিনয়?’ ঠাট্টা করে বললাম, ‘এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি। দেখাচ্ছি মজা।’

আমার ডায়লগগুলো আপনারা দয়া করে খেয়াল করবেন।

জিনিয়া খুন হলে পুলিশ অফিসাররা ওর মোবাইল ফোন নিয়ে পড়বে। ওর কল লিস্ট দেখবে। এমনকী কথাবার্তার রেকর্ডও শুনবে। তখন ওরা যাতে নিশ্চিত প্রমাণ পায় যে, খুন হওয়ার পাঁচ-সাত মিনিট আগেও আমার আর জিনিয়ার মধ্যে অন্তত বিশ কিলোমিটার

ফারাক ছিল, সেইজন্যেই আমার ওই কথাগুলো বলা। আর এ তো জানা কথা, ওয়াইফ মার্ডার হলে সমস্ত সন্দেহের তির আগে ছোটে বেচারা হাজব্যান্ডের দিকে।

আর দেরি করলাম না। ফ্ল্যাটের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম সবাই নাচে, গানে আর গ্লাসে মত্ত। আমার দিকে কারও নজর নেই। তাই টুক করে টাইম মেশিন হাতে টয়লেটে ঢুকে পড়লাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে।

কোথায় যেন প্লাগ পয়েন্টটা? ওই তো!

মেশিনটাকে তাড়াতাড়ি সেখানে নিয়ে গেলাম। সুইচ অন করলাম। প্ল্যাটফর্মটা পেতে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালাম।

আমার বুকের ভেতরে ডুগডুগি বাজছিল। দমবন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল।

মেশিনের ডায়াল সেট করলাম, কিবোর্ডে বোতাম ঠুকতে লাগলাম।

এত ঘামছি কেন কে জানে! আমার মার্ডার স্কিমে তো কোনও ফাঁকফোকর নেই! পারফেক্ট মার্ডার। পারফেক্ট।

এবার নব ঘোরালাম। 'এন্টার' বোতাম টিপলাম।

আমাকে দেখে জিনিয়া চমকে উঠল।

'হাই, জিনি!'

'তু-তুমি!' ম্যাগাজিনটা ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। ও ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল।

'হ্যাঁ, আমি।' হেসে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম: 'বললাম যে, এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি। দেখাচ্ছি মজা।'

'তুমি পার্টিতে যাওনি? সন্তোষপুরে?'

উত্তরে ঝুঁকে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কপালে একটা চুমু খেলাম। বললাম, 'আমার টাইম মেশিনের ব্যাপারটা গল্প নয়—সত্যি, জিনি। এই দ্যাখো—' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুপাশে দু-হাত ছড়িয়ে দিলাম: 'আমি—রিয়েল আমি। রক্ত-মাংসের দেবদত্ত রায়চৌধুরী —।'

বিছানার সেই জায়গাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তোশকের নীচে হাত ঢুকিয়ে হাতুড়িটা বের করলাম।

বেশ ভারী হাতুড়ি। মুন্ডুটা প্রায় পাঁচশো গ্রাম হবে। কারও মুন্ডু গুঁড়ো করার পক্ষে বেশ নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

জিনিয়া হাঁ করেছিল। বোধহয় চিৎকার করবে বলে। কিন্তু সেটা করে ওঠার আগেই আমি শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সাংঘাতিক মোমেন্টামে হাতুড়িটা ওর মাথায় নামিয়ে আনলাম।

কিন্তু রিফ্লেক্স যাবে কোথায়!

শেষ মুহূর্তে জিনিয়া মাথাটা ইঞ্চিচারেক সরাতে পেরেছিল। তাই আমি ব্রহ্মতালু তাক করলেও হাতুড়িটা শেষ পর্যন্ত ওর মাথার বাঁ-দিক ছুঁয়ে কান ঘেঁষে কাঁধে গিয়ে পড়ল।

ও বাঁ-দিকে কাত হয়ে গেল। 'দেবু, কী করছ, কী করছ!' বলে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। তারপরই আমাকে অবাক করে দিয়ে ঘরের দরজা লক্ষ্য করে ছুট লাগাল।

এটা আমার ছকের মধ্যে ছিল না। ও যে দৌড়ে পালাতে পারবে সেটা ভাবিনি।

আমি একমুহূর্তে হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই ওকে পাগলের মতো তাড়া করলাম। ডবল জামা-প্যান্টের জন্যে ছুটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড গোঁ আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার ভেতরের ঠান্ডা খুনিটা আবার জেগে উঠেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে ও ড্রইং-ডাইনিং-এর দিকে দৌড়তে শুরু করেছিল। তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা চিৎকারও শুরু করেছিল।

কিন্তু আমি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় হাত বাড়িয়ে ওর ঘাড়ের গোড়ায় হাতুড়ি বসিয়ে দিলাম। ছুটন্ত জিনিয়া এবং চিৎকার—দুটোকেই মাঝপথে থামিয়ে দিলাম।

'আঁক' শব্দ করে জিনিয়া মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

জিনিয়া উপুড় হয়ে পড়েছিল। ওকে আর চিত হওয়ার সুযোগ দিলাম না। চট করে ওর পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম। হাতুড়ি দিয়ে এলোপাথাড়ি কাজ করে চললাম। ওর নাচ, সন্দেহ, দ্রৌপদী সিনড্রোম, ফিগার—সব একসঙ্গে থেঁতো হয়ে যাচ্ছিল।

আমার ভেতরে বোধহয় একটা জন্তু ঢুকে পড়েছিল। কারণ, বেশ টের পাচ্ছিলাম, অন্ধ আক্রোশ, রাগ, ঘৃণা, হিংসা—সব আমার মাথার ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল। আমি ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছিলাম। জিনিয়াকে কখনও মনে হচ্ছিল টিয়াপাখি, কখনও-বা তুলতুলে কুকুর।

কিন্তু একই সঙ্গে আমি ঠান্ডা মাথায় ভাবছিলাম। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। বাড়িতে আর কেউ নেই। বারান্দার দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ—খিল ছিটকিনি আঁটা। সুতরাং জিনিয়ার মার্ডার মিস্ট্রির সমাধান করতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যাবে। ইমপসিবল ক্রাইম। লকড রুম মিস্ট্রি। খুনি বাড়িতে ঢুকল কী করে, আর বেরোলই বা কী করে? ঢোকার সময় জিনিয়া যদিও বা দরজা খুলে দিয়ে থাকে, খুন করে চলে যাওয়ার পর জিনিয়ার পক্ষে তো আর দরজা বন্ধ করে খিল-ছিটকিনি এঁটে দেওয়া সম্ভব নয়!

মনে-মনে হাসি পেয়ে গেল আমার। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। আমি হাতুড়িটা হাতে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে ওটার হাতলটা ঘষে-ঘষে মুছে দিলাম। তারপর ওটাকে একপাশে ফেলে দিলাম।

জিনিয়ার বডিটা মেঝেতে উপুড় হয়ে লেপটে রয়েছে। ওর মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে। দু-তিনটে মাছি কোথা থেকে যেন এসে ওড়াউড়ি শুরু করেছে। ডিসগাস্টিং মেস।

রক্ত ছিটকে আমার জামা-প্যান্টেও লেগেছে। কিন্তু তার জন্যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওই যে বলেছি, ডবল জামা-প্যান্ট।

টনির ফ্ল্যাটের টয়লেটে ফিরে ওপরের রক্ত মাখা জামা আর প্যান্ট খুলে ফেলব। ওগুলো টাইম মেশিনের বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখব। তারপর মেশিনের সঙ্গে প্যাক করে নিয়ে সোজা বাড়ি।

এবারে আর জামা-প্যান্ট পোড়ানোর গন্ধ পেয়ে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

জিনিয়ার ডেডবডির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, ওর নাচের প্রোগ্রামগুলোর এখন তা হলে কী হবে?

আর ঠিক তখনই 'মিঁয়াও-মিঁয়াও' ডাক শুনতে পেলাম।

আচমকা ডাকে চমকে তাকিয়ে দেখি গিনিপিগ। কোথায় ছিল কে জানে! আদরের মালকিনের খোঁজে বেরিয়ে এসেছে। তারপর জিনিয়ার রক্ত মাখা ডেডবডির কাছে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে গন্ধ শুঁকছে আর মিঁয়াও-মিঁয়াও' করে ডাকছে।

হঠাৎই বেড়ালটা মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তের ওপরে মাথা নামাল। জিভ বের করে চাটতে শুরু করল।

আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। ওটাকে 'হুস-হুস' করে তাড়াতে চেষ্টা করলাম।

বেড়ালটা সবুজ চোখে সরাসরি তাকাল আমার দিকে। এবং কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ 'হোঁয়াও' করে বিকট ডেকে উঠে আমার বুক লক্ষ্য করে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপরই হুউস।

টনির হলঘরে আমি সার্কাসের জোকারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি। রক্ত মাখা জামাকাপড়ে একটা বেড়ালের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি। আমাকে ঘিরে ঝকঝকে পোশাক পরা গেস্টের দল। পাগল করা ছন্দে ঝিনচ্যাক মিউজিক বাজছে। সেই তালে তাল মিলিয়ে সবাই এলোমেলো পা ফেলে নাচছে।

আমাকে দেখামাত্রই পলকে মিউজিক থেমে গেল। নাচ থামিয়ে সবাই যেন ফ্রিজ শট হয়ে গেল। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই। তাদের অবাক গোল-গোল চোখে নীরব প্রশ্ন।

আমার মাথা কাজ করছিল না। শুধু বুঝতে পারছিলাম আমার বাড়ির মাস্টার বেডরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম বলে ফিউচারে পৌঁছে আমার পজিশান বদল গিয়েছিল। সেইজন্যে টাইম মেশিন আমাকে ঠিকঠাক টয়লেটের ভেতরে ফেরত নিয়ে আসার বদলে এই হলঘরে এনে হাজির করেছে।

এ ছাড়া সঙ্গে রয়েছে এই হতচ্ছাড়া পাগল বেড়ালটা। আঁচড়ে কামড়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আর আমার জামা-প্যান্টের এখানে ওখানে লেগে রয়েছে রক্ত—জিনিয়ার রক্ত।

ওদের সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করে আর কোনও লাভ নেই। টয়লেটের দরজা ভাঙলেই টাইম মেশিনটা ওরা দেখতে পাবে। তারপর...।

সোনি হাঁ করে আমাকে দেখছিল। হঠাৎই ও তীক্ষ্ন গলায় চিৎকার করে উঠল। তার সঙ্গে আরও দু-একজন মহিলা গলা মেলাল।

অপমানে, ক্ষোভে, লজ্জায় আমার চোখে জল এসে গেল। এরই নাম পারফেক্ট মার্ডার! ছিঃ!

তাই আপনাদের হাতজোড় করে একটা রিকোয়েস্ট করছি। টাইম মেশিন হাতে থাকলেও কখনও খুন করবেন না। প্লিজ!

ভৌতিক ডট কম

গল্প

তোমার আসা চাই

ঠিক এইভাবেই সিদ্ধার্থকে বলত নিনি। যেন জন্মদিনের পার্টিতে ওকে ইনভাইট করছে।

বিয়ের আগে যখনই রাস্তাঘাটে, মেট্রো রেলের কাউন্টারের সামনে, কিংবা সিনেমা হলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকত তখন এইভাবেই জোর দিয়ে বলত নিনি। অথচ ও নিজেই দেরি করে আসত—সবসময়। এ নিয়ে সিদ্ধার্থ কিছু বলতে গেলেই হাউমাউ করে বাধা দিয়ে বলত, 'মেয়েদের ওরকম একটু দেরি হয়। পরে আসব না তো কি আগে এসে ভোম্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব!'

এখন অন্ধকারে বসে সেসব কথা মনে পড়ছিল আর চোখের কোণে জল আসছিল। আজ আসবে তো সিদ্ধার্থ? নাকি আসবে না?

ঘরের এককোণে ধূপ জ্বলছিল। অন্ধকারে উজ্জ্বল লাল ডগাগুলো গুনল নিনি। তেরোটা। সাগরিকা বলেছে, 'তেরোটা ধূপ জ্বালালে ভালো হবে। বেশ স্পিরিট-ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হবে।'

নিনির সামনে গোলটেবিল। টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে একটা লম্বা মোমবাতি। একপায়ে দাঁড়িয়ে জ্বলছে। সেই মলিন আলোয় কালচে টেবিলের কাঠ অল্পসল্প চকচক করছিল। সেখানে একটা সাদা কাগজ পাতা, তার ওপরে ধ্যাবড়া করে খানিকটা সিঁদুর মাখানো। আর সেই সিঁদুরের ওপরে ত্রিভুজের চেহারার সাজানো তিনটে কড়ি। কড়ির গায়ে মোমের আলো হাইলাইট তৈরি করছে।

নিনির বাঁ-পাশ থেকে সঙ্গীতা ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই, নড়িস না। কনসেনট্রেট কর। একমনে সিদ্ধার্থর কথা ভাব...।'

টেবিলটাকে ঘিরে বসে আছে ওরা চারজন।

নিনি, সাগরিকা, সঙ্গীতা আর সন্দীপন।

আজকের মেইন আইডিয়াটা সন্দীপনের। তাতে ওর বউ সঙ্গীতা, আর নিনির বেস্ট ফ্রেন্ড সাগরিকা উৎসাহের ইন্ধন জুগিয়েছে। নিনির একেবারেই মত ছিল না। কিন্তু তিনজনের চাপের কাছে ও শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে।

সিদ্ধার্থ অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে আজ কতদিন? কুড়ি পেরিয়ে একুশদিন।

চারতলার ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। রাত তখন বড়জোর এগারোটা। নিনিও ছাদে ছিল। আকাশের তারা উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনের আলো দেখছিল। একইসঙ্গে ছুটে আসা বাতাসের আদর উপভোগ করছিল।

হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! একটা আচমকা আর্ত চিৎকার: 'নিনি—!'

চমকে ঘুরে তাকিয়েছিল। অন্ধকার পাঁচিলের ওপরে সিদ্ধার্থের সিলুয়েট আর দেখা যাচ্ছে না। সিগারেটের আগুনের বিন্দুটাও আর নেই।

ছুটে পাঁচিলের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল নিনি। অনেক নীচে, গুলি খাওয়া বেলে হাঁসের মতো, এলোমেলো হয়ে পড়ে পড়ে আছে সিদ্ধার্থ।

নিনির মাথাটা কেমন পাক খেয়ে গিয়েছিল। শুধু মনে আছে, ছাদে লুটিয়ে পড়ার আগে ও আকাশের তারা দেখতে পেয়েছিল।

সেইদিন থেকে সংসারে নিনি একা হয়ে গেল। বাবা চলে গেছেন সেই কোন ছোটবেলায়। মা-ও চলে গেছেন চারবছর আগে। ভাই-বোন কেউ ছিল না। তাই শুধু সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ও বেঁচে ছিল।

অন্ধকারে একটা খসখস আওয়াজ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্দীপনের চাপা গলা শোনা গেল, 'কেউ কি এসেছেন?'

চাপা কাশির শব্দ শোনা গেল।

নিনির হাতের ওপরে সঙ্গীতার হাতের চাপ বেড়ে গেল। ডানদিকে বসা সাগরিকার শুধু হাতের চাপ বাড়ল না, হাতটা তিরতির করে কাঁপতেও লাগল।

'কেউ কি এসেছেন?' আবার সন্দীপন।

কাপড়ে কাপড়ে ঘষার শব্দ হল। অচেনা একটা গলা অস্পষ্টভাবে 'হুঁ' বলে উঠল।

নিনি ভয় পেয়ে গেল। যদিও প্ল্যানচেট-ফ্যানচেটে ওর এতটুকুও বিশ্বাস নেই। সে-কথা ও বারবার বলেছে। কিন্তু ওরা তিনজন শুনলে তো!

সন্দীপন একই প্রশ্ন তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার করল, কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ঘরের চতুর্দিকে তাকাল নিনি। মোমের আলোর পরিধি পেরিয়ে ঘরের অন্ধকার আনাচেকানাচে ওর সন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়াল। কোনও অস্বাভাবিক বাড়তি ছায়া কি নজরে পড়ছে?

সিদ্ধার্থর চলে যাওয়াটা খুব দুঃখের হলেও তার মধ্যে একটা সান্ত্বনার ছোঁয়া আছে। কয়েকদিন আগে ওকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে-করতে সাগরিকা হঠাৎ বলে ফেলেছে, 'শোন, সিদ্ধার্থর ব্যাপারটা খুব স্যাড মানছি—বাট এটা তো ঠিক যে, এখন তুমি ব্যাপক বড়লোক। লাইফে সেফটির জন্যে টাকা একটা মেজর ফ্যাক্টর। সিদ্ধার্থর সবকিছু তো তুই-ই পাবি। যে যাওয়ার সে গেছে—কিন্তু তোমার মুখের রুপোর চামচ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না...।'

না, সাগরিকা কিছু ভুল বলেনি। সিদ্ধার্থর সাম্রাজ্য নেহাত ছোট ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর থেকে নিনির কোনও স্বপ্নকে আমল দেয়নি ও। ওর কাছে জীবন বলতে ভালো থাকা-খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, গাড়ি, বাড়ি, হইহুল্লোড়, ফুর্তি—ব্যস।

অথচ নিনির আরও পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল, ছবি আঁকা শিখে বড় পেইন্টার হওয়ার সাধ ছিল। ও ভেবেছিল, আমেরিকার গিয়ে এই সাধগুলো ও পূরণ করবে, কিন্তু হয়নি। সিদ্ধার্থ ওর ইচ্ছেগুলোয় সায় দেয়নি। বরং ওর পেইন্টার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে

কখনও-সখনও বাজে ঠাট্টা করেছে। ওর সঙ্গে এ নিয়ে তর্কাতর্কিও করেছে নিনি। তারপর তর্ক থেকে ঝগড়া।

কিন্তু শুধু এই সমস্যাটুকু ছাড়া সিদ্ধার্থর আর কোনও সমস্যা ছিল না। হি ওয়াজ আ গুড হাজব্যান্ড।

হঠাৎই ফিসফিসে গলায় কে যেন টেনে-টেনে উচ্চারণ করল, 'নি—নি—।'

নিনির গায়ে কাঁটা দিল। এই প্রথম ওর মনে হল ও যেন প্রাণ খুলে সিদ্ধার্থকে বলতে পারছে না, 'তোমার আসা চাই!' বরং যেন মনে হচ্ছে, এই অন্ধকার ঘরে ও যেন না আসে। ও যদি প্রেতলোকে এখন থেকে থাকে তা হলে সেখানেই থাক। কিন্তু সিদ্ধার্থ কি এখন নিনির কথা শুনবে? ও কি নিনির চিন্তা টের পাচ্ছে?

আবার পা টেনে চলার ঘষটানির শব্দ। এবং হালকা অস্পষ্ট গলায় কে যেন বলল, 'নিনি। নিনি—আমি এসেছি।'

নিনির মনে হল, এই কাঁপা-কাঁপা ফিসফিসে স্বর যেন অন্য কোনও হিমশীতল জগৎ থেকে ভেসে আসছে।

কিন্তু এ অসম্ভব! নিনি ভালো করেই জানে ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। ওরকম যা-কিছু শোনা যায় সবই মনের ভুল—দেখা কিংবা শোনার ভুল। এখনও যে-কথাগুলো শুনছে সবই হ্যালুসিনেশান।

'নিনি...নিনি...আমি...আমি এসেছি...।'

সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র ভয়ের চিৎকার।

মেয়েলি গলায় ওদেরই কেউ চিৎকার করেছে। মনে হল, চিৎকারটা নিনির ডানদিক থেকে এল।

চিৎকারের তীব্রতায় নিনি আঁতকে উঠল। সন্দীপন হঠাৎই জোরালো গলায় বলল, 'কোনও ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। আমি আলো জ্বালছি...।'

আলো জ্বলে উঠল।

সাগরিকা মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সঙ্গীতা আর সন্দীপন ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎই সন্দীপন দু-হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'ও. কে. বাবা! সরি। সরি এভরিবডি, সরি। ওইসব ভূতের আওয়াজ আমি করেছি। আর নিনির নাম ধরে ফিসফিস করে ভুতুড়ে কথাগুলো আমিই বলেছি। স্রেফ মজা করার জন্যে—আর নিনিকে আওয়াজ দেওয়ার জন্যে। ও সবসময় বলে ভূত বলে কিছু নেই।' সাগরিকার মাথায় হাত বোলাল সন্দীপন: 'সাগরিকা, কাম ডাউন লেডি। আই সেইড আই অ্যাম সরি...।'

নিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ ওর কেমন যেন দম আটকে আসছিল।

শেষ পর্যন্ত বহু তোয়াজ করে সাগরিকাকে শান্ত করা গেল। সন্দীপন মজা করে এ-কথাও বলল, 'আচ্ছা, এবার চুপ কর—তোকে একটা এক্সট্রা-লার্জ ক্যাডবেরি খাওয়াব।'

প্ল্যানচেট-পর্ব এভাবেই শেষ হল।

একটু পরে ওরা তিনজন চলে গেল। আড়াইহাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে নিনি এখন একা। গেস্ট বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ও গোলটেবিলটার দিকে তাকাল। নিভিয়ে দেওয়া

মোমবাতিটা একপায়ে দাঁড়িয়ে। ধূপকাঠিগুলো জ্বলে-জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। সিঁদুর মাখানো কাগজ আর কড়িগুলো এখন কত নিরীহ দেখাচ্ছে।

সন্দীপনটা বরাবরই একটু ফাজিল। প্র্যাকটিক্যাল জোক করে অন্যকে হেনস্থা করে। তবে মানুষটা ভালো। হয়তো নিনির মন ভালো করার জন্যই ও এরকম একটা ভয়ের নাটক করেছে।

গেস্ট বেডরুমের আলো নিভিয়ে দিল নিনি। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল। এখন ও কত একা! কিন্তু একইসঙ্গে কত স্বাধীন!

গুনগুন করে দু-লাইন গান গাইল নিনি। অতীত এখন অতীত। এখন ওকে তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। ওর ইচ্ছেগুলো এখন ইচ্ছেমতো ডানা মেলতে পারে।

হঠাৎই দরজায় নক করার শব্দ শুনতে পেল।

চমকে উঠল নিনি। আওয়াজ লক্ষ করে ফিরে তাকাল।

গেস্ট বেডরুমের দরজার ওপাশ থেকে কেউ আলতোভাবে নক করছে। ঠক-ঠক। ঠক-ঠক।

নিনির নার্ভ মোটেই কমজোরি নয়। ও একটুও ভয় পেল না। উলটে বন্ধ দরজাটার খুব কাছে এগিয়ে গেল।

দরজাটা খুলবে না কি?

আবার নক করার শব্দ।

তারপর ফিসফিসে গলায় কেউ ডেকে উঠল, 'নিনি, আমি এসেছি—।'

সন্দীপন কি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মজা করছে?

অসম্ভব! কারণ, ওরা তিনজন অনেকক্ষণ আগে চলে গেছে। নিনি ওদের ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। তারপর নিজের হাতে দরজা লক করেছে। এতে কোনও ভুল নেই, ভ্রান্তি নেই।

আবার ডাকল সে, 'নিনি, দরজা...খোলো। আমি...আমি এসেছি...।' যন্ত্রণায় কাতর একটা মানুষ হাঁপাতে-হাঁপাতে শ্বাস টেনে-টেনে কথা বলছে।

নিনি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি তো সবসময় বলতে, "তোমার আসা চাই।" তাই আমি এসেছি। দরজা খোলো, নিনি—তোমার সঙ্গে কথা আছে...।'

নিনি একটু ভয় পেল এবার। উদভ্রান্ত চোখে চারপাশে তাকাল। কী করবে ভেবে পেল না।

নক করার শব্দ ক্রমশ জোরালো হতে লাগল। হতে-হতে সেটা ধাক্কায় বদলে গেল।

'নিনি! নিনি!'

গলাটা এবার সিদ্ধার্থর মতো লাগছে না?

এখন নিনি কী করবে? চিৎকার করবে? অন্য ফ্ল্যাটের লোকজনদের ডাকবে?

'কে? কে তুমি?' নিনি মরিয়া হয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

‘নিনি, তুমি দরজা না খুললে…আমি…দরজা…ভেঙে…।’

‘না! তুমি সিদ্ধার্থ নও! তুমি…তুমি…।’

‘হ্যাঁ, আমি সিদ্ধার্থ। আমি জানি…সেদিন রাতে…ছাদে স্মোক করার সময়…কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আর তুমিও সেটা ভালো করে জানো, নিনি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ এ-কথা জানে না। এবার বিশ্বাস হল তো! নাউ বি আ গুড গার্ল…অ্যান্ড ওপেন দিস ড্যাম ডোর, উইল ইউ?’

আমার বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুল

মৌমিতাকে আমার বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলের আসল ব্যাপারটা খুলে বলিনি। কারণ, খুলে বলাটা খুব সহজ নয়। কিন্তু ও যে বারবারই আমার বাঁ-হাতের দিকে তাকায় সেটা আমি লক্ষ করেছি। এখনও দেখছি, ও কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে আমার বাঁ-হাতের দিকে চেয়ে আছে।

আমি বাঁ-হাতের সবসময় সাদা দস্তানা পরে থাকি। কাপড়ের দস্তানা। ঠাটবাটওলা রেস্তরাঁয় বেয়ারারা যেমন পরে থাকে। এখনও আমাদের টেবিলের আশেপাশে দু-তিনজন বেয়ারা এরকম সাদা দস্তানা পরে আছে।

মৌমিতাকে আজ ডিনার খাওয়াতে 'দ্য অর্কিড'-এ নিয়ে এসেছিলাম। ই এম বাইপাসের ধারে এই 'দ্য অর্কিড' রেস্তরাঁটা মন্দ নয়। এখানে জগঝম্প নাচ-গান নেই। তার বদলে শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ। খুব সফট টোনে খুশির মুড তৈরির মিউজিক বাজছে। এসি-র তীব্রতা প্রায় শীত করার মতো। বেশিরভাগ টেবিলই ভরতি থাকলেও কারও কথা শোনা যাচ্ছে না। সবাই নিশ্চয়ই নীচু গলায় কথা বলছে। আমাদেরই মতো।

'একটা কথা জিগ্যেস করব?' মৌমিতা হঠাৎ মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

'করো।' আমি জানতাম ও কী জিগ্যেস করবে।

'তুমি বাঁ-হাতে সবসময় গ্লাভস পরে থাকো কেন?'

'গ্লাভস নয়—গ্লাভ বলো...' হেসে বললাম আমি, 'আমি তো শুধু বাঁ-হাতে পরেছি—দু-হাতে পরিনি।'

'তুমি আনসারটা এড়িয়ে যাচ্ছ।' কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস লম্বা চুমুক দিয়ে বায়নার সুরে ও বলল, 'বলো না! বলতে কোনও প্রবলেম আছে?'

আমার মনটা হঠাৎ কেমন-কেমন হয়ে গেল। প্রবলেম? ভালো কথাই বলেছে মৌমিতা। প্রবলেম নেই আবার!

একহাতে দস্তানা পরে থাকি বলে অনেকের কাছেই আমাকে জবাবদিহি করতে হয়। কাউকে বলি, এটা আমার এক বিচিত্র শখ। কাউকে বলি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময় এই অভ্যেসটা ডেভেলাপ করেছে। আবার কাউকে বা তিতিবিরক্ত হয়ে বলি, আমার বাঁ-হাতে স্কিন ডিজিজ আছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কী সেটা একজন ছাড়া কাউকে বলিনি—অন্তত এখনও।

কৌতূহল থাকাটা দোষের নয়। সুতরাং মৌমিতার কোনও দোষ নেই। ব্যাপারটা ওর জানতে ইচ্ছে করতেই পারে। তাই ওর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'মৌ, বলতে কোনো প্রবলেম নেই। তবে...মানে...এর পেছনে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে...।'

ও বড়-বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই? তা হলে বলো—প্লিজ...।'

রেস্তরাঁর ছায়া-ছায়া আলোয় আমি ওকে ভালো করে দেখতে চাইলাম।

মৌমিতা। লম্বা স্লিম চেহারা। মাথার একরাশ চুলে সোনালি রঙের ঝিলিক। লম্বাটে ফরসা মুখ। টানা-টানা চোখ। এই চোখে চোখ পড়লে নজর ফেরানো যায় না। চোখা নাক। সামান্য ফোলা দু-ঠোঁট যেন সবসময়েই দুষ্টু হাতছানি দিচ্ছে।

মৌমিতাকে আমি ভালোবাসা। খুব সাধ ওকে নিয়ে বাকি জীবনটা একসঙ্গে থাকব। আমার ভেসে-বেড়ানো দিকশূন্য ছন্নছাড়া জীবনে ও সারথি হয়ে আসুক। আমাকে সামলে নিক। আমার সুখ-দুঃখের শরিক হোক। আমার অভিভাবক হয়ে উঠুক।

মৌমিতাকে এখনও এসব কথা বলিনি। দস্তানার গল্পটা বলার পর বলব। মনে হয় না ও আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

আমি বেয়ারাকে ডেকে বিল দিতে বললাম। তারপর মৌ-কে চাপা গলায় বললাম, 'এখানে নয়—গল্পটা তোমাকে গাড়িতে যেতে-যেতে বলব।'

ও খুব খুশি হল। কোল্ড ড্রিঙ্কের খালি গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'সোনু, আই লাভ ইউ...।'

আমি বললাম, 'গল্পটাতো এখনও শোনোনি...আগে শোনো...তারপর...।'

বিল মিটিয়ে আমরা দুজনে উঠে পড়লাম। রেস্তরাঁর কাচের দরজার কাছে এসে দেখি বৃষ্টি পড়ছে—তবে তেমন জোরে নয়। আমি আর মৌ হাত ধরাধরি করে ছুট লাগালাম গাড়ি লক্ষ করে।

গাড়িতে গুছিয়ে বসার পর মৌ বলল, 'বৃষ্টিটা হেভি রোম্যান্টিক—তাই না?'

'তুমি পাশে থাকলে আমার কাছে মরুভূমিও রোম্যান্টিক লাগবে।'

'হোয়াও!' বলে আমার জামা ধরে টান মারল মৌ। ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে ছোট্ট ঠোকরানো চুমু খেল গালে।

জানলার কাচ তোলাই ছিল। হালকা করে এসি চালিয়ে দিলাম। তারপর পার্কিং লট থেকে গাড়ি তুলে নিয়ে এলাম বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায়।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল।

বৃষ্টির জন্যে রাস্তা দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে ওয়াইপার চালিয়ে দিলাম। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে চোখ গেল। আটটা ঊনচল্লিশ।

নাঃ, রাত বেশি হয়নি। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে মৌ-কে বাড়িতে পৌঁছে দিলেই হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাইডরোডে ঢুকে পড়লাম। এ-রাস্তাটায় গাড়ি-টাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। দোকানপাটও চোখে পড়ছে না। আলো বলতে রাস্তার দু-পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর সোডিয়াম বাতি।

মৌমিতার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই দস্তানার ব্যাপারটা তোমার অনেকদিন ধরেই জানতে ইচ্ছে করছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ইউ আর স্মার্ট, সোনু। তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই এটা আমার কাছে একটা বিশাল কিউরিয়োসিটি...। আজ কৌতূহল চাপতে না পরে তোমাকে স্ট্রেটকাট জিগ্যেস করে ফেলেছি...।' হঠাৎ কী ভেবে ও বলল, 'তুমি কি মাইন্ড করলে, সোনু? তা হলে থাক...।'

'ওহ-হো, কী যে বলো! হোয়াই শুড আই মাইন্ড?' কথা বলতে-বলতে ঝুঁকে পড়ে ওর মাথায় একটা চুমু খেলাম: 'তোমাকে সবকিছু খুলে বলতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, গল্পটা শুনলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না।'

উত্তরে মৌ আমার দস্তানা-পরা আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আই উইল বিলিভ এনিথিং ইউ সে।'

ভালোবাসা এমনই জিনিস, আজগুবি রূপকথাও বিশ্বাস করতে মন চায়।

রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়ে ঝোপজঙ্গল ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালাম। মৌমিতা তাতে অবাক হল না। কারণ, আগেও এরকম ফাঁকা স্পটে আমি গাড়ি দাঁড় করিয়েছি। এবং মৌমিতা আর আমি গাড়ির মধ্যে খুশিমতন হুটোপাটি করেছি। ইংরেজিতে একেই বোধহয় 'হেভি পেটিং' বলে। আজও গল্প-টল্প বলা হয়ে গেলে ওসবে মন দেওয়া যাবে।

গাড়ির চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। জানলার কাচ বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। ওয়াইপার দুটো প্রাণপণে উইন্ডশিল্ডের জল সরাচ্ছিল। ওদের চলার তালে-তালে মোটরের মিহি শব্দ হচ্ছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই মেঘের ডাক শোনা গেল।

আমি গল্পটা বলতে শুরু করলাম।

মৌ তোমাকে কখনও বলা হয়নি...মানে, আমার বাবা দেড় বছর আগে মারা গেছেন... মানে, খুন হয়েছিলেন। সেইসময় কলকাতায় একটা জঘন্য সিরিয়াল কিলিং চলছিল। একের পর এক খুন করে চলেছিল লোকটা। প্রথমে খুন করেছিল একটা এগারো বছরের বাচ্চা মেয়েকে। না—শুধুই খুন করেছিল—অন্য কিছু করেনি। মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছিল। খুনের পর মেয়েটার যা চেহারা হয়েছিল...মানে, কাগজে যেসব ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল...সেসব দেখলে তুমি শিউরে উঠতে। মেয়েটার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। ঠোঁটের কোণে ফেনা ছিল। আর জিভটা মরা ছাগলের জিভের মতো বাইরে বেরিয়ে ঝুলছিল।

মেয়েটার মারা যাওয়ার আগের ছবি আর পরের ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল কাগজে। দেখে মনে হচ্ছিল, দেবশিশু আর পিশাচ। খুনির হাত ওকে এমনই বদলে দিয়েছিল।

কাগজে দিনের পর দিন এই খুনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তাতেই পড়েছিলাম, খুনি এত জোরে মেয়েটার গলা টিপে ধরেছিল যে, থাইরয়েড বোন আর কার্টিলেজ বোন ভেঙে গিয়েছিল। এই যে...গলায়...এখানে। কণ্ঠমণি...মানে, ইংরেজিতে অ্যাডামস অ্যাপল যাকে বলে। না, না, তোমার শিউরে ওঠার কোনও কারণ নেই। বললাম যে, ব্যাপারটা তিনবছরেরও বেশি পুরোনো।

মেয়েটার নখের ভেতরে আঁশমতন কিছু পাওয়া গিয়েছিল। ফোরেনসিক পরীক্ষায় জানা গেল, সেগুলো পুরোনো শুকনো কোনও চামড়ার আঁশ। অর্থাৎ, খুনি চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করেছিল। নাঃ, কোনওরকম আঙুলের ছাপ-টাপ পাওয়া যায়নি। পুলিশ ফুল এনথু নিয়ে ইনভেস্টিগেট করেও কিস্যু করতে পারল না। মেয়েটার খুনি ধরা পড়ল না।

দ্বিতীয় খুনটা হওয়ার পর পুলিশ নড়েচড়ে বসল।

এবারে খুন হল একজন মাঝবয়েসি পুরুষ। খুনের স্টাইল একই। মার্ডার বাই স্ট্র্যাংগুলেশান। এবারেও ভিকটিমের নখের নীচে চামড়ার ফাইবার পাওয়া গেল। অর্থাৎ, সেই দস্তানা। প্রথমবারের যেমন খুনের মোটিভের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, এবারেও তাই। সব মিলিয়ে পুলিশ বেকুব বনে গেল। খুনি রয়ে গেল সবার চোখের আড়ালে।

তিননম্বর খুনটা হওয়ার পর পুলিশ বুঝতে পারল ব্যাপারটা সিরিয়াল কিলিং। মিডিয়া খুনির নাম দিল 'দস্তানা-খুনি'। ইংরেজি চ্যানেল আর খবরের কাগজ নাম দিল 'গ্লাভ কিলার'। সারা শহর জুড়ে খুনির খোঁজ চলতে লাগল। সবাই জোট বেঁধে দস্তানা পরা লোক খুঁজে বেড়াতে লাগল। বুঝতেই পারছ, কলকাতা শহরে চামড়ার দস্তানা আর কোন কাজে লাগে! তাই দস্তানা পরা লোক খোঁজার কাজটা বেশ সহজ। কিন্তু সেরকম কাউকেই পাওয়া গেল না।

এদিকে খুনের ব্যাপারটা চলতেই লাগল। তিননম্বরের পর চারনম্বর, চারনম্বরের পর পাঁচনম্বর, তারপর ছ'নম্বর। আর ছ'নম্বরে পর...সাতনম্বর আমার বাবা।

বাবা খুন হওয়ার পরই সিরিয়াল কিলিং-এর ব্যাপারটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। খুনি যেন হঠাৎই চলে যায় বনবাসে। কেউ-কেউ বলল, সাতটা খুন করাটাই লোকটার টার্গেট ছিল। আবার কেউ-বা বলল, ভয় পেয়ে খুনি গা-ঢাকা দিয়েছে। কারণ, গোটা শহরের লোক সাবধান হয়ে গেছে। তা ছাড়া সবাই এমন হন্যে হয়ে দিন-রাত দস্তানা পরা লোকের খোঁজ করছে যে, নতুন খুনের ভিকটিম খুঁজে পাওয়াই মুশকিল—তাকে খুন করা তো অনেক পরের ব্যাপার।

বাবা খুন হওয়ার পর আমি অনাথ হয়ে গেলাম, কিন্তু সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, সাইকোপ্যাথ খুনির সিরিয়াল কিলিং বন্ধ হয়ে গেল।

এতে সমস্যা মিটলেও নতুন কিছু প্রশ্ন উঠে এল পুলিশের সামনে। আমার বাবা খুন হয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। মানে, এলাকার বাউন্ডারি ওয়ালের কাছাকাছি ঝোপের মধ্যে বাবার ডেডবডিটা পড়েছিল।

শুনলে তোমার অবাক লাগবে মৌ, বাবাকে কিন্তু গলা টিপে খুন করা হয়নি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাগলের মতো কোপানো হয়েছিল বাবাকে। ছত্রখান হওয়া ডেডবডিটা পড়ে ছিল ঘাসের ওপরে। মুখটা ধারালো ফলার কোপে শতচ্ছিন্ন। হাতের আঙুলগুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে এখানে-সেখানে পড়েছিল। বাঁ-হাতটা কাঁধের কাছ থেকে প্রায় খুলে এসেছিল। সে এক বীভৎস ব্যাপার!

বাবার পকেটে পাওয়া ক্রেডিট কার্ড থেকে পুলিশ পরিচয় আর ঠিকানার খোঁজ পায়। আমি বাবাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম হাতের একটা আংটি দেখে, আর ডানহাঁটুর নীচে একটা কাটা দাগ দেখে। আইডেনটিফাই করার পরই আমি সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলাম।

এবারে তোমাকে প্রশ্নগুলোর কথা বলি।

প্রথমত, বাবাকে গলা টিপে খুন করা হয়নি। ফলে খুনের কায়দাটা সিরিয়াল কিলারের স্টাইলের সঙ্গে মিলছে না। কেন খুনি হঠাৎ স্টাইল বদলাতে গেল?

দ্বিতীয়ত, মার্ডার স্পটে একটা কালো চামড়ার দস্তানা পাওয়া যায়। রক্তমাখা দস্তানা—ছুরির কোপে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। দস্তানার রক্তের সঙ্গে বাবার রক্ত মিলে গিয়েছিল। এই দস্তানাটি কি খুনির দস্তানা হতে পারে?

তৃতীয়ত, খুনের ধরনটা এমনই যে, পুলিশের মনে হয়েছে, খুনটা প্রতিহিংসা বা আক্রোশ থেকে করা হয়েছে। প্রচণ্ড আক্রোশ না থাকলে কেউ এভাবে খুন করে না। তা হলে সিরিয়াল কিলার হঠাৎ এই আক্রোশ দেখাল কেন?

পুলিশ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছিল। কিন্তু তাতে একটিমাত্র বাধা ছিল। নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ কী সেই সিদ্ধান্ত, আর কী সেই বাধা?

যাকগে, আমিই বলছি।

পুলিশের সেই সিদ্ধান্ত হল: আমার বাবা-ই সেই সিরিয়াল কিলার। খুন হওয়া কোনও ভিকটিমের রিলেটিভ বা বন্ধুবান্ধব প্রতিহিংসায় আক্রোশে বাবাকে ওরকম বীভৎসভাবে খুন করেছে।

আর এই সিদ্ধান্তের পথে বাধা হল, খুঁজে-না-পাওয়া বাঁ-হাতের দস্তানা।

দস্তানাটা পুলিশ কেন খুঁজে পায়নি জানো? ওটা আমি নিয়ে এসেছিলাম।

প্রথমদিন অন্ধকারে পুলিশ ভালো করে জায়গাটা সার্চ করতে পারেনি। হয়তো বাবার সঙ্গে খুনি বা খুনিদের ধস্তাধস্তির সময় দস্তানাটা দূরে কোনও ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। তাই ওরা সেটা দেখতে পায়নি।

খুনের পরদিন দুপুরে গোয়েন্দারা লোকজন নিয়ে এসে জায়গাটা তন্নতন্ন করে সার্চ করে। কিন্তু ওটার খোঁজ পায়নি। কারণ, সেদিন ভোরবেলা পাহারাদার কনস্টেবলদের চোখে ধুলো দিয়ে দস্তানাটা আমি খুঁজে বের করি। ঘন ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ওটা লুকিয়ে ছিল। ওটার গায়ে কোনও ছুরির কোপ ছিল না। শুধু দু-একজায়গায় শুকনো রক্ত লেগে ছিল।

দস্তানাটা বাড়ি নিয়ে এসে আমি লুকিয়ে রাখলাম। বাবার শোক ভুলতে আমার কয়েক মাস লেগে গিয়েছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, পুলিশের সন্দেহ ঠিক। আমার বাবা-ই সেই সিরিয়াল কিলার।

না, না—মৌ, তোমার আপসেট হওয়ার কিছু নেই। আফটার অল ট্রুথ ইজ ট্রুথ। সিরিয়াল কিলার লোকটা যে আমার বাবা এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বহু সিরিয়াল কিলারই ফ্যামিলি ম্যান ছিল । মানে, ওরা কারও-না-কারও বাবা ছিল।

এবারে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আরও একটু বলি। আমার মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। তাই মা-কে আমার ভালো করে মনে নেই। কিন্তু মায়ের সম্পর্কে বাবা খুব বাজে-বাজে কথা বলতেন। প্রথম-প্রথম আমার খারাপ লাগত। কিন্তু পরে একই ধরনের কথা রোজ-রোজ শুনতে-শুনতে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে এসেছিল। কে জানে, হয়তো বাবার অভিযোগগুলো বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিলাম।

বাড়িতে মায়ের কোনও ফটো ছিল না। বাবা রাখেননি। তাই আমি আজও জানি না, আমার মা-কে কেমন দেখতে ছিল। এই শূন্যতা নিয়ে আমি বড় হয়েছি, মৌ।

আমার বাবা এমনিতে শান্ত মানুষ হলেও হঠাৎ-হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠতেন। ঘরের জিনিসপত্র পাগলের মতো ভাঙচুর করতেন। আমার মরা মা-কে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে নোংরা গালিগালাজ করতেন।

বাবার একটা ব্রিফকেস ছিল। ব্রিফকেসটা খুলে আমি কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছিলাম। মেয়েদের মাথার ক্লিপ, ছেলেদের দুটো রিস্টওয়াচ, তিনটে আংটি, একটা চামড়ার বেল্ট, আর দুটো নাইলনের প্যান্টি।

জিনিসগুলো দেখে আমার মনে হল, ওগুলো ভিকটিমদের গা থেকে বাবা খুলে নিয়েছেন। মানে, জিনিসগুলো মার্ডার সুভেনির।

সিরিয়াল কিলিং-এর ব্যাপারটা অনেক নিউজপেপারেই বেশ বড় করে দিনের পর দিন বেরিয়েছিল। বাবার ওই ব্রিফকেসে তার কাটিংগুলো আমি পেয়েছিলাম। সেগুলো বারবার করে খুঁটিয়ে পড়ে ভিকটিমদের হারানো কয়েকটা জিনিসের কথা জানতে পারলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, হারানো জিনিসগুলো বাবার ব্রিফকেসেই রয়েছে। সুতরাং, সন্দেহের আর কোনও জায়গা রইল না।

এবারে তোমাকে দস্তানাটার কথা বলি।

মাস আস্টেক অগের কথা। তুমি তো জানো, আমি মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করি। একদিন রাতে বাড়িতে একা-একা বসে হুইস্কি খাচ্ছিলাম আর বাবার কথা ভাবছিলাম। ঘরে নাইটল্যাম্পের আবছা নীল আলো। সিডি প্লেয়ারে হালকা মিউজিক বাজছে। নেশা বেশ জমে উঠেছে।

সামনের টেবিলে বোতল আর গ্লাসের পাশে পড়ে ছিল বাবার দস্তানাটা।

আমি ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এর ভেতরে একটা খুনি হাত বাস করত। আর সেই হাতটা আমার বাবার হাত।

গ্লাভটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে হঠাৎ কী-খেয়াল হল, আমি ওটা বাঁ-হাতে পরে ফেললাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কী যে হল, তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার বাঁ-হাতের আঙুলের ডগাগুলোয় যেন হাই ভোল্টেজের শক খেলাম। বাঁ-হাতের প্রতিটি শিরা চিনচিন করতে লাগল। অসহ্য জ্বালায় আমি ছটফট করতে লাগলাম। ছটফট করতে-করতে বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ে গেলাম চেয়ার থেকে। আমার পায়ের লাথিতে টেবিলটা উলটে গেল। তার সঙ্গে-সঙ্গে গ্লাস আর বোতলও।

হাতের অসহ্য জ্বালাটা আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। আমি মরিয়া হয়ে দস্তানাটা টেনে খোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! ওটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না। ওটা সিমেন্টের ঢালাইয়ের মতো আমার হাতে একেবারে সেঁটে গেছে!

মেঝেতে পড়ে আমি হিস্টিরিয়ার রুগির মতো হাত-পা ছুড়ছিলাম আর গ্লাভটা খোলার চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। হাতের জ্বালা-পোড়াটা এত বাড়তে লাগল যে, একসময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, টের পেলাম, জ্বালাটা আর নেই। নেশাও পুরোপুরি কেটে গেছে।

কোনওরকমে উঠে ঘরের টিউবলাইট জ্বেলে দিলাম। তারপর তাকালাম আমার বাঁ-হাতের দিকে।

কবজি থেকে আমার হাতের পাঞ্জা, আঙুল সব কালো চামড়ায় ঢাকা। এমনকী হাতের তালুর রং-ও কালো হয়ে গেছে। তবে দস্তানাটাকে আর দস্তানা বলে চেনা যাচ্ছে না। ওটা যেন আমার হাতেরই চামড়া হয়ে গেছে। কারণ, কালো চামড়ার তালুতে হাতের রেখাগুলো আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। নখগুলোর আকার বোঝা গেলেও সেগুলোর রং আর চরিত্র বদলে গেছে।

কী আশ্চর্যভাবেই না আমি একটা 'কালো' হাতের মালিক হয়ে গেলাম!

হতভম্ব হয়ে হাতটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎই শুনলাম একটা কর্কশ স্বর: 'এইবার তুই উপযুক্ত হয়েছিস, সোনু। আমার অসম্পূর্ণ কাজ তুই শেষ করবি। যারা ঘোর পাপী, দুশ্চরিত্র, ব্যাভিচারী, তাদের সবাইকে তুই শাস্তি দিবি। আমার সব শক্তি আমি তোকে দিলাম। নে...।'

আবার একপ্রস্থ জ্বালা-যন্ত্রণা, ছটফটানি, চিনচিনে ব্যথা।

তারপর, কিছুটা সময় কেটে যেতেই, আমি চেতনা ফিরে পেলাম। টের পেলাম, অদ্ভুত এক আনন্দ আর তৃপ্তিতে আমার মনটা টগবগ করছে।

তবে সমস্যা একটা হল। আমার এই কালো রঙের বাঁ-হাতটা দেখে কৌতূহলী লোকজন স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত করে মারবে। কিন্তু সবাইকে তো আর এ-গল্প বলা যায় না। তাই আমি সবসময় বাঁ-হাতে সাদা দস্তানা পরে থাকি। লোকে আমাকে হয়তো রেস্তরাঁর বয়-বেয়ারা ভাবে। তা ভাবুক! অন্তত পাগল-করা কৌতূহলের হাত থেকে তো আমি রেহাই পাব। কী বলো?

আমার গল্প শেষ হতেই মৌমিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'সোনু, তুমি ফ্যানট্যাস্টিক! তোমার জবাব নেই। এই অন্ধকার...এই অল্প-অল্প আলো... এই বৃষ্টি...মাঝে-মাঝে মেঘের গর্জন...বিদ্যুতের ঝলকানি—এর চেয়ে আইডিয়াল পরিবেশ আর কী হতে পারে, সোনু? তোমার দস্তানার গল্পটা বানিয়েছ দারুণ। এবারে প্লিজ, রিয়েল স্টোরিটা বলো—।'

কথা বলতে-বলতে আমার দিকে ঝুঁকেক পড়েছিল মৌ। আমার গায়ে হাতও রেখেছিল। আর একইসঙ্গে ওর মিষ্টি গলায় খিলখিল করে হাসছিল।

আমি বারবার ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম...বলতে চাইলাম যে, আমি যা বলেছি সেটাই আসল ঘটনা—কিন্তু কে শোনে কার কথা!

বৃষ্টি কিছুটা কমে এলেও মেঘের ডাকাডাকি চলছিল। আমি উইন্ডশিল্ডের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকালাম।

আর ঠিক তখনই মৌ একটানে আমার হাত থেকে সাদা দস্তানাটা খুলে নিয়েছে।

আমি চমকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখের রং সাদাটে হয়ে গেছে। ও গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার কালো রঙের বাঁ-হাতটার দিকে, কালো রঙের পাঁচটা আঙুলের দিকে।

আমি নীচু গলায় বললাম, 'মৌ, প্রথম মেয়েটাও তোমারই মতন ছিল। ওর নাম ছিল জিনিয়া। সুন্দরী, ছটফটে, চঞ্চল, মুখে সবসময় খই ফুটছে। তার সঙ্গে উগ্র পোশাক।

চটকদার মেকাপ। জিনিয়াও আমার গল্পটা বিশ্বাস করতে চায়নি। তখন বাবা ওকে শাস্তি দিতে বলল...।'

মৌমিতা আর কোনও কথা বলতে পারছিল না—শুধু আমার কালো হাতটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

এমন সময় আমার কালো হাতের আঙুলগুলো মাকড়সার পায়ের মতো নড়ে উঠল। আর কর্কশ গলায় হাতটা বলে উঠল, 'সোনু, আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোর গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। নে, চটপট কাজ সেরে নে...।'

পিতাশ্রীর আদেশ অমান্য করি কেমন করে!

আমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো যখন সাঁড়াশি হয়ে মৌমিতার গলায় চেপে বসল, তখনও ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। ব্যাপারটা কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছে না।

জিনিয়াও বিশ্বাস করতে পারেনি। মৌমিতাও পারল না।

আর পরের মেয়েটাও পারবে না।

অন্ধকার রঙের কুকুর

বহু বছর আগের ঘটনা হলেও সেই সন্ধেটার কথা আমি ভুলিনি।

আমার সামনে ছিল আঁকাবাঁকা শীর্ণ নদী। নদীর ওপারে জঙ্গলের গাছপালা। ঝাঁকড়া গাছের পাতার ফাঁকে আগুন রঙের সূর্য ঢলে যাচ্ছিল। আর শীতের ঘোলাটে সন্ধ্যা চুপিচুপি সূর্যকে চাদর মুড়ি দিতে আসছিল।

ঠিক সেই সময়েই আমি শিসের শব্দগুলো শুনতে পেয়েছিলাম। জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে আসা তীক্ষ্ণ শব্দগুলো আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল ওরা ছুটে আসছে।

তারপরই যা হয়েছিল সে-কথা মনে পড়লেই ভয়ে আমার শরীরটা ঠান্ডা বরফ হয়ে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায় সেই মুহূর্তেই।

কী করব এখন!

এত বছর পর যখন ছোটবেলার ওই ঘটনাটার কথা ভাবি তখনও যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সেই সন্ধের দৃশ্যটা জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। হিংস্র পশুগুলোর গায়ের বুনো গন্ধ নাকে স্পষ্ট টের পাই।

তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। বয়েস কতই বা হবে! বারো আর তেরোর মাঝামাঝি। শীতের ছুটিতে বড়কদমগাছি বেড়াতে গিয়েছিলাম—আমার বড়মাসির কাছে।

বড়কদমগাছি জায়গাটা রানাঘাট থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে। সেখানে একটা স্কুলে আমার বড়মাসি বাংলার টিচার ছিলেন। আর বড়মেসো জমিজিরেত মাপজোখের কী একটা চাকরি করতেন যেন।

ক্লাস সিক্স থেকেই ডিসেম্বরের শেষে বড়কদমগাছি বেড়াতে যাওয়াটা নিয়মমাফিক শুরু হয়েছিল। বাপি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতেন বড়মাসি আর মেসোর কাছে। বলতেন, ‘শুধুই কি আর খেলাধুলোয় মেতে থাকবি? এই ক’দিনের ছুটিতে তোর মাসির কাছে বাংলাটাও একটু জোরদার করে নে—।’

তো বাংলা জোরদার কতটা করতাম কে জানে! তবে খেলাধুলোর ব্যাপারটায় মোটেও ফাঁকি দিতাম না। আর সেইসঙ্গে মাছ ধরা।

খেলাধুলোর আমার সঙ্গী ছিল রাহুল আর পিংকি। বড়মাসির ছেলে আর মেয়ে।

রাহুল আমার চেয়ে মাসছয়েকের ছোট। আমরা তিনজনের মিলে কী হুড়োহুড়িই না করতাম! আর মাছ ধরার নেশায় আমার মাস্টারমশাই ছিলেন বড়মেসো।

বড়কদমগাছি জায়গাটা গ্রাম হলে কী হবে, ছবির মতো সুন্দর। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। টালির চাল আর টিনের চালের মাটির বাড়িগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে এখানে-ওখানে কতরকমের ছোট-বড় গাছ।

আমরা তিনজনে ঘোর দুপুরে সেইসব গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলতাম, গাছের পেয়ারা, কুল, জারুল পেড়ে ইচ্ছেমতো খেতাম। আর বিকেলে রাহুলের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দল বেঁধে ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠতাম।

সবমিলিয়ে দিনগুলো ছিল দারুণ।

বড়কদমগাছিতে একটিমাত্র নদী ছিল। নাম বউনি। বহুকাল আগে গ্রামের এক নতুন বউ বিয়ের সাজগোজসমেত ওই নদীতে ডুবে মারা যায়। তারপর থেকেই ওই নাম—বউনি। লোকজনের কাছেই শুনেছি, এই সরু নদীটা নাকি চুর্নি নদীতে গিয়ে মিশেছে।

বউনি নদীর এপারে আছে শ্মশান। আর ওপারটায় ঘন জঙ্গল। তাই খুব একটা কেউ নদীর দিকে যায় না। আর যদি বা যায়, তা হলে সন্ধের আগেই ফিরে আসে।

বড়মেসোর ভীষণ মাছ ধরার শখ। ছুটির দিন হলেই মেসো টোপ-বঁড়শি নিয়ে বউনির পাড়ে গিয়ে হাজির। কাপড়ের সাদা টুপি মাথায় দিয়ে নদীর পাড়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর দিনের শেষে ছ'ইঞ্চি কি আট ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একপিস মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

কিন্তু তাতেই দেখেছি মেসোর কী আনন্দ! বঁড়শিতে ধরা মাছ নিয়ে হেঁড়ে গলায় গান গাইতে-গাইতে বাড়ি ফেরেন। তারপর সেই মাছ কী-কী পদ্ধতিতে রান্না করতে হবে তা নিয়ে বড়মাসিকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তখন মাসি আর মেসোয় তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। আর আমি, রাহুল, পিংকি সেই মজার 'আলোচনা'-র নীরব দর্শক।

মেসোর কাছেই শুনেছি ছিপের ইংরেজি 'অ্যাংগল', আর যারা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে তাদের বলে 'অ্যাংলার'।

মেসো আমাকে সবসময় বলতেন, 'বুঝলি, মাছ ধরায় যে কী আনন্দ সেটা নিজে হাতে মাছ না ধরলে কখনও বুঝবি না। এ একটা দারুণ পজিটিভ নেশা। এতে কনসেনট্রেশান বৃদ্ধি পায়।'

সে যাই হোক, মেসোর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি একদিন মেসোর সঙ্গে চলে গেলাম বউনি নদীর তীরে। জায়গাটা স্বপ্নের মতো, তবুও কেন যেন গা-ছমছম করে।

বিশাল কয়েকটা চাষের খেত পেরিয়ে তারপর নদীটার দেখা মেলে। নদীর আঁকাবাঁকা পার ধরে আমি আর মেসো হেঁটে চললাম। এবড়োখেবড়ো জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। শীতের সময় নদীর জল কমে এসেছে। সূর্যের আলোয় বয়ে যাওয়া জলের স্রোত চিকচিক করছে। তারই মধ্যে কয়েক জায়গায় মাছ বুড়বুড়ি কাটছে বলে মনে হল।

নদীর ওপাশে বেশ ঘন জঙ্গল। সেখানে গাঁয়ের কেউ-কেউ কাঠ কাটতে যায়। মেসো বললেন, ওই জঙ্গলে শেয়াল, ভাম, বুনো কুকুর আর ছোটখাটো জন্তুজানোয়ার আছে। ওরা সন্ধের পর বউনি নদীতে জল খেতে আসে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিশাল বটগাছের নীচে আমরা মাছ ধরতে বসলাম। মেসো আমাকে ছিপ, বঁড়শি আর টোপের ব্যাপারে নানান কথা বোঝাচ্ছিলেন। কীভাবে কেঁচোগুলো বঁড়শিতে গাঁথতে হয়, ময়ূরের লেজের পালকের সাদা 'কাঠি'টা দিয়ে কীভাবে

ফাতনা তৈরি করতে হয়, কীভাবে ছিপ বাগিয়ে জলে ভেসে থাকা ফাতনার দিকে নজর রাখতে হয়—এইসব।

আমি হাঁ করে মেসোর কথা গিলছিলাম আর ফাতনার দিকে নজর রাখছিলাম।

হঠাৎই কানে এল 'বলো হরি, হরিবোল' ধ্বনি। মুখ ফিরিয়ে দেখি একদল লোক ওপরের মেঠো পথ ধরে খাটিয়া বয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের কাছ দিয়ে ওরা চলে গেল।

মেসো কপালে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'ওইদিকে আরও খানিকটা এগিয়ে তারপর শ্মশান—' আঙুল তুলে সেদিকটা দেখালেন: 'ওই দিকটায় লোকজন কম যায়...।'

এরই মধ্যে কখন যেন ফাতনা নড়ে উঠেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে 'অ্যাংলার' মেসো ছিপ ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছে।

তখন আমার আনন্দ আর দ্যাখে কে!

কারণ, মেসোর বঁড়শিতে তখন ছটফট করছে ফুটখানেক লম্বা একটা আস্ত রুইমাছ।

সেই মাছটাকে ঘিরে আমার কী উত্তেজনা! বেশ বুঝতে পারছিলাম, নিজের হাতে মাছ 'শিকার' করে বাড়ি ফেরার সময় মেসো কেন আনন্দে টগবগ করে ফুটতে থাকেন, কেন চেঁচিয়ে হেঁড়ে গলায় গান করেন।

এমনসময় জঙ্গলের মধ্যে থেকে হিংস্র গর্জন ভেসে এল।

ছটফট করা মাছটা তখন মেসো নাইলনের থলেতে ঢোকাচ্ছিলেন। থলের মুখটা চেপে ধরে মুখ তুলে নদীর ওপারে নজর দিলেন।

আমিও গর্জনের ব্যাপারটা বোঝার জন্যে জঙ্গলের ওপরে চোখ বোলাতে লাগলাম।

হঠাৎই একপাল কুকুর বেরিয়ে এল গাছপালার আড়াল থেকে। গুনে দেখলাম পাঁচটা। ওরা একটা কুকুরকে তাড়া করে ঘিরে ফেলেছে। কুকুরটার রং হালকা বাদামি আর সাদা। তার ওপরে ছোপগুলো যে রক্তের দাগ সেটা নদীর এপার থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

আমি মেসোকে বললাম, 'ওই কুকুরটা নিশ্চয়ই অন্য এলাকার—তাই ওই কুকুরগুলো ওকে অ্যাটাক করেছে।'

বড়মেসো ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই ভয়ের গলায় বললেন, 'কুকুর নয় রে, বুনো কুকুর। এখানকার মানুষরা ঢোল বলে। দেখছিস না, সবক'টা একইরকম দেখতে—।'

সত্যিই তাই। পাঁচটা বুনো কুকুরই একইরকম দেখতে। গায়ের রং গাঢ় বাদামি। মুখটা ছুঁচলো। লেজটা সাধারণ কুকুরের চেয়ে বেশ মোটাসোটা। আর লেজের ডগায় কালো ছোপ।

এরপর চোখের সামনে যা হল তা দেখা যায় না।

নদীর পাড়ে পাঁচটা কুকুর বাদামি-সাদা কুকুরটাকে ঘিরে ফেলল। তারপর নানান দিক থেকে বেচারা কুকুরটাকে হিংস্র আক্রমণ করতে লাগল। একবার ছুটে গিয়ে এ কামড়ায় তো পরমুহূর্তেই ছুটে গিয়ে আর-একজন কামড় দেয়। একটা তো এক কামড়ে এক চাকা মাংস খুবলে নিল।

আমার চক্রব্যূহে অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে গেল।

বুনো কুকুরগুলোর ধারালো দাঁতের পাটি দেখা যাচ্ছে। শিকারের দিকে প্রখর চোখে তাকিয়ে ওরা অদ্ভুত স্বরে গর্জন করছে।

ওদের ফাঁদে পড়া কুকুরটা তখন মরিয়া। সে-ও হিংস্র গর্জন করে পালটা কামড় দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এরকম অসম লড়াই বেশিক্ষণ চলার কথা নয়—তাই চললও না। কামড়ে-কামড়ে বাদামি-সাদা কুকুরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। বুনো কুকুরগুলোর আক্রমণের বৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। তারপর একসময় পাঁচটা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপরে। ওদের শরীরে কোণঠাসা কুকুরটার শরীর ঢাকা পড়ে গেল। শুধু শোনা যেতে লাগল ওর মরণ আর্তনাদ।

ততক্ষণে পাঁচটা বুনো কুকুর ওদের হিংস্র মহাভোজ শুরু করে দিয়েছে।

হঠাৎই খেয়াল করে দেখি বড়মেসোর চোখে জল। মাছ ধরার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে তিনি বললে, 'শিগগির চল, ফিরে যাই। ওই কুকুরগুলো নদী পার হয়ে এপাশে এলেই বিপদ।'

'ওরা নদী পার হয়ে চলে আসে?' আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, আসে। একে তো সরু নদী—তার ওপর শীতকাল। কতটুকুই বা জল থাকে! তা ছাড়া ওরা সাঁতারে ওস্তাদ। নদী পার হয়ে ওরা শ্মশানের বেওয়ারিশ মড়া খেতে যায়। তবে সাধারণত রাতে যায়—খুব খিদে না পেলে ওরা দিনের বেলা এপারে আসে না।'

আমরা নদীর পাড় ধরে ফিরে যাচ্ছিলাম। তবে আমি বারবার পেছন ফিরে বুনো কুকুরগুলোকে দেখছিলাম। ওরা তখন খিদে মেটাতে ব্যস্ত। একটা বুনো কুকুরকে দেখলাম জল খেতে নদীর কিনারায় নেমে এসেছে। ওর গায়ে এখানে-ওখানে রক্ত লেগে রয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর যখন আমরা একটা ধানখেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন আমি আর থাকতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, 'মেসো, তুমি তখন কাঁদছিলে কেন?'

মেসো চোখের কোণ মুছে হেসে বললেন, 'কাঁদছিলাম? আমি? দূর!'

আমি মেসোর হাতে আবদারের ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ কাঁদছিলে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বলো—তোমাকে বলতেই হবে—।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মেসো নীচু গলায় বললেন, 'আসলে বিলটুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।'

'বিলটু? কে বিলটু?'

'আমার পোষা কুকুর। ও কুকুর নয় রে—আগের জন্মে আমার কেউ ছিল। ও আমাকে এত ভালোবাসত...।' মেসোর চোখের কোণ জলে ভরে গেল আবার।

সবুজ ধানখেতের ওপারে সূর্য ঢলে পড়েছে। টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে গেল ঘোলাটে আকাশে। একটু আগেই যে-দৃশ্যটা মন ভরিয়ে দিচ্ছিল এখন সেটাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। সূর্যের লাল রংটা ওই হতভাগ্য কুকুরটার কথা মনে পড়িয়ে দিল।

চোখ মুছে নিয়ে বড়মেসো আবার বলতে শুরু করলেন।

'শোন, বিলটুর কথা পিংকি আর রাহুলও জানে না। ওদের কখনও বলিনি। তা ছাড়া এসব ওদের জন্মের আগের ব্যাপার তখন তোর বড়মাসি সবে স্কুলের চাকরিতে ঢুকেছে।

‘বিলটুকে আমি নিয়ে এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। তখন ও এই এত্তটুকুন ছিল। কী সুন্দর দেখতে ছিল, জানিস? আর কী সাহস! ক্রস ব্রিডের কুকুরছানা। ভেলভেটের মতো লোম। ছাইরঙের ওপরে এলোমেলো ছোট-ছোট সাদা ছোপ। ওর কথা বলতে গেলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। মানে...।’

‘থাক, তোমাকে তা হলে বলতে হবে না।’

বড়মেসো জেদের গলায় বললেন, ‘না, বলব। তোকে বললে আমার ভেরতটা অনেক হালকা হবে। তা ছাড়া তুই তো নিজের চোখে ঢোলগুলোর কাণ্ড দেখলি। কীরকম নিষ্ঠুরভাবে ওই গোবেচারা কুকুরটাকে শেষ করে দিল। বিলটুকেও ওরা ঠিক এইভাবে খতম করে দিয়েছিল—তবে বিলটু এই কুকুরটার মতো ভিতু ছিল না। ও দলটার সঙ্গে বীরের মতো লড়াই করেছিল। কিন্তু...কিন্তু...শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি।’ কথা বলতে-বলতে মেসোর গলা ধরে এল। একটু সামলে নিয়ে মেসো বললেন, ‘ওর জন্যে আমি আর তোর বড়মাসি কত যে চোখের জল ফেলেছি...।’

আমরা বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। মেসো চোখ মুছে জোর করে হাসলেন। তারপর বললেন, ‘নাঃ, এখন আর না। আজ রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিলটুর ব্যাপারটা তোকে বলব। শুধু তোকে কেন, একইসঙ্গে পিংকি আর রাহুলকেও শোনাব। আমার যত কষ্ট হয় হোক। বিলটুর সাহসের গল্প ওদেরও শোনা দরকার।’

এরপর বড়মেসো অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। এগারো ইঞ্চি লম্বা রুইমাছটা কী-কী মশলাপাতি সহযোগে রান্না হবে তাই নিয়ে বড়মাসির সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিলেন। পিংকি আর রাহুলকে আমি বললাম যে, আজ রাতে খাওয়াদাওয়ার পর মেসো একটা সত্যি ঘটনা শোনাবেন।

ওরা হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিল। বলল, ওদের বাপিকে ওরা ভালো করে চেনে। ওদের বাপি কখনও ওদের সত্যি ঘটনা কিংবা মিথ্যে ঘটনা—কিছুই নাকি শোনাননি।

কিন্তু সে-রাতে বড়মেসো বিলটুর গল্প আমাদের তিনজনকে শোনালেন।

মাছ ধরা আমার ছোটবেলাকার নেশা। বউনি নদীতে আমি মাছ ধরি প্রায় বিশ বছর ধরে। ছিপ, বঁড়শি, টোপ নিয়ে ওই নদীর পাড়ে ধৈর্য ধরে বসাটা আমার বরাবরের অভ্যেস। বিলটুও ধীরে-ধীরে এই অভ্যাসটা রপ্ত করে নিয়েছিল। ও আমার সঙ্গে বলতে গেলে পায়ে-পায়ে ছুটত। তারপর নদীর পাড়ে গিয়ে যখন আমি ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে চুপটি করে বসে থাকতাম তখন ও এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করত। কোনও একটা মাছ ধরে ডাঙায় তুললেই ওর সে কী উত্তেজনা আর লাফালাফি! যেন মাছটা আমি নয়—ও-ই ধরেছে।

এইভাবে বছরখানেকের বেশি কেটে গেল। বিলটু চেহারায় বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। ওকে দেখে নেড়িকুকুররা বেশ সমীহ করে—আর লোকজন বেশ ভয়-টয় পায়।

আমাদের গ্রামে একবার চুরির হিড়িক শুরু হয়েছিল। তখন মাঝরাতে বিলটু হঠাৎই এক চোর ধরে ফেলল। তার পায়ে আর উরুতে ও এমন বাঘা কামড় বসাল যে, একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সে-কথা চাউর হতেই গ্রামে চুরি-টুরি সব বন্ধ।

একদিন সকাল বউনি নদীর তীরে ছিপ ফেলে বসে আছি, হঠাৎই ফাতনা নড়ে উঠল। দেখেশুনে মনে হল, বেশ বড় সাইজের মাছ টোপ গিলেছে। তো আমি সেদিকে মনোযোগ দিয়ে ছিপটাকে খেলাচ্ছি, হঠাৎই কানে এল অদ্ভুত শিসের শব্দ। তারপরই কয়েকটা চাপা গর্জন।

ছিপটা বাগিয়ে ধরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে দেখি কয়েকটা বুনো কুকুর ওপারে দাঁড়িয়ে। বিলটুকে লক্ষ করে ওরা চাপা গোঙানির শব্দ করছে।

আমি বিলটুকে সাবধান করার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। বিলটু ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ঘেউঘেউ করতে লাগল। তারপর আমি কিছু করে ওঠার আগেই ভয়ংকর তেজে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে গেল ওপারে।

আমি ছিপ-বঁড়শি সব ছুড়ে দিয়ে বিলটুকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিলটু ওপারে পৌঁছে গেল। এবং শুরু হয়ে গেল দাঁত-নখের প্রচণ্ড লড়াই। বিলটু ঘুরে-ঘুরে ওঁদের আক্রমণ ঠেকাতে লাগল। শূন্যে বারবার লাফিয়ে শত্রুদের মরণকামড় বসাতে লাগল। কুকুরের লোম উড়তে লাগল শূন্যে।

আমি অসহায়ের মতো এপারে দাঁড়িয়ে বারবার বিলটুর নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আর কিছুক্ষণ লড়াই চললেই বিলটুকে ওরা শেষ করে দেবে।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বিলটু শেষ পর্যন্ত জিতে গেল। বুনো কুকুরগুলো হঠাৎই রণে ভঙ্গ দিল। বিলটুর দূরন্ত আক্রমণের মুখে পড়ে ওরা ভয়ের চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে।

বিলটু ওপার থেকে তাকাল আমার দিকে। ওর সারা গা ক্ষতবিক্ষত। কাঁধ আর গলার কাছ থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে বুনো কুকুরের দল। শরীরের নানা জায়গায় লেপটে আছে রক্তের দাগ। ও জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, ধুঁকছে।

ওই ক্লান্ত অবস্থাতেই আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে বিলটু ঘেউঘেউ করে উঠল। মনে হল, ও যেন বলছে, 'দ্যাখো প্রভু, আমি ওদের হারিয়ে দিয়েছি।'

ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি আকুল হয়ে ওকে এপারে আসার জন্যে ডাকতে লাগলাম।

আমার কথা বিলটু বোধহয় বুঝতে পারল। ও নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে এল এপারে। কিন্তু তারপর আমার কাছে না এসে ও চলে গেল বউনির কিনারায় এক কাদার গর্তে। সেখানে থকথকে কাদার ওপরে শুয়ে পড়ে প্রাণভরে গড়াগাড়ি খেতে লাগল।

গ্রামের বয়স্ক মানুষদের মুখে বহুবার শুনেছি এই কাদার নাকি এক অদ্ভুত গুণ আছে। এই কাদা গায়ে মেখে নিলে কাটাছেঁড়া, ঘা, এসব নাকি চট করে সেরে যায়। জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যায় বা নদীতে যেসব জেলেরা মাছ ধরে তারা কেটে-ছড়ে গেলে এই কাদা গায়ে লেপে নেয়। পোষা গরু-মোষ-ছাগলের জন্যেও তারা এই 'ওষুধ' ব্যবহার করে।

কিন্তু বিলটু কী করে এই কাদার গুণের কথা জেনেছিল তা বলতে পারব না। তবে কাদায় লুটোপুটি খেয়ে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে যখন ও খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন ওর অদ্ভুত চেহারা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম।

ওর কপাল থেকে গলা পর্যন্ত এক লম্বা গভীর ক্ষতচিহ্ন। বুনো কুকুরের নখের টানে বাঁ-দিনের চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। নাকের পাশে মাংস ফাঁক হয়ে গেছে। চোয়ালের নীচে নরম মাংস ফালা-ফালা হয়ে ঝুলছে।

আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললাম। হাঁটুগেড়ে বসে কাদা-মাখা বিলটুকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর চিৎকার করে লোকজনকে ডাকতে লাগলাম।

বিলটু আমার বুকে মুখ লুকিয়ে 'কুঁইকুঁই' করে চাপা আওয়াজ করতে লাগল।

তারপর আমার আর ভালো করে কিছু মনে নেই। পরে জেনেছি, আমার চিৎকার শুনে দু-চারজন চাষি ছুটে এসেছিল। ওরাই আমাকে আর বিলটুকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

না, ওই কাদা বিলটুকে বাঁচাতে পারেনি। আটদিন কষ্ট পাওয়ার পর বিলটু মারা যায়। ওর গায়ের কাটা জায়গাগুলো পেকে ঘা হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছিল।

আমি আর তোদের মা—মানে, তোর বড়মাসি—বিলটুকে ওই বউনি নদীর পাড়েই কবর দিয়ে এসেছিলাম।

তারপর থেকে বউনির তীরে মাছ ধরতে গেলে আমার মনে কষ্ট হয়। কিন্তু একইসঙ্গে মনে হয়, এই বুঝি বিলটুকে দেখতে পাব। আমার ধরা ছটফটে মাছ দেখে ও লেজ নাড়তে-নাড়তে খুশিতে ছুটোছুটি করবে। একবার মাছটার কাছে ছুটে আসবে, আর একবার দূরে ছুটে যাবে।

ওর কথা ভাবি বলেই বউনিতে মাছ ধরার অভ্যেসটা ছাড়তে পারিনি।

বড়মেসোর গল্পটা শুনেছিলাম। প্রথমবারে বড়কদমগাছিতে গিয়ে। শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাহুল আর পিংকিও খুব দুঃখ পেয়েছিল গল্পটা শুনে। ওরা বড়মেসোর কাছে আবদার করল সেই জায়গাটা দেখতে যাবে—যেখানে বিলটু শেষ লড়াই করেছিল। আর একইসঙ্গে ওই কাদার গর্ত আর বিলটুর কবর দেখবে।

বড়মেসো উদাস গলায় বললেন, 'চল, কালই চল। তবে সব কী আর আগের মতন আছে রে!'

পরদিন দুপুরে আমরা তিনজনে বড়মেসোর সঙ্গী হলাম নদীর পাড় ধরে হেঁটে-হেঁটে মেসো জায়গাগুলো আমাদের দেখতে লাগলেন। বিলটুর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আমি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানালাম। যদিও মনে হল, এরকম একজন 'বীর'কে সেলাম জানালেই বোধহয় বেশি মানানসই হত।

কাদার গর্তটাও দেখলাম আমরা। মেসোর কাছেই শুনলাম, জোয়ারের সময় জল জমে গিয়ে এই গর্তটায় কাদা হয়। শীতকালে সেখানে নেমে গাঁয়ের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কাদা ঘেঁটে ল্যাটা মাছ, গেঁড়ি, গুগলি, শামুক—এসব খুঁজে বেড়ায়। এখনও নজরে পড়ল তিনটে ছেলে কাদা হাতড়ে-হাতড়ে সেই কাজ চালাচ্ছে। একজনের গায়ে তো বুক পর্যন্ত কাদার ছোপ। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয়, কাদা রঙের জামা-প্যান্ট পরেছে।

মেসোর সঙ্গে বেশ ক'দিন মাছ ধরতে গিয়ে আমার মধ্যে মাছ ধরার নেশাটা চারিয়ে গেল। মাছ ধরার প্রথমদিন ওরকম একটা বীভৎস দৃশ্যের সাক্ষী হলেও বিলটুর ব্যাপারটা

আমাকে কী করে যেন বউনি নদীর দিকে টেনেছিল। তা ছাড়া মেসোর বলা কথাগুলো ‘দারুণ পজিটিভ নেশা’, ‘কনসেনট্রেশান বৃদ্ধি পায়’ আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল।

অনেকসময় মেসো না গেলেও আমি রাহুল কিংবা পিংকি—অথবা দুজনকেই সঙ্গী করে ছিপ-বঁড়শি নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে বসতাম।

মাছ ধরতে বসে ফাতনার দিকে নজর থাকলেও আমার চোখ মাঝে-মাঝেই ছিটকে যেত জঙ্গলের দিকে। যদি কখনও একটা বুনো কুকুরের ছায়াও দেখি তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ছিপ-টিপ নিয়ে ছুট লাগাব বাড়ির দিকে।

পিংকিটা ছিল রামভিতু। সবসময় রাহুল কিংবা আমার জামা খামচে ধরে বসে থাকত। তবে মাছ ধরার ব্যাপারটা দেখার লোভ ও কিছুতেই ছাড়তে পারত না।

রাহুল তুলনায় বেশ সাহসী। ও আত্মরক্ষার জন্যে একটা পেয়ারা কাঠের গুলতি আর পোড়ামাটির গুলি সবসময় পকেটে রাখত। আমি ছিপ নিয়ে বসলে ও গুলতি বাগিয়ে বসত। আর কখনও যদি ও ছিপ হাতে নিত তা হলে আমাকে পাহারাদারের ভূমিকায় বসাত।

ঘটনাটা ঘটেছিল পরের শীতে—তখন আমি ক্লাস সেভেনে।

দুপুরবেলা নদীতে ছিপ ফেলে বসে আছি। আমার একপাশে পিংকি, আর একপাশে রাহুল।

হঠাৎ ওপারের জঙ্গল থেকে শিসের শব্দ ভেসে এল। আমি চমকে মুখ তুলে তাকালাম। মেসোর কাছেই শুনেছি বুনো কুকুরগুলো শিস দেওয়ার মতন করে অদ্ভুতভাবে ডাকতে পারে। কিন্তু কোনও কুকুর আমার নজরে পড়ল না। তখন আবার ফাতনার দিকে মন দিলাম।

এমনসময় সমু নামে একটা ছেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে রাহুলকে ডাকতে এল। বলল, ভীষণ দরকার। কাল সকালের ট্রেনে পরেশদা নামে একজন কলকাতা যাবে। তার হাত দিয়ে ক্লাবের ক্রিকেট ব্যাটটা কলকাতার দোকান থেকে আনানো হবে। তার চাঁদা তোলার জন্যে সুবিন আর তোতন রাহুলকে এক্ষুনি ডাকছে। ওদের সঙ্গে কথা সারতে দশ-পনেরোমিনিটের বেশি লাগবে না।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে সমুর সঙ্গে রওনা হয়ে গেল।

আমাদের সশস্ত্র পাহারাদার চলে যাওয়াতে পিংকি বেশ ভয় পেয়ে গেল। ও আমার গা ঘেঁষে বসে জামা খামচে ধরল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, ‘কোনও ভয় নেই...।’

কিন্তু আমার কথায় ও খুব একটা ভরসা পেল বলে মনে হল না।

একটু পরেই বেশ কয়েকবার শিসের শব্দ শোনা গেল আবার। ব্যস, তাতেই হয়ে গেল। হঠাৎই পিংকি আমার পাশ থেকে উঠে একেবার দে ছুট।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে ওকে চিৎকার করে ডাকলাম, ফিরে আসার জন্যে বারবার বললাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

রাহুল এক্ষুনি ফিরে আসবে এই ভরসায় আমি ছিপ নিয়ে বসে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল কিন্তু রাহুল ফিরল না। ততক্ষণে আমি একটা চারাপোনা ধরেছি এবং প্রবল উৎসাহে আবার নদীতে ছিপ ফেলেছি।

মাছ ধরার দিকে মনোযোগ দিয়ে মনে-মনে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। চোখ ছিল ফাতনার দিকে, কিন্তু মনে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। রাহুল বা পিংকি যে ফিরে আসেনি সেটা যেমন খেয়াল ছিল না, তেমনই সূর্য যে জঙ্গলের মাথায় হেলে পড়েছে সেটাও নজর করিনি।

জঙ্গল থেকে হিংস্র ডাকগুলো কানে আসতেই আমার ঘোর কাটল। ডাকগুলো বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। একটানে ছিপ তুলে নিলাম নদী থেকে। নাইলনের থলেটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাব, অমনি পাথর হয়ে গেলাম।

কখন যেন ছ'টা বুনো কুকুর পেছন থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। এতই চুপিসাড়ে ওরা কাজটা সেরেছে যে, আমি একটুও টের পাইনি। মনে হয়, ওরা আধপোড়া মড়ার খোঁজে নদী পেরিয়ে শ্মশানের দিকে এসে উঠেছিল। তারপর শিকারের খোঁজে নদীর পাড় ধরে হেঁটে এদিকটায় চলে এসেছে।

কয়েকটা ঢোল শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছিল। আর কয়েকটা হিসহিস শব্দ করছিল। আবার কখনও-বা চাপা গর্জন।

ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। কিন্তু শরীরটা পুরো অবশ হয়ে পড়েনি। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার জন্যে তৈরি হলাম। আমার হাতের অস্ত্র বলতে পলকা একটা ছিপ।

এগিয়ে আসা কুকুরটাকে ছিপের এক ঘা বসিয়ে দিলাম। ওটা 'কেঁউ' শব্দ করে দু-পা পিছিয়ে গেল বটে কিন্তু পাশ থেকে একটা কুকুর সাপের ছোবল মারার ঢঙে আমার ডানপায়ে এক কামড় বসিয়ে দিল।

সেদিকে ঘুরে তাকাতেই বাঁ-দিকে কোমরের কাছটায় একটা কামড় টের পেলাম। প্যান্টের মোটা কাপড় ফুটো করে ধারালো দাঁত বসে গেল শরীরে। আমি যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলাম। ডান পা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। কোনদিক সামলাব আমি? আমাকে ঘিরে হিংস্র কুকুরগুলো যেন ব্যালে নাচছে। একবার ছুটে এসে এ কামড়ায় তো আর-একবার ও কামড় দেয়।

আমি ছিপটাকে এলোপাতাড়ি চালাতে লাগলাম, আর প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু শুকনো গলা দিয়ে যে-স্বর বেরিয়ে এল তা কারও কান পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব নয়।

বুনো কুকুরগুলো আঁচড়ে-কামড়ে আমাকে ঘায়েল করে চলল। নদীর পাড়ে রক্ত ছিটিয়ে পড়তে লাগল এখানে-ওখানে। আমার মাথা টলে গেল। নিজের ভাঙা গলার চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল আমি নয়, অন্য কেউ চিৎকার করছে।

আর সহ্য করতে পারলাম না। অবশ হাত থেকে ছিপ খসে পড়ল। আমিও কাত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। একটা কুকুর আমার বাঁ-পায়ের ডিম থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিল। মনে হল, আমার শরীরে কেউ একটা গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল।

ঠিক তখনই নদীর পাড় ধরে সে উঠে এল।

সর্বাঙ্গে কাদা-মাখা অন্ধকার রঙের এক বিশাল কুকুর। সে বিদ্যুতের মতো ছুটে এল শিকারি কুকুরগুলোর দিকে। হিংস্র চোয়াল আর ধারালো নখ দিয়ে ওদের শরীর ছিন্নভিন্ন করতে লাগল।

বাতাস লোম উড়তে লাগল। দাঁতে দাঁত লাগার খটাখট শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে ছোট-বড় গর্জন।

ছ'জন শত্রুর সঙ্গে একাই লড়তে লাগল সেই অন্ধকার কুকুর। একবার এর ওপর লাফিয়ে পড়ে তো আর-একবার ওর ওপর।

আমি অসাড় শরীরে শুয়ে-শুয়ে সেই আশ্চর্য লড়াই দেখতে লাগলাম। কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসে গেল।

তিনটে বুনো কুকুর পড়ে গেল মাটিতে। আর উঠতে পারল না। বাকি তিনটে প্রাণভয়ে ঝাঁপ দিল নদীতে। তখন দেখি আরও তিনটে বুনো কুকুর নদীর ওপারে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় সঙ্গীদের অবস্থা দেখে ওরা আর লড়াইয়ে সামিল হয়নি।

লড়াই শেষ হলে জিভ বের করে বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল কাদা-মাখা কুকুরটা। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল, অদ্ভুতভাবে তাকাল।

আমি যেন মনে-মনে শুনতে পেলাম, 'দ্যাখো প্রভু, আমি ওদের হারিয়ে দিয়েছি।'

আর তখনই দেখতে পেলাম, ওর কপাল থেকে গলা পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষত। বাঁ-দিকের চোখটা কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। নাকের পাশে মাংস ফাঁক হয়ে গেছে। চোয়ালের নীচে নরম মাংস ফালা-ফালা হয়ে ঝুলছে।

তারপরই কাদা-মাখা কুকুরটা নদীর পাড় বেয়ে নেমে গেল নীচে। আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই শুনতে পেলাম লোকজনের চিৎকার—আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে বড়মেসো আর রাহুলের গলা আমি চিনতে পারলাম।

বোধহয় আমার ভাঙা গলার চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছিল।

চেইন রিয়্যাকশন

'ইয়োর বুকস' কোম্পানিতে আমি লাস্ট এপ্রিলে জয়েন করেছি—ওদের এডিটোরিয়াল গ্রুপে,অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে। সেখানেই রঙ্গিলা শর্মার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

লম্বা, ছিপছিপে, ঝকঝকে মেয়ে রঙ্গিলা। ওর উজ্জ্বল চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি। সে-চোখে নজর পড়লেই মনে হয়, ও সব গোপন কথা জানে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

রঙ্গিলার এমনই টান যে, ওকে দেখলেই সবাই বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। কিন্তু অনেকেই ওর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কারণ, ওর ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধি।

পাবলিশিং ওয়ার্ল্ডে রঙ্গিলা শর্মার নাম সবাই জানে। ও এক অদ্ভুত জাদু জানে—অঙ্কের জাদু। আড়ালে অনেকে বলে, ও সুপারন্যাচারাল ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াস। তবে ম্যাথ বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। রঙ্গিলার ব্যাপারটা সুপারম্যাথ। এই অঙ্কই বই বিক্রির জাদু ওর হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। সিম্পলি ওর জন্যেই 'ইয়োর বুকস' অন্য সব পাবলিশিং কোম্পানিকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। পাবলিশিং-এর দুনিয়ায় রঙ্গিলা শর্মা এককথায় এক ইউনিক আইকন।

'ইয়োর বুকস'-এ চাকরির সুযোগ পাওয়া মানে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। অন্তত আমার কাছে। এর আগে ছোটোমোটা ফিলিম ম্যাগাজিনে সাব-এডিটরের কাজ করেছি। একটা ক্রাইম ম্যাগে সহ-সম্পাদকও ছিলাম। হঠাৎ করে কী খেয়ালে 'ইয়োর বুকস'-এর ইন্টারভিউটা দিয়েছিলাম—লাক ফ্যাক্টর—চাকরিটা গেঁথে গেল। স্বপ্নের চাকরি। কারণ, কোম্পানিটা মাপে বাড়ছে—ওপরে ওঠার স্কোপ অনেক।

'ইয়োর বুকস' লাস্ট দশবছরে যে-ক'টা পেপার-ব্যাক সিরিজ বের করেছে তার সবক'টাই সুপারহিট। কোনওটা ক্লাসিক, কোনওটা ছোটদের, কোনওটা ক্রাইম থ্রিলার, কোনওটা আবার সায়েন্স ফিকশন অ্যাডভেঞ্চার। এই সবক'টা সিরিজ সাকসেসফুল হওয়ার মূলে রঙ্গিলা—আর ওর সুপারম্যাথ। আর তার রেজাল্ট: 'ইয়োর বুকস'-এর টার্নওভার অন্যান্য পাবলিশিং হাউসকে ঈর্ষার নীল করে দেয়—গাঢ় নীল।

'ইয়োর বুকস'-এ জয়েন করার পর তৃতীয় দিনেই রঙ্গিলার মুখোমুখি হলাম।

মাঝারি একটা কাচের ঘরে ওর অফিস। টেবিলে তিনটে টেলিফোন, একটা ল্যাপটপ, হাফডজন নানা রঙের পেন, আর দু-থাক ফাইল।

একতাড়া কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটের ওপরে ঝুঁকে ছিল ও। ওপরের হেডিং দেখে বুঝলাম, ওগুলো সেলস ফিগার। পরে জেনেছি, সেলস ফিগারেই রঙ্গিলার একমাত্র

ইন্টারেস্ট। কারণ, সেলস ফিগারই ওর সুপারম্যাথ অ্যাপ্লিকেশানের র' ডেটা।

আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেছেন বিক্রম ভট্টাচার্য, কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাদের দেখেই ও মুখ তুলে তাকাল। ছোট-ছোট লেন্সের শৌখিন চশমাটা চোখ থেকে নামাল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'আমাদের প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার—রঙ্গিলা শর্মা।' বিক্রম আলাপ করিয়ে দিলেন: 'মিস শর্মা, আমাদের নতুন অ্যাসোসিয়েট এডিটর প্রীতম চৌধুরী।'

চট করে ও হাত বাড়িয়ে দিল। আমরা হাত ঝাঁকালাম। আমি বললাম, 'আপনার নাম অনেক শুনেছি...।'

'তাই?' ও হাসল—ছোট্ট চাপা হাসি। অনেকটা পিঠ চাপড়ানো গোছের।

আমি ওকে দেখছিলাম। চাউনি, শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর ঢং, গলার স্বর—সবকিছু থেকেই ক্ষমতার অদৃশ্য তরঙ্গ ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই তিরিশ বছর বয়েসেই 'ইয়োর বুকস'-এর প্রোডাকশন অ্যান্ড ড্রিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার! হয়তো আর কয়েক বছরের মধ্যেই ও এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর হয়ে ভিপি-তে পৌঁছে যাবে।

বিক্রম তখন মুখে পেশাদার হাসি ফুটিয়ে বলে চলেছেন, 'রঙ্গিলা আমাদের কোম্পানির সুপারব্রেন। ওর ম্যাজিকে আমাদের সেলস ফিগার এক্সপোনেনশিয়ালি বেড়ে চলেছে...।'

কেন জানি না, বারবার 'সেলস ফিগার' কথাটা শুনতে-শুনতে আমার রঙ্গিলার ফিগারের দিকে নজর গেল। সবুজ ছক-কাটা চুড়িদারে ওকে সুন্দর মানিয়েছে। গাঢ় সবুজ ওড়নাটা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই—অনেকটা পাশে সরে আছে। তাই বোঝা গেল, ওর কাঠামো ছিপছিপে হলেও ও বেশ ফলন্ত গাছ। তবে ওর আকর্ষণের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাবধানী শাসন রয়েছে।

সবমিলিয়ে যেটা বুঝলাম, রঙ্গিলা শর্মা আর-পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।

আমার ধারণা যে কতটা সত্যি সেটা বুঝলাম আরও মাস-দেড়েক পর। কারণ, এর মধ্যে রঙ্গিলার সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব হয়েছে। কাজের ফাঁকে সময় পেলেই আমি ওর ঘরে গিয়ে হাজির হই। নতুন-নতুন বইয়ের পাবলিকেশান প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করি। ও চাবুকের মতো সব পরামর্শ দেয়, নানান বুদ্ধি দেয়, ইউনিক সব স্কিমের কথা বলে। তিরিশ বছরের একটা মেয়ের মুখ থেকে এসব শুনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে, ও এক অদ্ভুত টাইপের জিনিয়াস।

ওর এই রহস্য আমাকে টানতে থাকে। কিন্তু ওর ব্যবহার দেখে সেরকম কোনও টান আমি টের পেতাম না।

রঙ্গিলা কোম্পানির প্রোডাকশন আর ডিস্ট্রিবিউশান ছাড়াও সেলস-এর অনেকটাই দেখাশোনা করে। কোন বই কত প্রিন্ট রান দেওয়া হবে, কোন-কোন বই দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালুরু এইসব মেজর সিটির কোথায়-কোথায় কত কপি করে পাঠাতে হবে, কোন টাইটেল-এর আনসোল্ড কপি রিটার্ন নেওয়া হবে—কোনটার হবে না—সবই রঙ্গিলা শর্মা ঠিক করে দেয়। বলতে গেলে কোম্পানিতে রঙ্গিলাই যেন শেষ কথা।

কানাঘুষোয় শুনলাম, এ নিয়ে বিক্রম ভট্টাচার্যের বেশ ক্ষোভ আছে। কিন্তু ভদ্রলোক কাজপাগল পেশাদার মানুষ। কোম্পানির জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। কোম্পানিকে বড় করে তোলার পেছনে ওঁর অনেক অবদান আছে। পনেরো বছর 'ইয়োর বুকস'-এ আছেন। সেখানে রঙ্গিলা শর্মা মাত্র চারবছর।

কিন্তু মামুলি মেধার মানুষ আর জিনিয়াসের মধ্যে এটাই তো ফারাক!

রঙ্গিলা সারাটা দিন ওর কাচের দেওয়াল ঘেরা অফিসে বসে অঙ্ক কষে, ল্যাপটপে ঠকাঠক করে বোতাম টেপে, চোখের চশমাটাকে বারবার ঠেলে নাকের গোড়ায় তোলে। তারপর...সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাসিমুখে ঘরের বাইরে বেরোয়। সারকুলেশান ম্যানেজার আশুতোষ শিভালকরের কাছে গিয়ে বলে, "হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান গোস্ট স্টোরিজ" টাইটেলটা মুম্বাই আউটলেটে দু-হাজার কপি পাঠান। আর কবিতা ভার্গবের "ফেমাস পিপল, ফেমাস ড্রিমস" হায়দ্রাবাদে যত আনসোল্ড কপি আছে—আপনি বলছিলেন বারোশো মতন—ওটা ইমিডিয়েটলি ব্যাঙ্গালুরুতে পাঠিয়ে দিন। ও. কে.?'

'ও. কে.।' শিভালকরের মুখ দেখে বোঝা যায় যে, তিনি খুশি হননি। কিন্তু 'ইয়োর বুকস'-এ এসব ব্যাপারে রঙ্গিলা শর্মাই শেষ কথা।

আর আমি এটাও জানি, শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলাই জিতবে। খুব কম সময়ের মধ্যেই মুম্বই আর ব্যাঙ্গালুরুর পাঠকরা ওই বই দুটোকে শুষে নেবে।

একদিন আমি শিভালকরের ঘরে ছিলাম। আমাদের নতুন তিনটে টাইটেল কেমন বাজার পাচ্ছে সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। কথা শেষ করে উঠতে যাব হঠাৎই রঙ্গিলা ঘরে এসে ওর চমকে দেওয়া তিনটে সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেল।

শিভালকর ব্যাজার মুখে 'থ্যাংকু ইউ' বলল।

রঙ্গিলা ঘরের বাইরে বেরোতেই আমিও বেরিয়ে এলাম। অফিসের করিডরে ওর পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, 'আপনি কি ম্যাজিক জানেন?'

ছোট্ট হেসে একঝলক তাকাল আমার দিকে: 'ম্যাজিক নয়। ম্যাথামেটিক্স। ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান।'

'ইভেন্ট স্পেকুলেশান?'

'হ্যাঁ। টাইম অ্যান্ড স্পেসে দুটো ইভেন্টকে একই কো-অর্ডিনেটে রাখতে পারলে আপনি যা চান তাই হবে। মানে, একটা ছেলে আর একটা মেয়ের দেখা হতে পারে। দুটো গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। একজন পাঠক একটা বই কিনে ফেলতে পারে... ব্যস...সিম্পল।'

'এর নাম সিম্পল?'

কথা বলতে-বলতে আমরা রঙ্গিলার চেম্বারে চলে এলাম।

ও চেয়ারে বসল। আমাকেও বসতে বলল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে সরাসরি তাকাল আমার দিকে: 'দেখুন, ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে সিম্পল নয়, তবে আমাকে লাস্ট পাঁচবছর অনেক কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশান করতে হয়েছে—তারপর ব্যাপারটা আমার কাছে সিম্পল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অন্য কাউকে এক্সপ্লেইন করে বোঝানো বেশ কঠিন। তবে এর এসেন্স হল, ওই যে বললাম, ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান...।'

'এসব তো সায়েন্স ফিকশানের মতো শোনাচ্ছে।'

'মতো কেন? এটা সত্যি-সত্যি সায়েন্স ফিকশান।' ও মুচকি হেসে বলল।

বুঝলাম, এর বেশি ও খুলে বলবে না। আর বলবেই বা কেন? এটা তো ওর স্পেশাল সিক্রেট।

কিন্তু আমার কৌতূহল বেড়েই চলল। রঙ্গিলার মন্ত্রগুপ্তিটা কী? এমন নয় যে, সেটা জেনে আমি আমার প্রমোশনের কাজে লাগাব। তবে কৌতূহলটা সবসময় আমাকে খোঁচাতে লাগল।

কিছুদিন পর আবার একটা ঘটনা ঘটল। রঙ্গিলার সেই সুপারম্যাথের ম্যাজিক। ঠিক জায়গায় ঠিক বইটা ঠিক সময়ে পাঠানো। আমরা প্রায় চারহাজার কপির বোনাস সেল পেলাম। 'ইয়োর বুকস'-এর সি অ্যান্ড এম-ডি আমেরিকা থেকে রঙ্গিলাকে স্পেশাল 'কনগ্র্যাচুলেশানস' নোট পাঠালেন। আমরাও ওকে অভিনন্দন জানালাম। ওর ছোট্ট হাসি দেখে বুঝলাম, এসব সাবাশি নেওয়া ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমাদের অফিসে একটা কফি শপ আছে। কাজের ফাঁকে কিছুটা বাড়তি সময় হাতে পেলে আমি ওখানে গিয়ে বসি। সেদিন রঙ্গিলাকে 'কফি খাওয়াব' বলে কফি শপে নিয়ে গেলাম।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে এ-কথা সে-কথা বলতে-বলতে আমি সেই চারহাজার কপির বোনাস সেলের প্রসঙ্গে গেলাম।

রঙ্গিলা তেরছা চোখে আমার দিকে তাকাল, ঠোঁটে একটুকরো হাসি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিছুই না—সিম্পলি ম্যাথামেটিক্স। আমি জানতাম ওখানে সাতদিনের একটা ন্যাশনাল স্পোর্টস ইভেন্ট আছে। সেটা দেখতে প্রচুর লোক জড়ো হবে—তারা বিন্দাস মুডে থাকবে। যদি সেই সাতটা দিন স্টেডিয়ামের নিয়ারেস্ট বুকশপগুলোতে আমাদের স্পোর্টস টাইটেলগুলো রাখতে পারি তা হলে একটা স্ট্যাগারিং সেল পাওয়া যেতে পারে। তো তাই করলাম সিম্পল।'

এরপর আরও কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে গল্প করলাম বটে কিন্তু আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। ওর সুপারম্যাথ আরও কী-কী করতে পারে ভেবে আমার অবাক লাগছিল।

কয়েকমাসের মধ্যেই অন্যান্যদের মতো রঙ্গিলার ম্যাজিক আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ওর সঙ্গে গল্প-টল্প করলেও এ নিয়ে আর কোনও কথা জিগ্যেস করতাম না। বরং মন দিয়ে নিজের কাজটা করতাম। কোন বই ছাপতে হবে, কোন বই রিপ্রিন্টে পাঠাতে হবে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। 'ইয়োর বুকস' দিনকেদিন আরও ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল।

চাকরিটা আমার ভালোই চলতে লাগল—শুধু বিক্রম ভট্টাচার্যের খবরদারি ছাড়া। আমাদের কোম্পানির মালিক বলবিন্দার নারুলা সারাটা বছর বলতে গেলে আমেরিকাতেই থাকেন। লোকটা যে ঠিক কত টাকার মালিক তা ও নিজেও জানে না। ওর অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে 'ইয়োর বুকস'-এর তুলনা করলে হাতির পাশে মাছিকে রাখতে হবে। তো এই মাছির খবরদারি করার দায়িত্বে রয়েছেন বিগ বস বিক্রম ভট্টাচার্য।

আমাদের অফিসটা পার্ক স্ট্রিটের একটা পুরোনো বিল্ডিং-এর ফোর্থ ফ্লোরে। প্রায় পাঁচহাজার স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে মোটামুটিভাবে সাজানো। রিসেপশানের এনক্লেভটা বড়, আমাদের পাবলিকেশানের নানান বইয়ের কভার দিয়ে সাজানো। তারপর রয়েছে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, ডিস্ট্রিবিউশান সেল, এডিটোরিয়াল গ্রুপ, স্টোর এইসব। এ ছাড়া কোম্পানির কয়েকজন হোমরাচোমরা—যেমন, এডিটর মনোজ বর্মন, সারকুলেশান ম্যানেজার আশুতোষ শিভালকর, রঙ্গিলা শর্মা, এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর কৃপাল সিং আর ভি পি বিক্রম ভট্টাচার্য—যাঁর-যাঁর ঘরে বসেন।

বিক্রম ভট্টাচার্য লোকটা কেমন যেন। চেহারায় বেঁটেখাটো। ময়লা রং। কপালে সবসময় ভাঁজ পড়েই আছে। সুট-টাই পরে অফিসে আসেন। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হয় সুট-টাই ওঁকে একদম মানায় না।

বিক্রমের সঙ্গে কারও তেমন সদ্ভাব নেই। কিন্তু তিন সবসময় গা-জোয়ারি ব্যক্তিত্ব ফলাতে চেষ্টা করেন। লোকে ভয়ে বা ভক্তিতে ওঁর কথা শোনে। রঙ্গিলার সঙ্গে বিক্রমের প্রায়ই খটাখটি লাগে। কিন্তু রঙ্গিলা কোম্পানির কাছে যতই ইমপরট্যান্ট হোক বিক্রম ভট্টাচার্য বলবিন্দারের 'ব্লু আইড বয়'। কারণ, কোম্পানির ছোট অবস্থা থেকে অনেক কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে বিক্রম 'ইয়োর বুকস'-কে ন্যাশনাল ম্যাপে এস্টাবলিশ করেছেন। অ্যানুয়াল অ্যাড্রেসে মিস্টার নারুলা সবসময় বিক্রমের স্যাক্রিফাইসের কথা বলেন। বলেন যে, 'মিস্টার ভট্টাচার্য ছাড়া "ইয়োর বুকস"-কে ভাবা যায় না। হি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দিস ফ্লোটিং ভেসেল—মাই ডিয়ারেস্ট ভেসেল ফর দ্যাট ম্যাটার।'

এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর কৃপাল সিং-এর বয়েস প্রায় সাতষট্টি। প্রায়ই ওঁর অসুখবিসুখ লেগে আছে। মাঝে-মাঝেই ওঁর রিটায়ারমেন্টের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সবাই জানে, কৃপাল সিং-এর জায়গায় রঙ্গিলা যখন-তখন যেতে পারে। তারপরই আর বাকি থাকবে মাত্র একটা ধাপ। বিক্রম ভট্টাচার্যের ভিপি-র চেয়ার। সেই চেয়ারের জন্যে রঙ্গিলার যে আকাঙ্ক্ষা আছে সেটা ওর কথায় মাঝে-মাঝে টের পেতাম। আর বিক্রম ভট্টাচার্য যে বুক পাবলিশিং-এর ব্যাপারটা ভালো বোঝে না সেটা নিয়েও ও কমেন্ট করত। বলত, 'মিস্টার ভট্টাচার্য হলেন এসটিডি এমপ্লয়ি।'

'তার মানে?'

'মানে হল, সার্ভিস টিল ডেথ।' হেসে বলত রঙ্গিলা, 'কবে কে কোম্পানির জন্যে কী স্যাক্রিফাইস করেছে সেটা ভাঙিয়ে দশ-পনেরো বছর চালিয়ে যাওয়াটা বড্ড বাড়াবাড়ি।'

আমি তখন রঙ্গিলাকে লক্ষ করতাম। ওর চোখ ছোট হয়ে এসেছে। দু-ভুরুর মাঝে দু-একটা সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে। ঠোঁটের কোণে অপছন্দের ছাপ।

দু-সপ্তাহ পরপরই বিক্রম স্ট্র্যাটেজি মিটিং ডাকতেন। তখন আমরা সবাই ওঁর চেম্বারে গিয়ে হাজির হতাম। ভিজিটরদের জন্যে সাজানো চারটে চেয়ারে মনোজ বর্মন, আশুতোষ শিভালকর, কৃপাল সিং আর রঙ্গিলা বসে। আর আমরা—স্মল ফ্রাইরা—ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকি।

বিক্রম ওঁর মতো করে পাবলিশিং প্ল্যান, কোম্পানি পলিসি, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এসব নিয়ে কথা বলেন। আমরা বাধ্য ছাত্রের মতো শুনি। তারই মধ্যে খেয়াল করি, রঙ্গিলা ওর চেয়ারে বসে উসখুস করছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কখনও-বা হাই তুলছে।

বিক্রম ভট্টাচার্য কথা বলতে-বলতে এই সিমটগুলো লক্ষ করতেন। বুঝতেন, রঙ্গিলা ওঁর গুরুগম্ভীর কথাবার্তাগুলোকে একফোঁটাও আমল দিচ্ছে না। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে রাগ হলেও বিক্রম সে-রাগ চেপে রাখতেন। কারণ, তিনি জানেন, তিনি কোম্পানির যতই ব্লু আইড বয় হোন না কেন, রঙ্গিলার চোখের মণিও কম নীল নয়। রঙ্গিলাকে তাড়ানোর ক্ষমতা বিক্রমের নেই। কারণ, কোম্পানিতে রঙ্গিলার যে-কোনও কথাই বেদবাক্য। ওর কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কারও নেই।

আমরা সবাই জানতাম, বিক্রম রঙ্গিলার কোনও একটা ভুলের জন্যে তক্কে-তক্কে আছেন। ছোট বা বড়—যে-কোনও একটা ভুল। তা হলেই বিক্রম ওকে ছেঁটে ফেলতে পারবেন। কিন্তু ওঁর কপাল খারাপ। কোম্পানির সেলস ফিগার দিন-দিন বেড়েই চলেছে

আর রঙ্গিলাও কাগজ-পেন নিয়ে আর ল্যাপটপে খটাখট বোতাম টিপে ওর 'ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান'-এর ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, আমাদের কোনও টাইটেল দশহাজার কপি বিক্রি হওয়ার মানে হল আমাদের চোখে সেটা 'অ্যাভারেজ সেল'।

রঙ্গিলা আচমকা তিনটে কি চারটে হার্ড কভার বই সিলেক্ট করে কৃপাল সিং আর বিক্রম ভট্টাচার্যকে বলত সেই বইগুলোর পেপারব্যাক এডিশান বের করতে। আমরা এডিটোরিয়াল গ্রুপ থেকে স্টাডি করে দেখতাম যে, বইগুলোর তেমন পোটেনশিয়াল নেই। কিন্তু রঙ্গিলা সেগুলো ছাপার জন্যে ঝুলোঝুলি করত। বিক্রম ভট্টাচার্য যখন ওকে বোঝাতেন যে, বইগুলো হার্ড কভারে খুব কম বিক্রি হয়েছে তখন রঙ্গিলা বলত, 'তার মানেই তো, স্যার, বইগুলো বেশি লোক পড়েনি। পেপারব্যাক এডিশান বেরোলে পড়বে। এগুলোর পেপারব্যাক এডিশান রাইট আমাদের ইমিডিয়েটলি কেনা উচিত। আই হোপ নাউ ইউ এগ্রি, স্যার...।'

আমরা পেপারব্যাক এডিশান বের করার পর বইগুলো মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হত। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলার সুপারম্যাথই জিতত।

চাকরির স্তরবিচারে আমার আর রঙ্গিলার মধ্যে দূরত্ব থাকলেও আমরা একবছরের মধ্যেই ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। আর কৃপাল সিং-ও বয়েস আর অসুখের চাপে রিটায়ার করলেন। আমরা সবাই ভাবলাম, এইবার রঙ্গিলা শর্মাকে নিশ্চয়ই এক্সিকিউটিভ ডায়রেক্টর করা হবে। কিন্তু আমাদের হিসেব মিলল না। কৃপাল সিং-এর স্লটটা বলবিন্দার নারুলা খালিই রেখে দিলেন। তখন নতুন একটা কানাঘুষো শুরু হল। নিজেদের মধ্যে অনেকে বলাবলি করতে লাগল যে, বিক্রম ভট্টাচার্যের চেয়ারটা খালিই হলেই রঙ্গিলা এ-কোম্পানির ভিপি হয়ে বসবে। কিন্তু বিক্রম ভট্টাচার্যের চেয়ারটা কীভাবে খালি হবে সেটা কেউ বলতে পারল না।

একদিন সন্ধের পর অফিসের কফি শপে বসে আমি আর রঙ্গিলা স্যান্ডউইচ আর কফি খাচ্ছিলাম। কথায়-কথায় আবার সুপারম্যাথের কথা উঠল।

এখন রঙ্গিলার সঙ্গে আমার রিলেশানটা এমনই যে, 'আপনি-আপনি'-র বদলে আমরা 'তুমি-তুমি' করে কথা বলি। তা ছাড়া 'ইয়োর বুকস'-এ আমার চাকরিও বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। তাই পুরোনো কৌতূহলটা আবার মাথাচাড়া দিল। ফস করে বলে ফেললাম, 'রঙ্গিলা, একটা সত্যি কথা বলব?'

'কী, বলো?' কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে ও চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

'তোমার সিক্রেটটা আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।'

ও হাসল। বলল, 'প্রীতম, এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছে, আমাদের অফিসে শকুন বেশি, মুনিয়া কম। ইউ আর ডিফরেন্ট—তাই আজ তোমাকে বলছি। বাট ইউ শুড কিপ ইট আ সিক্রেট।'

'প্রমিস—।'

'ওয়েল, অঙ্কটা হচ্ছে নানান ইভেন্টের পারসেন্টেজের খেলা। লাস্ট পাঁচবছর ধরে এই অঙ্কটা নিয়েই আমি লড়ে গেছি। স্রেফ অঙ্ক কষে দুটো জিনিসকে এক জায়গায় মিট করানো যায়। মানে, একটা পারটিকুলার টাইমে একটা পারটিকুলার জায়গায় দুটো অবজেক্ট এসে মিট করবে। এটা করতে হলে সেই অবজেক্ট দুটো সম্পর্কে প্রচুর ডেটা

থাকতে হবে—আর যে-কোনও একটার ওপর তোমার ইনাফ কন্ট্রোল থাকতে হবে। আই মিন, টু সাম এক্সটেন্ট তুমি তার মুভমেন্ট, অ্যাক্টিভিটি—এসব কন্ট্রোল করতে পারবে। অঙ্ক কষে আমি যেটা করি, ইভেন্ট স্পেকুলেশান। দুটো সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টসকে দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে স্টাডি করে একই জায়গায় নিয়ে এসে স্রেফ মিট করিয়ে দেওয়া। ব্যস—।'

ব্যাপারটা আমার ম্যাজিকের চেয়েও কিছু বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ওকে কিছু বললাম না।

ও বলে চলল, 'আর বই বিক্রির ব্যাপারে আমি যেটা করি সেটা হল, সাপ্লাই আর ডিমান্ডকে মিট করিয়ে দেওয়া। ঠিক যে-জায়গায় ডিমান্ড ডেভেলাপ করেছে আমি ঠিক সেই স্পটে বই পাঠিয়ে দিই। ব্যস—লোকে বই কেনে। ইটস দ্যাট সিম্পল।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ধুস, আরও গুলিয়ে গেল'। তারপর শব্দ করে কফির কাপে চুমুক দিলাম। স্যান্ডউইচে একটা কামড় বসালাম।

রঙ্গিলা আমাকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল: 'লুক, সাপোজ মুম্বইতে আমাদের হরার সিরিজের তিনটে টাইটেল নেক্সট থার্সডেতে তিনশোজন পাঠক কিনতে চাইবে। তখন আমি সেই বইটা মঙ্গলবারের মধ্যে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। তখন সাপ্লাই আর ডিমান্ড মিট করে যায়। আমার ইকুয়েশানগুলো সলভ করেই সব উত্তর আমি পেয়ে যাই। যখন কোনও খদ্দেরের একটা বই কেনার ইচ্ছে চাগিয়ে ওঠে ঠিক তখনই সেই পারটিকুলার বইটা আমি তার হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।'

স্যান্ডউইচ চিবোতে-চিবোতে ও কফি শপের কাচের জানলার দিকে তাকাল। একটু আনমনা গলায় বলল, 'শুধু বই কেন, যে-কোনও দুটো অবজেক্ট নিয়ে আমি এরকম করতে পারি—অবশ্য, তাদের প্রচুর ডেটা আমার হাতে থাকা দরকার।'

'তো তুমি হঠাৎ বইয়ের লাইনে এলে কেন? পাবলিশিং ইজ নট দ্যাট অ্যাট্রাকটিভ।'

'টু মি, ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাট্রাকটিভ।' হেসে বলল রঙ্গিলা, 'আমি পাবলিশিং ট্রেডকে ইনডাস্ট্রিতে কনভার্ট করতে চাই। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। পাবলিশিং বিজনেসের মেইন ড্রব্যাকটা কোথায় জানো? যখন একজন পাঠকের একটা বই কেনার ঝোঁক চাপছে তখন সেই বইটা সে হাতের কাছে পায় না। পরে যখন বইটা সে হাতের নাগালে পাচ্ছে তখন কিন্তু বইটা কেনার ঝোঁক কমে গেছে। অ্যাজ আ রেজাল্ট বইটা সে আর কিনছে না। সো ইউ গেট নো সেল। কিন্তু...।' আমার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রঙ্গিলা। কফিতে ঠোঁট ছোঁয়াল! তারপর বলল, 'কিন্তু যদি সেই পাঠকের বই কিনতে চাওয়ার ইমপালসের মোমেন্টে তুমি বইটা তার হাতের কাছে পৌঁছে দিতে পারো তো কেল্লা ফতে—ইউ গেট আ সেল।'

'বই ছাড়াও অন্য ইভেন্ট নিয়ে এরকম অঙ্ক তুমি করতে পারো?'

আমি ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম। রঙ্গিলা এসব বলছে কী! আজ ও খুব ক্যান্ডিড মুডে আছে। ওর সিক্রেট রুমের দরজা খুলে দিচ্ছে ধীরে-ধীরে। আর আমিও অন্ধকার ঘরটার ভেতরে উঁকি-ঝুঁকি মারার চেষ্টা করছি।

কফি শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। তারপর নীচু গলায় বলল, 'অন্য ইভেন্ট নিয়ে এরকম করতে পারি কিনা? হ্যাঁ, পারি। কখনও ভেবে দেখেছ, যখন কোনও লোক গাড়িতে ধাক্কা খায় তখন একই জায়গায় ঠিক একই সময়ে দুটো অবজেক্ট এসে মিট

করে? এই অবজেক্ট দুটো কিন্তু নানান চেইন অফ ইভেন্টস-এর মধ্যে দিয়ে এসে ওই পারটিকুলার মোমেন্টে মিট করেছে—যাকে আমরা বলি অ্যাক্সিডেন্ট। তা হলে ভেবে দ্যাখো, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ঘটনা—যাদের একটার সঙ্গে আর-একটার কোনও কানেকশান নেই—কীভাবে এসে মিট করে! একটা ইভেন্ট চেইন কীভাবে আর একটা ইভেন্ট চেইনকে ইন্টারসেক্ট করে!'

'এরকম কোনও ইভেন্ট চেইনকে তুমি কি সত্যিই কন্ট্রোল করতে পারো?'

'কিছু-কিছু পারি।' ঠোঁট টিপে হাসল রঙ্গিলা: 'আমি ক্যালকুলেট করতে পারি। ইভেন্ট স্পেকুলেশানের ম্যাথ অ্যাপ্লাই করতে পারি। সেসব করে ইভেন্ট চেইনের কয়েকটা টুকরোকে ম্যানিপুলেট করতে পারি। একজন পাঠক আর একটা বইকে একজায়গায় নিয়ে আসতে পারি। একটা গাড়ি আর একজন রাস্তা-পার হওয়া মানুষকে ধাক্কা লাগাতে পারি। ইয়েস আই ক্যান।'

ওর মুখের সিরিয়াস ভাব দেখে আমি হেসে ফেললাম: 'রঙ্গিলা, এবার ব্যাপারটা সায়েন্স ফিকশানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে কিন্তু! তার মানে, তুমি বলছ বহু ঘটনার ভবিতব্য তোমার হাতে?'

'ভবিতব্য মানে?' রঙ্গিলা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল।

'ডেসটিনি। আই মিন, ইউ থিংক ইউ ক্যান কন্ট্রোল ডেসটিনি?'

আমার প্রশ্নটায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া থাকলেও রঙ্গিলা সেটাকে আমল দিল না। ও সিরিয়াস মুখে বলল, 'হ্যাঁ, প্রীতম, ডেসটিনি আমি কন্ট্রোল করতে পারি—খানিকটা অন্তত পারি।'

এ নিয়ে কথাবার্তা সেখানেই শেষ হয়েছিল। তারপর কাজের চাপে ব্যাপারটা মন থেকে সরে গেল। নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ লঞ্চ করার প্ল্যানিং নিয়ে আমাদের এডিটোরিয়াল গ্রুপ মেতে উঠল। আমি আর মনোজ বর্মন ঘনঘন মিটিং করতে লাগলাম। কলকাতা বুক ফেয়ার কাছাকাছি এসে গেল। প্রতি বছরের মতো 'ইয়োর বুকস'-এ সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

সেইসময় একদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ রঙ্গিলা আর বিক্রম ভট্টাচার্যের তুমুল খটাখটি লাগল। রঙ্গিলা চারটে আউট অফ প্রিন্ট পেপারব্যাক রিপ্রিন্টের জন্যে প্রোডাকশনের পাইপলাইনে দিয়েছিল, কিন্তু বিক্রম সেগুলো নাকচ করে দিয়েছেন।

রঙ্গিলা বেশ জোরালো গলায় বলল, 'আমার সিক্সথ সেন্স বলছে বুক ফেয়ারে এই বইগুলোর এক-একটা দু-হাজার করে বিক্রি হবে। সেইজন্যেই আমি পাইপলাইনে ওগুলো দিয়েছি।'

'সরি, রঙ্গিলা। দিস টাইম আই উড গো বাই মাই সিক্সথ সেন্স। বইমেলায় নতুন টাইটেল হল টপ প্রায়োরিটি। অন্তত আমার কাছে। সো—।'

'এই চারটে টাইটেল হল হাই পোটেনশিয়াল মেটিরিয়াল—নতুন টাইটেলের চেয়ে কিছু কম নয়।'

'সো ইউ থিঙ্ক।' বিক্রম ভট্টাচার্যের গলা সামান্য উঁচু হল।

ওঁর ঘরের বাইরে তখন আমাদের কয়েকজনের ভিড়। আমরা ভাবছি, জল কোনদিকে গড়ায়।

‘আমি তা হলে সি অ্যান্ড এম-ডি-কে ব্যাপারটা জানাচ্ছি।’ থমথমে গলায় বলল রঙ্গিলা।

‘অফ কোর্স জানান। আই উড লাভ দ্যাট। অ্যাজ পার দ্য রুলস অফ দ্য কোম্পানি এক্সক্লুডিং সি অ্যান্ড এম-ডি দ্য ভিপি অলওয়েজ হ্যাজ দ্য ফাইনাল সে। এক্সক্লুডিং সি অ্যান্ড এম-ডি অ্যান্ড আই অ্যাম স্টিল দ্য ভিপি হিয়ার। ইউ হ্যাভন্ট গট মাই জব ইয়েট। আমি আটমোস্ট ট্রাই করব যাতে এই কোম্পানিতে আপনি সবসময় ভিপি-র চেয়ারের নীচেই থাকেন। ও. কে., নাউ ইউ ক্যান বেগ ইয়োর লিভ, ম্যাম’। এই কথা বলে বিক্রম ওঁর চেম্বারের কাচের দরজা খুলে ধরলেন।

গলা ধাক্কা দেওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

রঙ্গিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এর। ওর মুখে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভাব। দেখে বোঝাই যায় না, একটু আগেই বিক্রম ভট্টাচার্য ওর ইগোতে হিংস্র কামড় বসিয়েছেন।

আমি ভাবলাম, এইবার বোধহয় কোম্পানিতে উথালপাথাল শুরু হবে, কলকাতা বইমেলার আগে একটা বোম-টোম কিছু ফাটবে।

কিন্তু কিছুই হল না।

এতে আমি যেমন অবাক হলাম, অফিসের আরও অনেকে অবাক হল। রঙ্গিলার বন্ধু হিসেবে অনেকে আমার কাছে ‘গোপন খবর’ শুনতে চাইল। কিন্তু আমি ছাই কিছু জানলে তো জানাব!

বিক্রম ভট্টাচার্যের সঙ্গে ক্ল্যাশের দশ-বারোদিন পর একদিন অফিসের কাজে রঙ্গিলার চেম্বারে ঢুকেছি, দেখি ও ঘরের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ওর হাতে একটা ছোট নোটবই আর পেন। মাঝে-মাঝে কীসব লিখছে।

‘কী করছ?’ আমি জিগ্যেস করলাম।

রঙ্গিলা ওর কাজে এতই বিভোর যে, কোনও উত্তর দিল না।

কিন্তু ততক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি, ও কী করছে।

রঙ্গিলা পার্ক স্ট্রিট আর মিডলটন স্ট্রিটের ক্রসিং-এর ট্র্যাফিক খুঁটিয়ে দেখছে। ক’টা গাড়ি যাতায়াত করছে তার হিসেব টুকে নিচ্ছে।

এরপর আরও কয়েকদিন ওকে একই অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। জানলা দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের গাড়ি চলাচল দেখছে, নোট নিচ্ছে, আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। তারপর সেই নোটবই থেকে প্রচুর ডেটা নিয়ে ল্যাপটপে যে বোতাম টিপে ঢোকাচ্ছে সেটাও লক্ষ করলাম।

রঙ্গিলা বিক্রমের ওপরেও নজর রাখতে লাগল। কখন তিনি অফিসে আসেন, কখন বেরোন, কখন লাঞ্চ সারেন, সবই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বিক্রম ভট্টাচার্য এমনিতে খুব ডিসিপ্লিনড আর পাংচুয়াল মানুষ। রোজ ঠিক পাঁচটায় তিনি অফিস থেকে বেরোন। এলিভেটরের জন্য লাইনে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যান। তারপর অফিস-বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট ক্রস করেন। তারপর মিডলটন স্ট্রিটে বাঁক নিয়ে নিজের লাল রঙের ইন্ডিকা গাড়িতে ওঠেন। গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়ি যান।

আমার মাথার মধ্যে 'ম্যাথামেটিক্স অফ ইভেন্ট স্পেকুলেশান'-এর গল্প ঘোরাফেরা করতে লাগল। আমি জোর করে ওইসব আজগুবি রাবিশকে মাথা থেকে তাড়ালাম। ধুস, যতসব ফালতু ব্যাপার!

একদিন—সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার—পাঁচটা বাজতে পাঁচমিনিট নাগাদ বিক্রম যখন ওঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে চটপটে পা ফেলে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন রঙ্গিলা ওঁকে ডাকল।

'স্যার—।'

বিক্রম থমকে দাঁড়ালেন। চোখে প্রশ্ন।

রঙ্গিলা তড়িঘড়ি ওঁর কাছে এগিয়ে গেল। তারপর নর্থ ইন্ডিয়া রিজিয়ানে আমাদের হোলসেল বিজনেস নিয়ে এলোমেলো কথা বলতে লাগল।

বিক্রম ভুরু কুঁচকে একবার নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন। তারপর শুধুমাত্র রঙ্গিলা শর্মা বলেই ওর কথা শুনতে লাগলেন।

আমি অফিসের ওয়াল ক্লকের দিকে নজর দিলাম। ওঁরা তখনও কথা বলছে। লক্ষ করলাম, রঙ্গিলাও আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পার হওয়ামাত্রই রঙ্গিলা হঠাৎ করে 'থ্যাংক ইউ, স্যার' বলে কথাবার্তায় আচমকা ইতি টানল। তারপর অনেকটা অশোভনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের চেম্বারের দিকে রওনা দিল।

বিক্রম ভট্টাচার্যও তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

আমি কী ভেবে রাস্তার দিকের একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীচে ব্যস্ত পার্ক স্ট্রিট।

একটা ঠান্ডা চোরা স্রোত আমার শরীরের ভেতরে বইতে শুরু করল। ভাবলাম, বিক্রমকে ডেকে সাবধান করি। কিন্তু কীসের জন্যে সাবধান করি। কিন্তু কীসের জন্যে সাবধান করব? আমাকে পালটা ওঁর ধমক খেতে হবে।

দেখলাম, বিক্রম ভট্টাচার্য অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর প্রথম সুযোগেই রাস্তা পার হতে শুরু করলেন।

রাস্তার মাঝবরাবর আসতেই একটা ট্যাক্সি পাগলের মতো ছুটে এসে বিক্রমকে ধাক্কা মারল। ওঁর শরীরটা শূন্যে ছিটকে গেল। তারপর...।

এরপর একমাস কেটে গেলেও আমার মন থেকে চোরা অস্বস্তিটা গেল না। বিক্রম অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর রঙ্গিলা শর্মা এখন আমাদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ভিপির চেয়ারে গেলেও আমার সঙ্গে ও 'তুমি-তুমি'-র বন্ধুত্বই বজায় রেখেছে। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দেখে অনেক সহকর্মীই আমাকে এখন পিঠ চাপড়ায়, আওয়াজ দেয়। আমিও বুঝতে পারি, রঙ্গিলার সঙ্গে আমার রিলেশানটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। এরপর যদি একদিন আমাদের বিয়ে হয়, তারপর...।

তারপর আমাকে এই ভেবে সারাটা জীবন কাটাতে হবে যে, কবে ও আমাকে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে আমার সঙ্গে ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কথা বলবে, দেরি করিয়ে দেবে। তারপর...।

ওই পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের ভয়েই আমি 'ইয়োর বুকস'-এর চাকরি ছেড়ে দিলাম।

নীল রঙের মশারি

এ ঘটনা কাউকে কখনও বলিনি। কিন্তু এই পাঁচবছর ধরে ব্যাপারটা বুকে চেপে রেখে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। যদি যাই, তা হলে এ ঘটনা আর কেউ কখনও জানতে পারবে না। আর আমিও আপনাদের কাছে বিচার চাইতে পারব না। বলতে পারব না, 'সব তো শুনলেন। এবারে আপনারই বলুন, আমি কোনও অন্যায় করেছি কি না। আমার বন্ধু রোহনকে আমি সত্যি-সত্যিই খুন করেছি কি না। ওকে আমি...।'

নাঃ, আর পারছি না। কেন যেন মনে হচ্ছে, এটাই আমার শেষ সুযোগ। এখন এ কাহিনি না শোনালে পরে আর কখনও—।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল একটা নীল রঙের মশারি দিয়ে। সস্তায় এই মশারিটা আমি কিনতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাও আমার জন্যে নয়—রোহনের জন্যে। রোহনের চামড়া নাকি প্রজাপতির মতো নরম-সরম। আর আমারটা নাকি গন্ডারের। তাই মশার কামড় আমি গায়ে না মাখলেও রোহন সেটা একেবারে সহ্য করতে পারে না।

চিড়িয়ামোড়ের কাছাকাছি একটা পুরোনো বাড়িতে দুটো ছোট-ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে আমি থাকি। ভাড়া নিয়েছিলাম সেই ছাত্রজীবনে—আর এখন চাকরিজীবনে পৌঁছে গেছি। তাই আজকের আগুন বাজারেও ভাড়াটা বেশ কমসমই রয়ে গেছে।

আমার ঘর দুটো পাশাপাশি, দোতলায়। বহুদিন ধরে ওদের দেওয়ালে রং পড়েনি। জায়গায়-জায়গায় নোনা ধরে পলেস্তারা ফেঁপে গেছে।

দুটো ঘরেরই পেছনদিকের দেওয়ালে লোহার গরাদ বসানো একজোড়া ছোট-ছোট জানলা। জানলা দিয়ে তাকালে ফ্রি-তে প্রকৃতি দেখা যায়।

প্রকৃতি বলতে একটা বিশাল পুকুর—তার বেশিরভাগটাই শ্যাওলার সবুজ গুঁড়োয় ঢাকা। তার পাড়ে বড়-বড় নারকোল গাছ—সবসময়েই বাতাসে মাথা নাড়ছে। এ ছাড়া আমার ঘরের খুব কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড আমগাছ। গরমের সময়ে ছেলেছোকরারা তার ডালে-ডালে হনুমানের মতো দাপাদাপি করে।

গাছগুলোর আশপাশ দিয়ে তাকালে আকাশ দেখতে পাই। আর বেশ কয়েকটা রঙিন পাখি রোজ ফ্রি-তে দেখা দেয়।

আমার ঘরজোড়ায় মশা আছে বটে তবে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তা ছাড়া ওরা তো ওই ফ্রি প্রকৃতিরই একটা পার্ট!

আমার বাপি মাঝে-মাঝে কলকাতায় কাজে এলে আমার কাছেই থাকে। মশার কামড় খেয়ে দু-চারবার আমার কাছে কমপ্লেইন করেছে বটে, কিন্তু আমি তেমন গা করিনি। আবার দেড়শো-দুশো টাকা খরচ করব! বাপিকে বুঝিয়েছি, 'এক-দুটো রাতের তো ব্যাপার! কয়েল জ্বেলে চাদর মুড়ি দিয়ে ম্যানেজ করে নাও।'

কিন্তু রোহন অন্য জিনিস। ও ম্যানেজ করতে নারাজ। ও শিলিগুড়ির কোন একটা ফার্মে ঢুকেছে। সেখান থেকে অডিটের কাজে প্রায়ই ওকে কলকাতায় পাঠায়। আর এসে ও আমার আস্তানাতেই ওঠে। তারপর কাজ মিটে গেলে কেটে পড়ে।

আমার দু-ঘরে দুটো সস্তার তক্তাপোশ আছে। তার ওপরে বিছানা-বিছানা ভাবওয়ালা যে-লেয়ার দুটি পাতা আছে তাকে টোস্টে মাখানো মাখনের লেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে থিকনেস ওই মাখনের মতো হলেও সফটনেস তার মতো নয়। এ নিয়েও রোহনের কাছে আমাকে কথা শুনতে হয়। সত্যিই, ও খলিফা জিনিস!

তো ওর উৎপাতেই মশারিটা কিনেছিলাম এবং দামটা শেয়ার করার জন্যে ও জোর করে একশোটা টাকাও আমার হাতে আগাম গুঁজে দিয়েছিল।

মশারিটা শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের একটা দোকান থেকে কিনেছিলাম। দোকানে অনেক মশারি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বিরক্ত এবং ক্লান্ত দোকানদার তার কোনও গুপ্ত কোটর থেকে এই নীল রঙের মশারিটা বের করে নিয়ে আসেন।

মশারিটার রং বেশ উজ্জ্বল নীল। সাধারণত এই রঙের মশারি চোখে পড়ে না। আর তার কাপড়টাও দারুণ—রেশম-রেশম ভাব।

ভাবছিলাম দাম বোধহয় অনেক হবে। কিন্তু দোকানদার ভদ্রলোক, কী জানি কেন, মাত্র একশো পঁচিশ টাকায় ওটা আমাকে গছিয়ে দিলেন। বললেন, 'এরকম জিনিস আর পাবেন না। কম দামে কেনা, তাই মিনিমাম লাভে ছেড়ে দিলাম—।'

তো ওই মিনিমাম লাভে কেনা মশারিটা থেকেই ম্যাক্সিমাম গোলমালের শুরু।

প্রথম রাতে কোনও প্রবলেম হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে ব্যাপারস্যাপার দাঁড়াল অন্যরকম।

রাতে কোনও একসময় ঘুম ভেঙে গেল। বাথরুম যেতে হবে। আমাদের এজমালি বাথরুম একতলায়। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সরু করিডর ধরে ঘুমচোখে পা ফেলে এগোচ্ছি, নজরে পড়ল আমার পাশের ঘরটার দরজার একটা পাল্লা খোলা।

ঘুম চটকে গেল পলকে। রাতে আমি ঘরটায় তালা দিই না, তবে বাইরে থেকে দরজা টেনে হাঁসকল লাগিয়ে দিই। কিন্তু সেটা তো নিজে থেকে আর খুলতে পারে না!

তা হলে কি চোর ঢুকল ঘরে?

কিন্তু ঘরে তো চুরি করার মতো বিশেষ কিছু নেই। তা ছাড়া এই বাড়িটার দোতলায় আমি একা থাকলেও একতলায় চারঘর ভাড়াটে রয়েছে। দোতলায় কাউকে আসতে হলে সেই ঘরগুলো পেরিয়ে আসতে হবে। সেটা চোরছ্যাঁচোড়ের পক্ষে যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার। তাই আমার দোতলাটা সবসময়েই নিরিবিলি এবং নিরাপদ।

এ বাড়ির করিডর বা সিঁড়িতে কোনও আলো নেই। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। রাস্তার লাইট বা অন্যান্য ঘর থেকে ছিটকে আসা আলোয় দিব্যি কাজ চলে যায়। আর আকাশে চাঁদ থাকলে খানিকটা বাড়তি সুবিধে পাওয়া যায়। তা ছাড়া

এতবছর এ বাড়িতে থেকে এর করিডর বা সিঁড়ির প্রতিটি ভাঁজ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তাই রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় কোনওকালেই আমি টর্চ ব্যবহার করি না।

প্রথমে ভাবলাম, চিৎকার করে লোক জড়ো করি। কিন্তু তার পরই মনে হল, এ-পাড়ার চুরি-টুরির সেরকম ট্রাডিশান নেই। শেষে যদি দেখা যায় চোর-টোর কিছু নয়, তা হলে ব্যাপারটা বিতিকিচ্ছিরি হাস্যকর এপিসোড হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং একটিবার দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি।

পা টিপে-টিপে দরজার খুব কাছে এগিয়ে গেলাম। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খোলা পাল্লা দিয়ে উঁকি মারলাম ঘরের ভেতরে। এবং যা দেখলাম তাতে ব্যাপার স্যাপার আমার পছন্দ হল না।

প্রথম কথা, সিলিংফ্যান ঘোরার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। আর দেখলাম, ঘরের জানলা দুটো খোলা। খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার গাছের ডালপালা আর খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাইরের বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

অথচ রোজ রাতে আমি ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে জানলা দুটো নিজের হাতে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করি। কাল রাতেও করেছি।

জানলা দুটো এমন হাট করে খুলল কে? আশ্চর্য! কোনও চোর নিশ্চয়ই এ কাজ করবে না!

মশারিটা কে যেন দড়ি দিয়ে তক্তাপোশের ওপরে দিব্যি টাঙিয়ে দিয়েছে। আর মশারির ধারগুলো পরিপাটি করে পাতলা তোশকের নীচে গুঁজে দিয়েছে। জানলা দিয়ে ছুটে আসা বাতাস আর সিলিংফ্যানের হাওয়ার মশারির নীল কাপড়ে তিরতিরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

মশারিটা আমি মোটেই টাঙাইনি। ওটা ভাঁজ করে ঘরের একপাশে দাঁড় করানো একটা ছোট টেবিলে রেখেছিলাম। তা হলে...।

খুব দ্রুত চিন্তা করছিলাম। যুক্তি দিয়ে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম। তাতে যেটা মনে হল, নিশ্চয়ই বাপি কিংবা রোহন কাল গভীর রাতে আচমকা এ-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। নীচের ভাড়াটেরা ওদের চেনে—তাই দোতলায় উঠে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তারপর আমাকে অযথা ডেকে ঘুম না ভাঙিয়ে চুপচাপ তক্তপোশে শুয়ে পড়েছে। এবং টেবিলের ওপরে নতুন মশারিটা দেখে বিনা দ্বিধায় সেটা কাজে লাগিয়েছে।

কিন্তু কে এই রাতের কুটুম্ব? বাপি, না রোহন?

এবার ঘরের ভেতরে পা রাখলাম আমি। সুইচ টিপে আলো জ্বালালাম। একইসঙ্গে ডেকে উঠলাম, 'কে, বাপি?'

কোনও সাড়া নেই।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই মশারির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আলো জ্বালার ফলে মশারির নীল রঙের ঘন বুনট পেরিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। তবে আবছা একটা আভাস মতন পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন মশারির ভেতরে কেউ শুয়ে আছে।

আমি আবার ডেকে উঠলাম, 'কে, রোহন?'

এবারে আগের চেয়ে জোরে ডেকেছি, কিন্তু তাও কেউ উত্তর দিল না। কিংবা ঘুমের ঘোরে ডাক শুনতে পেল না।

ভৌতিক কিংবা অলৌকিকে আমার ছিটেফোঁটাও বিশ্বাস নেই। অন্তত কোনওকালে ছিল না। কিন্তু এখন যে একটু গা-ছমছম করছিল না তা নয়।

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

খোলা জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছিল। আমগাছের পাতা খসখস শব্দ তুলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, মশারিটা যেন একটা প্রাণী—থম মেরে কীসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

আমি আবার বাপি আর রোহনের নাম ধরে ডাকলাম। তারপর আর একবার।

মশারি তবুও চুপচাপ। মশার পিনপিন শব্দ কানে এল। আমি একদৃষ্টে মশারিটার দিকে তাকিয়ে। মশারিটাও মনে হল ওর অদৃশ্য চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে।

কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর টের পাচ্ছিলাম, আমার কপাল, গলা, ঘাড় ঘেমে উঠেছে।

আমি টেনশানে আর থাকতে পারলাম না। হঠাৎই দুঃসাহসের একটা ঝটকা খেলে গেল আমার মাথায়। সেই ঝটকায় ক্ষিপ্ত পাগলের মতো ছুটে গেলাম মশারিটার দিকে। হ্যাঁচকা টানে মশারিটা তুলে ধরলাম শূন্যে। টানাহ্যাঁচড়ায় একটা দড়ি পট করে ছিঁড়ে গেল। আর দলাপাকানো মশারিটা খামচে ধরে আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

কারণ, মশারির ভেতরে কেউ নেই। বিছানা শূন্য!

অবাক চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে যখন এই মাঝরাতের হেঁয়ালির উত্তর ভাবছি, তখন হঠাৎই নাকে একটা গন্ধ পেলাম।

গন্ধটা অনেকটা যেন হালকা ঘামের গন্ধ।

একইসঙ্গে বিছানায় হাত দিয়ে সামান্য উষ্ণতা টের পেলাম। যেন বিছানায় এতক্ষণ ধরে কেউ শুয়ে ছিল—এইমাত্র উঠে চলে গেছে।

মাথার বালিশের দিকে তাকিয়েও যেন মাথার গোল ছাপের একটা আদল চোখে পড়ল। বালিশের কাছে ঝুঁকে পড়ে জোরে শ্বাস টানলাম। নারকোল তেলের গন্ধ নাকে ভেসে এল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালে গলায় হাত বুলিয়ে ঘাম মুছলাম।

ভূত-প্রেত কিছুই দেখিনি অথচ তাও আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? হতে তো পারে, রোহন কিংবা বাপি সত্যিই হয়তো এসেছে—তারপর উঠে বাথরুমে গেছে।

নিজেকে ভুল বোঝানোর চেষ্টায় আমার ভেতরে একটা লড়াই চলছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম, যুক্তি ক্রমশ হেরে যাচ্ছে কুসংস্কারের কাছে।

একটু পরে আমি মশারিটা ফেলে দিলাম বিছানায়। মনে সাহস জড়ো করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। করিডর ধরে এগোলাম বাথরুমের দিকে।

কিন্তু যা আন্দাজ করছিলাম তাই।

বাথরুমে কেউ নেই—না বাপি, না রোহন।

সুতরাং বাথরুম সেরে আবার উঠে এলাম দোতলায়। খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম।

ঘরের অবস্থা একইরকম: টিউবলাইট একইভাবে জ্বলছে, সিলিংফ্যানে চলছে, মশারিটাও পড়ে আছে বিছানায়।

বিরক্তির একটা শব্দ করে ঘরের আলো-পাখা নিভিয়ে দিলাম। দরজার পাল্লা টেনে দিয়ে হাঁসকল লাগিয়ে দিলাম আবার।

নিজের ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মশারিটার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই একটা সহজ-স্বাভবিক ব্যাখ্যা দাঁড় করতে পারলাম না।

পরপর তিনদিন—কিংবা বলা ভালো তিনরাত্তির—বেশ নিশ্চিন্তে কাটল। মাঝরাতে উঠে পাশের ঘরের হাঁসকল খুলে দেখেছি কোনও 'অলৌকিক' ব্যাপার নেই। জানলা দুটো দিব্যি বন্ধ। এবং মশারিটা 'ভালো ছেলে'-র মতো টেবিলের ওপরে ভাঁজ করা অবস্থায় 'শুয়ে' আছে।

তখন মনে হল, সেদিন রাতে যা দেখেছি সেটা আমার মনের ভুল নয় তো? হয়তো ভাবছিলাম, রোহন কিংবা বাপি হঠাৎ করে কলকাতায় চলে আসতে পারে। মশারিটা টাঙিয়ে দিলে আর ওদের মশার কামড় খেতে হবে না। হয়তো আধোঘুমে এসব নিয়েই স্বপ্ন দেখছিলাম। তারপর স্বপ্নের ঘোরে পাশের ঘরের দরজা খুলে ওসব ভুলভাল জিনিস দেখেছি। হয়তো আমি সে-রাতে ঘোরতর ভাবে 'ঘুমিয়ে চলা'-র অসুখে পড়েছিলাম।

এসব ভেবে-ভেবে শেষ পর্যন্ত মেনে নিলাম যে, আমি সে-রাতে ভুলই দেখেছি। তাই চারনম্বর রাত্তিরে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

কিন্তু সেদিন রাতে যা দেখলাম সেটা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন।

বাথরুমে যাওয়ার জন্যে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। করিডরে এসে পাশের ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। কান পেতে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম।

হ্যাঁ—সিলিংফ্যানটা ঘুরছে। পুরোনো পাখার কিচকিচ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি হাঁসকল খুল দরজার পাল্লা ঠেলে দিলাম ভেতরে।

নীল মশারিটা তক্তপোশে পরিপাটি করে টাঙানো রয়েছে। মশারির ওপাশে জানলা দুটো খোলা। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া বাতাসে এবং সিলিংফ্যানের হাওয়ায় মশারির কাপড় নড়ছে, দুলছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্রই আমি সেদিনের মতো হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিলাম। দুবার ঝিলিক মেরে টিউবলাইট জ্বলে উঠল।

আর তখনই মনে হল, দরজার হাঁসকল তো বাইরে থেকে বন্ধ ছিল! তা হলে কেউ ভেতরে ঢুকে মশারিই-বা টাঙাল কী করে, আর পাখাই-বা চালাল কী করে?

একটা ঠান্ডা ভয় আমাকে জাপটে ধরল। মনে হল, ঘরের বাতাস কমে গেছে—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আলো জ্বালার জন্যে মশারির ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া বাতাসে মশারির কাপড়ে ঢেউ খেলছিল বলে দেখতে আরও অসুবিধে হচ্ছিল।

হঠাৎই আমার মনে হল, মশারির ভেতরে কেউ যেন নড়ছে। কারণ, কোনও শব্দ-টব্দ না হলেও মশারিটা জায়গায়-জায়গায় ফুলে উঠছিল। মানে, কারও মাথা কিংবা হাত-টাতের আদল বোঝা যাচ্ছিল। যেন মশারির ভেতর থেকে কেউ আমাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে, অথবা মশারির দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। অবাক ভয়ের চোখে সেই অপার্থিব দৃশ্যের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। আমার কপাল থেকে ঘামের ফোঁটা যে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সেটা অনুভবে টের পেলাম।

হঠাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস শব্দ কানে এল। শব্দটা এমন, যেন কেউ হাঁপাচ্ছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, শব্দটা আসছে মশারির ভেতর থেকেই।

কিন্তু কে রয়েছে মশারির ভেতরে? মশারির ভেতর থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না কেন?

জানি, অবাস্তব চিন্তা, কিন্তু তবুও—অকূলপাথারে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো—আমি রোহন আর বাপির নাম ধরে ডেকে উঠলাম। কিন্তু যে-কণ্ঠস্বর আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল সেটা আমার কাছেই অচেনা ঠেকল।

'রোহন!...বাপি!'

কোনও সাড়া নেই। তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

'রোহন! রোহন!' এবারে বেশ জোরে ডেকেছি: 'বাপি! বাপি!...বাপি!'

কিন্তু এবারেও কোনও সাড়া নেই। শুধু ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস।

গলা পর্যন্ত ভয়ে টইটম্বুর অবস্থাতেও আমার মধ্যে কী করে যেন একটা মরিয়া ঝোঁক ঝলসে উঠল। মনে হল, মশারিটাই আমার চিরশত্রু। ওটাই বড়-বড় নিশ্বাস ফেলছে।

সঙ্গে-সঙ্গে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মশারিটার ওপরে। পটপট করে মশারি টাঙানোর দুটো দড়ি ছিঁড়ে গেল। আর আমি শূন্য মশারি বুকে নিয়ে তক্তপোশে আছড়ে পড়লাম।

তারপর পাগলের মতো মশারিটাকে হাতড়াতে লাগলাম। কারও অস্তিত্বের খোঁজে চাপড় মেরে থাপড়ে-থাপড়ে দেখতে লাগলাম ওটার নানান জায়গায়।

কিন্তু কোনও লাভ হল না। কেউ নেই।

এক প্রবল আক্রোশে মশারিটা টান মেরে বিছানা থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর দলাপাকানো মশারিটা হাতে নিয়ে শূন্য বিছানার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

কেউ কোথাও নেই।

শুধু আগের দিনের মতো বালিশে কারও মাথার ছাঁচ চোখে পড়ল। নাকে এল ঘামের গন্ধ। আর বিছানায় হাত রেখে মনে হল যেন বাড়তি উষ্ণতা টের পেলাম।

ভয়ে স্পঞ্জের মতো ফোঁপরা হয়ে গেলাম এবং তার ফাঁকফোকরে ঠান্ডা ভয়ের স্রোত ঢুকে গেল।

আমি বিছানায় বসে পড়লাম। বারবার খোলা জানলা আর দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম। মনে হচ্ছিল, কেউ বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোনওরকমে ওই জানলা কিংবা দরজা দিয়ে সটকে পড়েছে—আবার এক্ষুনি হয়তো আচমকা ফিরে আসবে ঘরে।

যদি সত্যিই আসে?

ভয়ে ঘামতে শুরু করলাম।

মশারিটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে বিছানা ছেড়ে আচমকা ছুট লাগালাম দরজার দিকে। চটপট আলো-পাখার সুইচ অফ করে দরজা টেনে বন্ধ করে দিলাম। তারপর হাঁসকল লাগিয়ে দিয়ে সোজা নিজের ঘরে। ঘরের আলো জ্বেলে সেই অবস্থাতেই শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

ভয়ে সারা রাত একফোঁটাও ঘুম এল না। মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় দপদপ করতে লাগল। কানে তখনও ভেসে আসছে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

মনে-মনে ঠিক করলাম, কালই মশারিটাকে আগুনে পুড়িয়ে 'খতম' করব। এবং এই 'অন্ত্যেষ্টি'-র কাজটা রাতের অন্ধকারে তিনতলার ছাদে কিংবা পুকুরপাড়ে গিয়েই সারতে হবে।

তখনও জানি না, আগামীকাল আমার কী কাল হবে!

সকাল ন'টা নাগাদ রোহন হইহই করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। কিন্তু তার অনেক আগেই মশারিটার এককোণে শুকনো রক্তের দাগটা আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি।

আজ সকালে কষ্ট করে আর ঘুম থেকে উঠতে হয়নি—যেহেতু সারাটা রাত বলতে গেলে জেগেই ছিলাম।

সকালে হাত-মুখ ধুয়ে নমো-নমো করে চা-বিস্কুট খেয়ে সোজা চলে গেছি পাশের ঘরে।

মশারিটা অগোছালোভাবে মেঝেতে পড়ে ছিল। ওটা তুলে নিয়ে বিছানায় বসলাম। এই বস্তুটার মধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে সেটা আমি আজ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে চাই।

জানলা দুটো খোলাই ছিল। সেদিকে তাকালে চোখে পড়ছে সকালের রোদ, গাছের সবুজ পাতা, পুকুরের জল, দু-চারটে পাখি। এসব দেখে মনেই হয় না পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু থাকতে পারে। কাল রাতে এ-ঘরে ঢুকে যেসব কাণ্ডকারখানা দেখেছি সেগুলোও আর সত্যি বলে মানতে মন চায় না।

সুতরাং বেশ হালকা মন নিয়েই মশারি পরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলাম, এবং মনে-মনে যেন ধরেই নিয়েছিলাম শত পরীক্ষা করেও তেমন কিছু পাওয়া যাবে না।

কিন্তু পেলাম।

মশারিটার এক কোণে ভাঁজের আড়ালে একটা দাগ দেখতে পেলাম। দাগটা মাপে একটাকার কয়েনের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। রং কালচে লাল।

দাগটার ওপরে আলতো করে আঙুল বোলাতেই আমার গোটা শরীর শিরশির করে উঠল। মনে হল যেন জ্যান্ত সাপের গায়ে হাত দিয়েছি।

চট করে আঙুল সরিয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে সাহস এনে দাগটা ধীরে-ধীরে নিয়ে এলাম নাকের কাছে। মাথা ঝুঁকিয়ে গন্ধ শুঁকলাম।

মনে হল যেন আবছা আঁশটে গন্ধ পেলাম।

তখন সবমিলিয়ে উত্তর বেরোল একটাই—দাগটা রক্তের দাগ।

কিন্তু এখানে রক্ত এল কোথা থেকে? এ কী মশার পেটের রক্ত?

প্রশ্নটা মনে জেগে উঠতেই হাসি পেয়ে গেল আমার। অন্তত কয়েকশো রক্তচোষা মশা মারলে পর এরকম মাপের একটা রক্তের দাগ তৈরি হতে পারে। সুতরাং, আমি যা ভাবছি তাই। দাগটা রক্তের—তবে মশার নয়।

দোকান থেকে মশারিটা কেনার সময় এই দাগটা আমার চোখে পড়েনি। পড়লে বোধহয় ভালোই হত। মশারিটা কিনে এভাবে হেনস্থা হতে হত না।

এরপর রোজকার কাজ শুরু করলাম বটে কিন্তু রক্তের দাগের ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে গেল না! তখনও জানি না, রোহন হুট করে এসে হাজির হবে।

ন'টার কাছাকাছি বাইরে থেকে রোহনের ডাক শুনতে পেলাম।

'পেরো! পেরো—!' বলে ডাকতে-ডাকতে রোহন দোতলায় উঠে এল। তারপর সটান ঢুকে পড়ল আমার ঘরে।

ঢুকেই একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল রোহন। লম্বা হাঁপ ছেড়ে বলল, 'পেরো, শোন, এই খেপে তিনদিন থাকব। শালা, এই চাকরিটা করে লাইফ হেল হয়ে গেল। আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

কথা শেষ করেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে, দে, আগুন দে—।'

রোহন এইরকমই। ভীষণ মুডি। আমার নাম পরিমল—ডাকনাম পরি। কিন্তু রোহন সেই ছোটবেলা থেকেই আমাকে 'পেরো' বলে ডাকে। আমার এতে আপত্তি ছিল, কিন্তু রোহন পাত্তা দেয়নি। এক তুড়িতে সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে ওই পেরোর গেরো আমার কপালে গেঁথে গেছে।

একটা ড্রয়ার থেকে লাইটার বের করে রোহনকে দিলাম। ও ফস করে আগুন জ্বেলে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের টান মারতে-মারতে লাইটারটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল।

কয়েকসেকেন্ড পরই ও হুকুমের ঢঙে বলল, 'এক গ্লাস জল খাওয়া। তারপর তোর হাতের তৈরি ফার্স্টক্লাস চা—।'

আমি ঘরের এককোণে গিয়ে প্লাস্টিকের বোতল থেকে একটা গ্লাসে জল ঢালতে লাগলাম। রোহন আবার সরাসরি বোতল থেকে জল খেতে পারে না। ওর কিছু খুচরো বাবুয়ানি আছে।

রোহন আমার ছোটবেলার বন্ধু হলেও ওর সঙ্গে আমার কোনও তুলনা হয় না। কোথায় ও, আর কোথায় আমি!

রোহন পড়াশোনার বরাবর একনম্বর। আর আমি যে কত নম্বর সেটা স্রেফ ভুলেই গেছি।

ও দেখতে সুন্দর। ফরসা। মাথায় কোঁকড়া চুল। চিবুকের ডানদিকে ছোট্ট তিল—বিউটি স্পট। শক্তপোক্ত চেহারা। মাথায় বেশ লম্বা। তা ছাড়া দারুণ চাকরি করে।

আর আমি? রোগা, কালো। হাইট মাঝারি। বুদ্ধিও তাই। সেইসঙ্গে চাকরিটাও।

সত্যি, মাঝে-মাঝে রোহনকে আমার হিংসে হয়। ওকে দেখলেই আমি কেমন একটা কমপ্লেক্সে ভুগি। বন্ধু হলেও ওর সামনে আমি যেন ঠিক সহজ হতে পারি না। ও আমাকে

যখনই কিছু বলে, তার মধ্যে সবসময় একটা চাপা অর্ডারের ভাব থাকে। যেমন এখন।

চা-টা খেয়ে পায়ের ওপরে পা তুলে বসল রোহন। আবার জুত করে সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'পেরো, আজ আর তোর অফিস গিয়ে কাজ নেই। আমি বাজার থেকে মুরগি নিয়ে আসছি— তুই কষে রান্না কর। আমি খেয়ে-দেয়ে দুটোর সময় কাজে বেরোব। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটায় ফিরলে দুজনে মিলে পুকুরপাড়ে বসে আড্ডা মারব। রিয়েলি, ও-জায়গাটা ফ্যানট্যাস্টিক।'

সত্যিই, আমার বাড়ির পেছনে যে-পুকুর আছে তার পাড়ে সন্ধেবেলা বসে থাকতে বেশ লাগে। রোহন যখনই আমার আস্তানায় এসে ওঠে তখনই পুকুরপাড়ে বসে আড্ডা মারার সুযোগ খোঁজে। এক-একদিন আমি আর ও রাত এগারোটা পর্যন্তও আড্ডা মেরেছি। তা ছাড়া রোহন আড্ডা জমাতেও পারে। কত বিষয়ে যে ও কতকিছু জানে! আর অনর্গল সুন্দর করে কথা বলতে পারে।

কথার মাঝে সামান্য ফাঁক পেতেই আমি ওকে জানালাম যে, আমি একটা বিউটিফুল মশারি কিনেছি।

শুনেই রোহন একেবারে হইহই করে উঠল। বলল, 'পেরো, অ্যাদ্দিনে তুই একটা কাজের কাজ করেছিস। আজ রাতে মাইনাস মশা ঘুমোনো যাবে...।'

রোহন আমাকে মশারির দামের বাকি পঁচিশটা টাকা দিয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু আমি নিলাম না। বললাম, 'খানিকটা কনট্রিবিউশান আমারও থাক। সবসময় তো ওটা আমিই ব্যবহার করব...তুই আর ক'দিন ইউজ করবি...।'

মশারিটার বাকি ইতিহাস রোহনকে কিছুই জানালাম না। কারণ, ও সেসব বিশ্বাস তো করবেই না—উলটে আমাকে প্যাঁক দিয়ে-দিয়ে জান কাহিল করে ছাড়বে।

সারাটা দিন আমাদের সুন্দরভাবে কাটল। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর দুজনে দু-ঘরে শুয়ে পড়লাম।

সন্ধে থেকেই আমার মধ্যে একটা টেনশান কাজ করছিল। বারেবারে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। রোহন সেটা টের পেয়ে বেশ কয়েকবার আমাকে ধাতানি দিয়েছে: 'পেরো, কোনদিকে তোর মন পড়ে আছে বল তো— !'

যাই হোক, রাতে যখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম, তখন টেনশানটা যেন আরও জাঁকিয়ে বসল। অন্ধকারে জেগে রইলাম। কিছুতেই ঘুম এল না। আমি যেন কীসের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পাশের ঘর থেকে রোহনের চিৎকার শুনতে পাব: 'পেরো!পেরো, কুইক! বাঁচা আমাকে...।'

অনেক রাতে—রাত তখন কত হবে জানি না—পাশের ঘর থেকে মনে হল যেন একটা শব্দ পেলাম। আর তার ঠিক পরেই কথাবার্তার শব্দ। চাপা গলায় দুজন লোক কথা বলছে।

কিন্তু পাশের ঘরে রোহন তো একা! এত রাতে কার সঙ্গে ও কথা বলবে?

তা হলে কি নীচে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলছে—আর সেই কথাবার্তা আমি দোতলার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছি?

কিন্তু এত রাতে কারা কথা বলবে?

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। জানলার কাছে গিয়ে পুকুরপাড়ের দিকে তাকালাম। চাঁদের আলোয় আবছাভাবে সব দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কোনও মানুষজন আমার নজরে পড়ল না।

অথচ চাপা কথাবার্তার শব্দ তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হল, পাশের ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে।

আর দেরি করলাম না। অন্ধকারেই দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে পড়লাম।

রোহনের ঘরের কাছে এসে দরজায় কান পাতলাম। সিলিংফ্যানের শব্দ ছাড়াও কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কথাগুলো বোঝা না গেলেও ব্যাপারটা যে অনেকটা বচসা মতন, সেটা আঁচ করা যাচ্ছে।

দরজায় দুবার টোকা দিয়ে চাপা গলায় ডেকে উঠলাম, 'রোহন! রোহন!'

সঙ্গে-সঙ্গে সব কথাবার্তা থেমে গেল। শুধু সিলিংফ্যানের কিচমিচ শব্দ।

এ-ঘরের দরজার ছিটকিনিটা বেশ গোলমেলে—ঠিকমতো আটকাতে চায় না। বাইরে থেকে দরজার পাল্লায় একটু ঠোকাঠুকি করলেই খুলে যায়। তা ছাড়া রোহন অনেকসময় ছিটকিনি না এঁটেই শুয়ে পড়ে। কারণ, ও ভালো করে জানে, এ-ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই।

রোহন কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে আমি আবার ওর নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু তিনবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে দরজায় বেশ জোরে দুবার ধাক্কা দিলাম।

ঠং করে ছিটকিনিটা পড়ে গেল। নাকি রোহনই ছিটকিনিটা ওরকম আওয়াজ করে খুলল কি না কে জানে!

এবারে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। নাকে এল সিগারেটের গন্ধ। আমার সিগারেট-বিড়ির অভ্যেস নেই বলে গন্ধটা বেশ চড়া লাগল।

'রোহন—!'

কেউ সাড়া দিল না। অথচ তক্তপোশের দিক থেকে সামান্য নড়াচাড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম।

চাপা টেনশানে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। তাই আর দেরি না করে ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম নীল রঙের মশারিটার দিকে।

মশারির ভেতরে কিছু একটা নড়ছে। কারণ, মাঝে-মাঝেই মশারিটা জায়গায়-জায়গায় ফুলে উঠছে। ওটার নীল রঙের কাপড় ভেদ করে ভেতরটা কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু আকারহীন একটা কালচে ছায়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আমি আবার রোহনের নাম ধরে ডাকলাম, 'রোহন! রোহন!'

মশারির ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না। তবে এলোমেলো নড়াচড়াটা চলতেই লাগল।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। মনের ভেতরে ভয় আর কৌতূহলের টানাপোড়েন চলছিল। মনে হল, রোহন আমাকে নিয়ে এ কী রসিকতা করছে!

তাই 'রোহন' বলে ডেকে উঠে ছুটে চলে গেলাম মশারির কাছে। এক হ্যাঁচকায় মশারিটা টান মেরে খুলে দিলাম।

মশারির ভেতরে কেউ নেই! সব শূন্য!

পাগলের মতো টানাহ্যাঁচড়া করে দড়ি-টরি ছিঁড়ে মশারিটা দু-হাতে খামচে ধরলাম বুকে। উত্তেজনায় বড়-বড় শ্বাস দিতে লাগলাম।

কোথায় গেল রোহন?

ওই তো, মেঝেতে ওর হাওয়াই চটিজোড়া পড়ে আছে। ওই যে, দেওয়ালের কাছে দাঁড় করানো রয়েছে ওর সবুজ রঙের ভি. আই. পি. সুটকেস। এগুলো ফেলে রেখে কোথায় উধাও হল ও? তা ছাড়া গেলই-বা কোথায় দিয়ে? ওর ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল!

আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলাম। রক্তের দাগ লাগা এই ভয়ংকর মশারিটা নিশ্চয়ই রোহনকে...।

না, না—এ অসম্ভব!

আর ভাবতে পারলাম না। এই হতচ্ছাড়া মশারিটাকে আগে আমি পুড়িয়ে ছাই করব। তারপর রোহনকে খুঁজব। থানা-পুলিশ করব। কাগজে আর টিভি-তে বিজ্ঞাপন দেব। যে-করে হোক রোহনকে আমি খুঁজে বের করবই।

কিন্তু আগে মশারিটার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষুনি।

মশারিটাকে প্রাণপণে জাপটে ধরে ছুটে চলে এলাম আমার ঘরে। ড্রয়ার থেকে লাইটার বের করে নিয়ে রওনা দিলাম তেতলার ছাদের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হল, মশারিটা সাপের মতো নড়ছে, আমার হাতের বাঁধন ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

আমি আরও জোরে ওটাকে আঁকড়ে ধরলাম। প্রচণ্ড ভয় থেকে এক অদ্ভুত মরিয়া শক্তি আমার ভেতরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই শক্তির জোরেই ছাদে এসে পড়লাম।

মশারিটাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে সঙ্গে-সঙ্গে লাইটার জ্বেলে ধরলাম ওটার গায়ে।

মশারিটা জ্বলতে শুরু করল।

আমি একটু দূরে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। দেখতে লাগলাম, একটা অশুভ অলৌকিক শক্তি জ্বলছে, পুড়ছে। কালো আর পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

আকাশের চাঁদ-তারা আর রাতের বাতাস এই অন্ত্যেষ্টির সাক্ষী হয়ে রইল।

হঠাৎই এক অদ্ভুত ক্লান্তি আমাকে জড়িয়ে ধরল। তন্দ্রার টানে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে চাইল।

আর ঠিক তখনই আমাকে চমকে দিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল কেউ।

'উঃ! জ্বলে যাচ্ছি...পুড়ে যাচ্ছি...। পেরো, আমাকে বাঁচা! পেরো, প্লিজ, বাঁচা আমাকে...।'

রোহনের গলা আমার কানে গরম সীসে হয়ে ঢুকে পড়ল। আমি দু-কানে আঙুল গুঁজে দিলাম। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেললাম।

কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই!

মশারিটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে যাক।

চ্যানেল এক্স

রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরামাত্রই শাশুড়িমা বললেন, বাবাজীবন, আজ পঞ্চাশটাকা উপার্জন করিয়াছি। টিভি হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।

আমি গা থেকে ঘামে ভেজা শার্টটা খুলতে যাচ্ছিলাম—ওঁর কথা শুনে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম।

না, শাশুড়িমার সাধুভাষা শুনে আমি অবাক হইনি। কারণ তাপসীর সঙ্গে আমার বিয়ের পর থেকেই এই পিকিউলিয়ার সাধুভাষার চচ্চড়ি শুনে আসছি। আমি অবাক হয়েছি ওই পঞ্চাশটাকা উপার্জনের কেসটা শুনে।

টিভি হইতে টাকা খসিয়া পড়িয়াছে? এ তো বড় রঙ্গ জাদু!

আমার শাশুড়িমা রোগাপাতলা ছোটখাটো মানুষ। টকটকে ফরসা গায়ের রং। তবে বয়েসের জন্যে চামড়ায় অনেক ভাঁজ। ওঁর যখন চোদ্দো বছর বয়েস তখন ওঁর গা ঘেঁষে বাজ পড়েছিল। ঘোর বর্ষার রাতে দেশের বাড়িতে কুয়োতলায় জল তুলতে গিয়েছিলেন। তখনই ওই বাজ পড়ে। উনি ছিটকে গিয়ে পড়েছিলেন পাশের কলাগাছের ওপর। এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

একঘণ্টা পর যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি দিব্যি সুস্থ মানুষ। গায়ে সেরকম কোনও কাটাছেঁড়া নেই। শুধু কথাবার্তা বলতে শুরু করেন সাধুভাষায়। আর মাথায় একটু মাটো হয়ে যান।

অনেক ডাক্তার-বদ্যি করেও এই সমস্যা সলভ করা যায়নি। সেকালের একজন নামকরা ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, কুয়োতলায় যাওয়ার আগে পেশেন্ট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' পড়ছিল। তারই একটা পারমানেন্ট সিগনেচার পেশেন্টের ব্রেনের ওপরে পড়ে গেছে।

বয়েসকালে আমার শাশুড়িমা দেখতে নাকি ব্যাপক সুন্দরী ছিলেন। এ-কথা তাপসীর মুখে শুনে-শুনে আমার কান পচে গেছে। একদিন আমি রাগের মাথায় বলেই বসেছি, তোমাকে দেখে সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না।

তবে তাপসীকে যা-ই বলি, শাশুড়িমা সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। নইলে আঠেরো বছর বয়েসে ওই সাধুভাষার প্রবলেম থাকা সত্ত্বেও ওঁর সঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের বিয়ে হয়েছিল কেমন করে!

আমার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন অনেক আগে। মানে, তাপসীর সঙ্গে আমার বিয়ের অন্তত দশ বছর আগে। তিনি বেশ জাঁদরেল উকিল ছিলেন। সেটা তাপসীকে দেখে বেশ বোঝা যায়। ওর মধ্যে ওকালতির অনেক গুণ আছে। শুধু আমরা দারিদ্র্যরেখার কাছাকাছি লোক বলে ওর গুণগুলো তেমন জ্বালাময়ী স্টাইলে প্রকাশিত হতে পারেনি।

আমি, তাপসী, আর আমার শাশুড়িমা—আমরা একসঙ্গে থাকি। একটা পুরোনো বাড়ির নোনাধরা আড়াইখানা ঘরে। ইংরেজিতে এরই নাম 'ফ্ল্যাট'। বহুকাল ধরে এই আস্তানায় আছি বলে আজকের আগুন বাজারেও বাড়িভাড়াটা প্রতিমাসে ম্যানেজ করতে পারছি।

তাপসী খুব স্বপ্ন দ্যাখে যে, আমরা ভালো জায়গায় থাকছি, ভালো-মন্দ খাচ্ছি, এদিক-ওদিক উড়ে-ঘুরে বেড়াচ্ছি। এভাবে দুঃখে-কষ্টে চিরকাল যাবে না। দিন বদলাবেই।

আমি একসময় স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু এখন আর দেখি না। এখন মুখের ভেতরটা সবসময় টক-টক হয়ে থাকে। আর মেজাজটা তেতো।

শাশুড়িমার কথায় প্রথম অবাক হলাম, তারপর মাথার ভেতরটা চড়াং করে উঠল। টাকার টানাটানি নিয়ে তাপসীর সঙ্গে দিন-রাত খচরমচর করি বটে, কিন্তু তাই বলে এরকম হ্যাটা দেওয়া রসিকতা! তাও আবার শাশুড়ির কাছ থেকে!

ভেতরের খ্যাপা রাগটাকে কোঁত করে গিলে ফেললাম। তারপর মুখ এবং গলার স্বর যথেষ্ট মোলায়েম করে অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, বলেন কী, মা! পঞ্চাশ টাকা... টিভি থেকে খসে পড়েছে?

চোখ গোল-গোল করলেন আমার রোগা তুলতুলে শাশুড়ি। তারপর সাধুভাষায় যা মেসেজ দিলেন তা ডিকোড করলে এইরকম দাঁড়ায়:

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার শাশুড়ি ঘণ্টাদুয়েক দিবানিদ্রা দেন। ওঁর একটু দুঃস্বপ্ন দেখার রোগ আছে। প্রায়ই ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠেন, ধড়ফড় করে উঠে বসেন। আজ দুপুরে কী একটা বাজে স্বপ্ন দেখে উনি সাড়ে তিনটে নাগাদ জেগে ওঠেন। তারপর একচিলতে খাওয়ার ঘরে বসে ঘুমচোখে টিভি দেখার মহান কাজ শুরু করেন। তাপসী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

টিভিতে কী একটা সিনেমা দেখাচ্ছিল। নামটা কী যেন। শাশুড়ি বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখেছিলেন। হঠাৎই পরদায় বাজ পড়ার মতো শব্দ আর আলোর ঝলক দেখা গেল। চোদ্দো বছর বয়েসের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় শাশুড়ি এক প্রবল চিৎকার করে উঠেছিলেন। সেই চিৎকারে পাশের ঘরে তাপসীর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙেই ও 'চোর! চোর!' বলে চেঁচাতে শুরু করে। কারণ, ওর মনে হয়েছিল, নির্জন দুপুরে বাড়িতে চোর ঢুকেছে।

এদিকে শাশুড়ি টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, ওই বার দু-তিনেক আলোর ঝলকের পরই টিভির চ্যানেলগুলো কীরকম যেন ওলটপালট হয়ে যায়। সিনেমাটা বদলে গিয়ে অন্য কী একটা ছবি শুরু হয়ে যায়। তখন শাশুড়িমা খেয়াল করেছিলেন যে, পরদার এককোণে লেখা রয়েছে 'চ্যানেল এক্স'। অথচ এই নামে কোনও চ্যানেল আছে বলে তিনি কখনও শোনেননি বা দেখেননি।

এই নতুন সিনেমাটায় একজন মোটা কালোমতন লোক অনেকগুলো টাকা গুনছিল। সব পঞ্চাশটাকার নোট। তখনই একটা নোট সেখান থেকে খসে পড়ে যায়। সেই খসে-পড়া নোটটা হাওয়ায় লাট খেতে-খেতে টিভির পরদা ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়ে।

শাশুড়িমা সেটা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নেন। তখনই আবার বাজ পড়ার শব্দ হয় এবং টিভিতে চোখ ঝলসানো আলোর ঝিলিক দেখা যায়। একইসঙ্গে আগের সিনেমাটা আবার ফিরে আসে। সবকিছু আমার শান্তশিষ্ট এবং নরমাল হয়ে যায়।

তাপসী পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দ্যাখে ওর মায়ের হাতে পঞ্চাশটাকার একটা কড়কড়ে নোট। ওর মা ফ্যালফ্যাল করে টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন।

এরপর মা ও মেয়ে অনেক আশা নিয়ে টিভির সামনে হা-পিত্যেশ করে বসে থেকেছে কিন্তু শিকে ছেঁড়েনি। সব চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেছে, চুলচেরা সূক্ষ্ম নানান পরীক্ষা করেছে, কিন্তু চ্যানেল এক্স আর দেখা দেয়নি।

সব কাজ ফেলে রেখে আমি একটা লজঝড়ে মোড়া টেনে নিয়ে শাশুড়িমার কাছে বসলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার খ্যাপা মনটাকে শান্ত করতে চাইলাম। তারপর বললাম, তপু কোথায়?

শাশুড়িমা বললেন, মম কন্যা নিকটেই এক সুহৃদের বাড়িতে গিয়াছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলিয়া আসিবে।

হুম। তা পঞ্চাশটাকার নোটটা কোথায়?

এই যে, বাবাজীবন—মম অঞ্চলে।—এ-কথা বলে শাশুড়ি শাড়ির আঁচলের গেঁট খুলতে শুরু করলেন। তখনই খেয়াল হল, অঞ্চল মানে আঁচল।

ছত্তিরিশ ভাঁজ করা পঞ্চাশটাকার নোটটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলাম। আলোর দিকে উঁচিয়ে ধরে চোখ ছোট-বড় করে ব্যাপক পরীক্ষা চালালাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। মালটা স্রেফ একটা অর্ডিনারি পঞ্চাশটাকার নোট। কোনও স্পেশাল ব্যাপার নেই।

এটা আমার কাছে থাক, বলে নোটটা প্যান্টের পকেটে চালান করে দিলাম। তারপর নড়েচড়ে বসে শাশুড়িমা-কে প্রাণপণ জেরা শুরু করলাম।

কোনও লাভ হল না।

আমার শাশুড়ি একই বক্তব্যে অচল-অনড় রইলেন। মিনমিনে কাহিল গলায় একই কথা বারবার বলে চললেন। শেষে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, যতই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করো, বাবাজীবন—টিভি হইতে টাকা খসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্র-সূর্য যেরূপ সত্য, ইহাও তদ্রূপ—চূড়ান্ত সত্য।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি শাশুড়িকে ছেড়ে টিভি নিয়ে পড়লাম। ওটা নানানভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। টিভির পেছনটা ভালো করে চেক করলাম। নাঃ, কিচ্ছু নেই।

সুতরাং এবার টিভিটা অন করে চ্যানেল সার্ফ করতে লাগলাম। একবার সামনে গেলাম, একবার পেছনে গেলাম।

না, চ্যানেল এক্স নামে কোনও চ্যানেল নেই।

তা হলে এই আজব কেসটার মানে কী?

ভেবে-ভেবে কোনও কূলকিনারা না পেয়ে লাস্টে মনে হল, শালা পঞ্চাশটাকার নোটটাতো রিয়েল! যদি এইভাবে মাঝে-মধ্যে টিভি থেকে নোটপানি পড়ে তা হলে খারাপ কী! দেখতে-দেখতে টিভির দামই উঠে যাবে।

আপনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে জামা-প্যান্ট ছাড়তে শোওয়ার ঘরে গেলাম।

পাশের ঘর থেকে শাশুড়িমা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি চা পান করিবে?

আমি বললাম, না, আপনার মেয়ে আসুক...তারপর।

জামা-প্যান্ট ছেড়ে পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে নিলাম। চোখে-মুখে জল দিয়ে বিছানার একপাশে বসে নোনা ধরা দেওয়ালে হেলান দিলাম। চোখ বুজে গোটা ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করলাম।

পাশের ঘরে টিভি চলছে। শাশুড়িমা ওঁর পুরোনো কাজে ফিরে গেছেন। তাপসী ওর আড্ডা সেরে কখন আসবে কে জানে!

কে যেন ডাকল, গায়ে ঠোকা দিল।

তন্দ্রায় চোখ লেগে গিয়েছিল। চোখ খুলেই দেখি তাপসী।

শুনেছ, আজ কী হয়েছে?

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, সব শুনেছি। মা বলেছে।

এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।—হাতজোড় করে ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাল তাপসী। সেখানে কড়ি-বরগার মাঝে একটা বড়সড় টিকটিকি চুপচাপ সেঁটে আছে।

ওটার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম, কখন যে তিনি কী রূপে থাকেন!

তাপসী বাচ্চা মেয়ের মতো একগাল হেসে বলল, আমরা খুব লাকি, তাই না? এত লোকের বাড়িতে টিভি—কই কারও টিভি থেকে কখনও টাকা পড়েছে বলে তো শুনিনি। আমি সেই কথাটাই ছোটনের মা-কে বলছিলাম।

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, কেন বলতে গেলে? ওরা যদি পুলিশ-টুলিশে খবর দেয় তা হলে কেলো হয়ে যাবে। ওরা এসে হয়তো টিভিটা-ই নিয়ে চলে যাবে—।

তাপসী ব্যাপারটা বুঝল। চোখ বড়-বড় করে বলল, ঠিকই বলেছ তো! আমি একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছি।—একটু ভেবে আরও বলল, যাকগে, কাল গিয়ে বলে দেব যে, আমি স্রেফ মজা করার জন্যে ও-কথা বলেছিলাম। আর মা-কেও বারণ করে দেব।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম। তারপর চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, কিন্তু কেসটা কী বলো তো? এত লোকের টিভি থাকতে শেষকালে আমাদের টিভিতেই...।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।—কপালে আঙুল ঠেকাল তাপসী।

আমি ওকে বললাম, আমাকে একটু চা খাওয়াও। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।

চা খেতে-খেতে আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা চালালাম, কিন্তু কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারলাম না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, টিভিটা যথাসম্ভব চালু রাখতে হবে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, ইলেকট্রিক বিলটা তো অনেক বেড়ে যাবে!

কারণ, এমনিতেই আমি ঘন-ঘন সবুজ রঙের বিলে অভ্যস্ত। তার ওপর চ্যানেল এক্স...।

তাপসী পালটা জবাব দিল, দু-তিনদিন দেখি না! যদি টাকাপয়সা কিছু না পাই তা হলে একটানা আর চালাব না।

ভেতরে-ভেতরে লোভের সুড়সুড়িটা আমিও টের পাচ্ছিলাম। সুতরাং রাজি হয়ে গেলাম। যদি কপাল ভালো থাকে তাহলে শুধু টিভির দাম কেন, ইলেকট্রিক বিলের পয়সাও এই চ্যানেল এক্স থেকে উশুল হয়ে যাবে।

কিন্তু হল না।

তবে তার বদলে যা হল সেটা অসভ্যরকমের মারাত্মক।

সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই শাশুড়িমার অভিযোগ: শোনো, বাবাজীবন—টিভি হইতে এক বেআক্কেলে যুবক আমাকে চক্ষু মারিয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে বিষম খেলাম আমি। হাত থেকে চা-সমেত কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। আর কাশতে-কাশতে আমার দম বেরোনোর জোগাড়।

আমার বৃদ্ধা শাশুড়িমা-কে চোখ মেরেছে এক বেআক্কেলে যুবক!

তাপসী চায়ে চিনি মেশাতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। তাই ও মায়ের কথাটা ভালো করে শুনতে পায়নি। রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কী করেছে, মা—কী করেছে?

কী আর করিবে! চক্ষু মারিয়াছে।

শুনে তাপসী থ। আর আমার অবস্থা 'ধরণী দ্বিধা হও' টাইপের।

কী লজ্জা, কী লজ্জা!

আমি কোনওরকমে শোওয়ার ঘরে পালালাম। সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছি, তাপসী ওর বৃদ্ধা মা-কে জেরা শুরু করেছে।

আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। চ্যানেল এক্স-এর জ্বালাতন নিয়ে এখন কী করি! দু-তিন একটানা টিভি চালিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও ফায়দা হয়নি। তখন নরমাল স্টাইলে চলে এসেছি বটে কিন্তু টিভির দিকে কড়া নজর রেখে চলেছি। আমার মা তাপসীর চোখে সেরকম কিছু পড়েনি। কিন্তু পড়ল তো পড়ল গিয়ে ওর মায়ের চোখে!

তা হলে চ্যানেল এক্স-এর ভূত কি শুধু আমার বৃদ্ধা শাশুড়িমা-কে টার্গেট করেছে?

আমি যে ভুল ভেবেছি সেটা বোঝা গেল তিনদিনের মধ্যেই।

চ্যানেল এক্স-এর কীর্তি প্রথম দেখল তাপসী। আর তারপর আমি।

সেদিনটা ছিল রবিবার। আমি সন্ধেবেলা এই সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ মুদিখানা থেকে গুঁড়ো সাবান, আটা, বিস্কুট, ছোলা এইসব কয়েকটা টুকিটাকি কিনে ঘরে ঢুকেছি। তাপসী টিভিতে কী একটা সিরিয়াল দেখছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, রান্নাঘরে রাখো—আমি একটু পরেই উঠছি—সব গুছিয়ে রাখব।

আমি ওর কথামতো জিনিসগুলো রান্নাঘরের এককোণে মেঝেতে নামিয়ে রেখে কলতলায় হাত-মুখ ধুতে গেলাম। দেখলাম বাথরুমে আলো জ্বলছে, দরজা বন্ধ। মানে, শাশুড়িমা ওখানে।

হঠাৎই তাপসীর চিৎকার শুনতে পেলাম: শিগগির এদিকে এসো—।

প্রায় ছুটে খাওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই তাপসী টিভির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখো! ওই দ্যাখো!

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে টিভির দিকে তাকালাম। সেখানে তখন গানের সঙ্গে উদ্দাম নাচ চলছে। রঙিন আঁটোসাঁটো পোশাক পরে বেশ কয়েকটা ছেলেমেয়ে 'খাই-খাই' স্টাইলে নেচে চলেছে।

আজকাল এসব নাচ-গান মুড়িমুড়কি হয়ে গেছে। তাই ভুরু কুঁচকে তাপসীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম, চেঁচালে কেন? কী হয়েছে?

তাপসী অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল: চেঁচালাম কেন মানে? চ্যানেলের নামটা দেখেছ? আমার কানে...।

ওর কথায় কান না দিয়ে টিভির দিকে আবার ভালো করে তাকালাম।

সত্যিই তো! ওপরে বাঁ-দিকের কোণে সুন্দর ঢঙে ইংরেজিতে লেখা 'চ্যানেল এক্স'।

আমি জিগ্যেস করলাম, শুধু চ্যানেলের নামটা দেখেই চেঁচালে?

তাপসী চোখ বড়-বড় করে বলল, না, না। নামটা তো পরে দেখলাম। এই যে সিরিয়ালটা এখন চলছে...।—টিভির দিকে আঙুল দেখিয়ে ও বলল, ওটা থেকে একটা লোক...ওই যে, বুড়োমতন কালো, মাথায় টাক...ওই লোকটা হঠাৎ আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, গোলাপি শাড়িটা আপনাকে হেভি মানিয়েছে। কিন্তু এককানের দুল কোথায় গেল?—ডানকানে দুল পরতে ভুলে গেছেন?—তক্ষুনি কানে হাত দিয়ে দেখি, সত্যিই তো! এককানে দুল পরতে ভুলে গেছি। আর গোলাপি শাড়িটা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ...।

আমি হতভম্ব হয়ে তাপসীর পাশে বসে পড়লাম। ওর কথাগুলো যে সত্যি সেটা বুঝতেই পারছি, কিন্তু এখন কী করা?

টিভির দিকে তাকিয়ে চ্যানেল এক্স-এর প্রোগ্রাম দেখতে লাগলাম:

হঠাৎই বিজ্ঞাপনের ব্রেক শুরু হল। বিজ্ঞাপনে এমন সব প্রোডাক্টের কথা বলতে লাগল যেগুলোর নাম আমি কখনও শুনিনি। তারই মাঝে চ্যানেল এক্স-এর প্রচার শুরু হল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে চ্যানেলের গুণগান শুরু করল। ওরা বলতে লাগল: এরকম ইন্টারঅ্যাকটিভ চ্যানেল এই প্রথম। আপনাদের সামনে যেসব প্রোগ্রাম আমরা সবসময় পেশ করব সেগুলো ইউনিক এবং হাইলি ইন্টারঅ্যাকটিভ। আপনি সবসময় আমাদের প্রোগ্রামের একটা পার্ট। ইন ফ্যাক্ট, ইউ আর চ্যানেল এক্স! সো কিপ ওয়াচিং...।

এর পাঁচ-দশ সেকেন্ড পরেই আলোর ঝলকানি দিয়ে চ্যানেল এক্স উধাও।

সেদিন রাতে আমার কী যে মনে হল, খাওয়া-দাওয়ার পর টিভি দেখতে বসে গেলাম।

কতক্ষণ যে ঠায় টিভির সামনে বসেছিলাম জানি না। বোধহয় একটু তন্দ্রামতন এসে গিয়েছিল। হঠাৎই মনে হল কে যেন আমাকে ডাকছে: ও কাকু, শুনছেন? এই যে—।

চমকে উঠে চোখ খুললাম।

দেখি টিভির পরদায় বছরদশেকের একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে ডাকছে।

আমাকে সজাগ হয়ে উঠতে দেখেই ছেলেটা বলল, কাকু, খেলতে-খেলতে বলটা পড়ে গেছে—একটু দিন না...আমার হাত যাচ্ছে না...।

ও মা! ছেলেটা টিভির পরদা থেকে হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। ওর ফরসা রোগা হাতটা আমার চোখের সামনে বেরিয়ে এল টিভির বাইরে। বলের সন্ধানে হাতড়াতে লাগল আমার ঘরের মেঝেতে।

তখন খেয়াল করলাম, সত্যি-সত্যিই একটা নীল রঙের বল মেঝেতে পড়ে আছে। কিন্তু বহু চেষ্টায় কাঁধ ঝুঁকিয়েও ছেলেটার হাতের আঙুল বল পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না।

আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম। বলটার কাছে গিয়ে ওটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলাম। তারপর আলতো করে টিভির পরদার দিকে ছুড়ে দিলাম। ছেলেটা চট করে বলটা লুফে নিল। হেসে বলল, থ্যাংক ইউ, আঙ্কল—।

টিভির পরদায় ছেলেটা বল নিয়ে লোফালুফির নানান কসরত দেখাতে লাগল। সেটাই তখনকার প্রোগ্রাম। দেখাচ্ছে চ্যানেল এক্স।

আমি কিন্তু মোটেই অবাক হলাম না কিংবা ভয়ও পেলাম না। মনে হল, ইন্টারঅ্যাকটিভ চ্যানেল এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক।

তখনই টিভি থেকে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকল।

ঘুরে তাকিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার ফণীবাবু—ফণীভূষণ পাত্র। আমার বাড়ি থেকে চারটে বাড়ি এগিয়ে বাঁ-দিকটায় ওঁর প্রেস ছিল। গতবছর ভদ্রলোক মিনিবাসের ধাক্কায় মারা গেছেন।

আমি এবার অবাক হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি তখনও আমাকে নাম ধরে ডাকছেন। বলছেন, চলে এসো। এসো—এসো...।

তখনই দেখি ফণীবাবুর পাশে আমার মধুজ্যাঠা এসে দাঁড়িয়েছেন। মধুজ্যাঠা আমার দূরসম্পর্কের জ্যাঠামশাই ছিলেন। বসিরহাটে থাকতেন। তিনবছর আগে গলায় দড়ি দিয়ে সুইসাইড করেছেন।

মধুজ্যাঠাও আমাকে হাতছানি দিয়ে ফিসফিসে গলায় ডাকতে লাগলেন। বললেন, আয়, আয়—এখানে চলে আয়।

আমি এবার ভয় পেলাম। টিভির কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে এলাম।

দেখি কোথা থেকে যেন আরও অনেক পুরুষ-মহিলা মধুজ্যাঠা আর ফণীবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা সবাই ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ফণীবাবু বললেন, জানো, এরা সবাই অপঘাতে মারা গেছে—সবাই। কী কষ্ট ওদের!

মধুজ্যাঠা হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, আয়, চলে আয়। এদিকটাও খারাপ না...।

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। চিৎকারটা ঠিকঠাক বেরোল না। কেমন যেন ভাঙাচোরা কর্কশ—সাপ ব্যাং গিলে খাওয়ার সময় ব্যাং যেরকম ডাকে সেইরকম।

হঠাৎ চার-পাঁচটা হাত টিভির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। হাতগুলো অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে পৌঁছে গেল আমার কাছে। সাঁড়াশির মতো আমার হাত আঁকড়ে ধরল। এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক প্রচণ্ড টানে আমাকে নিয়ে গেল টিভির ভেতরে।

আমার কানে তখন ভেসে আসছিল চ্যানেল এক্স-এর প্রেজেন্টারের কথা: ...বিশ্বাস করুন, এরকম সুপার-ডুপার ইন্টারঅ্যাকটিভ চ্যানেল আপনি আগে কখনও দেখেননি...।

অনির্বাণ ছাই

আমাকে নামিয়ে দিয়ে লজঝড়ে বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

ধুলোর কুয়াশা ফিকে হলে চোখের সামনে যা দেখলাম তা যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই টিয়াপাখি-রঙের ধানখেত। বিকেলের রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও বড়-বড় গাছ। দু-একটা পাকা বাড়ি।

পিচের রাস্তা থেকে একটা চওড়া মোরাম বিছানো পথ ডানদিকে চলে গেছে। সেই পথের পাশে একটা বড় জামগাছ। অনির্বাণ এই গাছটার কথা বলেছিল। বলেছিল, ওই গাছের নীচে ও দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু এতবছর পর ওকে কি আমি চিনতে পারব? ও-ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। স্কুলে আমরা একসঙ্গে অনেক বছর পড়েছি বটে, কিন্তু স্কুল ছেড়েছি প্রায় বারো বছর হয়ে গেল। আমাদের দুজনের চেহারাই নিশ্চয়ই অনেক পালটে গেছে।

দেখলাম, গাছতলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা রোগা, কালো, মাথার চুল উড়ছে, হাতে ভাঁজ করা একটা কালো ছাতা। এছাড়া ধু-ধু রাস্তায় আর কেউ নেই। দুটো গাঙশালিক পথের ধারে ঘাসঝোপের মধ্যে খেলা করছিল।

আমি হাঁটতে-হাঁটতে পকেট থেকে সেলফোন বের করলাম। অনির্বাণের নম্বর দেখে ডায়াল করলাম।

দেখলাম, গাছতলার লোকটা পকেট থেকে ওর সেল বের করে কানে দিল।

আমি কথা বললাম, 'অনির্বাণ?'

'হ্যাঁ। তুই অনির্বাণ?'

'অফ কোর্স—অনির্বাণ নাম্বার ওয়ান।'

'আমি তোর জন্যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি। তুই কোথায়?'

'তোর দিকেই এগোচ্ছি—পায়ে হেঁটে...।'

এ-কথা যখন বললাম তখন আমাদের মধ্যে মাত্র হাতপাঁচেকের তফাত।

গাছের ছায়ার ভেতরে ঢুকে পড়ে আমি লোকটার একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। সেলফোন অফ করে পকেটে ঢুকিয়ে অবাক সুরে চেঁচিয়ে বললাম, 'তুই অনির্বাণ দুই?'

লোকটা হেসে আমাকে বুকে জাপটে ধরো: 'ঠিক বলেছিস। আজ কতবছর পরে একের সঙ্গে দুইয়ের দেখা হল বল তো! ভীষণ ভালো লাগছে রে—নতুন করে আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

প্রথম আবেগের ঝাপটা কেটে গেলে হারানো বন্ধুর দিকে ভালো করে তাকালাম। ও-ও আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

স্কুলে আমাদের স্কুলে একটা বিরল ঘটনা ছিলাম আমরা দুজন। কারণ, আমাদের দুজনেরই নাম অনির্বাণ সরকার। তাই গুলিয়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে স্কুলের স্যাররা কখন যেন আমাকে অনির্বাণ ওয়ান, আর ওকে অনির্বাণ টু করে দিয়েছিলেন। আমি মাথায় একটু বেশি লম্বা ছিলাম। হয়তো সেইজন্যেই 'ওয়ান' উপাধি পেয়েছিলাম। স্কুলের বন্ধুরা সংক্ষেপে আমাদের বলত 'ওয়ান' আর 'টু'।

টু আমার চেয়ে মাথায় খাটো হলে কী হবে ওর মাথা—মানে, ব্রেন—ছিল নাম্বার ওয়ান। তা ছাড়া ওর রং ছিল টকটকে ফরসা, আর আমি তার ঠিক উলটো—একেবারে কেষ্ট ঠাকুর।

ক্লাসে আমাদের বন্ধুত্বটা কী করে যেন বেশ আঠালো হয়ে গিয়েছিল। মনের সব কথা আমি ওকে খুলে বলতাম। আর ও-ও আমাকে সব কথা খুলে বলত।

নীচু ক্লাসে থেকে ওপরে উঠতে-উঠতে আমরা এক সঙ্গে বড় হচ্ছিলাম। সুখ-দুঃখগুলোকে নতুন করে চিনতে পারছিলাম, আর সেগুলো দুজনে মিলে ভাগ করে নিচ্ছিলাম। সবমিলিয়ে দিনগুলো বেশ কাটছিল।

তারপর স্কুল একদিন ফুরোল। চলে এল এক আর দুইয়ের ছাড়াছাড়ির দিন। বেশ মনে আছে, সেদিন স্কুল ছুটির পরে আমরা দুজনে বোসদের পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসেছিলাম। অনেক গল্প করেছিলাম। কেঁদেও ছিলাম।

আজও সব মনে আছে আমার।

তারপর কত মাস কত বছর যে কেটে গেছে! দুইয়ের কথা না ভুললেও স্মৃতির পাতা অনেকটা আবছা হয়ে এসেছিল। মনে-মনে শুধু চাইতাম ও যেখানেই থাক খুশিতে থাক, আনন্দের ধুলো মাখা থাক ওর কপালে। কারণ, অনির্বাণ বেশিরভাগ সময়েই খুব মনমরা হয়ে থাকত। আর একটু যেন চাপা স্বভাবের ছিল।

কলেজের পাট শেষ করে আমি যখন চাকরি করছি তখন আমাদেরই এক স্কুলের বন্ধু কমলেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ও বলল, 'টু, ওয়ান তোকে ফোন করবে। কোত্থেকে যেন আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমাকে ফোন করেছিল। নেক্সট উইকে শনিবার ওর বিয়ে। আমাকে যেতে বলেছে। তোকে বলবে। তবে আমার বোধহয় যাওয়া হবে না। কোন ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুর—মানে, আসনপুর না কেশবপুর—কোথায় যেন থাকে। যাকগে, তোকে ও ফোন করবে।'

অনির্বাণ আমাকে ফোন করেছিল। বিয়েতে নেমন্তন্নও করেছিল। কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। অফিসের কাজের চাপ আর কেশবপুরের দূরত্ব—এই দুটো ফ্যাক্টরই বাদ সেধেছিল।

বিয়েতে যাইনি বলে অনির্বাণ টু অভিমান করে আমাকে আর কখনও ফোন-টোন করেনি। আমিও সংকোচে ওকে ফোন করে উঠতে পারিনি।

এরপর বছর ছয়েক কেটে গেছে। ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কেমন একটা 'কিন্তু-কিন্তু' পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে গেছে। তারপর হঠাৎই ওর ফোন এল। মাত্র তিনদিন আগে।

'ওয়ান?'

'হ্যাঁ—।'

'টু বলছি।'

'অনির্বাণ। কেমন আছিস? শোন, আমি এক্সট্রিমলি সরি। তোর বিয়েতে যেতে পারিনি রে। এমন কাজের প্রেশার পড়ল যে, কী আর বলব। আমি...।'

'ওসব ফালতু কথা ছাড়, ওয়ান।' আমাকে রুক্ষভাবে থামিয়ে দিল অনির্বাণ: 'ওসব তো হাফডজন বছরের পুরোনো কথা। আজ খুব জরুরি দরকার তোকে ফোন করেছি। তোকে আমার বাড়িতে একবার আসতেই হবে। ভীষণ দরকার। কবে আসবি বল?

আমি ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, 'যাব, যাব। কিন্তু তোর কী হয়েছে বল তো? তোর কথা শুনে তোকে ভীষণ আপসেট বলে মনে হচ্ছে...।'

'তুই এলে সব বলব। তোর কাছে তো আমার গোপন কিছুই নেই! বল, কবে আসবি?'

একটু চিন্তা করে আমি বললাম, 'পরশু যাব। তা তোর ফ্যামিলি লাইফ কেমন চলছে বল। ওয়াইফ কেমন আছে? ছেলেমেয়ে ক'টা?'

অনির্বাণ টু চুপ করে গেল। কয়েকসেকেন্ড পর একটু যেন বিষণ্ণ গলায় বলল, 'ওদের নিয়েই তো প্রবলেম। ওয়াইফ...আর আমার চার বছরে ফুটফুটে মেয়েটা। তুই পরশু আয়, ওয়ান। আমাকে ঝোলাস না যেন! তুই এলে সব বলব। তোর হেলপ না পেলে আমার সর্বনাশ হবে...।'

আরও কয়েকটা কথার পর আমি শপথ করে বলছিলাম, '...পরশু বিকেলে তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রমিস।'

'থ্যাংকু ইউ, ভাই। আমি তোর জন্যে কেশবপুর মোড়ে জামগাছতলায় ওয়েট করব...।'

এখন জামগাছতলায় দাঁড়ানো লোকটাকে আমি খুঁটিয়ে দেখছিলাম। নাঃ, অনির্বাণ টু আগের চেয়ে অনেক কালো হয়ে গেছে। চেহারাও অনেক শুকিয়ে গেছে। এই বয়েসেই গাল বসে গেছে। ঠোঁট খসখসে। চোখগুলো বড় বেশি সাদাটে।

ও আমাকে বাড়ির পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল। আমি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও ছাতাটা খুলে মাথার ওপরে ধরে রইল।

চওড়া রাস্তা ছেড়ে আমরা সরু পথে ঢুকে পড়লাম। দুপাশে বাঁশগাছ, জবাফুলের গাছ, ভেরেন্ডার বেড়া। কয়েকটা ছোট-ছোট ডোবা। সেখানে লুকোনো চুনোমাছ বুড়বুড়ি কাটছে।

পথে বেশ কয়েকটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল। বাখারির কাঠামোয় গোবর আর মাটির চাপান দেওয়া দেওয়াল। কোথাও-কোথাও মাটির চাঙড় খসে পড়েছে। সেই কুঁড়েঘরের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

উঁচু-নীচু কাঁচা পথ পেরিয়ে একটা সমতল মাটির উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। আরও একটু এগোতেই একটা মামুলি দোতলা বাড়ি। তার একটা অংশ পুড়ে কালচে হয়ে ধসে পড়েছে।

সেই বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অনির্বান টু বলল, 'আয়, এটাই আমার বাড়ি। দেখেছিস, কীরকম ড্যামেজ হয়ে গেছে!'

পথে আসার সময় অনির্বাণ ওর স্ত্রী আর মেয়ের কথা বলছিল। কাঞ্চন আর কাঞ্চি। ওদের নিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকাটাই একটা স্বপ্নের মতো। কী দারুণ জীবন! অনেক ভাগ্য করে মানুষ এরকম জীবন পায়। আরও কত ভালো-ভালো কথা।

ওর কথা শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিল এবার বাবা-মায়ের কথা মেনে নিয়ে বিয়েটা করে নিলেই হয়! স্বপ্নের মতো দারুণ জীবন তো সবাই চায়!

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ পেলাম। দুধ উথলে উনুনে পড়লে যেমন পোড়া গন্ধ বেরোয়।

আমি নাক টেনে গন্ধটা কোনদিক থেকে আসছে সেটা ঠাওর করতে চেষ্টা করছিলাম। অনির্বাণকে জিগ্যেস করলাম, 'কী পুড়ছে রে?'

ও নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'আমার বাড়ি। বাড়িটা পুড়ছে।'

আমি ওর ঠাট্টার মানে বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল মুখটা যেন বিষণ্ণ পাথর দিয়ে তৈরি।

বাড়িতে ঢুকে অনির্বাণ দোতলার সিঁড়ি দিকে এগোল। আমি বাধ্য অতিথির মতো ওর পিছু নিলাম। আমাদের পায়ের শব্দ কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

আমি কান পেতে কাঞ্চন বা কাঞ্চির গলার আওয়াজ শুনতে চাইলাম, কিন্তু পেলাম না। লক্ষ করলাম, যে-অনির্বাণ এতক্ষণ ধরে এত কথা বলছিল সে বাড়িতে ঢোকার পর থেকে কীরকম যেন চুপচাপ হয়ে গেছে।

আমরা দোতলায় উঠে এলাম।

সামনেই চওড়া বারান্দা। চকচকে লাল মেঝে। রেলিঙের ওপরে গ্রিল দেওয়া।

বারান্দার ডানদিকে একটা পোড়া দরজা। সেটা পেরিয়ে একটা ঘর। তার দেওয়ালগুলো কালো, ফাটল ধরা, কোথাও-কোথাও ধসে পড়েছে।

পোড়া গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে নাকে ধাক্কা মারল।

সেই ঘরটার মধ্যে আমাকে নিয়ে ঢুকল অনির্বাণ। সঙ্গে-সঙ্গে পোড়া গন্ধটা শ্মশানের গন্ধ হয়ে গেল।

আমার চারপাশে পোড়া ক্যালেন্ডার, পোড়া দেওয়াল-ঘড়ি, পোড়া খাট-বিছানা, পোড়া জানলা, পোড়া আলনার জামাকাপড়, পোড়া ড্রেসিংটেবিল, আর পোড়া ফটোগ্রাফ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

অনেকক্ষণ পর প্রায় ফিসফিস করে ওকে জিগ্যেস করলাম, 'কবে হল?'

ও বলল, 'হয়েছে। দাঁড়া, তোকে একটা জিনিস দেখাই। যে জন্যে তোকে এতদূর ডেকে এনেছি...।'

কথাগুলো বলতে-বলতেই ঘরটার আর-একটা পোড়া দরজা দিয়ে অনির্বাণ টু চট করে কোথায় চলে গেল।

আমার কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগছিল। লোকের বাড়িতে এলে আগে লোক একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করে, চা-টা দেয়—তারপর...। তার বদলে ও এসব কী করছে!

বাড়িটায় কোনও লোকজনের আওয়াজ নেই। চারপাশে পোড়া গন্ধ। ওর আচরণও কেমন অদ্ভুত। তা ছাড়া...।

একটা টিনের বাক্স হাতে ফিরে এল অনির্বাণ। বাক্সটা কালচে, তোবড়ানো। জুতোর বাক্সের চেয়ে মাপে খানিকটা বড়। দেখেই বোঝা যায় বাক্সটা অনেক পুরোনো।

অনির্বাণ বিষণ্ণ গলায় বলল, 'ওয়ান, তোকে এটা দেব বলে এতদিন ওয়েট করেছি। স্কুলে তুই আর আমি ছিলাম যাকে বলে হরিহর আত্মা। তাই এটা আমি তোর জন্যে রেখেছি। তুই এটার একটা গতি না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। প্লিজ, ওয়ান, তুই আমাকে এইটুকু হেলপ কর...।'

বাক্সটা ও আমার হাতে দিল। আমি ওর কথা শুনতে-শুনতে যেন হিপনোটাইজড হয়ে গিয়েছিলাম। রোবটের মতো হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিলাম।

বাক্সটা বেশ হালকা কিন্তু হাতে গরম ঠেকল। হাত পুড়ে যাওয়ার মতো নয়, কিন্তু বেশ গরম।

কী আছে বাক্সের ভেতরে?

সেই প্রশ্নটাই করলাম ওকে, 'এর ভেতরে কী আছে রে?'

অনির্বাণ প্রশ্ন শুনে উসখুস করে উঠল। বারকয়েক মেঝের দিকে তাকাল। আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে নখের ডগা খুঁটতে লাগল।

'কী আছে বলবি তো!'

একটু ইতস্তত করে ও বিড়বিড় করে বলল, 'ওয়ান, কিছুদিন আগে আমার ফ্যামিলিতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। আচমকা এই ঘরটায় আগুন লেগে যায়। আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারকেশ্বরে একটা কাজে গিয়েছিলাম। ফিরে দেখি সব শেষ! কাঞ্চন...আর কাঞ্চি... আমার পুতুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটা...ওরা আর নেই। আগুন...আগুন ওদের খেয়ে ফেলেছে...খেয়ে চেটেপুটে সব শেষ। শেষ!' কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল অনির্বাণ।

'সে কী রে! বলিস কী! আশপাশের কেউ কিছু করতে পারল না?'

মাথা নাড়ল অনির্বাণ: 'নাঃ। কিছু করে ওঠার আগেই সব শেষ। সব জ্বলে-পুড়ে খাক।'

হঠাৎই ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে এল। একইসঙ্গে মেঘের ডাক কানে এল।

অবাক হয়ে একটা জানলার দিকে তাকালাম।

আশ্চর্য! একটু আগেই খোলা জানলা দিয়ে একটা নারকেল গাছ আর বিকেলের রোদ দেখা যাচ্ছিল—এখন নারকেল গাছটা আছে, তবে রোদ লুকিয়ে পড়েছে। আর গাছটাও অস্পষ্ট, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

অনির্বাণ দেওয়ালের পোড়া সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে বোধহয় একটা সুইচ টিপে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বালব হলদেটে আলো ছড়িয়ে দিল ঘরে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। পোড়া ঘর, বাইরের আঁধার, বালবের আলোয় তৈরি হওয়া কালো-কালো ছায়া, আর সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরকম অনির্বাণ আমাকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিল।

'কী আছে এই বাক্সের ভেতরে?' ফাঁপা গলায় ওকে প্রশ্ন করলাম।

'বাক্স খুলে দেখ...।'

আমার ভেতরে একটা জেদ তৈরি হচ্ছিল। ভয় পেলেও সেই জেদের জোরেই একটানে বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেললাম।

বাক্স ভরতি কালো ছাই।

'ওগুলো কাঞ্চন আর কাঞ্চির ছাই...।' অনির্বাণ টু বলল।

আমি সম্মোহিতের মতো ছাইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'এগুলো তুই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিস...।' ঠোঁট টিপে ও কান্না চাপতে চাইল। তারপর আর্ত সুরে বলল, 'দিবি তো?'

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ—দেব।' তবে একইসঙ্গে ভাবছিলাম, ওর বউ আর মেয়ে কবে আগুনে পুড়ে মারা গেছে? ও বলছিল, 'কিছুদিন আগে।' তা হলে ছাইগুলো এখনও গরম থাকে কেমন করে?

আমার অবাক ভাবটা অনির্বাণের চোখে পড়ল। ও বলল, 'ভাবছিস ছাইগুলো এখনও গরম আছে কেমন করে, তাই না? তা হলে শোন, ওই ছাইয়ের আগুন এখনও নেভেনি। এখনও আমি জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তোর যদি এমন হত তুই কী করতিস? যদি তোর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ দুজন এরকম আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যেত তা হলে তোর মনের অবস্থাটা কী হত? বল, সত্যি করে বল। একটিবার বল...।'

ওর প্রত্যাশা ভরা সজল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল। কে যেন আমাকে দিয়ে আচমকা বলিয়ে নিল, 'কিছু মনে করিস না। ওরকম হলে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করত না...।'

'ঠিক বলেছিস।' তর্জনী তুলে উত্তেজিতভাবে সায় দিল অনির্বাণ। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে ওর জিভ জড়িয়ে গেল: 'তাই কী করেছিলাম জানিস?' কথাটা বলেই ও একছুটে ভেতরের দরজা পেরিয়ে কোথায় চলে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা প্লাস্টিকের জেরিক্যান হাতে আবার ঘরে ফিরে এল। ক্যানের ছিপি খুলতে-খুলতে বলল, 'কেরোসিন নিয়ে নিজের গায়ে মাথায় ঢালতে শুরু করেছিলাম...' জেরিক্যান উলটে পাগলের মতো নিজের শরীরে কেরোসিন ঢালতে লাগল ও। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলতে লাগল, 'এই যে—এইভাবে। এইভাবে...ঢালছিলাম...।'

কেরোসিনে ওর মাথার চুল ভিজে গেল। ভিজে গেল সারা শরীর, গায়ের জামাকাপড়। ঘরের মেঝেতে কেরোসিনের বন্যা বয়ে গেল। তীব্র গন্ধে চারদিক ভেসে গেল।

'অনির্বাণ! অনির্বাণ! কী করছিস তুই?' আমি ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠলাম।

আমার চিৎকার অনির্বাণ টু শুনতে পেল বলে মনে হল না। কেরোসিনের ক্যানটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে তরলের শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত নিজের গায়ে ঢেলে দিচ্ছিল।

'...তারপর ছুটে রান্নাঘরের গিয়ে দেশলাইটা নিয়ে এলাম...' কথা বলতে-বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল ও। এবং কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে ফিরে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তারপর...তারপর...।'

ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল। তার সঙ্গে জ্বলে উঠল অনির্বাণ। দাউদাউ আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক হতে লাগল।

হঠাৎই এক দমকা বাতাস কোথা থেকে যেন ছুটে এল। ঘরের ভেতরে পাগল করা ঝড় তুলল। সেই ঝড়ে আমার হাতে ধরা বাক্সের ছাই উড়তে লাগল। ছাইয়ের গুঁড়োয়

তৈরি কালো মেঘ খ্যাপা মোষের মতো ঘরে বাতাসে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

উড়ে বেড়ানো ছাইয়ের কালো কুয়াশা ভেদ করে জ্বলন্ত অনির্বাণকে দেখা যাচ্ছিল। ওর উজ্জ্বল শরীরটা শূন্যে ভেসে উঠে এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল। ওর যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠা স্বর শোনা গেল: 'ওদের ছেড়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম রে। তাই...তাই... তোর হাতের ওই বাক্সের ভেতরে আমিও আছি। কাঞ্চন আর কাঞ্চির সঙ্গে মিশে আছি... মিশে আছি...। আর আজও জ্বলে-পুড়ে মারছি। ওই ছাইয়ের আগুন আজও নেভেনি রে...।'

আলো জ্বেলো না, কেউ শব্দ কোরো না...

কারণ, ঘরের আলো যদি জ্বেলে রাখো, যদি শব্দ করো, তাহলে যাঁর আবির্ভাবের জন্যে এত আয়োজন, এত ডাকাডাকি, তিনি আর দেখা দেবেন না।

এ যেন এক অন্যরকম পুজো! তাই এর জন্যে প্রয়োজন অন্যরকম উপচার। দেবতার আরাধনা একা-একা তুমি করতে পারো, কিন্তু এঁকে আহ্বান জানানোর সময় একা হলে চলবে না—অন্তত তিনজন একসঙ্গে বসা চাই। 'প্ল্যানচেট' অথবা প্রেতচক্রের নিয়মই তাই।

কীভাবে বসবে সেটা এবারে বলি শোনো।

একটা ছোট্ট গোল টেবিলকে ঘিরে থাকবে কয়েকটা চেয়ার। ধরো, চারটে চেয়ার। সেই চেয়ারে তিনজন বসবে, তারপর তুমিও বসবে। তোমরা টানটান হয়ে বসে একে অপরের হাত ধরে থাকবে—তবে দেখবে কারও হাঁটুর সঙ্গে যেন কারও হাঁটুর ছোঁয়া না লাগে।

একটা কথা মনে রেখো—ঘরটা যেন পুরোপুরি অন্ধকার না হয়। ঘরের কোথাও একটা ছোট মোমবাতি জ্বেলে রাখতে পারো। সেই অল্প আলোয় তোমাদের মুখগুলো অস্পষ্টভাবে হলেও যেন দেখা যায়।

তোমরা সবাই শান্ত হয়ে বসবে। চুপ করে শুধু তাঁর কথাই চিন্তা করবে যাঁকে আজ আহ্বানের আয়োজন করেছ তোমরা। ইচ্ছে করলে হালকা কোনও মোলায়েম সুর বাজাতে পারো টেপরেকর্ডারে। তবে বেশিক্ষণ নয়—দশ কি পনেরো মিনিটের জন্যে। তারপর... তারপর তোমাদের মধ্যে যে মিডিয়াম—মানে, যাকে অবলম্বন করে তিনি দেখা দেবেন—যে সবাইকে ফিসফিস করে জানাবে, কেন তোমরা আলো-আঁধারিতে একটা গেল টেবিলকে ঘিরে হাতে হাত ধরে বসেছ। কার কথা তোমরা সবাই ভাববে, কার স্মৃতিকথা তোমরা কল্পনার চোখে জীবন্তভাবে 'দেখতে' চেষ্টা করবে। শুধু ভাববে তাঁর কথা, শুধু ভাববে, শুধু ভাববে। আর একইসঙ্গে ফিসফিস করে তাঁর নাম ধরে ডাকবে: 'এসো... তুমি এসো...।'

হঠাৎই একসময় তোমরা টেবিলের পায়ার একটা শব্দ শুনতে পাবে, শুনতে পাবে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। তখন হয়তো তুমি প্রশ্ন করবে, 'কেউ কি এসেছেন?'

কোনও উত্তর তুমি পাবে না। তবে তার বদলে টেবিলের পায়া নড়ে উঠে একবার শব্দ করবে: খুট। যার মানে, হ্যাঁ—এসেছি।

তোমরা প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারবে না। তোমরা ভয় পাবে, ভীষণ অবাক হবে। কিছুক্ষণ তোমরা কেউই কথা বলতে পারবে না। তারপর...তারপর তোমাদের মধ্যেই কেউ হয়তো জিগ্যেস করবে, 'আপনি কি এ-ঘরে আগে থেকেই ছিলেন?'

টেবিলের পায়া নড়ে উঠবে অন্ধকারে। শব্দ করে 'খট-খট'—দুবার। যার মানে, না—এ-ঘরে আগে ছিলাম না।

এবার তোমার শীত করবে। মনে হবে, ঘরের বাতাস হঠাৎই যেন হিম ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবহাওয়া জেলির মতো ভারী হয়ে গেছে।

এরপর মিডিয়াম তোমাদের হয়ে তাঁকে শব্দ করবে—আর তিনি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' এই ঢঙে প্রশ্নের উত্তর দেবেন। অর্থাৎ, গোল টেবিলটা শব্দ করে নড়ে উঠবে—হয় একবার, নয় দুবার।

ছায়া-অন্ধকারে ঘটনাক্রম যত এগোবে ততই তুমি টের পাবে যে, তোমার হাতে ধরা হাত দুটো বেশ কাঠ-কাঠ হয়ে উঠেছে, অল্প-অল্প কাঁপছে। তোমাদের কেউ-কেউ—হয়তো তুমি নও—উসখুস করছে, মুখে চাপা 'উঃ...আঃ' শব্দ করছে।

এর মানে কী জানো?

ওরা ভয় পাচ্ছে। এই প্রেতচক্র ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কিন্তু কী এক অলৌকিক টানে পারছে না। ভয়ে সিঁটিয়ে চেয়ারে বসে আছে। না, না, তোমাকে বলছি না। তুমি নিশ্চয়ই ওদের মতো ভয় পাওনি—কারণ, তোমার সাহস হয়তো অনেক বেশি।

এবার তোমরা একটা কুয়াশা দেখতে পেলে। শূন্যে, টেবিলের ঠিক ওপরে, ধীরে-ধীরে গাঢ় হচ্ছে, জমাট বাঁধছে। অন্ধকার ঘরে ছাইরঙা মেঘ। কী অদ্ভুত! আর একইসঙ্গে একটা অচেনা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

তোমাদের মিডিয়াম ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? আপনার নাম কী?'

মেঘের সঙ্গে মেঘ ঘষা লাগলে শব্দ হয় কি না জানি না, কিন্তু একটা খসখস শব্দ শোনা গেল। মনে হল যেন ওই মেঘটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে, কাঁপছে।

একই প্রশ্ন আবার করল মিডিয়াম। তারপর আবার। তারপর আরও একবার।

তখন অদ্ভুত কাণ্ড হল একটা। ফিসফিস করে কেউ যেন বলল, 'আমি...কেউ...না। আগে...ছিলাম। এখন...আমি...নেই। আমি এখন কেউ না...।'

তুমি একটা ঝাঁকুনি খেলে। কে কথা বলল? এতগুলো কথা! ভুল শোনার তো কোনও প্রশ্ন নেই! তা হলে কথাগুলো বলল কে?

তোমার গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু তুমি চেয়ারে বসেই রইলে। বেশ টের পাচ্ছ, হাতে হাত ধরা অবস্থাতেও তোমার হাতের পাতা কাঁপছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্রেফ মনের জোরে তুমি বসে আছ। গোল টেবিল ঘিরে হাতে হাত ধরে তৈরি করা 'চক্র' ভাঙছ না।

তুমি মনে-মনে যুক্তি তৈরি করতে চাইলে। অকালের শীত যে তোমার গায়ে কাঁটা ফুটিয়ে তুলেছে সেটার অন্য ব্যাখ্যা তুমি খুঁজলে। মিডিয়াম চুপ করে আছে—হয়তো ভয় পেয়েছে। কিন্তু তুমি তো সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র নও। তাই তুমি মিডিয়ামকে ডিঙিয়ে প্রশ্ন করলে, 'টেবিলটা কি আপনি নাড়াচ্ছিলেন?'

এর উত্তরে ঘরের কুয়াশায় আবার কাঁপন ধরল। মোমের আলো তার মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে ছোট মাপের এক অদ্ভুত রামধনু তৈরি করে ফেলল। তারপর সেই রামধনু

তিরতির করে কাঁপতে লাগল। সেইসঙ্গে ঘরের জমাট বাতাসেও কাঁপন ধরল।

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে তুমি ফিসফিসে হাসির শব্দ পেলে যেন। শব্দ না করে কেউ হাসছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে হাসছে।

তোমার চোখ এবার বড় হল, মুখটা হাঁ হল। তোমার তিনসঙ্গীরও তখন একই অবস্থা। অবশ্য তুমি ওদের স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ না।

হঠাৎ কেমন একটা গোঙানির শব্দ পাওয়া গেল। যন্ত্রণায় গোঙানি।

তুমি তখনও ভয় পেলে না। বরং তোমার মনের ভেতরে লড়াইয়ের একটা জেদ তৈরি করলে। অন্য তিনজনকে নিজের সাহস দেখানোর জন্যে একটু উঁচু গলায় একই প্রশ্ন করলে, 'টেবিলটা কি আপনি নাড়াচ্ছিলেন?'

এবার উত্তর পাওয়া গেল সরাসরি। টেবিলের পায়াটা যেন মেঝেতে 'পা ঠুকল'। একবার। যার মানে 'হ্যাঁ।'

হঠাৎই তোমার মনে সন্দেহ তৈরি হল। টেবিলের এইসব ব্যাপার-স্যাপারগুলো বাকি তিনজনের কারও কীর্তি নয়তো! হয়তো প্রেতচক্রে বসে-বসেই কেউ অন্ধকারে লুকিয়ে নড়বড়ে টেবিলকে নাড়াচ্ছে। মেঝেতে তার পায়া ঠুকে দিচ্ছে। দরকার মতো একবার কিংবা দুবার।

কিন্তু ওই কুয়াশা? যেটা এখনও তোমার চোখের সামনে শূন্যে নিরালম্ব হয়ে ভেসে রয়েছে? সুগন্ধটা সামান্য ফিকে হয়ে এসেছে বটে কিন্তু এখনও অস্তিমান। এই কুয়াশা কি কারও পক্ষে তৈরি করা সম্ভব? কিংবা ওই মিনিয়েচার রামধনু?

কেন নয়?

তুমি নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝালে। হয়তো তোমার তিন সঙ্গীর কেউ সবাইকে লুকিয়ে একটা বোতলে বন্দি করে খানিকটা ধূপের ধোঁয়া নিয়ে এসেছে। তারপর..।

কিন্তু সেই ধূপের ধোঁয়া সে ইচ্ছেমতো বোতলের বাইরে বের করবে কেমন করে?

এই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজে পেলে তুমি। গ্যাসের প্রসারণের সূত্র। বোতলের মুখ খুলে দু-হাতের তালু বোতলের গায়ে ভালো করে চেপে ধরে রাখলেই কাজ হাসিল করা যাবে। তালুর উত্তাপ বোতলের কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে পৌঁছে যাবে ধোঁয়ায়—মানে, গ্যাসে। গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বাড়বে। তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসবে বোতলের মুখ দিয়ে। সুতরাং..।

তোমার মনে নতুন প্রশ্ন জেগে উঠল। ধোঁয়াটা বোতল থেকে বেরিয়ে শূন্যে একই জায়গায় ভেসে আছে কেমন করে? কেমন করে তৈরি হল ওই রামধনু?

এবার তোমার যুক্তি হোঁচট খেল। তোমার বিজ্ঞানমনস্ক মন আহত হল। তোমার আস্থায় আঁচড় পড়ল।

তুমি ভাবতে লাগলে। কারণ কিছুতেই হাল ছাড়তে রাজি নও তুমি।

একটু পরেই উত্তর খুঁজে পেলে।

সিনেমায় যেমন দেখায়, নায়ক-নায়িকার পায়ের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে জমাট ধোঁয়া। একই জায়গায় থেমে রয়েছে—ওপরে ভেসে উঠছে না। হয়তো সেইরকম কোনও

কেমিক্যাল-ধোঁয়া ব্যবহার করেছে তোমাদের কেউ। তারপর তার ওপরে লুকোনো কোনও টর্চ থেকে স্পেশাল রঙিন আলো ফেলে রামধনুর হলোগ্রাম ইমেজ তৈরি করেছে।

তুমি স্বস্তির শ্বাস ফেললে। যাক, অবশেষে একটা নড়বড়ে হলেও যুক্তি খাড়া করতে পেরেছ তুমি।

নাঃ, এইসব প্ল্যানচেট-ফ্যানচেটে তোমার আর বিশ্বাস নেই। সব বাজে কথা। মিডিয়ামগুলো সব জালিয়াত। ম্যাজিশিয়ান হ্যারি হুডিনি এইসব জালিয়াত মিডিয়ামদের ধরে-ধরে বেনকাব করত। এতক্ষণ এইভাবে বসে-বসে ফালতু বাজে সময় নষ্ট হল।

তুমি হঠাৎই ওই ধোঁয়া—কিংবা কুয়াশা—লক্ষ্য করে জোরে ফুঁ দিলে। তোমাকে আবারও অবাক করে দিয়ে ওই ছোট্ট মেঘের টুকরোটা একইরকম রয়ে গেল। রামধনুটাও।

নাঃ, যুক্তি দিয়ে এটার একটা ব্যাখ্যা বের করতে হবে।

তুমি হঠাৎই সঙ্গীদের হাত ছেড়ে দিলে। বেশ জোরের সঙ্গে বললে, 'তোদের মধ্যে কে চালাকি করছিস বল—।'

সবাই চমকে উঠল। অন্ধকার আর মোমের আলোয় মাখামাখি তোমার মুখের দিকে তাকাল। ওরা অসহায়ভাবে বলল যে, ওরা সত্যিই কোনও চালাকি করেনি।

তুমি বিশ্বাস করলে না। শূন্যে ঝুলে থাকা মেঘের মধ্যে পাগলের মতো এলোমেলো হাত চালালে।

মেঘটা ঘেঁটে গেল। রামধনু মিলিয়ে গেল। সাদা কুয়াশার টুকরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যে ভেসে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তারই মধ্যে একটা বিকৃত মুখের চেহারা দেখতে পেলে তুমি।

তুমি সেটাকে কোনও আমল দিলে না। আকাশের মেঘও তো অনেক সময় নানান ছবির চেহারা নেয়! এই বিকৃত ভয়ংকর মুখটাও সেরকম কিছু। তুমি নিজেকে বোঝালে, বিজ্ঞান আর যুক্তিই চিরকাল শেষ কথা বলবে।

কিন্তু তোমার সঙ্গীরা ভয় পেল। ওই মুখটা দেখে হঠাৎই একটা আতঙ্কের ঝোঁক ওদের গ্রাস করল। তোমার বকুনির তোয়াক্কা না করেই ওরা ছুট লাগাল ঘরের দরজার দিকে।

তুমি হকচকিয়ে গেলে। কিন্তু তারপরই চেঁচামেচি করে ধমক দিয়ে ওদের ধাওয়া করলে।

এতক্ষণ ধরে এত ঘটনা দেখার পরেও, শোনার পরেও, তুমি বিশ্বাস করতে চাইছ না। ভাবছ প্ল্যানচেট আসলে বুজরুকি, ম্যাজিকের লোকঠকানো কলাকৌশল।

কী করে তোমাকে যে বিশ্বাস করাই!

তোমার বন্ধুরা তখন দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার দিকে ছুটছে। আর তাদের পেছন-পেছন তাড়া করে তুমিও ছুটছ।

তোমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আমি তখন মরিয়া। তাই ঘরের বাইরে আমিও বেরিয়ে এলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম।

আমি জানতাম, এবার তুমি পেছন ফিরে তাকাবে—এবং বিশ্বাস করবে।

ঠিক তাই হল। পেছনে খটখট শব্দ শুনে তুমি সিঁড়ির ওপর থেকে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালে।

দেখলে, প্ল্যানচেটের গোল টেবিলটা খটখট শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে তোমাকে ধাওয়া করে উঠছে।

বলো, এবারে তোমার বিশ্বাস হল তো?

কুয়াশা, অন্ধকার এবং...

বৃষ্টি। তবে কুয়াশা আর অন্ধকার যতটা ঘন বৃষ্টি ততটা নয়। ঝিরঝিরে মতন। গাড়ির উইন্ডশিল্ডে বৃষ্টির বাচ্চা-বাচ্চা ফোঁটাগুলো যেন খেলার ছলে দস্যিপনা করে ছিটকে পড়ছিল।

শীতের রাতে কুয়াশা আর অন্ধকার থাকাটা স্বাভাবিক। শুধু বৃষ্টিটাই হিসেবের বাইরে।

সামনের কাচের ওপরে ওয়াইপার চলছিল। একইসঙ্গে হেডলাইটের আলো ছিটকে যাচ্ছিল অন্ধকার আর কুয়াশার দিকে।

আমার একহাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাতে সিগারেট। জানি, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা বেশ কিছুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি।

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

অন্ধকার রাত। গাঢ় কুয়াশা। জমাট শীত। হালকা বৃষ্টি। কালো ফিতের মতো রাস্তা। হেডলাইটের হলদে আলো।

সবমিলিয়ে বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই রাস্তা ধরে আজীবন গাড়ি চালাই। এমনকী জীবনের পরেও।

ভাবের ঘোরে বোধহয় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। সেইজন্যেই মেয়েটাকে প্রথমে দেখতে পাইনি। পাশের গাছপালার ফাঁক থেকে কোন মুহূর্তে যেন আচমকা ছিটকে চলে এসেছে গাড়ির সামনে।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু-হাত সামনে বাড়ানো। বড়-বড় আয়ত চোখে নিছক ভয়।

কী করে যেন শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষতে পারলাম।

বিশ্রী শব্দ হল। ভেজা রাস্তায় গাড়ির চাকা পিছলে গেল। কপাল ভালো যে, আমার পেছনে কোনও গাড়ি ছিল না। থাকলে সে নির্ঘাত আমার গাড়িতে ধাক্কা মেরে বসত।

মেয়েটি টাল সামলাতে গিয়ে গাড়ির বনেটের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল। হেডলাইটের আলো ওর কোমরের কাছটা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। থুতনির নীচে আর গালে আলো পড়ে চোখের কোটর দুটো অন্ধকার গর্তের মতো লাগছিল।

হঠাৎ করেই যেন একটা ঠান্ডা শিরশিরে ভাব আমাকে ছুঁয়ে গেল।

মেয়েটা আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিল। প্রায় ছুটে চলে এল গাড়ির জানলার কাছে। কাচের ওপর শব্দ করে টোকা দিল কয়েকবার।

একমুহূর্ত কী ভেবে আমি ঝুঁকে পড়ে জানলার কাচ সামান্য নামালাম।

মেয়েটি হাত দিয়ে বৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করতে-করতে বলল, 'দরজাটা একটু খুলুন না—প্লিজ...।'

ওর মুখের একপাশে হেডলাইটের আলোর ঠিকরে আসা আভা। বাকিটা ছায়া-ছায়া, অন্ধকার। তারই মধ্যে কয়েকটা জলের ফোঁটা চিকচিক করছে।

কী ভেবে দরজাটা খুলে দিলাম। আমার দিকে জানলার কাচ নামিয়ে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলাম।

ও চট করে উঠে বসল আমার পাশে। দরজা বন্ধ করে ওড়না দিয়ে মুখটা মুছে নিল। তারপর জানলার কাচটা তুলে দিল।

লক্ষ করলাম, মেয়েটা হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকটা পথ ছুটে এসেছে। ওড়নার আঁচল দিয়ে নাকের কাছে বাতাস করল। বোধহয় সিগারেটের গন্ধে অস্বস্তি হচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আড়চোখে মেয়েটাকে দেখলাম।

হলদে আর লাল চুড়িদার। সেইরকম একটা ওড়না। জামার ওপরে কালচে রঙের একটা স্লিভলেস সোয়েটার। বয়েস আটাশ কি তিরিশ। বেশ সুন্দর দেখতে। প্রসাধন তেমন না থাকলেও শরীর থেকে একটা হালকা গন্ধ বেরোচ্ছে।

হঠাৎই মনে হল, আমি যেন সিনেমার ভেতরে ঢুকে পড়েছি। কারণ, সিনেমা-টিনেমায় এরকম হয়।

চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলাম, 'এই রাতে হঠাৎ এভাবে কোথা থেকে এলেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে তাকাল আমার দিকে: 'কেন? জিগ্যেস করছেন কেন?'

ওর কথার সুরে একটা চাপা ভয় টের পেলাম। সেইসঙ্গে চোখের নজরে দু-চারফোঁটা সন্দেহ।

আমি হাসলাম: 'ভয় নেই—আমি পুলিশের লোক নই। যেভাবে এই রাতে কুয়াশা আর বৃষ্টির মধ্যে আপনি হঠাৎ করে আমার গাড়ির সামনে এসে পড়লেন—তাতে প্রশ্নটা করে খুব একটা অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয় না।'

কয়েক মুহূর্ত ঠোঁট টিপে বসে রইল। তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এখনও বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। বুক ওঠা-নামা করছে।

আমি আবার কথা বললাম, 'খুব পার্সোনাল কিছু হলে বলার দরকার নেই।'

রাস্তার বাঁকে ঝোপের গোড়ায় একটা কুকুর চোখে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় জন্তুটার সবুজ চোখ ঝিকিয়ে উঠল। আমি মুখ ফেরালাম মেয়েটার দিকে: 'যাকগে, আমার নাম রনিত। আপনি কোন দিকে যাবেন?'

'আপনি যেদিকে যাচ্ছেন। আমি আসলে এখান থেকে পালাতে চাই—যতদূরে পারা যায়। আমার নাম সোনাল।'

'বাঃ, বেশ অদ্ভুত নাম তো!' তারিফ করে বললাম, 'তা কার কাছ থেকে পালাতে চান? হাজব্যান্ডের কাছ থেকে?'

আবার চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকাল: 'কী করে বুঝলেন?'

কেতার হাসি হাসলাম, বললাম, 'আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। বছর দুয়েক হল এই গুণটা গজিয়ে উঠেছে। তবে কীভাবে হল সেটা এগজ্যাক্টলি বলতে পারব না।'

'আমার হাজব্যান্ডটা একটা জানোয়ার—' কথাটা বলার সময় ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে বেঁকাল সোনাল। ওর চোয়াল শক্ত হল: 'ও পারে না এমন কোনও কাজ নেই। মানে, পারত না এমন কোনও কাজ নেই। আপনি অচেনা মানুষ—তাও বলছি। দিন-রাত নেশা করত, হাত তুলত, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করত...।'

সোনালের দিকে তাকালাম।

এরকম ফুটফুটে কোমলতা মাখা মেয়ের গায়ে কী করে কেউ হাত তোলে!

'...দিন আর রাতগুলো এত বিশ্রীভাবে কাটাত যে, মনে হত আমি আর বেঁচে নেই। প্রেতাত্মার মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি...।'

'আর এখন?' কথার পিঠে কথা বলার ছলে প্রশ্নটা করলাম।

'এখন তো মুক্ত। মানে টোটাল ফ্রিডম। এখন আমি যা খুশি তাই করতে পারি—।'

'তাই? জানতে চাইলেন না তো আমি কোথায় যাচ্ছি।'

'জেনে কী হবে? নতুন জীবন শুরু করার সময় এসব ফালতু প্রশ্নের কোনও দাম নেই...।'

আমি অবাক হয়ে সোনালকে দেখলাম। একটু আগে ও ভয়, সন্দেহ, উৎকণ্ঠায় ভাসছিল। আর এখন বেপরোয়া, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত। ও সত্যি, না মায়া? নাকি আমাকে ঘিরে ওর অন্য মতলব আছে? থাকলে থাক। কারণ, এখন আমার ভয়-ডর বলে আর কিছু নেই।

কিন্তু যেভাবে ও আমার গাড়ির সামনে এসে পড়েছে তাতে মনে হয় না ব্যাপারটা সাজানো। তা ছাড়া এ-রাস্তা ধরে আমি প্রায়ই রাতের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাই। আগে কখনও তো ওকে দেখিনি!

'আপনার হাজব্যান্ড এখন কোথায়?'

'নেই।'

'নেই মানে?'

'শেষ। দ্য এন্ড।'

মেয়েটা কি ওর স্বামীকে খুন করেছে নাকি?

আমার কোঁচকানো ভুরু দেখে কী যেন ভাবল সোনাল। হেসে বলল, 'আমি নিজেই জানতাম না আমার মধ্যে এত শক্তি আছে। কী করে যে পারলাম কে জানে! বোধহয় আমি নয়—আমার ভেতরের আত্মা কিংবা প্রেতাত্মা আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে।'

'কী কাজ?'

'বুঝে নিন। এর বেশি বলব না।'

আমার হঠাৎ কেমন সন্দেহ হল। আড়চোখে সোনালকে বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর কথার মধ্যে কতকগুলো শব্দ আমার কানে বাজছিল।

একা মেয়ে। এই শীতের রাতে কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ করে কোথা থেকে এল ও? আর ঠারে ঠারে যা বলতে চাইছে তাতে একটা মারাত্মক কাণ্ড করে এসে এইরকম নির্লিপ্ত আর উদাসী থাকছে কেমন করে?

আমার ভীষণ অবাক লাগল। মনের ভেতরের কাঁটাটা খচখচ করতে লাগল।

'আপনি থাকেন কোথায়?' ওকে জিগ্যেস করলাম।

'প্রশ্নটা অনেকটা পুলিশের মতো শোনাচ্ছে।'

'আগেই তো বলেছি—আমি পুলিশ নই।'

আমার দিকে পূর্ণ চোখে তাকাল। তাকিয়ে কী খুঁজল জানি না। তারপর: 'যেখানে আপনার গাড়িতে প্রায় চাপা পড়ছিলাম, সেখান থেকে বড়জোর দু-আড়াই কিলোমিটার। সেখানে আমাদের সাজানো দোতলা বাড়ি। পুরোটা ছবির মতন। শুধু ওই লোকটাই ছিল কলঙ্ক।' একটু চুপ করে রইল। ওড়নার কাপড়ে হিজিবিজি কাটল। তারপর: 'ওই বাড়িতে আমি আর থাকতে পারব না...।'

আমি হঠাৎই রেডিয়োটা অন করে দিলাম।

শুরু হয়ে গেল গান আর কথার কচকচি। তৃতীয় কারও গলা আমাকে যেন ভরসা দিল।

'এবারে আপনার গল্পটা শুনতে পারি?' সোনাল জিগ্যেস করল।

আমি চুপ করে রইলাম। চোখ রাস্তার দিকে।

বৃষ্টি এখন আর নেই—তবে রাস্তায় ভিজে দাগ রয়েছে। ভিজে দাগ থাক বা না থাক, এখন রাস্তাই আমার জীবন।

'কী, বলবেন না? আমারটা তো হাঁ করে শুনলেন—।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। পুরোনো স্মৃতি ঝিলিক মেরে গেল মাথার ভেতরে।

'সেই চেনা গল্প।' ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম, 'বড়লোক বউ। স্বামী গরিব, তবে সৎ পরিশ্রমী মানুষ। দিন-রাত শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। আমি নাকি অপদার্থ। শিক্ষিত হলেও গণ্ডমূর্খ। ফুটোপয়সার মুরোদ নেই।

'একদিন রাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমাকে। ওর বাবার দেওয়া বাড়ি—তাই আমাকে "গেট আউট" বলার অধিকারও ছিল। আমারও যে কী হল! দুঃখ অভিমানে বোকার মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এই গাড়িটা নিয়ে—ওর বাবার দেওয়া গাড়ি।' আক্ষেপে স্টিয়ারিং-এ চাপড় মারলাম: 'আমার লাইফটা একেবারে ইউজলেস ছিল...আর একইসঙ্গে হোপলেস...।'

হঠাৎই হেসে উঠল সোনাল।

'হাসছেন কেন?'

'না, একটা কথা মনে হল—তাই।'

'কী কথা?'

‘মানে...দুজন হোপলেস একজায়গায় হলে একটু-আধটু হোপ তৈরি হতে পারে কি না...।’

‘বেশ বলেছেন। এরকম কথা শুনলে ভালো লাগে—নতুন করে আবার বেঁচে উঠতে ইচ্ছে করে। জীবনের জন্যে মায়া জাগে।’

সোনাল মাথা নীচু করল। আস্তে-আস্তে বলল, ‘আপনি হয়তো ভাবছেন, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একটা সিরিয়াস ক্রাইম করে এসে এত কুললি কী করে কথা বলছি।’ একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘আসলে আমার হাজব্যান্ড আমার চোখে বহুদিন আগেই ”নেই” হয়ে গিয়েছিল। ওর থাকা না থাকায় আমার লাইফের কোনও ডিফারেন্স নেই। তা ছাড়া আমার এখনকার লাইফটাও তো ঠান্ডা বরফ আর পাথরের মতো। মানে, মৃত্যু যেমন হয়...।’

দূরে একটা রোড সাইন চোখে পড়ল।: ‘কার্ভ অ্যাহেড’। তারপরই রাস্তাটা ডানদিকে বেঁকে গেছে।

এসে গেছি। আর কয়েকসেকেন্ড।

সোনালকে বললাম, ‘গাড়ি সাইড করছি। আপনি এখানটায় নেমে পড়ুন।’

‘কেন?’ কপালে ভাঁজ ফেলে আমার দিকে তাকাল ও।

গাড়ির গতি কমালাম: ‘এরপর আমার সঙ্গে গেলে আপনার বিপদ হবে—গাড়ি আর থামানো যাবে না—তাই।’

‘কীসের বিপদ?’

‘প্লিজ, আমার কথা শুনুন...নেমে পড়ুন।’

‘না।’ জেদি গলায় বলল মেয়েটা, ‘আগে বলুন—কীসের বিপদ—।’

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম: ‘সোনাল, বছরদুয়েক আগে...সেই যে আমি রাগ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম...সেই রাতটা ছিল অমাবস্যার রাত। আজও তাই...।’

খেয়াল করলাম, স্টিয়ারিং-এর ওপরে আমার বাঁ-হাতের পাতাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডান হাঁটু আর উরু দেখা যাচ্ছে না।

সোনাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। এফ. এম. রেডিয়াতে ঝিনচ্যাক মিউজিকের সঙ্গে গান বাজছে।

‘...সেই শীতের রাতে এই রাস্তায় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ওই যে রোড সাইনটা দেখা যাচ্ছে—ওটা পেরিয়ে ডানদিকে টার্ন নিয়ে...তারপর...।’

আমার বাঁ-দিকের অনেকটা অংশ আচমকা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ব্যাপারটা সোনালের চোখে পড়ল। না পড়ে উপায়ও ছিল না।

ও চোখ বড়-বড় করে ফেলল। ভয়ংকর এক চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই। গাড়ি আর থামানো যাবে না।

‘একটা লোডেড ট্রাকের সঙ্গে আমার গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সঙ্গে-সঙ্গে সব শেষ। তারপর থেকে...।’

সোনাল এখনও চিৎকার করে চলেছে। এফ. এম. রেডিয়ো বাজছে। রোড সাইনটা কাছে এসে গেছে।

'তারপর থেকে প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে আমি এ-রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে যাই। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা, শীত পরোয়া না করে ছুটে যাই ওই অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায়। মারা যাওয়ার পর থেকে এটাই আমার জীবন, সোনাল...।'

কী মনে হওয়ায় গাড়ির রিয়ার ভিউ মিরারটা আমার দিকে ঘোরালাম।

যা ভেবেছি তাই। আমার মুখের বাঁ-দিক, গলা—সব মিলিয়ে গেছে। শুধু ডানদিকের গাল, দুটো চোখ, কপাল আর চুল সাপের ফণার মতো শূন্যে ভেসে আছে।

সোনাল ছুটন্ত গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করছে, আর পাগলের মতো চিৎকার করছে।

ডানদিকে বাঁক নিয়ে এগোতেই ছুটে আসা ট্রাকের ঘোলাটে হেডলাইট চোখে পড়ল আমার।

সোনাল তখন হিস্টিরিয়ার রুগির মতো 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করছে। গাড়ির উইন্ডশিল্ডের কাচে হিংস্রভাবে ঘুসি মারছে।

আশ্চর্য! এই মেয়েটাই না একটু আগে বলছিল, ...'আমি আর বেঁচে নেই। প্রেতাত্মার মতো বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি...।'

এখন ওর সামনে সত্যি-সত্যি সেই সুযোগ এসে গেছে। এখন থেকে ও আর আমি একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব।

আমার শরীরের বাকি অংশগুলো একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

ট্রাকটা ক্ষিপ্ত গন্ডারের মতো ছুটে আসছে।

আমি অদৃশ্য আঙুলের চাপে গাড়ির হর্নটা বাজাতে শুরু করলাম।

শেষ মুহূর্তটার জন্যে আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উপন্যাস

না যেন করি ভয়
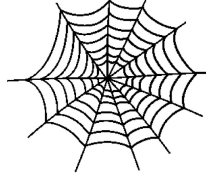
গরম বেগুনিতে কামড় দিয়ে শানু একটু বিপদে পড়ল। হাঁ করে ফুঁ দিয়ে বেগুনির টুকরোটাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। তারপর সাবধানে ছ্যাঁকা বাঁচিয়ে ওটাকে কামড় দিতে-দিতে বলল, 'আসলে আইটা উ আজে—।'

টুনটুন জিগ্যেস করল, 'কী বললে? কী বললে?'

বেগুনিটাকে ঠিকঠাক কবজা করে শানু আবার একই কথা বলল, 'আসলে বাড়িটা খুব বাজে—।'

শানুর মা অনিতা, মানে টুনটুনের মাসি, ভুরু কুঁচকে ছেলেকে আলতো ধমক দিয়ে বললেন, 'ওকে এসব আজেবাজে কথা বলার কী দরকার! ছেলেটা ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।'

শানু মাসতুতো বোনের দিকে একবার তাকিয়ে একমুঠো মুড়ি মুখে ঢেলে দিল। তারপর সেটা চিবোতে-চিবোতে বলল, 'আগে থেকে না বলে রাখলে প্রবলেম আছে, মা। নইলে কোন রাতে দেখবে বাঁশির আওয়াজ শুনে...।'

অনিতা তাড়াতাড়ি ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক—এখন ওসব বাজে কথা থাক। ও সবে এসেছে...।'

টুনটুন হেসে উঠে হাত নেড়ে বলল, 'ওতে আমি ভয় পাব না, মাসি। ওরকম ভুতুড়ে বাড়ির গল্প আমি অনেক পড়েছি। শুধু দেখতেই যা বাকি! তো শানুদা যদি হেলপ করে তা হলে সেই বাকিটুকুও আর থাকবে না।'

কথা শেষ করে টুনটুন মুড়ি-তেলেভাজায় মন দিল।

বাইরে ঝমঝম শ্রাবণের বৃষ্টি। শুরু হয়েছে সেই দুপুর থেকে—আর এখন সন্ধে সাতটা। আকাশের যা হাঁকডাক আর জলের যা তোড় তাতে মনে হয় না এ-বৃষ্টি মাঝরাতেও থামবে।

না থামুক ক্ষতি নেই। কারণ, টুনটুন জানে, বৃষ্টি-ঝমঝম সন্ধেবেলাতেই ভূতের গল্প-টল্প ভালো জমে। তাই ও চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বেশ আশা নিয়ে পলকহীন চেয়ে রইল শানুর দিকে। ওর নজরে একটা বেপরোয়া ভাবও ছিল। সেই ভাবটা যেন বলতে চাইছে, এসো, কত ভয় দেখাবে দেখাও। পরীক্ষা করেই দ্যাখো আমি ভয় পাই কি না।

বিকট শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। কাচের জানলার নীলচে সাদা আলো ঝিলিক মারছে বারবার। সেদিকে একপলক দেখে অনিতা শানুর দিকে তাকিয়ে বেশ চিন্তার গলায়

বললেন, 'তোর বাপিকে কতবার করে বললাম, এখন বেরিয়ো না। জেদ ধরে সেই গেলই। ছাতাতে কি এ-বৃষ্টি আর আটকায়! দেখিস একেবারে ভিজে কাক হয়ে ফিরবে...।'

টুনটুনের মেসো গেছেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে খবর দিতে। কারণ, ফ্রিজের গায়ে হাত দিলে নাকি শক মারছে। টুনটুন আজ বিকেলে শক খেয়েছে বলেই মেসোর চিন্তাটা হয়েছে আরও বেশি। সকালে এসে পৌঁছেছে যে-অতিথি সে কি না বিকেলের মধ্যেই শক খেয়ে বসে আছে!

টুনটুন যতই মেসোকে বুঝিয়েছে যে, শকটা হালকা চিনচিনে—ওর তেমন কিছু লাগেনি, মেসো ততই জেদ ধরে বলেছেন, 'ইলেকট্রিক শক মানে ইলেকট্রিক শক। তাকে কখনও খাটো করে দেখা উচিত নয়...।'

শানু ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু মুখে আবদার করে বলল, 'মা, প্লিজ, ওকে শর্টে কালো বাড়ির ব্যাপারটা একটু বলি। ও তো ভয় পাবে না বলছে। তা ছাড়া ও এখানে নতুন। ওকে একটু অ্যালার্ট না করে দিলে কখন কী হয়...।'

অনিতা নিমরাজি হলেন: 'বললে বল। এরপর রাতে যদি ও ভয় পায়...।'

টুনটুন তেলেভাজা চিবোতে-চিবোতে তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল, 'না, না, মাসি। তুমি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছ। আমার..।'

শানুও তাল মিলিয়ে বলল, 'রাতে ও ভয় পাবে কী করে? ও তো তোমার আর আমার সঙ্গে শোবে...।

শেষ পর্যন্ত অনিতা হার মানলেন। ওদের জন্য আরও কয়েকটা বেগুনি ভাজতে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন।

শানু মুড়ি-তেলেভাজা খেতে-খেতে বলল, 'তোকে ব্যাপারটা বলছি...কিন্তু বাপির সামনে এ নিয়ে একটা কথাও বলবি না।'

টুনটুন ঘাড় নাড়ল। কয়েকবার পা দুলিয়ে শানুর দিকে ঝুঁকে এল।

টুনটুন এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। শুধু পাশই করেনি, চারটে লেটার এবং স্টার পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মন ভরেনি। রেজাল্টটা আরও ভালো হবে আশা করেছিল। ওর স্কুলের টিচাররাও এই রেজাল্টে কিছুটা হতাশ হয়েছেন। ফলে রেজাল্ট বেরোনোর পর টুনটুন ক'টা দিন বেশ মনমরা হয়েছিল। তাই দেখে মা আর বাপি দুজনেই ঠিক করলেন, ও মাসির বাড়ি ক'দিন ঘুরে আসুক।

টুনটুনের মেসোর বদলির চাকরি। মাসছয়েক আগে বদলি হয়ে এসেছেন তিলকপুরে। সুতরাং টুনটুনের মন ভালো করতে মাসির বাড়িতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে।

আজ সকালেই বাপি ওকে পৌঁছে দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। সাত-আটদিন পর এসে আবার নিয়ে যাবেন।

বাপি চলে যাওয়ার পর টুনটুনের কিছুক্ষণ মনখারাপ লেগেছিল, কিন্তু শানু ওর সঙ্গে গল্পে মেতে উঠতেই মনখারাপের ব্যাপারটা ওর মাথা থেকে উবে গেল। আর তারপরই শুরু হল বৃষ্টি।

শানু টুনটুনের চেয়ে বছর চারেকের বড়। ও বি. কম. পড়ছে বটে, কিন্তু পড়াশোনা ওর ভালো লাগে না। সবসময় অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়ায়। ওর জন্য চিন্তা করে-করে মাসি

নাকি রোগা হয়ে গেছে।

টুনটুন এসব কথা মায়ের মুখেই শুনেছে। শুনে-শুনে 'শানুদা'কে ও অপছন্দ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখানে এসে শানুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, গল্প করার পর, 'শানুদা'কে ওর দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে।

কত গল্পই যে করতে পারে শানু!

শানুর গল্পের জন্যেই টুনটুনের এখনই মনে হচ্ছে মাসির বাড়িতে ও এসেছে ক-ত দিন যেন হয়ে গেছে। অথচ ও এসেছে আজ সকাল ন'টায়—আর এখন সবে সন্ধে সাতটা।

তেলেভাজা-মুড়ি খেতে-খেতে কালো বাড়ির কাহিনি শোনাল শানু। শুনতে-শুনতে টুনটুনের মনে হল, শানুদা বোধহয় বইয়ে পড়া কোনও ভূতের গল্প ওকে শোনাচ্ছে। টুনটুন অসংখ্য ভূতের গল্প পড়েছে, আর সেগুলো যে 'গল্প' সে নিয়ে ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই। ও ভূতের গল্পের পোকা হলেও ভূতে ওর একফোঁটা বিশ্বাস নেই। কারণ, মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কে যে নিরানব্বই আর ফিজিক্যাল সায়েন্সে চুরানব্বই পায় ভূতে তার বিশ্বাস থাকবে কেমন করে!

সুতরাং বেশ মন দিয়ে শানুর গল্প শুনল টুনটুন। শুনতে-শুনতে একটু যে গা-ছমছম করেনি তা নয়। কিন্তু ভূতের কোনও গল্প পড়ার পর বেশ ভয়-ভয় লাগুক এটাই তো টুনটুন চায়!

রাতে মাসি ঘুমিয়ে পড়লে শানুর সঙ্গে অন্য অনেক গল্প করেছে ও। কিন্তু ওই কালো বাড়ির গল্পটা কিছুতেই মাথা থেকে যায়নি। ও অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে ওই বাড়িটার কথা ভেবেছে। কারা থাকত ওই বাড়িতে? তারা এখন কোথায়? কেন ওই বাড়িটা পোড়োবাড়ি হয়ে পড়ে আছে?

বাইরে বৃষ্টি এখনও বেশ ভালোই পড়ছে। তবে সন্ধেবেলা যেমন ঘনঘন বাজ পড়ছিল এখন সেরকম নয়। মাঝে-মাঝে টিউবলাইটের মতো সাদা আলো জানলার কাচ ভেদ করে ঝলসে যাচ্ছে ঘরের দেওয়ালে।

টুনটুনের ঘুম আসছিল না কিছুতেই। একটু ভয়-ভয়ও করছিল। কিন্তু শানুর কাছে সেটা ধরা পড়ুক ও চাইছিল না।

অন্ধকারে চোখ খুলে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ও চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'শানুদা...।'

কোনও সাড়া নেই।

'শানুদা—।' আবার চাপা গলায় ডাকল ও।

'উঁ...।' ঘুমজড়ানো চোখে সাড়া দিল শানু, 'বল, কী?'

'ওই বাড়িটার গল্প তুমি কি আমাকে শর্টে বললে?'

শানু এবারে পাশ ফিরল টুনটুনের দিকে। একটা হাই তুলল: 'এই মাঝরাত্তিরে কীসব কোশ্চেন শুরু করলি! বল কী বলছিস।'

টুনটুন আবার একই প্রশ্ন করল।

শানু একবার ঘুমন্ত মায়ের দিকে দেখল। তারপর আবার হাই তুলে বলল, 'যেটুকু জানি সেটুকুই বলেছি। তবে এই এরিয়ার আরও অনেকে অনেক কিছু জানে—সবসময় বলতে

চায় না।'

'কারা থাকত ওই বাড়িতে, শানুদা?'

'আরে সে অনেক ব্যাপার। কাল দেখা যাবে। এখন ঘুমো তো।'

'কাল একটু খোঁজখবর করে দেখলে হয়। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে...ওই কালো বাড়ির পুরো গল্পটা...শর্টে নয়...লঙে।'

'বললাম তো কাল সব হবে। এখন প্লিজ, আমার কাঁচা ঘুমটা ঘেঁটে দিস না—।'

শানু আবার ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

ঘরের দেওয়ালে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই বাজ পড়ার শব্দ।

টুনটুন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল।

পরদিন বিকেলে শানুর সঙ্গে তিলকপুর দেখতে বেরোল টুনটুন। বেরোনোর সময় অনিতা জোর করে ছেলের হাতে একটা ছাতা গুঁজে দিয়েছেন।

টুনটুন আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে কালো মেঘ। কিন্তু সেই কালো মেঘের মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট নীল জানলা—আকাশ দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে কত যে গাছ! তারা সব সবুজ হাত তুলে আকাশকে যেন ডাকছে।

দেখতে-দেখতে টুনটুনের মনে হল, ও কারও আঁকা একটা ছবি দেখছে। কলকাতায় এরকম ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। ইস, মা-কে এই ছবিটা দেখাতে পারলে ভীষণ ভালো লাগত ওর।

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা দুটো পুকুর পেরিয়ে গেল। তারপরই একটা বিশাল খেলার মাঠ। মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। জল-কাদায় ওদের ভূতের মতো লাগছে।

শানু বলল, 'এই মাঠে আমরা খেলি। ওই যে, আমার বন্ধুরা সব খেলছে। পরশু থেকে আমার জ্বর-জ্বর মতন হয়েছে বলে মা ক'দিন খেলতে বারণ করেছে। এই মাঠটা পেরোলেই আমাদের ক্লাব "বিপ্লবী সংঘ"।'

কথা শেষ হতে-না-হতেই শানুর পকেটের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোন বের করে পরদার দিকে একপলক তাকাল শানু। কে ফোন করেছে দেখল। তারপর বোতাম টিপে ফোন কানে লাগিয়ে বলল, 'এই তো, ক্লাবের কাছে এসে গেছি। মাঠ পেরোচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার মাসতুতো বোন আছে। আমাদের বাড়িতে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এক্ষুনি ঢুকছি।'

মাঠের পাশ দিয়ে ওরা এগোতে লাগল। মাটির ওপরে ইটের খোয়া ছড়ানো রাস্তা। তার জায়গায়-জায়গায় জল-কাদা জমে আছে। রাস্তার পাশে বড়-বড় ঘাস, আর কয়েকটা বিশাল গাছ। তার পাশেই ঢালু জমি নেমে গেছে। সেখানে বৃষ্টির জল জমে ছোটখাটো পুকুর হয়ে গেছে। ব্যাঙের দল ডাকছে।

একটু পরেই ওরা ক্লাবঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

ইটের দেওয়াল। সাদা রং করা। মাথায় টিনের চাল। তার ওপরে গাছের ঝরাপাতা ছড়িয়ে আছে।

ক্লাবঘরের দেওয়ালে ছোট্ট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা: 'বিপ্লবী সংঘ'।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

ঘরে টিভি চলছে। মেঝেতে রঙিন চাদর পাতা তার ওপরে বসে তিনজন ছেলে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছে।

তিনজনের সঙ্গে টুনটুনের পরিচয় করিয়ে দিল শানু। অঙ্কিত, রোশন, আর রাজর্ষি। ওরা টুনটুনকে বসতে বলল। তখন শানু বলল, 'না রে, এখন বসব না। ওকে কালো বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাব। অন্ধকার হয়ে গেলে প্রবলেম জানিস তো!'

তিনজনের মধ্যে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সবচেয়ে বড়সড় অঙ্কিত। ও হেসে বলে উঠল, 'না, না —ওকে দেখাস না। ভয় পেয়ে যাবে...।'

টুনটুন পালটা হাসল, 'ভয় পাই পাব। আমার ওই বাড়িটা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তা ছাড়া ভয়-টয় পেলে তোমরা তো আছ...।'

'তা হলে আর দেরি করে লাভ কী!' অঙ্কিত উঠে দাঁড়াল: 'চল, আমিও তোদের সঙ্গে যাই...।'

শানু বলল, 'টুনটুন বলছে ওর নাকি হেভি সাহস। এবার সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

রোশন আর রাজর্ষিকে বলে ওর ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে এল। অনেকগুলো গাছপালার সারি পেরিয়ে একটা পুকুরকে পাক দিয়ে ভাঙাচোরা একটা রাস্তায় এসে পড়ল।

আকাশে চাপা গুড়গুড় শব্দ হল। হাঁটতে-হাঁটতেই ওরা মুখ তুলে আকাশে তাকাল। একটু আগের দেখা ছোট-ছোট নীল জানলাগুলো আবছা কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে।

অঙ্কিত বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা—বৃষ্টি আসতে পারে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা প্রায় ছুটতে শুরু করল।

কাঁচা রাস্তায় জল-কাদা। দুপাশে ছোট-খাটো বাড়ি-ঘর। কোনওটা পাকা বাড়ি, কোনওটা টিনের চাল, আর কোনওটা স্রেফ মাটি আর চাটাই দিয়ে তৈরি। বাড়ির উঠোনে লাউ-কুমড়োর মাচা আর আম-কাঁঠাল-পেয়ারা গাছ।

দু-মিনিট যেতে না যেতেই বাঁ-দিকে একটা ফাঁকা জমি পাওয়া গেল। জমিতে আগাছার জঙ্গল। আর জমি পেরিয়ে বিশাল একটা সবজির খেত। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

সেগুলো ছাড়িয়ে চোখ মেললেই দু-চারটে ছোট-ছোট বাড়ি, আর তার মাথায় আকাশ। কিন্তু ডানদিকে পঁচিশ কি তিরিশ ডিগ্রি মতন চোখ সরলেই আকাশটা আর দেখা যাচ্ছে না।

কারণ, তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো বাড়িটা।

ওরা তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। টুনটুন অবাক হয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কালো রঙিন বিশাল একটা ডাইনোসর যেন গুড়ি মেরে বসে আছে। পড়ন্ত দিনের মেঘলা আলোয় বাড়িটার দিকে তাকিয়ে টুনটুনের মনে হল ওটা যেন অন্ধকার দিয়ে তৈরি। শরীরটাকে গুটিয়ে ছোট করে রেখেছে। প্রতিটি পেশিতে অসম্ভব তেজ ও শক্তি। শুধু ওটার মাথাটা যে কোথায় সেটাই ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না।

একটা বাড়ির আকার যা-ই হোক না কেন আকাশের পটভূমিতে তার সীমানা সবসময়েই সরলরেখা দিয়ে তৈরি হয়—অন্তত টুনটুন এতদিন তাই জানত। কিন্তু এই কালো বাড়িটার যে সীমারেখা আকাশের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সেটার বেশিরভাগই বাঁকা রেখা দিয়ে তৈরি। এর কারণ হতে পারে খসে পড়া ইট পলেস্তারা, কিংবা বাড়ির নানান জায়গায় লেপটে থাকা কালচে সবুজ শ্যাওলা।

বর্ষার জোলো বাতাস হু-হু করে বইতে শুরু করল। টুনটুন, শানু আর অঙ্কিতের চুল উড়তে শুরু করল। ঝোড়ো হাওয়ায় দিশেহারা পতাকার মতো ঝাপটা মারতে লাগল গালে, কপালে।

টুনটুন বাড়িটার দিকে আরও দু-চার পা এগিয়ে এল। ওর দেখাদেখি পা বাড়াল বাকি দুজন।

তখনই ছাতাধরা জিনিসের গন্ধটা টুনটুনের নাকে এল। বর্ষাকালে বহুদিন আলো-বাতাস না পাওয়া জামাকাপড়ের গায়ে যে বিশ্রী গন্ধটা টের পাওয়া যায়, ঠিক সেইরকম।

গন্ধটা নাকে আসতেই মুখে বিরক্তির শব্দ করে নাক টিপে ধরল টুনটুন।

শানু চাপা গলায় বলল, ‘বাড়িটার গা থেকে সবসময়েই এরকম বাজে গন্ধ বেরোয়।’

‘কেন?’ টুনটুন জিগ্যেস করল। কিন্তু বাড়িটার দিক থেকে চোখ সরাল না।

অঙ্কিত ওর প্রশ্নের জবাব দিল, ‘কেউ জানে না কেন…।’

বহুকাল আগে বাড়িটার রং কালো ছিল কি না কে জানে। কিন্তু এখন তার সারা গায়ে ময়লা আর শ্যাওলা জমে বলতে গেলে কালো রংটাই বসে গেছে। ভালো করে নজর করলে সেই কালোর ওপরে ছাতাধরা সাদা ছোপ-ছোপ দাগ বেশ দেখা যায়।

কালো বাড়িটার বিশাল চৌহদ্দি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আর সেই পাঁচিলের চেহারাও বাড়ির সঙ্গে মানানসই। সর্বত্র ভাঙাচোরা—কোথাও আছে, কোথাও নেই। আগাছার জঙ্গলে পাঁচিলটার অনেক জায়গাই ঢাকা পড়ে গেছে।

পাঁচিলের একজায়গায় প্রায় দশফুট উঁচু বিশাল লোহার গেট। বাতাস আর বর্ষায় জং ধরা। গেটের পাল্লা দুটো ফুট দুয়েক ফাঁক হয়ে আছে। বড়-বড় ঘাস আর আগাছা গেটের নীচের দিকটা ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে যতটা চোখ যায় শুধু ছোট-বড় গাছ আর হরেকরকম আগাছার জঙ্গল। সদর দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোনোর পথটাও আগাছায় প্রায় ঢেকে গেছে।

বাড়ি আর তার লাগোয়া জমির বহর দেখে মনে হয় বাড়িটা এককালে কোনও বড়লোকের বাগানবাড়ি ছিল।

টুনটুন লক্ষ করল, কালো বাড়িটার আশেপাশের জমিতে বড়-বড় ঘাস-পাতার মধ্যে দুটো গোরু চরে বেড়াচ্ছে আর বাড়িটার কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটার দূরে দুটো ছোট মাপের আধাখ্যাঁচড়া বাড়ি রয়েছে। আধাখ্যাঁচড়া বলতে একতলা তৈরির পর দোতলা তৈরি হতে-হতে কনস্ট্রাকশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকলে যা হয়!

সেই বাড়ি দুটো দেখিয়ে টুনটুন অঙ্কিতকে জিগ্যেস করল, ‘ওই বাড়ি দুটোয় কারা থাকে?’

‘কেউ না।’

‘কেন?’

‘সে প্রায় বিশ বছরের পুরোনো কেস। বাবার মুখে শুনেছি। দু-বন্ধু দুটো বাড়ি তৈরি করছিল। তাদের ফ্যামিলি একতলায় থাকত। দোতলা তৈরির কাজ চলছিল। এক বর্ষার সিজনে দু-ফ্যামিলির সাতজন মেম্বার বাজ পড়ে একসঙ্গে খতম।’ বড় করে শ্বাস ছাড়ল অঙ্কিত: ‘তারপর থেকে কালো বাড়িটার কাছাকাছি আর কেউ বাড়ি তৈরির চেষ্টা করেনি..।।’

অঙ্কিতের কথাগুলো টুনটুন শুনছিল, কিন্তু ও স্থিরচোখে তাকিয়ে ছিল কালো বাড়িটার দিকে। এক অদ্ভুত ভয় আর মুগ্ধতা ওর মধ্যে কাজ করছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অঙ্কিত আবার বলল, ‘কালো বাড়িটার চারপাশে ওই যে সব গাছ দেখছ, ওতে মাঝে-মাঝে পিকিউলিয়ার সব ফুল হয়—নানান রঙের ফুল...খুব অ্যাট্রাকটিভ। শুনেছি, ওই ফুলের লোভে দুজন কালো বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছিল—আর বেরোতে পারেনি। তাদের আর কোনও খোঁজও পাওয়া যায়নি। সেই থেকে ওই ফুলের ফাঁদে আর কেউ পা দেয় না।’

পাখির মিহি ডাক কানে এল ওদের। টিয়ার ঝাঁক ‘ট্যাঁ-ট্যাঁ’ করতে-করতে মেঘলা আকাশের একদিন থেকে অন্যদিকে উড়ে গেল।

কালো বাড়িটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থেকে টুনটুন জিগ্যেস করল, ‘অঙ্কিতদা, এই বাড়িটায় ঢুকে আবার বেরিয়ে এসেছে এমন কেউ নেই?’

প্রশ্নটা শুনে অঙ্কিত একটু দোটানায় পড়ে গেল যেন। টুনটুনের দিকে তাকাল। জবাব দেবে কি দেবে না কয়েক সেকেন্ড ভাবল।

তখন শানু ওকে বলল, ‘বল না, মনিরুল চাচার কথা বল—।’

‘কে মনিরুল চাচা?’ টুনটুনের প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই।

‘ওই ওদিকে বটতলায় চায়ের দোকান ছিল।’ হাত তুলে একদিকে নিশানা করল অঙ্কিত: ‘পাঁচ-ছ’বছর হল ওর ছেলে কামাল দোকান চালায়—আর চাচা চুপচাপ দোকানের একপাশে বসে থাকে।’

‘মনিরুলচাচা এই বাড়িটায় ঢুকেছিল?’

‘হ্যাঁ—’ কালো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে বলল অঙ্কিত, ‘আবার বেরিয়েও এসেছিল...।’

‘তারপর?’

‘তারপর কী হয়েছিল সেটা চাচার মুখ থেকেই শুনবি। তোর বাড়ি দেখা শেষ হয়েছে? তা হলে চল, এখনই বটতলায় যাই।’

এর মধ্যেই আলো বেশ কমে এসেছে। আশপাশের জলা থেকে ভেসে আসা ব্যাঙের ডাক জোরালো শোনাচ্ছে। বড়-বড় গাছের পাতার ঝাঁকের আড়ালে ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে।

কমে যাওয়া আলোয় কালো বাড়িটাকে ওত পেতে থাকা এক অপার্থিব জন্তুর সিলুয়েট বলে মনে হল টুনটুনের। মনে হল, যেই ওরা পিছন ফিরে হাঁটা দেবে অমনি যেন সেই জন্তুটা ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

টুনটুন শানুকে বলল, 'শানুদা, এখন বটতলায় গেলে মাসি কিছু বলবে?'

'না, না, মা কিছু বলবে না। ও আমি ম্যানেজ করে নেব। যদি বাই চান্স দেরি হয় ফোন করে দেব। তুই এখানে বেড়াতে এসে সবসময় কি ঘরে বসে থাকবি না কি?'

ওরা তিনজন ফিরে চলল। কালো বাড়িটা পিছনে পড়ে রইল। কিন্তু টুনটুনের মনে হল, বাড়িটা যেন অদৃশ্য সুতোয় ওকে পিছনদিকে টানছে।

ওরা তিনজন যখন মনিরুলচাচার দোকানে এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, আর সেইসঙ্গে টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

মনিরুলচাচাকে দেখে বেশ অবাক হল টুনটুন।

শানুদা আর অঙ্কিতদা বলেছিল মনিরুলচাচার বয়েস সত্তর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু চাচার মাথার চুলগুলো সব দাঁড়কাকের মতো কালো। চেহারা ভাঙাচোরা হলেও বাদামি চামড়ায় এই বয়েসেও চকচকে ভাব আছে। চোখে চশমা, থুতনিতে দাড়ি।

চায়ের দোকানটা বাঁশের খুঁটি আর টিনের চাল দিয়ে তৈরি, কিন্তু মাপে বেশ বড়। দোকানের বাইরে সার দিয়ে ক'টা ব্যাটারির বাক্স উপুড় করে রাখা—খদ্দেরদের বসার জন্য। এখন বৃষ্টির জন্য সিটগুলো সব খালি। আর ভেতরে জোড়াতালি দেওয়া একটা বড় টেবিল, তার দুপাশে দুটো ফাটল ধরা লম্বা বেঞ্চ।

দোকানের একপাশে পাতা উনুনে আগুন জ্বলছে। চাচার ছেলে কামাল ব্যস্ত হাতে চা-বিস্কুটের জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছে। ওর গায়ে গেঞ্জি আর প্যান্ট। পোক্ত হাতে সসপ্যানে চামচ নাড়ছে। তাতে অদ্ভুত ছন্দে 'বাজনা' বাজছে।

দোকানটার আলো বলতে দুটো বালব। সেই অলোয় উদ্ভট চেহারার কতকগুলো ছায়া তৈরি হয়েছে।

চাচা দোকানের একপাশে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে একটা টুলে বসেছিল। অঙ্কিত চাচার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'চাচা, ভালো আছ তো?'

চাচা কাগজ থেকে মুখ তুলল, 'কে, আঙ্কু? বসো—চা খাবা নাকি?'

'হ্যাঁ, চাচা, খাব। আজ সঙ্গে আমার এক বন্ধু এসেছে।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে অঙ্কিত বলল, 'আপনার সেই কালো বাড়ির কেসটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চায়...।'

'ওঃ—' বলে হাসল চাচা: 'এই গল্প কতজনের যে কইসি! ওই শয়তান বাড়িডা য্যামন ছিল ত্যামনই রইয়া গেল। আমাগো কপাল পোড়া...।'

ওদের তিনজনের জন্য তিনটে চা বলল অঙ্কিত। দোকানের ভেতরে তিনজন খদ্দের বসে চা খাচ্ছে, খোশগল্প করছে।

টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। চাচা যেদিকটায় টুলে বসে সেদিকটায় দোকানের চাল সামনে হাত তিনেক বাড়ানো। ওরা ব্যাটারির বাক্স টেনে নিয়ে চাচার কাছ ঘেঁষে বসে পড়ল।

মুখ মুছে দাড়িতে হাত বুলিয়ে মনিরুলচাচা তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে-দিতে টুনটুনরা চাচার গল্প শুনতে লাগল।

বহুবছর আগের কথা। সময়টা শীতকাল। মনিরুলচাচা তখন সদ্য জোয়ান। একদিন সন্ধের পর স্টেশন থেকে ঘরে ফেরার পথে হঠাৎ বাঁশির শব্দ চাচার কানে আসে। বাঁশি তো নয়, যেন বুকফাটা সুরেলা কান্না। বাঁশি শুনে চাচার মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। চাচার মনে হচ্ছিল, বাঁশির সুরটা যেন চাচাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কানের কাছে ফিসফিস করে কেউ যেন বলছে, 'আয়...চলে আয়...।'

চাচা তখন বাজার পেরিয়ে সবে দশ কি বারো কদম এগিয়েছে। চারপাশটা অন্ধকার হলেও পথে দু-চারজন লোক চোখে পড়ছে। কিন্তু সেই মন-ভোলানিয়া বাঁশির সুর মনিরুলচাচা ছাড়া আর কেউ যেন শুনতে পাচ্ছিল না।

তখন চারপাশে এত আলো ছিল না। এত দোকানপাট ছিল না। এত বাড়ি-ঘরও ছিল না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। চারপাশে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক আর জোনাকির মিটমিটে আলো।

বাঁশির সুর মনিরুলচাচাকে যেন 'হাত ধরে' ডেকে নিয়ে চলল।

কেমন এক অলৌকিক নেশার ঘোরে চাচা পৌঁছে গেল সেই কালো বাড়িটার কাছে। বাড়ির বাগানের ফুলগুলো তখন রঙিন আলো হয়ে জ্বলছে। অদ্ভুত আভা ফুটে বেরোচ্ছিল ওগুলোর ছোট-ছোট শরীর থেকে। যে-টানটা মনিরুল চাচা তখন টের পেয়েছিল সেটা সমুদ্রের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার টান। সেই টানে চাচা জং ধরা লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়িটার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছিল।

তারপর...।

তারপর সেই বাঁশির সুর চাচাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। চাচা ঢুকে পড়েছিল অন্ধকার বাড়িটার ভেতরে।

অন্ধকারে দিকভ্রম হয়ে গিয়েছিল। সময়ের হিসেবও ওলোটপালট হয়ে গিয়েছিল। চাচাকে নিয়ে কারা যেন ভয় পাওয়ানোর খেলায় মেতে উঠেছিল। বৃষ্টি-ভেজা শরীরের মতো ঘামে ভিজে উঠেছিল চাচার শরীর। একটা প্রচণ্ড ভয় চাচাকে কুঁকড়ে দিয়েছিল। চিন্তাভাবনা, মন, সব অসাড় করে দিয়েছিল। ভয়ের গোলকধাঁধায় চাচা দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেয়েছিল।

শুধু এইটুকুই চাচার মনে আছে।

ওই বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর পর চাচাকে সদর হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল। চারদিন পর চাচা সেরে ওঠে। তখন লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারে একটা গোটা রাত চাচা ওই কালো বাড়িতে কাটিয়েছিল। কারণ, গাঁয়ের লোকরা চাচাকে পরদিন ভোরবেলা বাড়ির সদরের লোহার গেটের কাছে পড়ে থাকতে দ্যাখে। চাচার জামাকাপড় ছেঁড়া ছিল, সারা গায়ে রক্তের দাগ ছিল। কপালে, হাতে, আঘাতের চিহ্ন ছিল।

কিন্তু সেরে উঠে চাচা কিছুই বলতে পারেনি। বাড়ির ভেতরকার ব্যাপার-স্যাপার সব ভুলে গেছে। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে স্লেটের লেখা মোছার মতন সেই ভয়ংকর স্মৃতিগুলো কেউ যেন মুছে দিয়েছে।

সেরে ওঠার পর প্রায় একমাস চাচা ঘেঁটে যাওয়া মন দিয়ে কষ্ট পেয়েছে। তারপর পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠলেও মনে-না-পড়ার সেই অস্বস্তিটা এত বছর পরেও যায়নি।

চাচার গল্প শুনতে-শুনতে বৃষ্টি আরও বেড়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে পলিথিন শিটের ছাদনা দেওয়া সাইকেল রিকশা প্যাঁক-প্যাঁক করতে-করতে চলে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে লাগানো একটা টিউবলাইট মিইয়ে যাওয়া আলো ছড়িয়ে অন্ধকার হটাতে চেষ্টা করছে। ব্যাঙের ডাকের একটানা ছন্দ কেটে দিয়ে একটা মোটরবাইক ছুটে গেল।

চা খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কামালের হাতে পয়সা দিয়ে শানুরা উঠে পড়ল।

বৃষ্টির ধরন দেখে টুনটুন ভাবছিল দোকানের চালার নীচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি কমার জন্য অপেক্ষা করবে। কারণ, শানুর কাছে একটিমাত্র ছাতা—আর ওরা তিনজন। কিন্তু শানু আর অঙ্কিত অপেক্ষা করার পাত্র নয়। বিশেষ করে অঙ্কিত একটু যেন বেপরোয়া। বলল, 'দুর! এই বৃষ্টিতে ভিজলে কিস্যু হবে না।'

শুধু বলল নয়, বলতে-বলতে নেমে গেল রাস্তায়। মনিরুলচাচাকে হাত নেড়ে বলল, 'আসি, চাচা...।'

বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাতে-চালাতে টুনটুন জিগ্যেস করল, 'চাচার কিছুই মনে নেই।'

'শুনলে তো—' অঙ্কিত বলল।

'ওই বাড়িটায় যারা ঢুকে আবার বেরিয়ে আসে তাদের আর কিছু মনে থাকে না—' আপনমনেই বলল টুনটুন, 'কিন্তু যে-দুজন লোক ঢুকে আর বেরোয়নি—তাদের?'

শানু হেসে বলল, 'আজব তো! ওই লোকদুটোর কী হয়েছে আমরা কী করে জানব।'

অঙ্কিত বলল, 'তুমি ওই বাড়িটায় ঢুকে পরীক্ষা করে দেখতে পারো তোমার সবকিছু মনে থাকছে কি থাকছে না—।'

কথাগুলো বলে অঙ্কিত হাসল। শানুও ওর সঙ্গে যোগ দিল।

কিন্তু টুনটুন হাসল না। ও তখনও চাচার কথাগুলো ভাবছিল। চাচার সারা গায়ে রক্তের দাগ ছিল। জামাকাপড় ছিল ছেঁড়া। কপালে-হাতে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

ওগুলো হল কেমন করে? তা হলে বাড়িটার ভেতরে কি কোনও হিংস্র জানোয়ার আছে?

পরদিন বিকেল চারটে থেকে বিপ্লবী সংঘের ফুটবল ম্যাচ। শানুর সঙ্গে টুনটুন সময় মতো বেরিয়ে পড়ল। শানুর জ্বর কমে গেছে। বাড়িতে মা-কে বারবার করে বলে এসেছে যে, ও খেলতে নামবে না—মাঠের ধারে টুনটুনের সঙ্গে বসে শুধু খেলা দেখবে। কিন্তু মাঠে এসে জার্সি পরা বন্ধুবান্ধব আর সাদা ফুটবলটা দেখে শানুর মাথাটা বিগড়ে গেল। ও টুনটুনের পাশ থেকে ছুটে চলে গেল অঙ্কিতের কাছে। অঙ্কিত আর তিনটে ছেলের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলে ও জার্সি পরে তৈরি হয়ে গেল খেলার জন্য।

টুনটুন 'শানুদা, শানুদা' করে ডাকতেই ও ছুটে চলে এল মাঠের ধারে। চাপা গলায় বলল, 'অ্যাই, মা-কে বলবি না কিন্তু। তোকে বেণুদার রেস্টুরেন্টে ফিশ ফ্রাই খাওয়াব—।'

টুনটুন জবাবে হাসল। ফুটবল খেলা ওর ততটা পছন্দের না হলেও ওর মনে হচ্ছিল জার্সি আর কেডস পরে ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ে।

একটু পরেই রেফারি বাঁশি বাজিয়ে ম্যাচ শুরু করল। বিপ্লবী সংঘ বনাম রক্তিম ইউনাইটেড। একদিকে লাল-সাদা জার্সি, অন্যদিকে নীল-হলুদ। জল-কাদা ভরা মাঠে কাদা-মাখা ফুটবলটা ছোটাছুটি করতে লাগল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে প্লেয়াররাও। থেকে-থেকে রেফারির বাঁশি বাজতে লাগল।

কোথা থেকে যেন কিছু দর্শকের দল জুটে গিয়েছিল। খেলার ওঠা-নামার তালে-তালে তাদের চিৎকারও উঠছে-নামছে। কেউ-কেউ প্লেয়ারদের নাম ধরে চেঁচিয়ে নানান নির্দেশ দিচ্ছে। টুনটুনের মনে হল, স্রেফ মুখে-মুখেই ওরা তীব্র উত্তেজনাময় ফুটবল খেলে চলেছে।

দর্শকদের মধ্যে চার-পাঁচজন মেয়েকে চোখে পড়ল। তার মধ্যে একটি লম্বামতন মেয়েকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী মনে হল। অঙ্কিতের পায়ে বল গেলেই ও উত্তেজিতভাবে চিৎকার করছে। 'দাদাভাই, দাদাভাই' বলে চেঁচিয়ে ডেকে ওর মূল্যবান পরামর্শ ছুড়ে দিচ্ছে।

মেয়েটি ফরসা। লম্বাটে মুখ। চোখদুটো বড়-বড়। মাথার চুল হর্সটেইল করে বাঁধা। পরনে সবুজ-কালো ছাপ-ছাপ একটা চুড়িদার। দেখে মনে হয় ক্লাস সেভেন কি এইটে পড়ে।

টুনটুনের মনে হয়েছিল মেয়েটি অঙ্কিতের বোন হতে পারে। শুধু 'দাদাভাই' শব্দটা ছাড়াও অঙ্কিতের মুখের সঙ্গে মেয়েটির মুখের বেশ মিল খুঁজে পেল ও। তবে একেবারে সুনিশ্চিত হওয়া গেল হাফটাইমের সময়।

অঙ্কিত মাঠের ধারে আসতেই মেয়েটি ওর পরামর্শ আর বকুনি নিয়ে 'দাদাভাই'-এর ওপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। অঙ্কিত হেসে ওর চুল টেনে দিয়ে সব টরচার সহ্য করতে লাগল।

হঠাৎই ও মুখ ফিরিয়ে টুনটুনের দিকে তাকিয়ে ওকে কাছে ডাকল, বলল, 'এদিকে এসো। এই যে—আমার ছোট বোন দিশা—ইন্ডিয়ার প্রথম লেডি ফুটবল কোচ। অবশ্য জানি না ওর আগে কেউ আছে কি না। ও আসলে আমার ছোট বোন নয়—দিদি...আবার দিদিমাও বলতে পারো...।'

টুনটুন হাসল দিশার দিকে তাকিয়ে ততক্ষণে অঙ্কিত সংক্ষেপে টুনটুনের পরিচয়ও দিয়ে ফেলেছে। বলেছে, তিলকপুরের গেস্ট। এখানে সবে বেড়াতে এসেছে। কালো বাড়িটার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড।

এটুকুই বোধহয় যথেষ্ট ছিল। হাফটাইমের পর খেলা শুরু হতেই দিশা টুনটুনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর ডানদিকে টুনটুন, আর বাঁদিকে অন্য বন্ধুরা।

দিশা বলল, 'আগে খেলাটা শেষ হোক, তারপর তোমাকে কালো বাড়িটার ব্যাপারে বলছি। আমার মা বলে বাড়িটা ভীষণ জাগ্রত—মানে জীবন্ত।'

টুনটুন ভেবে পাচ্ছিল না একটা বাড়ি কেমন করে জাগ্রত হতে পারে। মায়ের কাছে বেশ কয়েকবার শুনেছে জাগ্রত মা-কালীর কথা। কিন্তু...?

একটু পরেই ওর মনে হল, কোনও 'কিন্তু' নেই। দেবতা যদি জাগ্রত হতে পারে তা হলে অপদেবতা কেন নয়!

ফুটবল খেলা নিয়েও অনেক বকবক করছিল দিশা। খুব ছোট থেকেই ও ফুটবলের পোকা। তখন ও ছেলেদের সঙ্গে জোট বেঁধে মাঠ বল পেটাপিটি করত। এখন টিভির খেলা আর পাড়ার খেলা দেখে সাধ মেটায়।

বিপ্লবী সংঘ তিন গোল দিল, রক্তিম ইউনাইটেড দিল একটা। অঙ্কিতদের প্রতিটি গোলের সময় দিশা হাততালি দিয়ে পিংপং বলের মতো লাফাচ্ছিল আর চিৎকার করছিল। টুনটুনের মনে হচ্ছিল, গোলগুলো যেন ওই তিড়িং-বিড়িং মেয়েটাই দিয়েছে।

খেলার শেষের দিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখন বড়জোর আর মিনিট পাঁচ-সাত বাকি। সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে খুলে গেল একরাশ কালো আর রঙিন ছাতা। টুনটুনের সঙ্গে ছাতা ছিল না। কিন্তু দিশার সঙ্গে ছিল। ও টুনটুনকে ওর ছাতার নীচে ডেকে নিল।

খেলা ভাঙার পর দিশা টুনটুনকে বলল, 'আমাদের বাড়ি চলো। তুমি গেলে মা-বাবা খুব খুশি হবে।'

টুনটুন শানুর কথা বলতেই দিশা বলল, 'ওদের দেরি হবে। তার চেয়ে দাদাভাইকে বলে দিই শানুদাকে নিয়ে চলে আসবে। তারপর তুমি আর শানুদা একসঙ্গে ফিরে যেয়ো—।'

দিশার কথাবার্তার মধ্যে কেমন একটা সরলতা আর মোলায়েম আদেশ মিশে ছিল। যার জন্য ওর যে-কোনও প্রস্তাবে 'না' বলা কঠিন। টুনটুন ওকে দেখছিল আর ভাবছিল এত টগবগে এনার্জি মেয়েটা পায় কোথা থেকে!

ওদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে কালো বাড়িটা নিয়ে নানান গল্প শোনাল দিশা। ওর স্কুলের বন্ধুরাও এরকম অনেক গল্প বলে। তবে গল্পগুলো সত্যি কি মিথ্যে বলা কঠিন।

টুনটুন বলল, 'গল্পগুলো শুনতে কিন্তু খারাপ লাগছে না। বইয়ের গল্পের মতন। আসলে বাড়িটা ওইরকম দেখতে বলে এতরকম ছমছমে গল্প তৈরি হয়েছে। পরে হয়তো দেখা যাবে বাড়িটা খুব ভালো—প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল...।'

দিশা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা হলে মনিরুলচাচার গল্পটা?'

ওটা নিয়েই টুনটুনের একটু অসুবিধে হচ্ছিল। ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ওটা ঠিকমতো এক্সপ্লেইন করতে গেলে আরও খবর দরকার। কেউ যদি বাড়িটার ভেতরে ঢুকে একটু ইনভেস্টিগেট করত তা হলে...।'

'ওরে বাবা! তোমার তো দেখছি সাহস কম নয়!'

টুনটুন হেসে বলল, 'না, আমার সাহস কম। আমার বাপির সাহস আমার চেয়ে অনেক বেশি—।'

'তাই?' চোখ বড়-বড় করল দিশা। তারপর সামনের একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'এই যে—এটা আমাদের বাড়ি।'

অঙ্কিতদের বাড়িতে গিয়ে হইহই করে অনেক সময় কেটে গেল। চারজনে মিলে তুমুল তর্কবিতর্ক আর আলোচনা হল। বিষয় কালো বাড়ি আর আজকের ফুটবল ম্যাচ।

ওদের বাড়ি থেকে টুনটুন আর শানু যখন রওনা হল তখন রাত প্রায় আটটা। ওদের পায়ের নীচে আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তা। তার নানান জায়গায় ছাল ওঠা। ইটের টুকরো বেরিয়ে পড়েছে। এখানে-ওখানে জল জমে আছে। আর আলো বলতে ধুলোর আস্তরে

মলিন হয়ে যাওয়া টিউবলাইট। লাইটগুলো এত দূরে-দূরে যে, একের আলো অন্যকে ছুঁতে পারছে না।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ওদের সঙ্গে একটা ছাতা ছিল বলে অঙ্কিতদের বাড়ি থেকে আরও একটা ছাতা ধার নিয়ে এসেছে।

শানু হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে তেরছাভাবে বেরিয়ে একটা কাঁচা পথ ধরল। ছোট্ট করে বলল, 'এটা শর্টকাট, বুঝলি?'

শর্টকাট সবারই পছন্দের। কিন্তু চারপাশটা যেন বড় বেশি অন্ধকার। তার সঙ্গে এলোমেলো গাছপালা, বড়-বড় ঘাস আর একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক।

জল-কাদায় পা ফেলতে-ফেলতে টুনটুনের মনে একটা অচেনা ভয় চারিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একটা টর্চ থাকলে ভালো হত।

বেশ কিছুটা এগোনোর পর একটা বিশাল পুকুর দেখতে পেল ওরা। এখানে মেঘ আর অন্ধকার এত গাঢ় যে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি না পড়লে পুকুরটাকে পুকুর বলে বোঝা যেত না।

চলতে-চলতে টুনটুন পুকুরটার দিকে দেখছিল। সেটা লক্ষ করে শানু বলল, 'এটা কালু হালদারদের পুকুর। এই এলাকার বেশিরভাগটাই ওদের জমি। শুনেছি এককালে ব্যাপক বড়লোক ছিল—এখন শুধু কয়েক বিঘে জমিজমা পড়ে আছে...।'

শানু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর বলা হল না। একটা চাপা বাঁশির সুর ওকে থামিয়ে দিল।

শুধু কথা নয়, চলাও থামিয়ে দিয়েছিল শানু। ওর দেখাদেখি টুনটুনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এ কি সেই বাঁশির সুর—যে বাঁশির সুরের কথা শানুদা বলছিল? যে-বাঁশির টানের কথা গতকাল মনিরুলচাচা গল্প করেছে?

শানু চাপা গলায় বলল, 'ওই বাঁশি বাজছে! চল, আমরা ফিরে যাই—।'

টুনটুন জিগ্যেস করল, 'কেন, বাঁশির আওয়াজে ভয় কীসের?'

'যদি টেনে নেয়? তোকে সেদিন বলছিলাম না—।'

'কোনদিকে টানবে?'

টুনটুনের দিকে ঘুরে তাকাল শানু: 'কেন, কালো বাড়িটার দিকে। মনিরুলচাচা কাল বলল শুনিসনি?'

বাঁশির সুরটার মধ্যে অপার্থিব কিছু ছিল না। তবে চোস্ত হাতে কেউ বাঁশিটা বাজাচ্ছিল। চাচা ঠিকই বলেছিল—বুকফাটা সুরেলা কান্না। অতল গহ্বরের কোনও কারাগার থেকে কয়েকশো বছরের পুরোনো কোনও বন্দি আকুল হয়ে মুক্তি চাইছে। তার তোলা বাঁশির সুর কোমল আর্তিতে যেন আকাশে, বাতাসে, গাছের পাতায়, পুকুরের জলে মাথা খুঁড়ে মরছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বাঁশির সুরটা অদৃশ্য এক সরীসৃপ হয়ে মোলায়েম সাবলীল গতিতে অলসভাবে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সবকিছুকে যেন এক অলৌকিক প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে ধরতে চাইছিল।

টুনটুনের সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। বাঁশির সুরটা ঠিক কোনদিক থেকে ভেসে আসছে সেটা ও কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিল না। বৃষ্টির মধ্যেই ও চোখ সরু করে চারপাশটা খুঁটিয়ে নজর করে লুকিয়ে থাকা অলৌকিক বাঁশিওয়ালাকে খুঁজছিল।

শানু আবার বলল, 'চল, ফিরে চল। এই রাস্তায় আর এগোব না—রিসক হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুই সঙ্গে আছিস। কোনও একটা কেস হয়ে গেলে...'

ঠিক তখনই টুনটুনের চোখ একটা জায়গায় আটকে গেল। সেদিকে তাকিয়ে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের কাছ থেকে তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে পুকুরপাড়ে একটা বিশাল অন্ধকার গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছটা পুকুরের দিকে অনেকটা ঝুলে রয়েছে। বহুদূর থেকে ছিটকে আসা টিউবলাইটের আলো হালকা জ্যোৎস্নার মতো গাছের ভিজে পাতা আর ডালে লেপটে আছে।

পুকুরের দিকে ঝুলে পড়া একটা বড়সড় ডাল টুনটুনের নজর কেড়েছিল। ওর মনে হল, সেই ডালে কিছু একটা যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে।

ও শানুর জামা ধরে টান মারল: 'শানুদা, ওটা কী দ্যাখো তো—।' আঙুল তুলে গাছটার দিকে দেখাল টুনটুন।

শানু ভালো করে নজর চালিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ রে, ওই ঝুলে পড়া ডালটায় কী একটা যেন জড়িয়ে রয়েছে—।'

'সাপ-টাপ হতে পারে?'

'উঁহু—বৃষ্টির মধ্যে সাপ অত কষ্ট করে ওপরে বেয়ে উঠে গাছের ডাল জড়িয়ে থাকবে কেন? ওটা অন্য কিছু—।'

শানুর কথা শেষ হতে-না-হতেই টুনটুন একটা কাণ্ড করে বসল। পায়ের কাছে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা বড় ঢিল কুড়িয়ে নিল। ছাতাটা খোলা অবস্থাতেই পাশে নামিয়ে রাখল। তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ঢিলটাকে গাছ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

ঠিক লক্ষ্যভেদ না হলেও ঢিলটা কাছাকাছি পাতা বা ডালে গিয়ে ঠোক্কর খেল। কারণ, সংঘর্ষের চাপা শব্দটা ওরা শুনতে পেল।

আর ঠিক তখনই বাঁশির সুর থেমে গেল। যেন অলৌকিক বাঁশিওয়ালাকে ঢিল মেরে কেউ থামিয়ে দিয়েছে।

ঝুঁকে পড়ে ছাতাটা তুলে নিল টুনটুন। দেখল, সেই গাছের ডাল থেকে কী একটা যেন সরসর করে নেমে যাচ্ছে।

শানু হঠাৎই ওর হাত ধরে টান মারল, বলল, 'চল তো, একটু এগিয়ে দেখি—।'

এগিয়ে দেখি! তার মানে?

টুনটুন এই কথাগুলো ভাবতে না ভাবতেই শানু আবার ওর হাত ধরে টানল। তারপর চটপটে পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেল।

তখনই ওরা স্পষ্ট দেখল গাছের ডাল বেয়ে অনেকটা নেমে এসে সেই 'কী একটা যেন' পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়ল।

'ঝপাৎ' শব্দ হল। ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

পুকুরের দিকে তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে রইল শানু আর টুনটুন।

জল নড়ছে, ফুলে উঠছে, নামছে—কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা জলের ওপরে সূক্ষ্ম নকশা বুনে চলেছে।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর টুনটুন জিগ্যেস করল, 'শানুদা, জলে ঝাঁপ দিল, ওটা কী? সাপ?'

'সাপের মতো...কিন্তু সাপ জলে ঝাঁপ দিলে ওরকম ঢেউ ওঠে না। ওটা অন্য কিছু। আগে কখনও আমি দেখিনি...কেউ দেখেনি।'

'তুমি খেয়াল করেছ, ঢিল ছোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাঁশি থেমে গেছে। তা হলে কি ওই জিনিসটাই বাঁশি বাজাচ্ছিল?'

'জানি না—আমি কিছু জানি না।'

টুনটুন চাপা গলায় জানতে চাইল, 'কালো বাড়িটা এখান থেকে কতদূরে, শানুদা?'

শানু হাত তুলে একদিকে দেখাল: 'বেশ দূরে। ওইদিকে।'

বেশ কিছুক্ষণ ওরা পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পাড়ের দিকে নজর রাখতে লাগল—পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রাণীটা জল থেকে ওঠে কি না।

কিন্তু আর কিছু দেখতে পেল না।

একসময় শানু বলল, 'এবার চল—রাত হয়ে যাচ্ছে।'

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফেরার পথে শানু আবার বলল, 'এসব কথা কাউকে বলিস না, বুঝলি?'

টুনটুন বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ল।

ঠিক তখনই বৃষ্টিটা আরও জোরে নামল।

কী করে যেন কালো বাড়িটা টুনটুনের মাথায় চেপে বসতে লাগল। বারবার ওর মনে হতে লাগল, বাড়িটা ওকে টানছে। চোখের সামনে বসে আছে একটা জমাট রহস্য, অথচ সেটা কেউ তলিয়ে দেখতে চাইছে না। বাড়িটাকে এত ভয় পায় সবাই!

শানু আর অঙ্কিতের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা বলেছে টুনটুন। একদিন রাগ করে এ-কথাও বলেছে, 'শানুদা, তোমরা তোমাদের ক্লাবের নামটা পালটে ফ্যালো। নাম রেখেছ "বিপ্লবী সংঘ" অথচ ওই বাড়িটায় ঢুকতে ভয় পাও। তোমরা...।'

'শোন—' শানু বলল, 'আমরা ভয় ঠিক পাই না—তবে...মানে, শুধু-শুধু বাড়িটাকে ডিসটার্ব করে কী লাভ! বাড়িটা যেমন আছে থাক না নিজের মনে...।'

'শুধু বাড়ি কেন?' পালটা তর্কে মেতে উঠল টুনটুন। কপালে নেমে আসা চুল সরিয়ে বলল, 'সেদিন রাতের কেসটা কী হল? ওই যে, গাছ থেকে সাপের মতো জিনিসটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল...বাঁশির আওয়াজ থেমে গেল...।'

অঙ্কিত অবাক হয়ে শানুর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার রে?' ওর ভুরু কুঁচকে গেল।

তখন শানু আমতা-আমতা করে ঘটনাটা জানিয়েছে। অঙ্কিত টু শব্দ না করে একমনে শানুর কাহিনি শুনেছে। শুনতে-শুনতে আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করেছে।

টুনটুনের উৎসাহ আর খোঁচায় কালো বাড়িটা নিয়ে নানান খোঁজখবর নিতে শুরু করল শানু আর অঙ্কিত। জানা গেল, ঠিক ওইরকম একটা অদ্ভুত প্রাণীকে এলাকার আরও দু-একজন দেখেছে। তবে তারা প্রত্যেকেই কোন এক অপদেবতার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে চেয়েছে।

কালো বাড়ি ছাড়া তিলকপুরে আরও যা কিছু দেখার আছে সেসব টুনটুনকে ক'দিন ধরে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল শানু। যেমন, দেড়শো বছরের পুরোনো একটা শিবমন্দির—যেখানে শিবরাত্রির সময় অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়। আশপাশের বহু এলাকা থেকে দলে-দলে সবাই আসে শিবের পুজো দিতে।

তারপর তিলকপুরের স্কুল, বাজার, রবিবারের পশু-পাখির হাট, ফুলচাষের বাগান—কিছুই দেখাতে বাকি রাখল না।

সব দেখানো শেষ হলে শানু বলেছিল, 'তবে আমাদের এখানে সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিসটা তুই সবার আগে দেখে ফেলেছিস। কালো বাড়ি। কিন্তু এটার কথা কেউ ডিসকাস করে না—যদিও প্রায় সবাই জানে।'

রবিবার বেলার দিকে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা তিনজন। বিশাল এলাকা জুড়ে হাট বসেছে। জায়গাটা একটা ফাঁকা মাঠ। তার মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছ, আর কয়েকটা চালাঘর—টিন অথবা চাটাইয়ের ছাউনি দেওয়া।

হাটে বেশ ভিড়। বিক্রির আশায় অনেকেই তাদের গোরু-বাছুর, ছাগল, কুকুর নিয়ে এসেছে। এ ছাড়া আছে নানান রঙের পাখি। খদ্দেররা ঘুরে-ঘুরে পশু-পাখি পরখ করে দেখছে। চারপাশে কিচিরমিচির ট্যাঁও-ট্যাঁও করে হরেকরকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে কখনও-কখনও ছাগলের ডাক বা গোরুর হাম্বা রব।

টুনটুনের অদ্ভুত লাগছিল।

বর্ষার ছাই-রঙা আকাশ। বেলা বারোটার সময়েই গোধূলির আলো ছেয়ে আছে। মানুষজনের ভিড়। পশু-পাখির ডাক। সবমিলিয়ে এক জ্যান্ত ছবি।

ওরা পাখি দেখছিল। হঠাৎই প্রচণ্ড শোরগোল শুনে চমকে ফিরে তাকাল।

দেখল হাটের লোকজন দিশেহারা হয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটছে। আর পাগলের মতো চিৎকার করছে।

ওদের তিনজোড়া চোখ এই ডামাডোলের কারণ খুঁজছিল। কয়েক সেকেন্ড পরই দেখতে পেল একটা স্বাস্থ্যবান কালো বলদ খেপে গিয়ে এলোমেলো দৌড়চ্ছে। তারই গুঁতোর ভয়ে লোকজনের ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

ওরা তিনজন ছুটে পিচের রাস্তায় চলে এল। একটা দোকানের সামনের রোয়াকে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

রোয়াকে আরও দু-চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের জিগ্যেস করে জানা গেল ওই এলোমেলো ছুটে বেড়ানো কালো বলদটার নাম মনু। ওটা বদন ঘড়াইয়ের বলদ। প্রচণ্ড গরমে মাঠে লাঙল দিয়ে-দিয়ে নাকি পাগল হয়ে গেছে। ওকে সারিয়ে তোলার জন্য বদন

অনেক ঝাড়ফুঁক করিয়েছে। কবিরাজের সালসা আর মোদক খাইয়েছে। এখন কী একটা ইনজেকশান দিয়ে চিকিৎসা চালাচ্ছে।

বদন প্রতি সপ্তাহের হাটে বলদটাকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। কিন্তু কপাল খারাপ—এখনও বিক্রি হয়নি।

মনু তখনও লেজ খাড়া করে দৌড়চ্ছে। আর রোগা-সোগা টাকমাথা একজন লোক তার পিছন-পিছন মরিয়া হয়ে ছুটছে, আর মাঝে-মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে নিজের লুঙ্গি সামাল দিচ্ছে।

জটলার মধ্যে একজন আঙুল তুলে সেদিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে...মনুর পেছনে দৌড়চ্ছে...বদন ঘড়াই...।'

লোকজন দৃশ্যটা দেখছিল, হাসাহাসি করছিল। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, এই খ্যাপা বলদটা গোটা এলাকাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। এটাকে দূরের কোনও গ্রামে চুপিচুপি ছেড়ে দিয়ে এলে বদল ভালো করত। তার জবাবে কে যেন বলল, সেটা হওয়ার নয়। কারণ, মনুকে বদন দারুণ ভালোবাসে।

এসব কথাবার্তার মধ্যেই মনু এবং তার মালিক হাটের লন্ডভন্ড এলাকা ছাড়িয়ে দূরে গাছাগাছালির মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

হাট থেকে ফেরার পথে শানু ঠাট্টা করে বলল, 'যাক, ফ্রি-তে একটা সিনেমা দেখা হয়ে গেল। সিনেমাটার নাম "পাগলা বলদ"।'

টুনটুন আর অঙ্কিত হেসে উঠল। কিন্তু একইসঙ্গে টুনটুনের মনে হচ্ছিল, স্নেহ-ভালোবাসা বড় মারাত্মক জিনিস। বোধহয় সবকিছুর চেয়ে বড়।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক দু-দিন পরে। বিকেলে।

সেদিন বৃষ্টি ছিল না—তবে আকাশে সাজানো-গোছানো মেঘ ছিল। টুনটুন আর দিশা হেঁটে যাচ্ছিল অঙ্কিতদের বাড়ির দিকে। অঙ্কিত আর শানু ওদের সঙ্গে ছিল না। ওরা গেছে সাইকেলের দোকানে—অঙ্কিতের সাইকেলের বেয়ারিং সারাতে। অঙ্কিত বলেছে, 'তোরা এগো— আমরা একটু পরেই তোদের পথে ধরে নেব...।'

টুনটুন ওর স্কুলের কথা বলছিল। বলছিল ওর স্যারদের কথা। স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস-এর সময় কীরকম হুইহুল্লোড় আর মজা হয় সেসব কথা শোনাচ্ছিল।

ওদের পাশ দিয়ে বেল বাজিয়ে দু-একটা সাইকেল যাচ্ছিল। একটা মোটরবাইক কানে তালা ধরিয়ে আঁকাবাঁকা রেখায় কায়দা দেখিয়ে ছুটে গেল। দিশা বলল, 'ওটা বিকাশদা। দারুণ বাইক চালায়...।'

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে আরও খানিকটা এগোতেই টুনটুন বহুদূরে কালো বাড়িটাকে দেখতে পেল।

ও বলল, 'চলো, ওটার কাছ দিয়ে যাই।'

দিশা ওর দিকে তাকিয়ে একটু দেখল। বলল, 'খুব ইন্টারেস্ট, না?'

'হ্যাঁ—তা একটু আছে।'

'তুমি ভূতুড়ে বাড়ি ভয় পাও না?'

'কে জানে! বাড়ির বাইরে থেকে তো পাই না।' মাথা ঝাঁকাল টুনটুন: 'ভেতরে ঢুকলে ভয় পাব কি না সেটা ডিপেন্ড করছে...।'

দিশা আর কিছু বলল না। ওকে নিয়ে বাঁ-দিকের একটা কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়ল।

এমন সময় দূর থেকে টুনটুনের নাম ধরে কেউ ডাকল।

ওরা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল অঙ্কিত আর শানু—হাসছে, হাত নাড়ছে। ইশারায় বলল, 'তোরা এগিয়ে যা—আমরা পেছনে আছি।'

টুনটুনরাও হাত নাড়ল। তারপর এগিয়ে চলল।

পথের দুপাশে কাছে-দূরে ছোট-বড় অনেক গাছ। তারই মাঝে এখানে-ওখানে কয়েকটা বাড়ি। বেশিরভাগই একতলা। কয়েকটা বাড়ির মাথায় টিনের বা টালির চাল।

পথের ওপরে বাচ্চারা ছুটোছুটি করে খেলা করছে। দুটি মেয়ে টিউবওয়েল থেকে কলসিতে জল ভরছে। গাছের আড়ালে কোথায় যেন একটা কোকিল ডাকছিল।

টুনটুন অবাক হয়ে এসব দেখছিল। শহরের চেয়ে কত আলাদা! কী মোলায়েম!

একটু পরেই ওরা কালো বাড়িটার কাছাকাছি চলে এল। সামনেই ফাঁকা জায়গা। গাছপালার রাজত্ব। সেগুলো পেরিয়ে জং ধরা লোহার গেট।

দিশা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই পিছন থেকে কয়েকজন মানুষের চেঁচামেচি হইচই কানে এল। তার মধ্যে দু-চারজন বাচ্চার গলাও মিশে আছে।

ব্যাপারটা কী? পিছনে ফিরে তাকাল টুনটুন।

তাকিয়েই ভয়ে ওর প্রাণ উড়ে গেল। ওদের দিকে পাগলের মতো ধেয়ে আসছে একটা কালো পাহাড়। মনু। বদন ঘড়াইয়ের সেই খ্যাপা বলদটা।

'দিশা—ছোটো!' বলে চিৎকার করে যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটতে শুরু করল টুনটুন।

দিশা চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে আঁতকে উঠল। এই খ্যাপা বলদটার কথা ও টুনটুনের মুখে শুনেছে।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল দিশার। ও চিৎকার করে দিশেহারা হয়ে এলোমেলো ছুটতে শুরু করল। বলদটা দিশারই পিছু নিল।

অনেকটা ছুটে যাওয়ার পর টুনটুন পিছন ফিরে দেখল। দিশা চিৎকার করছে, ছুটছে।

কিন্তু এবার টুনটুন আরও বেশি ভয়ে পেল। কারণ, মনুর ভয় পাগল হয়ে দিশা কালো বাড়িটার দিকেই ছুটে যাচ্ছে। বলদটার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। ওর সামনে আর কোনও আড়াল নেই, আশ্রয় নেই।

আগাছার জঙ্গলের মধ্যে টুনটুন দাঁড়িয়ে পড়ল। ও কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। এবং ওর অবাক চোখের সামনে লোহার দরজার দু-পাল্লার ছোট ফাঁক দিয়ে দিশা কালো বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ল।

বলদটা প্রবল আক্রোশে ছুটে গেল সেই লোহার সিংদরজার দিকে। মাথা নীচু করে শিং বাগিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজার পাল্লার ওপরে। সংঘর্ষের ধাতব শব্দ বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

দিশা আরও জোরে ভয়ংকর এক চিৎকার করে ঢুকে পড়ল কালো বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে।

টুনটুন কেঁপে উঠল। শিরশির করে একটা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীরের ভেতর দিয়ে। ও 'দিশা! দিশা!' করে ডেকে উঠল।

বলদটা আরও দুবার দরজায় ঢুঁ মারল। তারপর ছুট লাগাল পাগলের মতো। ঝোপজঙ্গল খেত চিরে দৌড়তে লাগল।

ততক্ষণে মানুষজনের ভিড় জমে গেছে। কালো বাড়ির কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন তুলছে, বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

টুনটুন ছুটে গেল ওদের কাছে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দিশাকে বাঁচান! একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। ওকে যে করে হোক সেভ করুন। পুলিশে খবর দিন। ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিন। কিছু একটা করুন—প্লিজ!'

কে একজন বলল, 'এখানে ফায়ার ব্রিগেড কোথায়? থানায় খবর দিতে পারো, তবে বড়বাবু আসবে বলে মনে হয় না...।'

আর একজন মন্তব্য করল, 'ও বাড়িতে ঢোকা মানে জান বন্ধক দেওয়া।'

'মেয়েটা মরতে ও-বাড়িতে ঢুকতে গেল কেন? পাশ দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে পালাতে পারল না?'

'একটু পরেই তো সব আঁধার হয়ে যাবে। তারপর কি আর ও-বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে?'

এসব মন্তব্য শুনতে-শুনতে টুনটুন যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল। ও চট করে আকাশের দিকে তাকাল। সন্ধে নামতে এখনও বোধহয় আধঘণ্টাখানেক বাকি। আকাশে মেঘ না থাকলে হয়তো আরও দশ-পনেরো মিনিট পাওয়া যেত। কিন্তু...।

তা হলে কি ও থানায় ছুটে যাবে?

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই শোনা গেল মেঘের গুড়ুম-গুড়ুম।

তখনই শানু আর অঙ্কিতকে দেখতে পেল টুনটুন। ও ছুটে ওদের কাছে গেল। বলল বদন ঘড়াইয়ের খ্যাপা বলদ মনুর কথা। আর দিশার কথা।

বলতে-বলতে টুনটুনের চোখে জল এসে গেল। অঙ্কিত ভীষণ ঘাবড়ে গেল। আর শানু বুঝে উঠতে পারছিল না কী করবে।

অঙ্কিত পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বাড়িতে ফোন করল। মা-কে দিশার খবরটা দিয়ে বলল, ওর বাবা যেন এক্ষুনি থানায় খবর দেন।

শানুও মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে লাগল। মা ফোন ধরতেই বলল, 'অঙ্কিতের ছোট বোনটা ভীষণ বিপদে পড়েছে। আমি আর টুনটুন এখানে আছি। ফিরতে দেরি হবে।'

অনিতা জিগ্যেস করলেন, 'কী বিপদ হয়েছে?'

'দিশা—অঙ্কিতের বোন—কালো বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।'

'কালো বাড়িতে? বলিস কী!'

শানু আর কথা না বাড়িয়ে আচমকা ফোন রেখে দিল।

অঙ্কিত ততক্ষণে দুটো ছেলেকে থানায় রওনা করে দিয়েছে। বলেছে, বড়বাবুকে ব্যাপারটা বলে যেমন করে হোক স্পটে নিয়ে আসতে।

টুনটুন লক্ষ করল, অঙ্কিতের মুখ ফ্যাকাসে, দিশেহারা। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ও শানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শানুদা, শিগগির চলো। এখনও আলো আছে। বাড়িটার ভেতরে ঢুকে দিশাকে নিয়ে আসি। এরপর সন্ধে হয়ে গেলে...।'

অঙ্কিত ইতস্তত করতে লাগল। দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন পরামর্শ শুনতে চাইল।

টুনটুন অঙ্কিতের কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে টান মারল: 'অঙ্কিতদা, জলদি করো! দেরি হয়ে গেলে দিশার যদি কিছু একটা হয়ে যায়...প্লিজ...।'

টুনটুনের গলা ভেঙে গেল। চোখে জল এসে পড়ল।

তখনই ও খেয়াল করল, অঙ্কিতের চোখও শুকনো নেই।

এমন সময় শানু আর অঙ্কিত দুজনেরই মোবাইল বাজতে শুরু করল। ওরা চটপট ফোন ধরে কথা বলতে শুরু করল।

কথা শুনে টুনটুন বুঝতে পারল ওরা ওদের বাবার সঙ্গে কথা বলছে।

অঙ্কিত ফোনে কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল। বলল, 'তোমরা যা করার তাড়াতাড়ি করো। এদিকে আমরা দেখছি...।' তারপর ফোন কেটে দিল।

শানুও একই ধরনের কথা বলে ফোন শেষ করল।

অঙ্কিত চোখ মুছল। নিজেকে সামলে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল। তারপর বলল, 'চল—।' বলে কালো বাড়িটার দিকে এগোল।

টুনটুন আর দেরি করল না। শানুর হাত ধরে এক টান মেরে অঙ্কিতের সঙ্গে এগোল।

জনতার ভিড় থেকে রব উঠল, 'যেয়ো না! ও-বাড়িতে ঢুকো না! আগে পুলিশ আসুক...।'

অঙ্কিত একপলকের জন্য পিছনে ফিরে তাকাল শুধু। কোনও কথা বলল না। উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখল। দিশা ওর ছোট বোন—ওদের নয়।

আবার কালো বাড়িটার দিকে পা চালাল অঙ্কিত। সঙ্গে শানু আর টুনটুন।

জল-কাদা আর ঘাস মাড়িয়ে ওরা বেশ কষ্ট করে এগোতে লাগল। টুনটুন কান পেতে শুনতে চাইল দিশার চিৎকার।

শানু বলল, 'পুলিশ এখুনি এসে পড়বে।' ওর কথাটা অনেকটা ভরসা খোঁজার মতো শোনাল।

একটু পরেই ওরা বাড়ির সিংদরজায় পৌঁছে গেল। অঙ্কিত দিশার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল। তারপর পালা করে টুনটুন আর শানুও চেঁচাল। কিন্তু দিশার কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

অঙ্কিত আচমকা একটা সাহসের জোয়ার দেখিয়ে গটগট করে ঢুকে পড়ল বাড়ির এলাকায়। টুনটুন আর শানুও দেরি করল না।

বাড়িটার এত কাছে এসে শ্যাওলা ধরা দেওয়ালগুলো আরও ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল টুনটুন। ভিজে চকচকে জমাট শ্যাওলা। সেইসঙ্গে ছাতা ধরা গন্ধটা ভয়ংকর তীব্র হয়ে নাকে আসছিল।

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ওরা খোলা জায়গাটা পেরিয়ে গেল। সামনেই কালো বাড়ির কালো রঙের বিশাল সদর দরজা। দরজার পাল্লায় বেশ কয়েকটা লোহার গজাল বসানো। ওগুলোর মাথা বিষফোঁড়ার মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। পাল্লা দুটোর নানান জায়গায় ফাটল ধরা। এখানে-ওখানে কাঠের চটা উঠে গেছে। ধুলো আর ময়লায় দরজাটা মলিন। দরজার ফ্রেমের কোনা থেকে ছোট-বড় গাছ বেরিয়ে গেছে।

দরজার পাল্লা দুটো বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে। এই ফাঁক দিয়েই দিশা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে। ওরা নজর চালিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিকষ অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

অঙ্কিত দরজার ফাঁকের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে ডাকল: 'দিশা—! দিশা—!'

কোনও সাড়া নেই।

টুনটুন দিশার নাম ধরে ডাকল দুবার।

কোনও উত্তর নেই।

'চল—' বলে দরজার একটা পাল্লা ঠেলে দিল অঙ্কিত। তারপর কালো বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ওর পিছন-পিছন শানু আর টুনটুনও ঢুকে পড়ল।

ওরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে দিশার নাম ধরে ডেকে চলল। সেই চিৎকারের মধ্যে মনের ভয় তাড়ানোর চেষ্টাও খানিকটা মিশে ছিল। ওদের চিৎকারের উত্তরে ফাঁপা প্রতিধ্বনি ফিরে এল বারবার।

এমনসময় আকাশের মেঘ ডেকে উঠল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

কালো বাড়ির সদর দরজাটা হঠাৎ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ওরা তিনজন চমকে ফিরে তাকাল। শানু আর টুনটুন ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজাটা টেনে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু ভেতর থেকে ধরে টানার মতো কোনও কড়া কিংবা হাতল খুঁজে পেল না।

তখন ওরা দরজার পাল্লায় জোরে-জোরে কয়েকবার ধাক্কা মারল, কিন্তু ভারী দরজাটা সে-ধাক্কাকে পাত্তা দিল বলে মনে হল না।

শানু আর টুনটুন অঙ্কিতের কাছে এসে দাঁড়াল। শানু একটু ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'দরজাটা কে বন্ধ করল বল তো? আমরা তো আর এ-বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না...!'

অঙ্কিত কোনও উত্তর দিল না। বাড়ির ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

গোটা বাড়িটায় এক অদ্ভুতরকমের আলো ছড়িয়ে আছে। গোধূলির আলোর সঙ্গে একটু নীলচে রং মিশিয়ে দিলে বোধহয় এইরকম আলোই পাওয়া যাবে। কিন্তু আলোটা কোথা

থেকে আসছে সেটা বোঝা গেল না।

ওরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা চওড়া করিডর মতন। তার দুপাশেই খাড়া কালো রঙের দেওয়াল। দেওয়ালে শ্যাওলার ছোপ আর ছাতা ধরা গন্ধ।

করিডর ধরে ওরা আরও একটু এগোল। অঙ্কিত দিশার নাম ধরে ডাকল দুবার, এবং যথারীতি কোনও সাড়া পেল না।

ওরা একটা সিঁড়ির সামনে এসে পড়ল। চওড়া কালো পাথরের সিঁড়ি। এবড়োখেবড়ো ধাপগুলো দোতলার দিকে উঠে গেছে।

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ওরা ওপরে উঠতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই ওরা খেয়াল করল, কোথা থেকে যেন একটা হালকা শব্দ ওদের কানে আসছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের মতো। খুব ঢিমে তালে কেউ যেন শ্বাস নিচ্ছে, আবার ছাড়ছে।

'কীরে, কোনও মেশিন-টেশিন চলছে নাকি?' অঙ্কিতের দিকে তাকিয়ে শানু জিগ্যেস করল।

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল অঙ্কিত: 'কামারশালায় যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেই টাইপের—না?'

'হ্যাঁ—।'

ওরা দোতলায় উঠে এল। এবার বাড়ির ভেতরের চেহারাটা ওদের কাছে স্পষ্ট হল।

একতলায় ওরা কোনও ঘরের দরজা দেখেনি। অবশ্য সেভাবে খোঁজেওনি। কিন্তু দোতলায় এসে অনেকগুলো দরজা চোখে পড়ল। আরও বুঝতে পারল, বাড়িটা মাপে বিশাল।

বাড়িটার ভেতরের রকমসকম অনেকটা পুরোনো দুর্গের মতো। দোতলার লম্বা বারান্দাটা একটা প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা বরাবর পাক খেয়ে গেছে। বারান্দা থেকে নীচে তাকালে একটা খোলা জায়গা চোখে পড়ে। সেই চাতালের ঠিক মাঝখানে একটা চৌকো পুকুরের মতো। পুকুরটার পাড় বাঁধানো। আর পুকুরে নামার জন্য চারদিকেই পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। পুকুরের চারকোণে চারটে বড়-বড় থাম। তার গায়ে নানান নকশা। তবে জায়গায়-জায়গায় সিমেন্ট খসে গেছে। শ্যাওলা ও ময়লা জমে নকশা চাপা পড়ে গেছে। এ ছাড়া থামগুলোয় জড়িয়ে রয়েছে নানান গুল্মলতা।

পুকুরের জলের রং যা-ই হোক, এখন সেটা কালো দেখাচ্ছে। আর বারান্দা থেকে ঝুঁকে পুকুরের দিকে তাকিয়ে ওরা কোনওরকম প্রতিফলন দেখতে পেল না।

জলে আকাশের ছায়া না দেখতে পেয়ে ওপরদিকে তাকাল টুনটুন। না, সেখানে খোলা আকাশ নেই। বরং রয়েছে ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড ঢাকনা। সেই ঢাকনার কোথাও-কোথাও ফাটল কিংবা গর্ত রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে আকাশের শেষ আলো চোখে পড়ছে।

ওরা তিনজন প্রথমে বারান্দাটা একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। 'দিশা! দিশা!' করে বারকয়েক ডাকল। উত্তর দিল প্রতিধ্বনি।

অঙ্কিত বলল, 'চল, এবার ঘরগুলো খুঁজে দেখি। তারপর তিনতলাটা দেখব।'

শানু আর টুনটুন ওর কথায় সায় দিল।

দোতলায় ওটার সময় সিঁড়ির ধাপ যে আরও ওপরদিকে উঠে গেছে সেটা ওরা খেয়াল করেছে। তবে টুনটুনের মনে প্রশ্ন জাগছিল, কালো বাড়িটা ক'তলা? বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখে ওর কখনও মনে হয়নি ওটা দোতলার বেশি। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঘোরাঘুরি করে ওর মনে হচ্ছে, তিনতলা কেন, বাড়িটা চারতলাও হতে পারে। তবে বাড়িটাকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ ও এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওই চাপা শব্দটা একটা অস্বস্তি তৈরি করছে। ওটা এখনও হয়ে চলেছে। টুনটুন ভাবল, সবক'টা ঘর তল্লাশি করে দেখলেই ওটার রহস্য ভেদ করা যাবে। হয়তো জানলা দিয়ে জোলো বাতাস ঢুকে ওরকম অদ্ভুত শব্দ তৈরি করছে।

দিশার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে ওরা তিনজনে তিনটে ঘরের দরজা লক্ষ্য করে দৌড়ল।

বাড়ির ভেতরে কোথাও কোনও ইলেকট্রিক বালব, টিউবলাইট কিংবা পাখা ওদের চোখে পড়েনি। শুধু তাই নয়, কোনও ওয়্যারিং বা সুইচবোর্ডও নেই। মনে হয়, এসব ব্যবস্থা এ-বাড়িতে কোনওকালেই ছিল না। তা হলে কি বাড়িটা মোমবাতি-হ্যারিকেন কিংবা প্রদীপ-কুপির যুগে তৈরি?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে টুনটুন একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরটা বেশ বড়। ঘরে একটা প্রকাণ্ড কাঠের আলমারি। তার পাল্লার ওপরে দুটো লম্বা-লম্বা আয়না লাগানো। আর একদিকে একটা একমানুষ সমান আলনা। তাতে বেশ কয়েকটা নোংরা ছেঁড়া কাপড় ঝুলছে। আলনার উলটোদিকের দেওয়াল ঘেষে একটা বড় পালঙ্ক। পালঙ্কে এলোমেলোভাবে পড়ে আছে দুটো বালিশ আর দুটো কোলবালিশ। দু-একটা বালিশের খোল ফেটে তুলো বেরিয়ে এসেছে। বিছানায় একটা সাদা চাদর পাতা রয়েছে। তার প্রান্তটা পালঙ্কের দুপাশে পরদার মতো ঝুলছে।

গোটা ঘরের সর্বত্র ধুলো আর ধুলো। আর তার সঙ্গে পুরোনো ছাতা ধরা গন্ধ।

টুনটুন দেখল, ওর মুখোমুখি দেওয়ালে দুটো জানলা হাট করে খোলা।

ও খুব অবাক হল। কারণ, আগে যখনই ও কালো বাড়িটাকে দেখেছে তখন একটা জানলাও ওর নজরে পড়েনি। কিংবা এমন হতে পারে, জানলা সব বন্ধ ছিল এবং শ্যাওলার পরত জানলার পাল্লা আর দেওয়ালকে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে যে, আলাদা করে আর চেনা যায়নি।

কী এক কৌতূহলে জানলার কাছে ছুটে গেল টুনটুন। চোখ মেলে বাইরে তাকাল। তারা ভরা আকাশ ওর নজরে পড়ল।

হঠাৎই ওর খেয়াল হল, কোনও গাছপালা, বাড়িঘর কিংবা আলোর বিন্দু—কিছুই ওর চোখে পড়ছে না। সবটাই শুধু রাতের আকাশ—মেঘহীন, পরিষ্কার। দেখে মনেই হয় না, এই আকাশ ক'দিন ধরে কী বৃষ্টিই না দিয়েছে!

কিন্তু এই অল্প সময়ে আকাশটা কী করে এত ঝকঝকে হয়ে গেল?

এ-কথা ভাবতে-ভাবতে ও নীচের দিকে তাকাল। আর তাকিয়েই ওর মাথাটা কেমন টলে গেল।

এ কী দেখছে ও? নীচের দিকে তাকিয়েও সেই রাতের আকাশ!

আকাশটা কি এই বাড়িটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে? এমনকী নীচ থেকেও?

টুনটুনের মাথাটা পাক খেয়ে গেল। ওর চারপাশটা কেমন দুলে উঠল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরে ও সামলে নিল। কিন্তু একইসঙ্গে ভয় পেয়ে গেল। এ-বাড়ি থেকে ওরা বেরোবে কেমন করে? দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে তাকালে তিলকপুরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না—শুধু আকাশ আর আকাশ।

টুনটুনের সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের লোক এসেই বা কী করে ওদের উদ্ধার করবে? লোকজন জোগাড় করে ওরা কি এই বাড়িটাকে ভেঙেচুরে একেবারে শেষ করে দিতে পারবে?

এমন সময় রক্ত হিম করা একটা চিৎকার টুনটুনকে পাথর করে দিল।

চিৎকারটা লম্বায় অনেক বড়। গলার স্বর এতটাই কর্কশ যে, মনে হল, ভাঙাচোরা গলা নিয়ে কেউ বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় চরম চিৎকার করছে।

হয় শানু, নয় অঙ্কিত। টুনটুনের মনে হল, চিৎকারের মালিক ওদেরই কেউ একজন। যদি তাই হয় তা হলে ওর সঙ্গে টুনটুনের কি আর দেখা হবে!

আর দেরি করল না ও। মাথার চক্কর সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'শানুদা! অঙ্কিতদা!' তারপর ঘরের দরজা লক্ষ্য করে তীব্র ছুট লাগাল।

ঠিক তখনই বিছানার সাদা চাদরটা ভেসে উঠল শূন্যে। সমুদ্রের জলের মতো ঢেউ তুলে ধীরে ধীরে নেমে এল ঘরের মেঝেতে। ঠিক যেন প্যারাশুটে ভর করে অদৃশ্য কেউ ঘরের মেঝেতে 'ল্যান্ড' করল।

ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে, আর-একটু হলেই টুনটুনের পা চাদরের ওপরে পড়ছিল। ছুটন্ত গাড়ি যেভাবে ব্রেক কষে অনেকটা সেভাবেই নিজেকে কোনওরকমে থামিয়ে দিল ও।

আর তখনই ওকে অবাক করে দিয়ে চাদরের ঠিক মধ্যিখানটা ফুলে উঠতে শুরু করল। এবং ফোলা জায়গাটা ক্রমেই খাড়াভাবে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। চাদরে ঢাকা একটা ফুটবল শূন্যে ভেসে উঠলে যেমন হয়।

টুনটুনের মনে হল, চাদর ঢাকা একটা মানুষ কীভাবে যেন মেঝেতে লেপটে ছিল—এবার অদ্ভুতভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

ও চিৎকার করতে চায়নি। কিন্তু চিৎকারটা নিজে থেকেই বেরিয়ে এল বাইরে। সহজে থামতে চায় না এমন চিৎকার। আর সেই চিৎকারের স্বরটাও এমন যে, টুনটুনের মনে হল, ও নয়, অন্য কেউ চিৎকার করছে।

চাদরের অবয়বটা খাড়া স্তম্ভের মতো টুনটুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ওর চিৎকার চলছিল—একবার, দুবার, তিনবার।

চার নম্বর চিৎকার শুরু হতেই সাদা চাদরটা ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

টুনটুন কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছিল। হাঁপাচ্ছিল হাপরের মতো। ঘরটার চারপাশ সতর্ক চোখে দেখছিল। নীলচে গোধূলি আলো আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা এখন ওকে বেশ ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। ও কোনওরকমে পাশের ঘরের দিকে রওনা হল। যাওয়ার সময় পালঙ্কের দিকে ভয়ের চোখে তাকাল বেশ কয়েকবার।

বারান্দায় এসেই ও অঙ্কিতকে দেখতে পেল।

এ কী উদভ্রান্তের মতো চেহারা হয়েছে ওর! মাথার চুল এলোমেলো। টি-শার্টে কালির দাগ। চোখে আতঙ্ক।

'শানুদা কোথায়?' টুনটুন হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল।

'জানি না। ও তো ওদিকের ঘরটায় ঢুকেছিল...।' আঙুল তুলে দূরের একটা ঘর দেখাল অঙ্কিত।

'তুমি কি একটু আগে চিৎকার করছিলে?'

'হ্যাঁ। ও-ঘরটায় একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার আছে—।' সামনের একটা ঘরের খোলা দরজার দিকে দেখাল ও: 'ঘরের দেওয়ালগুলো হঠাৎ কাঁপতে শুরু করেছিল। তারপর... একবার ফেঁপে উঠছিল, আর-একবার চুপসে যাচ্ছিল। বেলুনের মতো। তা ছাড়া দেওয়ালের গা বেয়ে একরকম কষ বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সেসময় একটা দেওয়াল ফুলে উঠে আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে দেয়। তারপরই দেখি আমার টি-শার্টের পিঠটা দেওয়ালে আটকে গেছে—কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলাম না। তখন ভয়ে...।'

'দিশা...দিশা...কোথায়?'

'জানি না। চলো, আমরা দুজনে মিলে একটু খুঁজে দেখি। আমার...আমার ভীষণ ভয় করছে...।' কথা বলতে-বলতে হঠাৎই অঙ্কিতের খেয়াল হল টুনটুন হাঁপাচ্ছে। তাই ও জিগ্যেস করল, 'তোমার কী হয়েছে? এরকম হাঁপাচ্ছ কেন? চোখ-মুখ কেমন হয়ে গেছে...।'

টুনটুন অঙ্কিতের হাত আঁকড়ে ধরল। বলল, 'এ-ঘরটায় আমিও কতকগুলো বিচ্ছিরি ব্যাপার দেখেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি। চলো, বলছি...।'

যে-ঘর থেকে টুনটুন একটু আগে বেরিয়ে এসেছে সেদিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে ও ঘরের দরজাটা একরকম দৌড়ে পেরিয়ে গেল। অঙ্কিতের সঙ্গে সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে ও সব বলল—বাড়িটাকে ঘিরে থাকা রাতের আকাশের কথা, বিছানার চাদরের কথা।

অঙ্কিত হঠাৎই অসহায় গলায় বলে উঠল, 'টুনটুন, আমরা কি আর এ-বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না?'

টুনটুন চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিচিত্র বাড়িটাকে দেখল, বলল, 'বেরোতে হবেই...যে করে হোক। বাড়িটা যতই ভয় দেখাক...আমরা...।'

টুনটুনের কথা আটকে-আটকে যাচ্ছিল। হঠাৎই ও দিশা আর শানুর নাম ধরে ডাকতে শুরু করল।

অঙ্কিত বুঝল, এটা ভয় তাড়ানোর একটা চেষ্টা। তাই ও আর দেরি করল না—টুনটুনের সঙ্গে গলা মেলাল।

কয়েকবার ডাকাডাকির পর ওরা থামল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

টুনটুন জোর করে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ, ইচ্ছে করলেই এ-বাড়ি থেকে ওরা বেরোতে পারবে না। তা ছাড়া দিশার খোঁজ করতে হবে, শানুর খোঁজ করা দরকার। এত বড় বাড়ি! কে জানে, এর কোন ঘরে কোন আনাচেকানাচে ওরা হারিয়ে গেছে।

তিনতলায় এসেই টুনটুন আর অঙ্কিত অবাক হয়ে গেল।

ওদের সামনে সেই চৌকো পুকুর। তার চারকোণে চারটে-স্তম্ভ। দোতলা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে ওরা পুকুরটাকে দেখেছিল। তাই পুকুরটা একতলায় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে ওটা তিনতলায়!

ওপরদিকে তাকাল টুনটুন। ছাতার মতো সেই প্রকাণ্ড ঢাকনা।

ওর মাথা গুলিয়ে গেল। অঙ্কিতকে বলল, 'এ-বাড়িটার দিকগুলো কেমন যেন জট পাকানো। এই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম—সেটা কি উঠে এলাম, নাকি নামলাম?'

অঙ্কিত বলল, 'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ওই দ্যাখো, জলের মধ্যে কী!'

টুনটুন অঙ্কিতের ইশারা লক্ষ্য করে তাকাল। পুকুরের কালচে জলে আলোড়ন। কিছু একটা জলের ওপরে এসে শরীরটা আবার পাক খাইয়ে জলের গভীরে তলিয়ে গেল।

টুনটুন পুকুরের ঘাটের কাছে এগিয়ে গেল। আলোটা এখন আরও কমে গেছে বলে মনে হল। তারই মধ্যে ও নজর চালিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। কোথায় গেল প্রাণীটা? যদি ওটা সত্যিই কোনও প্রাণী হয়।

একটু পরে প্রাণীটাকে দেখতে পেল টুনটুন। একটা নয়—অন্তত চার-পাঁচটা। জলে ঝটাপটি তুলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। তবে মাছের মতো নয়—সাপের মতো। মাথায় কালো রঙের চুল বা সেরকম কিছু রয়েছে। লম্বা তেলা মাছের শরীর। দুপাশে দুটো পাখনার মতো। আর লেজও একটা নয়—দুটো।

টুনটুন আর অঙ্কিত অবাক হয়ে প্রাণীগুলোকে দেখতে লাগল। সাপের মতো, অথচ সাপ নয়। এ কোন আশ্চর্য সরীসৃপ!

ঠিক তখনই ওরা দেখল, উলটোদিকের ঘাটের সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠছে দুটো সরীসৃপ। ভেজা ন্যাকড়ার মতো নরম ওদের শরীরে সিঁড়ির ধাপের আদলে ভাঁজ পড়েছে।

ওদের বিস্ময় ভরা চোখের সামনে সরীসৃপ দুটো এগিয়ে গেল একটা স্তম্ভের কাছে। ওটার গায়ে পাক খেয়ে লেপটে রইল।

টুনটুনের মনে পড়ে গেল সেই রাতের কথা। দিশাদের বাড়ি থেকে ও আর শানু যখন বৃষ্টির মধ্যে ফিরছিল। গাছ থেকে সাপের মতো কী একটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুকুরের জলে।

টুনটুন বলল, 'অঙ্কিতদা, এরকম একটা পিকিউলিয়ার সাপ আমি আর শানুদা দেখেছিলাম। সেদিন রাতে তোমাদের বাড়ি থেকে ফেরার সময়...।'

'এটা আবার কী টাইপের সাপ রে! দুটো লেজ...মাথায় চুল...।'

'কী জানি!'

এমন সময় একটা মেয়েলি চিৎকার শুনতে পেল ওরা। কিন্তু কোনদিক থেকে চিৎকারটা এল সেটা ঠিক বুঝতে পারল না।

অঙ্কিত আর টুনটুন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপরই ওরা ছুটতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু কোথায় সিঁড়ি!

ভয়ে কাঁটা হয়ে ওরা দুজনে সিঁড়িটাকে খুঁজতে শুরু করল।

একটু পরেই অবাধ্য সিঁড়িটাকে খুঁজে পেল ওরা। যে-সিঁড়িটাকে ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে খুঁজে পাওয়ার কথা সেটাকে পাওয়া গেল একেবারে বাঁ-প্রান্তে। এটুকু সময়ের মধ্যে পাথরের সিঁড়িটা যে কী করে নড়েচড়ে সরে এল সেটা কে জানে!

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। চিৎকারটা তখনও নীচ থেকে ভেসে আসছে।

নীচে এসে ওরা দেখল দোতলার চেহারাটা আর আগের মতো নেই। সেখানে এখন বিশাল মাপের একটা হলঘর। তার সিলিং-এ কয়েকটা বালব জ্বলছে। কী করে জ্বলছে সেটা বোঝা মুশকিল—কারণ, কোথাও ওয়্যারিং বা সুইচের কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

হলঘরের দূরের কোণে একটা মেয়ে ভেজা বেড়ালের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। দু-হাত বুকের কাছে জড়ো করা। আর প্রকাণ্ড হাঁ করে প্রবল চিৎকার করছে।

দিশা! দিশাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। কিন্তু দিশা ওদের দেখতে পেল না। কারণ, ও তখন ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে একটানা চিৎকার করে চলেছে। হলঘরের মেঝেতে চলে-ফিরে বেড়োচ্ছে অসংখ্য কালো ছায়া। ছায়াগুলোর চেহারা নানান রকমের। ওরা মেঝেতে লেপটে চলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যে-কায়া থেকে ছায়াগুলো তৈরি হয়েছে তাদের কোনও হদিস নেই। শুধু মেঝেতে আর দেওয়ালে চলন্ত ছায়া কিলবিল করছে।

'দিশা! দিশা!' চিৎকার করে উঠল অঙ্কিত। ছায়াগুলো মাড়িয়ে ও ছুট লাগল দূরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় মেয়েটার দিকে। টুনটুনও মরিয়া হয়ে দৌড়ল ওর পিছনে।

সঙ্গে-সঙ্গে ছায়াগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল পটাপট। আর ঘরের বাতাসে এক অলৌকিক ঝড় উঠল। ঘন বাতাস ঘূর্ণিপাক তুলে হলঘরের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য নেচে বেড়াতে লাগল। মাথার ওপরে ঝুলন্ত বালবগুলো পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল।

অঙ্কিত ছুটে গিয়ে পাগলের মতো জাপটে ধরল দিশাকে। আনন্দে কাঁদতে শুরু করল। দিশাও 'দাদাভাই! দাদাভাই!' বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

টুনটুন দিশাকে ভরসা দিয়ে বারবার বলতে লাগল, 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না। আমরা এসে গেছি...।'

ভাই-বোন একটু সামলে নেওয়ার পর টুনটুন জিগ্যেস করল, 'শানুদা কোথায়?'

ঘরের মধ্যে ঝড় সাঁইসাঁই আওয়াজ তুলছিল। ঝোড়ো বাতাসে সকলের চুল উড়ছিল।

দিশা ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'শানুদা কোথায় জানি না। দোতলা না তিনতলায় যেন একবার দেখেছিলাম। কীসের ভয়ে পাগলের মতো ছুটে পালাচ্ছে।'

দিশাকে অবাক চোখে দেখছিল টুনটুন।

কী চেহারা হয়েছে ওরা! চোখের কোলে কালি। গাল দুটো বসে গেছে। চুড়িদার এখানে-ওখানে চেঁড়া। যেন একটা সাইক্লোন বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে।

অঙ্কিত বলল, 'এ-বাড়িটার ঘর, সিঁড়ি—কিছুই ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না। চলো, আমরা একসঙ্গে থেকে এলোমেলো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াই। দেখি, বেরোনোর দরজাটা খুঁজে পাই কি না। এইভাবে হয়তো শানুর খোঁজও পেয়ে যেতে পারি—।'

ওরা তিনজন আর দেরি করল না। হলঘরের একটা বড় দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকেই চলতে শুরু করল। কখনও সিঁড়ি, কখনও বারান্দা, কখনও অলিন্দ ধরে ওরা ছুটতে লাগল, আর মাঝে-মাঝেই শানুর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

এইভাবে বাড়িটার গোলকধাঁধায় পাক খেতে-খেতে ওরা একটা বিশাল ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরটা মাপে যেমন বড় তেমনই তার ছাদ তিরিশ ফুট উঁচুতে। ঘরে অনেকগুলো বালব জ্বলছে।

ঘরটায় একটা প্রকাণ্ড মাপের যন্ত্র বসানো। যন্ত্রটার হাজাররকম পার্টস। এবং নানানরকম শব্দ করে সেগুলো নড়ছে, কারণ যন্ত্রটা চলছে। অনেকগুলো সরু-সরু কাচের নল দিয়ে রঙিন কেমিক্যাল বয়ে চলেছে। কোনও-কোনও ইস্পাতের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। একটা বিরাট ফাঁপা চামড়ার বল যন্ত্রের শব্দের তালে-তালে ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে। তা থেকে ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে। এই শব্দটাই ওরা মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের মতো মনে হচ্ছিল।

'এটা কীসের যন্ত্র?' বিশাল যন্ত্রটা জরিপ করতে-করতে অঙ্কিত বলল।

টুনটুন বলল, 'কে জানে! পাইপে-পাইপে একেবারে জট পাকিয়ে গেছে।'

দিশা বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই, দাদাভাই। শানুদার খোঁজ করতে হবে যে...।'

ওরা ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা চিৎকারের শব্দ কানে এল। কোনদিক থেকে শব্দটা আসছে সেটা ঠাহর করার চেষ্টা করতে-না-করতেই চিৎকারটা আবার শোনা গেল। ওরা তিনজনে সেদিক লক্ষ্য করে ছুটল।

দুটো ঘর পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরে গিয়েই ওরা শানুকে দেখতে পেল। ওকে নিয়ে অদৃশ্য কারা যেন ছিনিমিনি খেলছে। অনেকটা ভলিবল খেলার ঢঙে ওকে নিয়ে লোফালুফি চলছে। কিন্তু সেই শক্তিশালী 'খেলোয়াড়'-দের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

শানু ভয়ে চিৎকার করছিল। ওকে ওইরকম অবস্থায় দেখে অঙ্কিতরাও ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে খেলোয়াড়রা বোধহয় থেমে গেল। কারণ, শানু ধপাস করে খসে পড়ল পাথরের মেঝেতে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

ওরা ছুটে গেল শানুর কাছে। ওকে ধরে তুলল। ওর কপালে বেশ খানিকটা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। হাতে দু-জায়গায় ছড়ে গেছে। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। যন্ত্রণায় 'উঃ! আঃ!' করছে।

ওরা শানুকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। টুনটুন জিগ্যেস করল, 'শানুদা, তুমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে?'

'জানি না। আমি তো সারাক্ষণ তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এই বাড়িটা যেন কেমন। সবকিছু গুলিয়ে যায়।'

অঙ্কিত বলল, 'চল, সবাই মিলে এবার বেরোনোর চেষ্টা করি—।'

ওরা দল বেঁধে রওনা হল। নীল আলোয় বেরোনোর পথ খুঁজতে লাগল।

ঠিক তখনই একটা বাঁশির সুর ভেসে উঠল বাতাসে। অদ্ভুত মিঠে সুরটা গোটা বাড়িটায় কেঁপে-কেঁপে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কে বাঁশি বাজাচ্ছে?' টুনটুন বলে উঠল।

'জানি না।' অঙ্কিত বলল,'তবে এই বাঁশির সুরটা সবাইকে টেনে নেয় বলে শুনেছি।'

‘টেনে নেয় মানে?’

‘মানে, হিপনোটাইজ বা ওরকম কিছু একটা করে বলে শুনেছি। বাঁশির এই সুরের ফাঁদে পড়ে অনেকে নাকি এই বাড়িটায় ঢুকে পড়েছে—আর বেরোতে পারেনি। তাদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি...।’

শানু ভয়ে-ভয়ে বলল, ‘আমাদের কী হবে?’

দিশা বলল, ‘ভয় পেলে চলবে না, শানুদা। যে করে হোক, এ-বাড়ি থেকে আমাদের বেরোতে হবে।’

ওরা আবার চলতে শুরু করল। কখনও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, কখনও নামতে লাগল। নানান ঘরে ঢুকতে লাগল—যে-কোনও দরজা পেলেই সেটা দিয়ে ঢুকে পরীক্ষা করতে লাগল বেরোনোর পথ পাওয়া যায় কি না। একইসঙ্গে অদ্ভুত বাড়িটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।

হঠাৎই একটা বড় মাপের ঘরে ঢুকে ওরা অবাক হয়ে গেল।

ঘরটা কোনতলায় ওরা জানে না। কারণ, এ-বাড়িতে ‘একতলা, দোতলা, তিনতলা’ শব্দগুলোর যে কোনও মানে নেই সেটা এতক্ষণে ওরা হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে।

ঘরটায় ঝকঝকে আলো। একেবারে আধুনিক ড্রইংরুমের ধাঁচে সাজানো। লম্বা-লম্বা সোফা। মাঝে বড় মাপের সেন্টার টেবিল। টেবিলে ফুলদানি। রঙিন সুগন্ধি ফুলে সাজানো। ছাতা ধরা গন্ধটা আর টের পাওয়া যাচ্ছে না।

সোফাগুলোয় ছ’জন মানুষ বসে রয়েছে। তাদের বয়েস নানারকম। তবে সবচেয়ে বেশি বয়েসি মানুষটির মাথায় ধবধবে সাদা চুল, গালে সাদা দাড়ি, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। কেতাদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট মানুষটি উচ্চতায় খাটো। তার ফরসা চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ।

ওদের দেখতে পাওয়ামাত্রই হাসি মুখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। হাত সামনে বাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, ‘ওয়েলকাম টু দ্য অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড অফ স্পেস-টাইম অ্যান্ড সুপারন্যাচারাল...।’

থতমত খেয়ে ওরা চারজনই ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। কিন্তু অবাক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ভদ্রলোক বলল, ‘আমার নাম ডক্টর শিলাদিত্য সেন। লেখাপড়ার ডাক্তার। বহু বছর ধরে এই সময়ের ফাঁদে আটক রয়েছি। কবে ছাড়া পাব জানি না।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডক্টর সেন: ‘নেহাত ভাগ্যচক্রে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নইলে এই বাড়িটার যা কারবার! কখন যে থ্রি ডায়মেনশনে থাকে আর কখন যে ফোর ডায়মেনশনে চলে যায় তার ঠিক নেই। এসো, এসো—বোসো—।’

একটা খালি সোফা দেখিয়ে ওদের বসতে বলল শিলাদিত্য সেন। ওরা চুপচাপ বসে পড়ল।

ওদের মন থেকে ভয়টা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে পেটের খিদে টের পেল ওরা। এই অদ্ভুত বাড়িতে ওদের কত সময় কেটে গেছে কে জানে!

ডক্টর সেন হাসি মুখে কথা বলতে-বলতে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। হাতে তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে বলল, ‘এবারে বলো দেখি, তোমাদের গল্পটা শুনি। এ-বাড়িতে তোমরা

ঢুকলে কবে?’

শানু, অঙ্কিত, টুনটুন আর দিশা পালা করে ওদের কথা বলতে শুরু করল। কথা বলতে-বলতে ওরা একটু-একটু করে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, ওদের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাচ্ছিল।

ওদের কাহিনিতে শেষের রেশ টেনে অঙ্কিত বলল, ‘...তারপর এ-ঘরে ঢুকে আপনাদের দেখা পেলাম।’

‘হ্যাঁ, দেখা পেলে।’ হেসে বলল শিলাদিত্য সেন, ‘তবে আমাদের নাও দেখা হতে পারত। অনেকেই আছে যারা অনেক বছর আগে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছে— কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।’ ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডক্টর সেন বলল, ‘হয়তো আর কোনওদিন দেখা হবেও না।’

‘কেন? দেখা হবে না কেন?’ শানু জানতে চাইল।

‘দেখা হবে না, কারণ, এই বাড়িটা থ্রি ডায়মেনশন আর ফোর ডায়মেনশনের মাঝে যাতায়াত করে...ছুটোছুটি করে বেড়ায়...’

‘থ্রি ডায়মেনশনের মানে না হয় বুঝলাম...’ অঙ্কিত বলল, ‘কিন্তু ফোর ডায়মেনশন?’

‘হ্যাঁ-ফোর ডায়মেনশন।’ হাসল ডক্টর সেন: ‘ওই ফোর্থ ডায়মেনশনটাই যত গোলমেলে ব্যাপার। ফোর্থ ডায়মেনশনটা আসলে হল টাইম—সময়। থ্রি ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডে শুধু তিনটে ডায়মেনশন—মানে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা—দিয়ে বোঝা যায় একটা জিনিস আমাদের চোখের সামনে আছে কি নেই। কিন্তু ফোর ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডে একটা বাড়তি ফ্যাক্টর—মানে, বাড়তি ডায়মেনশন—এসে যায়: সময়। সেই কারণেই আমাদের থ্রি ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডের সব কনসেপ্ট সেখানে খাটে না। স্পেস-টাইমের কারসাজি আর কী! এর বেশি তোমাদের বোঝানো মুশকিল।

‘এই বাড়িটা সেই কারণেই অদ্ভুত। এর ঘরগুলো মাপে, সংখ্যায় আর চেহারায় বারবার পালটায়। এর সিঁড়িগুলো উলটেপালটে যায়। এর যে-কোনও ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে বাইরে যে-দৃশ্য দেখা যায় তার সঙ্গে আমাদের কনসেপ্টের কোনও মিল নেই। পুরো ব্যাপারটাই একেবারে অন্যরকম।

‘যদি তোমরা এই ঘর থেকে বেরিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে আসো তা হলে হয়তো দেখবে এই ঘরটাই আর খুঁজে পাচ্ছ না—পুরো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে তোমাদের আর কখনও হয়তো দেখাই হল না। এটাই হল বাড়িটার ক্যারেকটার...।’ দু-হাত দুপাশে ছড়িয়ে থামল শিলাদিত্য সেন।

‘কিন্তু অন্য সব ব্যাপারগুলো?’ একসঙ্গে প্রশ্ন করে ফেলল দিশা আর টুনটুন। একে অপরের দিকে তাকাল একপলক। তারপর: ‘ওই যে সব ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো! চাদরে ঢাকা মূর্তি। ঘরের দেওয়াল ফুলে ওঠা, চুপসে যাওয়া। ওই পুকুরের জলে সাঁতরে বেড়ানো সাপের মতো জিনিসগুলো। তা ছাড়া বাঁশির শব্দ...।’

হাসল ডক্টর সেন। সকলের মুখের ওপরে একপলক নজর বুলিয়ে বলল, ‘বলছি—সব বলছি। আমার যেটুকু জানা আছে সেটুকু অন্তত ঠিকঠাকভাবে বলার চেষ্টা করছি। দ্যাখো, প্রথমেই বলেছি, ”ওয়েলকাম টু দ্য অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড অফ স্পেস-টাইম অ্যান্ড সুপারন্যাচারাল...। এর মধ্যে স্পেস-টাইমটা যতটা সহজে পেরেছি এক্সপ্লেইন করেছি—বাকিটা সুপারন্যাচারাল—মানে, অলৌকিক—এলাকার ব্যাপারস্যাপার।’ গলার স্বর

সিরিয়াস করে ডক্টর বলে চলল, 'তোমরা কি জানো, এ-বাড়িতে ঢোকার পর কত লোক এখানে মারা গেছে? এই অদ্ভুত স্পেস-টাইমের মধ্যে সেইসব বন্দি প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। কখনও তাদের দেখা যায়—কখনও যায় না। এ ছাড়া সবশেষে রয়েছে এই প্রাগৈতিহাসিক বাড়িটা। তোমরা কি বললে বিশ্বাস করবে, এই বাড়িটা জীবন্ত! যে-যন্ত্রপাতির ঘর তোমরা দেখেছ ওটা আসলে বাড়িটার হার্ট-লাংস—আর এনার্জির সোর্স। বাড়িটার শ্বাস নেওয়ার শব্দ তোমরা সর্বক্ষণ শুনতে পাচ্ছ। যে-ঘরে অঙ্কিত দেওয়ালের গায়ে আটকে গিয়েছিল, ওটা এই বাড়িটার স্টমাক—পাকস্থলী।

'আমি জানি, এগুলো অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার—কিন্তু সত্যি। একটা জীবন্ত প্রাচীন বাড়ি, যেটা ভূতুড়ে, স্পেস-টাইমে থ্রি ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ড আর ফোর ডায়মেনশনাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হরবখত যাতায়াত করে! তোমরাই বলো, এরকম একটা বাড়ির সঙ্গে লড়াই করে পারা যায়!

'আর ওই যে বাঁশির ব্যাপারটা। ওই বাঁশিগুলো সব হাড় দিয়ে তৈরি। কীভাবে ওগুলো বাজে, কে বাজায়—সেটা আমি আজও ঠিকঠাক উদ্ধার করতে পারিনি। তবে ওই বাঁশির আওয়াজে সম্মোহনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঢেউ চুম্বকের মতো শিকারকে টেনে নিয়ে আসে এই বাড়িতে। তার শরীর থেকে কী এক কায়দায় সব হাড় বের করে নেওয়া হয়—বাড়িটাই বের করে নেয়—অথচ মানুষটা তখনও বেঁচে থাকে। জলে সাপের মতো সাঁতার কাটে, গাছপালার ডালে শরীরটাকে জড়িয়ে রাখে। আমার ধারণা, বাড়িটা নিজে বাঁশি বাজায়। তার সঙ্গে ওই সরীসৃপ-মানুষগুলোও কখনও-কখনও বাজায়। এইভাবে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকার পর একদিন...একদিন ওরা আমার মতো...' সোফায় বসে থাকা নানান বয়েসি পাঁচজন মানুষের দিকে ইশারায় দেখাল ডক্টর সেন, '...বা আমাদের মতো হয়ে যায়।' একটা লম্বা শ্বাস ফেলে ঘরের ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। কিছুক্ষণ পর মুখ নামিয়ে টুনটুনদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরাও এককালে সাঁতার কাটতাম, বাঁশি বাজাতাম। বাড়িটার বাঁশি তৈরির নেশা থেকেই যত সমস্যা।'

'এতসব কথা আপনি জানলেন কী করে?' দিশা ডক্টর সেনকে প্রশ্ন করল।

বিষণ্ণভাবে হাসল ডক্টর সেন। বলল, 'আমি এখানে আছি বহুবছর। আমার স্টাডিরুম আছে এ-বাড়িতে। কিন্তু ওই ডায়মেনশনের গন্ডগোলের জন্য ঘরটা এখন দেখাতে পারছি না। আমি এই বাড়িটার ব্যাপারে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে স্টাডি করেছি, রিসার্চ করেছি—তারপর ধীরে-ধীরে সব জানতে পেরেছি। এককথায় বলতে গেলে এই বাড়িটা একটা জাদুকর। নানারকম ইলিউশান তৈরি করতে পারে ও।'

'কী করে এই বাড়ি থেকে বেরোনো যায় আপনি জানেন না?' দিশা জানতে চাইল।

'না, জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি—চোখের সামনে যা দেখছ তা সবসময় সত্যি নয়—আসলে একটা ইলিউশান। এ-কথাটা মনে রেখো। এই যে আমরা ছ'জন তোমাদের সামনে রয়েছি—আমরা আসলে নেই—বহুদিন আগেই "নেই" হয়ে গেছি। আমরা একসময় বাঁশি বাজাতাম...একসময়...।'

ডক্টর সেনের কথাগুলো ধীরে-ধীরে প্রতিধ্বনির মতো শোনাতে লাগল। একটা ঝোড়ো ঘূর্ণিপাক কোথা থেকে যেন আচমকা এসে ঘরে ঢুকে পড়ল। ওদের চোখের সামনে ডক্টর সেন আর তার পাঁচ সঙ্গী পাউডারের মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ঝরে গেল, মিলিয়ে গেল। আর একইসঙ্গে ঘরের আলোগুলো সব নিভে গেল।

টুনটুনরা দেখল, অন্ধকার ঘরে আবার সেই নীলচে গোধূলি-আলো। ঘরের শেষ প্রান্তের দেওয়ালে চারটে খোলা জানলা। জানলা দিয়ে রাতের আকাশ চোখে পড়ছে। তারায় ভরা ঝকঝকে গাঢ় নীল আকাশ।

কী ভেবে টুনটুন সবাইকে ডেকে নিয়ে ছুটে গেল সেই খোলা জানলাগুলোর কাছে। একটা জানলা দিয়ে মুখ বের করে তাকাল।

সেই একই দৃশ্য। ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে-নীচে শুধু আকাশ আর আকাশ। তারা আর তারা। ফোর ডায়মেনশন। ওলটপালট।

ডক্টর সেনের কথা মনে পড়ল ওর।

'চোখের সামনে যা দেখছ তা সবসময় সত্যি নয়—আসলে একটা ইলিউশান।'

এই তারা ভরা আকাশ কি তা হলে ফোর ডায়মেনশনের মায়া? কী আছে এই আকাশের আড়ালে? বাঁচার পথ নেই তো?

টুনটুন ভেতরে-ভেতরে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। কিছু একটা তো করতে হবে। হবেই। নইলে এই বাড়িতে প্রেতাত্মার সংখ্যা বাড়বে শুধু।

মা-বাপির কথা মনে পড়ল ওর। চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সামনে তো আর কোনও পথ খোলা নেই। ভয় পেলে চলবে না।

ও চোখের জল মুছে নিল। শানুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শানুদা, যদি একটু পরে নীচের দিক থেকে আমার ডাক শুনতে পাও তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সবাই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়বে—।'

'কী বলছিস তুই?' শানু চেঁচিয়ে উঠল।

'কী করছ? কী করছ? পাগলামো কোরো না—।' অঙ্কিত।

'টুনটুনদা! টুনটুনদা!' দিশা।

কিন্তু তার আগেই টুনটুন খোলা জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শূন্যে।

নীচের তারা ভরা আকাশ ওর জন্য আঁচল পেতে রয়েছে। ঠিক এই কথাটাই মনে হল টুনটুনের। ও যেন খোলা প্যারাশুটের মতো ভাসতে-ভাসতে নীচে নামতে লাগল।

একটু পরেই ভেজা গাছপালা আর জল-কাদায় ওর শরীরটা আছড়ে পড়ল। কানে এল ব্যাঙের ডাক।

পৃথিবীটা এত সুন্দর আগে কখনও মনে হয়নি টুনটুনের। মনে হয়নি ব্যাঙের ডাক এ-ত মিষ্টি।

ও পাশ ফিরে তাকাল চারপাশে। বেশ খানিকটা দূরে তিনটে সার্চলাইট জ্বেলে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টুনটুনের গায়ে আলো এসে পড়েছিল। ওকে দেখতে পেয়েই লোকজন হইহই করে লাফিয়ে উঠল।

টুনটুন শরীরের সব শক্তি জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠল, 'দিশা। অঙ্কিতদা! শানুদা!'

তারপরই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আঁধারপ্রিয়া

'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।

ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।'

একটি শীতের সন্ধ্যা, ১৯৭৪ সাল

সতেরো-আঠেরো বছরে মেয়েটি রাস্তা পার হচ্ছিল। পরনে গোলাপি-কালো নকশা ছাপা শাড়ি। গায়ে একটা বাদামি রঙের শাল অগোছালোভাবে জড়ানো। এখন কোনও কিছুই গুছিয়ে করার মতো মনের অবস্থা মেয়েটির নেই।

সেটা মেয়েটির হাঁটার ধরন লক্ষ করলেও বোঝা যায়।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে শীত যতই জাঁকিয়ে বসুক না কেন যানবাহনের বেহিসেবি সংখ্যার তাতে কোনও হেরফের হয় না। সুতরাং এদিক-ওদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল নানান গাড়ি: প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম, স্কুটার, মোটরবাইক। আর অসংখ্য মানুষ যে-যার ব্যস্ততায় ফাঁকফোকর পেয়েই একছুটে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথের বাঁ-দিকে পায়রার খোপের মতো ছোট-ছোট লটারির টিকিটের দোকান। ডানদিকে পাঁচমিশেলি ফলের দোকানে কেনাকাটার ভিড়। তার পাশেই জাগ্রত মা-কালীর মন্দিরে আরতি হচ্ছে, ঘণ্টাও বাজাচ্ছে কেউ-কেউ। ভক্তেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রণাম সেরে নিচ্ছে। কেউ মাথা ঠুকছে মন্দিরের দেওয়ালে। কারও মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তাই ভক্তি মেশানো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে দেবীকে। আর কেউ বা মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় কাতর প্রার্থনায় আকুল।

মেয়েটি আস্তিক। ওর বাড়িতে ঠাকুরের আসন আছে। সেখানে ওর মা সকাল-সন্ধে পুজো করেন। মেয়েটিও একই অভ্যাস পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। দেবদেবীর ওপরে ওর ভক্তি আছে, আস্থাও। এই পথ ধরে ও বহুদিন বহুবার যাতায়াত করেছে, কিন্তু এই কালী মন্দিরে কখনও থমকে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায়নি। ওর কাছে ওর বাড়ির দেবদেবীই ছিল সব।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই ওর সমস্ত হিসেব গুলিয়ে গেছে। মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। মনের অবস্থাও এলোমেলো। তাই ও-দিকের ফুটপাথে কালী মন্দিরটা চোখে পড়ামাত্রই ও কোনওরকমে গাড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তা পার হল। ওর টানা-টানা চোখে নাম-না জানা আশঙ্কা। রাস্তার ধার ঘেঁষে বসেছিল কয়েকজন শাকসবজি বিক্রেতা। তাদের

পাশ কাটিয়ে মেয়েটি চলে গেল ফুটপাথের ওপরে। মন্দিরের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গাঢ় চোখে অনুভব করল জাগ্রত মা কালীকে। মেয়েটির চোখ জলে ভিজে গেল। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা, বাবার কথা, ছোট-ছোট দুটো ভাইয়ের কথা।

আর শুভদীপের কথা।

প্রতিমাকে প্রণাম জানিয়ে মেয়েটি অন্যান্য ভক্তের পাশ কাটিয়ে সরে এল মন্দিরের দেওয়ালের কাছে। তারপর বিষাদে আকুল হয়ে মাথা ঠুকতে লাগল, আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'মা, আমাকে রক্ষা করো। মা...মাগো...।'

মেয়েটির মনের একটি অংশ বলতে চাইছিল, 'মাথা খুঁড়ে কোনও লাভ নেই। যা হওয়ার তা হবেই।' কিন্তু ওর মনের অন্য আর-একটা অংশ চিৎকার করে বলছিল, 'দেবতার লীলা দেবতাই জানে। তোর প্রার্থনায় যেন তিলমাত্রও অবিশ্বাস না থাকে।'

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি যেন ঘোর থেকে জেগে উঠল। শাল সরিয়ে বাঁ-হাত বের করে ঘড়ি দেখল: সাতটা পঁচিশ। শুভদীপ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছে। বাঁ-হাতের চেটো স্পষ্টভাবে চোখের সামনে মেলে ধরল মেয়েটি। শুভদীপের ফোন নম্বর লেখা রয়েছে সেখানে: ফোর সেভেন টু ফোর জিরো ওয়ান।

চোখের জল মুছে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এল ও। হাঁটতে শুরু করল পাঁচমাথার মোড়ের দিকে। মোড়টা পেরিয়ে ও যাবে শ্যামবাজারের টেলিগ্রাফ অফিসে। সেখান থেকে ফোন করা যায়। যদি ওদের ফোন খারাপ থাকে তা হলে দুটো ওষুধের দোকান আছে কাছাকাছি—একটু বেশি পয়সা দিলে ওরা ফোন করতে দেয়।

মেয়েটির গায়ের রং মাজা। সরল, টানা-টানা, গভীর চোখ। গড়ন লম্বা ছিপছিপে। ভুরুর কাছটা যেন জোড়া, নাকে ছোট্ট সাদা চকচকে পাথর বসানো নাকছাবি। চিবুক তীব্র, সামান্য উদ্ধত। অথচ চোখের দৃষ্টি এখন অসহায়। খানিকটা যেন ভয় পেয়েছে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পার হওয়ার সময় নেতাজীর মূর্তির প্রায় পাশ ঘেঁষে চলে গেল মেয়েটি। রাস্তায় পথচারী যানবাহন ও যেন দেখেও দেখছিল না।

শীতের বাতাসে হালকা কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল। একটু দূরের জিনিস ঠিকমতো ঠাহর করে দেখা যাচ্ছিল না। মেয়েটির নজর ঝাপসা হয়ে আসছিল বোধহয়। ও শালের খুঁট দিয়ে কয়েকবার চোখ মুছল।

টেলিগ্রাফ অফিসের দোতলায় উঠে একটা টেলিফোন বুথ খালি পেয়ে গেল মেয়েটি। চটপট বুথের ভেতরে ঢুকে গিয়ে অকূলপাথারে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো রিসিভারটাকে আঁকড়ে ধরল। না, ডায়াল টোন নেই। লিভারটা টেনে বেশ কয়েকবার খটখট করল ও। রিসিভার কানে চেপে শুনল। না, একটা অস্বাভাবিক গুঞ্জন কানে আসছে শুধু।

বেরিয়ে এসে পাশের বুথের ভাঙা দরজার কাছে দাঁড়াল মেয়েটি। একজন অবাঙালি ভদ্রলোক বেশ চেঁচিয়ে কথা বলছেন টেলিফোনে। মেয়েটি উসখুস করতে লাগল। পিছনের কাউন্টারের ওপাশ থেকে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শুনতে পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, মর্স কোডের সংকেত ওর মাথার ভেতরে বাজছে। এই ভদ্রলোকের টেলিফোন করা কখন শেষ হবে!

একটু পরে বুথ খালি হতেই মেয়েটি ঢুকে পড়ল বুথে। নম্বর ডায়াল করার সময় টের পেল ওর হাত কাঁপছে।

ও-প্রান্তে রিং বাজছিল। চারবারের পর টেলিফোন তুলল কেউ।

‘হ্যালো।’ বয়স্ক পুরুষ কণ্ঠস্বর। বোধহয় শুভদীপের বাবা।

‘হ্যালো, শুভদীপ আছে?’

‘আপনি কে বলছেন?’ প্রশ্নের মধ্যে অপছন্দের সুর।

শুভদীপের বাবার সঙ্গে মেয়েটির এখনও আলাপ হয়নি। শুভর কাছে শুনেছে, ভদ্রলোক বেশ কড়া আর রাশভারি। ওঁর ব্যবসার পয়সাতেই শুভদীপদের যত বাবুয়ানি।

মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। এক মুহূর্ত কী ভেবে কাঁপা গলায় মিথ্যে বলল, ‘আমি ওর বন্ধু জয়ন্তর দিদি। জয়ন্ত ওকে একটা খবর দিতে বলেছে। ওর লাস্ট উইকের ক্লাস নোটটা যেন কাল ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে আসে। আর...’ আর কী বলা যায় এই মুহূর্তে!

ও-প্রান্তের রাশভারি গলা শোনা গেল, ‘দাঁড়াও, বুড়োকে দিচ্ছি, ওকে যা বলার বলো—’ ‘বুড়ো’ শুভদীপের ডাকনাথ।

কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। শুধু পিছন থেকে টরে-টক্কা ভেসে আসছে। কী রকম দম বন্ধ করে ভ্যাপসা গরম লাগছে যেন।

‘হ্যালো—’

শুভদীপের গলা।

আঃ! মা কালী সত্যিই জাগ্রত।

‘শুভ...শুভ...খুব বিপদে পড়েছি...।’

গলা চিনতে পারল শুভ। সঙ্গে সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন নির্বিকার কাঠ-কাঠ হয়ে গেল। বাবার সামনে কী করে সহজভাবে কথা বলবে ও! ও তো বলেই দিয়েছিল, ‘ফোন নাম্বার নিচ্ছ নাও, কিন্তু, জেনুইন ইমারজেন্সি না হলে ফোন কোরো না—অথচ...।

‘কেন, কী হয়েছে?’ শান্তভাবে প্রশ্নটা করল শুভ।

‘শুভ...শুভ...আজ সকাল থেকে খুব...বমি হচ্ছে। বারবার ওয়াক উঠছে।’ শেষ দিকে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

হাসল শুভ, বলল, ‘কাঁদছ কেন, বোকা মেয়ে! রেগল্যান ট্যাবলেট খেয়ে নাও, বমি-বমি ভাব এক্ষুনি কেটে যাবে। কোনও কারণে বোধহয় খাওয়াদাওয়ার গণ্ডগোল হয়েছে।’

মেয়েটি বুঝতে পারল, ও-প্রান্তে টেলিফোনের সামনে শুভদীপ এখন একা এবং নিরাপদ। কিন্তু শুভর কথায় ভরসা না পেয়ে ও তখনও কাঁদছিল। জড়ানো গলায় বলল, ‘না, না, সেসব নয়। অন্য ব্যাপার—ট্যাবলেট খেলেও কমবে না। তুমি বুঝতে পারছ না। সেই যে পুজোর সময় আমরা ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলাম। তোমাকে তখন অত করে বারণ করলাম, তুমি শুনলে না। বললে, ভয়ের কিছু নেই...এখন কী সর্বনাশ হল বলো তো।’ কান্না আরও বেড়ে গেল।

‘আস্তে, আস্তে—’ চাপা গলায় বলে উঠল শুভ।

তা হলে কি ওর বাবা আবার ঢুকে পড়েছেন ঘরে? কিন্তু মেয়েটি তখন মরিয়া। একমাত্র শুভদীপই ওকে বাঁচাতে পারে এই পাগল-করা ঝড় থেকে। তাই ও জেদি গলায় বলল, ‘কাল আমি ছ-টার সময় তোমার জন্যে কফি হাউসে ওয়েট করব। তুমি আসবে কিন্তু। তারপর—।’

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল শুভদীপ, 'মাত্র একবারে এত কিছু হতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি হিসেবে কোনও গন্ডগোল করছ। আর তাতেই এত প্যানিকি হয়ে উঠেছ। যাকগে, কোত্থেকে ফোন করছ তুমি?' শুভ জানে ওদের বাড়িতে ফোন নেই।

মেয়েটি বলল।

'ও ব্বাবা! এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে এই ঠান্ডার মধ্যে এতদূর চলে এসেছ। এরকম হিসেবের গোলমাল তোমার আগেও হয়েছে। ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাড়ি যাও। ভালো করে খেয়ে-দেয়ে কষে ঘুম দাও—।'

'কাল তুমি ছ'টার সময় আসছ তা হলে?' মেয়েটি ভয় পাওয়া গলায় জিগ্যেস করল।

'কাল ছ'টার সময় বোধহয় হবে না। কাল আমাদের বিজনেসের ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে একটু বসতে হবে...।'

শুভদীপ যে পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে বাবার ব্যবসায় সময় দেয় সেটা মেয়েটি জানে। কিন্তু এখন এই জরুরি অবস্থায় ওর কি বিজনেস নিয়ে মাথা না ঘামালে চলছিল না!

'শুভ, প্লিজ, এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমি মরে যাব। যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু, তুমি পাশে না থাকলে আমি—।'

'শোনো, এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই। পরশু সন্ধেবেলা...অ্যাই, শোনো, কাল আমি বিডিজি-র ক্লাসটা করতে পারব না। ইন্ডিয়ান পলিটিক্স নিয়ে অনেকটা লাইব্রেরি ওয়ার্ক বাকি আছে। নোট করলে তোকে দেব, কপি করে নিস। এখন রাখছি। কাল এগোরোটায় ক্লাসে দেখা হবে।' বলে টেলিফোন রেখে দিল শুভ।

মেয়েটি বুঝতে পারল, শেষ দিকটায় শুভ কাল্পনিক কোনও ক্লাসমেটের সঙ্গে কথা বলছিল। ওর এই অভিনয়ের একমাত্র কারণ হয়তো টেলিফোনের কাছাকাছি ওর বাবা এসে পড়েছেন। কিন্তু এই অবস্থায় অন্য সমস্যার কথা শুভ ভাবছে কেমন করে! মেয়েটি তো অন্য কোনও সমস্যার কথা আর ভাবতে পারছে না!

গা গুলিয়ে উঠল মেয়েটির। গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইল সবকিছু। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে ঢোক গিলল ও। রিসিভার রেখে দিয়ে আবার ডায়াল ঘোরাল।

বুথের বাইরে একজন তরুণ টেলিফোন করার জন্য অপেক্ষা করছিল। মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার ডায়াল ঘোরাতে দেখেই হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে দিল সে। রুক্ষ গলায় বলল, 'কী হল, দিদি। এখানে পরপর দুটো টেলিফোন করা যায় না। বাইরে আসুন, আমার হয়ে যাক, তারপর আপনি আবার করবেন—।'

মেয়েটি ঘুরে তাকাল ছেলেটির দিকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি পাথর হয়ে গেল। ভাসানের সময় দুর্গা প্রতিমার মুখটা ঠিক এরকম দেখায়।

মেয়েটি কান্না-চাপা গলায় বলল, 'প্লিজ, আমার ভীষণ জরুরি দরকার...।'

ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি করে নিন। বলেছি বলে কিছু মাইন্ড করবেন না।'

আবার ফোন করল মেয়েটি।

ও-প্রান্তে সেই রাশভারী গলা।

মেয়েটি রিসিভার রেখে দিল।

আবার ডায়াল ঘোরাল। আবার সেই কণ্ঠস্বর।

তারপরও সেই একই ব্যাপার।

তারপরের চেষ্টায় ও-প্রান্তে কোনও রিং শোনা গেল না। বোধহয় শুভদীপের বাবা বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন একপাশে।

একটা ঘোরের মধ্যে টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি। এখন আর ফোন করার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। কিন্তু এখন কী করবে ও?

পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি নানান কথা ভাবছিল।

সন্দেহটা ওর মনে মাথাচাড়া দিয়েছিল দিন সাতেক আগে থেকেই। মেয়েলি নিয়মটার গরমিল হতেই ওর ডায়মন্ডহারবারের ব্যাপারটা মনে পড়ে গিয়েছিল। তারপর যত দিন গেছে, ভয়টা ততই জমাট বেঁধেছে। অবশেষে কাল রাত থেকে ওয়াক উঠতে শুরু করেছে। রাতে ও দু-একবার বাথরুমে গিয়েছিল তার মধ্যে একবার বমির দমক চাপতে পারেনি। কিন্তু শুধু খানিকটা জল বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি মুখ দিয়ে।

তারপর আজকের জঘন্য সকালটার শুরু। গা গুলোনো, মাথা ঝিমঝিম, সেইসঙ্গে ছোটখাটো আরও কত নানান উপসর্গ।

মা কয়েকবার স্নেহ মাখানো অবাক চোখে তাকিয়েছে, ডাক্তার দেখানোর কথা বলেছে, ওষুধ খাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু মেয়েটি বিশেষ আমল দেয়নি। বরং আজ অনেক বেশি সময় ধরে ও প্রার্থনা করেছে ঠাকুরের আসনের সামনে। সেখানে অধিষ্ঠিত মা কালী, দেবী লক্ষ্মী, আর দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁরা নিশ্চয়ই ওর প্রার্থনায় বিশেষ কান দেননি, কারণ শরীরের অস্বস্তি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরও বেড়েছে।

ওর বাবা অতসব লক্ষ করেননি। সদাগরি অফিসের ম্যানেজারসাহেবের অতসব লক্ষ করার সময় কোথায়! সবসময় ধোপদুরস্ত পোশাকে ফিটফাট হয়ে রয়েছে। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। বাড়িতে তিনি সাধারণ সিগারেট খান। কিন্তু রাস্তায় বেরোলেই আঙুলের ফাঁকে থাকে দামি সিগারেট—অফিসেও তাই। অফিসের গাড়ি সকাল ন'টার সময় তাঁকে মোহনলাল স্ট্রিটের মুখ থেকে তুলে নিয়ে যায়। সেই গাড়িতে অফিসের আরও দুজন হোমরাচোমরা যাতায়াত করেন।

বাড়িতে বাবা যখনই কোনও কথা বলেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে অফিস আর উন্নতি। মানুষটা শুধু প্রতিপত্তি আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেই গেল। মায়ের কাছে শুনেছে, একেবারে গরিব অবস্থা থেকে বাবা এই মাঝারি অবস্থায় পৌঁছেছেন। মাঝারি থেকে এখন পৌঁছতে চান অনেক উঁচুতে।

ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের খবর তিনি খুব কম নেন। আর যখনই নেন, সেটা একেবারে অফিসারের ঢঙে। কাজে-কর্মে ভুল হলে মাকে অধঃস্তন কর্মচারী ভেবে দিব্যি ধমক লাগান আর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট রেখে একমনে রেডিয়োর খবর শোনেন।

দেশের খবর নিয়ে কমবেশি মাথাব্যথা থাকলেও বাড়ির খবরে খুব একটা বোধহয় আগ্রহ ভদ্রলোকের ছিল না। তা না হলে সদ্য-যুবতী মেয়ের তাল-কেটে-যাওয়া রোজকার জীবন কেন তাঁর নজরে পড়বে না!

আজ সারাদিন মায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে মেয়েটির। অথচ মা-কে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকে ওর মনে শুধুই মায়ের স্মৃতি। কারণ ওর বাবা তখন গরিব থেকে মধ্যবিত্ত হওয়ার চেষ্টায় দিনরাত ব্যস্ত ছিলেন।

ছোট-ছোট ভাই দুটোকেও মেয়েটি খুব ভালোবাসে। বুবুর বয়েস আট, আর টুটুর বয়েস পাঁচ। 'দিদি' বলতে ওরা দুজনেই একেবারে আত্মহারা। অথচ আজ ভাই দুটোর সঙ্গেও হাসিখুশি ব্যবহার করতে পারেনি মেয়েটি।

একটিমাত্র দুশ্চিন্তা ওকে চোখের পলকে অন্য গ্রহের বাসিন্দা করে দিয়েছে। ওর সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা যেন ছোট্ট একটা ঘরে লুকিয়ে পড়েছে। আর সেই ঘরের জানলাগুলোও যেন বন্ধ করে দিয়েছে কেউ।

একটু আগে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করেছে, 'কোথায় বেরোচ্ছিস, এখন, এই ঠান্ডার মধ্যে?'

'একটা...একটা ফোন করব...।'

'কাল সকালে করিস।'

'না। খুব জরুরি ফোন—এখনই করা দরকার।' দরজার কাছে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল ও।

'যা তা হলে। যা ভালো বুঝিস কর। এখন তুই বড় হয়ে গেছিস, নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছিস—' মা অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলছিল।

মা-কে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তখন।

'আজ সকাল থেকে তোর কী হয়েছে!' মা আলনার জামাকাপড় গুছোতে-গুছোতে আবার কথা বলছিল, 'তোকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়—'

শুভদীপের কথা কাউকে বলেনি ও। বাবা তো জানেই না, মা-ও না। ইস, যদি মা-কে সব খুলে বলতে পারত।

মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে, 'কেন, শুধু-শুধু চিন্তার কী আছে!'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'দশ মাস দশ দিন তো পেটে ধরেছি, তাই...।'

দশ মাস দশ দিন!

কথাটা ধাক্কা মারল মেয়েটির বুকে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই দশ দিন কেটে গেছে। তা হলে আর দশ মাস বাকি। মা যদি ব্যাপারটা এখন শোনে তা হলে কি হার্টফেল করবে? মায়ের তো আবার হাই ব্লাড প্রেসারের ধাত রয়েছে।

আর কথা বাড়ায়নি ও। থমথমে মুখে সদর দরজা খুলে নেমে এসেছে রাস্তায়।

এখন, বাড়ি ফেরার পথে, বারবার ওর মনে হচ্ছিল, প্রতিটি মুহূর্তে ওর শরীরের ভেতরে আর একটা শরীর বেড়ে উঠছে।

মেয়েটির চিন্তা এলোমেলো দিশেহারাভাবে ছুটোছুটি করে শেষ পর্যন্ত পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

'মা জননী, অন্ধকে কিছু সাহায্য করবেন—।'

চমকে উঠে মেয়েটি দেখল, ফুটপাথে একজন অন্ধ ভিখারি একটা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে ভিক্ষে করছে।

মেয়েটি পার্স থেকে একটা টাকা বের করে লোকটিকে দিল।

'ভগবান আপনার ভালো করবেন...।'

মেয়েটি প্রায় চোখ বুজে সেই আশিস গ্রহণ করল। এখন ওর সবরকমের শুভেচ্ছা প্রয়োজন।

বাড়িতে ফেরার পর মেয়েটি ঠিক করল, কাল ও ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শুভদীপের সঙ্গে দেখা করবে। এই সমস্যাটা এমন কিছু বড় সমস্যা নয়। শুভদীপ নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সমাধান তো একটা আছেই : বিয়ে।

এই চিন্তাটাকে পাখির ছানার মতো বুকে আঁকড়ে ধরে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিল মেয়েটি। বারবার ওর গা গুলিয়ে উঠছিল, মাথা দপদপ করছিল। কিন্তু শুভদীপের সঙ্গে কাটানো ভালোবাসার মুহূর্তগুলোর কথা সিনেমার ছবির মতো পরপর ভেবে ও নিজেকে সামলে রাখছিল। কখনও-কখনও দু-এক কলি গান গেয়ে মনটা হালকা করতে চাইছিল।

কাল শুভদীপের সঙ্গে দেখা হলেই আর কোনও চিন্তা নেই। তারপর মা-কে সব কথা খুলে বলবে ও। মা-কে কষ্ট দিয়েছে ভেবে ও মনে-মনে কষ্ট পেল। কাল ও মা-কে গলা জড়িয়ে ধরে সব বলবে। বলবে, 'মা, মাগো, আমিও তোমার মতো দশ মাস দশ দিন কষ্ট করতে শিখেছি।'

মনটা বোধহয় ওর শান্ত হয়ে আসছিল। কারণ, একসময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি। তবে ঘুমিয়ে পড়ার আগে ও আকুল হয়ে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে ডেকেছিল।

দেবতারা যে ওর আকুল প্রার্থনায় কান দেননি সেটা মেয়েটি বুঝতে পেরেছিল এক সপ্তাহের মধ্যেই।

শুভদীপ ওর সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল।

একটি শীতের সন্ধ্যা, ১৯৯৪ সাল

ভদ্রমহিলা আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিলেন। বেশ মোটামোটা কালোকোলো চেহারা। সিঁথির সিঁদুর বেশ চওড়া। যতটা চওড়া, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বোধহয় ঠিক ততটাই সরু। তাই আমার কাছে এসেছেন। সম্পর্ক জোড়া লাগানোর ঝাড়ফুঁক তুকতাক করতে।

বড়-বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু খোনা গলায় তিনি অনুনয় করে বললেন, 'কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে। অনেক আশা নিয়ে আমি এসেছি—।'

আমি মহিলাকে ভালো করে দেখলাম। তিনটি সন্তানের জননী। জননী হওয়ার জন্যে আলাদা কোনও যোগ্যতার দরকার হয় না। এ-ব্যাপারে পশু বা মানুষের কোনও তফাত নেই। শুধু জন্মসূত্রে শারীরিক কোনও গোলমাল না থাকলেই হল।

ভদ্রমহিলার স্বামী অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে বেড়ায়। কবে নাকি স্বামীর ব্যাগের মধ্যে একটা পারফিউম মাখানো রুমাল পেয়েছিলেন তিনি। তারপর দু-মাসের ব্যবধানে দুটো চিঠি। না, নির্দোষ চিঠি নয়, প্রেমপত্র।

এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তুমুল হয়ে গেছে, অথচ লাভ কিছুই হয়নি। ভদ্রমহিলার যা চেহারা দেখছি তাতে ওঁর পক্ষে স্বামীকে বশ করা বেশ মুশকিল। তার ওপর উনি ফ্রিজিড

কি না কে জানে!

কিন্তু চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। এই চেষ্টা করার জন্যেই সবাই আমাকে টাকা দেয়। আর সেই টাকাতেই আমার আর মায়ের দিন চলে যায়।

'আপনার স্বামীর নাম কি?' ওঁকে জিগ্যেস করলাম।

'অতীশ। অতীশ নন্দী—' উৎসাহ নিয়ে মহিলা বললেন।

আমি পাশের টেবিল থেকে বেশ মোটাসোটা একটা বই টেনে নিলাম। অতি ব্যবহারে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলোর সেলাই ঢিলে হয়ে গেছে। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে নির্দিষ্ট একটা জায়গা খুঁজে পেলাম: পতি বশীকরণ মন্ত্র। পাতার মার্জিনে আমারই লেখা নানান নোট।

সামনে রাখা একটা সাদা খাতা টেনে নিলাম। একটা ফরসা পৃষ্ঠা বের করে লিখতে শুরু করলাম:

মন্ত্র: 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণী পতিং মে বশ্যং কুরু-কুরু স্বাহা।'

মঙ্গলবার একটি গোটা সুপারি উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে মুখে রাখবে। স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, সুপারিটি মুখ থেকে বার করে দুধ, গঙ্গাজল দ্বারা ধুয়ে আবার সেই সুপারিটি উক্ত মন্ত্রে ২১ বার অভিমন্ত্রিত করে সেটা কুচিয়ে পান সেজে স্বামীকে খাওয়ালে পতি বশ হবে। তীব্র বশীকরণ প্রভাব পেতে হলে সুপারির সঙ্গে বাদুড়ের কানের সামান্য টুকরো এবং গোরোচনা মিশিয়ে পতিকে খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া অভিমন্ত্রিত করার সময় নীচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভুর্জপত্রে অঙ্কন করে চোখ বুজে বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা দ্বারা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এই আচার পালন করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।
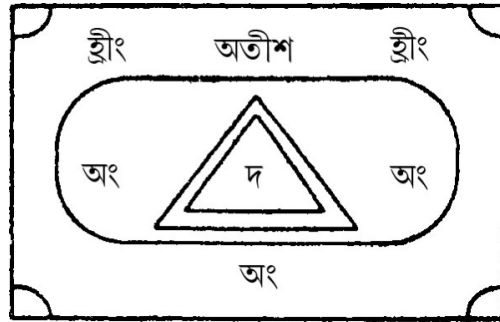
পতিবশীকরণ যন্ত্র

লেখা এবং যন্ত্রের ছবি আঁকা শেষ হলে কাগজটা ভদ্রমহিলার হাতে নিয়ে বললাম, 'আপনার চেনাজানার মধ্যে অতীশ নামে আর কেউ নেই তো?'

ভদ্রমহিলা দ্রুত মাথা নেড়ে জানালেন, না, কেউ নেই।

আমি বললাম, 'থাকলে মুশকিল হত। দুজন অতীশই আপনার টানে পাগল হত।'

ভদ্রমহিলা বিনয়ের হাসি হেসে বোধহয় ব্লাশ করলেন। গায়ের রঙ কালো বলে রক্তের টুকটুকে লাল উচ্ছ্বাস বোঝা গেল না।

কাগজের লেখা ইত্যাদি পড়া শেষ হলে তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'গোরোচনা জিনিসটা কী?'

'গোরুর পিত্ত থেকে একরকম চকচকে হলদে জিনিস বেরোয়—সেটাই।'

'কিন্তু এই গোরোচনা আর বাদুড়ের কানের টুকরো পাব কোত্থেকে? ওগুলো বাদ দিয়ে যদি...।'

ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। ওগুলো বাদ দিলে কাজ হবে না। আপনাকে নিউ মার্কেটের একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে গিয়ে আমার নাম বললে সব পেয়ে যাবেন। তবে দোকানের নামটা আর কাউকে জানাবেন না—।'

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞভাবে বারবার ঘাড় নাড়লেন। তারপর তাঁর হাতব্যাগ থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে জিগ্যেস করলেন, 'কত দেব?'

আমি বই আর খাতা গুছিয়ে রাখতে-রাখতে বললাম, 'দুশো—।'

এমন সময় মা দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। চেহারা এতই রোগা যে, গায়ের চাদরের একপাশ খসে পড়েছে। মুখে অসংখ্য ভাঁজ, চোখে চশমা, গাল ভাঙা, মাথার সব চুল সাদা ধবধবে।

আমাদের দুজনের সামনে দুটো কাপ সাজিয়ে দিতেই ভদ্রমহিলা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'এতসবের কী দরকার ছিল...।'

আমি বললাম, 'আমার মা—।'

মহিলা দুশো টাকা আমার হাতে দিয়ে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে আচমকা উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। মায়ের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঝপ করে একটা প্রণাম সেরে ফেললেন। মা লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে গেল।

আমি মজা পেলাম। ভদ্রমহিলা বোধহয় মা-কে বড়-ডাইনি ভেবেছেন, তাই এত ভক্তি।

মা কোনও কথা না বলে চলে গেল। বহু বছর ধরেই মা খুব কম কথা বলে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে ভদ্রমহিলা বিড়বিড় করে আমার দেওয়া কাগজটা পড়ছিলেন। বোধহয় এখন থেকেই মন্ত্র প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু মাঝে-মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার শব্দ।

ভদ্রমহিলা এখন বোধহয় এই মধ্যবিত্ত মলিন ঘরে বসে থাকতে অস্বস্তি পাচ্ছেন। কাজ মিটে গেলে কে-ইবা ডাইনির আস্তানায় বসে থাকতে চায়!

চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথা জিগ্যেস করছি...কিছু মনে করবেন না...।'

আমি বললাম, 'বলুন। আমার কাছে মন খুলে কথা না বললে কাজে নানান প্রবলেম হয়...।'

হাতের কাগজটা আমাকে দেখিয়ে তিনি অসহায় বালিকার গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এসবে ঠিকঠাক কাজ হবে তো!'

'আপনার কী মনে হয়?

তিনি বেশ লজ্জা পেয়ে বলে উঠলেন, 'না, মানে, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আপনি তো আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন...ওইসব জিনিস ঘাঁটতে হবে। আমার গা গুলিয়ে উঠছে...বমি পাচ্ছে...।'

'আপনার কোনও চিন্তা নেই। একবার একটু কষ্ট করেই দেখুন না। আর একটা কথা: যেদিন পানটা সেজে স্বামীকে খাওয়াবেন, সেদিন উপোস করে থাকবেন। খেয়াল রাখবেন, আপনার হাজব্যান্ড যেন কিছু টের না পায়—।'

ভদ্রমহিলা ঘন-ঘন ঘাড় নেড়ে কৃতজ্ঞতায় আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। আমি ওঁকে দরজার কাছে এগিয়ে দেওয়ার সময় বললাম, 'হাজব্যান্ডের সামনে একটু সেজেগুজে থাকবেন। একটু পারফিউম-টারফিউম মাখবেন।'

আচমকা এই হিতোপদেশে ভদ্রমহিলা একটু যেন অবাক হলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

'নিয়মগুলো ঠিক-ঠিক মানবেন। কাজটার এফেক্ট কী হল ও-সপ্তাহে আমাকে ফোন করে জানাবেন।'

এই বশীকরণ মন্ত্রে যদি কাজ না হয় তা হলে ওঁর অতীশকে আর ধরে রাখা যাবে না। তখন বাদুড়ের কান কেন, ইয়েতির 'ইয়ে' পানে সেজে খাওয়ালেও কোনও কাজ হবে না।

ভদ্রমহিলা চলে যাওয়ার পর আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। এখন আর কোনও ক্লায়েন্টের আসার কথা নেই। পাশের রান্নাঘর থেকে পাঁচফোড়নের গন্ধ নাকে আসছে। মা রান্না শুরু করে দিয়েছে।

চুপচাপ বসে আমি নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবছিলাম। আর চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট ঘরটাকে দেখছিলাম। কুড়ি বছরে এই ঘরটা এতটুকু বদলায়নি। অথচ জীবন কত বদলে গেছে।

ঘরের দেওয়ালগুলো বিশ বছরে আরও জীর্ণ মলিন হয়েছে। একদিকের দেওয়াল নানানরকম তন্ত্র-মন্ত্র অলৌকিক আচারের বই আর কাগজপত্রে ঠাসা। আর একদিকের দেওয়ালে অনেকগুলো তাক। তাকে নানা জড়িবুটি, পশুপাখির লোম-পালক, হাড় আর নখ, রুদ্রাক্ষ, হরীতকী, শুকনো নিমপাতা, সাপের খোলস ইত্যাদি রয়েছে। ক্লায়েন্টদের দরকারে এগুলো ব্যবহার করতে হয় আমাকে।

তাকগুলোর ওপরে দেওয়ালে রক্ষাকালীর এক বিশাল মাপের ফটো টাঙানো। লোল জিহ্বা, করাল বদন, ছিন্ন মুণ্ডে সজ্জিতা দেবী। এই ফটোর প্রভাব আমার ওপরে যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি আমার ক্লায়েন্টদের ওপরে। কারণ, দেবদেবীর ওপর ভক্তি আমার অনেকদিন আগেই ক্ষয়ে গেছে।

এখন আমার মা নিত্য দেবতার পুজো করে। আর আমি করি অপদেবতার পুজো।

মা কালীর উলটোদিকের দেওয়ালে আর-এক দেবতার ফটো: আমার পিতৃদেব। বছরে একদিন ধূপধুনো ফুলমালায় পুজো পেয়ে থাকেন। যদিও সবসময় উনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু ফটোর মানুষ বলেই আমাকে দেখতে পান না। পেলে তাঁর ম্যানেজার-সুলভ গলায় নির্ঘাত ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'এসব কী হচ্ছে, লিলু! তোমাকে না কতদিন শিখিয়েছি, ভূত-প্রেত অবদেবতা বলে কিছু নেই!'

‘দেবতা বলেও তো কিছু নেই, বাবা!’ আমি হেসে আপনমনেই বলে উঠলাম।

এই বাড়িতে দেবতা একদিন ছিল। কিন্তু বিশ বছর আগে তাঁরা একটা আঠেরো বছরের অসহায় মেয়েকে একা ফেলে রেখে আকাশে চম্পট দিয়েছে।

বাবার ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার গা গুলিয়ে উঠছিল, বমি পাচ্ছিল অকারণে। পুরোনো সেই রাতটাকে আমি ফিরে পাচ্ছিলাম মনে-মনে।

অবস্থা যখন চরমে পৌঁছেছিল তখন ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারিনি আমি। গা গুলিয়ে, মাথা ঘুরে, বমি হয়ে সে এক সাংঘাতিক অবস্থা!

মা আমাকে ধরে-ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার সময় বারবার জিগ্যেস করছিল: ‘লিলু, কী হয়েছে বল! কী হয়েছে বল!’

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শুভদীপের নির্লিপ্ত নির্বিকার গলা কানে বাজছিল: ‘ভয়ের কিছু নেই।’ আর ততই আমার ভয় বাড়ছিল।

মা-কে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম আমি। মা আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে কী বুঝেছিল কে জানে! মায়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। চাপা ভর্ৎসনার গলায় বলেছিল, ‘লীলা, এ তুই কী করলি!’

আমার গা পাক দিয়ে উঠেছিল। ছুটে বাথরুমে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বমি করতে শুরু করলাম। মা তাড়াতাড়ি এসে বাথরুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল, যাতে নাক-গলানে পড়শিরা আমার বমির শব্দ শুনতে না পায়।

সেদিন রাতে ঠাকুরের আসনের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে বসে মা পাথরের মূর্তি হয়ে স্থির ভেজা চোখে তাকিয়ে ছিল দেবতার দিকে। এই বিশটা বছরে দেবতারা মা-কে কী দিতে পেরেছেন জানি না, তবে মা এখনও ঠাকুরের আসন ছাড়েনি, দেবতাদের ছাড়েনি, আর...আর আমাকেও ছাড়েনি।

চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে আমি বাবার গলা পেলাম। বাবা কাঁদছে।

রাত তখন অনেক। পাশের ঘর থেকে মা আর বাবার চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। হঠাৎই বাবা কেঁদে উঠল। ইনিয়েবিনিয়ে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

আমি অস্বস্তি আর যন্ত্রণার মধ্যেও হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ফিটফাট পোশাক পরা চব্বিশ ঘণ্টার ম্যানেজারসাহেব কাঁদছে! বাবাকে সেই প্রথম কাঁদতে শুনেছিলাম। মানুষটা ভেঙেচুরে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। অফিসে বাড়িতে যে সবসময় শৃঙ্খলা বজায় রাখে সে নিজেই বেসামাল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল।

সে-রাতে আমার ভালো লেগেছিল। বাবা তা হলে আমাদের কথা ভাবে, আমার সুখ-দুঃখের কথা ভাবে!

কিন্তু তিনদিন পর বুঝেছিলাম, বাবা আমার সর্বনাশ নিয়ে ভেঙে পড়েনি। বাবা ভেঙে পড়েছে নিজের সর্বনাশের চিন্তায়। কারণ, আমার ব্যাপারটা পাঁচ কান হলে দামি সিগারেট খাওয়া ম্যানেজারসাহেবের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কী হাল হবে সেটা ভেবেই বাবা ভেঙে পড়েছিল। এই মানসিক চাপ মানুষটা নিতে পারেনি। তাই এক ছুটির দুপুরে সিলিং ফ্যানে মায়ের শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল।

বাবার গল্প সেখানেই শেষ হয়েছিল, কিন্তু আমার গল্প নয়।

স্বপ্নে দেখা স্লো-মোশান সিনেমার মতো আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে ছবির ফ্রেমের কোনা দিয়ে একটা সরু কালচে রক্তের ধারা ধীরে-ধীরে গড়িয়ে নামছিল।

পুরোনো স্মৃতি সত্যিই বড় নির্লজ্জ। যখন তখন ল্যাংটা হয়ে চোখের সামনে এসে নাচানাচি করে। যেমন এখন, এই অসময়ে, বিশ বছরের পুরোনো কথা মনে পড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। স্মৃতিকণা নামের বিশ বছরের এই উদোম তরুণী শরীরে মোচড় দিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে নাচতে থাকে। নাচতে-নাচতে ও কমলালেবুর খোসার রস ছুড়ে দেয় আমার চোখে। আমার চোখ জ্বালা করে, বুক জ্বালা করে।

হঠাৎ মায়ের গলা পেলাম, 'কী রে, লিলু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি!'

আমি চোখ মেলে তাকালাম। এই শীর্ণ জীর্ণ বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। এঁর সহ্যের কোনও সীমা নেই।

একের পর এক মর্মান্তিক ঝড় বয়ে গেছে আমার মায়ের ওপর দিয়ে।

প্রথমে আমার ঘটনা।

তারপর বাবার স্বার্থপরের মতো আত্মহত্যা।

আর, অবশেষে, বুবু আর টুটুর আলাদা হয়ে যাওয়া।

বিয়ের পরই ওরা আলাদা হয়ে গেছে। দিদির সঙ্গে ওদের দূরত্ব আগেই অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর সেই দূরত্বের মাঝে কেউ যেন কংক্রিটের পাঁচিল তুলে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি আর মা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইলাম। একটা সময়ে প্রচুর টিউশানি করে টাকা রোজগার করতাম। তারপর কী করে কী হয়ে গেল, ঝাড়ফুঁক তুকতাকের দু-একটা বই হাতে এসে গেল। আর একইসঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝোঁক গেল বেড়ে। গোয়াবাগানের এক 'বাবা'র আশ্রমে আমি প্রায়ই যেতাম। ভদ্রলোকের নাম নৃপেন সাধুখাঁ। সংসারী তান্ত্রিক বলে নিজের পরিচয় দিতেন। সেখানে প্রায় বছর পাঁচেক তাঁর সাধন সঙ্গিনী হয়ে ছিলাম। শরীর বা মন নিয়ে শুচিবায়ুর ব্যাপারটা আর ছিল না। তাই বোধহয় 'গুরু'কে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

'তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে দেব?' মা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'তোর কি খুব ক্লান্ত লাগছে?'

আমি একটা হাই তুললাম। তাকে রাখা টেবিলঘড়ির দিকে তাকালাম: প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। মাকে বললাম, 'ন-টা বাজলে খেতে দিয়ো। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব —।'

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। মা ফোন ধরে কথা বলে আমার দিকে রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর ফোন।'

আমি রিসিভার কানে চেপে ধরে 'হ্যালো' বললাম।

ও-প্রান্তে মিসেস খান্ডেলওয়াল কথা বললেন। আমার অনেকদিনের ক্লায়েন্ট। ওঁর বিশ্বাস, আমার মন্ত্রতন্ত্রের জন্যেই উনি মা হতে পেরেছেন।

প্রায় বছর ছয়েক হল আমার পসার বেড়েছে। ক্লায়েন্টরাই আমাকে সবকিছু দিয়েছে। এই টেলিফোনও ওদেরই দেওয়া। এসব আমি কখনও ভুলি না।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন শুতে গেলাম, তখন হঠাৎই মনে হল, আর দিন কয়েক পর ১৮ ডিসেম্বর। বিশ বছর আগে ওই দিনটাতেই আমি শুভদীপকে টেলিফোন

করতে বেরিয়ে শ্যামবাজার কালীবাড়ির দেওয়ালে মাথা খুঁড়েছিলাম—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কয়েকটা বইয়ের খোঁজে গিয়েছিলাম।

মাঝে-মাঝে নিজের পড়াশোনার কাজে ওখানে যেতে হয় আমাকে। আজ দুটো বই কিনলাম ওদের সেলস কাউন্টার থেকে: 'এ ক্রিটিক্যাল এডিশান অফ শ্রীকালচক্রতন্ত্ররাজ' আর 'তন্ত্রলোক'। তারপর ওদের পুঁথিঘরে পড়াশোনা সেরে বেরিয়ে এসেছি বিকেলের পার্কস্ট্রিটে।

সূর্য ডুবে গিয়ে এর মধ্যেই ছায়া নেমেছে। শীতের হাওয়া বেরিয়ে পড়েছে সান্ধ্য ভ্রমণে। সামনের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ একা-একা লাগছিল। মাঝে-মাঝে এই নিঃসঙ্গতার অসুখ আঁকড়ে ধরে আমাকে। আমার জানা এমন কোনও জড়িবুটি নেই যা এই অসুখ সারাতে পারে।

আমি জানি, আমি স্বাভাবিক নই। আমার বয়েসি যৌবন যাই-যাই কোনও মহিলা সারাদিন নানারকম স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। আর আমি! আমার যত ব্যস্ততা আমার পেশাকে ঘিরে। আমার কোনও বন্ধু নেই—ছেলে-বন্ধুও না, মেয়ে-বন্ধুও না। শুভদীপের ঘটনার পর আমার বিশ্বাসের জায়গাটায় বোধহয় কোনও গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলেও কাউকে আমি বিশ্বাসের আওতার মধ্যে নিয়ে এসে বন্ধু করতে পারিনি। শুধু আমি আর মা লতানে গাছের মতো পরস্পরকে জড়িয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছি।

শরীরের তাড়না আমি কখনও-কখনও টের পাই। তখন কামোত্তেজনা দমন যন্ত্র সামনে রেখে নিয়মমতো অভিমন্ত্রিত করে সে-তাড়নার উপশম করি। তবে সবসময় যন্ত্র বা মন্ত্রে কাজ হয় না।

যে-তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবসা করে আমি বেঁচে আছি, তাতে কি আমি বিশ্বাস করি?

বহুদিন ধরে ভেবে উত্তর পেয়েছি 'হ্যাঁ'। আমার বিশ্বাসে ইন্ধন জুগিয়েছে আমার অসংখ্য মক্কেল। আর, যে কখনও তোমার ক্ষতি করবে না, তাকে বিশ্বাস করতে ভয় কিসের! তন্ত্রচর্চা কখনও আমাকে নিরাশ করেনি।

ফুটপাথের কোণে দাঁড়িয়ে এসব নানান কথা ভাবছিলাম। অফিস ফেরত লোকজন অনবরত যাতায়াত করছে পাশ দিয়ে। হঠাৎই বিশ বছরের পুরোনো একটা ভূত দেখে আমি চমকে উঠলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে লাফিয়ে পড়ল স্মৃতিকণা নামের মেয়েটা। আমাকে ঘিরে ফুটপাথের ওপরেই ড্যাং-ড্যাং করে নাচতে শুরু করল। ওর বুক ঊরু অশ্লীলভাবে নড়ছে। আর বিলোল কটাক্ষে আমাকে প্রতি মুহূর্তে শেষ করে দিচ্ছে।

ভূতটা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। খানিকটা অবাক হয়ে দেখছিল আমাকে।

আমি প্রথমটায় ভেবেছি সন্ধের আলোছায়ায় ভুল দেখছি। কিন্তু না, ভূতটা এখনও মিলিয়ে যায়নি!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সবকিছু সেই একইরকম—চলার ছিরি, মুখের ছাঁদ, চুলের কায়দা, আর সর্বনাশা সেই দুটো চোখ।

স্মৃতিকণা পাগলের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বাতাসে হাত-পা ছুড়ে নাচছিল। আমার মাথার ভেতরে মা অবাক চিৎকারে বলছিল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!' আর বাবা কপাল চাপড়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিল

ভূতটা আরও কাছে এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল।

এবার আরও ভালো করে দেখলাম।

বয়েস হয়েছে, কপালের দুপাশের চুল ফিকে হয়ে এসেছে, কোমর একটু ভারী, প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটারে স্মার্ট সাজার চেষ্টা করেছে বটে, তবে উঁচিয়ে ওঠা ভুঁড়ির জন্যে একটু বোকাসোকা লাগছে।

কিন্তু চোখ দুটো পালটায়নি। সেই গভীর টলটলে চোখ। রোমান্টিক। এখনও—বিশ বছর পরেও। কেন যে এই চোখের গভীরে সেদিন বোকা মেয়ের মতো ঝাঁপ দিয়েছিলাম! কেন যে ওকে অতটা বিশ্বাস করেছিলাম! কিন্তু তখন যে আমাদের বয়েসটাই ছিল না ভেবে কাজ করার বয়েস।

না, ভূতটাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি।

'আপনাকে যেন চেনা-চেনা লাগছে—' ভূতটার গলার স্বরে এখনও সেই পুরোনো ম্যাজিক।

আমি বললাম, 'শুভদীপ? শুভ?'

'লীলা...শ্যামবাজার...লিলু...মানে...' ও হাসল।

আমি উত্তরে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে তুললাম ঠোঁটে।

'ওঃ, সেই টিপিক্যাল হাফ স্মাইল! বাব্বাঃ, কতদিন পর দেখা! পনেরো-ষোলো বছর হবে, কী বলো?'

আমি বললাম, 'পনেরো নয়, কুড়ি...বিশ বছর...।'

বিশ বছর? নাকি বিষ বছর?

শুভদীপের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়। আমার 'টিপিক্যাল হাফ স্মাইল'-এর ব্যাপারটাও ও মনে রেখেছে! কিন্তু বিশ বছরটা ভুলে গেছে অনায়াসে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর শুভ বলল, 'লিলু, চলো, কোথাও গিয়ে একটু বসি—যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে। কত গল্প জমে আছে, জানো?'

আমি অবাক হয়ে শুনলাম আমি বলেছি, 'চলো, কোনও আপত্তি নেই।'

রাস্তা দিয়ে কত গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। শুভকে আমি কেন এক ধাক্কায় কোনও গাড়ির তলায় ফেলে দিচ্ছি না! কেন খতম করে দিচ্ছি না ওর পৌরুষের আস্ফালন?

আমার একা-হয়ে যাওয়া মন বোধহয় এই মুহূর্তে কারও সঙ্গ চাইছিল। তাই ওর পাশাপাশি হেঁটে চললাম অনায়াসে। বাবার কান্না আর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে শুভ বলল, 'লিলু, সত্যি, ভাবা যায় না! বিশ বছর পর হঠাৎ করে এরকম রাস্তায় দেখা...!'

আমি অল্প হেসে বললাম, 'আমি আর সহজে অবাক হই না, শুভ। ভাবা যায় না এরকম অনেক কিছু আমি এই বিশ বছরে ভাবতে শিখেছি।'

শুভ একটু অবাক চোখে দেখল আমার দিকে। মজা করে বলল, 'আমার লিলু অনেক পালটে গেছে।'

'পালটাবেই তো। আঠেরো বছর আর আটতিরিশ বছরে অনেক তফাত।'

আমরা 'টমি ক্যাট' রেস্তরাঁয় গিয়ে বসলাম।

রেস্তরাঁর ভেতরটা আবছা অন্ধকার। মাঝে-মাঝে লাল-নীল স্পট জ্বলছে। চাপা ঝংকার তুলে হালকা মিউজিক বাজছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোট-ছোট বুকওয়ালা একটা রোগা মেয়ে মিহি গলায় হিন্দি গান গাইছে।

রেস্তরাঁর সাজগোজ মন্দ নয়। পালিশ করা কাঠের দেওয়াল। তার ওপরে পেতলের কারুকাজ। আর দেওয়ালের নানা জায়গায় রহস্যময় ছমছমে অয়েল পেইন্টিং ঝোলানো। দরজার কাছে রঙিন কাচের চুড়ির শিকল ঝুলিয়ে তৈরি চিক। তার জায়গায়-জায়গায় লাল-নীল-হলদে টুনি বাতি।

শুভদীপ মেনু কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'পছন্দসই অর্ডার দাও।'

আমি বললাম, 'শুধু একটু স্ন্যাক্স নেব। যেমন, চিকেন স্যান্ডউইচ চলতে পারে। তার সঙ্গে কফি।'

শুভ পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে-ধরাতে বলল, 'ব্যস, এই! ড্রিঙ্কস নেবে না?'

'না। অভ্যেস নেই—' একটু থেমে তারপর: 'তবে তুমি নিতে পার। আই ওন্ট মাইন্ড।'

শুভ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি একটু হুইস্কি নেব। ফর ওল্ড টাইমস সেক —।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

বিশ বছর আগের মতো সুন্দর করে হেসে শুধু জিগ্যেস করল, 'বলো, কেমন আছ। কী-কী করলে এই কুড়ি বছরে—।'

ওর কথার সহজ সুরে মনে হল, বিশ বছর নয়, ওর সঙ্গে বিশ ঘণ্টা পরে যেন আমার দেখা হল।

টেবিলের একপাশে কাচের গ্লাসে সাজানো পেপার ন্যাপকিনের নকশা দেখতে-দেখতে বললাম, 'তেমন কিছুই করিনি। শুধু বুড়ি হয়েছি। কোনওরকমে দিন চলে যাচ্ছে...।'

'কে বলেছে তুমি বুড়ি হয়েছ!' কথাটা বলে শুভদীপ আমার সাজপোশাক দেখছিল। বারবার তাকাচ্ছিল আমার বুকের দিকে। বয়েস সেখানে ছাপ ফেলতে পারেনি। তা ছাড়া আমি তো জানি, ওর বরাবরই বুকের নেশা—তা সে ছোটই হোক, আর বড়ই হোক।

'বিয়ে তো করোনি দেখছি—।'

ওর সিগারেটের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছিল, আর বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, মানুষটা সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে আর কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

আমি হেসে বললাম, 'শুধু বিয়ে কেন, অনেক কিছুই করা হয়ে ওঠেনি।'

আবার সিগারেট গভীর টান। তারপর: 'বিয়ে না করার জন্যে নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাওনি!'

আমার বমি পাচ্ছিল, গা গুলিয়ে উঠছিল। বললাম, 'ওটা ছাড়া আর কোনও টপিক নেই?'

শুভ হাসল—স্বস্তির হাসি। ও বোধহয় ভেবেছিল, আমি পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে ওর দায়দায়িত্ব নিয়ে চাপান-উতোর শুরু করব। সেই আশঙ্কা কেটে যেতেই ও অনেক সহজ হয়ে গেল।

'এখন কোথায় থাকো? সেই শ্যামবাজারে?'

'হ্যাঁ। একই বাড়িতে। থাকা বলতে আমি আর মা।'

'মেসোমশাই?'

শুভদীপ আমাদের বাড়িতে কখনও যায়নি। শুধু আমার মুখে সকলের গল্প শুনেছিল। ওকে সংক্ষেপে সবার কথা বললাম। তবে বাবা যে আত্মহত্যা করেছে সেটা জানালাম না।

চিকেন স্যান্ডউইচ আর পটাটো চিপস চলে এল টেবিলে। সঙ্গে টমাটো সস।

শুভ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে স্যান্ডউইচে সস মাখাতে শুরু করল। দু-এক টুকরো চিপস দাঁতে কেটে স্যান্ডউইচ কামড় বসাল।

আমারও খিদে পেয়েছিল। তাই লোক-দেখানো লজ্জা না করে খেতে শুরু করলাম।

'তুমি আর মাসিমা বাড়িতে একা থাকো!' শুভ বেশ অবাক হয়ে বলল। কিন্তু ওর চোখে একটা লোভের ছায়া দেখতে পেলাম আমি। মনে হল, কয়েক মিনিট পরেই ও হয়তো আমার বাড়িতে আসার বায়না ধরবে।

আমি ওর কথায় হাসলাম, বললাম, 'দুজন থাকলে আর একা কোথায়?'

'তোমাদের চলে কী করে?'

আমি স্যান্ডউইচ চিবোতে-চিবোতে বললাম, 'স্যান্ডউইচটা বেশ ভালো করেছে।'

'তোমাদের চলে কী করে?' শুভদীপ নাছোড়বান্দার মতো দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করল।

আমি হেসে ওর দিকে তাকালাম, বললাম, 'আমি স্যান্ডউইচ মাইনাস স্যান্ড। ওই করেই বেশ চলে যায়।'

শুভ চোখ কপালে তুলে জিগ্যেস করল, 'তার মানে?'

'আমি উইচ। সাদা কথায় যাকে ডাইনি বলে। তুকতাক ঝাড়ফুঁক নিয়ে আছি—।'

আমার কথায় ও এত জোরে হেসে উঠল যে, পাশের টেবিলের লোকজন প্রায় চমকে উঠল। কিন্তু ওর হাসি কিছুতেই আর থামতে চায় না।

হাসতে-হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কোনওরকমে বলল, 'লিলু, দারুণ জোক করেছ। তোমাকে সেলাম।'

আমি কোনও কথা বললাম না। সত্যি কথা বলেছি, বিশ্বাস করা-না-করা ওর ব্যাপার। ওকে বিশ্বাস করিয়েই বা আমার কী লাভ!

'এবার তোমার কথা বলো—।' আমি ঠান্ডা গলায় বললাম।

শুভদীপের সাজপোশাক, হাতের হিরের আংটি ইত্যাদি জানিয়ে দিচ্ছিল ও বেশ আরামেই জীবন কাটাচ্ছে।

আমার তলপেটটা ব্যথা করছিল। চিনচিনে ব্যথা। এ-ব্যথা থেকে নিস্তার নেই। একটা সিনেমার রিল উলটোদিকে ঘোরাচ্ছিল কেউ। বিশ বছরের পথ পেরিয়ে গেল বিশ সেকেন্ডে। লীলা, এ তুই কী করলি! এ তুই কী করলি!

স্মৃতিকণা কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে টেবিলে। তারপর হাত-পা-বুক দুলিয়ে-দুলিয়ে ওর সে কী নৃত্য! ছাতা-পড়া পুরনো ঘা-টাকে ও যেন খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে দাগদগে করে তুলছিল।

আমি পলকের জন্যে চোখ বুজলাম। ওঃ! তোর এই হাহাকারী নাচ আর কত দেখব!

শুভদীপ ওর ব্যবসার কথা বলছিল। বাবার ব্যবসাকে কীভাবে কৃতিত্বের সঙ্গে ও ফুলিয়ে- ফাঁপিয়ে তুলেছে গর্ব করে সে-কথাই শোনাচ্ছিল। ওরা এখন প্রায় সাতাশ রকম কনুজিউমার প্রোডাক্ট তৈরি করে। বরানগরে ওদের বিশাল ফ্যাক্টরি। বাবা-মারা গেছেন চার বছর। এখন ও আর ওর ছোট ভাই সবকিছুর মালিক। মায়ের অংশটা ওরা দুজনেই দেখাশোনা করে। ওরা এখনও সেই যোধপুর পার্কের বাড়িতেই আছে। নতুন একটা বাড়ি তৈরি করেছে সল্টলেকে। সেটা লিজ দেওয়া আছে।

বোঝা গেল। আমার সামনে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে একজন সফল লম্পট।

আমি নির্লিপ্ত মুখে শুভর কথা শুনছিলাম। ও আমার কাছে ঝুঁকে এসে চাপা গলায় বলল, 'লিলু, আমাদের প্রোডাক্টের লিস্টে অ্যাডাল্ট আইটেমও আছে।'

আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে ও উদাস গলায় বলল, 'আমাদের প্ল্যান্টে একটা অটোমেটিক পোরশান গন্ডগোল করছে। তাই কনসালট্যান্ট ফার্মকে খবর দিতে এদিকে এসেছিলাম। ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

কথা শেষ করে শুভ একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল পকেট থেকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'রেখে দাও—।'

চোখ বুলিয়ে দেখলাম, তাতে অফিস আর বাড়ি—দুটো ঠিকানাই আছে।

একবার মনে হল কার্ডটা ওর মুখে ছুড়ে মারি। কিন্তু ল্যাংটো মেয়েটা টেবিলের ওপরে নাচতে-নাচতেই যেন চোখ টিপল আমাকে। ইশারা করল। কার্ডটা আমি হাতব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম।

হঠাৎই শুভদীপ জিগ্যেস করল, 'এরপর তুমি কোথায় যাবে?'

বেয়ারা কফি দিয়ে গিয়েছিল। তাতে চুমুক দিয়ে বললাম, 'কোথায় আবার, বাড়ি! মা একা আছে।'

শুভ ওর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল। চুমুক দেওয়ার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল দু-এক পেগ ওর কাছে নেহাতই ট্রায়াল বল।

'লিলু, একটা কথা বলব?' শুভ সতর্ক চোখে আমাকে জরিপ করতে-করতে বলল, 'আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে? আমি ভীষণ লোনলি...।'

আমি কফিতে আরামের চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাড়া কিসের! বিশ বছর পর আমাদের দেখা হল কি আবার বিশ বছরের ছাড়াছাড়ির জন্যে!'

'লিলু, ইউ আর গ্রেট!' শুভদীপ আবেগে যেন পা পিছলে পড়ল। ও বোধহয় আমার শরীরের তাপ-উত্তাপ টের পাচ্ছিল। হয়তো সেই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক থেকে বিশ বছর আগে ডায়মন্ডহারবারের ব্যাপারটা জীবন্ত করে তুলতে চাইছিল মনে-মনে।

'তোমাকে দেখে মনেই হয় না তোমার বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে।' শুভদীপ বোধহয় প্রশংসার মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

'তোমাকে দেখেও ঠিক একইরকম মনে হয়। মনে হয় সেই বিশ বছর আগের শুভ।' ছেনালি করে ওর ছেনালির শোধ দিলাম। কিন্তু শুভ বোধহয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। কারণ মাথা ঝুঁকিয়ে ও ব্লাশ করল।

'লিলু, কবে আবার দেখা হবে?'

আমি ওকে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিলাম। বললাম, 'কাল সন্ধে সাতটায় আমার বাড়ি এসো। আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব—।'

শুভদীপ আমার হাত চেপে ধরল। গাঢ় গলায় বলল, 'তোমার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। তুমি কখনও আমাকে ক্ষমা করবে ভাবিনি।'

হঠাৎ দেখি নাচুনী মেয়েটা আমাদের টেবিলের ওপর থেকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। আর তখনই খেয়াল করলাম, রোগা ছোট-ছোট বুক মেয়েটা তখনও গান গাইছে: 'মার দিয়া যায়, কে ছোড় দিয়া যায়। বোল তেরে সাথ কেয়া সলুক কিয়া যায়...।'

সত্যি, নিয়তির জবাব নেই! নইলে শুভদীপের সঙ্গে এতদিন পর এই অলৌকিক সাক্ষাৎ! এখন বুঝতে পারছি, রক্তের ঋণ সহজে শোধ হয় না। রক্তের ফোঁটা সহজে ধুয়ে ফেলা যায় না।

কফি শেষ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম: 'কাল সাতটায় এসো কিন্তু।'

শুভও উঠে দাঁড়াল: 'ছ-টা বেজে ষাট মিনিটে আমি পৌঁছে যাব।'

বাড়ি ফেরার পথে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, শুভদীপ কী চমৎকারভাবেই না দুটো প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। এক: ওর বিয়ের প্রসঙ্গ। দুই: বিশ বছর আগে ওর-আমার সন্তানের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা ও জানতে চায়নি।

অনেক ভেবে দেখলাম, শুভদীপকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেওয়াটা আমার অপদেবতাদের অভিপ্রায় নয়।

তা হলে কি আঠেরো বছরের একটা মেয়ের সঙ্গে অন্যায়ের জন্যে আটতিরিশ বছরের এক মহিলা প্রতিশোধ নেবে?

কাঁটায়-কাঁটায় সাতটার সময় শুভদীপ এল আমার বাড়িতে। পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল পরে ও একেবারে ফুলবাবুটি সেজে এসেছে।

ও যখন আমাকে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকল তখন ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

আমার হাসি পেয়ে গেল। লড়াইয়ের জন্যে ও দেখছি পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে!

মা-কে বলে রেখেছিলাম, সাতটার সময় আমার কাছে একজন দামি মক্কেল আসবে। আর কাজের বাচ্চা মেয়েটাকে দোকানে পাঠিয়ে মিষ্টি আনিয়ে রেখেছি। মা শুভদীপের সামনে সেগুলোই সাজিয়ে দিয়ে গেল। ও 'এ কী, এতসবের কী দরকার ছিল' বলে একটু সৌজন্য দেখাল।

খেতে-খেতেই শুভ ঘরটা খুঁটিয়ে দেখছিল। আর আমি তলপেটের সেই চিনচিনে ব্যথাটা টের পাচ্ছিলাম।

ও মা-কালীর ফটো দেখল, বাবার ফটো দেখল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমিই প্রসঙ্গ তুললাম।

'তোমার জীবনটা ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।' টেবিলে নখের আঁচড় টানতে-টানতে বললাম। তারপর মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে: 'বিয়ে করেছ?'

ও অস্বস্তি পেয়ে নড়েচড়ে বসল। ওর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনও কথা বলার আগে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল।

'আমার জীবনটা কোনও জীবন নয়, লিলু। শুধু অফিস-ফ্যাক্টরি-বাড়ি, অফিস-ফ্যাক্টরি-বাড়ি, এই করে দিন কাটছে। একটু থেমে ও বলল, 'তবে কাল থেকে জীবনটা অন্যরকম লাগছে। আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: সত্যি, মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করে এক।'

বুঝতে পারলাম, বিশ বছরে শুভদীপ আরও চালাক হয়েছে। আরও সুন্দর করে মন-রাখা কথা বলতে শিখেছে। ওর ডায়ালগ শুনে আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছিল। কী সুন্দরভাবেই না ও আমার প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে গেল!

মা এসে চা দিয়ে গেল। খালি প্লেট-গ্লাসগুলো তুলে নিয়ে গেল যাওয়ার সময়।

আমি নির্লিপ্ত গলায় একই প্রশ্ন করলাম আবার, 'বিয়ে করেছ?'

আজকের লিলু বিশ বছর আগেকার খুকি লীলারানি নয়।

তা সত্ত্বেও ও চুপ করে আছে দেখে ভর্ৎসনা করে বললাম, 'ওঃ, কাম অন, শুভ! ছেলেমানুষি কোরো না। আমি না করলে কী হবে, সবাই বিয়ে করে।'

একটা সিগারেট ধরাল শুভদীপ। চায়ের কাপে কয়েকবার চুমুক দিল। তারপর উদাস চোখে মা-কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুস্মিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে বারো বছর। এই জানুয়ারিতে টুয়েলফথ অ্যানিভার্সারি। আমার কাছে ব্যাপারটা মৃত্যুবার্ষিকীর মতো।'

আমার হাসি পেয়ে গেল। বেচারা শুভদীপ আজ কত আশা নিয়েই না আমার বাড়িতে এসেছিল! বিশ বছর আগে পড়া আমার শরীরের ভূগোল বই ওর আজও মুখস্থ আছে কি না সেটা যাচাই করতে এসেছিল। অথচ কথাবার্তা কী অদ্ভুতভাবে ওর অপছন্দের পথে এগোচ্ছে।

আমি শুভর অভিনয়ে সায় দিয়ে সহানুভূতির অভিনয় করে বললাম, 'কেন, সুস্মিতা কি তোমার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে চলে না?'

‘ও আমাকে একটুও বোঝার চেষ্টা করে না। জানি, তুমি হয়তো ভাবছ এসব বলে তোমার সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু...’ হঠাৎই সিগারেট ফেলে দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল শুভদীপ: ‘বিশ্বাস করো, লিলু, আমি ভীষণ একা—।’

শুভ আমার হাত কচলাতে লাগল।

আমার বিরক্ত লাগছিল, কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিলাম না। ওকে আমি একটু-আধটু আশকারা দিতে চাই। আমার পরিকল্পনার পক্ষে সেটা খুব জরুরি।

আমার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম। শুভর অভিনয়ে বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে ওকে আমার খারাপ লাগছিল না। বোকা ভগবানের চেয়ে বুদ্ধিমান শয়তান অনেক ভালো।

ওর হাত ক্রমশ গরম হয়ে উঠছিল। ও আতুর চোখে আমাকে দেখছিল।

দেখার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ আমি আমার আলমারির সবচেয়ে ফিনফিনে এবং দামি শাড়িটা পরেছি। আর আকাশি শাড়ির নীচে লো-কাট গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ। বাইরে শীত থাকলেও ঘরের ভেতরে সেরকম ঠান্ডা নেই। সুতরাং আমার শরীরের যতটুকু যেভাবে দেখা যায় সেভাবেই দেখছিল শুভদীপ।

আমি আচমকা জিগ্যেস করলাম, ‘তোমার ছেলেমেয়ে ক’টা?’

শুভ আমার হাতটা চট করে ছেড়ে দিল। আমাকে একপলক অদ্ভুত চোখে দেখে মাথা নাড়ল: ‘নেই।’

‘তোমার বিয়ে তা হলে সুখের হয়নি?’

‘এর পরেও ঠাট্টা করছ, লিলু!’

‘সুস্মিতাকে ডির্ভোসের কথা ভেবেছ?’

‘ভেবেছি, কিন্তু কোনও উপায় নেই। বাঁধা পড়ে গেছি। ওর বাবা আমাদের বিজনেসে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ঢেলেছে—।’

তাই বলি! আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা না পড়লে শুভকে কে আটকাতে পারে!

‘লিলু, তুমি সাহস দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি। তা হলে পুরোনো ভুলটা শোধরানো যায়। বিশ্বাস করো টাকা-পয়সার দিকে আমার আর কোনও টান নেই।’

কিন্তু মেয়েছেলের দিকে আছে। বুঝতে পারছিলাম, শুভর কথাগুলো আগাগোড়া মিথ্যে, পুরোটাই অভিনয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও শুনতে খারাপ লাগছিল না।

তুমি সাহস দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি। চমৎকার!

আমার গুরু নৃপেন সাধুখাঁ যখন আমাকে কামনা করেছেন তখন স্পষ্ট বলেছেন, ‘লীলা, আমাদের মিলন প্রয়োজন।’

আমরা দুজনে মাঝরাতে মিলিত হওয়ার পর উত্তরে মুখ করে বসে কর্ণপিশাচিনী গুহ্যমন্ত্র সাধনা করেছি। ফলে মিলনটাকেও আমার খুব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয়েছে। সেই গুরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি বট-যক্ষিণী চেটক, রতিরাজ চেটক, ষটকোণ বিশাংক যন্ত্র প্রয়োগ, বার্তালী মন্ত্র ইত্যাদি চর্চা করেছি। একসময় মানুষটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তিনিই আমার দেখা একমাত্র পুরুষ, যার মধ্যে পুরুষকার রয়েছে।

কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর সম্পর্কের পর তিনি একবস্ত্রে হিমালয়ের দিকে রওনা হয়ে যান। মনে পড়ে, সেদিন আমি হারানো ভালোবাসার জন্যে কেঁদেছিলাম।

খেয়াল করিনি শুভ কখন যেন আমার উরুতে হাত রেখেছে। শুনতে পেলাম ও বলছে, 'লিলু, আমি বিয়ে করেছি শুনে তোমার খারাপ লাগছে?'

আমি বাবার ফটোর দিকে চোখ রেখে বললাম, 'না, তা নয়।'

তারপর উঠে গিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। মা জানে, তন্ত্র চর্চার জন্যে নির্জনতা দরকার। এখন ঘরে আমি আর শুভদীপ—ঘরের দুটো দরজাই নিশ্চিন্তে বন্ধ।

শুভ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের শালটা খুলে রেখে দিল চেয়ারে। তারপর দু-পা ফেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এখন না—পরে। কয়েকটা দরকারি কথা তোমার শোনা দরকার।'

শুভ আমার চোখে কী দেখল কে জানে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ও শালটা গায়ে জড়িয়ে নিল আবার। ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'শুধু-শুধু তা হলে দরজা দিতে গেলে কেন?'

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম। বললাম, 'শরীরের লজ্জা আড়াল করতে দরজা দিইনি। দিয়েছি মনের লজ্জা আড়াল করতে। বোসো—।'

ও বসে পড়ল।

দাঁতে-দাঁতে চেপে আমি ঠিক করলাম, এইবার ওকে বলা দরকার। সত্যি কথার প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যায় না।

'শুভ, কুড়ি বছর মানে কত দিন জানো! সাত হাজার তিনশো দিন।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আজ আমার সর্বনাশের প্রায় বিংশতিতম বার্ষিকী..।'

'লিলু, প্লিজ, আমাকে আর অপমান কোরো না। জানি, আমার অন্যায়ের কোনও ক্ষমা নেই...আমি...।'

'কথা না বলে চুপ করে শোনো।'

শুভদীপের মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়ল। ওর পারফিউমের গন্ধ মিশে যাচ্ছিল মলিন ঘরের প্রাচীন গন্ধের সঙ্গে। কেমন এক অদ্ভুত বাতাবরণ কখন যেন তৈরি হয়ে গেছে এই শীতের সন্ধ্যায়।

শুভ ঠিক বুঝতে পারছিল না কী করবে, কোনদিকে তাকাবে, হাত দুটো কোথায় রাখবে।

আমি স্বগতোক্তির মতো বলতে শুরু করলাম, 'সর্বনাশ বলতে তোমার হাতে আমার মেয়েলি ব্যাপার খোওয়া যাওয়া নয়। এমন কি তুমি আমাকে বিয়ে না করে সরে পড়েছ, তাও নয়। ব্যাপারটা অন্য। বিশ বছর আগে আমার বয়েস ছিল সতেরো কি আঠেরো—কিশোরী আর যুবতীর মাঝামাঝি বয়েস একটা। বাড়িতে ঝগড়া করে আজকের মতোই শীতের এক সন্ধ্যায় শ্যামবাজারের টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তোমার বাড়িতে আমি ফোন করেছিলাম। তুমি নানান পাশ কাটানো কথা বলেছিলে আমায়। বলেছিলে, আপসেট

হওয়ার কিছু নেই। তারপর তোমার কোনও ক্লাসমেটের সঙ্গে কথা বলার ভান করেছিলে। তুমি যদি…।'

শুভদীপের চোয়াল কিছুটা ঝুলে পড়েছিল। ও বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি হাত তুলে ওকে বাধা দিলাম: 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। নানান দুশ্চিন্তা মাথায় করে সেদিন আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তুমি জানো না, কীভাবে আমার এক-একটা দিন, এক-একটা রাত কেটেছিল। বেশ কয়েকদিন সন্ধেবেলা আমি কফি-হাউসে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি। তুমি আসোনি। শুভ, আমি কিন্তু তোমার বাড়িতে যেতে পারতাম। পারতাম ইউনিভার্সিটিতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো হইচই হত, অনেক ঝামেলা হত—শেষ পর্যন্ত সমাধানও হয়তো একটা হত। কিন্তু আমার আত্মসম্মানে বেধেছিল। ফাঁপা আত্মমর্যাদা নিয়ে আমি শুধু অপেক্ষাই করে গেলাম মূর্খের মতো।'

শুভ তখনও মুখ সামান্য হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে। আর আমি একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছিলাম।

'তুমি তো জানো, অ্যাবরশান তখন বেআইনি ছিল। ফলে অনভিজ্ঞ অপদার্থ একটা মেয়ে অসহায়ভাবে শূন্যে হাতড়াতে লাগল। লুকিয়ে-চুরিয়ে যে কিছু করব, তাও পেরে উঠলাম না। ভাবতে পারো, তখন আমি কী পাগলামিটাই না করেছি! যা দিয়ে পেরেছি চেষ্টা করেছি, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছি। পেন, পেনসিল, স্কেল, অ্যালুমিনিয়ামের হ্যাঙার —ওঃ!'

স্মৃতিকণা নামের নির্লজ্জ মেয়েটা কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের ওপরে। ওর বিশ বছরের যৌবন উথালপাথাল হয়ে মাতালের মতো ধেইধেই করে নাচছে।

'লিলু, প্লিজ, আমি আর শুনতে পারছি না—' শুভদীপ ভাঙা গলায় অনুনয় করে বলল, গলা দিয়ে উঠে আসা কাশির দমক কোনওরকমে সামলে নিল।

আমি কিন্তু থামলাম না। একে-একে সব ওকে বললাম। মায়ের কথা, বাবার কথা। বাবা যে পাশের ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলেন সে-কথাও বললাম।

'…বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ঠিক করলাম, বাচ্চাটাকে নষ্ট করব না। মায়ের সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেলাম বর্ধমানের এক দূর সম্পর্কের পিসির বাড়িতে। দোকান থেকে সিঁদুর কিনে মাথায় লাগিয়ে মিথ্যে একটা বিয়ের গল্প ফেঁদে সেখানে থেকে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, পিসির বাড়িতে আমি রাতদিনের ঝিয়ের কাজ করতাম। পিসির বড় ছেলে আমাকে নষ্ট চোখে দেখত। কী অপমানে, কী হেনস্থার মধ্যে যে ক'টা মাস সেখানে কাটিয়েছি তা শুধু আমিই জানি। বিশ বছরে সেই দিনগুলোর কথা আমি একটুও ভুলিনি। একটুও না। অথচ শেষ পর্যন্ত কী হল জানো?'

শুভ কেউটে সাপের মুখে বশ হওয়া কোলা ব্যাঙের মতো নিষ্পলকে আমার দিকে তাকিয়ে। ওর ঠোঁট সামান্য কাঁপছে। আমার গল্প শুনতে-শুনতে আমার ভেতরের গল্পটাও পড়ে ফেলতে চাইছে যেন।

আমার চোখ জ্বালা করছিল। গলায় কী একটা যেন আটকে গেছে। অনেক চেষ্টা করে আবার কথা বললাম আমি, 'বাচ্চাটা মরে জন্মাল। জন্মের পর মৃত্যু নয়—মৃত্যুর পর জন্ম। আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম আমি। আর সেই সঙ্গে মা হওয়ার সাধে চিরদিনের মতো ইতি পড়ল, নটে গাছটি মুড়োল।'

শুভদীপ দু-হাতে মুখ ঢাকল। একটা যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে। তারপর কোনওরকমে বলল, ‘আমাকে ক্ষমা করো, লিলু। এতসব আমি জানতাম না...আমি...।’

‘সত্যিই তো, জানবে কী করে! তুমি তো ‘আপসেট হওয়ার কিছু নেই। বলেই পালিয়েছিলে—।’

শুভ এবার কাঁদতে লাগল। ওর পাঞ্জাবি পরা পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। তারই মধ্যে ও জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, ‘আমাকে শাস্তি দাও। আমার বাবা কী ভয়ংকর মানুষ ছিলেন তুমি জানো না। তা ছাড়া আমি তখনও পড়াশোনা নিয়ে...।’

ওর কান্নায় আমার মন নরম হতে দিলাম না। বিশ বছরে আমি অনেক কেঁদেছি। কেউ সে-কান্না শুনতে পায়নি।

‘শুভ, সেই টেলিফোন করা রাতের ব্যাপারটা নিয়ে পরে আমি অনেক ভেবেছি। সেদিন তোমার কাছ থেকে আমি বোধহয় শুধু ভরসা চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও। পরে কী হত সেটা পরে ভাবা যেত।’

আমার তলপেটে কেউ যেন বরফের ছুরি চালাল। গোপন যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে গেল আমার।

‘লিলু, আমি সেদিন ভুল করেছিলাম। সেদিন আমার খুব অন্যায় হয়েছিল। তুমি আমাকে শোধরানোর সুযোগ দাও...একটিবার...।’

আমি হাসলাম। আমার অভিযোগের উত্তরে শুভদীপ প্রতিবাদ করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। আর শোধরানো! তার মানে বিয়ে? শুভদীপকে? কক্ষনো না। সুস্মিতার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। না, একটি বিশেষ অঙ্গ যে-জাতের একমাত্র মূলধন, সে-জাতের কোনও প্রাণীকে বিয়ে করার সাধ আমার নেই। তবে শরীরের চাহিদার ব্যাপারটা আলাদা।

অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। শুভদীপ রুমাল বের করে চোখ, গাল, কপাল মুছছিল বারবার। আর আমার চোখ জ্বালা করছিল, তলপেটে জ্বালা করছিল। স্মৃতিকণাকে আর টেবিলের ওপরে দেখতে পেলাম না।

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, সেই ঘটনার পর আমার মতো বিপন্ন অবস্থায় শুভ যদি কোনওদিন আমাকে ফোন করত! আমি হয়তো ওর মতোই এড়িয়ে যাওয়া কথাবার্তা বলতাম, তারপর ওকে ‘বর্ধমানের পিসির’ ভরসায় ছেড়ে দিতাম।

হঠাৎই খেয়াল করে দেখি শুভ কখন যেন আমার কাছে সরে এসে গায়ে-টায়ে হাত দিচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম, অপরাধবোধের খোলস ছেড়ে ধূর্ত নারীখাদকটা আবার বেরিয়ে এসেছে বাইরে। শীতের রাত, ঘরের দুটো দরজাই বন্ধ—এ-সুযোগ ছাড়ার কোনও মানে হয় না।

আমি মনে-মনে হাসলাম। ‘বর্ধমানের পিসির’ চেয়েও বড় শাস্তি ওকে আমি দিতে চাই। কিন্তু ওর তো সংসার আছে! একটা বউ আছে। নিশ্চয়ই সে আমার চেয়ে কমবয়েসি কোনও ফুটফুটে মেয়ে।

শুভ তখন আমার গা ঘেঁষে বসে পড়েছে। ওর অভিসারী হাতের গন্তব্যের কোনও বাছবিচার আর নেই। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ও বিড়বিড় করে বলছিল, ‘সুস্মিতাকে আমি ছেড়ে দেব। নকল বিয়েতে আমার আর কোনও সাধ নেই। আমার লিলুকে আমি খুঁজে পেয়ে গেছি। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমিই আমার শেষ ভালোবাসা। লিলু, লিলু...।’

লিলু, এ তুই কী করলি! লিলু, এ তুই কী করলি!

শুভদীপকে আমি আরও স্পষ্ট করে চিনতে পারছিলাম। বিশ বছরে ও বিশেষ শোধরায়নি।

ও আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল জোর করে। আমাকে জাপটে ধরে ওর একমাত্র মূলধন ঘষতে লাগল আমার শরীরে। আমার মুখে, গালে, ঠোঁটে, যেখানে সেখানে চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো। আমার ডায়মন্ডহারবারের দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেইসঙ্গে অসহায় মেয়েটার টেলিফোনের কথাও।

যখন ও প্রায় চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে, তখন ওকে থামালাম। ও স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিতে লাগল।

আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজ নয়—পরে। ফোনে বলে দেব।'

শুভদীপ আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষের চোখে আমাকে দেখল। হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল, 'কেন'?

আমি বললাম, 'এটা আমার ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলার ঘর। এটা তুকতাক-মারণ-উচাটন-বশীকরণের ঘর। এ-ঘরে আর সবকিছু আছে—শুধু ভালোবাসা নেই। আজ তুমি যাও—।'

শুভ যথেষ্ট আহত হল। কিন্তু আহত হলেও আমার কিছু করার ছিল না। নিজেকে তৈরি না করে ওর সঙ্গে কিছু করতে চাই না আমি।

'লিলু, কাল আসব?' ও আকুল গলায় জানতে চাইল।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'না, কাল নয়, পরশু। সময়টা পরে আমি বলে দেব।'

'কাল নয় কেন?' বাচ্চাদের মতো বায়না করল শুভ। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসলাম আমি। বললাম, 'অপেক্ষার আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না বলে—।'

বিশ বছর ধরে আমিও হয়তো অপেক্ষা করেছি। অপেক্ষার আনন্দ থেকে আমিও বঞ্চিত হতে চাই না।

অপ্রসন্ন মন নিয়ে শুভদীপ চলে গেল। আমি ওকে 'টা-টা' করে বিদায় জানালাম।

শুভদীপ চলে যাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত নানান বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। দেওয়ালের একেবারে নীচের তাক একটা প্রাচীন পুঁথির কপি বের করলাম। নেপালের দরবার পাঠাগারের একটি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পুঁথি 'গুহ্যসূত্র'—এটা তারই কপি।

পুঁথির পাতা উলটে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলাম, কাগজে নোট নিলাম। তারপর বের করে নিলাম আরও দুটি বই: 'গর্ভপ্রবেশ' ও 'সৃষ্টিশাস্ত্র'। সেগুলোর কয়েকটা বিশেষ পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে পড়ার পর পেয়ে গেলাম আমার আকাঙ্ক্ষিত সমাধান: বন্ধ্যা নারীর নিশ্চিত গর্ভসঞ্চারের হদিস। একবার এক মক্কেলের জন্যে এই টোটকা কাজে লাগিয়েছিলাম। তাতে ফলও পাওয়া গিয়েছিল।

এবারে আমার নিজের পালা।

একটা সাদা কাগজে যাবতীয় তথ্য-আচার লিখে নিতে লাগলাম :

মন্ত্র : 'ওঁ হ্‌ং গং নং ষং ফং সং খং মহাকাল ভৈরবায় নমঃ'

দু-চামচ মধু, এক চামচ পোস্ত, পোয়াটাক দুধ, তিল পরিমাণ আফিম ও ধুতুরার দুটি বিচি গুঁড়ো করে ভালো করে মিশিয়ে একটি শুচি কাচপাত্রে রাখবে। দ্রব্যটিকে শুষ্ক করে একটি কাকের পালক ও একটি প্যাঁচার পালক দিয়ে তিনবার করে স্পর্শ করবে। তারপর দ্রব্যটিকে উপরোক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করবে। অভিমন্ত্রিত করার সময় নীচের যন্ত্রটি অষ্টগন্ধের সাহায্যে ভূর্জপত্রে অঙ্কন করে চোখ বুজে বাঁ-হাতের অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করে রাখতে হবে। এই আচারের পর গর্ভকামী যুবতী দ্রব্যটি সেবন করবে এবং বীর্যবান পুরুষের সঙ্গে পূর্ণমিলনে লিপ্ত হবে। মিলনকালে মন্ত্রটি নিবিষ্টমনে জপ করবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।
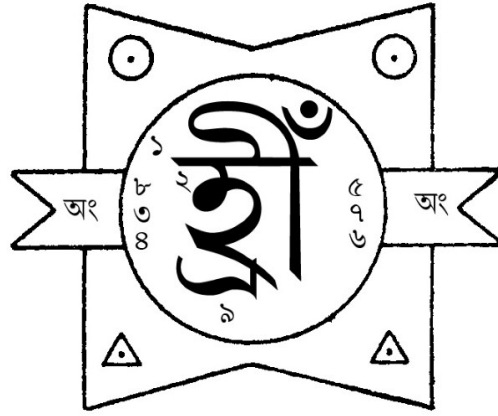
গর্ভসঞ্চার যন্ত্র

বইগুলোতে এর পরেও লেখা ছিল পুত্রসন্তান লাভের জন্য কী-কী নিয়ম মানতে হবে, আর কন্যাসন্তানের জন্যেই বা কী নিয়ম। সেসব আমার কোনও দরকার নেই। কারণ, আমি চাই কিছু একটা হোক—তা সে ছেলে, মেয়ে বা হিজড়ে যা-ই হোক, আমার কাজ চলে যাবে।

শুভদীপ এরপর যেদিন আসবে, সেদিন আমাকে তৈরি থাকতে হবে আগে থেকেই। মা-কে আর কাজের মেয়েটাকে দেশবন্ধু পার্কে ভাগবত পাঠ শুনতে পাঠিয়ে দেব, যাতে বাড়ি খালি থাকে। তারপর আমি, শুভ, আর অশুভ—শুধু এই তিন শক্তির খেলা।

পরদিন সকাল শুভদীপ ফোন করল।

‘লিলু, কেমন আছ?’

‘ভালো। তুমি?’

‘তোমার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছি—।’

‘আমিও বিশ বছর ধরে অপেক্ষা করেছি।’ হেসে ওকে বললাম।

‘আমিও। ডায়মন্ডহারবারের সেই দিনটার অ্যাকশন রিপ্লের জন্যে হন্যে হয়ে ওয়েট করছি।’ অন্যরকম ইঙ্গিত দিয়ে হাসল শুভ।

আমি হেসে বললাম, ‘অপেক্ষার আনন্দ টের পাচ্ছ?’

‘আনন্দ নয়, লিলু, যন্ত্রণা। আজ রাতে তোমার বাড়ি যাচ্ছি।’ জেদি গলায় বলল ও।

‘না, আজ নয়।’ ওর আশায় ঠান্ডা জল ঢেলে দিলাম আমি : ‘পরে বলব।’

এই কথা বলে টেলিফোন রেখে দিলাম।

সারাদিনে আমাকে মোট তিনবার ফোন করল ও। কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, ওর মাথা আর কাজ করছে না, শুধু শরীর কাজ করতে চাইছে।

আমি হাসলাম মনে-মনে। আপন মনেই বললাম, ‘ধৈর্য ধরো, বৎস, ধৈর্য ধরো।’

তারপর পরদিনও শুভদীপের ফোন এল। ফোন করেই ওর প্রথম প্রশ্ন, ‘কবে, লিলু?’

আমি হেসে বললাম, ‘আজ রাতে।’

ও আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। গদগদ গলায় বলল, ‘সোনামণি, আজ রাতে আর ছলনা কোরো না।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, ‘তুমি ঠিক রাত আটটায় এসো।’ হেসে আরও বললাম, ‘বাড়ি ফিরতে তোমার রাত হতে পারে—।’

ও উৎসাহী গলায় বলল, ‘নো প্রবলেম। আমার সঙ্গে গাড়ি থাকবে।’

সেদিন সন্ধে থেকেই তৈরি হওয়ার কাজ শুরু করলাম। বেশ টের পাচ্ছিলাম, ভেতরে-ভেতরে একটা উত্তেজনা ধীরে-ধীরে জানান দিচ্ছে।

ঠিক আটটার সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

সদর দরজা খুলতেই শুভদীপকে দেখতে পেলাম। আজও যথারীতি পাজামা, পাঞ্জাবি আর শাল, নাকে এল পারফিউম আর হুইস্কির গন্ধ।

‘লিলু, তোমার টানের কাছে তড়িৎ চুম্বকও হার মেনে যাবে।’ মজা করে বলল শুভদীপ।

বুঝতে পারছি, ওর দণ্ড চুম্বকের অবস্থা খুব খারাপ। তাই বললাম, ‘এসো, ভেতরে এসো—।’

‘ভেতরে ঢোকার জন্যে আমি ছটফট করছি—’ চোখ মটকে বলল ও। তারপর : ‘আমার কথাটার কিন্তু ডাবল মিনিং...।’

আমি হাসলাম। ওর জন্যে যে কী অপেক্ষা করে আছে তা যদি ও জানত! জানলে নির্ঘাত ও দৌড়ে পালাত এ-বাড়ির দরজা থেকে।

বাইরে ফুটপাথের লাইটপোস্টের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো কুকুর আকাশের দিকে মুখ তুলে মিহি সুরে কেঁদে উঠল। বোধহয় বেচারার শীত করছে।

আমি আবার ওকে ডাকলাম, 'এসো—।'

আমাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় শুভর বাঁ-হাত যেন অসাবধানে ঘষে গেল আমার বুকে। আমার ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে ও জড়ানো গলায় বলল, 'সুইট উইচ, আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ, লিলু।'

মনে পড়ে গেল, বিশ বছর আগে এক নির্বোধ অষ্টাদশী এই চারটে শব্দ শোনার জন্যে সমরখন্দ বোখারা দিয়ে দিতে পারত। দিতে পারত কেন, দিয়ে দিয়েছিল, আজ এই চারটে শব্দ চারটে লম্বা কালো শুঁয়োপোকার মতো আমার কানে কিলবিল করতে লাগল।

আমি সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম।

শুভ আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। বেপরোয়া আদর করতে লাগল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

আমি কোনওরকমে ওকে ভেতরে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেলাম। নীচু গলায় বললাম, 'বাড়িতে আর কেউ নেই।'

শুভ এক ঝটকায় ওর শালটা ছুড়ে দিল একটা চেয়ারের ওপরে। পাঞ্জাবিটাও খুলে ফেলল মসৃণভাবে। ওর পরনে শুধু স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা। শীতে গায়ে কাঁটা দিয়েছে।

ওর পাজামার দিকে লক্ষ করে বুঝলাম জ্বর বাড়ছে, থার্মোমিটারের পারা উঠছে।

বললাম, 'তুমি একটুও পালটাওনি, শুভ...।'

'আমি তোমার ক্রীতদাস, লিলু, তোমার দেখা পেয়ে অনেকগুলো পুরোনো ফুল ফুটে গেছে আমার পোড়ো বাগানে। তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা, তুমিই আমার শেষ ভালোবাসা। সুস্মিতাকে কাটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমি খুব সিরিয়াসলি ভাবছি।'

আমি তখন তৈরি করা 'দ্রব্যটির' কথা ভাবছিলাম। জিনিসটা বিছানার মাথার কাছে একটা টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। আমি সেটার দিকে হাত বাড়াতেই শুভ আমাকে জড়িয়ে ধরল আবার। বলল, 'আর্লি টু বেড...।'

আমি ওর বাঁধন ছাড়াতে-ছাড়াতে বললাম, 'এক মিনিট, প্লিজ, একটা ছোট কাজ বাকি আছে।'

একটা কাচের বাড়িতে জিনিসটা রেখেছিলাম আমি। ঢাকা তুলে কাচের বাটিটা হাতে নিলাম। তারপর চোখ বুজে মন্ত্রপূত ডেলাটা মুখে পুরে নিলাম। কোনওরকমে চিবিয়ে সেটা গোগ্রাসে গিলতে চেষ্টা করলাম।

শুভ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'ওটা কী খাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'এটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ। এটা খেলে বাচ্চা হওয়ার ভয় থাকে না।'

'লিলু, তুমি সত্যিই লাজবাব!' উৎফুল্ল হয়ে বলল শুভ।

আমি বাটিটা রেখে দিয়ে টেবিল থেকে জলের জাগ তুলে নিলাম। ঢকঢক করে জল খেয়ে কোনওরকমে গিলে ফেললাম জিনিসটা। মুখের বিস্বাদ ভাবটা কিছুতেই পুরোপুরি গেল না।

শুভ আর দেরি করতে পারল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো আদর করতে শুরু করল। আমার বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে সেই চারটে শুঁয়োপোকা ছেড়ে দিল বারবার।

আমার তলপেটে চিনচিনে ব্যথাটা হঠাৎই শুরু হয়ে গেল। গা গুলিয়ে উঠতে লাগল। চোখের সামনে হাইস্পিড চলচ্চিত্র ঝিলিক মেরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আর একটা সতেরো-আঠেরোর মেয়ে উবু হয়ে বসে ওর শরীরের ভেতরকার শরীর নষ্ট করার চেষ্টা করছিল।

আমার শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পেশাদার হাতে খুলে ফেলেছে শুভ। আমার নগ্ন শরীর দেখে ওর লালসাও যেন হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। ও বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ‘আটতিরিশে এই ফিগার! লিলু, তুমি সত্যি, না স্বপ্ন?’

ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও আমার কেমন লজ্জা করছিল। তাই অনেক কসরত করে বেডসুইচ টিপে ঘরের আলোর নিভিয়ে দিলাম। শুভদীপের তীব্র শক্তি আমাকে কাত করে ফেলে দিল বিছানায়। ও নিজের বাকি পোশাক খুলে এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিল।

এবং আমরা শুরু করলাম।

শুভ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। আমি ওকে চুমু খেলাম। ও পাগলের মতো আমাকে চটকাতে লাগল। আর বরাবর বলতে লাগল, ‘লিলু...লিলু...আমার লিলু...।’

বয়েস শুভদীপের আগ্রহ আর ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্রও ভোঁতা করতে পারেনি। ওর তাড়াহুড়োয় আমার ব্যথা লাগছিল, কিন্তু সব সহ্য করলাম। ও ছন্দে নড়তে লাগল! আর আমি নিবিষ্ট মনে গুপ্ত মন্ত্র জপ করে চললাম।

বিড়বিড় করে আমার মন্ত্র আওড়ানো শুনে শুভদীপ একটু ভুল বুঝল। ও ভাবল, আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের কেরামতির অহঙ্কারে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। খাটে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হতে লাগল।

একটু পরেই আমাকে আঁচড়েকামড়ে চিৎকার তুলে শুভদীপ খেলা শেষ করল। আমি কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ওর চরম তৃপ্তির ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম ক্লান্ত শরীরে। শুভ কয়েকটা ভালোবাসার চুমু এঁকে দিল এখানে সেখানে। তারপর উঠে বাথরুমে গেলাম। একটু পরে ফিরে এসে শাড়ি-জামাকাপড় পরতে শুরু করলাম।

শুভ বিছানায় বসে সিগারেট টানছিল। আমাকে দেখে আবেগ মাখানো গলায় বলল, ‘লিলু, নতুন করে আবার শুরু করা যায় না?’

আমি বিশ বছরের পুরোনো বমির গন্ধ পেলাম। একমনে শাড়ির কুচি ঠিক করতে লাগলাম। ওর প্রশ্নের কোনও জবাব দিলাম না।

‘তোমাকে তো কতবার করে বলছি কুড়ি বছর আগে আমি...আমি ভুল করেছিলাম... অন্যায় করেছিলাম। কিছুতেই কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না, লিলু?’

আমি শুধু হাসলাম। সেই মুহূর্তে বিশ বছরের পুরোনো রক্তের গন্ধ পেলাম। মাংস চিরে যাওয়ার যন্ত্রণা টের পেলাম।

তৈরি হয়ে নিয়ে ঘরের টিউবলাইটটা জ্বেলে দিলাম।

শুভদীপের মুখ কেমন বিবর্ণ লাগছিল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে চেয়ারে কাছে গেল। সিগারেটে শেষবারের মতো লম্বা টান দিয়ে ওটা ফেলার জায়গা খুঁজল। তারপর সেরকম

কিছু খুঁজে না পেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। মেঝেতে ঘষে ওটা নেভাল। তারপর চেয়ার থেকে ওর শালটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কাল কখন দেখা হচ্ছে?'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে তাড়া দিলাম, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। মা এখুনি চলে আসবে।'

'তোমার মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে না?'

'না। কারণ মা কে বলার মতো কোনও যোগ্য পরিচয় তোমার নেই। নাও, জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

ও পোশাক পরে নিতে শুরু করল। তারপর আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল: 'লিলু, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি মরে যাব।'

আমি হেসে বললাম, 'তাই? তা হলে ধরে নাও আর দেখা হবে না।'

শুভদীপ কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর রুক্ষভাবে বলল, 'তা হলে আমাকে এভাবে ডাকলে কেন? শুলে কেন? নাকি তোমাকে শোওয়ার টাকা দিতে হবে?'

আমার হাসি পেল। পুরোনো জানোয়ারটা বিশ বছরের পথ ডিঙিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

ওর থুতনিতে হাত দিয়ে বাচ্চা ছেলেকে আদর করার মতো করে নেড়ে দিলাম। বললাম, 'শুভ, লাখ টাকার প্রশ্ন করেছ তুমি। সত্যি, কেন যে তোমাকে আদর করে ডাকলাম, কেন যে শুলাম, তা যদি তুমি জানতে!'

আর কথা না বাড়িয়ে ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। যাওয়ার আগে ও নাছোড়বান্দার মতো বলল, 'কাল তোমাকে ফোন করব—।'

আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। দরজার কাছের আঁধারি জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলাম। আমি যা করেছি সেটা ঠিক, না ভুল? ন্যায় না অন্যায়?

বিশ বছর আগে ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব কে কষেছিল?

আমার গা ঘিনঘিন করছিল। তাই গ্যাস-স্টোভে গরম জল চাপিয়ে দিলাম। এক্ষুনি স্নান করতে হবে।

সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না।

পাগলের মতো কাঁদলাম। খোলা জানলা দিয়ে শীতের রাত দেখলাম, আকাশের তারা দেখলাম। এলোমেলো গান গাইলাম। শুভকে যা-তা গালিগালাজ করলাম। বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক কষ্ট হতে লাগল। বারবার ভাবতে লাগলাম, যা করতে চলেছি তা উচিত হবে কি না।

ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহটা দুলতে লাগল। মায়ের বুকফাটা হাহাকার শুনতে পেলাম। আর শূন্য বয়েসে চলে যাওয়া খুদে দস্যিটা চিৎকার করে আমাকে চৌচির করে দিতে লাগল।

আমার চোখের জল জমাট বেঁধে বরফের কুচি হয়ে গেল। না, শুভদীপকে ক্ষমা করা যায় না।

এইভাবে দোলাচলের মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর আমি অনেকটা শান্ত-স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। শুভদীপ পরপর চারদিন আমাকে ফোন করেছিল, কিন্তু আমি ঠান্ডা গলায় ওকে একই কথা বলেছি। আর মনে করিয়ে দিয়েছি সুস্মিতার কথা। ও তাতে খেপে উঠেছে পাগলের মতো। তারপর থেকে আমাকে ফোন করা বন্ধ করে দিয়েছে।

কিছুদিন পরেই বুঝলাম, 'গুহ্যসূত্র', 'গর্ভপ্রবেশ' ও 'সৃষ্টিশাস্ত্র'-এর নির্দেশ ব্যর্থ হয়নি।

আরও দু-মাস যেতে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম।

আমার হিসেব অনুযায়ী চার মাস সতেরো দিন পর উপযুক্ত সময় এল। শরীরে সব ক'টা প্রয়োজনীয় লক্ষণই নজরে পড়ল আমার। তখনই কাজ শুরু করলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় একটা গোটা রাত ছাগলের মতো ছটফট করলাম। ভীষণ জ্বর এল। রক্তপাতও হল। সকালবেলা রক্তমাখা কাপড় থেকে রক্তাক্ত সাতটা সুতো ছিঁড়ে নিলাম। সেগুলোকে পরিষ্কার একটা শিশিতে ছিপি এঁটে রেখে নিলাম। তারপর ব্যথা কমানোর দুটো ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

আমার মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তন মায়ের চোখ ধরা পড়েছিল। মায়ের চোখে নীরব প্রশ্ন থাকলেও মুখে কোনও নতুন কথা ছিল না। বিড়বিড় করে শুধু বলতে লাগল, 'তুই সাবধানে থাকিস। নিজের যত্ন নিস।'

ন'-দশ দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। শরীরে, মনে, জোর ফিরে পেলাম। তখন কাশী মিত্তির ঘাটের শ্মশানে গিয়ে দু-চিমটে ছাই আর খানিকটা মাটি নিয়ে এলাম।

একদিন রাতে আমি পুতুলটা তৈরি করতে বসলাম।

মাটি আর ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম শিরীষের আঠা আর খানিকটা সিঁদুর। তারপর বেশ মনোযোগ দিয়ে পুতুলটা তৈরি করলাম। হাত-পা-মাথা...সব। চোখের জায়গায় দুটো লাল পুঁতি বসিয়ে দিলাম।

পুতুলটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর রাতে স্নান সেরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উত্তরদিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসলাম। পুতুলটা দু-হাতে ধরে একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হে অন্ধকারের রাজা, প্রেতসিদ্ধ সম্রাট, শক্তি দাও। এই জড় পদার্থে তোমার তীব্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করো, প্রাণ সঞ্চার করো। শত্রুকে নাশ করো, অনুগতকে রক্ষা করো।

সাদা সরষে, কালো মরিচ আর ঘি দিয়ে একটা মণ্ড তৈরি করে রেখেছিলাম। সেটাতে আগুন দিয়ে হোম শুরু করলাম। তারপর পাশে রাখা একটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে শত্রুনাশের মন্ত্র জপ করতে লাগলাম। পুতুলটা তখন আমার অন্য হাতে স্থির।

'সর্ববাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরী।

এবমেব ত্বয়া কার্য্যসম্পদ বৈরী বিনাশনম।।'

জপ শেষ হলে বাঁ-হাতের অনামিকার নখ দিয়ে পুতুলটার তলপেট লম্বালম্বিভাবে চিরে দিলাম। উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম ছিপি আঁটা শিশিটা। একটা কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তমাখা

সুতোগুলো বের করে নিলাম। ওগুলো গুঁজে দিলাম পুতুলটার তলপেটে। তারপর ভালো করে টিপে-টিপে চেরা জায়গাটা বন্ধ করে মসৃণ করে দিলাম। পুতুলটার তলপেটে আর কোনও ক্ষতচিহ্ন রইল না।

পরপর দু-দিন আমি উপোস করলাম। তৃতীয় দিনে আমার সরঞ্জামের তাক থেকে শালিঞ্চ গাছের শুকনো শেকড় বের করে নিলাম। সেটা গুঁড়ো করে আমার নগ্ন দেহে ছড়িয়ে দিলাম। সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষের একটা ছোট্ট টুকরো জল দিয়ে গিলে ফেললাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। কারণ আজই সেই পবিত্র দিন। আজই শেষ হবে আমার কাজ।

সারাটা দিনে কতবার যে ঘড়ি দেখেছি মনে নেই! শেষে যখন রাত পৌনে বারোটা হল তখন ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

আজ শনিবার। পূর্ণিমার রাত। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল অন্ধকার ঘরে, আমার নগ্ন দেহে, আর পুতুলটার ওপরে।

একটু পরে উঠে বসে একটা ছোট পিঁড়ি নিলাম। পুতুলটাকে তার ওপরে বসিয়ে তার তিন দিকে তিনটে মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। তারপর একটা ছোট শিশি খুলে কয়েক ফোঁটা সুগন্ধি তেল ছিটিয়ে দিলাম পুতুলটার গায়ে। আর একটা ধূপকাঠি জ্বেলে দিলাম।

কপালে খানিকটা সিঁদুর আর কাজল মেখে আমি পুতুলটার সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসলাম। তারপর প্রার্থনা শুরু করলাম।

একটু পরেই আমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে কেউ যেন কাটাছেঁড়া করছে আমার ভেতরটা। নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে বারবার!

হে নিরাকার কৃষ্ণশক্তি! এসো, আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো। রক্তের ঋণ শোধ হোক রক্ত দিয়ে। হে দেবী! তোমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো। তোমার অনুগতকে আশীর্বাদ করো। শত্রুকে নাশ করো। হে নিরাকার অন্ধকারের রাজা! হে অন্ধকার তন্ত্রলোকের রানি! আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো।

যন্ত্রণায় আমার তলপেট ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করলাম। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। কিন্তু আমার আকুল প্রার্থনা চলতেই লাগল। সেই সঙ্গে বিধি অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণ।

সেই যন্ত্রণার মধ্যেই যেন দেখলাম, পুতুলটার হাত-পা নড়ে উঠল, কিলবিল করে উঠল।

হঠাৎই আমার শরীর এক বিচিত্র ক্লান্তি ও অবসাদে ছেয়ে গেল। ভীষণ ঘুম পেল আমার। আমি বিছানায় আবার শুয়ে পড়লাম। চাঁদের আলোয় আমার নগ্ন শরীর মাখামাখি হয়ে গেল।

তারপর ঘুমে আমার চোখ ঢুলে এল। সেই অবস্থাতেই দেখলাম, পুতুলটা যেন জীবন্ত হয়ে তীব্র লাল চোখে আমাকে দেখছে।

দিনের পর দিন যেতে লাগল। তলপেট ফুলে পুতুলটার রোগা-ভোগা চেহারা ক্রমে বেঢপ হয়ে উঠতে লাগল। একইসঙ্গে আমিও উলটোপালটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

স্বপ্নগুলো ধীরে-ধীরে দুঃস্বপ্নের চেহারা নিল। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে মন হাতড়ে শত চেষ্টাতেও সেগুলোকে আর খুঁজে পেলাম না। কোথা থেকে তিলতিল করে মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল। অবাক হলেও সন্দেহটা মন থেকে ঠেলে সরাতে পারলাম না। ওটা ক্রমে গাঢ় হতে লাগল।

আমি কাজটা ঠিক করছি তো? সত্যিই কি রক্ত দিয়েই শোধ করতে হয় রক্তের ঋণ?

মনে পড়ছে, শুভদীপ কেঁদেছিল। আমার দু-হাত চেপে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল বারবার। ভুল শোধরাতে চেয়েছিল অনুনয়ের সুরে। সত্যিই কি বিশ বছর আগের ব্যাপারটা ওর আকস্মিক ভুল? কে জানে, বিশ বছরে ও হয়তো সত্যিই বদলে গেছে। মানুষ তো বদলায়। মানুষই তো বদলায়! আমিই হয়তো জেদের বশে একটা ভুল করতে চলেছি। নিষ্ঠুর ভুল। যে-ভুল একবার হয়ে গেলে আর শোধরানো যায় না।

সুতরাং চরম ভুল করে বসার আগে একবার খোঁজ করে দেখতেই হবে।

কার্ডে লেখা শুভদীপের ঠিকানা নিয়ে একদিন দুপুরে সোজা চলে গেলাম ওর যোধপুর পার্কের বাড়িতে।

বাড়িটা খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না।

ওর বাড়ি দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। বড়লোকের বাড়ি কাকে বলে!

তিনতলা বাড়ি, সঙ্গে ছোট একটুকরো বাগান। বাড়ির দেওয়ালের নানা জায়গায়-মার্বেল পাথরের ডিজাইন। ছাদে টিভি অ্যানটেনা আর হাওয়া-মোরগ।

আমার চোখে সানগ্লাস। মাথায় রঙিন ছাতা। পিচের রাস্তা দুপুরের রোদে জ্বলছে।

শুভ নিশ্চয়ই এখন বাড়িতে নেই। অফিসে বা ফ্যাক্টরিতে গেছে। এই সুযোগে সুস্মিতার সঙ্গে একটু আলাপ করে নেওয়া যেতে পারে। তা হলেই বুঝতে পারব, শুভদীপ সত্যিই বদলে গেছে কি না।

বাড়ির কাছাকাছি গিলে লাল-সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম। বছর পঁচিশ বয়েস। স্বাস্থ্য মন্দ নয়। রঙ কালোর দিকেই, তবে মুখ-চোখ ভালো।

মেয়েটির কানে রুপোর দুল, আর নাকে রুপোর নাকছাবি। শাড়ির আঁচল ডানকাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে নেমেছে। দেখে কাজের লোক বলেই মনে হল।

ইশারা করে ডাকতেই মেয়েটি কাছে এল।

ওকে শুভদীপের কথা জিগ্যেস করলাম।

মেয়েটি হিন্দি মেশানো বাংলায় বলল যে, সাহেব বাড়ি নেই। ফ্যাক্টরিতে গেছে।

তখন আমি মেমসাহেবের কথা জিগ্যেস করলাম। বললাম, 'আমি সুস্মিতাজীর দোস্ত। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। শ্যামবাজারে থাকি—।'

মেয়েটির চোখে আচমকা জল এসে গেল। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিয়ে বলল, 'আপনি জানেন না, বড় মেমসাব খুদকুশি করেছে! এই তো করিব এক মাহিনা হল।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। খুদকুশি! আত্মহত্যা!

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিলাম।

তারপর জিগ্যেস করলাম, 'কেন, সুইসাইড করল কেন? এরকম ভালো স্বামী, যার এত পয়সা, শান-শওকত, সে কেন হঠাৎ সুইসাইড করতে যাবে!'

তখন কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি যা বলল তার সারাংশ এই:

সুস্মিতাজীর পতি মোটেই ভালো লোক নয়। বাড়িতে বসে সবসময় মদ খায়। উলটোপালটা আওরত ইয়ার-দোস্ত দিয়ে আসে। রোজ বিবির সঙ্গে হুজ্জুতি করত। অথচ বড় মেমসাহেবের পয়সাতেই তার এত বোলবোলা, দুটো বাড়ি, দুটো গাড়ি, ফ্যাক্টরি, অফিস—কী নেই! সুস্মিতাজীর মতো মালকিন হয় না— এত ভালো ছিল। লেকিন সবই তকদীর! অনেক সহ্য করেছিল, শেষ পর্যন্ত আর পারল না।

আমি ভেতরে-ভেতরে পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। আর সেইসঙ্গে স্বস্তিও পাচ্ছিলাম। তা হলে ভুল আমার হয়নি!

ওকে জিগ্যেস করলাম, সুস্মিতাজী কীভাবে খুদকুশি করেছে।

মেয়েটি ভাঙা গলায় জানাল যে, বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বড় মেমসাব তার হাত-পায়ের শিরা ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে। অনেক খুন বেরিয়েছিল। সাহেব তখন বাড়ি ছিল না। কোম্পানির কী একটা কাজে দিল্লি গিয়েছিল। চিৎকার চেঁচামেচি করে দরজা ভেঙে সবাই সুস্মিতাকে দেখতে পায়। থইথই রক্তের মধ্যে মেমসাব পড়ে ছিল।

ওঃ! সেই রক্ত! কিছুই তা হলে পালটায়নি! শুধু আমিই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু সুস্মিতার সুইসাইডের ব্যাপারটা শুভদীপ আমাকে ফোন করে জানাল না কেন! এটা তো ওর রাহুমুক্তির সুখবর! নাকি ওর কোনও মতলব ছিল? কয়েকমাস পর সব থিতিয়ে গেলে তারপর কি ও খবরটা আমাকে জানাবে? তারপর হ্যাংলার মতো আবার বলবে, 'লিলু, নতুন করে সবকিছু আবার শুরু করা যায় না?'

না, সবকিছু আর শুরু করা যায় না। এখন শেষ করার সময়।

ওঃ! শুভ তা হলে সেই শুভই আছে! আগাপাস্তলা নিখুঁত জানোয়ার!

সুস্মিতার জন্যে আমার কান্না পেল। তলপেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

মেয়েটিকে বললাম, 'সাহেব বাড়ি ফিরলে এত সব কথা বলার দরকার নেই। শুধু বলবে, আমি খোঁজ করতে এসেছিলাম।'

'আপনার নাম?'

'বলবে শ্যামবাজারওয়ালি মেমসাব। তা হলেই তোমার সাহেব বুঝতে পারবেন।'

'এখানে নওকরি করতে আমার আর মন লাগে না, দিদি...।' মেয়েটি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল।

আমি ঠান্ডা সুরে জবাব দিলাম, 'কে করতে বলেছে! ছেড়ে দাও চাকরি।'

শুভদীপের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পথে গনগনে রোদ্দুর আমার মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল। নাকে রক্তের আঁশটে গন্ধ পেলাম।

গন্ধটা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত আমার নাকে লেগে রইল।

পরদিন সন্ধে নাগাদ শুভদীপকে ফোন করলাম আমি।

টেলিফোনে আমার গলা পেয়ে ও একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'লিলু, কাল তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ—।'

'আমি ঠিকই আন্দাজ করেছি, তবে ভয়ে তোমাকে ফোন করিনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'লিলু, থ্যাঙ্ক গড যে তোমার রাগ পড়েছে। আমি হয়তো তোমাকে দু-এক সপ্তাহ পর ফোন করতাম।'

'কেন, সুস্মিতা সুইসাইড করেছে এই খবরটা আরও থিতিয়ে গেলে তারপর আমাকে জানাতে?' আমি নির্লিপ্তভাবে বললাম।

'ওঃ, লিলু! সবসময় তুমি এত মারমুখী হয়ে থাকো কেন বলো তো?' গলায় সুর অন্তরঙ্গ করে ও বলল, 'কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলো—খুব জরুরি কথাবার্তা আছে।' কথা শেষ করার আগেই হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল শুভ।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী হল!'

'ও কিছু নয়...।' আবার সেই একইরকম শব্দ। তারপর: 'কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলো। অনেক জরুরি কথা আছে।'

'আমারও তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথা আছে। আজ রাত আটটার সময় তুমি আমার বাড়িতে আসবে?'

'ন-না। তার চেয়ে বরং তুমি আমার বাড়িতে এসো।' শুভদীপ কাহিল সুরে বলল, 'আমার শরীর ভালো নেই।'

'তোমারও তা হলে শরীর খারাপ হয়!' আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'আমার কথাটার ডাবল মিনিং আছে কিন্তু—।'

'আঃ, লিলু, প্লিজ, ঠাট্টা কোরো না। আমার শরীরটা ভালো নেই। তুমি রাত আটটার চলে এসো। তুমি এলে কোনও প্রবলেম হবে না।' দোতলার দক্ষিণ দিকটায় আমি থাকি।

আমি হাসলাম। বললাম, 'প্রবলেম কী করে হবে! প্রবলেম তো সুইসাইড করেছে!'

হেঁচকি তোলার মতো শব্দ শোনা গেল আবার। শুভ বলল, লিলু, প্লিজ, রাত আটটায় এসো কিন্তু। এখন রাখছি—।'

রাত আটটায় ওর বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রচণ্ড গুমোট কেটে গিয়ে বাতাস বইতে শুরু করেছে। ওদের বাগানের গাছের পাতা শব্দ করে এপাশ-ওপাশ দুলছে। আকাশে তারা ফুটেছে বটে, তবে চাঁদ খানিকটা মেঘে ঢাকা।

এক অচেনা বিষণ্ণতা ছেয়ে যাচ্ছিল আমার মনে। শুভদীপের ওপরে মনটা নরম হয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল সুস্মিতার কথা, বিশ বছর আগেকার কথা, আর বেঢপ নগ্ন পুতুলটার কথা।

কলিংবেল বাজাতেই গতকালের শ্যামলা মেয়েটি দরজা খুলে দিল। আমাকে সানগ্লাস ছাড়া দেখেও ও সহজে চিনতে পারল। বলল, 'বড়সাহেব দোতলার ঘরে আছে। সাহেবকে কাল বলেছি, আপনি এসেছিলেন।'

আমি হেসে ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে। তারপর এগিয়ে গেলাম দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে।

দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় শুভদীপ ছিল। বিছানায় কাত হয়ে বসে টিভি দেখছিল। আমাকে দেখেই রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে টিভি অফ করে দিল। সোজা হয়ে উঠে বসতে-বসতে ক্লিষ্ট হাসল। বলল, 'আরে, এসো এসো...বোসো...।'

আমি টিভির প্লাগ পয়েন্টের সুইচটা অফ করে দিলাম। ঘরের ভেতরটায় একপলক চোখ বুলিয়ে নিলাম।

সর্বত্র বড়লোকী ছাপ। সবকিছুই সাজানো ফিটফাট।

আমি শুভদীপকে খুঁটিয়ে দেখলাম। প্রায় পাঁচ মাস পর ওকে আমি দেখছি। এর মধ্যে ও তেমন কিছু একটা পালটায়নি। অন্তত ওর বাইরেটা পালটায়নি।

কিন্তু ওর ভেতরটা যে পালটে যাচ্ছে সে-খবর আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে!

আমি একটা শৌখিন মোড়া টেনে নিয়ে ওর বিছানার কাছে বসলাম। ওর মুখে ক্লান্তি শ্রান্তির পাণ্ডুর ছাপ।

'শুভ, তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলার আছে—।'

শুভ হেসে বলল, 'তোমার মাত্র কয়েকটা কথা বলার আছে? আর আমার তোমাকে অনেক কথা বলার আছে।'

কথা শেষ করেই ও হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করল। জোর করে ঢোক গিলে গলা দিয়ে উঠে আসা কোনও জিনিসকে রুখে দিল।

'শুভ, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো—।'

ও আমাকে প্রায় বাধা দিয়ে বলল, 'ভাবতেই পারছি না, তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার বেডরুমে বসে গল্প করছ!'

ঠান্ডা গলায় বললাম, 'আরও অনেক কিছুই তুমি ভাবতে পারবে না।'

হঠাৎই ও পেট খামচে ধরল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। তারপর আমার দিকে একটু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি ঘরে বসেই ওর বমি করার শব্দ শুনতে পেলাম।

একটু পরেই ও মুখ-টুখ ধুয়ে ফিরে এল। ক্লান্ত পা ফেলে বিছানায় গিয়ে বসল।

'কী, তোমার শরীর খারাপ না কি?'

'হ্যাঁ, কয়েক মাস ধরেই এরকম হঠাৎ-হঠাৎ পেট ব্যথা করছে, বমি পাচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। একটু পরেই আবার সব ঠিকঠাক । কী যে হয়েছে কিছু বুঝতেই পারছি না। ডাক্তার দেখিয়েছি। বলছে, কিছু হয়নি। হয়তো নতুন টাইপের কোনও ভাইরাল ইনফেকশান। কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়েছে, কিন্তু তাতে...।'

বুঝলাম, কাজ শুরু হয়েছে। আর কেউ এই শরীর খারাপের রহস্য বুঝতে পারবে না।

আমি নিষ্ঠুর হেসে বললাম, 'ডাক্তার দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার কী হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি।'

শুভ যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে অবাক চোখে আমাকে দেখল: 'তুমি আমাকে ভালো করে দাও, লিলু।'

'এখন ভগবানও তোমাকে ভালো করতে পারবে না। শোনো, শুভ, কাল আমি এ-বাড়িতে এসেছিলাম। সুস্মিতার কথা সব শুনেছি।'

'কে বলেছে? আশা?'

'আশা কি ভালোবাসা, কী নাম আমি জানি না—তবে তোমাদের কাজের মেয়েটিই সব বলেছে।'

শুভদীপ বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'সুস্মিতা নিজের দোষে মরেছে। ওর মাথার দোষ ছিল।'

'হ্যাঁ, মাথার দোষ তো ছিলই, নইলে তোমার মতো পাবলিককে বিয়ে করে! যাকগে, এবার জরুরি কথাগুলো শোনো—।'

ওকে মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারগুলো খুলে বললাম।

শুভদীপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল: 'লিলু, আমার কাছে উইচও যা, স্যান্ডউইচও তাই। তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, একটুও ঠাট্টা করছি না। তোমাকে তো আগেও বলেছি, আমি কী করে দিন চালাই। আর আমার বাড়িতে গিয়ে তুমি তুকতাকের জিনিসপত্রও দেখেছ—।'

শুভ ওর তলপেটে হাত বোলাতে লাগল। একটা বালিশ কোলে টেনে নিয়ে আরাম করে বসতে চাইল।

ওকে বললাম, 'শুয়ে পড়ো, তা হলে আরাম পাবে।'

ও কী ভেবে সত্যিই খাটের মাথার দিকটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক ঠেলে।

তখন ওকে পুতুলটার কথা বললাম।

ও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

নিস্তব্ধতা আমাদের ডুবিয়ে দিল।

তারপর ও হঠাৎ উঠে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'তুকতাক, মারণ, উচাটন—তন্ত্রমন্ত্র! হুঁঃ! এসব বুজরুকি যারা বিশ্বাস করে তারাই ওতে ভয় পায়। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।'

আচমকা ওয়াক তুলল শুভদীপ। মুখ কুঁচকে গেল ওর। জোর করে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল।

'কিন্তু আমি ওসবে বিশ্বাস করি, শুভ। আর অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করাই। ক'-মাস ধরে তোমার গা-বমি, পেট ব্যথা, গা-ব্যথা, সব কি মিথ্যে? অবশ্য পুতুলটার কথা তখন তুমি জানতে না।'

'ওসব কাকতালীয় ব্যাপার।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ও বলল।

আমি মোড়া থেকে উঠে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ওর একটা হাত ধরলাম। নরম গলায় বললাম, ‘শুভ, আজ শুধু তোমাকে সত্যি কথাই বলব। আর ক’-দিন পরেই এসব তন্ত্রমন্ত্রে তুমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। কারণ, বাচ্চাটা তখন নড়বে-চড়বে, হাত-পা ছুড়বে—তুমি নিশ্চয়ই টের পাবে।’

এক ঝটকায় আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিল শুভ। সিগারেটের শেষ টান দিয়ে গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে।

এমন সময় আশা আমার জন্যে জলখাবারের ট্রে নিয়ে এল। একটা টি-টেবিলে মিষ্টির প্লেট, চা-বিস্কুট ইত্যাদি সাজিয়ে দিয়ে ও চলে গেল।

ও চলে যেতেই শুভদীপ চেঁচিয়ে বলল, ‘তোমার ওসব নোংরা কথা আমি শুনতে চাই না। আমার গা ঘিনঘিন করছে। তুমি চটপট এগুলো খেয়ে চলে যাও...প্লিজ...।’

আমি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা মিষ্টি মুখে দিলাম। সেটা খেতে-খেতে হাসলাম, বললাম, ‘বিশ বছর আগে আমিও ঠিক এইরকম হাত-পা ছোড়া নড়াচড়া টের পেয়েছিলাম। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, বাচ্চার বদলে...।’

‘তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরোও! এই মুহূর্তে।’ রাগে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল শুভ। ও বিছানা থেকে নেমে এক পা এগিয়ে এল আমার দিকে।

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, ‘আর এগিয়ো না। আমাকে সুস্মিতা পাওনি। একটু বেচাল দেখলেই তোমার হাল আরও খারাপ করে ছাড়ব।’

বেশ বুঝতে পারছিলাম, শুভদীপের চোখ ওর দেখা লীলাকে আর একটুও চিনতে পারছিল না।

‘তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও!’ হুমকি দিয়ে বলল ও।

‘হ্যাঁ, যাব। এ সময়ে তোমার বিশ্রাম দরকার।’

‘আউট! কোনও কথা আমি শুনতে চাই না! আউট!’ আঙুল তুলে ও দরজা দেখিয়ে দিল আমাকে।

আর-একটা মিষ্টি নিয়ে মুখে দিলাম আমি। আজ তো মিষ্টিমুখ করারই দিন!

লক্ষ করলাম, শুভর চুল এলোমেলো, দু-চোখে ভয়।

আমি দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পুতুলটার সব কথা ওকে বলা দরকার।

‘একটা কথা তোমাকে এখনও বলিনি—।’

‘তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।’

‘চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই, শুভ। শোনো। পুতুলটা হচ্ছে অনেকটা অর্ধনারীশ্বর। ওটার ওপরের পোরশানটা মেয়ে, আর নীচের পোরশানটা ছেলে—।’

শুভ বিভ্রান্ত নজরে দেখতে লাগল আমাকে। আমার কথা ও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

‘পুতুলটার পক্ষে মা হওয়া কী কষ্টের এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ঠিক একইরকম কষ্ট তোমারও হবে।’

শুভদীপ থম মেরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা এখনও ওর কাছে বোধহয় স্পষ্ট হয়নি। পরে বুঝবে। দশ মাস দশ দিন যখন পূর্ণ হবে।

ওকে একটা চুমু ছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলাম।

ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার পা কাঁপছিল, মাথা টলে যেতে চাইছিল।

জ্বালাধরা চোখ নিয়ে আমি স্মৃতিকণাকে দেখতে পেলাম। আমার পাশে-পাশে নাচতে-নাচতে চলেছে। তীব্র উল্লাসের নাচ।

শুনতে পেলাম, বাবা কপাল চাপড়ে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে।

মা জলভরা চোখে আমার সামনে এসে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'লীলা, এ তুই কী করলি!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'বেশ করেছি! এতদিনে বিশ বছরের ঋণ শোধ হল।'

অন্ধকার পিচের রাস্তা থেকে তাপ উঠছিল। বাড়ি ফিরে আমাকে স্নান করতে হবে।

এমন সময় পেছন থেকে শুভদীপের বুক-ফাটা চিৎকার শুতে পেলাম—যন্ত্রণা আর আতঙ্কের চিৎকার। সে-চিৎকারে বুক কেঁপে ওঠে।

হঠাৎই মনে হল, চিৎকারটা বোধহয় আমার কল্পনা।

কারণ, এখনও তো দশ মাস দশ দিন হয়নি।

অপরূপ অন্ধকার

বিশ্বনাথকে গোপন খবরটা দিয়েছিলেন ওঁরই বন্ধু সন্দীপন।

তবে সেটা মোটেই সহজে দেননি। ওঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক চাপাচাপি করতে হয়েছিল, সঙ্গে ঘুষ দিতে হয়েছিল এক প্যাকেট বিদেশি সিগারেট। তারপর একটু-একটু করে ব্যাপারটা ফাঁস করেছিলেন সন্দীপন।

ফাঁস করেছিলেন আরও একটা কারণে। বিশ্বনাথের রোজকার হেনস্থার কথা শুনে সন্দীপনের মনটা নরম হয়েছিল। বন্ধুর দুঃখ-কষ্ট দাগ কেটেছিল মনে। তাই গোপন কথাটা আর গোপন রাখতে পারেননি।

শুনে থ' হয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। এরকমটাও হয়।

'হয় মানে!' চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, সন্দীপন, 'হচ্ছে! এই তো আমি জলজ্যান্ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তারপরেও তুমি অবিশ্বাস করবে?'

না, শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে পারেননি বিশ্বনাথ। কিন্তু অভিনব ধাক্কাটা সামলাতে সময় লেগেছিল। আর সেই বেসামাল অবস্থাতেই একটা গোপন ইচ্ছে মনের জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল।

সন্দীপনকে আর কিছু বলেননি বিশ্বনাথ। শুধু একটা ঝিম ধরা ভাব নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

সেদিন রাতে ছেলের বউ পারমিতা যখন ওঁর সামনে খাবারের থালা রেখে দিয়ে চলে গেল তখন বিশ্বনাথ বিরক্ত হতেও ভুলে গেলেন। সন্দীপনের কথাগুলো ওঁকে এমনই মশগুল করে রেখেছিল।

খানিকক্ষণ পর খেয়াল হতেই থালায় সাজানো পদগুলো দেখতে পেলেন। তিনটে রুটি, বেগুনপোড়া, একটা সবজি, আর একটা ছোট্ট বাটিতে দই।

ওঁর মতো ষাট পেরোনো বৃদ্ধের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে এই ধরনের মেনুই নাকি ডাক্তারের পরামর্শ।

বিশ্বনাথের মনে হল, পাশেই ডাইনিং স্পেসে গিয়ে পারমিতা আর আলোকের পাতটা দেখে আসেন। ডাক্তাররা কোন ধরনের মেনু সাজেস্ট করেছেন বত্রিশ আর সাতাশের স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর ডাইনিং স্পেসের পাশের বারান্দায় গিয়ে দেখে আসেন, আলোকের পোশা অ্যালসেশিয়ান ভিক্টরের জন্য কোন মেনু বরাদ্দ হয়েছে।

স্ত্রী রেণুকণা বেঁচে থাকলে বলতেন, 'ছেড়ে দাও! এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কিছু বোলো না। সবাই তোমাকে ছোট ভাববে। তার চেয়ে বরং একটু না হয় স্যাক্রিফাইস করলে...।'

স্যাক্রিফাইস! আলোক আর পারমিতা জানে এই শব্দটার মানে?

রেণুকথার কথা মনে পড়তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের জমাট অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে এল বাইরে।

দীর্ঘশ্বাসের আর দোষ কী! রেণুকথা চলে যাওয়ার পর গত পাঁচ বছর ধরে এটা বিশ্বনাথের গা সওয়া হয়ে গেছে।

বেশ মনে পড়ে, আলোকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়া ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ও কলেজ থেকে বি. এসসি. পাশ করে বেরোনোর পর-পর।

এমনিতে ছোটবেলা থেকেই ও বেশ আদরে-আদরে মানুষ হয়েছে—একমাত্র সন্তান হলে সাধারণত যেমনটা হয়। তবে ও যতই বড় হয়েছে ওর মধ্যে জেদ আর স্বার্থপর ভাব ততই মাথাচাড়া দিয়েছে।

বিশ্বনাথ ব্যাপারটা ভীষণ অপছন্দ করতে শুরু করেছিলেন।

রেণুকথা আলোককে যেমন স্নেহ করতেন, তেমন শাসনও করতেন। তবে দুটোর মাত্রা বোধহয় সঠিক অনুপাতে ছিল না। অথবা বোধহয় ভাবতেন, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হয়নি।

আলোকের সঙ্গে যেদিন বিশ্বনাথের প্রথম সরাসরি সংঘর্ষ বাধে সেদিনটা বিশ্বনাথ ভোলেননি। কারণ, দিনটা ছিল আলোকের জন্মদিন। তখন ও থার্ড ইয়ারে পড়ে।

বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করেছিল আলোক। আর ভ্যাপসা গরমের মধ্যে সারাটা দিন ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাত পুড়িয়ে ছ'-সাত পদ রান্না করেছিল রেণুকথা। ফ্রায়েড রাইস, চাইনিজ আলুর দম, চিনি চিকেন, আরও কত কী!

জন্মদিন আসার দিনসাতেক আগে থেকেই মায়ের কাছে বায়না করেছিল আলোক। বলেছিল, 'মা, কলেজে এবারই আমাদের লাস্ট ইয়ার—এরপর বন্ধুরা কে কোথায় ছিটকে যাবে। এবারের বার্থডেটা একটু জোরদার করতে হবে। আমার খুব ক্লোজ পাঁচ-ছ'জন বন্ধুকে সেদিন নেমন্তন্ন করব—রাতে এখানে খেতে বলব।'

রেণুকথা হেসে রাজি হয়েছিলেন। কারণ, আলোকের সেই কোন সাত বছর বয়েসে বেশ ঘটা করে ওর জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রায় সব বছরেই শুধু ওরা তিনজন। আর রেণুকণার হাতে তৈরি পায়েস, সঙ্গে মাংস, কিংবা চিংড়ি মাছের মালাইকারি।

তাই সেবার খাওয়াদাওয়ার আয়োজনটা ভালোই হয়েছিল। বিশ্বনাথ নিজের হাতে চুটিয়ে বাজার করেছিলেন।

সন্ধেবেলা আলোকের পাঁচজন বন্ধু এসে হাজির হল। তিনজন ছেলে, দুজন মেয়ে। ওদের পোশাক বেশ আধুনিক ফিটফাট। চেহারাও টগবগে, তরতাজা। মুখে হাসি লেগেই আছে। আর হাতে গিফটের প্যাকেট।

বিশ্বনাথ আর রেণুকণার সঙ্গে বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিল আলোক। ওরা সবাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করল।

বিশ্বনাথের ব্যাপারটা ভালো লেগেছিল। যদিও যুগ এখন অনেক এগিয়ে গেছে, চারপাশটা অনেক আধুনিক, তা সত্ত্বেও এই সেকেলে অভ্যাসটা বিশ্বনাথকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

সারা সন্ধে ধরে আলোকের ঘরে ওরা হুইহুল্লোড় করল। সাউন্ড সিস্টেমে চড়া আওয়াজে গান বাজিয়ে নাচল। গোটা ফ্ল্যাটে আনন্দ আর খুশির পাগলা হাওয়া উদ্দামভাবে ছুটে বেড়াতে লাগল।

পাশের ঘরে বসে বিশ্বনাথ আর রেণুকণা উৎসবের এই মেজাজটা বেশ ভালোই উপভোগ করছিলেন। কয়েকটা গানের সঙ্গে রেণুকথা গুনগুন করে গলাও মেলাচ্ছিলেন।

বিশ্বনাথের বয়েসটাও পিছিয়ে যাচ্ছিল দ্রুতবেগে। তিনি রেণুর হাত চেপে ধরে একটা গোপন ইশারা করলেন, তারপর হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

কিন্তু রাতের খাওয়াদাওয়ার পরেও ওদের হুইহুল্লোড় চলতে লাগল।

বিশ্বনাথের ভুরু কুঁচকে গেলেও ব্যাপারটা অতটা গায়ে মাখেননি। শুধু ঘড়ির কাঁটা দশটা পার হতেই রেণুকণাকে বললেন, 'দশটা বেজে গেছে...এখনও এরকম শোরগোল হচ্ছে...আশপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন এবার মাইন্ড করতে পারে...।'

রেণু বললেন, 'তুমি গিয়ে একবার আলোকে বলো না...।'

বিশ্বনাথ বেঁকে বসলেন। রেণুকণাকেই বললেন দায়িত্বটা নিতে। কিন্তু রেণুও গাঁইগুঁই করে বিশ্বনাথের কোর্টে বল পাঠাতে চাইলেন।

এইভাবে বেশ কয়েকবার বল চালাচালির পর বিশ্বনাথ হেরে গেলেন। ব্যাজার মুখে উঠে দাঁড়ালেন। রওনা হলেন আলোকের ঘরের দিকে।

ওর ঘরে যেতে-যেতে মনে-মনে রিহার্সাল দিচ্ছিলেন বিশ্বনাথ। ঠিক কীভাবে কথাটা বলবেন আলোকে? ঘরের বাইরে ইশারায় ডেকে নেবেন? তারপর চাপা গলায় বলবেন, 'আলো, রাত হয়েছে—এবার বন্ধুদের বাড়ি যেতে বলো।'

নাঃ, এটা একটু শাসনের মতো শোনাচ্ছে। ছেলে বড় হয়েছে। ওর ইগো এতে হার্ট হতে পারে।

তার চেয়ে এরকম করে বললে হয়: 'আলো, সাউন্ড সিস্টেমের আওয়াজটা একটু আস্তে করে দাও। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন হয়তো ডিসটার্বড হচ্ছে...।'

হ্যাঁ, এটা অনেক বেটার। এ-কথা বলে আলোক মোটেই বিশ্বনাথের ওপরে রাগ করবে না।

সুতরাং রিহার্সাল দেওয়া সংলাপটা একরকম মুখস্থ করে বিশ্বনাথ আলোকের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের বাইরের বারান্দার আলোটা নেভানো ছিল। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের আলো আর শব্দ চলকে পড়ছে বাইরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ইশারা করে ডাকার জন্য আলোর এলাকায় মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন বিশ্বনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর ভেতরকার ছন্দ-তাল সব গরমিল হয়ে গেল।

কারণ, যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

মিউজিক সিস্টেমের ঝংকারের তালে-তালে ছ'টা ছেলেমেয়ে উদ্দামভাবে নাচছে। মেঝেতে ওদের এলোমেলো পা ফেলার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছিল, পায়ের সঙ্গে মাথার তেমন সুষম যোগযোগ নেই।

আলোককে দুপাশ থেকে ধরে রেখেছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি রোগা, লম্বা, থুতনিতে এক চিলতে দাড়ি। আর মেয়েটি মাথায় খাটো, ফরসা মুখের দুপাশে কোঁকড়া চুলের ঢল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, গায়ে লাল রঙের থ্রি-কোয়ার্টার হাতা টপ, পায়ে স্কিন-টাইট জিনস।

আলোককে ওরা ধরে রেখেছে কারণ আলোক ঠিকঠাক অবস্থায় নেই। ও চোখ বুজে জিভটা লম্বা করে বাইরে বের করে রেখেছে। আর ওর জিভের সামনে লকলক করছে ছোট্ট একটা সবুজ সাপ। সাপটাকে আলোকের জিভের কাছাকাছি ধরে রেখেছে কালো মতন কদমছাঁট চুল একটি ছেলে। ছেলেটির চুলের ডানপাশটা সাপটার মতোই সবুজ। আর হাতে চামড়ার দস্তানা।

বেসামাল নাচের তালে-তালে আলোকের জিভ এপাশ-ওপাশ সরে যাচ্ছিল। আর সাপটাও জিভের নিশানা ঠিক রাখতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছিল।

বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মতো সবুজ হিলহিলে সাপটা আলোকের জিভে ছোবল মারল।

ছোবল এসে পড়ল বিশ্বনাথের বুকেও। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ভেজা কাপড় নিংড়ানোর মতো ওঁর হৃৎপিণ্ডটা অমানুষিক শক্তিতে মোচড় দিচ্ছিল কেউ, আর টপটপ করে রক্ত ঝরছিল।

পৃথিবীর যত বয়েস বাড়ছে ততই সে আধুনিক হয়ে উঠছে। পৃথিবীর বয়েস আসলে যেন কমছে। কিন্তু বিশ্বনাথের বুকের ভেতরটা হুহু করছিল।

একটু-আধটু নেশা করা হয়তো দোষের নয়। কিন্তু তাই বলে সাপের ছোবল!

ছোবলটা জিভে পড়ার পরই পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল আলোক। ওর শরীরটা বেপরোয়াভাবে ছটফট করতে লাগল। ব্যাপারটা যন্ত্রণার না আনন্দের সেটা আলোকের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বুঝতে চাইলেন বিশ্বনাথ। কিন্তু পারলেন না।

শুধু দেখলেন, আলোকের দুপাশের ছেলেটা আর মেয়েটা শক্ত করে আলোককে চেপে ধরে আছে। আর আলোকের ঠোঁটের কোণ থেকে লালা ঝরছে। একটা তৃপ্তির গোঙানিও যেন শোনা যাচ্ছে ওর মুখ থেকে।

ভাঙা বুক নিয়ে সরে এসেছিলেন বিশ্বনাথ। অন্ধকার বারান্দায় শুরু হয়ে গিয়েছিল ওঁর নতুন রিহার্সাল। রেণুকণাকে গিয়ে এখন কী বলবেন? বলবেন সাপের ছোবলের কথা? রেণুকণার সমস্ত আনন্দ আর সুখ শেষ করে দেবেন এক ছোবলে?

না, বিশ্বনাথ সেটা পারেননি। ফিরে এসে মিথ্যে কথা বলেছিলেন স্ত্রীকে: 'আলো বলল, একটু পরেই ওরা চলে যাবে...।'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার সেই শুরু।

রেণুকণা বিশ্বনাথের কাছ থেকে আলোককে আড়াল করেছেন। আর বিশ্বনাথ পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে আলোর কালো দিকগুলো লুকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

এইভাবে দুজনে গোপনে সাপের ছোবল খেয়ে চলেছেন বরাবর।

সময় বদলে যাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আলোকও। কিন্তু বিশ্বনাথ আর রেণুকণা নিজেদের বদলে ফেলতে পারছিলেন না মোটেই। যখনই ওরা শক্ত হয়ে কোনও একটা রুক্ষ সিদ্ধান্তের কথা ভাবছিলেন, তখনই ম্যাজিকের মতো ছোট্টবেলার আলোক হাসিমুখে আধো-আধো কথা নিয়ে ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। আর সেই স্নেহের তাপে বরফের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত গলে জল হয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে।

শেষ পর্যন্ত ওঁরা আড়ালে শুধু চোখের জল ফেলেছেন।

আলোক বড় হয়ে উঠছিল আর চারপাশের উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে দিব্যি নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছিল।

ওকে ব্যবসা করার জন্য টাকা দিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। সে-টাকা নষ্ট হলেও কোনও প্রশ্ন করেননি ছেলেকে—কোনও জবাবদিহি চাননি। শুধু রেণুকণার কাছে আড়ালে আক্ষেপ করেছেন।

আলোক ওর ইচ্ছেমতো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আউটিং-এ গেছে। সারা রাত ধরে নাইটক্লাবে গিয়ে হুল্লোড় করেছে। কিংবা বাড়িতে ইয়ার দোস্তদের ডেকে রঙ্গিলা পার্টির আয়োজন করেছে।

একইসঙ্গে আলোকের পোশাক-আশাক, চুলের ছাঁট ইত্যাদি পালটে গিয়েছিল।

কখনও লম্বা-লম্বা চুল, এক কানে দুল, বুড়ো আঙুলে সোনার আংটি নিয়ে ও হাজির হয়েছে বিশ্বনাথের সামনে। আবার কখনও-বা জুলপি-হীন কদমছাঁট, হাতে রিস্ট ব্যান্ড, গলায় সরু চেন—তার লকেটে কঙ্কালের মাথা। আবার কোনওদিন নাভি পর্যন্ত খোলা থ্রি-কোয়ার্টার হাতা ফিনফিনে কাপড়ের জামা, বুকে নানান রঙের উল্কি, ডানবুকের নিপলে আটকানো সোনার রিং।

এইভাবে ছেলেটা ধীরে-ধীরে অচেনা হয়ে যাচ্ছিল বিশ্বনাথের কাছে। আলোক থেকে স্রেফ লোক হয়ে যাচ্ছিল।

জীবনের শেষ ক'টা বছর রেণুকণার বেশ কষ্টে কেটেছিল। চাপা গলায় আপনমনে প্রায়ই বলতেন, 'আমাদের সেই আগের সময়টাই ছিল ভালো— যখন আর কেউ ছিল না...শুধু তুমি আর আমি...।'

কথাটা বলতে গিয়ে রেণুকণার গলা ধরে যেত। তিনি সবসময় বিশ্বনাথকে যেমন ছেলের কাছ থেকে আড়াল করতেন, একইসঙ্গে নিজেও ছেলের জীবন থেকে সরে থাকতে চাইতেন। গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকের মতো ওঁরা আলোকের জীবনযাপন দূর থেকে দেখতেন।

আলোক একটা ওষুধকোম্পানিতে প্রথম চাকরি নিয়েছিল। তারপর অত্যন্ত কম সময়ে উঠে গেল ওপরদিকে। হঠাৎ একদিন ও একটা এসি প্রিমিয়াম গাড়ি কিনে ফেলল—গাড়িটার রং তেল চকচকে কালো—ছ'টা দরজা। আর তার সপ্তাহদুয়েক পরেই একটা সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। রেণুকণাকে ডেকে বলল, 'মাম, এ হল পারমিতা। আজ থেকে আমার সঙ্গে থাকবে—।'

ঘটনাটা রেণুকণাকে নতুন করে তেমন ধাক্কা দেয়নি। আধুনিক টিভি প্রোগ্রামের দৌলতে সবাই জানে যে, শাঁখা-সিঁদুর-বিয়ে বহুবছর ধরে মাথায় উঠেছে। এখন শুধু থাকাথাকির যুগ। যতদিন পোষায় একসঙ্গে থাকো। তারপর ইচ্ছে হলে একা চলে যাও।

কিন্তু বিশ্বনাথ বা রেণুকণা ব্যাপারটাকে 'বিয়ে' বলেই ভেবেছেন। পারমিতা আজও বিশ্বনাথের চোখে আলোর 'স্ত্রী'।

আলোকের বিয়ের—অথবা, ওইরকম কিছুর—বছরখানেক পর রেণুকণা চলে গেলেন। চলে যাওয়ার সময় নিজে যেমন কষ্ট পাননি, তেমনিই কাউকে কষ্ট দেননি। রাতে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে সেই ঘুম আর ভাঙল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, সিভিয়ার সেরিব্রাল অ্যাটাক। হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা ছিলই—সম্ভবত সেটাই ঘুমের মধ্যে লাগামছাড়া হয়ে গেছে।

রেণুকণা চলে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন না—তাই কিছুই গুছিয়ে যেতে পারেননি। বিশ্বনাথকে আচমকা ফাঁকা মাঠে একা দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন। ঢেউয়ের দাপটে লাট খাওয়া মানুষের মতো বিশ্বনাথের সব ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি হতবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

তার পর থেকে পাঁচটি বছরে সবকিছুই কেমন বদলে গেল।

ফ্ল্যাটের সবচেয়ে ছোট ঘরটায় বিশ্বনাথের ঠাঁই হল। সরকারি গবেষণা সংস্থা 'ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট' থেকে সিনিয়ার সুপারিটেন্ডেন্ট হিসেবে রিটায়ার করলেন এবং ছোটবেলার মতো বেকার হয়ে গেলেন।

টিভি দেখে, রেণুকণার কথা ভেবে, আর বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলেন বিশ্বনাথ। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কমিয়ে দিলেন। চারপাশের জীবন থেকে ধীরে-ধীরে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে তিনি যেন কোনও চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় রইলেন। একটা অপ্রয়োজনীয় জীবনকে বয়ে বেড়ানোর ক্লান্তি আর গ্লানি বিশ্বনাথকে কুরে-কুরে খেতে লাগল।

সামনে রাখা থালার দিকে হাত বাড়ালেন। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে খানিকটা বেগুনপোড়া মুড়ে নিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'দ্যাখো রেণু, কপালপোড়া দিয়ে রুটি খাচ্ছি—।'

গ্রাসটা মুখে পুরে দিলেন। একইসঙ্গে চোখ ফেটে জল এল। খাবারটা চিবিয়ে ঢোঁক গিলতে কষ্ট হল।

রেণুকণা ওঁর বুকের ভেতর থেকে বকুনি লাগালেন: 'কী ছেলেমানুষের মতো করছ! কী খেলে সেটা বড় কথা নয়—শরীর রাখাটাই বড় কথা। ভুলে যাও কেন, তোমার বয়েস হয়েছে? নাও, খেয়ে নাও...কেঁদো না, লক্ষ্মীটি...।'

গলা ব্যথা করলেও খাওয়া শেষ করলেন বিশ্বনাথ। অনেকটা জল খেয়ে গলা সাফ করে তবেই ঠিকঠাক শ্বাস নিতে পারলেন আবার। পারমিতার ছকে দেওয়া নিয়ম মতো এঁটো থালা আর গ্লাসটা টয়লেটের কাছে ওয়াশবেসিনের নীচে রেখে দিলেন। তারপর বেসিনে হাত-মুখ ধুচ্ছেন, হঠাৎই একটা চাপা গরগর শব্দ শুনে বেসিনের সামনে আয়নার দিকে তাকালেন।

আলোকদের বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্টর।

লোমে ঢাকা ভারী শরীর। গলার কাছটায় লোমগুলো এত ঘন যে, গলার বেলটটা লোমে ডুবে গেছে। দুটো হলদে চোখ কী তীব্র! কপাল থেকে ছাই রং নেমে এলেও পরে সেটা গাঢ় হয়ে ছুঁচলো মুখের কাছে কালো হয়ে গেছে। চোয়াল দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে

আছে। নাকের ডগাটা কুঁচকে ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত বের করে রেখেছে বলে হিংস্র আর ভয়ংকর লাগছে।

তার সঙ্গে ওই গরগর শব্দ।

রোজকার রুটিন থেকে বিশ্বনাথ জানেন, ভিক্টর এখন টয়লেটে যাবে। পারমিতা ট্রেনিং দিয়ে ওকে এটা অভ্যেস করিয়েছে। টয়লেট ব্যবহার করার সময় ভিক্টর একা থাকতে চায়—আশপাশে লোকজন চায় না। অর্থাৎ বিশ্বনাথকে এখন টয়লেটের কাছ থেকে সরে যেতে হবে।

বিশ্বনাথ সরে এলেন।

ভিক্টরের কাছাকাছি হতে ওঁর ভয় করে। কারণ, মাসকয়েক আগে ভিক্টর ওঁর হাতেকামড়ে দিয়েছিল। আলোক আর পারমিতার কাছে সে ঘটনা জানানোর পর ওদের যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল!

আলোকের কথাগুলো মনে পড়তেই বিশ্বনাথের কান গরম হয়ে উঠল। অপমান আর ধিক্কারের জ্বালা নতুন করে ছুঁচ ফোটাল বুকে।

ঘরে এসে অলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। আজ আর বই পড়তে কিংবা টিভি দেখতে ইচ্ছে করল না।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে একটা হাত মাথার ওপরে রেখে অন্ধকার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আলোক আর পারমিতার কাছে বিশ্বনাথের পরিচয় প্রয়োজনহীন নিষ্কর্মা একজন বাড়তি মানুষ। বিশ্বনাথ থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী! বিশ্বনাথ যে বেঁচে আছেন সেটা কেউ টের পায় না। আবার চলে গেলেও কেউ যে ওঁর অভাব টের পাবে তাও মনে হয় না।

সব মিলিয়ে এক হতচ্ছাড়া জীবন।

সেইজন্যই সন্দীপনের কথাটা মনে পড়ছিল বারবার।

সত্যিই তো! যে-জীবনটা অবহেলা আর অপমানে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে সেটাকে একটু বদলে নিলে ক্ষতি কী!

বিশ্বনাথের ইচ্ছে হল, এক মুহূর্তে সন্দীপনকে একটা ফোন করেন। কিন্তু উপায় নেই। বেস ফোন আলোকদের ঘরে। আর বিশ্বনাথের মোবাইল ফোন নেই।

কিন্তু সন্দীপনের আছে।

এই নতুন ‘চাকরি’টা নেওয়ার পরই বোধহয় তিনি মোবাইল ফোন কিনেছে।

কমিউনিটি পার্কে রিটায়ার্ড বৃদ্ধদের আড্ডায় সন্দীপন বিশ্বনাথের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। কারণ, দুজনের জীবনে অনেকটা মিল আছে।

সন্দীপন বিপত্নীক। ওর এক ছেলে। ছেলে যেমন একরাশ মেয়েবন্ধু জুটিয়ে ফূর্তিফার্তা করে, ছেলের বউও একই টাইপের। দুজনে একেবারে যেন রাজযোটক। সন্দীপন ওদের সঙ্গে কোনওরকমে টিকে আছেন।

সেইজন্যই বিশ্বনাথের সঙ্গে সন্দীপনের সুখ-দুঃখের কথা হয় বেশি।

আজ সন্ধেবেলা পার্কে বসে সন্দীপনের কাছে ব্যাপারটা শোনার পর বিশ্বনাথ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একটা ভয়ংকর ধাক্কা খেয়েছিলেন।

কিন্তু যতই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছেন ততই মনে হচ্ছে, সন্দীপন ঠিকই করেছেন।

প্রথমত, এই 'চাকরি'টা নিলে একটা কাজের মধ্যে থাকা যাবে। আর দ্বিতীয়ত, আর্থিক টানাপোড়নের জায়গাটা অনেক নরম আর সহজ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এখন যে-জীবনে বিশ্বনাথ হাঁটছেন—হাঁটছেন কি না কে জানে!—তার ডাকনাম হয়তো 'জীবন', কিন্তু পোশাকী নাম যে 'মরণ' সেটা ক'জন বুঝবে!

বিশ্বনাথ ভেবে দেখলেন, মরে থাকা মানুষ আর মরতে পারে না। তাই ঠিক করলেন, কাল রাস্তায় বেরিয়ে সন্দীপনকে ফোন করবেন।

বাড়িটার বাইরের চেহারাটা যে ছদ্মবেশ সেটা বোঝা গেল ভেতরে ঢোকার পর। বাইরেটা যেমন জরাজীর্ণ, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো, ভেতরটা ততটাই উলটো—ঝকঝকে, স্মার্ট। এটাই 'শটস অ্যান্ড বিকস'-এর অফিস।

রাস্তার ফোনবুথ থেকে সন্দীপনকে ফোন করে একটা কোম্পানির নাম আর একটা সেল ফোনের নম্বর নিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। তারপর দুরুদুরু বুকে সেই নম্বরে ফোন করেছেন।

'হ্যালো..."শটস অ্যান্ড কিকস"?'

'ইয়েস।' একটা মেয়েলি গলা উত্তর দিল, 'আপনি কে বলছেন?'

বিশ্বনাথ নাম বললেন।

'এই ফোন নাম্বারটা আপনাকে কে দিয়েছেন—রেফারেন্সটা কাইন্ডলি বলবেন?'

বিশ্বনাথ সন্দীপনের নাম-ঠিকানা বললেন।

সঠিক রেফারেন্স না দিতে পারলে কথাবার্তা যে সেখানেই শেষ সেটা সন্দীপন বারবার করে বিশ্বনাথকে বলে দিয়েছেন। বলেছেন যে, ওরা স্রেফ 'রং নাম্বার' বলে লাইন কেটে দেবে।

ও-প্রান্তে মেয়েটি একটু সময় নিচ্ছিল। বোধহয় কম্পিউটারের ডেটাবেস-এ সন্দীপনের নাম-ঠিকানাটা ক্রসচেক করে নিচ্ছিল।

একটু পরেই: 'ও. কে., মিস্টার বোস, বলুন কীভাবে আপনাকে আমরা হেলপ করতে পারি—।'

বিশ্বনাথ বেশ চেষ্টা করে বললেন, 'আমি সি. ভি. অপারেশান করাতে চাই।'

এ-কথা শুনে মেয়েটির যান্ত্রিক গলা একটুও কাঁপল না। ও বলল, 'আপনার ফুল পোস্টাল অ্যাড্রেস দিন আর আপনার মায়ের বিয়ের আগের পদবী বলুন।'

বিশ্বনাথ নিজের পুরো ঠিকানা বললেন। তারপর আমতা-আমতা করে জানতে চাইলেন, 'আমার মায়ের মেইডেন সারনেম? মা তো বহু বছর আগে মারা গেছেন...তাঁর বিয়ের আগের...।

মেয়েটি বিশ্বনাথকে বাধা দিয়ে বলল, 'একটা-দুটো অফবিট পারসোনাল ইনফরমেশান আমরা ডেটাবেস-এ স্টোর করে রাখি, মিস্টার বোস। আমাদের কোনও পেশেন্ট ওভার দ্য ফোন কোনও ইনফরমেশান চাইলে আমরা তাঁর টেলিফোনিক পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার ছাড়াও দু-একটা পারসোনাল ইনফো ক্রসচেক করে নিই—সেইজন্যেই আপনার মায়ের মেইডেন সারনেমটা দরকার। যদি বাই চান্স কেউ আপনার টি-পিন নাম্বারটা জেনেও যায়, সে আপনার নাম করে ফোন করেও আমাদের কাছ থেকে আপনার কোনও প্রাইভেট ইনফো বের করতে পারবে না।' একটু দম নিল মেয়েটি। তারপর বলল, 'দিস ইজ অ্যাবসোলিউটলি ফর প্রোটেকশান অফ ইয়োর প্রাইভেসি, মিস্টার বোস। আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড...।'

বিশ্বনাথ বুঝলেন, কিন্তু একইসঙ্গে অবাকও হলেন। এত সতর্কতা কীসের জন্য?'

একটু পরেই ওঁর মনে হল, অপারেশানটা হয়তো ইল্লিগাল—তাই এত সাবধান হতে চায় ওরা।

বিশ্বনাথ ওঁর মায়ের বিয়ের আগের পদবি বললেন।

তখন মেয়েটি ওঁকে একটা নম্বর দিয়ে বলল, 'এটা আপনার রেফারেন্স নাম্বার। আমাদের অফিসের রিসেপশানে এসে এই রেফারেন্স নাম্বারটা বলবেন, আর আপনার ফোটো আই-ডি কার্ড দেখাবেন। তা হলেই আপনাকে একজন এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে। আপনার দেখা করার সময় হল সন্ধে সাতটা থেকে ন'টা। যদি আজ থেকে ঠিক সাতদিনের মধ্যে আপনি যোগাযোগ না করেন তা হলে আপনার সমস্ত রেকর্ডস আমাদের ডেটাবেস থেকে অটোমেটিক্যালি ইরেজড হয়ে যাবে। তখন আপনাকে পুরো কেসটা রিওপেন করতে হবে। 'ইজ ইট ক্লিয়ার, মিস্টার বোস?'

এত কথা বলার সময় মেয়েটির গলায় এতটুকু ওঠা-পড়া হয়নি। মনে হচ্ছিল, টেলিফোনে মেয়েটি পড়া মুখস্থ বলছে।

এরপর মেয়েটি বিশ্বনাথকে 'শটস অ্যান্ড কিকস'-এর ঠিকানা দিল। তারপর বলল, 'উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ইন ইয়োর পসিবল নিউ লাইফ, মিস্টার বোস। থ্যাংক ইউ ফর কলিং। হ্যাভ আ নাইস ডে।'

টেলিফোনে কথা বলার পর বেশ কয়েকদিন তীব্র দোটানায় ভুগেছেন বিশ্বনাথ। অপারেশান করাবেন—না কি করাবেন না? রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রেণুকণার সঙ্গে অনেক কাল্পনিক তর্ক-বিতর্ক করেছেন, নিজের সঙ্গেও অনেক লড়াই করেছেন। কারণ, এই সি. ভি. অপারেশানটা পারমানেন্ট—রিভার্সিবল নয়। একবার অপারেশান হয়ে গেলে আর ফেরা যায় না।

বিশ্বনাথ অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এলেন, তিনি আর ফিরতে চান না।

সুতরাং বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরে যাওয়ার কোনও ঝটকা টের পেলেন না বিশ্বনাথ। বরং মনে হল, সামনেই নতুন জীবন।

বাড়িটার রং চটে গেছে, নানান জায়গায় ফাটল। তার কোনও-কোনও জায়গা থেকে উঁকি মারছে বট-অশ্বত্থের চারা। রাস্তার ভেপার ল্যাম্পের কটকটে আলোয় বাড়িটাকে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা ভিখারি মনে হচ্ছে।

বাড়ির সদর দরজার মাথায় ছোট্ট ইলেকট্রনিক সাইনবোর্ড। তাতে ইংরেজি হরফে লেখা: 'শটস অ্যান্ড কিকস'। তার নীচে ছোট-ছোট হরফে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: 'ড্রাগ

অ্যাবিউজ ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ।'

চারপাশে ড্রাগের নেশা কীরকম জাঁকিয়ে বসেছে সেটা বিশ্বনাথ ভালোই জানেন। সরকার ড্রাগ অ্যাবিউজের সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত। খবরের কাগজ কিংবা টিভি চ্যানেল খুললে ড্রাগের বিষয়ে খবর অন্তত শতকরা দশ ভাগ। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকেই ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা ড্রাগের খপ্পরে পড়ছে। সেটা সামাল দিতে সরকার যে-স্পেশাল নারকোটিকস ডিপার্টমেন্ট খুলেছে তারা দিন-রাত হিমশিম খাচ্ছে। সেইসঙ্গে নাজেহাল হচ্ছে পুলিশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অর্থনীতির সমস্যা থেকেই এই সমস্যাটা মাথাচাড়া দিয়েছে। আর অর্থনীতির সমস্যার শিকড়ে রয়েছে তীব্র বেকার সমস্যা।

না, এতসব জটিলতা বিশ্বনাথ বোঝেন না। তিনি শুধু দেখছেন, চারপাশের ছেলেমেয়েরা দিন-দিন কেমন উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া হয়ে উঠছে, নিত্যনতুন নেশার পিছনে পাগলের মতো ছুটছে। ওদের সামনে নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঝকঝকে তকতকে একটা অফিসের মুখোমুখি হলেন বিশ্বনাথ। চারপাশে শুধু কাচের দেওয়াল, সৌখিন রাবার উডের ফার্নিচার, ল্যাপটপ কম্পিউটার আর টেলিফোন। কোথাও-কোথাও মিহি সুরে ফোনের রিং বাজছে—এ ছাড়া এয়ার কন্ডিশান্ড অফিসটায় আর কোনও শব্দ নেই।

সব পার্টিশান কাচের হাওয়ায় অফিসের ভেতর অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

বিভিন্ন কাচের দেওয়ালে যেসব স্লোগান আর পোস্টার লাগানো রয়েছে তাতে মনে হবে 'শটস অ্যান্ড কিকস'-এর আসল কাজ হল ড্রাগের মারাত্মক নেশা ছাড়ানো। প্রতিটি পোস্টারে ওদের লোগো—'এস', 'এ', 'কে' অক্ষর তিনটে সুন্দর জড়ানো কায়দায় লেখা।

বিশ্বনাথের অবাক লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এটাও আর-একটা ছদ্মবেশ।

রিসেপশানে অনেক লোকের ভিড়। বেশিরভাগই কমবয়েসি ছেলেমেয়ে—সঙ্গে ওদের বাবা-মা কিংবা গার্জেন। ওঁরা সত্যি-সত্যি হয়তো ছেলেমেয়ের ড্রাগের নেশা ছাড়াতে এসেছেন।

ওই ভিড়ের মধ্যে দুজন বয়স্ক মানুষকে দেখে বিশ্বনাথের সন্দেহ হল। ওঁরা দুজন সি. ভি. অপারেশানের জন্য আসেননি তো!

কে জানে, 'শটস অ্যান্ড কিকস' হয়তো ড্রাগের দু-দিকেই কাজ করে: ড্রাগের নেশা ধরানো এবং ছাড়ানো।

রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ফুটফুটে দেখতে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। লম্বা-লম্বা নখে একই রঙের নেইলপালিশ। কানের লতিতে বিশাল মাপের দুটো রুপোলি রিং। ওর পিছনের দেওয়ালে জ্বলন্ত সিগারেটের ওপরে লাল কাটা চিহ্ন দেওয়া একটা পোস্টার।

রিসেপশানে বিশ্বনাথ নিজের নাম লেখা স্লিপ জমা দিয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পালা আসতেই রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ওঁর নাম ধরে ডাকল।

বিশ্বনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে মেয়েটির কাছে গেলেন। নিজের রেফারেন্স নম্বর বললেন, ফটো আই-ডি কার্ড দেখালেন।

মেয়েটি ভাবলেশহীন মুখে ল্যাপটপের বোতাম টিপতে লাগল। কালো কিবোর্ডের ওপরে ওর নড়েচড়ে বেড়ানো লাল নখগুলোকে ফুলের পাপড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

ল্যাপটপের পরদায় মেয়েটি কী দেখল কে জানে! শুধু চোখ তুলে বিশ্বনাথের দিকে কয়েকপলক তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি বসুন, মিস্টার বোস। আপনাকে নিতে লোক আসবে।'

তারপরই মেয়েটি কিবোর্ডের বোতাম টেপায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বেশিক্ষণ বসতে হল না। সাদা অ্যাপ্রন পরা একটি ছেলে অফিসের ভেতর থেকে হেঁটে আসছিল রিসেপশানের দিকে। কাচের দরজা ঠেলে সে রিসেপশান জোনে এল। রিসেপশানিস্টের কাছে গিয়ে চাপা গলায় কী যেন জিগ্যেস করল। উত্তরে রিসেপশানিস্ট চোখের ইশারায় বিশ্বনাথকে দেখিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটি স্মার্টভাবে চলে এল বিশ্বনাথের কাছে। নীচু গলায় বলল, 'মিস্টার বোস?'

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে উঠে দাঁড়ালেন।

'কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন—।'

ছেলেটির সঙ্গে এগোলেন বিশ্বনাথ। ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। চোখের আধুনিক পলিমার লেন্সের চশমা। ফরসা, রোগা চেহারা। এতই রোগা যে, চোয়াল এবং কণ্ঠা বিশ্রীভাবে নিজেদের জাহির করছে। তবে ছেলেটির মাথার চুল অস্বাভাবিক ফোলানে-ফাঁপানো। ওর রোগা চেহারার সঙ্গে ভীষণ বেমানান লাগছে। ওর পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকড়া চুলগুলো নড়ছে।

ছেলেটির সঙ্গে অনেকগুলো কাচের দরজা পেরোলেন বিশ্বনাথ। তারপর একটা পরদা ঘেরা কাচের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ছেলেটি বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসল: 'ভেতরে যান, মিস্টার বোস। ডক্টর মালাকার আপনার জন্যে ওয়েট করছেন।'

হাত বাড়িয়ে কাচের দরজা ঠেলে খুলল ছেলেটি। চোখের ইশারায় বিশ্বনাথকে ভেতরে যেতে ইশারা করল।

বিশ্বনাথ যখন ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকছেন তখন ছেলেটি চাপা গলায় বলল, 'অল দ্য বেস্ট, স্যার—।'

ছেলেটি 'স্যার' বলায় বিশ্বনাথ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন। ছেলেটি মুচকি হেসে চলে গেল।

এতক্ষণ বিশ্বনাথের বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ছিল। যদিও জেদটা মনের ভেতরে ভালোমতোই জাঁকিয়ে বসেছিল। ছেলেটির বলা 'স্যার' শব্দটা বিশ্বনাথকে যেন নতুন এক ভরসা দিল। নতুন এক মর্যাদাও যেন অনুভব করলেন।

ভাবার সময় আর বেশি ছিল না। শক্ত পায়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন বিশ্বনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে ডক্টর মালাকার ওঁকে খুব চেনা আত্মীয়ের মতো অভ্যর্থনা জানালেন।

'আরে, 'আসুন...আসুন, বিশ্বনাথবাবু...' একগাল হেসে দু-হাত বাড়িয়ে বিশ্বনাথের হাত চেপে ধরলেন মালাকার: 'বলুন, কেমন আছেন? সব কুশল মঙ্গল তো!'

বিশ্বনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে কাঠ-কাঠ হাসলেন। নীচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো আছি—।'

ডক্টর মালাকার কি অন্য কোনও সূত্রে ওঁকে চেনেন? এমনভাবে ভদ্রলোক কথা বলছেন যেন কতদিনের চেনা!

'বসুন, বসুন—'একটা শৌখিন রিভলভিং চেয়ারের দিকে ইশারা করলেন ডক্টর মালাকার। তারপর একই ঢঙে উচ্চারণ করলেন, 'হুম। তো আপনি ভ্যাম্পায়ার হতে চান? মানে, সি. ভি. অপারেশান করাতে চান—মানে, যেটাকে আমরা কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার বলি...।'

বিশ্বনাথ চেয়ারে বসলেন বটে, কিন্তু ওঁর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মালাকার তাঁর চেয়ারে বসে হাসি-হাসি মুখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বোধহয় উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন।

আশ্চর্য! কী সহজে কথাগুলো বললেন মালাকার! যেন ব্যাপারটা রোজকার দাড়ি কামানোর মতোই মামুলি।

ঠান্ডা ঘরের মধ্যেও ঘেমে গেলেন বিশ্বনাথ। অবাক চোখে মালাকার এবং তাঁর অফিসটাকে দেখতে লাগলেন। যেন পুরোটাই অন্য কোনও গ্রহের ব্যাপার।

ডক্টর মালাকার বেশ মোটাসোটা। কোমরের বেলটের ওপর থেকে মাঝারি মাপের ভুঁড়ি উপচে পড়ছে। মাথায় মসৃণ টাক—শুধু কানের ওপরটায় কয়েক খাবলা কাঁচাপাকা চুল। আর কানের পাশ দিয়ে অনেকটা গালপাট্টার মতন পাকা জুলপির জঙ্গল নেমে এসেছে।

মালাকারের রং ফরসা—তবে কিছুটা রোদে পোড়া। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। ছোট মাপের ভুরু। তার নীচেই মেটাল ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। দু-দিকে ফোলা গানের মাঝে নাকটা বক্সারদের মতো থ্যাবড়ানো। গোঁফ-দাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। থুতনির নীচে দু-থাক চর্বি। সবমিলিয়ে মুখে একটা কমিক ভাব আছে। ফলে এই লোক যে সি. ভি. অপারেশন করেন সেটা ভাবাটা বেশ কঠিন।

মালাকারের চেম্বারটা মাপে বেশ বড়। দেখে ডক্টরস চেম্বার বলেই মনে হয়। দু-দেওয়াল জুড়ে 'এল' কাউন্টার। তাতে বেশ কয়েকটা মোটা-মোটা বই আর কাগজপত্র রাখা। তার পাশেই একটা এলসিডি মনিটারওয়ালা কম্পিউটার। মনিটারে কারসর দপদপ করছে।

কাউন্টারের বাঁদিকে প্রচুর ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। অপারেশানের জন্য সেগুলো ব্যবহার হয় কি না বিশ্বনাথ ঠিক বুঝতে পারলেন না। তার ঠিক ওপরেই কাচের দেওয়ালে একটা ইলেকট্রনিক ক্যালেন্ডার—তাতে আজকের তারিখটা লাল রঙে জ্বলছে।

ডক্টর মালাকারের সামনে রাবার উডের বড়সড় টেবিল। টেবিলের একপাশে ল্যাপটপ কম্পিউটার। হয়তো বিশ্বনাথ ঘরে ঢোকার আগে মালাবার এই কম্পিউটারেই কাজ করছিলেন।

কম্পিউটারের পাশে একটা বেঁটেখাটো প্ল্যাস্টিকের স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডের একইঞ্চি ওপরে একটা ডাম্বেল আকৃতির রোটর শূন্যে ঘুরছে। আর স্ট্যান্ডের একপাশে লেখা 'এস. এ. কে'।

এ ছাড়া টেবিলে পড়ে আছে রঙিন কয়েকটা পেন, দুটো মোবাইল ফোন, আর চার-পাঁচটা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন।

মালাকার আবার জিগ্যেস করলেন, 'আপনি সি. ভি. অপারেশানটা করাতে চান তো, বিশ্বনাথবাবু?'

বিশ্বনাথ মাইক টেস্ট করার মতো গলাখাঁকারি দিয়ে গলা টেস্ট করলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, চাই...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...।'

উত্তর শুনে মালাকার হাসলেন, বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল! আপনার মতো কনফিডেন্ট পেশেন্ট আমরা খুব বেশি পাই না। বেশিরভাগই দোটানায় ভোগে।'

বিশ্বনাথ অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর কী করতে হবে সেটা ডক্টর মালাকার তাড়াতাড়ি বলে ফেললেই ভালো। সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েই গেছে তখন আর দেরি করে লাভ কী!

সন্দীপন এখানকার কনট্যাক্ট নম্বর বিশ্বনাথকে দিয়েছেন, আর দু-চার লাইনে অপরেশানটার কথা বলেছেন। এও বলেছেন, 'আর বেশি জানতে চেয়ো না। ওরা পুরো ব্যাপারটাই কনফিডেনশিয়াল রাখতে বলেছেন। তুমি আগে ডিসাইড করো কী করবে—তারপর ওখানে গেলে ওরাই সবকিছু তোমাকে ডিটেইলসে বলে দেবে...।'

এখন সেই ডিটেইলস শোনার পালা।

ডক্টর মালাকার টেবিলে রাখা ল্যাপটপের কিবোর্ডে আঙুল চালালেন। এলসিডি পরদার দিকে কয়েক সেকেন্ড আড়চোখে তাকালেন। তারপর বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসলেন।

'বিশ্বনাথবাবু, আমরা আপনার একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবনটা বদলে দেব—নতুন থ্রিলিং জীবনের দরজা খুলে দেব আপনার সামনে।' টেবিলের ওপরে ঝুঁকে এলেন মালাকার: 'না, না—এগুলো মোটেই সেলস টক নয়। এগুলো হার্ড রিয়েলিটি। তা ছাড়া অপারেশানের জন্যে আমরা তো পয়সা নেব—সো ইউ শুড নট বি গ্রেটফুল টু আস। ইটস আ প্রফেশনাল ডিল। আপনি যা চান—আমরা দেব।

'আপনি তো জানেন, এই টুয়েন্টি সেকেন্ড সেঞ্চুরিতে টেকনোলজি বুম যেমন হয়েছে তেমনই হয়েছে অ্যাডিকশান বুম—স্ন্যাক বুম। এখনকার ইয়াং জেনারেশানের টুয়েন্টি এইট পার্সেন্ট অ্যাডিকটেড। মদ, গাঁজা, চরস, হ্যাশিশ, এলএসডি, মারিজুয়ানা, কোকেন, মরফিন, মিথাডেন, মেস্কালাইন—এরকম কত নাম আর বলব! এর কোনওটা স্টিমুল্যান্ট, কোনওটা নারকোটিক, আবার কোনওটা বা হ্যালুসিনোজেন। এরকম আরও অনেক টাইপ আছে। কিন্তু লাস্ট পনেরো কি বিশ বছরে আরও অনেক নতুন-নতুন নেশা ইনট্রোডিউসড হয়ে গেছে...।'

ডক্টর মালাকারকে বাধা দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, 'হ্যাঁ—যেমন সাপের ছোবল।'

হাসলেন মালাকার: 'ঠিকই বলেছেন। তবে সাপের ছোবলেই ব্যাপারটা থেমে থাকেনি। সাপের পাশাপাশি চালু হয়েছে পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে, গিরগিটি আর বেজির কামড়—এ ছাড়া যদিও খুব রেয়ার এবং কস্টলি, কেউ-কেউ নেশার জন্যে অ্যামেরিকার অ্যারো-পয়জন ফ্রগের বিষ ডাইলুট করে ব্যবহার করে। আপনি জানেন কি না জানি না—বহুবছর আগে কাফ সিরাপ আর ঘুমের ট্যাবলেটও এসব কাজে ব্যবহার হত—'

বিশ্বনাথ মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তিনি শুনেছেন।

ডক্টর মালাকার ভুরু উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এখন সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে কোন নেশা জানেন?'

বিশ্বনাথ জানেন। সন্দীপনের কাছে শুনেছেন। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। ডক্টর মালাকারের কাছ থেকেই উত্তরটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

‘ভ্যাম্পায়ারের ছোবল।’ চোখ বড়-বড় করে বললেন মালাকার, ‘এটাই এখন ট্রেন্ডি। বড়লোকের নেশা করা ছেলেমেয়েরা এই ছোবলের জন্যে পাগল। বুঝতেই পারছেন, এই নেশাটা কস্টলি—তাই একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরাই এই নতুন নেশায় হ্যাবিচুয়েটেড...। চলতি কথায় এটাকে আমরা বলি ”ভি-স্টিং”। আফটার সি. ভি. অপারেশান স্টিং প্রোভাইড করাটাই হবে আপনার প্রফেশান। তাতে খুব একটা খারাপ ইনকাম হবে না আপনার। তা ছাড়া বোনাস হিসেবে কতকগুলো বাড়তি সুবিধে পাবেন... থাক—সেগুলো পরে জানবেন।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখে হাত বোলালেন মালাকার: ‘মোট কথা, আমি আপনাকে বলছি, আফটার অপারেশান, দিস নিউ লাইফ ইজ গোয়িং টু বি ভেরি-ভেরি ইন্টারেস্টিং। রিয়েলি ইট ইজ—কারণ, এ পর্যন্ত আমরা কোনও কমপ্লেইন পাইনি।’

টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সেইসঙ্গে কেঁপে উঠে নড়তে লাগল টেবিলের ওপরে।

ডক্টর মালাকার ফোনটা তুলে কথা বললেন, ‘হ্যাঁ’, ‘হ্যাঁ’, করে কিছুক্ষণ কথা বলে শেষে বললেন, ‘হ্যাঁ, পেশেন্টের সঙ্গে ফাইনাল কথা বলে অপারেশানের ডেট ফিক্স করে নিচ্ছি। ও. কে.।’

মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে ওটা টেবিলে আবার রেখে দিলেন মালাকার। তারপর স্থির চোখে তাকালেন বিশ্বনাথের দিকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘মিস্টার বোস, লেট আস নাউ কাম ডাউন টু বিজনেস। লেট মি টেল ইউ দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারস অ্যাবাউট দ্য সি. ভি. অপারেশান...।’

ডক্টর মালাকার বলে গেলেন, বিশ্বনাথ শুনে গেলেন।

অপারেশানটার জন্য খরচ দু-ঘণ্টা সময়, আর চল্লিশ হাজার টাকা। তবে হিসেব করলে অপারেশানটা মোটেই কস্টলি নয়। কারণ, অপারেশনের পরে বিশ্বনাথ যখন ‘শটস অ্যান্ড কিকস’-এর মাধ্যমে নেশার ক্লায়েন্ট পাবেন, তখন ক্লায়েন্টপিছু এক-একটা রাতের জন্য তিনি পাবেন একহাজার টাকা। তার মধ্যে সার্ভিস চার্জ হিসেবে ‘শটস অ্যান্ড কিকস’ কেটে নেবে থার্টি পার্সেন্ট। সুতরাং অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, মাত্র আটান্ন রাতের কাজ পেলেই বিশ্বনাথের অপারেশানের খরচ উঠে আসবে। তা ছাড়া অপারেশানের পর বিশ্বনাথ কিছু নতুন-নতুন ক্ষমতার মালিক হবেন। সেগুলো বোনাস বলেই ভাবেন।

‘আমাদের এই অপারেশান বা রিলেটেড ব্যাপারগুলো কিন্তু অ্যাবসোলিউটলি কনফিডেনশিয়াল। আমাদের যে-এগ্রিমেন্ট তৈরি হবে তার একটা মেজর কন্ডিশানই হচ্ছে সিক্রেসি। কারণ, জেনে রাখুন, এই সি. ভি. অপারেশানটা পানিশেবল আন্ডার ইন্ডিয়ান পিনাল কোড। যদি অপারেশানের পরে আমাদের সিক্রেট পুলিশ কিংবা সিকিওরিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট আপনার খোঁজ পায়...যদি জানতে পারে যে, আপনি কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। তা ছাড়া ভ্যাম্পায়ারের ছোবল দিয়ে নেশা করা বা করানো—দুটোই ইল্লিগাল।’ মালাকার আবার চওড়া হাসলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো ভুঁড়ির ওপরে রাখলেন। একটু কেশে নিয়ে বললেন, ‘আপনি হয়তো ভাবছেন, ইল্লিগাল হলে এই কাজটা আমরা করছি কেন। করছি কারণ, এই অপারেশানটা বায়োটেকনোলজির একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। তা ছাড়া আমরা ভালো কাজও তো করছি! এই যে, কত ছেলেমেয়েকে ড্রাগের সর্বনাশা নেশা থেকে বাঁচাচ্ছি! আসলে একগাদা পুণ্যের সঙ্গে ছিটেফোঁটা পাপ মিশে থাকলে ওটা হিসেবের মধ্যে আসে না।

‘মোট কথা, মিস্টার বোস, আপনি এখন ”এস এ সি”-র টপ সিক্রেট জোনে ঢুকে পড়েছেন। এবার আপনাকে এগ্রিমেন্ট ফর্ম আর বন্ড সই করতে হবে। তারপর আপনার রুটিন মেডিকেল চেক-আপ করা হবে। এই ইসিজি, ইইজি, ব্লাডপ্রেশার, ইউএসজি এইসব আর কী!

‘এবারে বলুন, আপনি কবে অপারেশানটা করাতে চান?...

বিশ্বনাথ যে সি. ভি. অপারেশানটা করিয়েছেন সেটা আলোক বা পারমিতা টের পেল না। কারণ, অপারেশানটা এমন যে, অপারেশানের পর ঘণ্টাতিনেক রেস্ট নিলেই রুগি চাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। ফলে বিশ্বনাথও অপারেশানের পর ‘শটস অ্যান্ড কিকস’ থেকে দিব্যি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসি ট্রলি বাস ধরে বাড়ি চলে এসেছেন। ওরা কেউ কিছু টের পায়নি।

তবে ভিক্টর বিশ্বনাথকে দেখে একটু যেন বাড়তি গরগর করেছিল। তাতে ভয় পেয়ে সাততাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

বিশ্বনাথের কেমন যেন গা গুলোচ্ছিল। তাই রাতে আর কিছু খাননি। ডক্টর মালাকার বলেছেন, ক’টা দিন ঠান্ডা নরম জিনিস খেতে—তার সঙ্গে দুধ বা ফলের রস।

তেতো হাসি আঁকা হয়ে গেল বিশ্বনাথের ঠোঁটে। দুধ বা ফলের রস! মালাকার তো আর জানেন না ও-দুটো জিনিসের বন্দোবস্ত করতে গেলে অকর্মণ্য বেকার বুড়ো বাপের জন্য আলোর যা বাজেট সেটা ছাড়িয়ে যাবে!

ডক্টর মালাকার বন্ধুর মতো সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনাথকে। সাতদিন বিশ্রাম। তারপর ‘এস এ কে’-তে গিয়ে ডক্টর মালাকারের কাছে পোস্ট অপারেশনাল চেক-আপ। এই রুটিন চলবে টানা বত্রিশ দিন। তারপর বিশ্বনাথ নতুন জীবনের জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবেন।

যেহেতু অপারেশানটা রিভারসিবল নয় সেহেতু মালাকার বারবার করে বলেছেন, নতুন জীবন নিয়ে কখনও কোনওরকম আক্ষেপ না করতে। এও বলেছেন, ‘...আপনার যা বয়েস তাতে দুঃখ বা আক্ষেপ হলেও খুব বেশিদিন সেটা আপনাকে সইতে হবে না। সবসময় অপটিমিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলবেন, বিশ্বনাথবাবু। ইট উইল বি গুড ফর ইয়োর নিউ লাইফ।’

আলোক আর পারমিতার জীবন ওদের ছন্দে চলছিল। আর বিশ্বনাথ থেকেও-না-থাকার ঢঙে দিন কাটাতে লাগলেন। শুধু অপারেশানের উপসর্গগুলো ওঁকে কষ্ট করে সইতে হচ্ছিল। দাঁতে আর মাড়িতে অসহ্য ব্যথা, কান ভোঁ-ভোঁ করা, মাথা ঘোরা, গলা শুকিয়ে আসা। মালাকার ওঁকে মোবাইল নম্বর দিয়েছেন। বলেছেন, ‘দরকার মনে করলেই আমাকে ফোন করবেন। আমার ফোন চব্বিশ ঘণ্টা অন থাকে—।’

অপারেশানের সময় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বনাথের কোনও জ্ঞান ছিল না। তবে অপারেশানের আগে ডক্টর মালাকার সংক্ষেপে সহজে ব্যাপারটা ওঁকে মোটামুটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

বিশ্বনাথের ক্যানাইন টুথ বা শ্বদন্ত দুটো আধুনিক কৌশলে রিস্ট্রাকচারড করা হয়েছে। ফলে দাঁত দুটো এখন আরও চোখা হয়েছে। আর ও-দুটোর ভেতরে সূক্ষ্ম চ্যানেল তৈরি

করা হয়েছে। ওর লালা গ্রন্থির মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছে একটা স্পেশাল ভ্যাম্পায়ার সিরাম গ্ল্যান্ড। এ ছাড়া নার্ভাস সিস্টেমটাকেও রিমডেল করে ভাইটালাইজ করা হয়েছে। আর মাসল স্ট্রেংথ অনেক বাড়ানো হয়েছে—সেই সঙ্গে কমানো হয়েছে যন্ত্রণা অনুভবের ক্ষমতা।

ডক্টর মালাকারের ভাষায়, '...পুরো ব্যাপারটাই এটা হাই-টেক ইনট্রিকেট কোঅর্ডিনেটেড অপারেশান। গত পাঁচ দশকে বায়োটেকনোলজির ফেনোমেনাল বুম না হলে এই অপারেশানটা শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞানের বইয়ে পাওয়া যেত—বিজ্ঞানের বইয়ে নয়।'

বিশ্বনাথ বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলেন, 'অপারেশানের পর আমি তা হলে কী হব? মানুষ, না ভ্যাম্পায়ার?'

'দুটোই—।' হেসে বলেছেন মালাকার, 'ইউ উইল হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস।'

তারপর তাঁর সে কী মজার হাসি!

হতভম্ব বিশ্বনাথের চোখের সামনে সন্দীপনের মুখটা ভেসে উঠেছিল। সন্দীপন বলেছিলেন, তিনি বেশ মজায় আছেন। কোনও সমস্যা নেই। যেহেতু এই সিক্রেট অপারেশানটা নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করাটা স্ট্রিকটলি বারণ, তাই সন্দীপন সব খুলে বলতে পারছেন না। শুধু বিশ্বনাথের দুরবস্থা দেখে বন্ধু হিসেবে মনে কষ্ট পেয়েছেন বলেই পথের নিশানাটুকু জানিয়েছেন।

অপারেশানের সাতদিন পর থেকেই বিশ্বনাথ পরিবর্তনগুলো টের পেতে লাগলেন।

আগে অন্ধকারের সময় কাটাতে খুব একটা পছন্দ করতেন না। কারণ, একরাশ বিষণ্ণতা মনটাকে ঘিরে ফেলত। রেণুকণার সঙ্গে মনে-মনে কথা বলা শুরু করে দিতেন—সেই কথার বেশিরভাগটাই ছিল আক্ষেপের।

কিন্তু এখন ধীরে-ধীরে সব কেমন পালটে যাচ্ছে। অন্ধকারের আকর্ষণ ক্রমশ টের পাচ্ছেন বিশ্বনাথ। সন্ধের পর নিজেদের ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে উঠে সময় কাটাতে বেশ লাগে। খুব প্রয়োজন না হলে ঘরের আলো জ্বালেন না। আর সেই অন্ধকারে চোখ মেলে কত না নতুন-নতুন রূপ দেখতে পান বিশ্বনাথ। ওঁর চোখের সামনে জমাট অন্ধকার কেমন সুন্দর-সুন্দর ছবি তৈরি করে। তখন রেণুকণার সঙ্গে কথা বলেন বিশ্বনাথ। আক্ষেপের নয়—আনন্দের কথা। যেমন, আর কিছুদিন পর থেকেই বিশ্বনাথের টাকাপয়সার টানাপোড়েন আর থাকবে না। তখন অনেকটা নিজের মতো করে বাঁচতে পারবেন। রাস্তার হোটেল-রেস্তরাঁয় ইচ্ছেমতো ভালো-মন্দ কিছু খেতে পারবেন। কোনও দুঃস্থ মানুষকে পাঁচটা টাকা ভিক্ষে দিতে পারবেন। কমিউনিটি পার্কে খেলতে আসা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের লজেন্স বা চকোলেট বিলি করতে পারবেন।

বিশ্বনাথের খুশি-খুশি ভাব দেখে রেণুকথা খুশি হন। নিশ্চিত হন।

ঘ্রাণশক্তিও কি খানিকটা বেড়ে গেছে বিশ্বনাথের? পারমিতার ঠিকে কাজের লোক যখন রান্নাঘরে রান্না করে তখন ঘরে বসেও সে-রান্নার গন্ধ তিনি পান কেমন করে? ভিক্টরের গন্ধও বা মাঝে-মাঝে নাকে আসে কেন?

আগে তো এমন আসত না!

নতুন এই ক্ষমতাগুলোকে বিশ্বনাথ উপভোগ করছিলেন আর বত্রিশ দিন শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ডক্টর মালাকারের রুটিন চেক-আপ চলছিল। প্রতিটি চেক-

আপের পর তিনি দিলখোলা ঢঙে হেসে বলেন, ‘ইউ আর হিলিং আপ একসিলেন্টলি। আই অ্যাম রিয়েলি সারপ্রাইজড।’

ডক্টর মালাকার একদিন বললেন, ‘আপনার হিলিং আপ প্রসেস শেষ হয়ে গেলে আমাকে মোবাইলে মাঝে-মাঝে ফোন করবেন। আমি আপনাকে প্রথম ক্লায়েন্ট দেব। আর ভি-স্টিং এর প্রসেসটাও ভালো করে বুঝিয়ে দেব। ও. কে.?

বিশ্বনাথ বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে, ‘এস এ কে’ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

কিন্তু বিশ্বনাথের দাঁত নিয়ে কৌতূহল ছিল। রোজ সকালে ওয়াশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজার সময় শ্বদন্ত দুটোকে পরখ করেন। দেখেন তার ওপরের মাড়ির অবস্থাটা। চোয়াল নাড়িয়ে দাঁতে-দাঁতে আলতো করে ঠোকাঠুকি করেন। না, তেমন ব্যথা আর নেই।

শুধু এতেই থামেননি বিশ্বনাথ। লুকিয়ে-লুকিয়ে কামড় দিয়েছেন বিছানার তোশকে। সেটা সে শুধু দাঁতের জোর পরীক্ষার জন্য তা নয়। দাঁত কেমন যেন সুড়সুড় করছিল কামড় দেওয়ার জন্য—কুকুরছানাদের যেমন করে।

অস্বীকার করে লাভ নেই, তোশকে কামড় দিয়ে একটু যেন তৃপ্তিও পেয়েছেন। যদিও জিভে তোশকের স্বাদটা মোটেই ভালো ঠেকেনি।

সেরে ওঠার বেশ কিছুদিন পর প্রথম ক্লায়েন্টের ডাক পেলেন বিশ্বনাথ। ডক্টর মালাকার বিশ্বনাথকে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন ‘এস এ কে’-র স্পেশাল সেল’-এ। ওরাই ক্লায়েন্টদের ফাইল মেনটেইন করে।

স্পেশাল সেল-এর কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে ক্লায়েন্টের ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন।

শশিভূষণ দে স্ট্রিটের একটা অন্ধকার বাঁকে দাঁড়িয়ে একটা পুরোনো তিনতলা বাড়ি। বাড়ির একতলায় একটি মলিন মিষ্টির দোকান। তার রং-চটা সাইনবোর্ডে কী লেখা আছে একমাত্র ভগবানই জানেন। দোকানের ময়লা শো-কেসের বেশিরভাগটাই খালি। যে-ক’টা মিষ্টি চোখে পড়ছে সেগুলো মনে হয় বেশ পুরোনো। দোকানের দেওয়ালে ঝুল-কালির ছোপ। একটি নাদুসনুদুস লোক খালি গায়ে শো-কেসের পিছনে বসে আছে।

এই মিষ্টির দোকানটাই বিশ্বনাথের ল্যান্ডমার্ক। এই দোকানেই ক্লায়েন্ট ব্রতীন সরকারের খোঁজ করতে হবে।

খোঁজ করলেন বিশ্বনাথ। তারপর দোকানের পাশের ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সিঁড়িতে ওঠার আগে বাঁ-দিকে একটা তালিমারা কাঠের দরজা। তাতে নতুন রং করা হয়েছে। দরজার পাল্লায় একচিলতে কম্পিউটার প্রিন্টআউট আঠা দিয়ে সাঁটা। তাতে ব্রতীন সরকার নামটা ছাপা রয়েছে।

দরজায় টোকা মারলেন বিশ্বনাথ। একইসঙ্গে স্পেশাল সেল-এর নির্দেশ মনে পড়ল: ‘ভি-স্ট্রিং-এর কাজটা সারতে আড়াই মিনিট মতো লাগে। কোনও অবস্থাতেই ক্লায়েন্টের সঙ্গে পাঁচমিনিটের বেশি কাটাবেন না। মনে রাখবেন, যে-সার্ভিসটা আমরা ক্লায়েন্টদের প্রোভাইড করছি সেটা অ্যাবসোলিউটলি ইল্লিগাল। সিক্রেট পুলিশ কিংবা সিকিওরিটি

কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের হাত থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে। আপনি যে-কাজে যাচ্ছেন সেটা একটা কাজ। এখানে পারসোনাল রিলেশানের কোনও জায়গা নেই।'

দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে পঁচিশ-ছাব্বিশের ছিপছিপে এক ফরসা যুবক। মাথার চুল কদমছাঁট। দু-গালে কুণ্ডলী পাকানো সাপের উল্কি। বাঁ ভুরুর শেষে একটা ছোট আংটি।

ব্রতীনের চোখ ঢুলুঢুলু। তবে সেটা নেশার জন্য নাও হতে পারে। কারণ, বিশ্বনাথ কোনওরকম গন্ধ পেলেন না।

ওর গায়ে লাল স্যান্ডো গেঞ্জি, আর পরনে সাদা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট—যাকে সবাই থ্রি-কিউ বলে।

'কী চাই?' ভারী গলায় প্রশ্ন করল ব্রতীন।

স্পেশাল সেল-এর বলে দেওয়া কোড নম্বরটা বললেন বিশ্বনাথ।

ঠোঁটে হাসল ব্রতীন। ওর চোখের মণি প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হল। ঘষা নার্ভাস গলায় বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন—।'

পাশের কোনও ঘর থেকে কড়াইয়ে ফোড়ন দেওয়ার 'ছ্যাঁক' শব্দ পেলেন বিশ্বনাথ। ওঁর বুকের ভেতরটাও কেমন যেন 'ছ্যাঁক' করে উঠল। সামনেই প্রথম পরীক্ষা। বিশ্বনাথ ঠিকঠাক পারবেন তো?

রান্নার গন্ধ নাকে গিয়ে ব্রতীনের ঘরে ঢুকলেন।

ছোট্ট অগোছালো ঘর। চারপাশে কড়া সিগারেটের গন্ধ। রঙিন জামা-প্যান্ট এখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। একটা ছোট্ট টেবিল বইপত্রে পাহাড় হয়ে রয়েছে। খাট বিছানা প্রায় লন্ডভন্ড। তার ওপরে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, তিনটে রঙিন সলিউবল প্লাস্টিকের প্যাকেট আর বেশ কয়েকটা একশো টাকার নোট এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে। একদিকের দেওয়ালে দড়িতে একরাশ জামাকাপড় ঝুলছে। তার পাশেই মাঝারি মাপের একটা শৌখিন আয়না।

ব্রতীন ঘরের মাঝখানে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় ওরও এটা প্রথমবার।

বিশ্বনাথ কাঁপা হাতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিলেন। তারপর ব্রতীনের দিকে হাত বাড়ালেন: 'টাকাটা?'

বাইটের ফি-টা আগে চেয়ে নেওয়াটাও নিয়মের মধ্যেই পড়ে। স্পেশাল সেল থেকে এটা বিশ্বনাথকে বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছে।

ব্রতীন বিছানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে খামচে-খামচে একশো টাকার নোটগুলো তুলে নিল। কাঁপা হাতে খসখস শব্দ করে গুনে নিল। তারপর বিশ্বনাথের দিকে এগিয়ে দিল: 'ওয়ান থাউজ্যান্ড...।'

বিশ্বনাথ টাকাটা গুনে পকেটে রাখলেন। টাকাটা নেওয়ার সময় ওঁর কানদুটো কেমন গরম হয়ে উঠল। মনে হল যেন, পৃথিবীর আদিম ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। টাকার বিনিময়ে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করা।

'কনভার্টেড ভ্যাম্পায়াররা এরকম এজেড হয় নাকি?' ব্রতীন নার্ভাসভাবে জিগ্যেস করল।

বিশ্বনাথ ওর দিকে তাকাতেই খেয়াল করলেন, ব্রতীন ওঁকে খুঁটিয়ে দেখছে।

বিশ্বনাথ ধীরে-ধীরে নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠছিলেন। নিজেকে বুড়ো ভাবতে এখনও রাজি নন। তাই ব্রতীনের কথার 'এজেড' শব্দটা ওঁকে একটু খোঁচা দিয়েছিল।

'তা আপনি কি পঁচিশ-ছাব্বিশের টগবগে ইয়াং লেডিকে আশা করেছিলেন নাকি?'

ব্রতীন এই পালটা প্রশ্নে মোটেই আহত হল না। বরং সরলভাবে বলল, 'না, আমি তো ঠিক জানি না...মানে, আগে কখনও বাইট নিইনি...তাই। আপনি কিছু মাইন্ড করবেন না, প্লিজ...।'

ছেলেটার কথায় বিশ্বনাথের কেমন যেন মায়া হল। বুঝতে পারলেন, এটাই ওর ভার্জিন বাইট। বিশ্বনাথের আরও কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বললেন না। স্পেশাল সেল-এর নির্দেশ মনে পড়ল: 'ক্লায়েন্টদের সঙ্গে প্রফেশন্যাল প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও নয়। ডোন্ট ওয়েস্ট আ সিঙ্গল মোমেন্ট। ইট ইজ অ্যান ইমপরট্যান্ট সেফটি রুল...।'

বিশ্বনাথ চোখ থেকে চশমাটা খুলে পকেটে ভরে নিলেন। তারপর ব্রতীনের কাছে এগিয়ে গেলেন।

টের পেলেন ঘামতে শুরু করেছেন। বুকের ভেতরে হাপর চলছে। রেণুকণার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এরকমই হাপর চলেছিল ওকে প্রথম জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার সময়।

ব্রতীন ঠিক বুঝতে পারছিল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী ওর করার আছে। ওর চোখের নজরে কেমন যেন একটা হতবুদ্ধি ভাব ছায়া ফেলছে। একজন কিশোরীর মতো অস্বস্তি নিয়ে ও ভার্জিন বাইটের জন্য অপেক্ষা করছিল।

ব্রতীন মাথাটা ডানদিকে সামান্য হেলিয়ে দিল। বিশ্বনাথ ওর কণ্ঠার হাড় দেখতে পেলেন। বাঁ কানের লতির ইঞ্চিতিনেক নীচে ফরসা কোমল জায়গাটায় মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। এইরকম জায়গায় ঠোঁট রেখে রেণুকণাকে আদর করেছেন অসংখ্যবার। কখনও-কখনও মৃদু দংশনও করেছেন।

আজ রেণুকণার বদলে একজন পুরুষ। আর দংশনও বিষাক্ত।

আর দেরি করলেন না বিশ্বনাথ। ব্রতীনের দু-কাঁধে হাতের ভর রেখে মুখ নীচু করলেন। ঠোঁট ছোঁয়ালেন ঘাড় আর কাঁধের জোড়ের কাছটায়। তারপর ঠোঁট ফাঁক করে শ্বদন্ত উঁচিয়ে ধরলেন।

ঠিক তখনই আড়চোখে আয়নাটার দিকে কেন তাকিয়েছিলেন কে জানে! সেখানে দেখা গেল একজন সুঠাম প্রৌঢ়ের মুখ। হাঁ করার ফলে মুখের চারপাশে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বাঁ-গালে একটা ছোট তিল।

সবই ঠিক ছিল—শুধু একটা জায়গায় বিশ্বনাথ ধাক্কা খেলেন। আয়নার প্রৌঢ়ের চোখে তৃষ্ণা মেটানোর আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

বিশ্বনাথ আর ভাবতে চাইলেন না। ওঁর নাকে ব্রতীনের ঘামের গন্ধ আসছিল। সেই গন্ধটাই কোন অজানা কৌশলে ফেরোমোনের কাজ করছিল যেন। বিশ্বনাথকে টানছিল।

আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। দাঁত বসালেন।

ছোট্ট করে 'আঃ'! শব্দ করল ব্রতীন। যন্ত্রণা আর আমেজে ওর চোখ বুজে গেল।

ভালো করে কামড় দিলেন বিশ্বনাথ। বুঝতে পারলেন, ভ্যাম্পয়ার সিরাম গ্ল্যান্ডে চাপ পড়ছে। একইসঙ্গে টের পেলেন, কামড়টা তোশকের তুলনায় অনেক—অনেক ভালো লাগছে। একটা উত্তেজনার ঢেউও যেন খেলা করছে বিশ্বনাথের শরীরে।

ব্রতীনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন। দুটো পুরুষ-শরীর ক্রমে জট পাকিয়ে যেতে লাগল। কেউ দেখলে ভাববে, সমকামী টানে শঙ্খ লাগা দুটো মানুষ।

আবার কামড় বসালেন বিশ্বনাথ। তারপর আবার।

স্পেশাল সেল-এর এটাই নিয়ম। মোট তিনবার। বোধহয় নেশাটাকে সুনিশ্চিত করার জন্য।

দ্বিতীয় কামড়ের পরেই রক্তের নোনা স্বাদ পেলেন। এই স্বাদটা যতটা জঘন্য লাগার কথা ততটা লাগল না। বরং ব্রতীনের ঘাড় থেকে মুখ তোলার পর দাঁতে এবং ঠোঁটে লেগে থাকা রক্ত জিভ দিয়ে দিব্যি চেটেপুটে মুছে নিলেন।

বিশ্বনাথের হাতের বাঁধনে ব্রতীন এলিয়ে পড়েছিল। বিশ্বনাথ অনায়াসে ওর শরীরটা তুলে নিয়ে বিছানায় ঢেলে দিলেন। পকেট থেকে চশমাটা বের করে চোখে দিলেন। তারপর সঙ্গে তার নিয়ে আসা স্টিকিং প্লাস্টার এঁটে দিলেন ব্রতীনের ক্ষতচিহ্নের ওপরে।

শরীরটা একটু দুর্বল লাগছিল। মাথাটাও যেন ঝিমঝিম করছিল খানিকটা। এগুলো বাইটের আফটার এফেক্ট। স্পেশাল সেল তাই বলেছিল।

নিজেকে সামলাতে দশ কি পনেরো সেকেন্ড সময় নিলেন। বিছানায় শিশুর মতো অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ব্রতীনের দিকে একবার তাকালেন। ঘুমন্ত ছেলেটার মুখ দিয়ে তৃপ্তির একটা 'উঁ-উঁ' শব্দ বেরিয়ে আসছে।

বিশ্বনাথ হঠাৎই অবাক হলেন। গায়ের শক্তি কি বেড়ে গেছে? নইলে ব্রতীনকে এত সহজে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন কীভাবে? ডক্টর মালাকার তো গায়ের জোর বেড়ে যাওয়া নিয়ে কোনও কথা বলেননি! তা হলে কি এটা হিসেবের বাইরের কোনও ঘটনা? সি. ভি. অপারেশানের পর যে-যে পরিবর্তনগুলো হওয়ার কথা তার বাইরেও কি কিছু-কিছু হয়ে যায়? ব্যাপারটা কি চান্স ফ্যাক্টর, না হিউম্যান ফ্যাক্টর?

বিশ্বনাথ আর সময় নষ্ট করলেন না। চুপিসারে ব্রতীনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজাটা আলতো করে টেনে ভেজিয়ে দিলেন। তারপর চলে এলেন রাস্তায়।

ওঁর প্রথম বাইটের অ্যাডভেঞ্চার বেশ নিশ্চিন্তেই শেষ হল বলা যায়। তাই বাড়ি ফেরার পথে বিশ্বনাথ হালকা মনে রেণুকণার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকিতে মেতে উঠলেন। শুধু ওঁর মুখের ভেতরে একটা আঁশটে গন্ধ লেগে ছিল। গন্ধটা বিশ্বনাথের খুব একটা খারাপ লাগছিল না।

তিতলির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা বিশ্বনাথের জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনা। আর দেখা হলও এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। চৌরঙ্গি এলাকার বারগুলো তখন সবে সন্ধে শুরু করেছে। প্রতিটি বারের বাইরে লাল-নীল-সবুজ নিওন সাইন। তার পাশেই হলোগ্রাম ছবিতে প্রায়-নগ্ন ক্যাবারে নাচের বিজ্ঞাপন। হলোগ্রাম-নর্তকী সুরের ঝংকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে

শরীরের নানান প্রত্যঙ্গ নাচিয়ে চলেছে। আলো আর সুরের মেলা জাঁকিয়ে বসেছে রাস্তাটায়।

বিশ্বনাথ আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক জগৎ দেখছিলেন।

বারগুলোর বাইরে মানুষজনের জটলা। কেউ হাসি-ঠাট্টায় মেতে আছে। কেউ চাপা গলায় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে, কেউ-বা ঢলানি সঙ্গিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে অসভ্যতায় মেতেছে।

আনমনা হাঁটতে-হাঁটতে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামটা সবে ছাড়িয়েছেন, হঠাৎই দেখলেন একটা গাড়ি ছুটে এসে একটা গাড়ির গায়ে রুক্ষভাবে ধাক্কা মারল। ধাতু আর প্লাস্টিক ভেঙে পড়ার শব্দ হল। তারপর চেঁচামেচি।

জায়গাটায় আলো বেশি ছিল না। কিন্তু বিশ্বনাথের দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাটা ওঁর দিনকেদিন জোরালো হয়েছে। চশমা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছেন সপ্তাহদুয়েক আগেই। আলোক আর পারমিতা এতে অবাক হলেও কোনও মন্তব্য করেনি।

বিশ্বনাথ দেখলেন, প্রথম গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে চট করে রাস্তায় বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তারপর পাশের একটি সরু রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুট লাগাল।

পিছনের গাড়ির দরজা খোলা-বন্ধের শব্দ হল। তিনটি লোক নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। নেমেই ধাওয়া করেছে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটে পালানো মেয়েটিকে।

বিশ্বনাথের ভেতরে একটা ভ্যাম্পায়ার জেগে উঠল। তিনি ছুটলেন লোকগুলোর পিছনে।

শরীরের এই জোর কোথা থেকে পেলেন সে-প্রশ্নের উত্তর দিকে পারেননি মালাকার। শুধু বলেছেন, ‘দেখুন, এটাকে আমরা বলি এক্স-ফ্যাক্টর। হিউম্যান ফ্যাক্টর, চান্স ফ্যাক্টর, আননোন ফ্যাক্টর—এইসব মিলেমিশেই এক্স-ফ্যাক্টর তৈরি। তবে এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই—শুধু বলব, এনজয় ইয়োর নিউ লাইফ, বাট প্লে ইট সেফ। বুঝতেই তো পারছেন...।’

এখন সেই এক্স-ফ্যাক্টর নিয়েই ছুটছিলেন বিশ্বনাথ।

রাস্তার দুপাশে পুরোনো আমলের বড়-বড় বাড়ি। তার সীমানায় বিশাল-বিশাল অন্ধকার গাছ। গাছের অচেনা ফুলের গন্ধ বিশ্বনাথের নাকে আসছিল।

রাস্তা নির্জন বলে ছুটন্ত পায়ের শব্দ দিব্যি শুনতে পাচ্ছিলেন। এ ছাড়া আরও শব্দ কানে আসছিল। কুকুরের ঘেউঘেউ, গাছের পাতার খসখস, রাতপোকার ডাক। অপারেশানের পর থেকে এরকম কত সূক্ষ্ম শব্দই যে শুনতে পান!

সত্যি, এই জীবনটা একদম নতুন—মানে, নতুন ধরনের।

গত দু-মাসে বেশ কয়েকজন ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করেছেন বিশ্বনাথ। তাই হাতে টাকাও এসেছে ভালোই। আর যতই টাকা এসেছে বিশ্বনাথের স্বাধীনচেতা মন ততই মাথাচাড়া দিয়েছে। আলোক আর পারমিতার শাসন থেকে অল্প-অল্প করে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে।

এখন খুশিমতন বাইরে বেরোন, পছন্দসই খাবার মাঝে-মধ্যে কিনে খান, হলে গিয়ে সিনেমাও দেখে ফেলেন টুকটাক।

আলোক বা পারমিতার বেশিরভাগ অভিযোগেরই কোনও উত্তর দেন না। এক কান দিয়ে ঢোকান, অন্য কান দিয়ে বের করে দেন। আর ভিক্টরকে একটু সামলে চলেন। কারণ, এখন ওঁকে দেখলেই ভিক্টর কেমন যেন লোম খাড়া করে চাপা গরগর শব্দ করতে থাকে। ঠোঁট পিছনে টেনে ধারালো দাঁতের পাটি হিংস্রভাবে মেলে ধরে।

যত যা-ই হোক, নতুন জীবনটার মধ্যে যে একটা রোমাঞ্চ আছে সেটা বিশ্বনাথ স্বীকার করেন।

এখন, অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে যেতে-যেতে, সেই রোমাঞ্চটাই টের পাচ্ছিলেন।

একটু পরেই রাস্তাটা একটা গলির মুখে এসে পড়ল। আর তখনই লোক তিনটে মেয়েটাকে ধরে ফেলল।

মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। রাস্তার আলোয় ওর ভয় পাওয়া ফরসা মুখ ঝলসে উঠল।

বিশ্বনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বড়-বড় শ্বাস নিতে লাগলেন।

এতক্ষণ একটা ঝোঁকের মাথায় ছুটে এসেছেন। বয়েসটার কথা ভাবেননি। এখন যেন হঠাৎই খেয়াল হল, ওরা তিনজন, আর বিশ্বনাথ একা।

লোক তিনটে তখন মেয়েটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আর মেয়েটা প্রতিবাদ আর যন্ত্রণার চিৎকার করে উঠছিল বারবার।

রেণুকণা যে পাশেই ছিলেন বিশ্বনাথ টের পাননি। হঠাৎই শুনলেন ওঁর চাপা ফিসফিসে গলা: 'কী হল, যাও—মেয়েটাকে বাঁচাও...।'

'ওরা তিনজন—আর আমি একা...।' কাতর গলায় মিনমিন করে বললেন বিশ্বনাথ।

খিলখিল করে হাসলেন রেণুকণা: 'আরে পাগল! ওরা মানুষ—আর তুমি ভ্যাম্পায়ার! এই নতুন জীবনটাকে ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা করো। যাও!'

এই আদেশের পর আর কোনও কথা চলে না।

বিশ্বনাথ চোখের পলকে ছুটে চলে গেলেন জটলার কাছে। সামনে যে-লোকটাকে পেলেন তার হাত ধরে এক টান মারলেন।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বিশ্বনাথের দিকে ঘুরে তাকাল। এবং বিশ্বনাথের চেহারা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

কোন আক্কেলে এই বুড়োটা এই সংঘর্ষে নাক গলাচ্ছে?

বিশ্বনাথের বুকে সজোরে ধাক্কা দিল লোকটা। কাঁচা খিস্তি দিয়ে বলে উঠল, 'আবে সুড্ডা লাল্লু, ফাট। সালা রাস্তা মাপ—নইলে দোকানের ঝাঁপ খুলে দেব।'

কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা একটা ছুরি বের করে ফেলেছে লোকটা।

রাস্তার আলোয় ওকে ভালো করে দেখলেন বিশ্বনাথ।

এমনিতে ভদ্রলোকের মতো চেহারা, তবে কুতকুতে চোখে শয়তানির ছাপ রয়েছে। চোয়াল চওড়া, কাঠের মতো শক্ত। মুখ থেকে অশ্রাব্য গালিগালাজ আর মদের গন্ধ বেরোচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছিল, এসব কাজে লোকটা পুরোনো পাপী।

মেয়েটা বাকি দুজনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল আর 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' বলে চিৎকার করছিল। দুজনের একজন পিছন থেকে মেয়েটাকে কষে জাপটে ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বিশ্বনাথের নজরে পড়েছিল। এও খেয়াল করেছিলেন, এত হইচই সত্ত্বেও কোনও লোক অকুস্থলে এসে হাজির হয়নি। বরং দু-একজন রাতচরা মানুষ যা চোখে পড়ছিল তারা চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছিল।

প্রথম লোকটা বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে ছুরিসমেত হাত চালাল। ছুরির ধারালো ডগাটা বিশ্বনাথের বুক ছুঁয়ে গেল।

গায়ের জামাটা চিরে গেল কিনা বিশ্বনাথ বুঝতে পারলেন না, তবে একটা জ্বালা টের পেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। সামনে গলা বাড়িয়ে লোকটার ছুরি ধরা হাতে ভয়ংকর এক কামড় বসালেন। বাইটের নিয়ম মতো একটা কামড় বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড। কিন্তু এখন বিশ্বনাথ নিয়ম-টিয়ম সব ভুলে গেলেন। কচ্ছপের কামড়ের মতো চোয়াল চেপে রইলেন—যেন মেঘ না ডাকলে ছাড়বেন না।

লোকটা কিছুক্ষণ ঝটপট করল। কামড় ছাড়ানোর জন্য হাতটা একবার ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

তারপরই লোকটা ফুটপাথের ওপরে খসে পড়ল। যন্ত্রণার চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে-চিৎকার জড়িয়ে গিয়ে আলতো হয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল।

বিশ্বনাথ অদ্ভুত ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও!'

বাকি দুজনের মধ্যে যার হাতে কাজ কম ছিল সে একটা ছোট টর্চ বের করে বিশ্বনাথকে তাক করে বোতাম টিপল।

আসলে লোকটা বোতাম টিপেছিল কৌতূহল আর বিস্ময়ে। কারণ, আধো-আঁধারিতে বিশ্বনাথকে দেখে ওর কমজোরি প্রৌঢ় বলেই মনে হয়েছিল। তার সঙ্গে মোকাবিলায় সঙ্গীর এই হাল লোকটা মানতে পারছিল না।

কিন্তু টর্চের আলো বিশ্বনাথের মুখের ওপরে পড়তেই পলকে সবকিছু মেনে নিল।

বিশ্বনাথের ঠোঁটের কোণ থেকে রক্তের রেখা গড়িয়ে নেমে এসেছে থুতনির দিকে। বুকের কাছে জামাটা রক্তে ভেজা। মানুষটার চোখে অমানুষিক দৃষ্টি। আর ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে থাকায় রক্ত মাখা দাঁত দেখা যাচ্ছে, সেইসঙ্গে জিভেরও খানিকটা।

ফুটপাথে পড়ে থাকা সঙ্গীর দিকে ঘুরে গেল টর্চের আলো। আর সেই মুহূর্তে বিশ্বনাথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রাণের মায়া ভুলে।

ওই যে মাথার ভেতরে রেণুকণা বলছিলেন, '...নতুন জীবনটাকে ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা করো...।'

ভয় পাওয়া লোকটা হাত বাড়িয়ে আক্রমণটা ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল। বিশ্বনাথ পাগলের মতো ওর ডানহাতের কড়ে আঙুলটা কামড়ে ধরলেন। দু-হাতে আঁকড়ে ধরলেন শত্রুর ডানহাত। এবং এক ঝটকায় হাতটাকে বেঁকিয়ে দিলেন অন্যদিকে।

'মটাস' শব্দ হল একটা। বিশ্বনাথ আঙুল ভাঙার শব্দ আগে কখনও শোনেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা।

এবার লোকটার চিৎকারের পালা।

ওর হাত থেকে টর্চ ছিটকে পড়ল। সাঁড়াশি দিয়ে গলা চেপে ধরা শুয়োরের মতো বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল। ছুটও লাগাল একইসঙ্গে।

নিজের অজান্তেই বিশ্বনাথ দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গেলেন সামনের দিকে। তিননম্বর লোকটা বুঝল গল্প শেষ। তাই একটুও দেরি না করে মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে পালাল।

বিশ্বনাথ বাঁ-হাতের পিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছে নিলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। লজ্জায় গ্লানিতে একেবারে মরে যাচ্ছিলেন। পাগলের মতো এসব কী করলেন তিনি? ওই তো লোকটা পড়ে রয়েছে ফুটপাতে! বেঁচে আছে, না মরে গেছে? যদি সিক্রেট পুলিশ দেখে ফেলে এখন!

বিশ্বনাথ কী এক লজ্জায় মেয়েটার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। বোকার মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠান্ডা বাতাস ওঁকে ঘিরে খেলা করতে লাগল। বাতাস বলছিল, ‘শীত আসছে। বিশ্বনাথের গা শিরশির করছিল। একইসঙ্গে হালকা মদের গন্ধ নাকে আসছিল। বুঝলেন, মেয়েটা নেশা করেছে।

‘শিগগির পালিয়ে চলুন! পুলিশ দেখতে পেলে কেলেঙ্কারি হবে।’

মেয়েটার কথায় বিশ্বনাথ যেন জেগে উঠলেন। মেয়েটা ওঁর হাত ধরে টান মারল: ‘শিগগির ছুট লাগান! এদিকে—।’

অন্ধকার রাস্তা ধরে দৌড়তে শুরু করল মেয়েটি। আর ওর পিছন-পিছন বিশ্বনাথ।

একটু পরেই ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছে গেল।

মেয়েটার গাড়িটা জায়গামতো দাঁড়িয়ে। তবে যে-গাড়িটা ওঁকে ধাক্কা মেরেছিল সেটাকে দেখা গেল না।

ঝটপট গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল মেয়েটি। উলটোদিকের দরজাটা খুলে দিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল বিশ্বনাথকে: ‘কুইক!’

বিশ্বনাথ সিটে বসে দরজা বন্ধ করেছেন কি করেননি এক হ্যাঁচকায় গাড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তারপর ফাঁকা রাস্তা ধরে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলল।

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই মেয়েটি বলল, ‘থ্যাংকস ফর সেভিং মাই লাইফ।’ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর: ‘আমার নাম তিতলি। আপনার?’

‘বিশ্বনাথ। আপনাকে ওরা অ্যাটাক করেছিল কেন?’

‘সে অনেক ব্যাপার—পরে কখনও বলব।’ হঠাৎ বিশ্বনাথের জামার দিকে নজর গেল তিতলির: ‘আরে! আপনার জামাটা তো রক্তে ভিজে গেছে! শিগগির নার্সিংহোমে চলুন—একটা ব্যান্ডেজ-ফ্যান্ডেজ বেঁধে না দিলে...।’

বিশ্বনাথ সামান্য কাত হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। রুমালটা বাঁ-হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। চাপা শান্ত গলায় বললেন, ‘না, না, সেরকম কিছু হয়নি। জাস্ট একটু চিরে গেছে।’

কাটা জায়গাটা এখন বেশ চিড়বিড়-চিড়বিড় করছিল। ছুরিটা ধারালো হওয়ায় প্রথমটা কিছু টের পাননি। তবে জ্বালাটা সহ্য করতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। পুরোনো

জীবন হলে এই জ্বালাই হয়তো অসহ্য ঠেকত। তা ছাড়া বিশ্বনাথ জানেন, এই কাটা-ছেঁড়া নিয়ে নার্সিংহোমে যাওয়া মানেই সিক্রেট পুলিশকে নেমন্তন্ন করা।

'শিয়োর আপনার কষ্ট হচ্ছে না?' তিতলি উদ্বেগের গলায় জানতে চাইল আবার।

'উঁহু। একদম না...।'

তিতলি সন্দেহের চোখে কয়েক পলক বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে রইল।

তিতলির ফরসা মুখের ওপরে রাস্তার আলো পড়ছিল, সরে যাচ্ছিল। বিশ্বনাথ ওকে খুঁটিয়ে দেখলেন।

বয়সে কুড়ি কি বাইশ। গোল টলটলে মুখ। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত—মাথা নাড়লেই এপাশ-ওপাশ নড়ছে। চুলের একটা পাশ বোধহয় সোনালি রং করা।

তিতলির গলায় ফ্লুওরেসেন্ট পুঁতির মালা—আধো-আঁধারিতে লাল-নীল-সবুজ রং জ্বলছে। কানে একই ধরনের দুল। গায়ে কালো পোশাক। কবজিতে প্লাটিনামের ব্রেসলেট আর ঘড়ি। ডানহাতের আঙুলে পাশাপাশি একইরকম দুটো আংটি।

উইন্ডশিল্ডের সামনের তাকে রাখা ছিল একটা পারফিউমের শিশি। সেটা বাঁ-হাতে তুলে নিল তিতলি। 'শ-শ-শ' শব্দ করে নিজের গায়ে পারফিউম স্প্রে করল। তারপর সামনের রাস্তার দিকে আড়াচোখে নজর রেখে দেখল বিশ্বনাথের দিকে: 'পারফিউম নেবেন?'

বিশ্বনাথ হকচকিয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'না—না।' পারফিউমের কড়া গন্ধে বিশ্বনাথের অস্বস্তি হচ্ছিল।

'ওইরকম তিনটে ইয়াংম্যানের সঙ্গে এরকম ম্যাজিকের মতো লড়ে গেলেন কেমন করে?'

ওর কথাতেই জবাব দিলেন বিশ্বনাথ, 'সে অনেক ব্যাপার—পরে কখনও বলব।'

পারফিউমের শিশিটা তাকে ফিরিয়ে দিল তিতলি: 'চমৎকার। আমার কথায় আমাকেই দিলেন!'

'আমার দেওয়ার মতো কিছু নেই—।'

'তা হলে কি শুধু নেওয়া বাকি?'

'সেটাই বা পারছি কই?'

হেসে ফেলল, তিতলি: 'আপনার কথাবার্তা বেশ ইন্টারেস্টিং। আপনার সঙ্গে আমার জমবে।'

বিশ্বনাথ ওর কথা বুঝতে পারলেন না। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

'আপনি কি ভি-স্টিং প্রোভাইডার?' আচমকা প্রশ্ন করল তিতলি।

'হ্যাঁ—, এক সেকেন্ড সময় নিয়ে স্পষ্ট জবাব দিলেন বিশ্বনাথ। মেয়েটা তা হলে লড়াইয়ের সময় বিশ্বনাথকে ভালোভাবেই লক্ষ করেছে।

'আমি আগে কখনও কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার দেখিনি। আমার এক বন্ধু বাইট নেয়—আমি কখনও নিইনি। একবার চেখে দেখলে হয়!'

'নেশা করা খারাপ...।'

‘এটা কি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ?’ ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বলে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল তিতলি।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘নেশা করা খারাপ তো সো হোয়াট? আমার এই লাইফটাও তো খারাপ। যদিও তার জন্যে কোনও স্ট্যাটিউটরি ওয়ার্নিং দেওয়া ছিল না…।’

মেয়েটার লাইফটা খারাপ?

বিশ্বনাথ নিজের জীবনের কথা ভাবলেন—রেণুকণা চলে যাওয়ার পরের জীবনের কথা। সেটাকে মোটেই ভালো বলা যায় না। বরং ডক্টর মালাকারের দেওয়া এই নতুন জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে খারাপ লাগছে না।

‘আপনাকে কোথায় নামাব?’

‘যেখানে খুশি। তবে থাকি শ্যামবাজারে—নিউ টাউন, ফেস ফোর-এ।’

ব্রেকে চাপ দিল তিতলি, গাড়ির মুখ ঘোরাল: ‘চলুন, শ্যামবাজারেই আপনাকে নামিয়ে দিই। আমার হাতে কোনও কাজ নেই…।’

‘থ্যাংকস।’

‘আশ্চর্য।’ ভুরু উঁচিয়ে তাকাল: আপনি আমার জীবনদাতা—আর বলছেন ”থ্যাংকস”!’

‘অভ্যেস সহজে মরতে চায় না।’ বুকের জ্বালাটা হঠাৎ খোঁচা দিল। বিশ্বনাথ যন্ত্রণায় চোখ বুজলেন একবার।

‘আমি কোথায় থাকি জিগ্যেস করলেন না তো?’

‘আমার বয়েস বাষট্টি। ছাব্বিশ হলে জিগ্যেস করতাম—।’

খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল তিতলি। সে-হাসি আর থামতেই চায় না।

বিশ্বনাথ চুপ করে ওকে দেখতে লাগলেন।

‘ওঃ, আপনি তো দারুণ কথা বলেন! বাষট্টি উলটো ছাব্বিশ…’ হাসির দমকে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল তিতলি, ‘এনিওয়ে, আমি থাকি লালা লাজপত রায় সরণিতে। আর আমার বয়েস বাইশ—ওলটালেও একই থাকে।’

‘এত রাতে চৌরঙ্গিতে কী করছিলেন?’ কৌতূহল বিশ্বনাথকে কাঁটা ফোটাচ্ছিল।

‘সেসব কথা পরে হবে—’ মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ওড়াল তিতলি: ‘দিন, আপনার ফোন নাম্বার দিন।’

‘আমার পারসোনাল কোনও ফোন নেই।’

তিতলি এক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকাল বিশ্বনাথের দিকে। তারপর সহজভাবে বলল, ‘তা হলে আমার মোবাইল নম্বরটা লিখে নিন—।’

বিশ্বনাথের কাছে কাগজ-পেন ছিল না। তাই রাস্তার ধারে গাড়ি সাইড করল তিতলি। গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে পেন আর কাগজ বের করে রাস্তার আলোতেই ফোন নম্বর লিখে দিল।

কাগজের টুকরোটা বিশ্বনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ‘ফোন করবেন কিন্তু।’

বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বললেন।

‘প্রমিস?’ বিশ্বনাথের ডানহাতের পাতাটা নিজের মুঠোয় নিয়ে আন্তরিকভাবে জানতে চাইল।

বিশ্বনাথ অদ্ভুত মেয়েটার চোখে তাকালেন। বললেন, ‘গড প্রমিস।’

আবার গাড়ি ছোটাল তিতলি।

গাড়ির গতি আর দুরন্ত বাঁক নেওয়ার মধ্যে একটা খুশির ছাপ খুঁজে পেলেন বিশ্বনাথ। বুকের জ্বালাটা তখন আর টের পাচ্ছিলেন না।

বেশ মনে আছে, ব্রতীনকে সার্ভিস দিয়ে আসার পর রাতে ভালো করে দাঁত মেজেছিলেন। সেদিন রাতে কিছু খেতে ইচ্ছে করেনি। আলো নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিলেন বিছানায়। তারপর রেণুকণার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছিলেন।

‘আমি আজ যা করে এলাম সেটা কি পাপ?’

‘কে বলেছে পাপ! হঠাৎ এসব আজেবাজে কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?’

‘না...মানে...একটা অল্পবয়েসি ছেলেকে নতুন একটা নেশায় নামিয়ে দিলাম...।’

‘তুমি না গেলে, ”শটস অ্যান্ড কিকস” অন্য কোনও সি. ভি.-কে পাঠাত। তাছাড়া ব্রতীন তো আর মরে যায়নি। বরং কিছুটা আনন্দ পেয়েছে।’

শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ রেণুকণার যুক্তির কাছে হেরে গেছেন।

কিন্তু আজ? আজ কী বলবেন রেণু?

আজ রাতে বাড়িতে এসে কলিংবেল বাজাতেই আলোক বিরক্তভাবে দরজা খুলে দিল।

‘কী যে তোমার একটা বাজে অভ্যেস হয়েছে! নিশাচর প্রাণীর মতো রাত করে বাড়ি ফেরা!’ তারপরই রক্তে ভেজা শার্টটা চোখে পড়ল ওরঃ ‘কী ব্যাপার? রক্ত কিসের?’

বিশ্বনাথ শুধু ছোট্ট করে বললেন, ‘গুণ্ডারা অ্যাটাক করেছিল—।’

‘চমৎকার!’ আলোক ঠোঁটের কোণ দিয়ে কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে শূন্যে হাত নাড়ল: ‘এখন সিক্রেট পুলিশের ঝুটঝামেলা সামলাবে কে?’

‘কোনও ঝুটঝামেলা হবে না...।’ নীচু গলায় কথাটা বলে ছেলের কাছ থেকে সরে গেলেন বিশ্বনাথ। তিতলির মুখটা চোখের সামনে ভাসছিল। অপলকে সেটাই দেখছিলেন।

আশ্চর্য! যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক, বিশ্বনাথের আঘাত নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই তার—বরং পুলিশি ঝামেলার ভয়ে সে অনেক বেশি ব্যতিব্যস্ত।

আর যাকে তিনি চেনেন না জানেন না সে বলেছিল, ‘...শিগগির নার্সিহোমে চলুন...।’

একদলা থুতু এসে গেল মুখের ভেতরে। নিজের ঘরের দিকে যেতে-যেতে আড়চোখে দেখলেন পারমিতা ওদের শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে ঘেন্না এবং বিরক্তি।

নিজের ঘরে ঢোকার পর নতুন জীবনের অলৌকিক শ্রবণক্ষমতায় শুনতে পেলেন পারমিতার কথা, 'বুড়োটা দেখছি লায়েক হয়ে গেছে!'

জামা-টামা খুলে কাটা জায়গাটা ভালো করে পরখ করলেন। না, বিশেষ কিছু হয়নি—ইঞ্চিচারেক সামান্য চিরে গেছে। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে। তবে চিড়চিড়ে জ্বালাটা এখনও আছে।

তুলো দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করলেন বিশ্বনাথ। তারপর অ্যান্টিসেপটিক হিলার স্প্রে করে দিলেন। জ্বালাটা বেশ কমে গেল।

রাতে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে আবার রেণুকণার সঙ্গে কথা-যুদ্ধ।

ব্রতীনের বেলায়—যা ব্রতীনের মতো আরও অনেক ক্লায়েন্টের বেলায়—রেণুকণার যুক্তির কাছে কাবু হয়ে গেছেন বিশ্বনাথ।

কিন্তু আজ?

রেণুকণা বরাবর শান্ত, বুদ্ধিমতী। মৃত্যুর আগেও—পরেও। আজ বিশ্বনাথকে সুন্দর ঠান্ডা যুক্তি শোনালেন রেণুকণা।

একটা বাইশ বছরের মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে বিশ্বনাথ যা করেছেন, ঠিকই করেছেন। তা ছাড়া ফুটপাথে পড়ে যাওয়ার লোকটা যে মরে গেছে সে-কথা কে বলেছে! লোক তিনটে যেরকম ক্রিমিনাল টাইপের তাতে মনে হয় তারা এর আগে প্রচুর খুন-জখম-ডাকাতি করেছে। অনেক আগেই ওদের মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত ছিল। আক্ষেপ এটাই যে, দুটো গুন্ডা প্রাণে বেঁচে পালিয়েছে।

ব্যস। বিশ্বনাথ আবার ঠুঁটো জগন্নাথ।

সুতরাং পরদিন সকালে যখন রাস্তায় বেরোলেন তখন বিশ্বনাথ পালকের মতো হালকা। বড় রাস্তার মোড়ে সিক্রেট পুলিশের দুজন অফিসারকে দেখে মোটেই ঘাবড়ে গেলেন না। বরং ওদের একজনকে সময় জিগ্যেস করে ঘড়ি মেলালেন। তারপর পায়ে-পায়ে এগিয়ে একটা পাবলিক ফোন বুথে ঢুকে পড়লেন।

কাগজের চিরকুটটা দেখে তিতলির নম্বর ডায়াল করলেন বিশ্বনাথ। ও-প্রান্তে 'হ্যালো' শোনামাত্রই বললেন, 'বাইশ, কেমন আছ?'

'হু ইজ ইট?' ঘুমজড়ানো স্বরে তিতলি জিগ্যেস করল।

'বাষট্টি বলছি—।'

সঙ্গে-সঙ্গে চিনে ফেলার খিলখিল হাসি। তারপর: 'ও, আপনি!'

'কী করছ এখন, বাইশ?'

'ঘুমোচ্ছি—।'

'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলা যায় না কি?'

'যায় বলছি তো!' আবার হাসি।

'আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন কেন?'

'আজ দুপুরে আমার এখানে খাবেন। আমরা খেতে-খেতে গল্প করব।'

'ওখানে আর কে-কে আছে?'

‘কেউ না। আমি একা থাকি—আমার আর কেউ নেই...।’

তিতলির গল্পটা জানতে ইচ্ছে করল বিশ্বনাথের। মনে পড়ল, কাল রাতে ও বলেছিল, ‘...সে অনেক ব্যাপার...।’

বিশ্বনাথ যেতে রাজি হলেন। তিতলি ওঁকে বলে দিল কীভাবে ওর ফ্ল্যাটটা চিনে নেওয়া যাবে। তারপর জিগ্যেস করল, ‘শিয়োর আসছেন তো? প্রমিস?’

বিশ্বনাথ হেসে বললেন, ‘গড প্রমিস—।’

বাড়ি ফিরে বিশ্বনাথ শেভ করলেন। অনেক বাছাবাছির পর একটা শার্ট প্যান্ট পছন্দ করে পরে নিলেন। বহুদিন পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন। মুখে পাউডার, ক্রিম লাগালেন। তারপর অযত্নে পড়ে থাকা একটি পারফিউমের শিশি খুঁজে বের করে জামায় বেশ কয়েকবার স্প্রে করলেন।

মনের ভেতরে একটা খুশি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এমন খুশি যে-খুশি সবাইকে ক্ষমা করতে শেখায়। হয়তো সেইজন্যই বেরোনোর সময় পারমিতার ভ্রূকুটি আর ভিক্টরের গজরানিকে ক্ষমা করে দিলেন।

পারমিতার দিকে না তাকিয়েই আলতো করে বললেন, ‘একটু বেরোচ্ছি। দুপুরে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন...।’

পারমিতার দিকে না দেখলেও বুঝতে পারলেন বউমা কী নজরে গলগ্রহ অকর্মণ্য শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তিতলির ফ্ল্যাটে পৌঁছতে খুব একটা অসুবিধে হল না বিশ্বনাথের। কলিংবেল বাজাতেই দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ পেলেন। ম্যাজিক আই-এ চোখ রাখার জন্য কয়েক সেকেন্ড সময় গেল বোধহয়। তারপর দরজা খুলে গেল, সামনে তিতলি।

‘আমার দেরি হয়নি তো, বাইশ?’ বিশ্বনাথ হেসে জিগ্যেস করলেন।

‘একটুও না। আসুন, ভেতরে আসুন—।’

ফ্ল্যাটের ভেতরে পা দিলেন বিশ্বনাথ। চারপাশটা দেখে মনে হল স্বর্গ। কিন্তু স্বর্গটা নরকের মতো লন্ডভন্ড, অগোছালো।

আসার সময় বিশ্বনাথ বাইশটা লাল গোলাপ দিয়ে একটা সুন্দর তোড়া তৈরি করিয়েছিলেন। সেটা তিতলির হাতে দিয়ে বললেন, ‘এটা নাও। বাইশকে বাইশটা গোলাপ দিয়ে অভিনন্দন।’

তিতলি তোড়াটা দু-হাত বাড়িয়ে নিল। লম্বা শ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকল। বলল, ‘আঃ দারুণ। বেশিক্ষণ শুঁকলে নেশা হয়ে যেতে পারে।’

তিতলির সঙ্গে বসবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন বিশ্বনাথ। চারপাশে ভালো করে নজর বোলাতে লাগলেন।

ঘরের সর্বত্র বিস্তর খরচের ছাপ। সোফা সেট, চায়ের টেবিল, ক্যাবিনেট সবই স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। তার সঙ্গে অতি আধুনিক ট্যাপেস্ট্রি।। ডিজিটাল প্লেট টিভি, সারাউন্ড থিয়েটার, ওয়ালস্ক্রিন টেলিফোন—কী নেই ঘরে! কিন্তু সব জিনিসই

এলোমেলোভাবে রাখা। ওদের ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখার জন্য কেউ সময় দেয়নি। আর ধুলোও ছড়িয়ে আছে নানান জায়গায়।

বিশ্বনাথ লক্ষ করলেন, দেওয়ালে মাস্টারদের গোটাতিনেক ওরিজিন্যাল অয়েল পেইন্টিং। ঘরের এক কোণে ব্রোঞ্জের একটা মডেল। আর জানলায় রঙিন সুতোর বল দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ধরনের ঝুলন্ত পরদা।

সারা ঘরে মোলায়েম একটা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিশ্বনাথ কয়েকবার নাক টেনে ঘ্রাণ নিলেন। তারপর একটা সোফায় বসে পড়লেন। তাকালেন তিতলির দিকে।

ঘরটার মতো তিতলিও অগোছালো, কিন্তু ওকে দারুণ লাগছিল বিশ্বনাথের।

বোধহয় একটু আগে স্নান করেছে। কানের দুপাশে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো যে ভিজে সেটা বোঝা যাচ্ছে। গায়ে একটা গোলাপি শার্ট, পায়ে সাদা পাজামা। গলায় সরু প্লাটিনামের চেন, কানের লতিতে সরষের মতো দুটো প্লাটিনামের ফুটকি।

তিতলি জিগ্যেস করল, 'কাটা জায়গাটা কেমন আছে?'

'ঠিক আছে।' বিশ্বনাথ বুকে দুবার আলতো চাপড় মেরে প্রমাণ দিলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ফুল ভালোবাসো?'

'কেন বাসব না! সবাই ভালোবাসে।' ফুলের তোড়াটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল তিতলি: 'তা ছাড়া আমার হাতে তো বেশি সময় নেই! তাই আমার সবকিছু ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।'

'কেন, সময় বেশি নেই কেন? তুমি তো সবে বাইশ!'

মলিন হাসল তিতলি। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বিশ্বনাথের মুখোমুখি বসে পড়ল। বিশ্বনাথ কাল রাতের পারফিউমের গন্ধটা পেলেন। সেইসঙ্গে সিগারেটের গন্ধও।

'বলছি। আগে একটু কফি খান।' চট করে উঠে পড়ল। হেসে বলল, 'আমি রান্নাবান্না কিছু জানি না। শুধু চা আর কফি বানাতে পারি।'

'তা হলে দুপুরে খাব কোথায়? বাইরে?'

'না, এখানে। কাছেই একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ আছে। বেশ ভালো। ওখানে ফোন করে বলে দিয়েছি। একটা নাগাদ খাবার এসে যাবে। এক মিনিট বসুন, কফিটা করে নিয়ে আসি —।'

প্রায় পাঁচমিনিট পরে কফির কাপ আর বিস্কুট ট্রে-তে সাজিয়ে হাজির হল। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখতেই বিশ্বনাথের চোখে পড়ল কফির কাপের পাশেই বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট আর শৌখিন লাইটার।

সোফায় বসে বিশ্বনাথের হাতে কফির কাপ এগিয়ে দিল তিতলি। নিজেও নিল। কফির কাপে কয়েক চুমুক দেওয়ার পরই সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিল। বিশ্বনাথের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল: 'লাইক আ স্মোক?'

মাথা নেড়ে 'না' জানালেন বিশ্বনাথ। আগে সিগারেটের নেশা ছিল। রেণুকণা তাই নিয়ে দিনরাত আপত্তি করতেন। রেণুকণা মারা যাওয়ার পর ওই নেশাটা ছেড়ে দিয়েছেন।

তিতলি মাথা নীচু করে সিগারেট ধরাল।

'নিন, কফি খান। বোধহয় তেমন ভালো হয়নি।'

‘তা কেন? ভালোই তো হয়েছে!’ কাপে লম্বা চুমুক দিলেন বিশ্বনাথ।

‘কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ারের লাইফ আপনার কেমন লাগছে?’ ধোঁয়া ছেড়ে জিগ্যেস করল তিতলি।

‘আগের লাইফের চেয়ে অনেক ভালো...।’

‘আগের লাইফ মানে?’

কফি খেতে-খেতে বিশ্বনাথ তার আগের লাইফের গল্প বলতে লাগলেন।

বাষট্টির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বাইশ সেই গল্প শুনতে লাগল। শুনতে-শুনতে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, সিগারেটটা কখন ছোট হয়ে গেছে খেয়ালই করেনি। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে জেগে উঠল তিতলি।

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনাথ তখনও গল্প বলেছিলেন। হঠাৎ, কী মনে হল কে জানে! তিতলির কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তিতলিও একটা ধরাল।

রেণুকণার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বনাথের চোখে জল এসে গেলে। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ মুছলেন। ঘষা গলায় বললেন, ‘এখনও আমি মনে-মনে ওর সঙ্গে কথা বলি। ও-ই আমার কথা বলার লোক।’

সব শোনার পর তিতলি অনেকক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল। তারপর বলল, ‘বাষট্টি, আমার ওসব প্রবলেম নেই। কারও সঙ্গে রিলেশান থাকলে—তারপর সেটা কেটে গেলে, তবে না তাকে মিস করব...।’

বিশ্বনাথ ওর গলায় বাষট্টি শোনামাত্রই চোখ তুলে তাকালেন। ওর কথার পিঠে বললেন, ‘তোমার সঙ্গে কারও রিলেশান হয়নি...সেটা ভাবা যায় না। তুমি এত সুন্দর...।’

‘আপনি দেখছি ছাব্বিশের মতো কথা বলছেন!’

‘সরি।’ ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন বিশ্বনাথ। একটু থেমে বললেন, ‘ঠিকই বলেছ। একটা বয়েসের পর সত্যি কথা বলতে নেই—বেমানান লাগে—।’

‘আমি কিন্তু হার্ট করতে চাইনি। জাস্ট একটু মজা করছিলাম—।’

‘আগের প্রশ্নটা আবার করতে পারি?’ অনুমতি চাওয়ার ঢঙে বললেন বিশ্বনাথ।

‘কোন প্রশ্ন?’

‘কারও সঙ্গে রিলেশান হয়নি কেন?’

একটু ইতস্তত করে তিতলি বলল, ‘আপনাকে সত্যি কথাটা বলছি। কাল আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তা না হলে আজ এত কথা কার সঙ্গে বলতাম।’ মাথার চুলে হাত বোলাল। ভঙ্গিটা বিশ্বনাথের ভালো লাগল। আরও মনে হল, একটা বয়েসের পর এই ভালো লাগাটা অন্যায়।

তিতলি সময় নিচ্ছিল। এপাশ-ওপাশ তাকাল অকারণেই। তারপর খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলার ঢঙে আলতো স্বরে বলল, ‘সেই ছোটবেলায় একজনের সঙ্গে রিলেশান হয়েছিল। তখন আমি পনেরো। ও-ই আমাকে আমার শরীরটাকে চিনিয়েছিল। ও ছাড়া আমাকে আর কেউ ভালোবাসত না—আমার বাবা-মাও না।’

বিশ্বনাথের দিকে চোখ ফেরাল। চোখের কোণে হিরের কণা।

‘কেন? বাবা-মা নয় কেন?’

‘বাবা মেয়ে চায়নি। আমার জন্মের পর যখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়েছিল...।’ আবার জানলার দিকে তাকাল তিতলি।

বিশ্বনাথ ওর মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

চট করে বিশ্বনাথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল: ‘এসব কথা আপনাকে বলছি...এগুলো ভীষণ পার্সোনাল...মানে...।’

বিশ্বনাথ বুঝলেন তিতলির ভেতরে একটা লড়াই চলছে। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। বিশ্বনাথ সুবোধ ছাত্রের মতো অপেক্ষা করে চললেন।

একসময় মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। বলল, ‘টু হেল উইথ সো কলড সিক্রেটস!’ মুখ তুলল, ঠোঁট কামড়াল। তারপর: ‘আমাদের রিলেটিভসরা সবাই আমাকে আর মা-কে দেখতে এসেছে। আমার এক মাসি হঠাৎ বাবাকে লক্ষ করে বলল, ‘কী সুন্দর দেখতে হয়েছে না! ঠিক মন্দিরার মুখটা যেন বসানো। কী দারুণ লাগছে, তাই না!”

‘মন্দিরা আমার মায়ের নাম। বাবা ”মণি” বলে ডাকত। তো মাসির কথা শুনে বাবা সেই কথাটা বলেছিল...।’

‘কী কথা?’ আড়ষ্ট গলায় জানতে চাইলেন বিশ্বনাথ।

‘বাবা মাসিকে বলেছিল, ”পরীক্ষায় ফেল করলে যেমন লাগে আমার ঠিক সেরকম লাগছে।” কথাটা শুনে মা নাকি সবার সামনে কেঁদে ফেলেছিল।’

‘তুমি জানলে কী করে?’

‘আমি বড় হওয়ার পর বাবার সঙ্গে মায়ের একদিন তুমুল ঝগড়া লেগেছিল। বাবা রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন মা হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে...কথাগুলো ...বলেছিল আমাকে...।’

চোখে জল জমে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিতলি চোখ না বুজে জোর করে তাকিয়ে রইল। জলের ফোঁটা ওর গালে গড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। সিগারেটটা বিশ্বনাথের তেতো লাগছিল। ওটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তিতলিও কখন যেন হাতের সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে দিয়েছে।

বিশ্বনাথ নরম গলায় জিগ্যেস করলেন, ‘মা ভালোবাসত না?’

‘বাসত—’ ধরা গলায় তিতলি বলল।

‘তারপর?’

‘আমার জন্মের পর থেকে মায়ের সঙ্গে বাবার রিলেশানটা ধীরে-ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বেশ কয়েক বছর পর মায়ের মনে হল, আমার জন্যেই এমনটা হচ্ছে—আমি নাকি অপয়া।’ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মুখ ভার করে বসে রইল। তারপর: ‘কী আর বলব! বাবার বাইরের টান ছিল...মা সেটা জানত। আমি তো ছোট ছিলাম...অতসব বুঝতাম না। মা বলত, ”পরীক্ষায় ফেল করার পর থেকে তোর বাবার বাইরের নেশা বেড়েছে। এখনও বুঝিসনি তুই অপয়া!” আমি আস্তে-আস্তে বুঝতে শিখছিলাম...। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে মনে-মনে অনেক দূরে চলে গেলাম...একা হয়ে গেলাম...।

'তারপর...পনেরোয় পা দিলাম। ও এল...চলেও গেল। ব্যস, গল্প শেষ!'

বিশ্বনাথের দিকে মুখ তুলে হাসল তিতলি। চোখে তখনও জল। জল মুছল। তারপর দু-হাত শূন্যে ঘুরিয়ে আনন্দের ভঙ্গি করে বলল, 'দুর! ওসব পুরোনো কথা ভেবে কোনও লাভ নেই। হাতে বেশি সময় নেই, বাষট্টি। তাই আমি লাইফের সবরকম দেখতে চাই...।'

বিশ্বনাথের মনে হল, তিতলি এখন আর মুখ খুলবে না। তাই স্বাভাবিক গলায় ফিরে আসার চেষ্টা করে বললেন, 'কেন লাইফ কি সিনেমা নাকি? যেখানে সবরকম মশলা পাওয়া যায়?'

'না তো কী!' একলাফে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বিশ্বনাথ দেখছিলেন, মেয়েটা কেমন পালটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওর একটু আগের কষ্টমাখা মুখটাকে বদলে ফেলতে চাইছে একপলকে।

'কাল রাতে লোকগুলো তোমাকে অ্যাটাক করেছিল কেন?' সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে গেলেন বিশ্বনাথ।

'ওসব পরে হবে। চলুন, আপনাকে আগে ফ্ল্যাটটা ভালো করে দেখাই—' তিতলি ওর শোওয়ার ঘরের দিকে রওনা হল। বিশ্বনাথকে আসার জন্য ইশারা করে বলল, 'ফ্ল্যাটটা নেহাত খারাপ না—কী বলেন!'

'দারুণ ভালো—' ফ্ল্যাটের তারিফ করলেন বিশ্বনাথ, 'শুধু একটু অগোছালো—।

'হ্যাঁ। জাস্ট লাইক মাই লাইফ।'

এরপর ওরা দুজনে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে দেখতে লাগল।

বিশ্বনাথ ফ্ল্যাটের মার্বেল করা মেঝেতে বেশ সহজভাবেই ঘোরাফেরা করছিলেন। ওঁকে মোটেই অতিথি বলে মনে হচ্ছিল না।

ড্রইংরুম, ডাইনিং স্পেস, বেডরুম, গেস্টরুম—সবই ঝকঝকে, সর্বত্র বিলাসের আদর মাখানো।

বিশ্বনাথ তিতলির বিছানা দেখলেন, আধুনিক খাট দেখলেন, জামাকাপড় রাখার শৌখিন আলনা দেখলেন, এয়ারকুলার দেখলেন, দেখলেন পড়াশোনার টেবিল-চেয়ার। কিন্তু টেবিলে বইপত্রের বদলে পড়ে আছে সিগারেটেরপ্যাকেট, মদের বোতল, স্ম্যাকের পুরিয়া।

বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল বিশ্বনাথের। ওর দিকে তাকিয়ে অকারণেই জিগ্যেস করলেন, 'এসব নেশার জিনিস কার?'

'কার আবার? ইউ গেস।' থুতনি উঁচিয়ে বিদ্রোহী সুরে বলল তিতলি।

বিশ্বনাথ চুপ করে গেলেন। সামনের খোলা জানলার দিকে তাকালেন। সামনের বাড়ির দেওয়ালে রোদ পড়েছে, কার্নিশে দুটো চড়ুই।

ওরা আবার ড্রইংরুমে এসে পড়ল। সোফায় অলসভাবে বসে নানান গল্প শুরু করল।

সন্ধের মুখে তিতলির ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তিতলি 'আবার আসবেন কিন্তু' বলছিল। হঠাৎই ও 'একমিনিট—' বলে ছিটকে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই একটা গোলাপ নিয়ে ফিরে এল। বলল, 'আপনার দেওয়া বাইশটা থেকে একটা নিয়ে এলাম—আমার জীবনদাতার জন্য। এটা রাখুন—।'

বিশ্বনাথ হেসে বলনে, 'কোনও মানে হয়!'

অথচ বিশ্বনাথ কল্পনায় একটা সাদা কার্ড দেখতে পাচ্ছিলেন—ফুলটার বোঁটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আর কার্ডে গোটা-গোটা হরফে লেখা: 'বাষট্টিকে বাইশ।'

ফুলটা পকেটে নিয়ে এক অনুপম ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে এলেন।

দিনগুলো কীভাবে কাটছিল বিশ্বনাথের ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না।

ক্লায়েন্টদের ভি-স্টিং দেওয়ার কাজ যেমন চলতে লাগল তারই সঙ্গে চলল তিতলিকে নিয়ে ব্যস্ততা।

প্রথম দিন ওর ফ্ল্যাট থেকে ফিরে প্রায় সারা রাত গোলাপটাকে নিয়ে কত কী না ভেবেছেন বিশ্বনাথ! রেণুকণার সঙ্গেও অনেক কথা বলেছেন।

রেণুকণা বলেছেন, 'দ্যাখো, ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্যের ব্যাপার নয়—তোমাকে খুশি দেখলেই আমি খুশি। এর বেশি আমি কিছু চাই না...।'

পরদিন রাস্তায় বেরিয়ে ফোনবুথ থেকে তিতলিকে ফোন করেছিলেন বিশ্বনাথ।

আজ সকালে বাইরে বেরিয়েও বিশ্বনাথের মনে হল, বাইশকে ফোন করলে কেমন হয়।

সঙ্গে-সঙ্গে ফোন বুথ। নম্বর ডায়াল। ক্রি-রি-রিং। এবং 'হ্যালো'।

'বাইশ, কেমন আছ?'

'ভালো। সবে ঘুম থেকে উঠছি।'

'এখন দশটা বাজে—।'

'অনেক রাতে শুয়েছি যে।'

'আমিও। তুমি এত রাত পর্যন্ত কী করছিলে?'

'ভাবছিলাম। আর নেশা করে বুঁদ হয়ে ছিলাম। এখনও হ্যাং-ওভার কাটেনি...।'

'নেশা করা খারাপ।'

'আবার গোরু রচনা! আমার সবচেয়ে খারাপ নেশাটা করতে ইচ্ছে করছে—দারুণ জমবে।'

'সেটা কী?'

'আহা! জানেন না যেন!' একটু হাসল। তারপর: 'ভি-স্টিং...বাইট। এখনও পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে মারাত্মক নেশা। টিভিতে বলছিল...।'

'নেশা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।'

'ওঃ! মাই গুডনেস!'

'যাকগে—আজ কী আমাদের দেখা হচ্ছে?'

‘অফ কোর্স...সন্ধেবেলা চলে আসুন...।’

বিশ্বনাথ একলহমা চিন্তা করে নিলেন। ঠিক করলেন, বিকেলে কমিউনিটি পার্কে বেড়ানো আর আড্ডা দেওয়ার পর অনায়াসে তিতলির ফ্ল্যাটে যাওয়া যেতে পারে।

‘যাব। সাতটা নাগাদ। অসুবিধে হবে?’

খিলখিল হাসি। তারপর: ‘ভদ্রতা লিমিট ছাড়িয়ে গেলে তাকে ন্যাকামি বলে। অফ কোর্স সাতটায় আসবেন...।’

‘ছাড়ছি তা হলে...।’

‘না, না—একটা জরুরি কথা আছে।’ সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল।

‘কী?’

‘কাল রাতে একটা লোক ফোন করেছিল। ফোনে থ্রেট করছিল...।’

‘চেনা?’

‘না—।’

‘তো আগে জানালেই পারতে...।’

‘কী করে জানাব?’

বিশ্বনাথ যেন হঠাৎই বুঝতে পারলেন, ওঁর কোনও ফোন নেই।

তিতলি তক্ষুনি ওঁর মনের কথাটা উচ্চারণ করল, ‘আপনি একটা মোবাইল ফোন কিনে নিন—আজকেই।’

‘ঠিক বলেছ।’

‘সেদিন রাতে আপনাকে সামনে পেয়ে আজেবাজে সব ভাট বকে গেছি। হেভি বোর করেছি। কিছু মাইন্ড করবেন না।’

‘সে তো আমিও বেশ লম্বা অটোবায়োগ্রাফি রিডিং পড়ে শুনিয়েছি।’ একটু থামলেন। তারপরে: ‘এবার আজকের কথা বলো...।’

‘সাতটায় মনে করে আসবেন। আমরা আজ গাড়ি নিয়ে যেদিকে দু-চোখ-যায় ঘুরতে বেরোব। রাস্তায় কোথাও ডিনার করে নেব।’

‘তাই হবে। কিন্তু ওই ফোনটার কথা শুনে ভয় করছে...।’

হাসল তিতলি। বলল, ‘ভয় পাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।...মনে থাকে যেন। সাতটায়।’

তিতলি ‘বাই’ বলে লাইন কেটে দিল।

বিশ্বনাথ চিন্তা করে দেখলেন, ওঁর এখন যা আর্থিক অবস্থা তাতে অনায়াসেই একটা মোবাইল ফোন কেনা যায়।

সন্ধেবেলা তিতলির ফ্ল্যাটে রওনা হওয়ার আগে সত্যি-সত্যিই একটা মোবাইল ফোন কিনলেন। বাড়তি টাকা দিয়ে নম্বরটা এমন বাছলেন যেন বাইশ আর বাষট্টি সংখ্যা দুটো নম্বরে পাশাপাশি থাকে। দোকানদারের কাছ থেকেই মোবাইলের প্রাথমিক কলাকৌশল শিখে নিলেন।

বাস স্টপেজ থেকে এসি চেয়ার কারে ওঠার আগে দুটো গোলাপ কিনলেন বিশ্বনাথ। দুটোই তিতলিকে দেবেন—তারপর একটা ফিরিয়ে নেবেন নিজের জন্য।

তিতলির ফ্ল্যাটে পৌঁছে মোবাইল ফোন আর গোলাপ দেখিয়ে ওকে চমকে দিলেন বিশ্বনাথ। গোলাপ দুটো ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে একটা আমি যাওয়ার সময় নিয়ে যাব...আমার জন্যে...।'

বিশ্বনাথকে ভেতরে ডেকে নিল তিতলি। মোবাইল ফোনের নম্বর নিয়ে ওঁকে ঠাট্টা করল।

ওকে নয়ন মেলে দেখতে লাগলেন বিশ্বনাথ।

কালো আর ছাই রঙের ছক কাটা ছোট হাতার একটা টপ পরেছে। তার বুকের কাছটায় লাল হরফে লেখা: 'আই অ্যাম মি।' পায়ে হলদে প্যান্ট, তাতে কালি ছেটানোর মতো কালো-কালো স্পট। গলায় অন্যরকম একটা চেন, কানের লতিতে ঝুরির মতো দুল, হাতে ব্রেসলেট।

বাইরের সন্ধের সঙ্গে মেয়েটা বেশ মানিয়ে গেছে। ওকে ঘিরে একটা সুগন্ধী বাতাস খেলে বেড়াচ্ছিল।

তিতলি আর দেরি করল না—বিশ্বনাথকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ও যে গাড়ি চালানোয় বেশ পটু তা আগের দিনই টের পেয়েছিলেন বিশ্বনাথ। আজও ওকে লক্ষ করছিলেন। কী সহজ অনায়াস ভঙ্গিতে স্টিয়ারিং, ব্রেক, ক্লাচ, অ্যাকসিলারেটর নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে!

বিশ্বনাথকে প্রথমে একটা গেমস পারলারে নিয়ে গেল তিতলি।

বিশাল মাপের তিনতলা পারলার। তাতে নানান ধরনের চোখধাঁধানো খেলা চারপাশে রঙিন আলো। লোকজনের ভিড়। চারটে ট্রান্সপারেন্ট এলিভেটর ব্যস্তভাবে ওঠা-নামা করছে। মাঝে-মাঝে মেগাফোনে নানারকম অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে। সারি-সারি ক্যাশ-কাউন্টার থেকে ইলেকট্রনিক স্মার্ট কার্ড কুপন বিক্রি হচ্ছে। কোনও নির্দিষ্ট গেমের স্লটে কার্ডটা টানলেই গেমের চার্জ বিয়োগ হয়ে যাবে।

এলিভেটরে দোতলায় উঠে 'নাইন স্টিকস' নামে একটা খেলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। ন'টা রং-বেরঙের লাঠি পাশাপাশি দাঁড় করানো আছে। প্রায় ছ'-সাত মিটার দূর থেকে একটা বড় মাপের বল গড়িয়ে দিতে হবে লাঠিগুলোর দিকে। লাঠিগুলোর মধ্যে একটা কাঠের, আর বাকিগুলো হলোগ্রাম ইমেজ। কিন্তু দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। পাঁচবার বলটা গড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে খেলোয়াড়। তার আসল কাজ হল, কাঠের লাঠিটায় বল লাগানো। সেটায় ধাক্কা লাগলেই 'ঠক' করে শব্দ হবে। প্রথম তিনটে থ্রো-র মধ্যে আসল লাঠিটা হিট করতে পারলে পাওয়া যাবে পুরস্কার।

হইহই করে খেলায় নেমে পড়ল তিতলি। বিশ্বনাথকেও নামিয়ে দিল। একবার এই খেলা, আর একবার সেই খেলায় নাম দিয়ে বিশ্বনাথকে পাগল করে দিল। ওর সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করতে-করতে বিশ্বনাথও যেন বাইশ হয়ে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পর গেমস পারলার থেকে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। বেশ কিছু টাকা প্রাইজমানি হিসেবে পেয়েছে তিতলি। ও খুশিতে বিশ্বনাথকে একটা আলতো ধাক্কা দিয়ে

বলল, ‘বাষট্টি, আপনি ভীষণ পয়া। দেখলেন, কত টাকা প্রাইজ পেলাম!’

বিশ্বনাথ হাসলেন।

আবার গাড়িতে চড়ে ওরা ছুট লাগাল।

এবারে তিতলি গিয়ে থামল ‘রিল্যাক্স’ নামের একটা অ্যাডিকশান জয়েন্টে। এখানে নেশার সবরকম খোরাক পাওয়া যায়।

তিতলি বলল, ‘এখানে আমি প্রায়ই আসি—।’

‘রিল্যাক্স’-এর বাইরে লাল-নীল নিওন সাইন দিয়ে বিরাট হরফে লেখা রয়েছে: ‘ইউ মাস্ট বিএইটিন টু এনটার’ তার মধ্যে ‘এইটিন’ কথাটা লাল রঙে সংখ্যায় লেখা।

ভেতরে ঢুকে বেশ অবাক হলেন বিশ্বনাথ। যদিও জানতেন চারপাশে এসব চলছে, তবুও নিজে কখনও এরকম আস্তানায় আগে আসেননি।

চতুর্দিকে আলোর মেলা। তারই মধ্যে আলো দিয়ে ছবি আঁকা সব বিজ্ঞাপন। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনই নানান লিকার কোম্পানির। তা ছাড়া আছে নেশা করার কিছু ড্রাগের বিজ্ঞাপন। আর লুকোনো স্পিকার থেকে ভেসে আসছে রক মিউজিক।

সত্যি, নেশা-প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে!

একটা রঙিন ফুলের ছবি চোখে পড়ল। সেটা রোজ দু-মিনিট করে শুঁকলেই অদ্ভুত নেশা হবে। আর মাসে একবার ফুলটাকে রিচার্জ করে নিতে হবে। সেইরকম দাবি করেছে একটি কোম্পানি।

বিশ্বনাথ অবাক শিশুর চোখে জগৎটাকে দেখছিলেন।

বিশাল হলঘরের নানা জায়গায় দাঁড় করানো আছে মদের স্লট মেশিন। তাতে বোতাম টিপে স্মার্ট কার্ড টানলেই গ্লাসে পরিমাণ মতো তরল পাওয়া যাবে। একটা কোণে ওয়াইড স্ক্রিন প্লেট টিভি-তে সিনেমা চলছে। ডানপাশের একটা লম্বা কাউন্টারে ড্রাগের সুদৃশ্য পলিপ্যাক বিক্রি হচ্ছে। কাউন্টারের মাথায় নিওন সাইনে লেখা ‘স্ম্যাক জ্যাক’। আর কাউন্টারের সামনে উঁচু টুলে বসে আছে ঝিম মেরে যাওয়া খদ্দেররা।

হলে সাজানো চেয়ার-টেবিলের মেলা ছাড়িয়ে দূরের একটা অঞ্চলে লাল নিওন সাইনে লেখা ‘হট স্পট’। সেখানে সিলিং থেকে লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলো ঠিকরে পড়েছে। সেই আলের নীচে চলেছে মাতালদের ছন্দহীন উদ্দাম নাচ।

বিচিত্র সব নেশার গন্ধে বিশ্বনাথ পাগল হয়ে গেলেন। তেজি ঘ্রাণশক্তি ওঁকে আরও বিব্রত করে দিচ্ছিল। ভাবছেন বেরিয়ে যাবেন কি না, ঠিক তখনই ওঁর হাত ধরে টান মারল তিতলি।

‘চলুন, ওইখানে গিয়ে বসি—।’ একটা খালি টেবিলের দিকে আঙুল তুলে দেখাল মেয়েটা।

‘বসব? কেন’ বিশ্বনাথের গলায় আপত্তির ছোঁয়া।

‘ভী-ষণ তেষ্টা পাচ্ছে।’ অনুনয় করে বলল। একটা কাউন্টারে সাজানো রঙিন বোতলের সারির দিকে দেখাল।

‘না!’

‘না কেন? আমার যে অভ্যেস...। তা ছাড়া এখানে বসে খাওয়ার মজাই আলাদা...।’

একটু চুপ করে রইলেন বিশ্বনাথ। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি তা হলে বোসো—আমি যাই!'

তিতলি এবার বিশ্বনাথের হাত ধরে ফেলল: 'সেটা কখনও হয় নাকি! আপনি আমার গেস্ট...।'

'তা হলে চলো...চলে যাই। এখানে আমার ভালো লাগছে না!'

ছোট বাচ্চার বায়না করার ভঙ্গিতে তিতলি বলল, 'একবার—জাস্ট একবার!'

বিশ্বনাথ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন।

তিতলি কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। তারপর বিশ্বনাথের চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কথা শুনব, যদি আপনি আমার কথা শোনেন—।'

'কী কথা?'

'আমি আপনার কাছে বাইট নেব—আজ রাতে।'

বিশ্বনাথ একটা জোরালো ধাক্কা খেলেন। বাইশ বলে কী!

কিন্তু বাইশ জেদ ধরে বসে রইল। বিশ্বনাথের কোনও জ্ঞানের কথা সে শুনতে রাজি নয়।

কথা কাটাকাটি করতে-করতেই ওরা 'রিল্যাক্স'-এর বাইরে বেরিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত তিতলি এমন কথাও বলে বসল, 'আপনি এত আপত্তি করছেন কেন বুঝতে পারছি না। যা চার্জ লাগে আমি দেব...।'

বিশ্বনাথ যে বেশ আহত হলেন সেটা ওঁর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল। আর কোনও তর্কাতর্কির মধ্যে গেলেন না। তিতলির সঙ্গে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বিশ্বনাথ জিগ্যেস করলেন, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'আমার ফ্ল্যাটে—এখন বাইরে ডিনার করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে ফ্রিজের লেফট ওভার গরম করে দুজনে খেয়ে নেব, কেমন।' গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল তিতলি। চোখ সামনের রাস্তার দিকে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। কখন যেন ধরিয়েছে।

বিশ্বনাথ কয়েক পলকে ওকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমি নেমে যাব। বাইট কোথায় পাওয়া যায় সে-কনট্যাক্ট নম্বর তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে নামিয়ে দাও...।'

তিতলি তাকাল। হাসল। বলল, 'রাগ হয়েছে? অন্য কারও কাছে বাইট নেব না—আপনার কাছেই নেব।'

'কেন?'

'আপনি স্পেশাল, তাই—।'

'কেন, স্পেশাল হতে যাব কেন?'

খিলখিল করে হাসল তিতলি। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'রিল্যাক্স-এ তো প্রচুর লোক নেশা করছিল—আপনি শুধু আমাকে বারণ করলেন কেন?'

বিশ্বনাথের মুখে রক্তের ঝলক ছুটে এল। লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন।

তিতলি থুতনি উঁচু করে বলল, 'আপনাকে আমি গাড়ি থেকে নামতে দেব না। দেখি আপনি কী করেন।'

বিশ্বনাথ একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি কিছুই করব না। হেরে ভূত হয়ে গেছি।'

'দ্যাটস লাইক আ গুড বয়। আমি চাই আমাকে আজ রাতে ভূতে ধরুক।'

বিশ্বনাথ চমকে উঠে তিতলির দিকে তাকালেন। ও তখন একমনে সিগারেটের টান দিয়ে চলেছে।

ফ্ল্যাটে এসে ওদের আর-একদফা তর্কাতর্কি শুরু হল। চলল জেদ আর বায়নার দড়ি টানাটানি।

শেষে তিতলি চোখ কুঁচকে, ঠোঁট উলটে, একটা আঙুল দেখিয়ে আন্তরিকভাবে বলল, 'বাষট্টি, প্লিজ...একবার। জাস্ট একবার...।'

বিশ্বনাথ তা সত্ত্বেও গাঁইগুঁই করছিলেন।

তখন তিতলি ব্যথা পাওয়া গলায় বলল, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার হাতে বেশি সময় নেই। হয়তো বাইট কেমন সেটা আর জানাই হবে না কখনও...। একটা দুঃখ থেকে যাবে, বাষট্টি।'

'কেন, সময় নেই কেন?' বিশ্বনাথের জেদ নমনীয় হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, এর আগেও একদিন তিতলি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়েও দেয়নি।

সোফাতে হেলান দিয়ে হাতদুটো ওপরে তুলে সোফার পিছনে ঝুলিয়ে দিতে চাইল মেয়েটা। তারপর ঘষা কাচের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বিশ্বনাথের দিকে।

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে যেন অনেক কষ্টে বিশ্বনাথকে ফোকাস করল। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, 'আজ আপনাকে বলব...সব বলব।'

বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। অপলকে বাইশকে দেখতে লাগলেন। ওঁর বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল।

বাইশ বলতে শুরু করল।

'আপনাকে কখনও বলা হয়নি। আমরা...আমরা জঘন্য বড়লোক। আমাদের দুটো কয়লা খনি, আর একটা অভ্র খনি আছে। এ ছাড়া আর যা-যা থাকে...বড়লোকের। মানে, কলকাতায় তিনটে বাড়ি, রাজারহাটে একটা বাগানবাড়ি। আর তিনটে গাড়ি...আমারটা নিয়ে।

'যদিও "আমাদের", "আমাদের" বলছি...আসলে এসবের মালিক এখন আমি একা। সব আমার। কারণ, দু-বছর আগে আমার মা-আর বাবা হাইওয়েতে...এনএইচ-থার্টিফোর-এ...একটা হরিবল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। স্পট ডেড।

'আগে মনে-মনে একা ছিলাম, অ্যাক্সিডেন্টটার পর সত্যি-সত্যি একা হয়ে গেলাম। এক কাকা ছাড়া আর কেউ রইল না। আর সেই কাকা...কাকা আমাকে পাগলের মতো তাড়া করে বেড়াতে লাগল।'

তিতলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ডানহাত নামিয়ে চোখ ঢাকল।

বিশ্বনাথ বিড়বিড় করে বললেন, '...তাড়া করে বেড়াতে লাগল কেন?'

চোখ ঢেকে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল তিতলি। ওর বুকের ওঠা-নামা দেখে সেটা বুঝতে পারছিলেন বিশ্বনাথ।

একটু পরেই ও চোখ থেকে হাত সরাল। তারপর বারদুয়েক নাক টেনে বলল, 'কাকা আসানসোলে থাকতেন। মাইনগুলো দেখাশোনা করতেন। তার জন্যে বাবা টাকা দিত মাসে-মাসে। কিন্তু ওই রোড অ্যাক্সিডেন্টটার পর কাকা একেবারে খেপে গেলেন। একে ওই কোটি-কোটি টাকার প্রপার্টি...আর তার সঙ্গে লোভ। বছরদেড়েকের মধ্যেই আমার কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। আমাকে বোকা বানিয়ে তিনি সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার তাল করতে লাগলেন। আমি বুঝতে পেরে বাধা দিলাম। লোকজানাজানি হয়ে গেল। আর তখনই বাধল ঝামেলা।

'আমাকে কিডন্যাপ করে কাকার একটা লুকোনো আস্তানায় তোলার জন্যে কাকা সুপারি দিয়ে প্রফেশন্যাল হুডলামদের লাগিয়ে দিলেন। কারণ, কাকা সম্পত্তি আইনমাফিক কবজা করতে গেলে কয়েকটা ডকুমেন্টে আমার সাইন দরকার। তো সেই লোকগুলো আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। ওরা কখনও আমাকে ফোন করে ভয় দেখায়। কখনও ফলো করে। কখনও-বা ফ্ল্যাটের দরজায় এসে সময়ে-অসময়ে কলিংবেল বাজায়।

'প্রথম-প্রথম আমি ভীষণ ভয় পেতাম। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বুঝলাম, ফালতু ভয় পেয়ে আর লাভ নেই—মরতে হবেই। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তা ছাড়া একে-একা কারই-বা সেরকম বাঁচতে ইচ্ছে করে!'

তিতলি একটু থামতেই বিশ্বনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কেন? তুমি তো পুলিশে খবর দিতে পারো...।'

'দিয়েছিলাম'। তেতো হাসল: 'কোনও লাভ হয়নি। ওরা কাউকে ট্রেস করতে পারেনি। খুন-টুন হলে তারপর ক্লু পাওয়া যায়। খুনের আগে থেকেই এগুলো এক্সপেক্ট করাটা বড্ড বাড়াবাড়ি। এ-কথা একজন পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছেন।'

'প্রথম-প্রথম আমি এ-শহর থেকে ও-শহর পালিয়ে বেড়াতাম। দু-মাস পর ক্লান্ত হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি। আর কোথাও আমি পালাতে চাই না। টু হেল উইথ দৌজ সুপারি কিলার্স। আই ওয়ান্ট টু ডাই ইন মাই ওন সিটি। যা হবে দেখা যাবে।' বিরক্তি আর ঘেন্না নিয়ে কথা শেষ করল তিতলি।

'তোমার কোনও বন্ধু নেই।'

'এখন?'

ওর প্রশ্নে বিশ্বনাথ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না, আগে হোক, এখন হোক...।'

'তিনজন কপালে জুটেছিল। কিলারদের কথা শোনামাত্রই দুজন সটকে পড়েছে। আর-একজন তো একটা এনকাউন্টারের মাঝে পড়ে গিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

'এনকাউন্টার?'

‘হ্যাঁ। সেদিন রাতে জওহরলাল নেহরু রোডে যেমন হয়েছিল। দুটো লোক একটা গাড়ি নিয়ে আমাকে চেজ করেছিল। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, শুভ্র আমার পাশে বসে ছিল। হেকটিক কার চেজের পর কোনওরকমে ওদের কাটিয়ে দেখি শুভ্র ফেইন্ট হয়ে গেছে।’

হাসল তিতলি। বলল, ‘আর কিছু জানতে চান?’

বিশ্বনাথ মাথা নাড়লেন: ‘না!’

‘একমাত্র আপনাকেই দেখলাম, অকারণে ছুটে এসে বোকার মতো ডেঞ্জারাস সিচুয়েশানে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন...।’

‘হয়তো আমি বোকা, ডেঞ্জারাস, তাই।’

‘আপনি কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার। সেজন্যেও হতে পারে।’

‘কে জানে! হতেও পারে—।’

‘কী অদ্ভুত ব্যাপার! আমার কথায় বারবার সায় দিচ্ছেন কেন?’

‘সায় দিতে ভালো লাগছে।’

অবাক হয়ে বিশ্বনাথের দিকে তাকাল তিতলি। তারপর উঠে দাঁড়াল: ‘চলুন, এবার শুরু করুন...।’

‘কী?’

‘আহা! ন্যাকা! বাইট।’

হতাশভাবে মাথা নাড়লেন বিশ্বনাথ। সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, ‘তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল। চলো, বেডরুমে চলো...।’

বিশ্বনাথ যেরকম সহজভাবে ‘বেডরুম’ কথাটা বললেন, তিতলি তার চেয়েও সহজভাবে বলল, ‘এই ফ্ল্যাটের রুমগুলোর মধ্যে বেডরুমটা আমার সবচেয়ে ফেবারিট।’

ওরা শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকেই তিতলি সুইচ টিপল। ঘরের সিলিং-এ ছড়িয়ে পড়ল নীল আলোর আভা। কিন্তু ল্যাম্পটা বিশ্বনাথের চোখে পড়ল না। শুধু দেখলেন, অদ্ভুত এক নীল মায়া ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

আর-একটা সুইচ টিপল তিতলি।

খুব নীচু লয়ে কোমল সুর জেগে উঠল কোথা থেকে। ঠিক যেন মায়ের আদর মাখা ঘুমপাড়ানি গান।

বিশ্বনাথ তিতলিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। গাঢ় নীল অন্ধকার দিয়ে সেজে উঠেছে মেয়েটা।

ও হাতছানি দিয়ে ডাকল বিশ্বনাথকে।

বিশ্বনাথ পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন ওর কাছে। কাঁধ আর গলার খাঁজে ঝুঁকে পড়লেন। পারফিউমের চড়া গন্ধ নাকে এল।

এক অদ্ভুত বিষণ্ণ আনন্দ বিশ্বনাথের মনে ঢেউ তুলছিল। আঙুলের ডগা দিয়ে কাঁধের কাছ থেকে ওর পোশাকটা একটু সরিয়ে দিলেন। তারপর আরও ঝুঁকে ঠোঁট রাখলেন ওর কোমল ত্বকে।

তিতলি হঠাৎই বিশ্বনাথকে জাপটে ধরল। চাপা গলায় বলল, 'ওঃ, সিক্সটি টু!'

বিশ্বনাথ নাভিমূল থেকে কেঁপে গেলেন। পলকে যেন ছাব্বিশ হয়ে গেলেন। ওর উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা বিশ্বনাথকে উষ্ণ করে তুলল। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, সব কেমন গুলিয়ে গেল।

ভ্যাম্পায়ারদেরও তা হলে নেশা হয়!

ঠোঁট ফাঁক করে কামড় বসালেন বিশ্বনাথ। এক অলৌকিক চরম তৃপ্তি ওঁর ভেতরে কাজ করে চলল। তিতলির রক্তের স্বাদ জিভে টের পাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে সিরাম গ্ল্যান্ডে চাপ পড়ছিল। নেশা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকছিল তিতলির শরীরে।

আগে খেয়াল করেননি, বিশ্বনাথ কখন যেন আঁকড়ে ধরেছেন মেয়েটাকে। দুজনের বুক প্রবল চাপে মিশে যাচ্ছিল। তার পরেও মেয়েটা বিশ্বনাথকে কাছে টানতে চাইছিল, পাগলের মতো করছিল।

সেই সময় বিশ্বনাথের ধারালো দাঁতের চাপে একটা রক্তের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ওঁর মনে হল, এইরকম একটা আশ্লেষের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ বছর বেঁচে থাকা যায়। ওঁর জীবনে পশ্চিমদিকটা আচমকা পুবদিক হয়ে গেল যেন। যে-সূর্যটা অস্ত যাচ্ছিল, সেটা যেন কোন এক ম্যাজিকে ভোরের সূর্য হয়ে গেল।

তিতলির ঠোঁট চিরে একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসছিল। ঘুমিয়ে পড়ার ঘোরে বাচ্চারা যেমন আলতো 'উঁ-উঁ' শব্দ করে সেইরকম।

শব্দের তেজ ক্রমশ কমতে-কমতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল। তিতলি শরীরের ভার ছেড়ে দিল বিশ্বনাথের হাতে।

বিশ্বনাথ ওকে যত্ন করে ধরে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। পকেট থেকে স্টিকিং প্লাস্টার বের করে লাগিয়ে দিলেন ক্ষতের ওপরে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন ওর ঘুম-ঘুম মুখের দিকে।

বিশ্বনাথ বিছানায় বসে পড়লেন। তিতলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মুখের ভেতরের নোনা আঁশটে স্বাদটা বারবার জিভ বুলিয়ে থুতু গিলে কমাতে চাইলেন।

বিশ্বনাথ নিজের নতুন জীবনের কথা ভাবছিলেন। কোথায় ছিলেন, আর কোথায় এসে পড়লেন। যে-জীবনটাকে প্রতিদিন ঘেন্নায় দূরে ঠেলতে চাইতেন, সেটাকে এখন তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল।

ঘোর ভেঙে গিয়ে চমকে উঠলেন বিশ্বনাথ। কে এল এ সময়? তিতলি তো বলেছিল, ওর সেরকম কোনও আত্মীয় কিংবা বন্ধু নেই!

ঝরনার শব্দ তুলে বেল বাজাল আবার।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি পা চালালেন ফ্ল্যাটের দরজার দিকে।

ডাইনিং রুমে কোনও আলো জ্বলছিল না। তবে ড্রইংরুমে জ্বলছিল। বিশ্বনাথ দরজার ম্যাজিক আই-তে চোখ রাখলেন।

দুটো অচেনা লোক দরজায় দাঁড়িয়ে। একজন বেশ লম্বা, আর-একজন বেঁটে। বেঁটে লোকটার মুখ লেন্স দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বড্ড বেশি নির্লিপ্ত কাঠখোদাই মুখ।

বিশ্বনাথের ওকে পছন্দ হল না।

লম্বা লোকটা একপাশে মুখ ঘুরিয়ে কান চুলকোচ্ছিল। তাই ওর মুখটা দেখতে পেলেন না। কিন্তু ওর কান চুলকোনোটা অভিনয় হতে পারে বলে মনে হল।

কী ভেবে ঘরে আলো নিভিয়ে দিলেন বিশ্বনাথ। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা খুললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বেঁটে লোকটা একটা লম্বাটে রঙিন কৌটো বিশ্বনাথের মুখের সামনে উঁচিয়ে ধরল। এবং বিশ্বনাথ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অ্যাটমাইজারের বোতাম টিপল।

'স-স-স-স' শব্দ করে মিহি রেণুর শঙ্কু ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বনাথের মুখে।

মিষ্টি গন্ধ পেলেন। বুঝতে পারলেন, স্প্রে করা তরলটা ক্লোরোফর্ম কিংবা ওই জাতীয় কিছু হতে পারে।

তিতলি যেহেতু একা থাকে তাই বেঁটে লোকটা ভেবেছে তিতলিই দরজা খুলবে। ফলে দরজা খোলামাত্রই সময় নষ্ট না করে অ্যাটমাইজারের বোতাম টিপেছে। তিতলি অজ্ঞান হয়ে গেলেই ওরা দুজনে ওকে তুলে নিয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ দরজা খোলায় গল্পটা ভেস্তে গেল।

যে-পরিমাণ তরল বেঁটে লোকটা স্প্রে করেছ তাতে কমপক্ষে দুজন মানুষের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু সি. ভি. বিশ্বনাথ অজ্ঞান হলেন না। চোখের নিমেষে ডানহাত বাড়িয়ে বেঁটে লোকটার টুঁটি খামচে ধরলেন।

লোকটার হাত থেকে রঙিন কৌটোটা খসে পড়ে গেল। ও চোখ বড় করে হাঁসহাঁস করতে লাগল। দু-হাতে বিশ্বনাথের কবজি চেপে ধরল। প্রাণপণ চেষ্টায় টুঁটির বাঁধন ছাড়াতে চাইল।

কিন্তু কোনও কাজ হল না।

বিশ্বনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমি একটা কামড় দিলে তুমি খতম হয়ে যাবে।'

এ-কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হল।

পিছনের লম্বা লোকটা সবে কী করবে ভাবতে শুরু করেছিল। ও সঙ্গীকে ফেলে রেখে সটান সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাল। বিশ্বনাথের হঠাৎই মনে হল, লম্বা লোকটা বোধহয় আগের দিন সংঘর্ষের সময় হাজির ছিল। বিশ্বনাথের কামড়ে কী হতে পারে ও হাড়ে-হাড়ে জানে।

বেঁটে লোকটার অবস্থা তখন মরা নেংটি ইঁদুরের মতো। বিশ্বনাথ ওকে পিছনে ঠেলে দিলেন। চাপা গলায় বললেন, 'তিতলির গায়ে হাত দিতে গেলে আমাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে...।'

বিশ্বনাথের ধাক্কায় লোকটা পড়ে গিয়েছিল। গলায় হাতে বোলাতে-বোলাতে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল।

বিশ্বনাথ বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে যেন আমার আর দেখা না হয়।'

লোকটা কোনও জবাব না দিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু ওর ছুটটা এক-পা খোঁড়া কুকুরের মতো দেখাল।

বিশ্বনাথ হাঁপাচ্ছিলেন। একটু-আধটু ভয়ও করছিল। এরা যদি সেই সুপারি কিলার হয় তা হলে সহজে হাল ছাড়বে না—ওরা আবার আসবে, এবং তৈরি হয়ে আসবে।

ঘুমপাড়ানি ওষুধের কৌটোটা মেঝেতে পড়ে ছিল। বিশ্বনাথ সেটা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ড্রইংরুমে সোফায় বসে কৌটোটা টেবিলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। টেলিফোনের পাশ থেকে কাগজ আর পেন নিয়ে তিতলিকে দু-লাইন নোট লিখলেন:

বাইশ,

একটা বিপদ এসেছিল। রুখেছি। চলে যাচ্ছি। কাল কথা হবে।

বাষট্টি

কাগজটা নিয়ে বেডরুমে গেলেন। ঘুমন্ত তিতলিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর কাগজের টুকরোটা রেখে দিলেন ওর হাতের কাছে।

তিতলির ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর এক অদ্ভুত ক্লান্তি টের পেলেন। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল হঠাৎই। তখনই রেণুকণার গলা পেলেন, 'সারা সন্ধে যা ধকল গেল! তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো—।'

বিশ্বনাথ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন বোধহয়। তাই রেণুকণার গলা পেয়ে চমকে চারপাশে তাকালেন। তারপরই বুঝতে পারলেন, রেণুকণার কথাগুলো এসেছে ওঁর বুকের ভেতর থেকে।

তিতলিকে গাঢ় আবেগে জড়িয়ে ধরেছেন। ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে আছেন গলা। পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছেন—সেইসঙ্গে তিতলির গন্ধও। বুঝতে পারছিলেন, এই বাইট অন্তত—কিছুতেই শেষ হবে না।

জীবনের টান ভোরবেলায় বিশ্বনাথকে এই স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। যখন জেগে উঠলেন তখনও স্বপ্নটা আদর মাখা চাদরের মতো বিশ্বনাথকে জড়িয়ে ছিল।

বেলা হতেই রোজকার মতো রাস্তায় বেরোলেন বিশ্বনাথ। এটিএম থেকে পেনশনের টাকা তুলতে হবে। তারপর 'শটস অ্যান্ড কিকস'-এর স্পেশাল সেল-এ একবার ফোন করতে হবে। নিজের জন্য টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে আর ওষুধ কিনতে হবে। তারপর সন্দীপনের সঙ্গে একবার দেখা করবেন। সি. ভি. জীবনের সুঃখ-দুঃখ নিয়ে কথা বলবেন।

রোদে হাসিখুশি রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে মনে হল তিতলিকে একটা এসএমএস করা যাক। এখন সওয়া দশটা বাজে—নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙেছে ওর।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে এসএমএস করলেন বিশ্বনাথ:

বাইশ জেগে ওঠো। তবে না 'গুড মর্নিং' বলব।

তাকিয়ে দ্যাখো, একটা দিন আমাদের জীবন থেকে

কমে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ যখন ওষুধের দোকানে তখন এসএমএস-এর উত্তর এল:

বাষট্টি, জেগেছি। গুড মর্নিং বলবেন না?

বিশ্বনাথ ভাবলেন, ওষুধের দোকানে কাজ মিটিয়ে তারপর ওকে ফোন করবেন।

প্রায় দশমিনিট পর দোকান থেকে বেরোতে না বেরোতেই আবার তিতলির এসএমএস:

কী ব্যাপার? হারিয়ে গেলেন নাকি?

বিশ্বনাথ হেসে ফেললেন আপনমনে। কী অল্পেতে ঠোঁট ফোলায় মেয়েটা! আসলে ওর কোনও দোষ নেই। সারা জীবনে কারও কাছ থেকে ও কিছু পায়নি। যা ওর পাওনা ছিল তাও না। না পাওয়ার যন্ত্রণা ওকে অভিমানী করে তুলেছে।

বিশ্বনাথ মোবাইল বের করে ওকে ফোন করলেন।

'হ্যালো, বাইশ। কেমন আছ?'

'কী ব্যাপার? হারিয়ে গেলেন নাকি?' তিতলি নয়, ওর অভিমান কথা বলল বলে মনে হল বিশ্বনাথের।

'গুড মর্নিং, বাইশ—।'

'গুড না ছাই! ফোন করতে আর-একটু দেরি হলেই মর্নিংটা ব্যাড হয়ে যেত।'

'কেন? তুমি তো ফোন করতে পারতে আমাকে—।'

'পারতাম। কিন্তু সকালের প্রথম ফোনটা আপনার কাছ থেকে পেতে ভালো লাগে।' হাসল তিতলি: 'থ্যাংকস ফর দ্য সুইট বাইট লাস্ট নাইট।'

মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা। বিশ্বনাথ একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। নীল আলোয় যা আকাঙ্ক্ষার মনে হয়েছিল এখন ঝকঝকে রোদে সে-কথা মনে পড়তেই বিব্রত হয়ে পড়লেন হঠাৎ।

তারপর উঠল বিশ্বনাথের লিখে আসা দু-লাইন চিঠিটার কথা। কথা চলল, এবং চলতেই থাকল।

সময় ভুলে গেলেন বিশ্বনাথ। আর তিতলিও।

বিশ্বনাথের মনে পড়ল, বাড়িতে যেদিন ওঁর মোবাইল ফোনের রিং-এর শব্দ আলোক প্রথম শুনতে পেয়েছিল সেদিন ওর মুখের অবস্থাটা কী বিচ্ছিরিই না হয়েছিল। বিশ্বনাথের

ঘরে ছুটে এসে গায়ের ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ছেলে। অবাক গলায় জিগ্যেস করেছিল, 'এ কী, বাবা, তুমি মোবাইল ফোন কিনেছ?'

'হ্যাঁ, কী হয়েছে?' শান্ত গলায় পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন বিশ্বনাথ।

'না, অনেক টাকার ব্যাপার...তাই...।'

'ঘরে যাও। পারমিতা তোমাকে বোধহয় ডাকছে।'

ভিক্টরের মতো গরগর করতে-করতে চলে গিয়েছিল আলোক।

পারমিতার কাছে অনেক খবরই ও পাচ্ছে আজকাল।

বিশ্বনাথ বড্ড বেশি বাড়ির বাইরে-বাইরে কাটাচ্ছেন। নতুন-নতুন জামাকাপড় তৈরি করাচ্ছেন। পারফিউম স্প্রে করছেন। আগে তিন-চারদিন পরপর শেভ করতেন—এখন রোজ করছেন। দু-একদিন ওঁকে ফুল হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখেছে পারমিতা।

ছেলে আর বউমার বিস্ময় অবশ্যই টের পান বিশ্বনাথ। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। পুরোনো জীবনকে তোয়াক্কা না করাটা এখন ওঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তিতলির সঙ্গে, বলতে গেলে রোজই দেখা করেন বিশ্বনাথ। ওর সঙ্গে পথে বেরিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তিতলির যেমন খেয়াল হয় সেভাবেই ওদের পা চলে।

একদিন তিতলি বলল, কলকাতার টুরিস্ট স্পটগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখবে। ব্যস, অমনই ওদের ট্যুর শুরু হয়ে গেল। পুরো চারদিন লেগেছিল সবগুলো দেখে শেষ করতে।

ওর ছেলেমানুষি দেখে বিশ্বনাথ মজা পান। সেইসঙ্গে ভালোও লাগে। ওর মনের সমস্ত ভাবনা, খামখেয়ালিপনা, এত স্পষ্ট, এত খাঁটি যে, তার তুলনা নেই। মনটা পড়ে নেওয়া যায় খোলা খাতার মতো।

একদিন সন্ধেবেলা ময়দানে হাঁটতে-হাঁটতে তিতলি বলল, 'হাতে আমার যদি বেশি সময় থাকত তা হলে ভালো হত...।'

'তার মানে?' বিশ্বনাথ জিগ্যেস করলেন।

'মানে বাইশ থেকে বাষট্টিতে পৌঁছতে ইচ্ছে করছে। সবকিছু ছেড়ে চট করে চলে যেতে মন চাইছে না...।'

'কোথায় চলে যাবে?'

চলতে-চলতে হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাল।

'এসব পাগলামি ছাড়ো! কে তোমাকে চলে যেতে দিচ্ছে?'

'কে আটকাবে? আপনি?'

'যদি বলি হ্যাঁ—আমি।' বেশ জোর করে বললেন বিশ্বনাথ।

মনমরা হাসল তিতলি: 'আপনি পারবেন না। ওরা প্রফেশন্যাল। ডেঞ্জারাস।'

'আর তুমি তো জানো, আমি বোকা এবং ডেঞ্জারাস—।'

তিতলি কোনও জবাব দিল না। ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসল শুধু।

বিশ্বনাথ তিতলির জন্য ভীষণ চিন্তা করছিলেন।

গত দশ-বারোদিন ধরে হুমকি-ফোনের ব্যাপারটা বেশ বেড়ে গেছে। তিতলিও ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে যেন। যখন ও মরতে ভয় পেত না তখন ওর কোনও ভয় ছিল না। যেদিন থেকে ওর বাষট্টি হতে ইচ্ছে করছে, একটু-আধটু বাঁচতে ইচ্ছে করছে, সেদিন থেকে ভয় চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে ওর ভেতরে।

সন্ধে হয়ে আসছে দেখে বিশ্বনাথ বললেন, 'বাইশ, এবার বাড়ি ফেরা যাক—।'

পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে তিতলি বলল, 'এখনও সূর্য অস্ত যায়নি।'

'দেরি করার কী দরকার!' বিশ্বনাথের কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। বারবার চারপাশে তাকাচ্ছিলেন।

লাল সূর্যের দিকে চোখ রেখে তিতলি বলল, 'বাষট্টি, কাল আমরা দূরে কোথাও বেড়াতে যাব।'

'কোথায়?'

'কাল ভোরে উঠে যেদিকে যাওয়ার ইচ্ছে হবে সেদিকে...।'

হঠাৎই বিশ্বনাথ দেখলেন, তিনটে লোক মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। তার মধ্যে একজন একটু বেশি লম্বা।

ভয় চলকে উঠল। অদৃশ্য গিটারের মোটা তার ঝংকার তুলল বিশ্বনাথের বুকের ভেতরে।

মাঠে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও লোকজন রয়েছে। বিপদে পড়ে চিৎকার করে উঠলে তারা নিশ্চয়ই ছুটে আসবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

বিশ্বনাথ এ-কথা ভাবছিলেন এবং আড়চোখে লোক তিনটের দিকে নজর রাখছিলেন।

তিতলি লাল-হয়ে-যাওয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে নানান কথা বলছিল। কিন্তু সব কথা বিশ্বনাথের মাথায় ঢুকছিল না। কারণ, লোক তিনটের দিকে লক্ষ করছিলেন।

হঠাৎই বিশ্বনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

লোক তিনটে মোটেই ওদের দিকে আসছিল না। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। সেই গাছ-বরাবর তাকালে দূরের রাস্তায় তিতলির শ্যাওলা রঙের গাড়িটা চোখে পড়ছে। অর্থাৎ, গাড়ির কাছে যেতে হলে লোকগুলোকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বনাথ আরও লক্ষ করলেন, গাছের নীচটায় ছায়া নেমে এসেছে। মাঠের লোকজনও কমে যাচ্ছে দ্রুত।

আর ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। তিতলিকে হাত ধরে টান মারলেন বিশ্বনাথ, 'বাইশ, চলো, আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

তিতলি বায়নার সুরে হলল, 'কেন? আর একটু থাকি...।'

'না।'

তিতলির হাত টেনে নিয়ে এগোতে লাগলেন। লক্ষ করলেন, আকাশের লাল আভা মলিন হয়ে সেখানে ছায়া-ছায়া তুলির আঁচড় পড়েছে। ঘরে ফেরা কাক-চড়ুইয়ের দল

ঝাঁকড়া গাছগুলোয় বসে তুমুল হল্লা করছে। রাস্তার ধারে পার্ক করা তিতলির গাড়িটাকে বেশ কষ্ট করে দেখতে পাচ্ছেন।

সেইসঙ্গে এও দেখতে পেলেন, লোক তিনটে বৃত্তচাপের ঢঙে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা কালো বাজপাখি যেন ডানা ছড়াচ্ছে।

বিশ্বনাথের আর সন্দেহ রইল না। চট করে চলার দিক পালটালেন। একইসঙ্গে গতিও বাড়ালেন।

তিতলি বারবার জিগ্যেস করছিল, 'কী হয়েছে?'

বিশ্বনাথ চাপা গলায় বললেন, 'সুপারি কিলার্স।'

তিতলির গলা দিয়ে একটুকরো ভয়ের শব্দ বেরিয়ে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বনাথ বললেন, 'চুপ! আমি তো আছি!'

'ওদের সঙ্গে বোধহয় আর্মস আছে...।'

ওকে সাহস দিতে বিশ্বনাথ হাসলেন: 'আর্মস আমারও আছে—তুমি জানো।' দাঁতের পাটি ফাঁক করলেন বন্ধ করলেন।

'আজ রাতে একটা বাইট প্রেজেন্ট করা যাবে?'

কী অদ্ভুত কথা! মেয়েটার কি মতিগতির ঠিক নেই? এই সাংঘাতিক মুহূর্তে নেশার আবদার করছে!

'ওসব পরে হবে। আগে...।'

বিশ্বনাথ লক্ষ করলেন, লোকগুলো আর দাঁড়িয়ে নেই। দুজন জায়গা বদলে গাড়ির দিকে এগোনোর পথটা আগলাচ্ছে। আর তিন নম্বর লোকটা জোর পায়ে ছুটে আসছে বিশ্বনাথ আর তিতলির দিকে।

'রান!' বিশ্বনাথ গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ছুট লাগাও জলদি—।'

ওরা ছুটতে শুরু করল। কিন্তু কিছুটা দৌড়ে যাওয়ার পরই তিননম্বর লোকটা ওদের ধরে ফেলল। একটা খাটো রড উঁচিয়ে ধরল মাথার ওপরে।

বিশ্বনাথ হাতের এক ঝটকায় তিতলিকে ছিটকে দিলেন ঘাসের ওপরে। আর একইসঙ্গে লোকটার নেমে আসা হাতটা রুখে দিলেন। কিন্তু আঘাতটা পুরোপুরি এড়াতে পারলেন না।

রডটা মাথার পাশে এসে লেগেছিল। তখনই বুঝতে পেরেছেন ওটা লোহার। একটা ভোঁতা যন্ত্রণা মাথায় চারিয়ে গেল। পুরোনো বিশ্বনাথ হলে হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যেতেন। নতুন বিশ্বনাথ ব্যথাটা সামলে নিলেন।

লোকটা মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করেনি। বিশ্বনাথও না।

লোকটাকে দেখলেন।

ছোট-ছোট চুল। পুরু গোঁফ। গাল ভাঙা। দাঁতে রঙিন ছোপ। গলায় সোনালি চেন। পোশাক বলতে চাপা প্যান্ট আর টি-শার্ট।

না, এই লোকটা সেদিন তিতলির ফ্ল্যাটে অ্যাটাক করতে আসেনি। এটা নতুন।

লোকটাকে দেখতে একপলক লাগল। আর ওর গলায় কামড় বসাতে আর এক পলক।

ভিক্টরের মতো অলৌকিক ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিশ্বনাথ। তারপর হিংস্রভাবে কামড় বসিয়েছেন। কনভার্টেড ভ্যাম্পায়ার যে আসল ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে কিছু কম নয়, সেটাই যেন মরিয়া হয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন।

এতক্ষণ কথা না-বলা লোকটা এবার গুঙিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। ঢলে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। কিন্তু বিশ্বনাথ কামড় ছাড়েননি। লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে সমান তালে ঝুঁকে পড়েছিলেন। শেষে হুমড়ি খেয়ে রইলেন ওর গলার ওপর।

নোনা। নোনা। নোনা।

গোটা সমুদ্রটা যেন ঢুকে পড়ছিল বিশ্বনাথের মুখের ভেতরে। সেইসঙ্গে যেন সমুদ্রের মাছগুলোও। কারণ, জোরালো আঁশটে গন্ধ টের পাচ্ছিলেন। শুনতে পেলেন, রেণুকণা বলছেন, না, এ কোনও অন্যায় নয়। একটা শয়তানকে মেরে তুমি একটি দুঃখী মেয়েকে বাঁচাচ্ছ। বাঁচাও! বাঁচাও!

তার মানে, শয়তানটাকে মারো, মারো!

বিশ্বনাথ তাই করছিলেন। লোকটা গলা কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছিল। আর একইসঙ্গে ওর প্রাণটা ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ময়দানের ঘাষ ভিজে যাচ্ছিল।

মিনিটখানেক পর লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, কাছেই তিতলি দাঁড়িয়ে। চোখ বড়-বড় করে বিশ্বনাথের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

‘শিগগির ছোটো গাড়ির দিকে! গাড়ি নিয়ে পালাও। কুইক!’

কিন্তু তিতলি বিশ্বনাথের কথা যেন শুনতেই পেল না। বলল, ‘ওই দ্যাখো, ওই দুটো লোক আসছে...।’

‘আসুক। ওদের আমি রুখে দিচ্ছি। বাট ইউ রান লাইক হেল। আমার কথা শোনো, বাইশ, প্লিজ! গাড়ি নিয়ে স্ট্রেট বাড়ি চলে যাও। সিক্রেট পুলিশকে ইনফর্ম করো। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা লক করে বসে থাকো। খবরদার, আমার কথা বলবে না কিছুতেই। যাও!’

‘আর তুমি?’ কাঁদতে-কাঁদতে জিগ্যেস করল তিতলি।

‘আমি তোমাকে ফোন করব। তারপর কাল হয়তো তোমার আস্তানায় গিয়ে হাজির হব।’ কথাটা শেষ করে বিশ্বনাথ হাসতে চাইলেন। কিন্তু হাসি এল না। ঠোঁট-মুখ চটচট করছে। থুতনি, গলা বেয়ে আঠালো তরল গড়িয়ে নামছে। হয়তো জামাতেও লেগে গেছে।

ছায়া-ছায়া আঁধারে ঠিক কী যে হচ্ছিল বাকি দুটো লোক সেটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারেনি। তা ছাড়া ওরা গাড়ি আগলাবে না সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে, সেটা নিয়েও দোটানায় ছিল। তাই ওদের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগেছে। এখন ওরা জোরকদমে এগিয়ে আসছে বিশ্বনাথের দিকে।

তিতলি কান্না-ভেজা ভাঙা গলায় বলল, ‘আমি একা যাব না—তুমিও চলো।’

বিশ্বনাথ তিতলিকে রুক্ষভাবে ঠেলে দিয়ে বললেন, ‘তুমি গাড়ি নিয়ে পালাও। আমি এদের ব্যবস্থা করে তারপর...।’

বিশ্বনাথ লম্বা-লম্বা শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছিলেন। আবার বললেন, ‘বাইশ, লক্ষ্মীটি—আমার এই কথাটা রাখো—প্লিজ। যাও—।’

‘বাষট্টি!’ বলে ডুকরে উঠল তিতলি। তারপর ঘুরপথে ছুট লাগাল গাড়ির দিকে।

লোক দুটো তখন বিশ্বনাথের হাতদশেকের মধ্যে এসে গেছে। সাবধানে সতর্ক পা ফেলে এক পা এক পা করে শিকার ধরতে এগিয়ে আসছে।

দুজনের মধ্যে লম্বা লোকটাকে একটু যেন চেনা মনে হল বিশ্বনাথের। তিতলির ফ্ল্যাটে কি লোকটা এসেছিল? তা হলে তো বিশ্বনাথকে ও চিনবে।

একটা লোকের গলা শোনা গেল, ‘ছামিয়াটা যে ওদিক দিয়ে ছুট লাগাচ্ছে, বস—।’

‘আগে এই ঢ্যামনাটাকে কোতল কর। হারামিটা রামাইয়াকে লুটিয়ে দিয়েছে। আমাদের অপারেশানে বারবার দখল দিচ্ছে। আর ওই ছামিয়া পালাবে কোথায়! ওর তো ওই একটাই ঠেক—।’

কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন বিশ্বনাথ। এক্স-ফ্যাক্টর ওঁকে চমৎকার সাহায্য করছিল। ওঁর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক, তিতলিকে আজ ওরা রেহাই দিচ্ছে। এই একটা দিনই বিশ্বনাথের দরকার। সন্দীপনের এক শালা সিক্রেট পুলিশে আছে। কাল সকালেই ওর সঙ্গে দেখা করে তিতলির ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। আগেও বিশ্বনাথ সন্দীপনকে এ-ব্যাপারে রেখে-ঢেকে একটু ইশারা দিয়েছেন, কিন্তু ইমার্জেন্সি ভেবে সেরকম তাগাদা করেননি।

লোকদুটো কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল শত্রু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পায়ের কাছে রামাইয়ার দেহ—অথবা, মৃতদেহ—অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

বিশ্বনাথ তিতলির দিকে লক্ষ করছিলেন। দেখলেন, ও গাড়িতে উঠে পড়ল। হেডলাইট জ্বলে উঠল। তারপর হেডলাইট দুটো দুরন্ত গতিতে ছুটতে শুরু করল।

আঃ—!

পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেললেন বিশ্বনাথ। এখন আর কাউকে তিনি ভয় পান না। সামনের এই জঘন্য লোকদুটোকেও না।

দুটো লোকের গায়েই ঢোলা শার্ট। প্যান্টের ওপর দিকে ঝোলানো। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলেও বিশ্বনাথ ওদের দেখতে পাচ্ছিলেন। একজনের বাচ্চা-বাচ্চা লালিপপ মুখ। বাঁ ভুরুর ওপরে কাটা দাগ। গা থেকে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছে।

আর অন্যজন সেই লম্বা লোকটা। শিকারি বাঘের মতো সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম সুযোগেই ক্ষিপ্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দুটো লোকই কোমরের কাছে হাত গুঁজে রেখেছিল। বোধহয় লুকোনো অস্ত্র হাতে ছুঁয়ে ভরসা খুঁজছিল। আর বিশ্বনাথের দু-পাটি অস্ত্র মুখের ভেতরে খটাখট শব্দ তুলে আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিল।

একটা হাত বেরিয়ে এল ঢোলা শার্টের আড়াল থেকে। হাতে ধরা ফুটখানেক লম্বা একটা চওড়া ব্লেডের ছুরি।

বিশ্বনাথ হিসেব কষছিলেন। এই হতচ্ছাড়া দুটোকে যেভাবে হোক আটকাতে হবে। খতম না হোক, অন্তত ঘায়েল করতে হবে। যাতে ওরা বাইশকে আর জ্বালাতে না পারে।

হিসেবের উত্তর অনুযায়ী বিশ্বনাথ ছুরিওয়ালার ছুরি লক্ষ করে ঝাঁপ দিলেন। ভঙ্গিটা এমন, যেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুরি চলল বাতাসে। বিশ্বনাথের বাঁ-হাতে, কুনুইয়ের ঠিক ওপরে, কেটে বসল ছুরিটা। বিশ্বনাথ লোকটার কান ধরলেন মুঠো করে। এক হ্যাঁচকায় ওকে টেনে নিলেন নিজের কাছে। এবং ওর ডান কাঁধে মরণ কামড় বসালেন।

শুয়োরের বাচ্চাটা বুঝুক ভ্যাম্পায়ারের কামড় কাকে বলে!

বাঁ-হাতে বসানো ছুরির ফলা। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু বাষট্টির কোনও তোয়াক্কা নেই। বরং কামড়টা ঠিকঠাক দিতে পেরেছে বলে বেজায় খুশি।

ঠিক সেই মুহূর্তে যন্ত্রণায় ছটফট করা লোকটা এক প্রবল ধাক্কা দিল বিশ্বনাথকে। বিশ্বনাথ ছিটকে পড়লেন বটে, তবে লোকটার কাঁধের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে চলে এল দাঁতে।

আঁশটে গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। থু-থু করে সব ফেলে দিলেন। তারপর নজর ফেরালেন লোকদুটোর দিকে। দেখলেন আহত লোকটা টলছে—যে-কোনও মুহূর্তে খসে পড়বে জমিতে।

কিন্তু দু-নম্বর লোকটা কোথায় গেল?

ওই তো! আহত সঙ্গীকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঘাসের ওপরে চিত হয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন বিশ্বনাথ। ওঁর একটা পা লম্বা হয়ে আছে রামাইয়ার গায়ের ওপরে। আর-একটা পা হিম-ভেজা ঘাসে।

আকাশের দিকে চোখ গেল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে চাঁদকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। চাঁদের খাঁজ এবং বাঁকগুলো মুগ্ধ করল বিশ্বনাথকে। যে-বাতাস হঠাৎ বইতে শুরু করেছে তাতে শীতের গন্ধ পাচ্ছিলেন। তবে তার মধ্যে যেন আলতো করে মৃত্যুর পারফিউম মিশিয়ে দিয়েছে কেউ।

ওই তো লম্বা লোকটা! ও একটা দাঁড়িয়ে আছে। ওর শাগরেদ—কাঁধে কামড় খাওয়া লোকটা—নির্ঘাত খসে পড়েছে মাটিতে।

শরীরের সব শক্তি জড়ো করে উঠে বসলেন বিশ্বনাথ। বাঁ-হাতটা অসম্ভব জ্বালা করছে। এবার শেষেরটাকে খতম করার পালা। তা হলেই নিশ্চিন্ত। অন্তত কিছুদিনের জন্য।

লম্বা লোকটা কোমরের কাছ থেকে কী একটা বের করে শূন্যে তুলল।

অস্ত্রটা চিনতে পারলেন বিশ্বনাথ। খাটো হাতলের একটা কুড়ুল। কিন্তু ততক্ষণে অস্ত্রটা বাতাস কেটে শূন্যে বৃত্তচাপ এঁকে ধূমকেতুর মতো ছুটে আসতে শুরু করেছে বিশ্বনাথের দিকে।

কুড়ুলটা বিশ্বনাথের বুকে এসে আছড়ে পড়ল। সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ হল। ফলার অর্ধেকটা গেঁথে গেল ওঁর পাঁজরে। আর উঠে-বসতে-চাওয়া বিশ্বনাথ কুড়ুলের ধাক্কায় সটান চিত হয়ে পড়ে গেলেন।

হেঁচকি তোলার একটা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল মুখ থেকে। চেষ্টা করেও বিশ্বনাথ মর্মান্তিক শব্দটা চাপা দিতে পারেননি। একইসঙ্গে বুকের ভেতরে দম বন্ধ হয়ে এল। একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন শ্বাসনালীতে আটকে গেছে।

ঝাপসা চোখে লম্বা লোকটার দাঁড়ানো সিল্যুট দেখতে পেলেন। ওর মাথার পাশ দিয়ে উঁকি মারছিল শুক্লপক্ষের চাঁদ।

সামনে ঝুঁকে পড়ে কুড়ুলের হাতল ধরে প্রকাণ্ড এক হ্যাঁচকা মারল শত্রু। বোধহয় ইচ্ছে ছিল কুড়ুলের দ্বিতীয় আঘাত হানবে বিশ্বনাথকে বুকে। কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। কারণ, কুড়ুলের ফলাটা কিছুতেই ছাড়ানো গেল না বিশ্বনাথের পাঁজর থেকে।

বিশ্বনাথের সারাটা শরীর চটচট করছিল। আঁশটে গন্ধ তুফান ছুটিয়ে দিয়েছে চারপাশে। কুড়ুলের কাঠের হাতলটা কোনওরকমে চেপে ধরলেন। তারপর ওঁর আঙুলগুলো কাঁকড়ার দাঁড়া হয়ে হাতল বেয়ে উঠতে লাগল। লম্বা লোকটা তখনও হাতল ধরে টানাটানি করছে। বিশ্বনাথের আঙুল ওর আঙুলের নাগাল পেয়ে গেল।

ব্যস। সঙ্গে-সঙ্গে তিতলিকে নিরাপদ করার তীব্র অভিলাষ বিশ্বনাথকে পেয়ে বসল। লোকটার আঙুল আঁকড়ে ধরে এক হিংস্র টান মারলেন। লোকটা নিমেষের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিশ্বনাথের বুকের ওপর। বিশ্বনাথ এক মুহূর্তও দেরি না করে লোকটার গাল কামড়ে ধরলেন। সিরাম গ্ল্যান্ডে চাপ দিলেন প্রাণপণে।

হে ভগবান, একে খতম করার পুঁজি যেন থাকে আমার অলৌকিক জীবনে! বিড়বিড় করে বারবার এই প্রার্থনা জানাতে চাইলেন বিশ্বনাথ।

লোকটা এলোপাথাড়ি ছটফটাচ্ছিল। কিন্তু একটু পরেই দম-ফুরিয়ে যাওয়া পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল। টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল বিশ্বনাথের গায়ের ওপর থেকে।

বিশ্বনাথের মনটা পালকের মতো হালকা হয়ে গেল। চিত হয়ে শুয়ে কুড়ুলের কালো হাতল আর চাঁদ দেখতে লাগলেন। হাতলটা যেন ওঁর শরীরেরই একটা বিচিত্র প্রত্যঙ্গ— আকাশের দিকে প্রতিবাদে উঁচিয়ে আছে।

ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল হঠাৎই। বিশ্বনাথের জ্বালায় আলতো প্রলেপ লাগাল।

সঙ্গে-সঙ্গে পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল আনন্দের সুরে।

অতি কষ্টে ডানহাত পকেটে ঢুকিয়ে বের করে নিলেন ফোনটা। সুইচ টিপে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'হ্যালো—।'

'বাষট্টি, তুমি ঠিক আছ তো? আর ইউ ও. কে.?' উদ্বেগে পাগল তিতলির গলা।

'আমি ঠিক আছি।' কোনওরকমে বললেন বিশ্বনাথ। প্রাণপণে কষ্ট চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন: 'আর কোনও ভয় নেই, বাইশ...।'

'তুমি শিগগির আমার এখানে পালিয়ে এসো। এখানে কেউ তোমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না—।'

'যাচ্ছি।' বিশ্বনাথের গলা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল।

'শিগগির চলে এসো।' উচ্ছ্বল গলায় বলল তিতলি, 'আমি তো ওয়েট করছি! আজ রাতে আমার ফ্ল্যাটে তুমি থেকে যাবে—।'

'যাচ্ছি—।' আবার বললেন বিশ্বনাথ। বইপত্র পড়ে কিংবা সিনেমা দেখে যেটুকু তিনি জেনেছেন, তাতে কুড়ুলের ঘায়ে ভ্যাম্পায়াররা খতম হয় না। কাঠের বল্লম দিয়ে ফুঁড়ে দিতে হয় তাদের হৃৎপিণ্ড। সুতরাং কোনও ভয় নেই। এক্ষুনি ওর বীভৎস ক্ষতের জায়গাটা অলৌকিক ম্যাজিকে মোলায়েম হয়ে জুড়ে যাবে। তারপর, বিশ্বনাথ উঠে বসবেন। তিতলির...।

কিন্তু গল্পের সঙ্গে, সিনেমার সঙ্গে, ব্যাপারটা মিলছিল না। শরীরটা কাহিল হয়ে আসছিল, হাঁ করে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন, আর চোখের নজর দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

বোকার হদ্দ মেয়েটা তখনও ফোনে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছিল, ‘বাষট্টি, তুমি আসছ তো? বাষট্টি! বাষট্টি...।’

বিশ্বনাথের শিথিল হাত থেকে মোবাইল ফোনটা খসে পড়ে গেল ঘাসের ওপরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, ‘যাচ্ছি...।’